পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ

হায়দার আলী চৌধুরী

পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ

হায়দার আলী চৌধুরী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ ঃ হায়দার আলী চৌধুরী ।। ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ১৪৩৮ ।। ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ৯৫৪.০২ ।। প্রথম প্রকাশ ঃ আষাঢ় ১৩৯৪, জিলকদ ১৪০৭, জুন ১৯৮৭ ।। প্রকাশক ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা ।। মুদ্রণে ঃ আদর্শ মুদ্রায়ণ, ৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা ।। বাঁধাইয়ে ঃ আজগর বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস, ৩১/৩২ পি. কে. রায় রোড, ইস্পাহানী বিল্ডিং, বাংলাবাজার, ঢাকা ।।

মূল্য ঃ ১০০·০০ টাকা

PLASSEY JUDHOTTAR AZADI SANGRAMER PADAPITH : The Stage of Post-Plassey Liberation Struggle, written by Haider Ali Choudhury in Bengali and published by Prof. Abdul Ghafur, Publication Director, Islamic Foundation Bangladesh.

June 1987

Price : Tk. 100.00 (Inland)
Dollar (U. S.) : 7·00 (Foreign)

উৎসর্গ

যাঁর দেশপ্রেম, দেশ-সেবা, স্বাধীনতা-প্রিয়তা মানুষের অনুপ্রেরণা; যিনি একাই নিজের শক্তি ও চেষ্টায় বিপ্লবী দল গঠন এবং আগ্নেয় অস্ত্রাদি সংগ্রহ করে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ক'রে দেশকে মুক্ত করার চেষ্টা ক'রে অমর হয়েছেন–সেই আমার অগ্রজতুল্য বন্ধু শিক্ষক-গুরু বিপ্লবী বীর কবি বেনজীর আহমদের স্মৃতির উদ্দেশে আমার এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

হায়দার আলী চৌধুরী

আমাদের কথা

যে জাতির ইতিহাস নেই, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে না। ইতিহাসকে জাতির দর্পণ বলা হয়, কারণ ইতিহাসে ফুটে ওঠে জাতির প্রতিচ্ছবি। একমাত্র ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমেই একটা জাতি তার নির্ভেজাল সত্তা ও শক্তিমত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে পারে, অগ্রসর হতে পারে তার উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের আস্থা বুকে নিয়ে।

ইতিহাস বলতে কী বোঝায়? ইতিহাস বলতে সাধারণ অর্থে আমরা অবশ্যই লিখিত ইতিহাস বুঝে থাকি। কিন্তু যখন আমরা বলে থাকি অমুক জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে তখন কি আমরা তার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ইতিহাস বুঝি, না গৌরবোজ্জ্বল অতীত বুঝে থাকি? আমরা বলতে চাইছি, স্মরণযোগ্য গৌরবযোগ্য অতীতই ইতিহাস, তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত থাক বা নাই থাক। ইতিহাস গ্রন্থ বলতে যা বুঝানো হয় তা ইতিহাসের গ্রন্থায়িত রূপ মাত্র। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, এমনও জাতি থাকে, যাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে, কিন্তু নেই সে ইতিহাসের সঠিক গ্রন্থিত রূপ। এর নিকটতম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ।

ইতিহাস রচনার কাজ সাধারণত যতটা সহজ মনে করা হয় ততটা সহজ এ কাজ নয়। কারণ মানব জাতির ইতিহাসের প্রতিটি স্তরেই রয়েছে ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে, কল্যাণ-অকল্যাণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আর এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সব সময় যে ন্যায়ের পক্ষ জয়ী হয়েছে এমনটাও সত্যি নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীতটাই সত্য থেকেছে। অকল্যাণের শক্তি যখন জয়ী হয়েছে তখন ন্যায় ও কল্যাণের পক্ষের বহু ঐতিহাসিক উপাদানই সচেতনভাবে চাপা দেয়া হয়েছে, হয়েছে ধ্বংস করে দেয়া। ইতিহাসের প্রকৃত গবেষকদের অন্যতম প্রধান কাজ যে ইতিহাস পুনর্গঠন করা অর্থাৎ ইতিহাসের চাপা-পড়া সত্যকে পুনরুদ্ধার করা, তার গুরুত্ব এখানেই।

পলাশীর আম্র-কাননে আমাদের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত যাওয়ার পর সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশের মুসলমানরা স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য রক্তক্ষরা সংগ্রাম চালিয়েছে। কিন্তু বিজয়ী বিদেশী শক্তির সাথে এদেশের একটি কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর যোগসাজসের ফলে মুসলমানদের যে গৌরবোজ্জ্বল

ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। শুধু সত্য চাপা দেয়াই নয়, দুই অপশক্তির যোগসাজসে মুসলমানদের যা কিছু গর্ব ও গৌরবের তা ধ্বংস করা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে বিধ্বস্ত করে দেয়ার বর্বর অভিযান চালানো হয়।

এই ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড এবং এই চাপা-পড়া ইতিহাসের কিছু অংশ সারা জীবনের পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে উদ্ধার করে আমাদের সামনে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন রংপুরের প্রবীন গবেষক জনাব হায়দার আলী চৌধুরী। নিজের আর্থিক দৈন্যদশা ও শারীরিক পংগুত্ব-জনিত বিড়ম্বনাকে উপেক্ষা করে সারা জীবন ধরে তাঁর জমানো গবেষণার ধন পাণ্ডুলিপি আকারে প্রস্তুত করতে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তাঁকে জাতির পক্ষ থেকে আমরা মোবারকবাদ জানাই। হায়দার আলী চৌধুরীর গবেষণার পূর্বে পলাশীর অব্যবহিত পরে এদেশের উত্তরাঞ্চলে মজনু শাহের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক ফকীর বিপ্লবের প্লাবন বয়ে যায়, তার খবর আমাদের খুব কম লোকই জানতেন।

হায়দার আলী চৌধুরী পেশাদার ঐতিহাসিক নন। ফলে তাঁর এ গ্রন্থকে নিয়ম মাফিক ইতিহাস গ্রন্থ বলতে হয়ত অনেকে কুণ্ঠাবোধ করতে পারেন। তবে এ কথা সত্য যে, তাঁর এ গ্রন্থে এমন বহু অজানা অমূল্য তথ্যের সন্ধান আমরা পাই, যা ইতিহাস পুনর্গঠনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। হায়দার আলী চৌধুরীর মত একজন নিবেদিতপ্রাণ গবেষণাকর্মী এবং সাধক পুরুষের আজীবন সাধনার ধন এই অমূল্য গ্রন্থখানা আমরা সুধী সমাজের সামনে উপস্থাপন করতে পারছি—এ এক বিরল সৌভাগ্যের কথা। আমরা পরম করুণাময়ের দরবারে গ্রন্থকারের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে জাতির এ ক্রান্তি-লগ্নে আমাদের সংকট-উত্তরণে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের রহমত প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
বাংলাদেশ ।। ৩০. ৬. ৮৭

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

আমার কথা

মোগল সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ সর্বভারতকে একই নেতৃত্বে রেখে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর নেতৃত্বে রংপুর জেলাস্থ ফুলচৌকীকে সুবা বাংলার নির্মীয়মান রাজধানী করে তৎকালীন বিদ্রোহীরা যে অভিযান আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন; যাকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ফকীর বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্প্রদায় ও শ্রেণীগত নাম দিয়ে প্রকৃত সত্যকে গোপন করবার চেষ্টা করে আসছে। সেই সত্যকে উদ্ঘাটন করার জন্য আমার এই প্রচেষ্টা।

রংপুর জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো সুপ্রাচীনকাল থেকে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। প্রাচীনকাল থেকে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে যেমন ভারতের সত্যিকার ইতিহাস লিখিত হয়নি, তেমনি রংপুর তথা বাংলার ইতিহাসও লিখিত হয়নি। বহু পূর্বের সুপ্রাচীন পুঁথিপত্রে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে ইতিহাসের যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, তার কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে আমরা দেওয়ার প্রয়াস পাব। অবশ্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বা বিচারে এর কতটা মূল্য আছে তা পাঠক নির্ধারণ করবেন। রংপুরের বা এই জনপদের ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। যাঁরা ইতিহাস লিখেছিলেন, তাঁরা মনে হয় প্রকাশ করতে পারেন নি বিদেশী ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বৈরিতার জন্য। রংপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক জমিদার শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে রংপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু শিলালিপি, তালপত্র, প্রাচীন মোহরাদি, সুপ্রাচীন পুঁথিপত্র, নানারূপ মূর্তি, বহুকিছু নানা সময়ে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এর কিছু ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল এবং আর অংশগুলো রংপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত ছিল। সেসব মিলিয়ে হয়তো অতি চমৎকার ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ইতিহাস হতে পারতো। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রংপুর সাহিত্য পরিষদে যা কিছু অমূল্য সম্পদ ছিল তা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় কে বা কারা সে সব লুটপাট করে নিয়ে যায়। একখানি কাগজ পর্যন্ত নেই। শুধু মেঝে ও ঘরটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। যা হোক, রংপুরের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ বর্ম্মা মহাশয়ের কিছুটা লেখা

থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা প্রথমে রংপুরের ঐতিহাসিক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করবো ঃ

> রংপুরের লোক-সাহিত্য কেবলমাত্র বর্তমান রংপুর জিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বস্তুত রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া এবং দিনাজপুরের কিয়দংশের কথা ভাষা ও লোক-সাহিত্য প্রায় এক। ইহার কারণ, পশ্চিম দক্ষিণে করতোয়া বেষ্টিত এ অঞ্চল একদা কান্তা বিহার বা কামরূপ রাজ্যের 'রত্নপীঠ' নামক একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল।
>
> —সাহিত্য বার্তা পত্রিকা, সাপ্তাহিক, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৬১ সাল, পৃষ্ঠা ৪

রংপুর কান্তা বিহার বা কামরূপ রাজ্যের 'রত্নপীঠ' নামক একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। সত্যই এই রত্নপীঠ নামটি অত্র অঞ্চলের জন্য সার্থক হয়েছিল। দেখা গেছে, ইংরাজ আমলের শেষ সময়টি পর্যন্ত রংপুরের মাটি রত্নই ফলাতো। এখানের মাটিতে যে কোন ফসল বুনলে প্রচুর ফলতো। এসব কথা আমরা পরে কিছুটা আলোচনা করবো। কিন্তু তার পূর্বে রংপুরের বাসিন্দা অধ্যাপক প্রদীপ বিকাশ চৌধুরী এম. এ.-এর লেখা থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা হলো।

> বর্তমান আসামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র একটি উপবিভাগ কামরূপ আখ্যায় আখ্যায়িত। এই বিরাট রাজ্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ আমরা পাই রামায়ণ গ্রন্থে। রামায়ণে এই রাজ্য 'প্রাগজ্যোতিষ' নামে উক্ত হয়েছে। ভারত বিবরণের মহাসমুদ্র বিশেষ মহাভারত গ্রন্থে 'প্রাগজ্যোতিষ' রাজ্য সম্পর্কীয় অনেক কথা লিখিত রয়েছে। তৎকালে নরকপুত্র ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ছিলেন। এই প্রাগজ্যোতিষ ব্যতীত শোনিতপুর বর্তমান তেজপুর হিড়িম্ব বর্তমান কাছাড়, জয়ন্ত বর্তমান জয়ন্তিয়া, মনিপুর প্রভৃতি রাজ্যের নাম মহাভারত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রী মদ্ভাগবত কামরূপের প্রাগজ্যোতিষ আখ্যাই পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের কামরূপ আখ্যা সর্বপ্রথম পুরাণ তন্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, কালিকা পুরাণ প্রভৃতিতে কামরূপের বিষয় উল্লিখিত আছে। কুচবিহার রাজ্যও এককালে কামরূপের অন্তর্গত ছিল। মিস্টার ই. এ. গেইট কামরূপের সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"In Joginitantra, which is probably a later work. Kamrupa

included the tract between the Korotoya river on the west and Dikrang on the east, the mountain of Kanchana and Girikanyaka on the north, and the confluence of the Brahmaputra and Lakshmi rivers on the south, that is to say it included roughly. The Brahmaputra valley, Bhutan, Rangpur and Koch-bihar."২

তাঁর গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা (তীরবর্তী ভূভাগ), ভুটান রাজ্য, রংপুর ও কুচবিহার কামরূপের যোগিনীতন্ত্রোক্ত সীমার মধ্যে পতিত হয়। এ ছাড়া 'আসাম বুরুঞ্জী' গ্রন্থে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি রংপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং রংপুর যে কামরূপ রাজ্যেরই অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট স্থান, এ কথা অযৌক্তিক নয়।

রাজা নরকের পুত্র ছিলেন ভগদত্ত। রাজা ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ছিলেন। উক্ত বংশের 'মহীরঙ্গ' নামক এক রাজার নামানুসারে এই রংপুর নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার কেউ কেউ অনুমান করেন যে, 'নরক'পুত্র ভগদত্ত যখন এই প্রদেশের শাসন ভার নিয়েছিলেন তখন তার রঙ্গভূমি হিসাবে এই জনপদের নাম রংপুর হয়েছিল। ভগদত্ত যে প্রাগজ্যোতিষেশ্বর ছিলেন এ কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। 'প্রাগজ্যোতিষেশ্বর নৃপতি ভগদত্তো মহারথঃ'। যাই হোক, এই নামকরণ নিয়ে অনেকে অনেক রকম মনে করেন। আমরা 'তারিখ-ই-ফিরিশতাতে' রংপুর নামের উল্লেখ পাই ঃ

On the boarder of Bengal in the place of Nadiya a new town, Rangpur by name, was founded by him, (Bakhtyar Khaljee) he made it capital and built Mosques.

যে পাল বংশের পরিচয় আমরা ইতিহাসে পাই, সেই বংশের ধর্মপাল, মানিকচাঁদ, গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র এবং ভবচন্দ্র এই রংপুর বিভাগে রাজত্ব করেছিলেন।"…

খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহীপাল পাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। মহীপালের গীত বা মহীপালের প্রশংসার কবিতা আজও নানা স্থানে

লোকে গীত করে থাকে। রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জায়গায় এই গান প্রচলিত আছে। মহামতি গ্লেজিয়ার যখন রংপুরের কালেক্টর ছিলেন সেই সময় তিনি রংপুরের একটি বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, মহারাজ **ধর্মপাল** তাঁর ভ্রাতৃবধূ মিনাবতীর সঙ্গে ত্রিস্রোতা বা তিস্তানদীর তীরে **মহাসংগ্রামে** বিনাশ প্রাপ্ত হন। মিনাবতীর পুত্র গোপীচাঁদ রাজা হন। গোপীচাঁদ বা গোবিচন্দ্রের গীত ডঃ দীনেশ সেন কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছে। এই গীত রংপুরের কবি দুর্লভ মল্লিক কর্তৃক রচিত।...

'রংপুর পৌণ্ড্রবর্ধন ভুণ্ডির অন্তর্গত বলে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং-এর বৃত্তান্তে জানা যায়। সে সময় পুণ্ড্রের রাজধানী ছিল বগুড়ার মধ্যে। একেবারে রাজমহল থেকে শুরু করে করতোয়া পর্যন্ত গোটা উত্তর বঙ্গই সে সময় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র বা বরেন্দী ছিল বর্তমান বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা জুড়ে। এখানে বলা আবশ্যক যে, করতোয়া নদীর তীরবর্তী রংপুর। প্রভাস চন্দ্র সেন তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন,* ভগীরথ বংশীয় ভীম রাজগণের বংশধরকে পরাস্তও এতদাঞ্চল থেকে বিতাড়িত করিয়া ভোজ গৌর বংশীয়গণ পৌণ্ড্রবর্ধনে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা আইন-ই-আকবরীর বিবরণ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।...

সুতরাং বুঝা যায় যে, রংপুর প্রাচীনকাল হইতেই একটা রাজনৈতিক জায়গা ছিল। History of Bengal পাঠে জানা যায়, আলীবর্দী খান (১৭৪০—১৭৫৬ খৃঃ) রাজত্ব নেবার পর তাঁর জামাতা সাইদ আহমদকে রংপুর হইতে উড়িষ্যায় নিয়ে গিয়ে কাসেম আলী খানকে রংপুরের ফৌজদার করেন। বঙ্গ বিজেতা বখতিয়ার খিলজী রংপুরে এসেছিলেন। এখনও বক্তিয়ারপুর তাঁর আগমনের স্বাক্ষর দিচ্ছে।*

উপরের উদ্ধৃতি হতে রংপুরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বদরগঞ্জ থানার অধীন কুতুবপুর কাছারীর পশ্চিম প্রান্তে যমুনেশ্বরী নদীর পশ্চিম পাড়স্থ ডাঙ্গা ভূমিকে এখন অবধি বক্তিয়ারের ডাঙ্গা বলা হয়ে থাকে। উক্ত যমুনেশ্বর নদী পূর্বের

---

* রংপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'উন্নয়ন', জানুয়ারী, ১৯৬৮ সংখ্যা, সম্পাদক : নূরুল ইসলাম। । পৃষ্ঠা ১—৫ এবং ৭ ও ৯।

তিস্তা। সম্ভবত তিস্তার পশ্চিম পাড়ে বখতিয়ার খিলজী তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ঐ স্থানে রাত্রি যাপন করেছিলেন। সেজন্য ঐ স্থানের 'বক্তিয়ারের ডাঙ্গা' নামকরণ হয়েছে। ইতিপূর্বে পাল উপাধিধারী বৌদ্ধ রাজগণ বাঙ্গালার বহু কিছু সভ্যতা ও উন্নতির আধারস্বরূপ ছিলেন।

এই জেলার বিভিন্ন স্থানে এখনও বহু প্রাচীন কীর্তি ধ্বংসোন্মুখভাবে নানা ধরনে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন গড়, কোট, দরগাহ, মসজিদ, মকবরা, মঠ, মন্দির হতে এর পূর্বের ঐতিহ্যের বেশ কিছুটা নমুনা পাওয়া যেতে পারে।

এতদঞ্চলের লোক বিনয়ী, নম্র। কিন্তু ন্যায় যুদ্ধে নিপুণ যোদ্ধা ও বীর। এরা উগ্র স্বভাবের নয়, তবে ভীরুও নয়। আমার লেখা এই ইতিহাসে সে পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক পূর্বের মত এখনও পরস্পর পরস্পরকে আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করে থাকেন। আজও তা অমলিন রয়েছে। এই আত্মীয়তাসূচক ঐক্যের বন্ধন এরা আজ অবধিও অক্ষুণ্ন রেখেছেন। যা বাংলার বা পাক-ভারতের অন্য কোথাও সহসা লক্ষ্য করা যায় না। এই ভূভাগের অধিকাংশ লোক মুসলমান। এর পরে হলো রাজপুত (রাজ বংশীয় বর্মণ)। উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং অল্প সংখ্যক অন্যান্য সম্প্রদায়। ধর্মে পৃথক হলেও মনের দিক দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর পরস্পরকে সম্ভ্রম শ্রদ্ধা করেন।

এই ভূ-ভাগের লোকেরা সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। ইতিহাসে তা অলিখিত থাকলেও নিম্নোক্ত বিষয়টি থেকে সহজে বোঝা যাবে। রংপুরের লোকেরা ছিলেন রেশম শিল্পের আদি পিতা। এই সত্য ইতিহাসের মধ্যস্থতায় পাওয়া যাবে। রোমীয়দের দ্বারা এই সত্য প্রকাশ হয়েছে। মনের দিক থেকে এবং বাস্তব জীবনের ব্যবহারিক দিক দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না। তাই বাস্তব সৃষ্টিতে দেখা যায়, রংপুর বা এই ভূ-ভাগের লোককে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এক বিশেষ সভ্যতার জনক বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য সাগর পারের বিদেশী কর্মচারী ইংরাজ লেখকগণের ২/১ জন এইসব অঞ্চলের লোকজনকে অসভ্য, অর্ধসভ্য বলতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু রেশম ও অন্যান্য শিল্পের স্রষ্টাদের কীর্তিকলাপ পর্যালোচনা করলে ধরা পড়বে যে, তাদের কথা আদৌ সত্য নয়। এখানে আমরা অর্থনীতি ও ইতিহাসের গবেষক অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ সাহেবের

গবেষণামূলক লেখা থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করে এ ব্যাপারে আলোকপাত করবো ঃ

> ইতিহাসে আষাঢ়ে গল্পের স্থান নেই। তবু ইতিহাস তার গতিপথে অনেক সময় এমন সব বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি করে, রূপকথার চাইতেও সেসব ঘটনা অবাস্তব বলে মনে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে এমন কতকগুলো তথ্য অবগত হওয়া যায়, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সেসব অলীক উপাখ্যানের মত মনে হয়। এখানকার (রংপুর) রেশম শিল্পের ইতিহাসে রয়েছে এমন একটি চমকপ্রদ ঘটনা।…
>
> পাক-ভারত উপমহাদেশ ও চীনদেশ রেশমের আদি বাসভূমি। উভয় দেশের পাঁচ হাজার বছর আগেকার সাহিত্যে রেশমের উল্লেখ দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখিত 'ক্ষৌম' ও 'পত্রোর্ণ' ছিল রেশমী বস্ত্র। উত্তরবঙ্গে তা উৎপন্ন হতো। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উর্ণ কৌষেয়, কীটজ, ক্ষৌম, পট্ট প্রভৃতি নামে রেশমী বস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। রেশম ফার্সী শব্দ, মুসলিম আমল থেকে এ শব্দের প্রচলন হয়। তবে গৃহপালিত কীটজ রেশমের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় না।
>
> চীন সম্রাট কোহি বংশীয় রাজা চীন নং ২৮০০ খৃষ্টপূর্বে রেশমী বস্ত্র উদ্ভাবন করেন বলে কিংবদন্তী আছে। ২৬০২ খৃষ্টপূর্বে হোয়েনটি তাঁর 'মালকায়ে আলম' সি নিং সি-কে রেশমী সূতার উৎকর্ষ সাধনের ভার দেন। এ ব্যাপারে কৃতিত্বের জন্য লোকে তাকে রেশমীর দেবী বলে জানতো; কিন্তু এ উপমহাদেশে উৎপন্ন রেশম আর সি রোয়াল্লী প্রমুখ রেশম তত্ত্ববিদের মতে, এ দেশজ অন্য কোথাও থেকে আনীত নয়।
>
> চীনদেশ রেশমের আদি বাসভূমি বলে যে সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত, বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ টেলর তা বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে, এ বিরাট ঐতিহ্য নিয়ে বড়াই করতে পারে যে জায়গা আজ তা' পূর্ব-পাকিস্তানের একটি অংশ। সিরিজ জাতি দুনিয়াতে সর্ব প্রথম রেশমের ব্যবহার প্রচলন করে। টলেমী, পম্পোনিয়াম, মেলা, প্লীনি ও পওসেনিয়াস সিরিজ জাতিকে রেশম উৎপাদনের জন্য খ্যাত বলে উল্লেখ করেন। বুনো গাছের ফুল থেকে একরকম পদার্থ পাওয়া যেত, তা থেকে সিরিজ বা রেশম উৎপন্ন করতো বলে এ'রা উল্লেখ করেন। এরিয়ান সিরিজ

দেশকে Jinae বলে উল্লেখ করেছিলেন। সিরিজ দেশের অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রাচীন লেখকদের মধ্যে মতদ্বৈত ছিল। এদের ধারণা ছিল, সিরিজ চীন ছাড়া অন্য কিছু নয়। টেলর প্রমাণ করে গেছেন, সিরিজরা ছিল রংপুরের আদিম অধিবাসী। (J. A. S. B. Jan. 1847) এতদঞ্চলে প্রবাহিত প্রধান নদীর তীরে এরা রেশম বিনিময় করতো বলে পম্পোনিয়াম এরিয়ান ও মেলা উল্লেখ করেন। প্লীনি এতদঞ্চলের প্রধান নদীর Psitras বলে উল্লেখ করেন। এ নদীকে রংপুরের তিস্তা নদী বলে মনে করা হয়েছে। (Modern Review : August, 1944) চতুর্দশ শতাব্দীতে অগাস্টান ভৌগোলিক ডাইওনিসিয়ানকে প্রাচ্যের বিবরণ সংগ্রহের জন্য পাঠান। সিরিজ বা উর্না জালের মত সূক্ষ্ম রেশম এক রকম ফুল থেকে আছড়িয়ে বের করতো বলে এ ভৌগোলিক উল্লেখ করেন। রেশম উৎপাদনের গোপন রহস্য তখনো এসব ভূ-পর্যটকদের কাছে কেবল উদ্‌ঘাটিত হয়নি, তার কারণ পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে বোঝা যাবে।

এ মিহি রেশমী বস্ত্র রোমে আমদানী হয়ে তথায় অগ্নিমূল্যে বিক্রি হতো। এর উচ্চমূল্য সত্ত্বেও ৫২৭ খৃষ্টীয় সালের মধ্যে এখানকার রেশমী লেবাস রোমান সুন্দরীদের প্রিয় বিলাস সামগ্রী হয়ে উঠলো। এ সময়ের রেশমের রফতানী বাণিজ্য ছিল ইরানী বণিকদের হাতে। রেশমী বস্ত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে সম্রাট জুষ্টিনিয়ান এক ফরমান জারি করেন। নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রতি পাউন্ড রেশমের দাম একটি স্বর্ণমুদ্রা ধার্য করা হলো। এ আইনে চোরাকারবারীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান করা হয়। সে যুগে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নজীর দেয়া যায় রোম সম্রাট আরিলিয়ানের একটি ঘটনা থেকে। তাঁর সম্রাজ্ঞী একটি রেশমী কামিজ তৈরী করার জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন জানিয়ে বিমুখ হয়েছিলেন। অগ্নিমূল্যে রংপুরী রেশমী 'অঙ্গরাখা' কিনে রানীকে উপহার দিতে তিনি নারাজ হয়েছিলেন। জুষ্টিনিয়ান এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য ইরানী সওদাগরদের হাত থেকে রেশমের ব্যবস্থা হস্তগত করা প্রয়োজন মনে করলেন। সম্রাটের এ প্রচেষ্টা সফল না হলেও অন্য উপায়ে রোমের রেশমের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলো।

রংপুরের এ রেশম উৎপাদনকারীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার কাছ থেকে রেশম উৎপাদন প্রণালীর রহস্য গোপন রেখেছিল।

সেজন্য প্রাচীন লেখকগণ রেশম উৎপাদন সম্বন্ধে উদ্ভট সব ধারণা পোষণ করতেন। রোম সম্রাট যখন মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করছিলেন, তখন দুজন ইরানী ধর্মযাজক সিরিজ দেশে প্রবেশ করে বহু দিন এখানে অবস্থান করেন। রেশম সম্বন্ধে গোপন তথ্য উদ্ধার করে তাঁরা দেশে ফিরলেন। এ গোপন তথ্য নিজের দেশে প্রকাশ না করে তাঁরা রোম সাম্রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে রোমান সম্রাটের কাছে সে রহস্য উদঘাটন করলেন। পাশ্চাত্য জগতের কাছে সর্বপ্রথম রেশমের জন্ম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলো। প্রচুর ইনামের লোভ দেখালেন সম্রাট। আদেশগ্রস্ত ইরানীদ্বয় পুনরায় ছুটলো রংপুর অভিমুখে। সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ফাঁকা যষ্ঠির ভেতর পুরে রেশম কীটের ডিম চোরাই চালান হলো রংপুর থেকে রোমে। (Modern Review : August 1944) ৫৫২ খৃস্টাব্দে সে ডিম থেকে কীট জন্মানো হলো। তুঁত গাছের পাতা খাইয়ে তাদেরকে রেশম পয়দা করতে দেয়া হলো। ধর্মযাজকদ্বয় পরে রোমানদেরকে রেশম বোনার সমস্ত প্রক্রিয়া শিখান। ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের রেশম কীটের পূর্বপুরুষের আদি বাসভূমি পূর্বপাকিস্তানের একটি জেলা রংপুর। বিংশ শতাব্দীর আনবিক রহস্যের চাইতে কম চাঞ্চল্যকর ছিল কি ষষ্ঠ শতাব্দীর রেশম উৎপাদন প্রণালীর গোপন তথ্যের এই চোরাই চালান ? পুরাতন বাংলা সাহিত্যে রেশমী বস্ত্রের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। কালপাট পরিহিতা চম্পাবরণী কালো মেঘের ফাঁকে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ। মধ্যযুগের বাঙ্গালী তন্বীর দেহ-লাবন্য বর্ধিত করতো অগ্নিপাট, কাঞ্চাপাট, কালপাট, পাটের বুনি, পাটের পাছড়া, নেতা, নালাদ ফেমী, তসর প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এগুলো ছিল রেশমী শাড়ী। সেদিনের কবি তাই লিখেছিলেন :

পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে যায়।
ধরায় আঁচল লুটি পায়ে পড়ি যায়।*

পৃথিবীর আদি রেশম স্রষ্টা যে বাংলাদেশ, বিশেষ করে রংপুর, এটা উপমহাদেশের প্রতিটি মানুষকে মুগ্ধ ও গৌরবান্বিত না করে পারে না।

---

* আমাদের প্রাচীন শিল্প, প্রথম সংস্করণ—১৯৬৪। তোফায়েল আহমদ প্রণীত, পৃঃ ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩।

এমন বহু সত্য তথ্য ইতিহাসের গর্ভে নিহিত রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এ সত্য উদ্ধার করবার দায়িত্ব দেশবাসীরই।

যে বিষয়ের অবতারণা করে এই মুখবন্ধ আমরা লিখবার প্রয়াস পেয়েছি সে সম্পর্কে সামান্য কিছুমাত্র আমরা বলবো। শাহ্‌জাদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ ও তৎবংশীয় এবং এঁদের প্রধান সহকারীদের সম্পর্কে আমরা যা কিছু জেনেছি তা লিপিবদ্ধ করেছি। এঁদের কার্যকলাপ ও কীর্তি কাহিনী সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহমুক্ত। এঁদের যুদ্ধকালীন সময়গুলো সম্পর্কে কিছুটা ভুলভ্রান্তি আমাদের হতে পারে। তবে ঐ সব নায়ক-নায়িকাদের পরিচয়াদি সম্পর্কে আমরা যা লিখেছি তাতে আমরা অবিচলিত থাকবো। কারণ শত শত লোকের নিকট আমরা এ কথা শুনে এসেছি এবং তারাও শুনে এসেছেন বংশ পরম্পরায়। এই সব প্রাচীন লোক কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। মিথ্যা বলায় এঁরা বা আমাদের দেশের লোক পূর্বে কখনও অভ্যস্ত ছিলেন না। মিথ্যা বলাকে মহাপাপ ও নিন্দার্হ বলে এঁরা বিশ্বাস করতেন। কোন কিছুরই বিনিময়ে এঁরা মিথ্যা বলতে রাযী হননি। এঁদের সম্পর্কে যে সব ঘটনা, তত্ত্ব ও তথ্য আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, তা আমাদের এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। একটি বিষয় নিয়েও আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সম্পর্কে গর্ব করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মানুষ কতটা বড় তা বোঝা যায় তখনই যখন কথায় ও কাজে সে খাঁটি থাকে। আমাদের বর্তমান দেশের কথা বলতে আমাদের জিনিসপত্রের ভেজালের কথা বলতে হয়। যেমন পাট বিদেশে চালান হয়, তার মধ্যে দেওয়া হয় পানি। পাটের উপরিভাগে থাকে উৎকৃষ্ট পাট, ভিতরে নিকৃষ্ট পাট দেওয়া হয়। এমনি প্রতিটি কর্মে ও বচনে আমাদের মধ্যে ভেজাল ঢুকেছে। অথচ ইউরোপের যে কোন জিনিসে **Made in England** বা **Germany** লেখা থাকলেই অসংকোচে ধরে নেওয়া যায় জিনিস খাঁটি হবে। অথচ ইংরাজের শাসনে প্রায় ২ শ' বছর থেকে আমরা আমাদের অনেক কিছুর সঙ্গে সত্যবাদিতাও হারিয়ে ফেলেছি। ইংরাজরা কিভাবে আমাদেরকে মিথ্যা বলার ও নানারূপ চরিত্রহীনতার দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বুঝতে পারা যাবে আশা করি:

> মাদক সেবনে মানসিক শক্তির কিরূপ হ্রাস হয়, চরিত্রবলের কিরূপ হানি ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নয়। কিন্তু আমাদের অর্থলুব্ধ

গভর্নমেন্ট দেশবাসীকে মাদকসেবী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আফিমের চাষে এদেশবাসী কৃষকের কখনই বিশেষ অনুরাগ ছিল না, বরং অনেকে সে বিষয়ে যথোচিত বিরাগ প্রদর্শন করিত। কিন্তু গভর্নমেন্ট দরিদ্র কৃষকদিগকে টাকা দাদন ও অন্যবিধ প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আফিমের চাষে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার সিসিল বিডন বিলাতের ফাইন্যান্স কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দানকালে স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন ঃ

The Government would probably not be deterred from adopting such a course by any consideration as to be deleterous effect which opium might produce on the people to whom it was sold.

অহিফেন সেবনে প্রজার চরিত্রবল বিনষ্ট হইবে, এই আশংকায় গভর্নমেন্ট সম্ভবতঃ কখনই এই লাভজনক ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান পোষণে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া রাজকোষ শূন্য না করিলে গভর্নমেন্টকে কখনই এই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষণ করিতে হইত না। কৃষকদিগকে টাকা দাদন করিয়াই গভর্নমেন্ট ক্ষান্ত হন নাই। এদেশবাসী যুবকদিগের যাহাতে অহিফেনে আসক্তি জন্মে, তাহারও জন্য অতি গর্হিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের ভূতপূর্ব সহকারী কমিশনার মিঃ হাইন্ড বলেন ঃ

Organised efforts are made by Bengal agents to introduce the use of the drug, and create taste for it among the rising generation.

এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া অহিফেনের প্রচার বৃদ্ধির জন্য বঙ্গদেশে যথারীতি চেষ্টা হইয়াছিল। অহিফেন সেবনে তরুণ যুবকদিগের যাহাতে আসক্তি জন্মে, তাহার জন্যও বিধিমতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

হাইন্ড মহোদয় এই চেষ্টার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—গ্রামে গ্রামে প্রথমে আফিমের দোকান খোলা হইল। তাহার পর পল্লীবাসী যুবকদিগকে দোকানে ডাকিয়া বিনামূল্যে অহিফেন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইল। কিছুদিন পরে যখন হতভাগ্যদিগের অহিফেন সেবনে অভ্যাস জন্মিল, তখন অতি অল্পমূল্যে এই বিষ বিক্রিত হইতে

লাগিল, ক্রমে যে পরিমাণে যুবকদিগের নেশা বাড়িতে লাগিল, গভর্নমেন্ট সেই পরিমাণে উহার মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে দেশের নানা স্থানে অহিফেনের প্রচার বাড়িল—পল্লীবাসী যুবকদল আফিমখোর হইয়া উঠায় পশুর অধম হইল।

যে সুরা এদেশে লোকের 'অপেয়' ও 'অস্পৃশ্য' ছিল, তাহার স্রোতে আজকাল সমাজ ভাসিয়া যাইতেছে। যে ঘৃণিত উপায়ে এদেশে আফিমের কাট্‌তি বাড়ান হইল, মদের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্যও যে প্রথমে সেই রূপ নিন্দনীয় উপায়ই অবলম্বিত হইয়াছিল, সিসিল বিডন্ এ কথা বিলাতে গিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর মদের কাট্‌তি না বাড়াইতে পারিলে কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরদিগকে প্রকাশ্যভাবে তিরস্কার করা হইত, বঙ্গীয় রেভিনিউ বোর্ডের পুরাতন রিপোর্টসমূহ পাঠ করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজস্ব বৃদ্ধির আশায় কর্তৃপক্ষ পাঞ্জাবে সুরার প্রচলন বিষয়ে এরূপ আগ্রহাধিক্য প্রকাশ করেন যে, তাহাতে বিপরীত ফলের উৎপত্তি হইল। বহু প্রদেশ সুরার বিষময় পরিণামে জনশূন্য হইয়া গেল, সরকারী রাজস্ব কমিয়া গেল। এই বিষয়ে পাঞ্জাবের তদানীন্তন ছোট লাট স্যার ম্যাকলিয়তের উক্তি এই ঃ

In the Nerbudda territories I have known whole districts depopulated in consequence of the action of our spirit contractors, they used to send people all over the country to reduce these poor simple folk and utterly demoralise them. They got on their books, and after being sold out of house and home, they absconded in thousand.

এখনও আবগারি বিভাগের আয় বাড়াইবার জন্য, ভারতীয় সমাজের চরিত্র বল হরণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের যত্নের ত্রুটি নাই। সরকারী রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, প্রতি বৎসরই মাদক দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া গভর্নমেন্টের ২ কোটি ৩৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা লাভ হয়। ১৮৮৩ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ কোটি ২৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৯৫ সালে আবগারি বিভাগে ৬ কোটি ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। তদবধি উহা ক্রমাগত বর্ধিত হইয়া বিগত

১৯০৩ সালে ৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৫ হাজারে দাঁড়াইয়াছে অর্থাৎ ঐ সালে গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট কর্তৃপক্ষ মাদক বিক্রয় হিসাবে সাড়ে পাঁচ আনা করিয়া লাভ পাইয়াছেন। আবগারির আয় বাড়াইতে কর্তৃপক্ষের যেরূপ যত্ন, দেশে সুশিক্ষা বিস্তারে সেরূপ যত্ন নাই, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে! সুসভ্য ইংরাজের এই বিসদৃশ কার্য প্রণালীর ফল কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, মিঃ কষ্ট মহোদয় পশ্চাল্লেখিল মন্তব্যে তাহা সুব্যক্ত করিয়াছেন :

As to the demoralising effeot of our control on the character of the native, we have presented to us the most fearful corroboration of what was asserted by Shore, and reiterated by Campbell... In the course of comparatively few years we have succeeded in destroying whatever of truthfulness and honour they have by nature, and substituting in its place habits of trieleery, ohicanery and falsehood. Every native will fell you that it is impossible, now-a-days, to find an honest man ... Our whole systen of law and Government and education tends to make the natives clever, irreligious, litigious scamps. No man can trust another. formerly a verbal promise was as good as a bond. Then bonds became necessary. Now bonds go for nothing and no proudent banker will bend money without Receiving landed property in pledge.

You are only to compare our new provinces willer the old from the recently acquired Punjab where the people have had little of our law and government, and education, and are comparatively truthful and honest. The population becomes worse and worse, as you descend lower and lower, to our old possessions Calcutta and Madras.

ভারতবর্ষে ইংরাজ যে শাসননীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর চরিত্র দিন দিন হীন হইবে, স্যার জন শোর ও ক্যাম্পবেল মহোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্প দিবসের মধ্যে বৃটিশ শাসনে ভারতবাসীর স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা ও সাধুতা অবনত হইয়াছে। প্রতারণা, কপটতা ও মিথ্যাবাদ ভারতীয় সমাজে বিশেষ

প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই এখন বলে, আজকালকার দিনে ভালো লোক পাওয়া অসম্ভব। আমাদিগের আইনে, শাসনে ও শিক্ষায় ভারতবাসীকে ধূর্ত, অধার্মিক ও মামলাবাজ করিয়া তুলিয়াছে। এখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। পূর্বে লোকের মুখের কথা দলিলের ন্যায় অটল বলিয়া বিবেচিত হইত, পরে দলিল বিশ্বাসের আধার হইল। এখন দলিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আর স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক না পাইলে টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় না। যে সকল অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ও শিক্ষা বদ্ধমূল হয় নাই, সে সকল অঞ্চলে সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তার নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় — নববিজিত পাঞ্জাবের সহিত বঙ্গদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের লোকের সহিত তুলনা করিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যাইবে। হায়! কোথায় সুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতবাসীর চরিত্রের দিন দিন উন্নতি হইবে, না ক্রমেই তাহার অবনতি ঘটিতেছে। দীর্ঘকালের মুসলমান শাসনেও ভারতীয় সমাজের যে চরিত্রগত অবনতি ঘটে নাই, স্বল্প দিনের ইংরাজ শাসনে তাহাই ঘটিল, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। ইংরাজের বর্তমান দোষবহুল শাসন নীতির পরিবর্তন না ঘটিলে এই চরিত্রাবনতির স্রোত ক্রমেই বেগশালী হইবে, সন্দেহ নাই।*

ইংরাজ রাজত্বে আমরা কিভাবে চরিত্রকে হারালাম তা স্পষ্টভাবে উপরের উদ্ধৃতিগুলিতেই বোঝা যাচ্ছে। আমাদের শিল্প-বাণিজ্যে যেমন ইংরাজ শাসনে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, চরিত্রও তেমনি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে অমানুষ করা, মানুষ করার জন্য নয়। আর সে আশাও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কাছে করা যেতে পারে না। যারা ইংরাজ রাজত্বের মহিমা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা কেন, কোন্ উদ্দেশ্যে অসত্য কথা বলেছেন, দেশবাসী নির্ধারিণ করবেন। তবে তাদের কথা যে অযৌক্তিক, অসত্য, অমূলক ও ভিত্তি বর্জিত তা প্রমাণ করবার জন্য আমরা শেষের দিকে ইংরাজ আমলের দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য তথ্য সন্নিবেশিত করেছি। মিথ্যা বলা, মিথ্যা কার্য করা এখন আর কোথাও অবশিষ্ট নাই, ইংরাজের প্রায় দু'শ বছরের কারামতের গুণে, কোর্ট, কাছারী, অফিস, আদালত, রাজনৈতিক, ইশতেহারে, বিজ্ঞাপনে, মঞ্চে, ব্যবসা-বাণিজ্যে,

---

* 'দেশের কথা,' পঞ্চম সংস্করণ : কলিকাতা. অগ্রহায়ণ ১৩১৫ সাল, প্রণীত—শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর, পৃঃ ৬৪—৬৮।

চলনে-বলনে, ধর্মের নামে সবখানে আজ মিথ্যা আর দুর্নীতির ছড়াছড়ি। মিথ্যা দিয়ে মুষ্টিমেয় লোক লাভবান হতে পারে, কিন্তু দেশ, জাতি চরিত্র-হীনতার কারণে আজ সব দিক দিয়ে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। এ অসারবান জাতি কোন কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে কি ? সহস্র তালি দিয়ে মিথ্যা পচাকে সেলাই করে আর চলতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষদের যত অশিক্ষিত মূর্খ বলা হোক না কেন, তাদের মধ্যে যে সত্যবাদিতা — সাধুতা ছিল তা জাতির পক্ষে অমূল্য সম্পদ ছিল না কি ? শিক্ষিত হয়ে এই যে মিথ্য বলা, চুরি করা, পরস্বাপহরণ করা হচ্ছে একি জাতীয় সুস্থতার লক্ষণ ? এই শিক্ষা জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। আরও যাবে বলে আমরা মনে করি।

বাঙ্গালীরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠনে এবং সৌন্দর্যে কিরূপ ছিলেন তা, নিম্নোক্ত কথাগুলো থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইংরাজরা বাঙ্গালীদের ভীরু, কাপুরুষ ও যুদ্ধে অপটু বলে এসেছে। কিন্তু অনেক প্রদেশের কতিপয় লোকের মত বাঙ্গালীরা একেবারে পোষা কুকুর হয়ে পায়ের নীচে বসে লেজও নাড়ে না। এই জন্যেই কি বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের বাঙ্গালীরা ইংরাজদের যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত আর ঘায়েল করেছিল বার বার সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধে, তারই জন্যে হয়তো বা বাঙ্গালীদের উপরে এই নিন্দা কুৎসা এবং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত না করা হতো, ইংরাজের মনমত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলে তবে তারা নিম্নমানের কিছু চাকরি দিয়ে কতিপয় বাঙ্গালীকে তারা পেয়েছিল তাদের কাজে-কর্মে। কিন্তু ঐ গুটিগতক বাঙ্গালী সমস্ত বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালীদের স্বাস্থ্য, শরীরের গঠন পূর্বে যেরূপ ছিল, এখন ধীরে ধীরে তা লোপ পেয়ে যাচ্ছে সীমাহীন দরিদ্রতার জন্যে।

> ...কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫০ বৎসর পরেও বাঙ্গালীর শারীরিক গঠন যেরূপ মল্লজনোচিত ছিল, তাহাতে বাঙ্গালী ইংরাজের সেনাদলে প্রবেশাধিকার পাইলে ইংরাজ সেনার গৌরব বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাসপ্রাপ্ত হইত না। কোম্পানীর আমলের অন্যতম বড় লাট লর্ড মিন্টো ১৮০৭ খৃস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের একখানি পত্রে বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমীচীনতা প্রতিপন্ন হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ

> **I have saw more handsome a race. They are much superior to the Madras people whose for I admired also. Those were slender, these are fall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. Their features one of the most classical European models with great variety at the same time.**

ভাবার্থ এই যে—বাঙ্গালীর ন্যায় সুশ্রী জাতি আমি আর কখনও দেখিনি। মাদ্রাজবাসীর গঠনের আমি প্রশংসা করিয়াছি সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর গঠন মাদ্রাজীদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মাদ্রাজীরা ক্ষীণকায়; বাঙ্গালীরা উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ ও মল্লজনোচিত কান্তি সম্পন্ন। ইহাদের অবয়বসমূহ সম্পূর্ণ ও সুগঠিত, মুখাবয়ব সৌষ্ঠবযুক্ত ও পরম রমণীয়। বাঙ্গালীর অবয়বে ইউরোপের আদর্শ স্থানীয় প্রাচীন সভ্য জাতিসমূহের অর্থাৎ গ্রীক ও রোমানদিগের সাদৃশ্য বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়।—১৮০৭ সালের 'উন্নত দেহ, বলিষ্ঠ ও মল্লজনোচিত কান্তি সম্পন্ন' বাঙ্গালীর সহিত বর্তমান ১৯০৭ সালের ম্যালেরিয়া জীর্ণ, মসীজীবী, ক্ষীণকায় ভীরু বাঙ্গালীর তুলনাই হয় না। একশত বছরের ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালীর কি শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় অবসন্ন হইয়া যায়। পলাশী যুদ্ধের পরও বহুদিন পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাদলে ভর্তি হইয়া বাঙ্গালী অসীম সাহস প্রকাশপূর্বক এদেশে ইংরাজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে এখন আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। যে বাঙ্গালী ও মাদ্রাজীরা আজ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল জাতি বলিয়া তিরস্কৃত হইয়া থাকে...*

খুব বেশী দিনের কথা নয়, এখন (১৯৭০) থেকে ৪০ বছর পূর্বের কথা বলছি। আফগানিস্তানের এক খাঁ সাহেবকে, নিলমামুদ গাছুয়া নামে এক লোক শূন্যে তুলে এমনভাবে আছাড় মেরেছিল যে, খাঁ সাহেব ৪/৫ সেরের মত পায়খানা করে ফেলেছিল। এমন লোকও দেখা গেছে গায়ের এণ্ডির চাদর দিয়ে ঢেকে জড়িয়ে ধরে অকস্মাৎ আক্রমণকারী ব্যাঘ্রকে একা মারতে মারতে মেরে ফেলেছে। এসব কথা কোন গালগল্প নহে। ফুলচৌকী

---

* 'দেশের কথা, পঞ্চম সংস্করণ : কলিকাতা, অগ্রহায়ণ—১৩১৫ সাল, পৃঃ ২৫২-২৫৩।

নগরের আশেপাশের গ্রামের লোকদের কথাই বলছি। ঠিকমত খাবার পেলে ও নিয়মিত অনুশীলন করলে বাঙ্গালী যুবকরা এখনও অসীম বল বিক্রমের অধিকারী হতে পারে। বাঙ্গালীরা যে বহু প্রাচীন কাল থেকে ভীরু নয়, বীর পুরুষ ছিলেন, সেকথা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সহজেই বোঝা যাবে। সকল বাঙ্গালীই ইংরাজের চাকুরীজীবী অথবা খয়েরখা ছিলেন না। খুব সামান্য অংশ মাত্র এই অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়ে কতিপয় প্রদেশকে ইংরাজের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং দেশে ইংরাজ বিতাড়নের সংগ্রামে কতিপয় বাঙ্গালী ইংরাজ চাকর কুইসলিং-এর কার্য করেছে।

> বাঙ্গালীরও প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষেরা এইরূপ অত্যাচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালী আজ ভীরু কাপুরুষ বলিয়া সর্বত্র নিন্দিত হইতেছে সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীকে এইরূপ ভীরু ও কাপুরষ করিল কে ? অতি প্রাচীন কাল হইতে মোহনলালের সময় পর্যন্ত বাঙ্গালীর নামে কেহ ভীরুতাপবাদ রটনা করিতে সাহসী হয় নাই। বাঙ্গালীর বলবীর্যের ভয়েই মহাবীর সেকেন্দর (আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট) বঙ্গদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই, এ কথা ম্যাগেস্থানিস স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।*

বাঙ্গালীরা কিরূপ সুনিপুণ সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, তা উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অতীতকে সঙ্গে নিয়ে স্মরণ করে সম্মুখপানে নব সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাওয়ার আজ সময় এসেছে।

রংপুরের এইসব ভূভাগে বারো মাসে তের ফসল উৎপন্ন হতো প্রচুরভাবে। এ ছাড়া কুটির শিল্প ছিল গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে। পুরুষরা ছাড়া মেয়েরা সুতা কেটে বেশ দু'পয়সা অর্জন করতো। লোকে অভাব কি—জানতো না এবং অভাব ছিল না সেদিনের বাঙ্গালীর। মল্লদের মত সুপুষ্ট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল তারা।

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভকাল থেকে যে অত্যাচারের শোচনীয় বেদনাদায়ক জঘন্যতম কার্যাদি ইংরাজরা এসব অঞ্চলে করেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন। এর কোন দৃষ্টান্ত বা তুলনা ঐ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছিল কিনা তা অন্তত ইতিহাস পাঠে জানা যায় না। সেই জ্বলন্ত অত্যাচারের আগুনের মধ্যে থেকেও আমাদের পূর্বপুরুষরা যে

---

* 'দেশের কথা', পঞ্চম সংস্করণ : কলিকাতা, অগ্রহায়ণ—১৩১৫ সাল, পৃঃ ২৫২।

উদ্যম ও সাহসিকতার সঙ্গে স্বাধীনতার জয় পতাকা তুলে ধরেছিলেন, তা আমরা ভুলিনি, ভুলব না। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাদের আমরা স্মরণ করবো।

১৯৪৭ সালের পরে পরে অর্থাৎ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এসব ভূভাগে আমাদের আলোচিত বিষয়গুলো সংগ্রহ যদি করা যেত, তবে ইতিহাস লিখতে অনেক সহজ ও সুবিধা হত। অবশ্য এসব কাজের দায়িত্ব ছিল সরকারের। দুঃখের বিষয়, তাঁরা এসব কাজে উদাসীন ও অমনোযোগী ছিলেন। জমিদারী সরকার নিজ হাতে নিয়ে নিল কিন্তু পরিতাপের বিষয় জমিদারদের কাগজপত্রগুলো বিশেষ করে পুরানো কাগজ-পত্রাদি তাঁরা জমিদারদের কাছ থেকে নিল না। জমিদাররা তাদের জমিদারী না থাকায় মূল্যবান দলীল-দস্তাবেজ নথিপত্র কিছুটা করলেন দোকানদারের কাছে বিক্রি। আর যা দোকানদাররা খরিদ করতে চাইল না, সেসব কাগজপত্র দলীল ইত্যাদি দিলেন নষ্ট করে। এর ফলে ইতিহাসের এক বিরাট ও অমূল্য সম্পদ সরকারের বুদ্ধি ও বিবেচনাহীনতার দোষে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। হয়তো সভ্য দেশ ও জাতির কাছে এই জাতীয় সম্পদগুলো মণি মানিক্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান বলে তাঁরা মনে করতেন এবং আমরাও তাই মনে করি। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তঙ্কের মিত্রাদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পাল (বৌদ্ধ), হিন্দু (সেন), পাঠান এবং মোগল আমলের বহু দুষ্প্রাপ্য দলীল-দস্তাবেজ, বইপত্র, নানারূপ পুঁথি, নানা ধরনের তালপত্র, বল্কলপত্র প্রভৃতি অমূল্য সম্পদ পরবর্তী জমিদার ধনপৎ সিংহ দুগড় ও লছমিপৎ সিংহ দুগড়দের কুতুবপুরের কাছারীতে সংরক্ষিত ছিল। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় জমিদারী চলে যাওয়ার পর তাদের পরবর্তী জমিদারীর কাগজ-পত্র, দলীল-দস্তাবেজ, বই, পুঁথি ইত্যাদি যেসব ব্যবহার করা যেতে পারতো ঐসব মণ দরে বদরগঞ্জের দোকানদাররা কিনে নিয়ে যায় এবং বহু পুরনো অমূল্য জিনিস যমুনেশ্বরী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। অবশ্য এতে জমিদারদের আমলাদেরকে দোষী করা চলে না। রংপুর ও পূর্বঙ্গের অনেক জমিদারের ঘরে এরূপ মূল্যবান কাগজপত্র নিয়ে জাতির ইতিহাস রচনা করতে এর বিশিষ্ট এক ভূমিকা থাকতো বলে আমরা বিশ্বাস করি। এই সম্পদ দিয়ে জাতি বল ও পুষ্টতাই লাভ করতো।

আমাদের গ্রন্থে Mr. S. C. Square লিখিত "If it had been discovered

in 1930 that Becan really did write Shakespear."-এর প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থ হতে কিছুটা বিষয় আমরা উদ্ধৃত করেছি এইজন্য যে, এতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বিশেষ করে নবাব নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ সম্পর্কে আমাদের তথ্য ও যুক্তিগুলোকে আরও বেশী উজ্জ্বল যুক্তিযুক্ত এবং আলোকিত করবে। পাঠক মহোদয় বিষয়টি পাঠ করলে সহজে এর যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

রংপুরে বিশেষ করে পূর্বের রংপুর শহরে এত লোককে ধরে নিয়ে এসে হত্যা করা হয়েছিল যে, ঐ আমলের প্রাচীন লোকেরা রংপুর আসতেই চাইত না। মামলার জন্য বাধ্য হয়ে আসলেও সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে যেত। আমি (লেখক) ফুলচৌকীর কালীয়া প্রামাণিককে (কালীয়া বুড়া), বয়স ১২৫ বৎসর হবে দেখেছি। তিনি তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যেও এক মুহূর্তের জন্যেও কোন সময় রংপুর শহরে যাননি। কেন যান না, জিজ্ঞেস করলে নীরব থাকতেন। বারবার উত্যক্ত করলে বলতেন, "জঙ্গপুর না জমপুর, জমপুরে কি যাওয়া যায় ? কি দরকার হামার জমপুরে।" আজও রংপুরে সে অত্যাচারের দৃষ্টান্তস্থল হল 'গণ-শহীদ' নামের স্থানটি। রংপুরের লোকেরা ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে বৃটিশ আমলের একেবারে শেষের দিক পর্যন্ত স্থানীয় হাটে বাজারে খরচ সওদাপত্র করতেন; শহরে বড় বেশী একটা আসতেন না। এ থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে অত্যাচার ও হত্যা কত ব্যাপক ও ভয়াবহভাবে করা হয়েছিল। যার জন্য রংপুর জেলাস্থ লোকদের শহরে দোকান খামার ও বসতবাটি একরূপ ছিল না বললেই চলে। মহকুমা শহরগুলোতেও ঐ একই অবস্থা ছিল। কোন আগন্তুক এসে হঠাৎ কারো নাম জিজ্ঞেস করলে এসব এলাকার লোক তাকে নাম বলতে এখনও ইতস্তত করেন, বলতে চান না। দেওয়ানী (প্রধান)-কে বলে তবে নাম বলেন বা কোন নতুন বিষয়ের কোন কথা হলে তাকে জিজ্ঞেস করে তবে বলেন। কারণ আগে থেকে এই রীতি চলে আসছে আজ অবধি।

'জনগণই যে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী' এই মহাসত্য নিম্নোক্ত বিষয়টি থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে বা জানতে পারা যায়। ইংরাজ পক্ষীয় স্বকথিত নবাব মীরজাফরকে এতদঞ্চলের জনসাধারণ নবাব তো বলতোই না, এমনকি মীর (সম্ভ্রান্ত) শব্দটিও বলতেন না। মীরজাফরের নামের সঙ্গে যুক্ত স্থানকে

শুধুমাত্র 'জাফরগঞ্জ', 'জাফরগড়' বলা হতো এবং এখনও তাই বলা হয়ে থাকে। ঐ সময়কার সম্রাট পক্ষীয় নবাবের কোটকে নবাব কোট বলা হতো এবং এখনও তাই বলা হয়ে থাকে। এ থেকে সহজে জনসাধারণের প্রগাঢ় স্বদেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। হিমালয়ের এই নিম্নাঞ্চলের স্বাধীনতা-প্রিয় অধিবাসীরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের কিরূপ ঘৃণার চোখে দেখে আসতেন, তা ইংরাজদের 'ভূত' এবং 'ভালুক' (ভল্লুক) বলা থেকে বেশ বোঝা যায়। এসব কথা আমরা যথারীতি ইতিহাসে আলোচনা করেছি।

এখনও যে কোটি কোটি লোককে অজ্ঞতার তমসায় ও দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে, তার আশু অবসান হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই অজ্ঞ সমাজই ইংরাজদের সব থেকে ঘৃণা, বিপক্ষতা ও বিরুদ্ধতা করে এসেছেন। এরা জাগলে দেশ জাগবে, দেশ বড় হবে।

মিঃ ডিগ্বীর The Prosperious British India, শ্রীযুক্ত নৌরোজীর **Poverty and un-British Rule in British India,** শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের The Economic of British India ও **India in the Victorian Age,** শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্করের দেশের কথা এবং রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—এসব অমূল্য গ্রন্থ এবং এমনি ধরনের আরও যে সকল গ্রন্থ রয়েছে সেসব আমাদের অবশ্যই পাঠ করা প্রয়োজন। এমনকি নতুনভাবে ছেপেও পাঠ করা প্রয়োজন স্বাধীন জাতি হিসেবে। কারণ আমরা মনে করি, এসব গ্রন্থ পাঠে বৈদেশিক বিশ্বাসঘাতকরা বাধা-প্রাপ্ত হবে এবং দেশের অভ্যন্তরে যদি কেউ মীরজাফরের ভূমিকায় অবতীর্ণ করতে চায়, তবে জনসাধারণ তাকে নিজেরা বাধা দেবে।

আমাদের লেখার মধ্যে কোথাও কোন ভুলত্রুটি থাকলে তা কেউ যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখিয়ে দেন, তবে ধন্যবাদের সহিত আমরা আমাদের সে ভুল সংশোধন করবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবো। এর পরে এই বিষয়গুলোকে আরো আলোকিত ও সুসংযোজিত করতে আমরা যা পারলাম না আমাদের পরবর্তী যাঁরা, তাঁরা এর সূত্র ধরে পারবেন বলে আশা করি। এই গ্রন্থের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে অনেকে অনেকভাবে নানারূপ সহযোগিতা এবং উপদেশাদি দিয়ে এসেছেন। তাঁদের আজ আমরা স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

উদীয়মান প্রসিদ্ধ শিল্পী মোঃ ইদ্রিস সাহেব পায়ে হেঁটে মহামান্যা বেগম

লালবিবি সাহেবার মাযার শরীফের চিত্র অংকন এবং ফুলচৌকীর কতিপয় দরগাহ প্রভৃতির চিত্র অংকন করে দিয়েছেন ঐ সমস্ত এলাকায় গিয়ে। অংকিত ছবিগুলো আমরা অস্পষ্টতার জন্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করতে না পারলেও এজন্য শিল্পীকেআমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কবি কায়সুল হক সাহেব শিল্পীর সাথে গিয়ে তার ঐসব চিত্র অংকন করতে সহযোগিতা করেছেন, সে জন্যে আমরা তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয় মুসলিম লীগ এই দুই সর্ব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্মকাল থেকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত করেছি আমাদের আলোচ্য বর্ণিত বিষয়বস্তুগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ হিসেবে এটুকু মাত্র কৈফিয়ত দেওয়া যেতে পারে যে, ভারতীয় এই দুই সর্ববৃহৎ স্বাধীনতাকামী প্রতিষ্ঠান দুটি এদের জন্মকালের পূর্ববর্তী সময়গুলোর স্বাধীনতা আনয়নে চেষ্টাকারী কোন রাজনীতিকের নাম পর্যন্ত এ'রা দলীয় সভা-সমিতিগুলোতে উচ্চারণ করেন নি। ভাবখানা এই যে এ'দের পূর্বে দেশে আযাদী আন্দোলনে আর কোন চেষ্টা কেউ করেনি। পূর্ববর্তী মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা না থাকার দরুনই আমাদের জাতীয় আন্দোলনগুলোর মধ্যে নানাভাবে অনেক দুর্বলতা এসে জমা হয়েছিল। এসব কথা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

ছড়াগানের কবি জহুর ফকীর, তার ভগ্নি আছিরন, পুত্র কাবিল ফকীর, কন্যা জনী মাওমী—এ'দের ছড়াগানগুলোতে নবাব নুরেউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ, তাঁর পদ-পদবী এবং বংশ-পরিচয় পুত্র-কন্যা প্রমুখের সংক্ষিপ্ত পরিচয়াদি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ'দের গানের মধ্যেই নিবাস প্রভৃতি কথা রয়েছে। গানগুলো রংপুর দিনাজপুর জেলায় এক সময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। আমি নিজে ছোটবেলায় কাবিল ফকীর ও তার ভগ্নি জনি মাওমীর গান শুনেছি। গ্রামের মেয়ে মানুষরা এ'দের গান বেশী শুনতো। পাড়ার সব মেয়ে জমায়েত হয়ে এ'দের গান শুনতো। ছেলেবেলায় মেয়েদের সঙ্গে গিয়ে এ'দের গান আমি শুনেছি। এ'রা স্বভাব-কবি ছিলেন। যে কোন বিষয় শোনা অথবা দেখামাত্র তৎক্ষণাৎ গান রচনা করে ফেলতে পারতেন। এ'দের বংশধর এখনো ফুলচৌকীর অনতিদূরে তঙ্ক এবং ধোপাকোণ নামক গ্রামে রয়েছে।

'মজনুর কবিতা' শিরোনাম দিয়ে একটা বাংলা কবিতার ছড়াছড়ি ইংরাজ আমলে সম্ভবত ইংরাজদের প্ররোচনায় কতিপয় এদেশীয় লোক বই এবং পত্রিকায় আলোচনা করে এসেছেন। 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকীর রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে এই কবিতাটির আলোচনাসহ শেষের দিকে পুরো কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। তা না হলে উক্ত ইংরাজী গ্রন্থে কবিতাটি আলোচিত হওয়ার পরেও পুরোপুরি শেষের দিকে দেওয়া হয়েছে কেন? মিথ্যা প্রচারের জন্যেই যে করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে পাতিলের তলাটি যে ফুটো তা বোধ হয় উক্ত কবিতাটির ফরমায়েশদাতাদের চোখে পড়ে নি। তাই যত গোল বেধে এসেছে পূর্বেও, এখনও। কবিতাটির লেখকের কোন পরিচয় কবিতার মধ্যে নেই। লেখকের বাসস্থান কোন্ জেলা, কোন্ গ্রামে তাও নেই। শুধু শ্রী পঞ্চানন দাসস্য লিখিত রয়েছে। আমরা এখন কবিতাটির সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রগাঢ় সন্দেহ পোষণ করছি অনেক কিছু জানার পর। এর পূর্বে আমরা কিছুই জানতাম না। তবে এখন যা জেনেছি তার গুরুত্ব অপরিসীম। অল্পদিনের মধ্যে কবিতাটি সম্পর্কে এবং মজনু শাহ্ যে ইংরাজদের দেওয়া নাম এবং তিনি দস্যু ছিলেন কি না প্রভৃতি সম্পর্কে লোক সঠিকভাবে অবহিত হতে পারবে বলে আমরা মনে করি। বাংলা বিশ্বকোষের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক মহাশয় পর্যন্ত কবিতাটি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ না করে পারেন নি। এখানে আমরা বিশ্বকোষের কথাগুলো উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

> মজনুর কবিতা—মজনু নামক দস্যুর অত্যাচার কাহিনী ইংরাজ শাসন বিস্তারের প্রাকালে দস্যু সর্দার মজনু ফকীর উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে অত্যাচার আরম্ভ করে। এই ঘটনা বিবৃত করিবার জন্য কবিতাটি লিখিত হইয়াছে। কবিতার শেষে ভণিতা নাই। তবে সর্বশেষে সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্তিক শ্রী পঞ্চানন দাসস্য, লিখিত থাকায় অনুমান হয়, মজনু সর্দার উক্ত সালের সময়কালে বা তাহার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন।

পঞ্চানন দাসস্য কবিতাটির লিপিকার কি রচয়িতা তাহা উক্ত উক্তির দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না।

সেই ঘটনা বিবৃত করিবার জন্য কবিতাটি লিখিত হইয়াছে।

অর্থাৎ অত্যাচারী দস্যু সর্দার মজনু ফকীরের অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করার জন্য লিখিত হয়েছে—এ কথা বিশ্বকোষের লেখক মহাশয়ের তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উক্ত গবেষক লেখক মহাশয় আরও একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তাহা এই যে, "পঞ্চানন দাসস্য কবিতাটির লিপিকার কি রচয়িতা তাহা উক্ত উক্তির দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় না।" সুতরাং উক্ত সুস্পষ্ট অভিমতের ইঙ্গিত দ্বারা ইহা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে মজনু শাহ্, শেষে মজনু ফকীর, দস্যু সর্দার প্রভৃতি অসৎ এবং মিথ্যা কথা দিয়ে আসল সত্যকে চাপা দেওয়ার জন্য ফরমায়েশ অনুযায়ী কবিতাটি কোন লোকের নিকট হতে লিখে নেওয়া হয়েছিল। পঞ্চানন দাসস্য বা দাস কবিতাটির রচয়িতা না শুধু লিপিকার—এ সম্পর্কে বিশ্বকোষের লেখক মহোদয় যে সন্দেহ পোষণ করেছেন তা অমূলক নয়। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে আমরাও বলছি—পঞ্চানন দাস কবিতাটির রচয়িতা তো নয়ই বরং মনে করি কবিতাটি ফরমায়েশী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সুচতুর ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা এমনি ধরনের বহু অসত্য কথা পুস্তকাকারে ছাপিয়ে প্রচার করেছিল, যার উপযুক্ত জবাব বিট্রিশ আমলেও অনেক ঐতিহাসিক দিয়েছিলেন। ইংরাজদের লিখিত ইতিহাসের কথাগুলোকে 'পক্ষপাতী' বলে অভিহিত করেছেন। সত্যই অপক্ষপাত ইতিহাস ইংরাজরা আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী বীর-বীরাঙ্গনাদের সম্বন্ধে লিখেনি। ঐতিহাসিক তো বটেই, রাজনীতিবিদ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পর্যন্তও ইংরাজদের লিখিত কথাগুলোকে আমল দিতে পারেন নি। তবে পাশবিক শক্তির উপরে টিকে থাকা ইংরাজ বেচারাদের দোষটাই বা কোথায়? মিথ্যা ছলনা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অসৎ কাজ দিয়েই তো তারা টিকেছিল।

রংপুরের 'সাপ্তাহিক বার্তা' পত্রিকায় আমার কতগুলো প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

'উত্তর বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটিও রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। উত্তর বাংলা পত্রিকাতেও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। অধুনা পত্রিকা দুটি নানারূপ অসুবিধার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। পত্রিকার মালিক ও সম্পাদকদের আমি আজ অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রংপুরের আর একটি মাসিক পত্রিকা 'উন্নয়ন' পত্রিকাটির পরিচালক জেলা বোর্ড। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক

অধ্যাপক নূরুল ইসলাম সাহেব। তাঁর পত্রিকাতেও আমার লেখা প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁরা সবাই আমার লেখা প্রবন্ধগুলো আগ্রহের সহিত প্রকাশ করতেন। এ জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রংপুর জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ আমার দুইটি প্রবন্ধ ২৫ শে আগস্ট ও ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৫৬০-এ পঠিত ও আলোচিত হয়। উভয় দিনের সভায় অধ্যক্ষ সিরাজুল হক সাহেব সভাপতিত্ব কবেন।

রংপুর কারমাইকেল কলেজের মিলনায়তনে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়। উক্ত সভায় আমি রংপুরের আযাদী আন্দোলনের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। 'ইতিহাসের আলোকে রংপুর' ('আযাদী আন্দোলনের পাদপীঠ)। উক্ত কলেজের পত্রিকায় সভা এবং আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে যা আলোচিত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলেজ ইউনিয়ন কাউন্সিলের উদ্যোগে কলেজ মিলনায়তনে রংপুর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঐতিহাসিক জনাব হায়দার আলী, শ্রী প্রফুল্ল ঘটক, জনাব আব্বাস আলী, জনাব খেরাজ আলী পণ্ডিত সাহেব এবং আরও অনেকে।

সম্পাদকীয়

'রংপুরের ইতিহাস'

"সম্প্রতি রংপুরের অধিবাসী জনাব হায়দার আলী সাহেবের ইতিহাস অনেকটা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এই ইতিহাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহা পাক-ভারতের আযাদী আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; এমন কি ইহাকে আযাদী আন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই ইতিহাস খুবই প্রামাণ্য; এর সত্যতা অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বহন করে চলেছে।"...

প্রধান সম্পাদক
গোলাম রহমান
প্রথম সংখ্যা *

---

* কারমাইকেল কলেজ বার্ষিকী, ১৯৫৬-৫৭।

এঁরা সভা করে এবং আমার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরে নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করে এসেছেন। এঁদের সকলকে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

এছাড়া আরও কতগুলো পত্র-পত্রিকায় আমার ঐতিহাসিক লেখাগুলো প্রকাশ করে অনেকে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় কতগুলো প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

আমার লিখিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশ হয় ঢাকার 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায়। পত্রিকা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়গুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে আমাকে নানাভাবে উপদেশ দেন। তাঁর পরামর্শ মত আমি মাসিক 'মোহাম্মদী'তে লেখাগুলো দিতে থাকি এবং তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। মাঝে মধ্যে জনাব মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সাথে আমার লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা হতো। তিনিও আমার মত ফকীর, সন্ন্যাসী ও প্রজাবিদ্রোহী ইংরাজ বিরোধী দল তিনটি না হয়ে যে একটিই ছিল, এটা মনে করতেন। এ সব জিনিস যাতে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা যায় এজন্য তিনি আমাকে উৎসাহিত করতেন। আমি 'আজাদ' সম্পাদক ও মাসিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদক জনাব মুজিবর রহমান খাঁ সাহেবকে অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

অনেক সুপ্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বংশ পরম্পরায় ঐতিহাসিক কথা-কাহিনী দিয়ে আমাকে ইতিহাস লিখতে অনেক সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথাগুলো আমরা আমাদের লিখিত গ্রন্থে দিয়ে আমাদের কথার যথার্থতা বহুলাংশে প্রমাণিত করতে পেরেছি, এজন্য আজ তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরাধিককাল ধরে ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান আমি নানারূপভাবে সংগ্রহ করেছি, ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে। আর্থিক ও নানারূপ প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। হয়তো কারও কাছে সহযোগিতা পেয়েছি, কারো কাছে বা পাইনি। মওলানা হোসেন আহম্মদ মাদানী, মনীষী অরবিন্দ ঘোষ, শ্রী অশোক মেহতা, কবি জামালুদ্দীন, ডক্টর ভূপেন্দ্র দত্ত ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনীষীর ইংরাজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তকাদির সাহায্য নিয়েছি। ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিপ্লবের কথা, রংপুরে যে বিদ্রোহ হয়েছিল ইংরাজ ও এদেশীয়রা তাদের অসংখ্য বইয়ের মধ্যেও কোথাও উল্লেখ করেন নি। লণ্ডন নগরীতে মহামতি কার্ল মার্কস ১৮৫৭ সালের 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা

যুদ্ধ' নামক গ্রন্থে রংপুরের বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। সকলের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি নিজে এবং অনেক বন্ধু-বান্ধবের সাথে পায়ে হেঁটে নানারূপভাবে পুরনো মন্দির, মসজিদ, ভাঙ্গা দালান-কোঠাময় বিভিন্ন স্থানে গিয়ে এবং অনেক বৃদ্ধ ও অনেকের কাছে গিয়ে ইংরাজদের গোপন কথা বিভিন্ন লড়াই বিদ্রোহের বংশ পরম্পরায় স্মৃতিতে ধরে রাখা কথাগুলো সংগ্রহ করে আমি আমার এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করবার চেষ্টা করেছি অনেক চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার পর।

আমি বিশ্বাস করি যে, জাতির ইতিহাস যত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার সে জাতি তত বড় উন্নত তা আধুনিক দেশগুলোর দিকে তাকালে সহজেই বোঝা যায়। বিশ্ব মনীষীদের এতদসম্পর্কিত কথাগুলো স্মরণ করলে আমারও মনে হয় নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতের ক্রন্দনাশ্রু আর শহীদের রক্ত নিয়ে আসবে আবার নতুন সভ্যতা।

মফস্বলের দূর-দূরান্তর বন-জঙ্গল, ভাঙ্গা মন্দির, মসজিদ, গড় এবং অনেক প্রাচীন লোকের নিকট আমার সহিত অনেক বন্ধু-বান্ধব গিয়ে আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে মরহুম ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেব, ডক্টর এনামুল হক সাহেব, কবি কায়সুল হক, অধ্যাপক কবি মুফাখখারুল ইসলাম, সুলেখক শামসুল হক সাহেব, জমিদার সূর্যসিংহ রায়, অনিতা ঘোষ এম. এ. বাবু হীরালাল গোস্বামী, সুলেখক আবু মোহাম্মদ মজাম্মেল হক, অধ্যক্ষ সিরাজুল হক সাহেব অন্যতম। শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা ও কবি বেনজীর আহমদ সাহেব, শাহজাহান মিঞা এডভোকেট, আজিজুল হক এডভোকেট এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে যে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন, সে জন্য আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যেখানে, ৩৫/৩৬ বছর ব্যাপী আমি আমার এই ইতিহাসের পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। অসাম্প্রদায়িক আশ্রম বরকাতিয়া খানকা শরীফ-এর প্রতিষ্ঠাতা মনীষী হযরত মওলানা আফতাবুজ্জামান সাহেবের পুণ্য নামটি আমি সর্বাগ্রে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি এবং বর্তমানের প্রবীন অধ্যক্ষ হযরত মওলানা শাহ মুতি আহমদ সাহেব ও তাঁর সম্পূর্ণ পরিবারের প্রতি গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃপ্রতিম মোখলেছুর রহমান সাহেব (সিদুভাই), মিসেস রহমান (রোজ ভাবী), 'দৈনিক কৃষাণ' পত্রিকার মালিক কাজী আবদুল কাদের, ভ্রাতৃপ্রতিম বাবু শ্রী সুবোধ চন্দ্র রায়, জমিদার শ্রী সত্যেন্দ্র মজুমদার ও তাঁর মাতা সুরুচি মজুমদার, মজিবর রহমান মণ্ডল লোহানী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ শ্রী সুরজিৎ দাসগুপ্ত, শ্রী মুক্তা

মঞ্জুশ্রী দাসগুপ্তা, ডক্টর বিমল সেনগুপ্ত, শাহ আবদুর রশীদ ফকীর ও শ্রদ্ধেয় ডক্টর মওলানা এ. বারী সাহেবের প্রতি।

এ গ্রন্থ প্রকাশে যাঁরা সক্রিয় সাহায্য করেছেন, তাঁদের অন্যতম ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর, দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আখতারুল আলম। আরো রয়েছেন প্রকাশনা বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব লুতফুল হক এবং প্রুফরিডার জনাব মোহাম্মদ মোকসেদ। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আধুনিক ইতিহাসের মাপকাঠি ও বিচারে আমরা তেমন কৃতকার্য হতে পারিনি ঠিক, তবে পূর্বের পরাধীনতার সহায়তাসূচক সময়গুলো স্মরণ করলে আমরা যা করেছি, তাছাড়া আমাদের পক্ষে আর বেশী কিছু করার ছিল না বলে মনে করি। পরদেশে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের জুলুম অত্যাচার বাজেয়াপ্ত ও হত্যার পৈশাচিকতার মধ্যে আমাদের পক্ষীয় মানে স্বদেশীয়দের নিকট দলীল-দস্তাবেজ, বই, কাগজপত্র থাকা বা রক্ষিত করে রাখা যে সম্ভব নয় বা ছিল না, তা না বললেও চলে। তাই বিশেষ কারণে আমাদের ইতিহাসকে আমরা আধুনিক ও স্বাধীন অবস্থায় লিপিবদ্ধ করলেও পরাধীনতার সময়কার ঘটনাগুলোকে আমরা আমাদের আলোচ্য বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছি। একটা পরাধীন জাতি কতখানি অসহায় ও নিরুপায় হয়ে পড়ে তার দেশের আযাদী আন্দোলনকারীদের আসল তত্ত্ব প্রামাণ্য আকারে প্রকাশ করবার কোন পুস্তক নথিপত্র, দলীল-দস্তাবেজ ঠিকমত না পাওয়ার দরুন, যার জন্য আমাদের বিভিন্ন বন-জঙ্গল এবং গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে সুপ্রাচীন লোকদের নিকট এসব কথা কাহিনী শুনতে হয়েছে। এছাড়া যাহা কিছু অন্যান্য সামগ্রী মাল-মসলা পেয়েছি তাও আমরা সন্নিবেশিত করেছি। জানি না, দেশবাসী এবং সুহৃদ পাঠক-পাঠিকা আমার রচিত ইতিহাসকে কিভাবে গ্রহণ করবেন। আমরা যা পারলাম না বা পারি নাই—আশা করি তা পরবর্তীরা সম্পন্ন করতে পারবেন।

আমার এই লেখায় আমার অজ্ঞতায় ও অসাবধানতায় যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তা দেখিয়ে দিলে এবং এ গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হলে তা সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বিনয়াবনত

হায়দার আলী চৌধুরী

ওরফে

আহসানউদ্দীন মোহাম্মদ

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমের প্রতিদান ১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ ৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎকার বিবরণী ৯৩

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ বেগম শাহবানু ৯৪

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ স্বর্ণময়ী চৌধুরানী ১০৬

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ মহারাজ সত্য নারায়ণ গিরি সন্ন্যাসী ১১২

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ সৈয়দ মকদুম মিয়া ১১৯

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ শ্রী যোগেন্দ্র নাথ রায় সরকার ১২৪

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ আবদুল করিম মিয়া ১২৮

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ শরীফউদ্দীন মুন্সী ১৩২

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ জামাল চৌধুরী ১৪০

সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ বাবু রামগোপাল চক্রবর্তী ১৪১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ১৪২

মুহাম্মদ আলী ১৪৪

মাওলানা কেরামত আলী ১৬৯

আমিরন নেছা ১৭২

আর একজন সাক্ষী ১৮০

বেগম আমিরন নেছা সম্বন্ধে রইসউদ্দীন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার বিবরণী ১৮৩

গোউসউদ্দীন মুহাম্মদ ১৮৪

ওয়ালীদাদ মুহাম্মদ ১৮৯

শাহযাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ ২০১

ফজিল খাঁ ২০৭

নির্মীয়মান নগরী ২১০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার ২২৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আনন্দমঠ ২৪২
তপস্বীদাঙ্গার দীঘি ২৪৫
মানস নদী ও দেশীয় সন্তানদের আস্তানা ২৪৭
নবাবের উযীর শিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর বংশ-পরিচয় ২৪৮
রানী ভবানী ২৫০
রতিরামের কবিতায় শিবচন্দ্র ও দেবী চৌধুরানী ২৫৭

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবী চৌধুরানী ২৬৪
দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় ২৭২
দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁ ২৭৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাওলানা এনায়েত আলী এবং মাওলানা বেলায়েত আলী ২৭৮
বর্তমান রংপুর শহর ও রঙ্গমহলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৮৭

নবম পরিচ্ছেদ

আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ ২৯৫
জলপাইগুড়ি ৩০৭
জনৈক সৈনিকের তুলনাহীন বীরত্ব ৩১৮
শিখ সৈনিক ৩২০
মৌলভী আহমদ শাহ ৩২৯
শ্রীরামচন্দ্র বর্মণের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৩৩
রোহিনীচন্দ্র মিশ্রের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৩৪
মোহাম্মদ আলী আবুল খয়ের চৌধুরীর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৩৫
মেহেরউদ্দীন খাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৪৩
রংপুর মাহিগঞ্জ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও প্রসিদ্ধ নেতা সমাজহিতৈষী মোহাম্মদ নয়ামিয়া সরকারের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৪৫
রহিমউদ্দীন সরকারের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৪৮
ডাক্তার ইদ্রিস আলী চৌধুরীর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৫০
মছিহুজ্জামান আবুল ওছামা ছাবের-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৫৫

ইয়াকুব আলীর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৫৬
তছিরউদ্দীন মুন্সীর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৫৭
মোহাম্মদ হোসেন ও বয়েজ মোল্লার সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৬১
শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রকুমার সিংহের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৬৯
শাহ মফিজউদ্দীনের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৭০
রমজান আলীর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৭১
দেওয়ান শামসুল হকের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৭২
সমতুল্যা শেখ-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৭৩
আমানুল্যাহ সরকারের সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৭৬
রহিমউদ্দীন মিয়ার সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৭৯
ভূ-গর্ভে হীরক ও স্বর্ণপ্রাপ্তি ৩৮০
হাফেজ মোহাম্মদ সাঈদ-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী ৩৮৩
বিদ্যাধরীর স্মৃতিস্তম্ভ ৩৮৩
দেওয়ান হাকিম আহসান উল্যাহ্ খান ৩৮৫
কেশবলাল বসু ও সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী ৩৮৯

দশম পরিচ্ছেদ

দলীল ৪০৩

একাদশ পরিচ্ছেদ

গড়ত্রয় ৪০৮
বামনগড়, রানীগড় ও সাতগড় ৪০৯

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মসিমপুরের বাঁড়াশী যুদ্ধ ৪১৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজধানীর বিবরণ ৪২১

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ৪৩২
শিল্পবিদ্যায় ইংরাজের হস্তক্ষেপ ৪৪৯
দেশের অবস্থা ৪৫৮

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শেষকথা ৪৮৩
পরিশিষ্ট ১—১৩৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশপ্রেমের প্রতিদান

স্বাধীনতার জন্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারিণী বীর নারীদের ইংরেজ লেখকেরা অতি কৌশলের সঙ্গে চরিত্রহীনা করে চিত্রিত করেছেন : কোন প্রতিবাদ না করে যা আমরা নিঃসংশয়ে মেনে চলেছি তার প্রকৃত রহস্য পর্যন্ত উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা না করে। সভ্যতা গর্বে অন্ধ ও গর্বিত ইংরেজরা ইতিহাসকে কিভাবে বিকৃত করেছেন, এদেশীয় কোন কোন ঐতিহাসিক তার কিছু প্রমাণ নানাভাবে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। স্বার্থ-ছলনা ও শঠতায় সিদ্ধহস্ত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সুবিধার্থে 'রামকে করেছে শ্যাম ও শ্যামকে করেছে রাম'। এর আরও প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু তা না দিয়ে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি গঠন ও রাজ্য বিস্তারের সহায়তাকারী "নওয়াব সুজা', এমনকি তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র মীর্জা আলীকে (উজীর আলী) অবৈধ (জারজ) সন্তান বলে ঘোষণা করতে (নাউযুবিল্লাহ্‌...) তাদের বিবেকে বাধেনি।'

—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

কোন এক ইংরেজ লেখক তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে ১৮৫৭-এর বিপ্লবে এক বীর রমণীর চরিত্র যে সুকৌশলে ও অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণভাবে কলঙ্কের তুলিকায় অঙ্কিত করেছেন, সে প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি কথা বলতে চাই; 'ট্রেভেলিয়ান কানপুর' নামক পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় জনৈক ইংরেজ লেখক লিখেছেন :

> কথিত আছে, আজিজন নামে একটি বারবিলাসিনী দ্বিতীয় দলের অশ্বারোহীদিগের প্রিয় পাত্রী ছিল। সমসউদ্দীন নামক একজন সোয়ার তাহা গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহে, দুই-একদিনের মধ্যেই নানা সাহেব সর্বময় কর্তা হইবেন। আমরাও তোমার গৃহ মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিব।

অথচ আজিজন বারবিলাসিনী ছিলেন না, ছিলেন এক অসাধারণ শৌর্য-বীর্যের অধিকারিণী বীরাঙ্গনা। নিম্নোদ্ধৃত উক্তিই তার প্রমাণ :

> কথিক আছে, আজিজন অস্ত্র পরিগ্রহপূর্বক এই স্থানে কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বারোহীদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। প্রাচীরের দক্ষিণ দিকে মীর নবাব আপনার কামান স্থাপিত করিয়া, নিরন্তর গোলা

> বৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্বদিকে বাকর আলী সন্নিবেশিত কামানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। —সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই 'কথিত আছে' শব্দ দু'টির প্রতি। 'ট্রেভেলিয়ান'-এর লেখক নিজে বলেন নি যে, আজিজন বারবণিতা বা বেশ্যা। লোকে বলে এই কথাই তিনি বলেছেন। কোন কথাকে বানাবার প্রয়োজন হলে এই ধরনের কৌশলের অনুসরণ করতে হয়। সুচতুর লোকেরা জানেন যে, এ ধরনের বানানো কথা একবার জনসাধারণের মধ্যে চালু করলে ধীরে ধীরে তা সত্য বলে প্রচারিত হয়। দুঃখের বিষয় রণরঙ্গিণী, স্বদেশ-প্রাণা আজিজনের বেলাতেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সেই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন।

এখন আমরা আজিজনের সাধারণ পরিচয় দিয়ে পরে আমাদের অন্যান্য যুক্তি একে একে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করব। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আজিজন বার বিলাসিনী হউন অথবা অস্ত্র পরিগ্রহপূর্বক কামানের পাশে দণ্ডায়মান থাকুন বা না থাকুন, আজিজন বলে কোন নারী অশ্বারোহী সৈন্যদের উৎসাহিত করেছিলেন কিনা তা উদ্ধৃত লেখা পড়লেই বেশ বোঝা যায়। এখন কথা হলো এই নারী কে? এর পূর্বে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখজনক হলেও বৃটিশ আমলে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানের ইতিহাস সংরক্ষিত হলেও বিশেষ করে ১৭৫৭ হতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১২৪ বৎসরের ইতিহাস, উত্তর বাংলার রংপুর, দিনাজপুরের ইতিহাস একরকম অলিখিতই রয়ে গেছে। তাই এই আজিজন কে এবং আজিজন সত্যই কি বারবণিতা? এর স্বামী, ছেলে, পিতা ছিলেন কি না —সে ইতিহাস কেউ উদ্‌ঘাটন করেন নি। আপনারা বিস্মিত হলেও আমরা এই কথা বলতে চাই, বীরাঙ্গনা আজিজনের স্বামীর নাম নাসির সুলতান (ইংরেজদের নাসিরউদ্দীন), যিনি ওহাবী ও সিপাহী যুদ্ধের জেনারেল ছিলেন। আজিজনের পিতার নাম সানাউল্লাহ্‌ মোহাম্মদ চৌধুরী।

নাসিরউদ্দীনের নিবাস ছিল বর্তমান রংপুর জিলার অন্তর্গত 'ফুলচৌকী'[১]

---

[১] ইংরেজ ও এদেশীয় লেখকগণ 'ফুলচৌকী'কে 'নগর' উল্লেখ করেছেন। হাণ্টার সাহেব এই 'নগরে'র রাজ পুরুষদের 'রাজা' ও রাজ মহিলাদের 'রানী' বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের মতে 'সুলতান' ও 'সুলতানা' হবে। সুলতানা আমিরন নেসার স্বামী ও শ্বশুর বংশের অতুল ঐশ্বর্যের বিবরণ ও খ্যাতি, মান, সম্মান ও দেশপ্রেমিকতার কথা আমরা পরে ধারাবাহিকভাবে আপনাদের জানাবার আশা রাখি।

নামক স্থানে এবং সানাউল্লাহ্ মোহাম্মদ চৌধুরীর নিবাস ছিল দিনাজপুরের অন্তর্গত 'ইকোর' নামক গ্রামে। আজিজনের প্রকৃত নাম সুলতানা আমিরন নেসা। আজিজন তাঁর ডাক নাম।

আমিরনের পিতা সানা উল্লাহ্ মোহাম্মদ চৌধুরী নাসিরউদ্দীনের পিতা সুলতান কামালের মীর মুন্সী (**Private-Secretary**) ছিলেন। তৎকালীন ভারতে এমন কোন বন্দর ও শহর ছিল না, যেখানে আমিরন নেসার শ্বশুরের ব্যবসায়ের কুঠি ও কারবার ছিল না। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'বাকর আলী' বলে যে নামটি রয়েছে সেটি 'বাকের মোহাম্মদ' হবে বলে আমরা ধারণা করি। কারণ, আমিরনের (আজিজন) দাদা-শ্বশুর বাকের মুহাম্মদ ও কামালউদ্দীন মুহাম্মদের নামে এ সময় পর্যন্তও বিভিন্ন স্থানে কারবার চলত এবং কানপুরেও চামড়া ও অন্যান্য জিনিসপত্রের কারবার ছিল। এ'রা মোগল রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন তো বটেই, উপরন্তু মোগলদের মধ্যে এ'রাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ধনী। আত্মীয়রা আমিরন নেসার পিত্রালয়ে তাঁবু[১] খাটিয়ে থাকতেন। ঐ স্থানের নাম অদ্যাবধি লোকে 'মঙ্গলপুর' বা 'মোগলপুর' বলে, যা ইকোর গ্রাম হতে আধ-মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত।

পূর্বে উল্লেখিত 'মীর নবাব'-এর সাধারণ পরিচয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে জয়ী ইংরেজ লেখকরা জানলেন না—এটা কেমন করে বিশ্বাস করা যায় এবং শুধু 'মীর নবাব' বলে এ বংশের সাধারণ পরিচয় না দিয়ে বা এর আসল নাম না দিয়ে শুধু 'মীর নবাব' বলে ইতিহাসে উল্লেখ করার মধ্যে একটি কারণ অবশ্যই আছে।

শুধু এটুকু বলে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, সুলতানা আমিরন নেসার (আজিজন) দাদা-শ্বশুর সুবাদার নবাব বাকের মোহাম্মদ নুরউদ্দীন জঙ্গ বাহাদুর (ইংরেজদের মজনু শাহ্) ও তাঁর সহকারী সন্ন্যাসী ভবানী পাঠক গোসাঁই মহারাজ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭-এর পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবের পরিকল্পনা এই ফুলচৌকীতে (নগরে) করেন। তাতে হিন্দু মুসলিম মিলনের এমন একটি পরিকল্পনা ছিল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পেলে ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ত। তাই ইংরেজরা সুকৌশলে

---

[১] মোগলশাহী পরিবারের লোকেরা যখন কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বাড়ীতে যেতেন, তখন তাঁরা সেখানে তাঁবু খাটিয়ে বাস করতেন এবং নিজেদের প্রস্তুতকৃত আহার্য ভক্ষণ করতেন। কারণ এদের মত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আদর আপ্যায়ন করা আত্মীয়-বন্ধুদের পক্ষে সম্ভব হতো না —লেখক।

সুলতানা আমিরন নেসাকে করেছে বারাঙ্গনা আজিজন ও মীর মুন্সী সানাউল্লাহ্ চৌধুরীকে করেছে ‘মীর নবাব’। এ ছাড়া আছে ইংরেজ বন্ধুদের কারসাজির কথা, যা আমার পরবর্তী প্রবন্ধগুলোতে আলোচনা করব বলে আশা রাখি। এ সম্বন্ধে ভূতপূর্ব ‘যুগান্তর’ সম্পাদক শ্রী ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এম. এ. পি. এইচ. ডি-এর নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতার ফলে ইহা জানি যে, যাহা লোক সমাজে রটে বা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, তাহাই ইতিহাস নহে। যথার্থ তথ্য লোকসমাজে বেশীর ভাগই অজ্ঞাত থাকে। ঐতিহাসিকেরা পুংখানুপুংখরূপে বিচার করিয়াও অনেক সময় তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন না, সেইজন্যই ভুল ঘটনা অনেক সময় ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত হয়।
>
> —অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস

আমিরন নেসা (আজিজন) তাঁর পিতা ‘মীর নবাব’ অর্থাৎ মীর মুন্সী সানাউল্লাহ্ চৌধুরীর সঙ্গে থেকে কানপুর সিপাহী যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। আমিরন দেবর সোউস সুলতান ঐ সময় আলীগড়ের সুবাদার ও দিল্লীর সেনানায়ক আর ঝাঁসী রেজিমেন্টের গোলন্দাজ ছিলেন। আমিরনের ফুফা-শ্বশুর সুলতান ওয়াসীদাদ মুহাম্মদ মধ্যপ্রদেশের শাসক ও সেনানায়ক ছিলেন। আমিরনের ননদের স্বামী মোহাম্মদ ফাজিল খাঁ মধ্যপ্রদেশের ‘রথগড়’ দুর্গের প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। আমিরন নেসার স্বামীর প্রধান দেওয়ান আসান উল্লাহ্ খাঁ দিল্লীতে সম্রাট বাহাদুর শাহের বিশ্বস্ত পার্শ্বচর ও সৈন্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমিরন নেসার চাচা শ্বশুরের-পুত্র ছিলেন খিযর সুলতান যাঁকে ফিরোজ শাহের দুর্গপথের সম্মুখে কতল করা হয়। এ সব কথা বিভিন্ন ইতিহাসে লেখাআছে। আমরা পরে বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা করব। আমিরনের শ্বশুর সুলতান কামাল রংপুর কারমাইকেল কলেজের অনতিদূরে ইংরেজদের দ্বারা শহীদ হন ও আমিরনের দ্বিতীয় ফুফু-শাশুড়ী সুলতানা চাঁদবিবি রংপুর বদরগঞ্জ থানার ‘কুরশা’ গ্রামে ইংরেজদের দ্বারা শহীদ হন।

সুলতানা আমিরনের (আজিজন) প্রথম ফুফু শাশুড়ী সম্রাজ্ঞী লালবিবি[১] (ইংরেজদের লালবাঈ) সিপাহী যুদ্ধের কয়েক বছর পূর্বের রংপুরের মীরগঞ্জ নামক স্থানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের দ্বারা অতর্কিত আক্রমণে নিহত হন।

---

[১] ইনি ছিলেন সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের প্রধান মহিষী এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের মাতা।

নীচের তিনজন ব্যতীত উপরের সকলেই ১৮৫৭-এর মহাবিপ্লবের মহাডাক 'দিল্লী চলো' 'চলো দিল্লী' ধ্বনি দিয়ে দিল্লী অভিমুখে যান।

সুলতানা আমিরন অত্যন্ত জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন—তা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। বিবেক-বিবেচনা-বর্জিত সুচতুর ইংরেজ লেখক তাই আমিরন্‌ নেসা (আজিজন)-কে বারবণিতা বলবার সুযোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আমিরন নেসার দৌহিত্র বধু শাহবানু চৌধুরাণী (বয়স ৯৪ বৎসর) বলেছেন ঃ

> আমি আমার দাদী শাশুড়ী সুলতানা আমিরন নেসা (আজিজন)-কে দেখেছি। যখন আমার বিবাহ হয়, তখন আমি পূর্ণ যুবতী। শ্বশুর বাড়ী আসার ৯/১০ বছর পর আমার দাদী শাশুড়ী ইন্তেকাল করেন। কি কারণে জানি না, সম্ভবত ইংরেজদের গোপন হুকুমে আমার দাদী শাশুড়ী তাঁর পুত্র-পৌত্রদের কতককে নিয়ে রাজবাড়ী ছেড়ে একটি খড়ের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। আমার দাদী শাশুড়ী তাঁর বিবাহিত জীবনের ৭/৮ বছর পর অর্থাৎ সিপাহী যুদ্ধ পর্যন্ত আর কোন সময় পিত্রালয়ে যাননি। এ কথা আমি আমার দাদী শাশুড়ী, শাশুড়ী ও দাসীদের নিকট এবং আমার আব্বাজির নিকট শুনেছি। আমার দাদা শ্বশুর নাসির সুলতান্‌ ও দাদী শাশুড়ী সুলতানা আমিরন দিল্লী ও কানপুর থেকে যুদ্ধ করেছেন। তিনি জাঁকজমকপ্রিয় ও বিলাসিনী এবং তেজস্বিনী ছিলেন। নীচতলা থেকে তেতলায় উঠতে তাঁর কয়েক জোড়া পাদুকা ছিল। তাঁর থাকার ঘরের দরজা থেকে পায়খানা পর্যন্ত কয়েক জোড়া পাদুকা ছিল। গোসল করতে তিনশ ঘড়া পানি লাগতো। ঘড়াগুলো পূর্বে সারিবদ্ধভাবে জলপূর্ণ অবস্থায় রাখা হতো। যত বড় মূল্যবান স্বর্ণ বা মণি-মুক্তা খচিত কাপড়ই হোক না কেন, যদি তা রোদে দেওয়া হ'ত এবং তার নীচ দিয়ে কোন কুকুর যেত তবে তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেওয়ার তিনি আদেশ দিতেন। এই হ'ল তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ চলাফেরার কয়েকটি মাত্র ঘটনা।

তার এই উক্তি ছাড়াও এ স্থানের আরো অনেকে এসব কথা জানেন। এই বিষয়গুলোর অনেক প্রমাণ আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার দরুন আর দু-একটি কথা বলেই এ প্রবন্ধ শেষ করব।

১৮৫৭ সালে ভারতের বিশেষ করে বাংলার সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের রাজত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ ১৭৫৭ সালের মাত্র কয়েক বছর পর সম্রাট শাহ আলমের দূত শেখ এহতেশাম উদ্দীন-এর ফারসী

পুস্তক হতে 'The Dacca Review, Vol. 6, Nov. 11-12 February and March, 1917 ১৩৬৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মাহেনও'-এ যে অনুবাদটি বের হয়েছে, তার থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

> বাদশাহের পত্র সংক্রান্ত ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য উক্ত কাপ্তান (কাপ্তান সুইনটন) আমাকে কঠোর নির্দেশ দিলেন।......লণ্ডন থেকে যখন বাংলায় ফিরে এলাম, তখন দেশের লোক এই বলে আমার দোষ দিতে লাগালো যে, ইংল্যাণ্ডে বাস করেও আমি ভাল করে ইংরেজী ভাষা শিখতে পারিনি। এর জবাবে যা বলতে হয়, তা বলতে গেলে গোপন কথা বেরিয়ে পড়ে। চুপ করে থাকা ছাড়া এবং আমার বুদ্ধিহীনতা স্বীকার করা ছাড়া আমি আর কি বলতে পারি এবং কোন্ ব্যাখ্যা দিতে পারি ?

পলাশী যুদ্ধের মাত্র কয়েক বছর পরেই উক্ত এহতেশাম উদ্দীনের যদি এই অবস্থা হয়, মানে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়ে সত্য কথা বলবার সাহস বা কোন ক্ষমতা না থাকে, তবে সিপাহী যুদ্ধের পর যে সময় ইংরেজ প্রচারকগণ প্রচার করে ফেলেছিলেন সূর্য উদয় এবং অস্ত পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য......ইত্যাদি; সে সময় সাধারণ লোক আর কি করে সত্য প্রকাশ করার মত সাহস পাবে ? কিন্তু দুঃখের বিষয় এ দেশ থেকে বৃটিশ চলে যাওয়ার পরও সেই সব সত্য প্রকাশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পত্র-পত্রিকা পর্যন্ত আজও নীরব। কারণ, বিনালাভে তুলাও কেউ বইতে রাযী নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ

বাংলার ইতিহাস নাই বলে বাঙালী মনীষীরা আফসোস করেছেন। এই ইতিহাস লিখবার জন্য তাঁরা কেউ কেউ সংকল্পও করেছেন, কিছু কিছু লিখেছেনও, তথাপি বাংলার ইতিহাস অদ্যাবধি অলিখিতই রয়ে গেছে। আবার দেশী ও বিদেশী লেখকদের দ্বারা এ যাবত যেটুকু ইতিহাস লিখিত হয়েছে, তাই বা কোন্ ইতিহাস? ভূতপূর্ব 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রী ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এম. এ., পি. এইচ. ডি. সত্যি বলেছেন:

> বাস্তব রাজনীতির অভিজ্ঞতার ফলে ইহা জানি যে, যা লোকসমাজে রটে, যা যা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, তাই ইতিহাস নহে। যথার্থ তথ্য লোক সমাজে বেশীর ভাগ লোকেই অজ্ঞাত থাকে। ঐতিহাসিকেরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেও অনেক সময় তা নির্ধারণ করতে পারেন না। সেই জন্যই ভুল ঘটনা অনেক সময় ইতিহাস বলে প্রচলিত হয়।
>
> —অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস

এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে বলে মনে ঘটনাটি ঘটেছে ১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধে যা ইংরেজ ঐতিহাসিকদের করি। মতে 'সিপাহী বিদ্রোহ' ছিল তা জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায়:

> ১৮৫৭ ভারতীয়দের হৃদয়ে একটি বিদ্যুৎ স্ফুরণের দীপ্তি সঞ্চার করে। আমাদের জনসাধারণ বিদ্রোহের বিভিন্ন ঘটনার কথা বলাবলি করে না। সেটা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু তাদের স্মৃতির গহনে সেগুলি রহস্যাবৃত হয়ে জীবন্ত রয়েছে। একদা জনৈক মিশনারী একদল ভারতীয় বালককে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে বলেছিলেন। প্রত্যেকেই একটি করে সাদা কাগজ দাখিল করেছিল। বিদ্রোহের কাহিনী বলায় তাদের সর্বসম্মত এবং অকুণ্ঠ অনিচ্ছা এই সাদা কাগজের মারফত স্পষ্ট প্রকাশিত হয়েছিল।
>
> ডব্লিউ. এইচ. ফিসেট লিখিত 'দি টেইল অব দি গ্রেট মিউটিনি,' পৃষ্ঠা ৪৪০

বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা ও লেখকেরা বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সব বই লিখেছেন, সেগুলি দ্বারা আমরা প্রভাবান্বিত হইনি। বিদ্রোহের স্মৃতি আজও আমাদের মনে এক অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পক্ষান্তরে আজ পর্যন্ত কোন বৃটিশ ঐতিহাসিকই বিদ্রোহকে তার যথার্থ পটভূমিকায় বিচার করতে সক্ষম হয়নি। ভারতীয়েরা বিদ্রোহে পরাজিত হয়েছে, তাদের পক্ষে দলীল-পত্র ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান সে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই 'বিদ্রোহে' নিহত ভারতীয় শহীদদের স্মৃতিকে মসী-লিপ্ত করতে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নি। তাদের সেসব ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জিত বিবরণ থেকে সত্য ঘটনার উদ্ধার সাধন সহজ নয়। প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে বিদ্রোহ-নায়কদের চরিত্র চিত্রণও কঠিন সাধ্য। —অশোক মেহতার লিখিত
পুস্তকের বাংলা সংস্করণ 'আঠার শ' সাতান্নের বিদ্রোহ'

তা যত কঠিন সাধ্যই হউক, আমি এখানে পলাশীর (১৭৫৭) পরে এবং সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭) অব্যবহিত পূর্ববর্তীকালের বাংলার ইতিহাসের একটি লুপ্তপ্রায় অথচ গৌরবোজ্জ্বল দিক আলোচনা করতে বসেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে সিপাহী যুদ্ধ ও সমসাময়িক ইতিহাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা করবার আশাও রাখি।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমার আলোচনার পটভূমি হিসেবে আমি তৎকালীন রংপুর প্রদেশকে বেছে নিয়েছি। কেননা, আলোচ্য সময়ে সমস্ত বৃটিশ বিরোধী পাক-ভারতীয় আযাদী আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল রংপুর। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন রংপুর জেলা একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছিল, বর্তমান রংপুর জেলা তো ছিলই, আর জলপাইগুড়ি ও বগুড়ার কতগুলো এলাকা, আসামের গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি মহকুমা ও জিলা, দিনাজপুরের ঘোডাঘাট অঞ্চল প্রভৃতি দ্বারাই পূর্বে রংপুর প্রদেশ গঠিত ছিল। —রংপুর : বিশ্বকোষ

তৎকালে এই জেলাসহ থানাগুলোর হেড অফিস নিম্নোক্ত জায়গাগুলোতে ছিল : সুলতানগঞ্জ (বর্তমান বগুড়ায়), বাদিয়াখালি (বর্তমান রংপুরে), কালিগঞ্জ (বর্তমান রংপুরে) রমনা গোয়াল পাড়া (আসামে), কসবা কৃষ্ণনগর (রংপুরে), ভোগডাবরী (রংপুরে), বড়বাড়ী (রংপুরে) এবং বিভাগসমূহের হেড অফিস বা রাজধানী ছিল রংপুর সদরের দক্ষিণে ফুলচাকী নগর নামক স্থানে। এই ফুলচৌকীর যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও তৎকালীন বাংলাদেশের তথা পাক-ভারতের আযাদী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনি হচ্ছেন নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জং বাহাদুর। অথচ মজার কথা এই যে, আমাদের দেশের তথাকথিত ইতিহাসে এই ক্ষণজন্মা বীর পুরুষের নামটি পর্যন্ত তেমন উল্লেখ নাই। তাঁর পরিবর্তে

আছে মজনু নামে এক দস্যু সর্দারের লুটতরাজের লোমহর্ষক কাহিনী। যে কাহিনী বলে দেশবাসীর মনকে তাঁর প্রতি বিরূপ করে তুলবার চেষ্টার ত্রুটি মাত্র করা হয়নি। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা সেই তথাকথিত ইতিহাসে বর্ণিত কাহিনীর কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত করছি। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায় ঃ

> In 1763 Hastings recorded the following note: Some times ago, a large body of Fakirs infesting the country about Backergange, Surrounded Mr. Kelly, my agent, and put him in danger of life......The Fakirs have since quitted the country.
>
> The same year, a rabble of Fakirs as Clive calls them, attacked the Dacca factory and captured it.
>
> A month later a Mr. Thwite was sent to take charge of his properties at the Rampur Boalia factory, The plunder, therefore, took place before 1763. The same letter records that in 1764, Sannayasis were encamped in a village 4 miles from Rampur Boalia and plundered it.
>
> The chief Sheikh Munjenoo fled on horse-back to Mustanguer (Adarga) where he was joined by about 150 of his followers, all disarmed and many of them wounded. After the Skirmish in which Capt. Thomas was killed at the end of 1772, a band of Sannayasis marched northward, towards Cooch Behar to reinforce the Sannayasis under Durrup Deo.
>
> After about two years Manjenoo Shah, the leader of Fakirs appeared again in Bengal on 18th December. The collector of Rajshahi reported, "Show Manjenoo entered the Pargana Messidah (now in Dinajpur) at the head of 700 Fakirs and demanded payment of debt 1500 Rs. due from the deposed Zeminders......I hear that Fakirs have joined the body of Sannayasis who were in neighbourhood and that they are gone......
>
> Majnu had his adherents amongst the local dacoits, He was in league with 'Bhowani Pathek, a leader of dacoits ......In 1787, some merchants carrying on business in tobacco

> **and other goods between Rampur and Dacca complained to Mr. Williams, Superintendent of Govt. customs at Dacca, of 'Bhowani Pathak' a desperate man having taken and plundered their boats in their passage.**

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলো নেওয়া হয়েছে সিভিলিয়ান লেখক রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষের **'Sannayasis and Fakir Raiders in Bengal'** শীর্ষক গ্রন্থ থেকে। লেখক তাঁর ভূমিকা থেকে উল্লেখ করেছেন যে, আলোচ্য তথ্যগুলো সংগৃহীত হয়েছে **'Mainly from official records** এবং

> **The materials was extracted from the records by the record room staff under the direction of Mr. A. Cassells I. C. S. in 1921-23. I am deeply indebted to Mr. Cassells for his help and suggestions and contant encouragement.........**

অতএব **'Sannayasi and Fakirs Raiders in Bengal'** গ্রন্থখানি তৎকালীন ইংরাজ কর্তৃক দলীল। ফাইল ও চিঠি-পত্রের সাহায্যে গ্রন্থখানিতে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সে কাদের ইতিহাস? মজনু শাহ্ কে? ভবানী পাঠকেরই বা সত্য পরিচয় কি? ঐতিহাসিক মিস্টার ঘোষ ও তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা পৃষ্ঠপোষক মিঃ এ. ক্যাসেলস এবং তাদের অনুসরণকারী অন্যান্য লেখকের মতে মজনু শাহ্ ভবানী পাঠক যথাক্রমে তৎকালীন রংপুরের মশহুর বিদ্রোহী ফকীর ও সন্ন্যাসী দলের লোক ও লুণ্ঠনকারী দস্যু।

অথচ ওদেরই লিখিত বিবরণী ও সমসাময়িক অন্যান্য বর্ণনানুসারে তাঁদের যে পরিচয় পাওয়া যায়. তদ্দ্বারা তাদেরকে দস্যু তো বলাই চলে না, উপরন্তু তাদেরকে এদেশীয় আযাদী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা বলে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় থাকে না। উপরিউক্ত পুস্তকে মজনু শাহকে দস্যু সরদাররূপে চিত্রিত করা হয়েছে, অথচ দস্যু সরদার দেশবাসীর ধন-প্রাণ লুণ্ঠন না করে এদেশীয় জমিদারদের নিকট খাজনা দাবি করেছে লেখা হয়েছে। আরও মজার কথা এই যে. এই লুণ্ঠনকারী ফকির সন্ন্যাসীদের মিলিত আক্রমণে শক্তিমত্ত বৃটিশ বাহিনী বারবার পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে: এমনকি এদের দমনের ব্যাপারে দেশবাসীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েও ইংরেজরা অধিকাংশ সময় ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু এদের জনপ্রিয়তা যে কত ব্যাপক ছিল, সে কথাও তাদের বিরুদ্ধবাদী লেখকরা পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য 'কোচবিহারের

ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি :

> স্থানীয় লোকে সন্ন্যাসীগণকে দেবতুল্য মনে করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত এবং তাহাদের গতি বিধির সংবাদ সহসা কাহারো নিকটে ব্যক্ত করিত না। সেই সমস্ত কারণে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসী দমনের জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।
>
> —কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯

শুধু তাই নয়, এদের দমনের জন্য যে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল, নাটোরের রানী ভবানীর নিকট মজনু শাহের নিম্নলিখিত পত্র খানিতে তার একটু আভাস পাওয়া যায় :

> **We have for a long time begged and been entertained in Bengal and we have long continued to worship god at the several shrines and alters without everonce abu Singor oppressing any one. Nevertheless last year 150 Fakirs were without cause put to death. They had begged in different continus and the clothes and victuals which they had with them were lost. The merit which is derived and the reputation which is procured from the murder of the helpless and indigent need not be declared. Formaly the Fakirs begged in separate and detached parties but now we are all collected and beg together. Displeased at his method they (English) abstract us visiting the shrines and other places. This is unreasonable you are the ruler of the country. We are Fakirs who pray always for your welfare. We are full of hopes. –Sannayasis and Fakir Raiders in Bengal, Page 41**

এ চিঠির জবাবে রানী ভবানী কি বলেছিলেন, ঐতিহাসিক ঘোষ তার উল্লেখ করেন নি বটে, তবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, উক্ত পত্র লেখার পর অল্পদিনের মধ্যে রানী ভবানীর বিশাল জমিদারী বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তদস্থলে কয়েকটি ক্ষুদ্র ও ভুঁইফোড় জমিদারীর পত্তন হয়। এ সম্পর্কে 'বাংলায় ভ্রমণ' শীর্ষক গ্রন্থে নিম্নলিখিত কয়েকটি লাইনের প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :

> ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে নানা কারণে নাটোরের বিশাল জমিদারীর অধিকাংশ এ বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং উহা হইতে বাংলার বিভিন্ন জিলায় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ছোট জমিদারীর সৃষ্টি হয়।
>
> —বাংলায় ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫

আমরা রংপুরের অধিবাসীরা ভালভাবেই জানি, রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত রংপুরের বাহেরবন্দ পরগনার পরবর্তী জমিদার—কাসিমবাজারের কান্তবাবু ও তার বংশীয়দেরকে ঐ পরগনার লোকেরা কখনো ন্যায়সঙ্গত মালিক বলে মনে করেনি।

ঐতিহাসিক মিঃ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে 'মজনুর কবিতা' শীর্ষক একটি কবিতার মূলসহ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। কবিতাটির লেখক পঞ্চানন দাসের (পঞ্চানন দাসস্য) কোন পরিচয় অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারিনি। তবে সেটি তৎকালীন রংপুর 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় (১৩১৭ বাংলা সন) প্রকাশ হয়েছিল। পঞ্চানন দাসস্য কবিতাটির লেখক, না সংগ্রাহক—এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে বাংলা 'বিশ্বকোষে'। উক্ত পঞ্চানন দাসস্য বা দাস লোকটি কে—সে খবরও বিশ্বকোষ-এর লেখকরা চেষ্টা করে জানতে পারেন নি। বৃটিশ আমলে এ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলেন নি যে এ লেখকটি কে? আর সে প্রশ্ন তোলাও তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। তবুও তাদের যে প্রচ্ছন্ন ভাব, তাতে এই বলা যায় যে, মজনুর কবিতার কবি ছিলেন ইংরাজের কোন খয়ের খাঁ—যার সত্য পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। যা হোক, মজনুর কবিতায় মজনু শাহকে জালিম ফকির বা ডাকাত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নে তার থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ

শুন সভে একভাবে নোতন রচনা
বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু করনা।।
কালান্তক জম বেটা কে বলে ফকির।
যাঁর ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।।
সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডা বান ঝাউল নিশান।।
উট গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি।।
চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজী।
মজনু তাজীর পর যেন মরদ গাজী।।
দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হইল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম।।
... ...

যেদিন যেখানে যায় করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া॥
সহজে বাঙ্গালী অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া॥
ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
গাছুয়া ব্যাপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গুড়॥
নারী লোকে না বান্ধে চুল না পরে কাপড়।
সর্বস্ব ঘরে থুয়া পাথারে দেয় লড়॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক। ইত্যাদি

এ সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কেননা কবিতাটিতে মজনুর যে পরিচিত দেওয়া হয়েছে, তাতে অন্তত এটা বোঝা গেল যে, তিনি একজন অসাধারণ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি—যাঁর 'ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির'; যাঁর 'সাহেব সুবার মত চলন সুঠাম'। ইতিহাসের উপাদান যে তখনকার লোককবিদের লেখায় থাকত, তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এখানে রংপুর সদরস্থ ইটাকুমারী গ্রামবাসী মশহুর লোককবি রতিরাম রচিত জাগগানের একটি পালা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি :

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবী সিং।
সে সময়ে মুল্লুকেতে হইল বার ঢিং॥
যেমন সে দেবতার মুরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভুষণ বাহন॥
রাজার পাপেতে হইল মুল্লুকে আকাল।
শিয়রে রাখিয়া টাকা গৃহি মারা গেল॥
কত যে খাজানা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে ওঠে ক্রন্দনের রোল॥
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার॥

সোয়ারিতে চড়িয়া যায় পাইকে মারে জোতা।
দেবী সিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোতা।।
পারে না ঘাটায় চলতে ঝিউরী বউরী।
দেবী সিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি।।
পূর্ণ কলি অবতার দেবী সিংহ রাজা।
দেবী সিংহের উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।।
রাজা রায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বলি সর্বলোকে কয়।।

… … … … …

মন্থনার কর্ত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানী।।
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারি ধরি লুট করে বদমাইশ পাকা।।
শিবচন্দ্রের হৃদে এই সব দুঃখ বাজে।
জয় দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে।
দেবী সিঙ্গের দরবারে শিবচন্দ্র গেল।
প্রজার দুঃখের কথা কহিতে লাগিল।।
রাজপুত কালাভূত দেবী সিং হয়।
চেহারায় মৈষাসুর হৈল পরাজয়।।

… … … … …

রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার।
সবাকে লেখিল পত্র সেট্‌টে আসিবার।।
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সকল প্রজাকে ডাকে রোক্কা দিয়া তার।

… … … … …

পীরগাছার কর্ত্রী আইল জয় দুর্গা দেবী।
জগ মোহনেতে বৈসে একে একে সবি।।

… … … … …

পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরনে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খানা করি উপবাস।।
মাও ছাড়ে, বাপ ছাড়ে, ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটী ছাড়ে নাই কারো মায়া।।

… … … … …

কারো মুখে নাই কথা হেট মুণ্ডে বয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয়।।
যেমন হারামজাদা রাজপুত ডাকাইত।
খেদাও সব্বায় তাকে ঘাড়ে দিয়া হাত।।
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই।
মাইয়া হইয়া জন্মিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড করি কাটিবারে পারোঙ্ তলোয়ারে।।

... ...

চারি ভিত্তি হতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা।
ভদ্রগুলো আইল কেবল দেখিবারে মজা।।

... ...

ইটার ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়।
দেবী সিংহের বাড়ী হইল ইটার পাহাড়।।
খিরকির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবী সিং।
সাথে সাথে পালেয়া গেল সেই সেই বার ঢিং।।
দেবী সিং পালাইল দিয়া গাও ঢাঁকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা।।

—রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা ১৭৮-১৮০, ১৩১৫

উপরিউক্ত কবিতায় কবি রতিরাম যে কাহিনীর বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন সাহিত্য পরিষদের (রংপুর শাখা) সভাপতি (১৩১৫) উত্তর বঙ্গের গৌরব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলেন ঃ

> জমিদারদিগের জমি নামমাত্র মূল্যে দেবী সিং বেনামীতে স্বয়ং কিনতে লাগলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই, তখন জমিদারবর্গ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহারো টাকা নাই। প্রহারে, অপমানে, জর্জরিত হইয়া অসংখ্য লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তারপর কৃষকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল।
>
> দিনাজপুরে দেবী সিং অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন; হররাম (দেবীর অধীনস্থ কর্মচারী) রংপুরে একবিংশতি প্রকারের কর

সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবী সিংহের তাতেও মন উঠিল না।……জমিদারদিগের তো কথাই নাই, স্ত্রী লোকদিগের উপরও ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল। স্ত্রী জাতির শেষ অপমান সর্বসমক্ষে তাহাও সংঘটিত হইতে লাগিল। ক্ষোভে, রোষে, অপমানে কত সহস্র কুল-ললনা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কে জানে? তাহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত। বংশখণ্ড অর্ধ চন্দ্রাকারে চাঁছিয়া তাহার দুই প্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত, বংশখণ্ড স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত। মূর্ছিত হইয়া রমণীগণ ভূ-তলে পতিত হইলে রক্তস্রোতে ধরাতল সিক্ত হইত। তাহার পর দুর্বৃত্তেরা এই নিপীড়িত রমণীগণের ক্ষতবিক্ষত দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে মশাল ও গুলের আগুন ধরাইয়া দিত।

খৃস্টান পুঙ্গব গুড ল্যাড় (Good Lad) কালেক্টর সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজকর্ম দেবী সিংহই করেন, দেবী সিংহের কীর্তি-কলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে? যথাসময়ে গুড লেডের কর্ণে এই সকল সংবাদ পৌঁছিল। তিনি শুনিলেন, নূরুল উদ্দীনকে নবাব পদে বরণ করিয়া প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছে। লেফটেন্যাণ্ট সাহেব শুনিলেন, নূরুল উদ্দীন মোগলহাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরুল উদ্দীন ৫০ জন মাত্র লোক মোগলহাটে লইয়া ছিলেন। তাঁহার দলবল সকলেই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাকডোন্যাণ্ড অতর্কিতভাবে মোগলহাটে নূরুল উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হ'ল, নূরুল উদ্দীন আহত হইয়া অল্প দিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন এবং নূরুল উদ্দীনের দেওয়ান দয়াশীল হত হইলেন।

এখানে লক্ষযোগ্য যে, তর্করত্ন মহাশয় নূরুল উদ্দীন বা নূরউদ্দীনকে নবাব ঘোষণা করে প্রজাদের বিদ্রোহী হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। জাগগানে এই নূরউদ্দীন বা নূরুল উদ্দীন ও তাঁর দয়াশীলের কথা নেই।

স্বর্গীয় তর্করত্ন মহাশয় এ ইতিহাস কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তা আজ জানবার উপায় নেই বটে, তবে এ সম্পর্কে নিশ্চয় কোন প্রামাণ্য তথ্য তাঁর জানা ছিল। তা না হলে কোন ভিত্তিহীন গুজবের উপর নির্ভর করে এ মন্তব্য লেখার লোক তিনি নন। আর সেই গোলামী আমলে তা সম্ভবও

ছিল না। সে যাই হোক, আমরা সমসাময়িককালের দু-একখানি ইতিহাসেও এই কাহিনীর উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি। নিম্নে তা থেকে কিছু অংশ তুলে দিলাম ঃ

> তাহারা কিছুতেই কর প্রদানে স্বীকৃত হল না। অবশেষে অস্ত্র ধারণ করে দেবী সিংহের অনুচরবর্গকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করতে লাগল। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে কাজির হাট, কাকিনা, টেপা ও ফতেপুর চাকলার প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে কুচবিহার ও দিনাজপুরের প্রজাদিগকে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আহবান করে। নায়েব-গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীকে যেখানে দেখতে পেল সেখানে হত্যা করল। টেপা প্রভৃতি স্থানের নায়েব তাদের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে নূর উদ্দীন নামে একজন আপনাকে নবাব ঘোষণা করে; দয়াশীল নামে আর একজনকে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করে। এইরূপে তাহারা সমস্ত প্রদেশে ভীষণ বিদ্রোহের অভিনয় দেখাইয়াছিল।
>
> দেবী সিংহ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে রংপুরের তদানীন্তন কালেক্‌টর গুড ল্যাডের শরণাপন্ন হলেন।...তিনি দেবী সিংহের অনুরোধে প্রজাদিগকে দমন করবার জন্য কয়েকজন সিপাহী প্রেরণ করলেন। লেফটন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড উত্তর দিকে এবং আর একজন সুবেদার দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হল। প্রজারা ইহা শুনে ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরীর নিকট আশ্রয় লইতে যায় কিন্তু চৌধুরী তাহাদিগকে আক্রমণ করায় একটা ভীষণ কলহ উপস্থিত হয়, তাহাতে গৌরমোহনের মৃত্যু ঘটে। কোম্পানীর সৈন্য যাহাকে সম্মুখে পেল, তাহাকেই বন্য পশুর মত গুলী করতে করতে অগ্রসর হল। মোগলহাট ও পাটগ্রাম নামক স্থানে তাহাদিগের সহিত প্রজাদিগের দুটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়েছিল। মোগল হাটের যুদ্ধে দয়াশীল নিহত, নূরুল উদ্দীন গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সেই আঘাতেই অল্পদিন পরে ইহজীবনের লীলা শেষ করেন। —মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃষ্ঠা ৫২১—৫২২

শীল রাজা দয়াশীলের (দেওয়ান দয়াল চন্দ্রশীল) বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি ফুলচৌকীর নিকটেই মঈনপুরে কদমতলার দক্ষিণ পার্শ্বে ও জগদীশপুর মৌজায় বিদ্যমান আছে। সেখানে রাজার নামে একটি বড় পুকুরও আছে। স্থানীয় লোকে এখনও উক্ত পুকুরটিকে 'নাউয়ার পুকুর ও শীল রাজার পুকুর' বলে থাকে। রাজার বংশধরেরা অদ্যাবধি কৃষ্ণ নগরের নিকটবর্তী উক্ত মঈনপুর কদমতলা গ্রামে বসবাস করছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য

যে, রাজার বাড়ীর নিকটেই বিখ্যাত ভবানন্দগীর বা ভবানী পাঠকের নামে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। পার্শ্বে প্রবাহিত কাটগড়ি নদী, সেটি নবাব বাকের জং (নুরউদ্দীন) খনন করেছিলেন। তার উপরে গোসাঁই সন্ন্যাসীদের নির্মিত একটি ইষ্টকময় পুরাতন পুলও বিদ্যমান আছে।

(ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সেই লোমহর্ষক খুনী ও অত্যাচারী দেবী সিংহের অধঃস্তন কর্মচারী হররামের নিকট বংশীয় হল উক্ত গৌরমোহন চৌধুরী। সামান্য কর্মচারী হররাম হেস্টিংসের সময়ে ডিমলার জমিদারী পত্তন করেন)।

> কোচবিহারের প্রজাবর্গ কেবল বাক্যতঃ নহে, কার্যতও দেবী সিংহের পরিচয় সম্যকরূপে অবগত ছিল। রংপুরের প্রজাবৃন্দ অবশেষে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়েছিল। ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্যভাবে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং নুরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি নিজেকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন, দয়াশীল সেই নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন।
>
> বিদ্রোহী দল কোচবিহার ও দিনাজপুরের প্রজাবৃন্দকেও তাহাদের তথাকথিত নবাবের অধীনতায় সমবেত হওয়ার জন্যে নিমন্ত্রিত করেছিলেন। তাহারা রাজস্ব প্রদানের নিষেধাজ্ঞা সর্বত্র ঘোষণা করেছিল এবং সংকল্পিত কার্য্য সমাধানের জন্য ঢিং খরচা (বিদ্রোহের চাঁদা) স্থাপন করেছিল। ...মোগলহাট এবং পাটগ্রামের যুদ্ধে বহু প্রজা আহত, নিহত এবং বন্দীকৃত হ'লে সেই বিদ্রোহের অবসান হইয়াছিল।
>
> —কোচবিহারের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২১৯

কবি রতিরাম দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মধ্যে নুরউদ্দীনের নামে করেন নি বটে, তবে নুরউদ্দীনই যে বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নুরউদ্দীনের দেওয়ান রাজা দয়াশীলের কথাও ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত এই যে, এই আন্দোলনে নুরউদ্দীন বা মজনু শাহ্ নেতৃত্ব দান করেন। জাগগানে দেবী চৌধুরাণীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে ভবানী পাঠকের সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দেবী চৌধুরাণী' নামের একখানি উপন্যাসে ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেবীর গভীর সম্পর্কের কথা বিশ্লেষণ করেছেন, তবে বঙ্কিমের উপন্যাস ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জিত ও শুধু ঐতিহাসিক নাম সর্বস্ব বলে

মনে হয়। আরও মনে হয় ঔপন্যাসিক বঙ্কিম বাব‍ুর পক্ষে ইংরেজদের খ‍ুশী করা ও তাদের মনোরঞ্জন করাও একটি কারণ হতে পারে। আসল দেবী চৌধ‍ুরাণী হলেন মন্থনার জয়দ‍ুর্গা দেবী চৌধ‍ুরাণী, জাগগানে তাঁর পরিচয় আছে। বর্তমানে রংপ‍ুর জেলায় চৌধ‍ুরাণী নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। এই স্টেশনের অনতিদ‍ূরে 'দেবী চৌধ‍ুরাণীর প‍ুকুর' নামে একটি বড় প‍ুকুর আছে। উক্ত প‍ুকুরটি নবাব ন‍ূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ কর্তৃক দেবী চৌধ‍ুরাণীর স্ম‍ৃতি রক্ষার্থে খনন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। উক্ত প‍ুকুরের অদ‍ূরে মোংলা কুটির (মোগল কুঠির) ভগ্নাবশেষে নবাব ন‍ূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর স্ম‍ৃতি অদ্যাপি রয়েছে। সন্ন্যাসী নেতা ভবানন্দগীরের জন্মস্থান ও পাকা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বর্তমান রংপ‍ুর জিলাস্থ উলিপ‍ুরের পাঠক পাড়ায় বিদ্যমান আছে। সেখানে ভবানী পাঠকের একটি মঠ ও প‍ুকুর আছে। পাঠক পাড়া থেকে ক্রোশ দ‍ুই দ‍ূরে 'বজরা' ও 'রাজার হাট' নামক স্থান আছে। শোনা যায়, নবাব ন‍ূরউদ্দীন ও তৎপ‍ুত্র কামাল উদ্দীনের 'বজরা' উক্ত স্থানের নিকট দিয়ে যাতায়াত করত এবং 'রাজার হাটে' উভয়ের নামে 'গঞ্জ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নবাব বাকের জঙ্গ ওরফে মজন‍ু শাহের ম‍ৃত্যু সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ স‍ৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক মিঃ ঘোষ লিখেছেন ঃ

> **Majnu Shah died in March or May 1787 (according to different reports) at Makhanpur and his bones were carried to a famous burial place in the country of Mawaat lying to the southward of Dholly.**
>
> **(Sannyasi and Fakir Raiders in Bengal, Page 110**

এর টীকায় আবার আছে ঃ

> **"Letter from the collector of Rangpur to the secretary to the government, dated 26th January 1788.**

অর্থাৎ মহাবীর মজন‍ু শাহের ম‍ৃত্যু হলো মাখন প‍ুর (কানপ‍ুর জেলায়) আর তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হলো ধ‍ুল্লির দক্ষিণে মেওয়াট রাজ্যে। আসলে তাঁর মাতৃভ‍ূমিই দিল্লী, তিনি দিল্লীর মোগল রাজ-পরিবারের সন্তান। তাঁহার মাখনপ‍ুরে ম‍ৃত্যু হওয়া আর মেওয়াট রাজ্যে কবরস্থ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। তবে আমার দ‍ৃঢ়র‍ূপে জানি যে, রংপ‍ুরে তাঁর অর্ধ সমাপ্ত রাজধানী ফ‍ুলচৌকীতেই তাঁর ম‍ৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।

এতদ্ব্যতীত বর্তমানে ফুলচৌকীর চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর নির্মীয়মান রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। তম্মধ্যে আন্ধার কোঠা (জেলখানা), মোগল কোর্ট (আদালত), কৃষ্ণনগর, কসবা শীল রাজবাড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি তুনকা নামক ইহাদেরই এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত কিল্লা মহলে প্রাপ্ত একখানা বৃহৎ শিলালিপিতে পারসী হরফে সম্রাট শাহ আলমের (২য়) নামসহ কিছু আয়াত ও বর্ণনা পাওয়া গেছে। এটার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধারের প্রয়োজন।

সে যাই হোক, রংপুরের কালেক্টর কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ অনুসারে এই নবাবের মৃত্যু তারিখ ১৭৮৭ খৃস্টাব্দের মার্চ অথবা মে মাসে। অথচ পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী নূরুল উদ্দীন বা নূরউদ্দীনের মৃত্যু হয় মোগল হাটে অনুষ্ঠিত খণ্ডযুদ্ধের অল্পদিন পরে ফুলচৌকীতে। বাকের জঙ্গ-এর ইন্তেকাল যে রংপুরেই হয়েছিল এবং ফুলচৌকীতেই তাঁর কবর আছে, এ সম্পর্কে বর্তমান মাহিগঞ্জ গোসাঁঈ রাজ স্টেটের মালিক জমিদার সন্ন্যাসী মহারাজ সত্যনারায়ণ গিরি ও অন্যান্য অনেক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলিম ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন। গোসাঁঈ মহারাজ বলেন, নবাব বাকের জঙ্গ সুবাদার বা নবাব নাজিম ছিলেন। তাঁকে ইংরেজরা মজনুশাহ্ বলত, ইনি ঐ সময়ে বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। ফুলচৌকী নামক স্থানে তাঁর মৃত্যু হয়। ঐ স্থানে তাঁর কবর আছে বলে আমার গুরু মহারাজ মোহান্ত সুমেরু গিরি গোসাঁইজি গুরুজী এবং আখড়ার বহু সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছি। কিন্তু ঐ সময়ের কথা তাদের বলতে বললেও তাঁরা সে সব কথা বেশী বলতেন না। কেননা ইংরেজ সরকারের কঠোর নিষেধ ছিল। ৭-৮-১০ বৎসর হয়তো বা এক-আধটা কথা প্রসঙ্গে ভয়ে ভয়ে বলে ফেলতেন। আমি বগুড়ায় অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বৃদ্ধের নিকটেও ঐসব কথা শুনেছি। তাঁরা একথাও বলেছেন, "ক্লাইভ. হেস্টিংস প্রমুখ নায়কেরাও বাকের জঙ্গ-এর নিকট বার বার পরাজিত ও তাড়িত হয়েছেন।" বগুড়া শেরপুর মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ দানবীর গোসাঁইজীকে হেস্টিংস সসৈন্যে এসে তার নৌকায় সাক্ষাৎ করতে আহ্বান করেন। এবং গোসাঁইজী সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ করতে গেলে হেস্টিংস তাঁকে বন্দী করেন। ফলে শেরপুরের নিকটবর্তী যমুনা নদীতে হেস্টিংসের সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম বিপ্লবী দলের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। বিপ্লবীরা জয়লাভ

করে দানবীর গোসাঁইজীকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। নবাব বাকের জং-এর মৃত্যুর পরে ইংরেজদের সঙ্গে বিপ্লবীদলের যে সন্ধি হয়, তদবধি উক্ত গোসাঁইজীর পুত্র (শিষ্য) আর কোনদিনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যান নি। আমাদের রাজবাড়ীর সামনের কামান দুটি উক্ত দানবীর সন্ন্যাসী গোসাঁইজীরই ব্যবহৃত কামান।

সুবাদার নূর উদ্দীন বাকের মোহাম্মদ ও তৎপুত্র শাহজাদা কামাল উদ্দীন[1] যখন পথ চলতেন, তখন শত শত আগদাল্লি পাছদাল্লি পরিবৃত হয়ে ঢাল-তলোয়ার, কামান-বন্দুক, হাতী-ঘোড়া, লায়-লশকর নিয়ে নকীব আগে আগে চলতো নবাবের নাম হাঁকিয়া হাঁকিয়া সবার পিছু চলতো খাওন-খোরাকের দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে আরো শত শত অনুচর। নবাব যে তাঁবুতে থাকতেন, সেখানে প্রতিদিন নহবত বাজান হত। নকীবের নাম হাঁকা এবং নহবত বাজান চলত নবাব হতে নবাবের পুত্র শাহজাদা কামাল পর্যন্ত। তাঁরা ফুলশয্যায় শয়ন করতেন। এসব ঐতিহাসিক কথা আমি ছোটবেলায় বহু সন্ন্যাসীর মুখে শুনেছি। মোটকথা হলো, সন্ন্যাসী ফকির জমিদার এবং প্রজা সাধারণ সকলে একযোগে এক হয়ে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। তিস্তা গ্রামের নাম পূর্বে ভূতছাড়া ছিল। বঙ্কিম চন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ঐ গ্রামের নাম 'ভূতনাথ' বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর বহু সংশোধিত গ্রন্থ 'আনন্দ মঠে' 'পদচিহ্ন' নামক গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা আসলে এখানকার 'পদাগঞ্জ'। বঙ্কিম চন্দ্র যে পুলের উপর দিয়ে সন্ন্যাসীদের পালাবার কথা বলেছেন, কথাটা অসত্য হলেও পুলটি অসত্য নয়। সেটা এখনও গোসাঁই পুল নামে অক্ষত আছে। ১৬৪ পৃষ্ঠায় যে মহেন্দ্র সিংহের কথা আছে তাঁর পিতার নামই ভগবান চন্দ্র সিং (সাহাজী), এদের পদাগঞ্জে একটি বাড়ী ছিল। কবি জামালউদ্দীনের কাব্য 'প্রেমরত্নে'ও মহেন্দ্র সিং সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল 'মহেন্দ্র' নামে। এঁরাই ছিলেন সুবাদার বাকের জঙ্গের টাকশালের কর্তা বা শাহজী। এদের মূল বাসস্থান ছিল শাহাগঞ্জে। এরা জাতিতে রাজপুত। বর্তমানে গরীব হয়ে যাওয়ায় এদের বংশধরেরা শাহজী না হয়ে সাহা হয়ে গেছেন। এদের ধনাগারের নাম 'সিরাজ টাকানি', পদাগঞ্জ নামক স্থান (বঙ্কিম বাবুর পদচিহ্ন) হতে এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে। পদাগঞ্জের

---

[1] ইংরাজ আমলের দলীলপত্রে আমরা দেখেছি, শাহজাদা কামাল উদ্দীন মোহাম্মদ-এর পিতার কোন নাম নাই। এ এক তাজ্জব কথা।

দক্ষিণে বর্তমান ঘোড়াগাছ নামক স্থানটিতে সুবাদার বাকের জঙ্গের মেয়ের ঘরের নাতি (অর্থাৎ লাল বিবি ও সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের পুত্র) সিরাজউদ্দীন মুহম্মদ বাহাদুর সাহসানীর নামানুসারে 'সিরাজ বাগ' নামে একটি সুবিস্তৃত আম বাগান (বঙ্কিমের আম্র কানন) ছিল, সে কথা বঙ্কিমও তাঁর 'আনন্দ মঠে' উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৭১৭)। বঙ্কিম লিখেছেন, "কাপ্তেন টমাস সন্তান সম্প্রদায়ের এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে" (পৃষ্ঠা ৬৬৯)। "সেই মঠ দিয়া মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা যাইবার রাস্তা"। "এ রাস্তা আসলে সাহাগঞ্জের গোসাঁই মহারাজের এই মঠ থেকে 'ঘোড়াঘাট' হয়ে মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা যাওয়ার রাস্তা'' (পৃষ্ঠা ৬৮০)। "পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল।" এই কল্লোলিনী আসলে সাহাগঞ্জের পার্শ্ববাহিনী 'যমুনেশ্বরী' (পূর্ব তিস্তার অন্যতম দ্বার) ৬৮৩ পৃষ্ঠায় 'নগরে পৌঁছিলেন।' এই নগর ফুলচৌকী ও জগদীশপুর গ্রামের অধিকাংশ স্থান জুড়ে নির্মীয়মান অবস্থায় ছিল। এ সম্পর্কে আলোচনা পরে হবে।

রংপুরের বৃদ্ধেরা বলেন, "সুবাদার (নবাব নাজিম) নবাব বাকের মুহাম্মদ নুরউদ্দীন জঙ্গ বাহাদুর সম্রাট শাহ আলমের চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন। ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মাসিমপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করে রাম নারায়ণ প্রভৃতিকে পরাস্ত করার পর সম্রাট কি নিজের কোন প্রতিনিধি (সুবাদার) বাংলা শাসন করবার জন্য রেখে যান নাই ? যদি রেখে গিয়ে থাকেন তবে তাঁর নাম কি ছিল ? এবং তিনি অবস্থান বা কোথায় করতেন ? আর তাঁর পরিচয় বা কি ? আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি যে, নবীন সম্রাট শাহ আলম ঐ সময় আমাদের আলোচ্য বাকের জঙ্গকে (ইংরেজদের মজনু শাহ) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। উক্ত সময় থেকেই ইংরেজ ও মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক নবাবদের যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়।

নগরটি ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার কথা বলেছেন (কিন্তু আসলে এই দুর্ভেদ্য নগরটি ১৮৫৮ সালের আগে কখনও ইংরেজ কর্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয় নাই)। প্রথম সংস্করণে বীরভূমের যে নগরের নাম করা হয়েছিল সেখানে ইংরেজ বিরোধীদের আড্ডা ছিল বলা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে উত্তর বঙ্গের এই নগরকে কিন্তু বঙ্কিম ইংরেজ পক্ষীয়ের আড্ডা করেছেন, যাতে লোকের ধারণা বিভ্রান্ত হয়। ৬৯৬ পৃষ্ঠায় 'কারখানা কোথায় হইবে ?' উত্তর 'পদচিহ্নে'। এই লোহার কারখানাটি আসলে পদাগঞ্জের দক্ষিণে 'লোহার বন্দ' নামক স্থানে ছিল। এখানে বাকের জঙ্গের লোহাস্ত্র তৈরীর অন্যতম কারখানা

ছিল। ৭০০ পৃষ্ঠায় 'পরিখা' ইত্যাদি বলে যে কথাটি আছে, বাকের জঙ্গের সে পরিখাটি কাটগড়ি নামীয় কাটা খাল। শ্যামপুর (নান্দিয়ার দীঘি) থেকে শুরু করে এই পরিখা হাশিয়ার (Border) পর্যন্ত তিস্তায় গিয়ে ঠেকেছে। এর পূর্ব পার্শ্বেই ইংরেজ বিরোধীদের যত রকম যুদ্ধায়োজন ও নগর। আর উত্তর পার্শ্বে বহু বিশ্রুত 'ভীমের গড়'। এই রকম লোহার কারখানা আরো আছে। এঁদের ফুলচৌকীর নির্মীয়মান রাজধানীর পাশে যে কৃত্রিম লেকটি (সরোবর) এখনো আছে, তার এক মাইল পূর্বে লোহাকুচি নামক স্থানেও তাঁদের লৌহাস্ত্রের কারখানা ছিল। ১৭২ পৃষ্ঠায় "ভবানন্দ (ভবানী পাঠক) ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারা গিয়াছেন"। যে স্থানে মারা যাওয়ার কথা লেখা আছে, সেখানে ঐ সময়ে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয় নাই। কাপ্তেন টমাসকে ইংরেজ ভক্ত বঙ্কিম চন্দ্র কালো আদমির দ্বারা না মেরে সাদা আদমির দ্বারা মেরেছেন। কিন্তু ইতিহাস বলে যে, এই শ্বেতাঙ্গ সেনাপতিটি কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারাই সদলে নিহত হন।

মজনু শাহের মৃত্যুর পর মুসা শাহ্ নামে যে ব্যক্তি ডাকাতীর সর্দারী করে বলে ইংরেজদের ইতিহাসে আছে, সেই মুসা শাহ্ই বাকের জঙ্গ-এর প্রধান সেনাধ্যক্ষ ও বখ্শী ছিলেন। এঁর আসল নাম মুন্সী কাদের উল্যাহ্। 'প্রেমরত্নের' কবি জামালউদ্দীন লিখেছেন ঃ

পিতা মোরে প্রভু প্রেমী চিরস্থায়ী ধামে নামী
এ জীবন অস্থায়ী জানিয়া
মুন্সী কাদের উল্যা নাম বিদ্যা সিন্ধু গুণধাম
ওরফে মুহাম্মদ মুসা মিয়া।।
পিতা মোর দিন বন্ধু নগরে প্রধান
তাহার সন্তান আমি এত অপমান।।

—১২৬০ সালে ছাপা, 'প্রেমরত্ন'

ইনি তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিয়ে জারুল্যাপুর নামক স্থানে অবস্থান করতেন। সেখানে এদের বালাখানা-প্রাসাদ-দীঘি ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। বঙ্কিমের 'পদচিহ্ন' গ্রাম থেকে এ স্থান চার মাইল পূর্ব-দক্ষিণে ও 'নগর' থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। কবি জামালউদ্দীন ও বাকেরের পুত্র কামাল-জামালের বখ্শী ছিলেন। তিনিও জারুল্যাপুরে বাস করতেন।

ওহাবী জিহাদের সুবিখ্যাত পীর মুজাহিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী শহীদের প্রসিদ্ধ খলীফাদ্বয় ইনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের কবর দিনাজপুর জেলার হাবড়া থানাস্থ (বর্তমান পার্বতীপুর থানা) খলিলপুর গ্রামে। সম্ভবত এক ভাইয়ের কবর এখানে আছে। বাকের জঙ্গের লৌহাস্ত্রের কারখানার ধ্বংসাবশেষ এখানে আছে।

ভবানী পাঠকের পিতৃভূমি কামাল থানায় (বর্তমান উলিপুর থানায়) বাকের জঙ্গ ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের সময় ক্ষুধার্ত জনতার মধ্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য একটি খাল কাটিয়ে নেন। সেটাকে লোকে মোগল কাটা দ্বারা বলে। তাছাড়া একই উদ্দেশ্যে শ্যামপুর ষ্টেশন ও সদ্য পুষ্করিণীর জমিদার বাড়ীর দক্ষিণে 'বড় বাজার' (চৌদ্দ ভুবনের বিল) হতে 'আখিরা নদী' নামে একটি খাল কাটিয়ে পীরগঞ্জ থানার ধোপ নামক স্থানে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়। কুড়িগ্রাম সদর থানার অধীন 'সুবা' নামক গ্রাম; সুবাদার বাকের জঙ্গের নাম অনুসারে সুবা নামে খ্যাত। কারণ এখানে বাকের জঙ্গের প্রতিষ্ঠিত একটি কুঠি ছিল।

খলিলপুরে বাকের জঙ্গের লোহার কুঠি, নীল রেশমের কুঠি, খয়ের পুকুর বন্দর ইত্যাদি করতোয়া নদীর উপরেই। এঁদের পরাজয়ের পর এগুলো ইংরেজ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এখানকার মীর পাড়া, পাঠান পাড়া, মোল্লা পাড়া, সর্দার পাড়া, খলিফার ছাউনি, খলিফার ডেরা, সৈয়দ আহমদ বেরেলভী শহীদের খলিফার নামে এখনও মুখে মুখে পরিচিত। বাকের জঙ্গের মেয়ে লালবিবি খলিফা ভ্রাতৃদ্বয়ের খিদমতের জন্য একটি পুকুর খনন করিয়ে দেন। খলিফার ডেরার দক্ষিণ পার্শ্বের এ পুকুরের নাম হয় লালদীঘি। নবাব স্বয়ং একটি দীঘি খনন করিয়ে দেন তাঁদের বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে। উক্ত দীঘির নাম সিঙ্গার দীঘি (অন্দরমহলের বিবি সাহেবানের সিঙ্গার ও আবদাস্তের জন্য খনিত)। এখানে একটি জামে মসজিদ ছিল। সেই জামে মসজিদ এখনো ঈষৎ ভগ্নদশায় আছে। ইংরেজের কারসাজিতে তা পতিত হয়েছে। সেই মসজিদের বাইরে উত্তর দিকে খলিফা ভ্রাতৃদ্বয়ের গোপন পরামর্শের হুজরাখানা ছিল। হুজরা ও মসজিদ সিপাহী বিপ্লবের যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজরা ভেঙে ফেলে। ভগ্নাবশেষ এখনো আছে। এই ইনায়েত আলী ও বিলায়েত আলী উভয়ে পাশাপাশি অবস্থায় এখানে সমাহিত আছেন দেখান হয়। অন্ততঃ এক ভাইয়ের যে কবর আছে এতে সন্দেহ নাই বলে মনে করি। তাদের মাযারটির উপরে দুটি গম্বুজ ছিল।

মাযারের দৈর্ঘ্য ১০ হাত (কারণ উভয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছেন)। প্রস্থ ১২ হাত (অর্থাৎ ৬ হাত করে এক এক ভাইয়ের কবরের সীমা)। বাইরেও একটি পাকা কবর রয়েছে। এ কবরটি ইনায়েত আলী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র ইন্নাদ আলীর। পরবর্তীকালে যিনি মসজিদের ঈমাম ও মাযারের খিদমতগার ছিলেন বাইরে তাঁরও একটি কবর আছে। এর মাঝে দ্বিগম্বুজ বিশিষ্ট ছাদের তলায় বৃটিশ সিংহকে ঘায়েলকারী ব্যাঘ্র ভ্রাতৃদ্বয় সুষুপ্ত আছেন। পাঠানপাড়া ও মীরপাড়া নাম থাকলেও বিদ্রোহের অপরাধে সেসব ব্যাপকভাবে ইংরজেরা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। ফুলচৌকী নগর থেকে এই খলিলপুরের দূরত্ব ১২/১৩ মাইলের বেশী নয় এবং বর্তমান রংপুর জিলার সীমানা থেকে মাত্র তিন মাইল। সাদুল্লাপুর থানাধীন একটি গ্রাম দুর্গাপুর। এই গ্রামে শতাধিক পুষ্করিণী আছে। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নামানুসারে এই জনপদের নামকরণ হয়। সুবাদার বাকের জঙ্গ এই পুষ্করিণীগুলি খনন করিয়ে দেন। উক্ত দুর্গাপুরের পার্শ্বে ভগবানপুর; এই জনপদের নাম বাকের জঙ্গের টাকশালের 'কোষাধ্যক্ষ' ভগবান সিং-এর নামানুযায়ী হয়। পাশের গ্রামের নামকরণ হয় কুটিরপাড়া। ত্রিমোহনী নদীর পারে উক্ত কুটিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে ভগবান সিং ও তৎপুত্র মহেন্দ্র সিং-এর কুঠি ছিল। দুর্গাপুরের পাশে দয়ার পাড়া ও বিশ্রামপুর। রাজা দয়াশীলের নামানুযায়ী উক্ত গ্রামের নাম হয় দয়াল পাড়া। বিশ্রামপুরে এদের বাংলো ছিল। বাকের জঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র জামালউদ্দীন ও অন্যতমা কন্যা চাঁদ বিবির নামানুসারে উক্ত গ্রামগুলির নামকরণ হয় জামালপুর ও চান্দের জাঙ্গাল। উল্লিখিত স্থানগুলি দুর্গাপুরের সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত।

রংপুরের প্রজা বিদ্রোহের পর যেসব ইতিবৃত্তের উল্লেখ কোথাও সামান্য মাত্র রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, নূরউদ্দীন (Nuruddin)-কে প্রজারা নবাব বলে ঘোষণা করে। কিন্তু আবার কোথাও রয়েছে তিনি নিজেই নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। কোথাকার নবাব ঘোষণা করে তার উল্লেখ নেই। ইংরেজ বিতাড়নের জন্য এই প্রজারা তাদের সনদপ্রাপ্ত আইনসঙ্গত নবাবের সঙ্গেই যোগদান করেছিল। আর একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে, মজনু নাম কোন মুসলমানের প্রকৃত নাম হতে পারে না। 'আকীকা' দেবার সময় নিশ্চয়ই তার একটি ভাল নাম রাখা হয়। এই যে 'মজনু শাহের' নাম—এটি

পাগল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ নিজের সন্তানের আসল নাম 'পাগল' জ্ঞাপক শব্দ রাখতে পারে না। যে ব্যক্তি পশ্চিম দক্ষিণ বাংলা ব্যতীত সমগ্র বঙ্গে ও বঙ্গের বাইরে অন্য অনেক জায়গায় ঘোরতর সংগ্রাম করে ফিরেছেন বলে এখনো ইংরেজদের লেখা দলীলপত্রে পর্যন্ত উল্লিখিত আছে, সেই লোকের আসল নাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা উৎপাদনকারী ইংরেজ জাতি দু'শ বছরেও আবিষ্কার করতে পারে নি, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না। সে নামটি কি? তবে ইংরেজের পক্ষে সে নাম প্রকাশ করা অসুবিধা হলেও রংপুর দিনাজপুরের লোকেরা সেই মজনু শাহ্‌র প্রকৃত নাম ও বংশ-পরিচয় ভালভাবেই জানে। সেই নামটিই নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ বাহাদুর।

মোগল বংশের শাহজাদাদের নামের শেষে কেউ কেউ 'শাহ্' শব্দটি ব্যবহার করতেন। প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণবও তাঁর 'বিশ্বকোষে' ভবানী পাঠকের পরিচয় লিখতে গিয়ে মজনু শাহ নাম ব্যবহার করেছেন কিন্তু 'ফকির' ব্যবহার করেন নি। সেকালের প্রত্যেক কবিতার শেষে কবির নামাঙ্কিত ভণিতা থাকতো। ভণিতা ছাড়া কোন কবিতা দেখা যায় না। কিন্তু কোন এক পঞ্চানন দাসস্য-এর লেখা 'মজনুর কবিতায়' মজনু নামক দস্যুর অত্যাচার কাহিনী দেখা যায়। ইংরেজ রাজ্য বিস্তারের প্রাক্কালে দস্যু সর্দার মজনু ফকির উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে অত্যাচার আরম্ভ করে। সেই ঘটনা বিবৃত করার জন্য কবিতাটি লেখা হয়েছে। কবিতার শেষে ভণিতা নেই। তবে সর্বশেষে সন ১২২০ সালের ১১ই কার্তিক শ্রী পঞ্চানন দাসস্য লিখিত থাকায় অনুমান হয়, মজনু সর্দার উক্ত সালের সমকালে বা তার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। পঞ্চানন দাস কবিতাটির লিপিকার কি রচয়িতা তা উক্ত উক্তির দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় না (বিশ্বকোষ)। রংপুর দিনাজপুরের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে এত গড় কুঠি, ইমারত, মঠ, মন্দির ও মসজিদ ইত্যাদির ভেতরে সুবাদারের ও তার সহকারীদের এত স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে যে, সে সবের উল্লেখ কোন পুঁথি কিতাবে ঘুণাক্ষরে দেখা যায় না। এখানকার সাহিত্য পরিষদেও তার কোনরূপ নিদর্শন নেই। অথচ কোথাকার কোন এক পঞ্চানন দাসস্য ৫২ পংক্তির একটি কবিতা লিখেছেন কি না লিখেছেন, তা সযত্নে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৭ বাং সন) ৫ম বর্ষ বিশেষ সংখ্যা, শেরপুর ইতিহাস ছাপা হওয়ার দরকার পড়েছিল।

১৭৬০ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে বাংলার মাসিমপুরে মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক নবাব, বিদেশীয় ইংরেজ এবং ডেপুটি নবাব রাম নারায়ণ পরাজিত হন। এখন জিজ্ঞাস্য, যুদ্ধে জয়লাভ করার পরও বাংলার জন্য সম্রাট কি কোনো সুবাদার বা নাজিম নবাব নিযুক্ত করে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন নি? ইংরেজদের লেখার ধরন দেখে মনে হয়, সম্রাট তা করেন নি। আমাদের আলোচ্য বাকের জঙ্গ (ইংরেজদের মজনু শাহ্) সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময় হতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তর বঙ্গ বিশেষ করে রংপুরবাসীদের গণ-সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ পুনরায় এদেশে আগমন করেন ও বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শুজার সঙ্গে এক সন্ধি করেন। ঐ সময় সম্রাট শাহ্ আলম সাজী অযোধ্যার শুজা উদ্দৌলার আশ্রয়ে ছিলেন। সন্ধি শর্তে কোরা ও এলাহাবাদ জিলা দু'টি শুজার নিকট হতে নিয়ে সম্রাটকে দেয়া হলো এবং বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি দেবে প্রতিশ্রুত হয়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ ক্লাইভ লাভ করেন। ঐ সঙ্গে মাদ্রাজে উক্ত সরকারেরও সনদ ছিল। ইহা গভীরভাবে চিন্তা ও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, উত্তর মাদ্রাজের উপর তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পূর্ণ প্রভাব ছিল, তথাপি বাংলার সঙ্গে উত্তর মাদ্রাজ সরকারের সনদ ক্লাইভ নিলেন কেন? ৩০ লক্ষ টাকা শুজারই থাকবে। শুধু ৫০ লক্ষ টাকা কোম্পানীকে ক্ষতি-পূরণ বাবদ শুজাকে দিতে হবে, এই হলো বাংলার সনদ লাভের প্রকৃত ইতিহাস। কেরানী-গভর্নর ক্লাইভ ওয়াটসনের নাম জাল করে উমিচাঁদকে এক সময় প্রতারণা করেছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই উপমহাদেশে ষড়যন্ত্র ও শঠতার উপরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল।

বৃটিশের বুকে ত্রাস সঞ্চারকারী সীমান্তের মীর্জা আলী খান যেমন ইপির ফকির নামে উপমহাদেশের সর্বত্র বিদেশী সরকারের দৌলতে পরিচিত, তদ্রূপ অদৃষ্টের পরিহাস হলেও বাকের জঙ্গ মজনু শাহ ১৯২১-১৯২৩ সালের দিক থেকে ফকির বলে ইংরেজদের প্রচারে প্রচারিত ও পরিচিত।

'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডারস ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের এই বাকের জঙ্গকে ফকির করবার কায়দা নিয়ে বলা হয়েছে ভারতীয় ফকিররা নিজকে শাহ্ কিংবা রাজা মনে করে।

রংপুরের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা নাম দিয়ে কেশব লাল বসু মহাশয়

চতুর্দশ ভাগ ২য় সংখ্যা রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত অংশের অনুসরণে প্রথম ঐতিহাসিক মিঃ ভাসের নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু উদ্ধৃত করেন ঃ

> **In 1772 herds of docoits rein forced by disbanded troops from the native armies and by peasant's ruined in the famine of 1770, were plundering and burning village in bodies of 50,000.**

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেও ঐ সময়কার কথা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

> মিঃ হান্টার প্রমুখ ঐতিহাসিক ও গেজেটিয়ার লেখকগণ বিষয়টিকে যতই চাপা দিতে যত্নপর হউক না কেন, তাহাদের চাপাচাপির মধ্য দিয়েই সত্যের উজ্জ্বল বিভাস যে অনেকাংশে পরিস্ফুট হয়ে হয়ে উঠেছিল…।

তার পরে লেখা আছে ঃ

> চল্লিশ হাজার বুভুক্ষু নারী, বালক-বালিকা প্রতিদিন আগমন করিতেছে। কোম্পানী ইহাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ ৫ টাকার চাউল বিতরণের অনুমতি প্রদান করেন, পরে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দশ টাকা করা হয়।

গ্রন্থের সম্পাদক এই স্থানে যে টিপ্পনী করেছেন আমি তা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন পরিত্যাগ করতে পারলাম না। সম্পাদক লিখেছেন, "৪০ হাজার বুভুক্ষু নর-নারীর জন্য দশ টাকার অন্নের ব্যবস্থা ! কি সর্বনাশ !!" আমরা কোম্পানীর প্রতি দোষারোপ করবার হেতু দেখি না। তৎকালের দশ টাকার চাউল অধুনা একশত টাকার চাউলের অপেক্ষা যে অনেক বেশী এ কথা ভুলিলে চলিবে না ইত্যাদি। (১৩৩৫—১ম—৪র্থ সংখ্যা, রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা)।

সুধী পাঠকবৃন্দের এখন লক্ষ্য করবার বিষয়, বৃটিশ রাজভক্ত কেশব বাবুর শেষের কথা কয়টিতে আমরা কোম্পানীর প্রতি দোষারোপ করার হেতু দেখি না ইত্যাদি। ১১৭৬-এর মন্বন্তরের মত ভীষণ দুর্ভিক্ষ বাংলায় আর কখনো হয় নি বলে জানা যায়। দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ 'বাজার দর' অপেক্ষা খাদ্যদ্রব্যের (চাউল ধানের) 'বাজার দর' বেশী হওয়াই স্বাভাবিক **"Annals of Rural Bengal"**, গ্রন্থের সম্পাদক পর্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন কোম্পানীর দানশীলতার বহর দেখে; অথচ ইংরেজ রাজভক্ত কেশব বাবু চল্লিশ হাজার বুভুক্ষু জনতার পক্ষে মাত্র দশ টাকার সাহায্যকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনতার সঙ্গে ডাকাতেরা (Dacoits) এবং দেশীয় সৈন্যারা

(Native armies) ছিলেন। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনতার সহিত ডাকাত ও সৈন্য থাকবার কারণটা ছিল কি? এটি অনুসন্ধান বিশারদ কেশব বাবুর বোধগম্য হলো না কেন? তা তিনি ও তাঁর রংপুর সাহিত্য পরিষদের অন্যান্য গবেষক সঙ্গীরা না জানলেও যারা সাহিত্য পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বা সভ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন নি, রংপুরে এমন অনেক হিন্দু মুসলিম উক্ত রহস্যগুলি জানতেন এবং অনেকে জানেন। এ জন্য আমরা নিরীহ কেশব বাবুকে বা অন্য কাউকে দায়ী করি না। জানলেও নির্বাক হয়ে থাকা ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না।

'বঙ্কিম স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী' প্রবন্ধে দেবী চৌধুরাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র মহাশয় বলেন:

> বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ নিজেদের সুবিধামত এদেশের বহু ঘটনা এমনিভাবে বিকৃত করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, আজ আর তা অতি সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না, করতেও পারে না।

অনেক সত্যকে তাঁরা মিথ্যায় এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে গেছেন, যা আজ দেশীয় ঐতিহাসিকদের কৃপায় আমরা অনেকটা বুঝতে পারছি। দেবী চৌধুরাণী কি ঠিক সদ্যুই ছিলেন? লেফটেন্যান্ট মেনাষ সাহেব অবশ্য তাঁকে এই আখ্যাই দিয়েছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশ করে গেছেন, তাঁর খানিকটার বাংলা তরজমা এখানে দেওয়া গেল:

> ভবানী পাঠক নামক এক বিখ্যাত দস্যুর সহিত এই স্ত্রী লোক ডাকাত দেবী চৌধুরাণীর যোগ ছিল......।

এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, দেবী চৌধুরাণী যদি সাধারণ ডাকাতই হতো, তবে যে অঞ্চলে সে ডাকাতী করেছে সেই অঞ্চলে তাঁর এত প্রতিপত্তি থাকে কিরূপে? থাকা সম্ভবপরই বা হয় কি করে ... ?

—রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ১৩৪৬ সাল

ইংরেজ ঐতিহাসিকদের সত্য বর্জিত ও নিজেদের মনগড়া কাল্পনিক চিন্তাপ্রসূত লেখা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায়ের কোন কোন বিষয়ের মন্তব্যের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

> মীরন বিহারের শাহজাদা আলী গওহর, পরে বাদশাহ্ শাহ্ আলমের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রান্তর মধ্যে বজ্রাঘাতে নিহত হন।—মীরনের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় পুণ্যশ্লোক বৃটিশ পুঙ্গবগণ নাকি তাহাকে কৌশল পূর্বক নিহত করিয়াছিলেন। —মুতাক্ষেরিন,

Voll. 11, p-223 জাফরগঞ্জ, পৃষ্ঠা ২৪৭, মুর্শিদাবাদ কাহিনী

কেউ কেউ বলে থাকে যে, মীর্জা মেহেদীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে, তক্তা চাপিয়াই তাহাকে হত্যা করা হয়। (রিয়াজেও তাহাই আছে) (মুর্শিদাবাদ কাহিনী)।

মীর মদনের মৃত্যুর পর মোহন লালের অগ্রসর হওয়া Orme Broome, Malleson প্রমুখ প্রধান ইংরেজ ঐতিহাসিকদের গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। একমাত্র Stewert-এ উল্লিখিত হয়েছে। সায়ের মুতাক্ষেরিনে প্রথমে এই ঘটনা উল্লিখিত হয় (Mutaqherin Trans. Vol. I. P.768) স্টুয়ার্ট সেটা থেকেই তা গ্রহণ করেছেন। মোহনলালের এই অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ করতে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কি জন্য বিস্মৃত হলেন বলতে পারি না। নিখিল নাথ রায় লিখেছেন ঃ

> মুসলমানদের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া দুর্ভাগ্য। হিন্দুগণও কোন কোন স্থানে তাহাদের লেখনীর মুখে স্থান পায় নাই, এবং অনেক স্থলে কৃষ্ণ বর্ণ বলেও চিত্রিত হয়েছে। যে মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে মীর মদনের পতনের পর অদম্য উৎসাহ সহকারে ইংরাজ সেনা মথিত করবার উপক্রম করেছিলেন, অর্মে প্রভৃতির ইতিহাসে তাঁহার সেই বীরত্ব কাহিনীর কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। পরবর্তী ব্রুস, ম্যাকলিন প্রভৃতিও অর্মের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগ্যে মুতাক্ষেরিন-কার সেই প্রভুভক্ত হিন্দু বীরের শৌর্য্য-ময় বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। —মুর্শিদাবাদ কাহিনী

মুতাক্ষেরিনকারের মতে দানা শাহের প্রতি সিরাজ অত্যাচার করেছিলেন কিনা, তার স্থিরতা নেই। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ লিখলেন যে, একেবারে তার কান কেটে দেওয়া হলো। ধন্য সত্যানুসন্ধিৎসু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ। হান্টার সাহেব বলেন যে, সিরাজকে ধৃত করার জন্য দানা শাহ্ মীরজাফরের নিকট হতে জায়গীর পেয়েছিলেন, কিন্তু বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলেন যে, দানা শাহের বংশীয়েরা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, তা দিয়েছিলেন গৌড়ের প্রসিদ্ধ বাদশাহ হোসেন শাহ্। বটব্যাল মহাশয় লিখেছেন ঃ

> যে স্থানে সিরাজ-উদ্দৌলা ধৃত হন ঐ স্থান কলিন্দী তীরবর্তী, উহা তদবধি 'সুবামার' নামে বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে তাহার 'শুওর মারা' নাম দিয়াছে। হায় বিধাতা! মুর্খের জিহ্বাতে তুমি সুবা সিরাজ-দ্দৌলাকে শুকরে পরিণত করিয়াছ। —সাহিত্য, ১৩০১ মাঘ,
> 'লক্ষ্মণাবতী' প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৬৫০, মুর্শিদাবাদ কাহিনী

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ তৎকালীন ভারতের রাজধানী (পরবর্তী ১৯১১ সাল হইতে শুধু বাংলার রাজধানী) কলকাতা শহরে যে মিথ্যা অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছিল তা প্রায় পোণে দু'শ বছর পর্যন্ত উন্নত শিরে বিরাজিত ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও এতদ্দেশীয়রা অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতি মিথ্যা না সত্য, এটি পর্যন্ত অনুসন্ধান করেন নি। বরং অনেকেই ইংরেজদের অনুকরণে তা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তৎকালীন ভারতের প্রতিটি জায়গায় প্রচার তো করেছেই, এমনকি সে সময় স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকেও অন্ধকূপ হত্যা সম্বন্ধীয় মিথ্যা কথাগুলো ছেলেদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যুগের পর যুগ ধরে। পরে স্বদেশভক্ত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও অন্য কেউ কেউ তাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে প্রমাণ করেছেন, অন্ধকূপ হত্যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কাল্পনিক। এখন জিজ্ঞাস্য, সে সময় ভারতের রাজধানী (কলকাতা শহর) যেখানে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ মনীষী ও শিক্ষিতেরা অবস্থান কিম্বা গমনাগমন করতেন, তাঁরা কি ঐ মিথ্যা স্মৃতি-স্তম্ভ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করেন নি ? সে সময়ের অবস্থা এমন হলে তখনকার অখ্যাত পল্লীগ্রামে (অবশ্য ইংরেজদের চেষ্টায়) স্বাধীনতা পিপাসু সুবাদার বাকের জঙ্গ মহারাজ ভবানী পাঠক, স্বদেশপ্রাণা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী ভবানী প্রমুখের তুলনাহীন ত্যাগ ও বীরত্বকাহিনী অমানিশার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকাই স্বাভাবিক নয় কি ? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাজভক্ত জমিদাররা বিদেশীদের প্ররোচনায় নগর ও উহার পার্শ্বস্থিত সুরম্য হর্ম্যরাজি এবং সরোবর কুঠি প্রভৃতি স্থানে সযতনে শালগাছের বীজ বপন করে ও পরে তা বিরাট জঙ্গলে পরিণত হয়, যাতে করে এসব স্থান লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে।

পরবর্তীকালের আযাদী আন্দোলনের নায়কদের যেমন দেশদ্রোহী, বিদ্রোহী অথবা দুষ্কৃতকারী হিসেবে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে বা তারও চেয়ে গুরুদণ্ড দিয়েছে তেমনি সুবাদার বাকের জঙ্গ, সেনানায়ক ভবানী পাঠক প্রমুখ দেশপ্রেমিক বীরদের তারা ডাকাত দস্যু নামে পরিচিত করার চেষ্টা করেছে।

পূর্ব বর্ণিত সুবার বাড়ী গ্রাম (দুর্গ) হতে সুবাদার বাকের জঙ্গ উত্তর পশ্চিমে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত বামদেব নামক ঘাটিতে (মঞ্জিল) পাটগ্রাম যাবার মানসে আসেন। ইতিহাস বর্ণিত ইংরেজদের গুপ্তচর দূত রামকান্ত মুন্সি জমিদারীর লোভ দেখিয়ে কৌশলে দু'জন স্ত্রীলোককে সন্ন্যাসীদের

দল থেকে ভাগিয়ে নেয়। দিবা ও নিশি নামে এই দুই নারী (আমাদের জানামতে এদের প্রকৃত নাম অলকা ও পবিত্রা) প্রতারণার জাল বিস্তারপূর্বক নূরুল উদ্দীন বা নূরুল মুহাম্মদ ও রাজা দয়াশীলকে মোগলহাটে গোপনে অবস্থিত ইংরেজ সেনার কবলে ফেলে দেয়। ঐ স্থানে ম্যাগডোনাল্ডের আক্রমণে সুবে বাংলার সুবাদার নূরুদ্দীন আহত ও মন্ত্রী দয়াশীল নিহত হন। 'ঐ সময় মাত্র ৪০/৫০ জন দেহরক্ষী তাঁর সঙ্গে ছিল।' —বিশ্বকোষ

অস্ত্রাঘাতে আহত সংজ্ঞাহীন নবাবকে নিয়ে কয়েকজন দেহরক্ষী বিশ্বাসঘাতকদের কবল হতে সরে পড়েন এবং তাঁর রাজধানী 'নগরে' নিয়ে আসেন। উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পরে নিজ রাজধানীতেই সুবে বাংলার নবাব নাজিম মুহাম্মদ নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ বাহাদুর ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামদেব গ্রামের যে স্থান হতে সন্ন্যাসী দলের আশ্রিত নর্তকী নারী অলকা শঠতা ও প্রতারণাপূর্বক নবাবকে শত্রু কবলে নিয়ে যায়, সেই স্থানটি পলাশী (প্রতারণার ভূমি) নামে অভিহিত হয়ে আসছে। সে স্থানের তিনটি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, পুকুর, কুঠি প্রভৃতি আজো লোকে দেখিয়ে দেয়। দিবা ও নিশি পুরস্কারস্বরূপ কর্নওয়ালিসের নিকট হতে দুটি বৃহৎ জমিদারী লাভ করে। তদবধি অলকা ও নিশির বংশীয়রা অভিভাবক সূত্রে ঐ জমিদারী ভোগ লাভ করে আসছে। রামকান্ত মুন্সি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব বলেন ঃ

> দেবী সিংহের অত্যাচারে উত্তর বঙ্গবাসীগণ প্রপীড়িত হওয়ায় রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ প্রভৃতি জেলা নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। ঐ সকল জেলার বন্দোবস্তের জন্য রামকান্ত ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। হেস্টিংস তজ্জন্য সন্তুষ্ট হয়ে তাঁহাকে বর্তমানে নদীয়া জেলাস্থিত পরগনা তালবেড়িয়া ও বলবেড়িয়া নামক দুইখানি তালুক, একটি মুক্তাজড়িত শিরপেঁচ এবং রজত নির্মিত হীরক খচিত আধারসহ একখানি সুন্দর তরবারি খেলাত প্রদান করেন। —বিশ্বকোষ

স্থানীয় লোকেরা বলে হেস্টিংস রামকান্ত মুন্সী (মুদী নয়)-কে যে মুক্তা জড়িত শিরপেঁচ (আমামা) এবং রজত নির্মিত হীরক খচিত আধারসহ একখানি তরবারি দান করেন, সেগুলো ছিল সুবাদার নবাব বাকের জঙ্গের। মোগল হাট যুদ্ধে তিনি আহত হলে ঐগুলো ইংরেজদের হস্তগত হয়।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রামদেব গ্রাম হতে পাটগ্রাম প্রায় ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং রামদেব গ্রাম হতে মোঘলহাটের দূরত্ব প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে মোঘলহাট ও কুচবিহারের সীমানা।

সম্ভবত ১৮৭৩ অব্দে বৃটিশ-আফগান যুদ্ধের সময় সম্রাট-মহীষী লাল বিবি পিত্রালয় 'নগরে' আসেন এবং সৈন্য সংগ্রহ মানসে বৃদ্ধ সেনানায়ক মহারাজ ভবানী পাঠকসহ মীরগঞ্জ শহরে আসার কালে জনৈক অকল্যাণ্ড নামীয় সেনানায়কের অতর্কিত আক্রমণে মীরগঞ্জের ১ মাইল দক্ষিণে রাজ মহিষী ও মহারাজ ভবানী পাঠক শহীদ হন। ঐ স্থানে তাঁদের কবর ও সমাধি সৌধের ধ্বংসাবশেষ, পুকুর প্রভৃতি আছে। ঐ স্থানটিকে লোকে আজও সমর-দীঘি বলে থাকে। ঐ সময় কয়েকজন ফকির ইংরাজদের বাধা দিয়ে শহীদ হন। সেই স্থানটির নাম আজও লোকে বলে 'জিহাদ পুকুর'। প্রকাশ—বৃদ্ধা রাজমহিষী ঘোড়া হতে লুটিয়ে পড়ার সময় রক্তাক্ত দেহে দুই হাত উপরে উঠিয়ে বলেন, "হে খোদা! আমার এই মৃত্যুকে তুমি কবুল কর। আমার এই শহীদ হওয়া যেন ব্যর্থ না হয়।"

বেগম লাল বিবি ও মহারাজ ভবানী পাঠকের হত্যা করার কাজে গুপ্তচর বৃত্তি করায় ইংরাজ কোম্পানী পায়রাবন্দের টাটি শেখ ও খয়ের উদ্দীন প্রামাণিক এবং জনৈক লাহিড়ীকে ৬০ লক্ষেরও অধিক টাকার জমিদারী দান করে। তাই লোকে বলে ঃ

টাটি পাইল মাটি,
খয়ের উদ্দীন পাইল লাট,
লাহিড়ী পাইল ঠাকুর বাড়ী
তার তামশা দেখ। —গ্রাম্য গাঁথা

বঙ্কিম বাবু উপন্যাসে বলেছেন, ভবানন্দ (ভবানী পাঠক) শ্বেতাঙ্গদের সহিত যুদ্ধে মারা গেছেন ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বলেছেন, "দ্বীপান্তরিত হয়েছেন।" সম্ভবত উক্ত কথাগুলির মত বিশ্বকোষেও লিখেছেন ঃ

> শোনা যায় ইংরাজ বিচারে তিনি (পাঠক) দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠক নিহত হন।

৩—

প্রকৃতপক্ষে ভবানী পাঠক ঐ সময় নিহত হন নি। আমরা উপরে যা উল্লেখ করেছি, ঐভাবে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হয়েছে। পাঠকের পুত্র এবং পৌত্রদের বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ভবানী পাঠক
তৎপুত্র অমৃতলাল পাঠক
,, বিশ্বনাথ পাঠক
,, প্রিয়নাথ পাঠক
,, নগেন্দ্রনাথ পাঠক
,, জিতেন্দ্রনাথ পাঠক
ও } এখনও জীবিত আছেন।
ফনীন্দ্রনাথ পাঠক

পরিশেষে ভবানী পাঠক সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিশ্বকোষে যা লিখা আছে, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করলাম ঃ

> ভবানী পাঠক বরেন্দ্র ভূমিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। দস্যু সর্দার বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্র চর্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির দুঃখে কাতর হন। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও দেবী রংপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা ইতিহাসে ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাত। প্রায় ৫০ সহস্র সন্ন্যাসী অনুচরে পরিবৃত পাঠক খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিলরাশি ও তার তীরভূমি আলোড়িত করিয়া ইংরেজ হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনু শাহ্। শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শে দেবী মজনুর করাল কৃপাণের সহযোগিতা পাইয়াছিল।

বাকের জঙ্গ পরিশিষ্ট

মুতাখখারিনের ইংরাজী তরজমার দ্বিতীয় খণ্ডে রাজা রামনারায়ণ ও শাহ্ আলমের যুদ্ধ সম্পর্কে ৩৩৪—৩৪৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে সব বিস্তারিত কাহিনী আছে তার কতকটা সংক্ষেপে এইরূপ ঃ

বিহার সীমান্তে শাহজাদা (সম্রাট শাহ্‌আলম) আলী গওহর কর্তৃক যে বাংলা সুবা আক্রমণ হয়, তখন মুতাখখারিন লেখক গোলাম হুসেন ছিলেন মুর্শিদাবাদী নবাবের পক্ষে আর তাঁর পিতা সৈয়দ হিদায়েত আলী ছিলেন শাহজাদার পক্ষে।

শাহ্‌জাদার পিতা সম্রাট ২য় আলমগীর (সানী) এবং তাঁর বেগম সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল যখন প্রকৃতপক্ষে ইমাদুল মুলকের মত জীবননাশা শত্রুতার হাত থেকে শাহজাদাকে রক্ষার মানসে সৈয়দ হিদায়েত আলীকে ডেকে তাঁর হাতে সঁপে দেন, সে সময় থেকেই হিদায়েত আলী শাহ্‌জাদার শুভাকাঙ্ক্ষী। পলাশী যুদ্ধের পর দিল্লীর মোঘল রাজশক্তির সঙ্গে বাংলার যে নামেমাত্র সম্পর্কটি ছিন্ন হয়, হিদায়েত আলী মারফত তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোশেশ হয়, আর হিদায়েত আলীই যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে শাহজাদাকে বাদশাহ্‌ ২য় শাহ্‌ আলম (সানী) রূপে দিল্লীর তখ্‌তে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁকে যদি তাঁর মতো কাজ করতে দেওয়া হতো, তা হলে ইংরাজ বাংলা সুবায় এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত কি না সন্দেহ।

হিদায়েত আলীই শাহজাদাকে পূর্বাঞ্চলে তাঁর ভাগ্যান্বেষণে উদ্বুদ্ধ করেন উযীর ইমাদুল মুলকের দুশমনি থেকে দূরে। তখন বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা হয়। শাহজাদা পূর্বাঞ্চলে চলে আসেন। হিদায়েত আলীর ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন টিকরি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এক জমিদার রাজা সুন্দর সিংহ। ইনি সিরাজুদ্দৌলার অন্যায় হত্যার দাদ নেওয়ার জন্য মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিলেন। কাজেই, তিনি শাহজাদাকে এ ব্যাপারে স্বেচ্ছায় সমর্থন করে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। কাশীর বলবন্ত সিংহ ও ভোজপুরের রাজা পাহ্‌লোয়ান সিংহও শাহজাদাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা গেল।—The Calcutta Review—June 1942. Essay : Nawab Sayyid Hidayyit Ali

সিয়ারুল মুতাখখারিন ইতিহাস থেকে কয়েকটি সন তারিখ দেখে মনে হয়, শাহজাদার অভিযান শুরু হয় হিজরী ১১৭২ সনের রজব মাসে (১৭৫৯ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে) শাহজাদা দ্বিতীয়বার অভিযানে আসেন ঈসায়ী ১৭৬০ সনের ডিসেম্বর মাসে। এ বারে সোন নদীর পূর্ব পাড়ের পথে তিনি সম্রাট পিতার মৃত্যু সংবাদ পান। তখন হিদায়েত আলীকে ডেকে তাঁর পরামর্শে সম্রাট বলে ঘোষিত হন। মুতাখখারিন লিখেছেন :

“এ সময় তিনি কর্মনাশা পার হয়েছেন। জায়গার নাম কাটোলী (Catoly)। উযীর ইমাদুল মুলকের এক দোস্ত কায়দা করে সম্রাটকে এক দরবেশের কথা শুনায়। সম্রাট দরবেশকে দেখবার জন্য ফিরুযশাহ্ মাকবারায় যান; সেখানে তাঁর তলোয়ার মেহ্দী নেছার খাঁর হস্তে দিয়ে পর্দা তুলে দরবেশের ঘরে ঢোকামাত্র মেহ্দী নেছারের তুরানী আততায়ীরা সম্রাটকে বধ করে এবং দরজা খুলে পা ধরে টেনে নদীর দিকে ফেলে দেয়। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর (সানী)-এর ভাতিজা ও জামাতা মীর্জা বাবর[1] এই দৃশ্য দেখে তাঁর তলোয়ার খুলেন এবং দলের দু-একজনকে যখম করেন, কিন্তু মেহ্দী নেছারের লোক তাঁকে অচিরেই পাকড়াও করে ফেলে। তাকে তারা পাল্কিতে সলিমগড় কিল্লায় স্থানান্তরিত করে। এই কিল্লাতেই রাজ পরিবারের শাহ্জাদাদের বন্দী রাখা হতো। এখান থেকে অন্য এক শাহজাদাকে বের করে নিয়ে শাহজাহান সানী (২য়) নাম দিয়ে তারা তখ্তে বসিয়ে দেয়। অবশেষে একদল লুচ্চা (Luchcha) শ্রেণীর লোক হুমায়ুনের মাকবারায় সম্রাটকে দাফন করে। এ খবর পেয়ে আলী গওহর মুতাখখারিন-কারের পিতার উপদেশক্রমে সম্রাট হন। কামগার খাঁ এবং দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁ নামক তাঁর দুই ভাই ৬/৭ হাজার সওয়ার ও পাইক সেনা নিয়ে নয়া সম্রাটের সাহায্যে আসেন।

ইংরাজের তাঁবেদার নায়েব নওয়াব রামনারায়ণ এ সময় দেহ্বা (দেওডোবা) নদীতীরে ছাউনি পেতেছিল। সম্রাটের সঙ্গে তার এই নদীতীরে লড়াই শুরু হয়। অনেক লড়াই-এর পর ইংরাজ সৈন্যসহ রাজা রামনারায়ণ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। তবে মীর আবদুল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার পেয়ে হাওদায় পড়ে যায়। মিঃ ওয়াট্স মীর আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর পাহারায় মোতায়েন করেছিল, এর ফলে মীর আবদুল্লাহ শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। যুদ্ধজয়ের পর নয়া সম্রাট বেপরোয়া আনন্দ করবার হুকুম দিলেন। যুদ্ধে মৃত সিপাহসালার দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁকে যুদ্ধের ময়দান থেকে তুলে নিয়ে

---

[1] ফার্সী মুতাখখারিন ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদে সম্রাটের আপন ভাতিজা ও জামাতা ‘বাকেরকে’ ‘বাবরে’ রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য শাহজাদা সুবাদার বাকের মুহাম্মদকে এইভাবে ঢেকে ফেলবার এক চক্রান্ত করা হয়েছে সব সময়। পাঠক-পাঠিকাগণ ধীরে ধীরে তাহা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ফতুয়াহ্ ও বৈকুণ্ঠপুরের মাঝামাঝি স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। (**Bet wsxit Fatuah and Bycantpur**) ডক্টর ফুলটার টনের বাংলোয় রাম নারায়ণের এই পরাজয়ের খবর গেলে প্রথমে কেউ তা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু বার বার এরূপ খবর আসতে থাকে।

নয়া সম্রাট নগরে প্রবেশ করলেই মুর্শিদাবাদ তাঁর দখলে আসত, কারণ, সেখানে তেমন কোন সিপাই-লশকর ছিল না কিন্তু কামগার খাঁ আশেপাশের দেশ-গাঁ ও লুটপাট করেই সন্তুষ্ট রইল। দু-তিন দিন যাবৎ রামনারায়ণ জখম সারার কৈফিয়ত দিয়ে সম্রাটের সামনে মুর্শিদাবাদের বশ্যতাব্যঞ্জক হাজিরা দিল না। এর পরে মুর্শিদাবাদী সৈন্যসহ মীরন ও কর্নেল ক্লাইভের আগমন সংবাদ পেয়ে সম্রাট এগিয়ে গেলেন তাদের মুকাবিলা করতে। খালিকদাদ খাঁর ছেলে ফরিদ দাদ খাঁ এবং গোলাম শাহ্ লাখনুভীকে সিপাহসালার করে কামগার খাঁর বাহিনীর প্রথম কাতার তাদের অধীনে দিলেন। এ যুদ্ধেও মুর্শিদাবাদীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। কিন্তু ইংরাজের সহায়তায় অবশেষে মীরনের জয়ের সূচনা দেখা দিল। সম্রাটের সালারেরা কয়েকজন মারা গেলেন; কামগার খাঁ সম্রাটকে নিয়ে বিহারে চলে যাওয়া নিরাপদ মনে করলেন। এই বিজয়ে মীরন আনন্দ করবার হুকুম দিল।

কিন্তু বিহার থেকে দু-তিনদিন পরেই কামগার খাঁ সম্রাটসহ মুর্শিদাবাদ আক্রমণে ছুটলেন। পথে সচ্চরিত্র মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ শিউভট ও বাবুজান বিষ্ণুপুরে একত্র হয়ে সম্রাটের সাহায্যে এলেন। এই সময়ে রংপুরের ফৌজদার মীর কাশিম দামোদর নদীর তীরে সম্রাট সৈন্যের মুকাবিলার জন্য ছাউনি ফেলতে হাযির হলেন। মীরনও এসে হাযির হলো। বুড়ো নওয়াব বিপুল বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে কামগার খাঁ ভয়ে পিছিয়ে গিয়ে যেন মুর্শিদাবাদ আক্রমণে যাচ্ছেন এমনিভাবে যাত্রা করলেন। উল্লসিত মীর জাফর শাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব কাম্বু নামক একজন সচ্চরিত্র সিপাহ সালারকে গুলী করে মারলেন; কারণ তার মনে হচ্ছিল যে, সে মুর্শিদাবাদ থেকে সম্রাটকে সব খবর দেয়; সে সিরাজউদ্দৌলারও খুব বিশ্বস্ত ছিল। —সিয়ারুল মুতাখ্খারিনের ইংরাজী অনুবাদের প্রফেসার মুফাখ্খারুল ইসলামের বাংলা তরজমা

"কামগার খাঁ সম্রাটকে নিয়ে বিহারে চলে যাওয়া নিরাপদ মনে করলেন—" উদ্ধৃতির এই কথায় 'বিহারে চলে যাওয়ার' কথা হতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে,

মীর জাফর এবং ইংরাজ সমর্থক মুতাখ্খারিন নামক ইতিহাসের লেখক গোলাম হোসেন স্পষ্ট করে কিছু না বললেও উক্ত লেখা হতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বাংলার মাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল। তা না হলে বিহারে চলে যাওয়ার কথা উঠছে কেন ? অবশ্য এ না করে উপায় ছিল না। এই ভীষণ পরাজয়কে ঢাকতে গিয়ে উক্ত কারসাজি না করে উপায়ই বা কি ছিল।

> সম্রাট মসিয়ে লা-কে তার সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠান। মসিয়ে লা মুর্শিদাবাদে হাজির হয়ে দেখেন সম্রাট বর্ধমান অভিযান থেকে আসেন নাই। মুর্শিদাবাদের লোকেরা এমন অরক্ষিত অবস্থায় ছিল যে, মসিয়ে লা-র আক্রমণ ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত ছিল। কিন্তু মসিয়ে লা শহর আক্রমণ না করে বিহারে গিয়ে বারুদ তৈরীতে লেগে পড়েন। কয়েক দিনের মধ্যে কামগার খাঁ সম্রাটসহ বর্ধমান অভিযান থেকে ফিরে আসেন। এসে কয়েকটি সুখবর পান। এই সময়ই খাদিম হোসেন খাঁ সংশ্লিষ্ট হন। তিনি খবর দেন, সম্রাটের সাহায্যে অচিরেই তার লোক লশকর হাজির হবেন। এ সময়ে ছোট পার্শেলে করে শাহী খাজাঞ্চীখানার জন্যে সন্ন্যাসী ফকিরদের সূত্রে রায়দুর্লভ রামের কাছ থেকে অনেক টাকা আসে। সন্ন্যাসী ফকিরেরা এমন সব চিঠিও নিয়ে এলো যাতে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিশ্চয়তা ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মিরী সওদাগর মীর আফজলের কাছেও এ জাতীয় নীরব আদান-প্রদান পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল না। এই সওদাগর সম্রাটকে অর্থ ও খবরা-খবর দিয়ে সাহায্য করতেন।
>
> —মুতাখ্খারিন ইংরেজী অনুবাদের প্রফেসার মুফাখ্খরুল ইসলামের বাংলা অনুবাদ

উক্ত মুতাখ্খারিন ইংরাজী অনুবাদে যে, 'দেওডোবা নদীতীরে ছাউনি পেতেছিল, তা সম্পূর্ণ মজে না গেলেও একটি বড় বিল আকারে সন্নিহিত গ্রামসহ দেওডোবা নামটি এখনও অক্ষত রয়েছে। এই দেওডোবা হলো বর্তমান রংপুর কারমাইকেল কলেজ রোড থেকে সোজা তিন মাইল পশ্চিমে এবং দেওডোবা হতে ফতুয়া বা ফতেপুরের দূরত্ব হলো এক মাইলের কিছু বেশী। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর সম্ভবত এই ফতুয়ার নাম ফতেপুর হয়েছে। দেওডোবা হতে বৈকণ্ঠপুর পাঁচ মাইল পশ্চিমে হবে। যে স্থানে ডেপুটি (নায়েব) নবাব রামনারায়ণ পরাজয় স্বীকার করে ঐ স্থানটিকে বশরাজপুর বলা হয়। যে স্থানে শাহ্ আলম স্বয়ং গিয়ে লড়াই করেন, ঐ স্থানটিকে এখনও 'শাহবাজপুর' বলা হয়। উক্ত স্থান দুটি বৈকণ্ঠপুর হতে ৫/৬ মাইল

দূরে। যে স্থানে বাদশাহ্ শাহ্ আলম বাংলা ক্রোক দেন ঐ স্থানটিকে এখনও ‘কুরশাহ্’ বলা হয়। আসলে কুরশাহ্ না হয়ে কুর্কশাহ হবে। এটা পারসী ও তুর্কী শব্দ। এই ‘কুর্ক’-এর অপভ্রংশ হয়েছে ‘ক্রোক’। এর পাশেই একটি গ্রামের নাম এখনও আলমপুর বলা হয়।

সম্ভবত সেটাও শাহ্ আলমের নামে আলমপুর হয়েছে। পার্বতীপুরের দক্ষিণে ফুলবাড়ী (রেলওয়ে স্টেশন) গড় হতে এক মাইল পূর্ব দিকে ‘মির্জাপুর’। ইহার দু’মাইল দক্ষিণে ‘কুরশাখালী’। সম্রাট এ স্থানে যুদ্ধে জয়লাভের পর ‘ক্রোক’ বাতিল করেন। তাই এর নাম ‘কুরশাখালী’ হয়েছে। ফুলবাড়ীর পূর্বদক্ষিণ ঘেঁষে ‘শাহবাজপুর’। ফুলবাড়ী হতে এর দূরত্ব মাত্র দু’মাইল। এখানেও সম্রাট ইংরাজদের সাথে যুদ্ধ করেন। যে স্থানে ইংরাজরা ছাউনী ফেলেছিল ঐ স্থানটিকে আজও ‘ভালকা জয়পুর’ বলা হয়। ঐ স্থান থেকে ইংরাজদের বিতাড়িত করার দরুনই উক্ত নামকরণ করা হয়েছে। তৎকালে স্থানীয় লোকেরা ইংরাজদের ‘ভালুক’ বা ‘ভল্লুক’ বলতো। উক্ত ভালকাজয়পুরের পাশে জয়পুর নামে আর একটি গ্রাম রয়েছে। সেই জয়পুরের অর্ধ মাইল দূরে আর একটি গ্রাম রয়েছে। এখানেও সম্রাট যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন বলে ঐ নামকরণ হয়। স্থানীয় লোকেরাও একথাই বলেন। উক্ত ভালকাজয়পুরের ছ’মাইল পূর্ব-দক্ষিণে বিখ্যাত বামনগড়। এই বামনগড় সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণপন্থী ভবানী পাঠকের গড়। ইতিপূর্বে এখানে সম্রাটের ছাউনী ছিল। তার পিছনেই এই গড় তৈরী হয়েছিল। কুশারখালির পশ্চিম পাশ ঘেঁষে অর্ধ মাইল দূরে ধনতোলা নামক স্থান রয়েছে। ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয়দের ধনমাল ঐ স্থান থেকে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ঐ নামকরণ হয়। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর প্রিয় সেনাপতি ভবানী পাঠকের অধীনস্থ দুর্গ বামনগড়ের দেড় মাইল দক্ষিণে নবাবগঞ্জ। উক্ত স্থানে বৃটিশ আমলে একটি থানা স্থাপিত হয়েছে। এটা নবাব বাকের জঙ্গ-এর স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। বামন গড় থেকে তিন মাইল দূরে ‘শাহ্ আলমপুর’ নাম আজও অক্ষয় হয়ে সম্রাটের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে রয়েছে। অবশ্য মূর্খের জিহবায় আলমপুর হয়েছে ‘সালামপুর’। কিন্তু কাগজপত্রে শাহ্ আলমপুরই দেখা যায়। বামন গড় ও মশহুর মসিমপুরস্থ মোগলীগড়ের সামনা-সামনি দূরত্ব প্রায় তিনমাইল হবে। মোগলীগড় দুর্গের যে অংশে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

হয়েছে ঐ স্থানটিকে লোকে আজও 'লোহজঙ্গ' বলে থাকে। এর অর্থ যুদ্ধভূমি। বর্তমানে ঐ স্থানটিতে একটি হাট বসেছে। সেটিকে 'ছড়ানের হাট' বলা হয়। দুর্গের গড়খাই বা ছড়া-র জন্যে ছড়ানের হাট নামকরণ হয়েছে। উক্ত ছড়ানের হাটের দু'মাইল উত্তর দিকে কুরশাহ্ (কুর্কশাহ) নামে আর একটি স্থান রয়েছে। উক্ত কুরশাহ হতে এক মাইল দক্ষিণে 'ধনতলা' নামে আর একটি স্থান রয়েছে। সুবাদার নবাব বাকের মুহাম্মদ এর পুত্র কামাল উদ্দীনের কুঠিতে ধনমাল নিয়ে যাওয়া আসা করার দরুন ঐ নামকরণ হয়েছে বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। বর্তমান মসিমপুরের হাট হতে তরফ শাহ্দি [তরফ শাহদিগর]-এর দূরত্ব প্রায় দু'মাইল।

এ স্থানে বাদশাহ্ পক্ষীয়দের তরফ অবস্থিত ছিল। তরফ বাদি [তরফ বাদিগর] এইখানে মীরজাফর পক্ষীয়রা প্রথমে এসে ছাউনি ফেলে। বাদী পক্ষ মানে প্রথম মীর জাফর পক্ষীয়রাই আসে। এখনও উক্ত নামগুলি প্রচলিত রয়েছে। মসিমপুরের দু'মাইল উত্তরে অপরূপ সৌন্দর্যশালী সরোবরের উপরে মোঘল কোট (সেনানিবাস)। মোঘল কোট নামটি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। উক্ত কোটের সিকি মাইল উত্তরে রয়েছে 'আন্ধারকোঠা' (বন্দীখানা)। আন্ধার কোঠার নাম এখনও অভিহিত হয়ে আসছে। আন্ধার কোঠার অর্ধমাইল উত্তরে সুবাদার নবাব বাকের জঙ্গের অর্ধ সমাপ্ত মসজিদ প্রভৃতি। উক্ত মূল প্রাসাদের এক মাইল উত্তরে রাজা দয়াশীল (ইংরাজদের দয়াশীল)-এর কোট ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। শীল রাজার কোট ও বাড়ী এখনও লোকেরা বলে থাকে। শীল রাজার কোটের দেড় মাইল উত্তর দিকে ট্যাকানী (টাকশাল বা ধনাগার)।

'আনন্দ মঠ'-এর মধ্যে বঙ্কিম বাবু যে জমিদার মহেন্দ্র সিংহের উল্লেখ করেছেন, উক্ত মহেন্দ্র সিংহ ও তাঁর পিতা ভগবান চন্দ্র সিংহ উক্ত ধনাগারে সম্রাট শাহ্ আলম পক্ষীয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধের ভার যে পাটনার নায়েব নবাবদের উপরে ছিল, তা নিম্নোক্ত বিষয়টি হতে পরিষ্কার হয়ে পড়ে। জানকীরাম (রাজা) লিখতে গিয়ে আশুতোষ দেবের 'সরল বাংলা অভিধানে' এই লিখা আছে ঃ

> বেহার বঙ্গের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণের ভার পাটনার শাসনকর্তার উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমান রাজত্বে এতাদৃশ গুরুতর ভারও বাঙ্গালীদের উপর অর্পিত হইত।

এখন এটা পরিষ্কার হয়ে পড়বে যে, পাটনার নায়েব নবাব রাজা জানকীরামের ন্যায় রামনারায়ণ-এর উপরেও বহিঃশত্রু আক্রমণ নিবারণের ভার পড়েছিল। এ জন্যই রামনারায়ণ সম্রাট ও সম্রাট পক্ষীয়দের আক্রমণ করেন।

এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, এই রামনারায়ণও ইংরাজদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগত ক্ষমতার মোহে এরা অন্ধ হয়ে পড়েছিল। দেশের সর্বাঙ্গীন আযাদী ও সুখ-শান্তির চেয়ে এইসব আমীর ওমরাহ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা উন্মাদ, নীতিভ্রষ্ট ও আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছিল। যার ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের মনের সম্পূর্ণ গোপন আশাটি শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। এবং এঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতা অল্প দিনের মধ্যেই লোপ পায়।

'দেওডোবা' বৈকন্ঠপুর প্রভৃতি স্থান তৎকালে হিন্দু-প্রধান ছিল। সুচতুর ইংরাজরা তাই ঐ হিন্দু প্রধান অঞ্চলে নায়েব নবাব রামনারায়ণকে পাঠান। শ্যামপুর, হরিপুর, রামচন্দ্রপুর, মধুপুর, চন্দন পাট, নন্দনপুর, শ্রীরাম পুর, অযোধ্যাপুর মাধবপুর ও গোপালপুর প্রভৃতি হিন্দু-প্রধান মহল্লা ও এলাকার অধিবাসীরা রামনারায়ণকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করে। তারা ইংরাজ ও ইংরাজদের পদলেহী নবাব ও ডেপুটি নবাবের চক্রান্তে না পড়ে সম্রাট পক্ষীয়দের পক্ষে থেকে বিদেশী ও স্বদেশী দুর্বৃত্তদের রংপুরের পবিত্র ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেন। মজনু শাহ্‌ ভবানী পাঠক ও দেবী বা দেবী চৌধুরাণী, জমিদার শিবচন্দ্র রায় ও জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী এদের প্রত্যেকেই এ সময়ে একই মহৎ উদ্দেশ্যে ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। কেননা উপরোক্ত তিনজন একই সঙ্গে যে ইংরাজ কথিত ডাকাতি করেছেন, তা ইংরাজদের মিথ্যা ইতিকথায়ও পাওয়া যায়। ইংরাজদের বেতনভোগী কর্মচারী ডেপুটি বঙ্কিম চন্দ্র যে এ দেশীয় বিপ্লবীদের পরিচয় বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন তা আশুতোষ দেবের 'সরল বাংলা অভিধানের' (পৃষ্ঠা ১০৮৯) নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু থেকে পরিষ্কার হয়ে পড়ে।

> পরে দেবী বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে মহা সমারোহে একটি দরবার করিয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে ইংরাজকে ধরা দিবার নিমিত্ত বজরায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠপুরে কোন সময়ই জঙ্গল ছিল না। দেবী চৌধুরাণীকে দস্যু প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র জলপাইগুড়ি জিলাস্থ বৈকণ্ঠপুর জঙ্গলের দিকেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। জলপাইগুড়ির বৈকণ্ঠপুর জঙ্গল বলে আজো খ্যাত। বঙ্কিম বাবুর এতাদৃশ কার্যের প্রতি যে কোন স্বাদেশিকের মনে ঘৃণারই উদ্রেক করে।

জাগগানের রচয়িতা বিখ্যাত লোককবি রতিরাম দাশ তাঁর জাগগানে বলেছেন ঃ

মন্হরার কর্ত্তী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ, সকলে বাখানী।।
... ...
পীরগাছার কর্ত্তী আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনতে বৈসে একে একে সবি।।
.. ..
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও (?) শকতি কি নাই।।
মাইয়া হয়া জন্মিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ তলোয়ারে।।
করিতে হইবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নিচু।।

এই মন্হরার জমিদার হলেন দেবী চৌধুরাণী বা জয়দুর্গাদেবী চৌধুরাণী। পীরগাছা মন্হনা ও 'ইটাকুমারী' উভয় এলাকার থানা। জমিদার শিবচন্দ্র রায়-এর গ্রাম হলো 'ইটাকুমারী'। ইটাকুমারী হতে মন্হনা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছয় মাইলের মত হবে। মন্হনার জমিদার পূর্ব হতে অর্থাৎ মোঘলদের আমল হতেই জমিদার ছিলেন। এ সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় 'রঙ্গপুরের জাগগান' ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৫ সাল, রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যে আলোচনা করেছেন সে আলোচনা পড়লেই বোঝা যায়, দেবী চৌধুরাণী আর জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী একই মহিলা। পণ্ডিতরাজের জন্মভূমি হলো ঐ ইটাকুমারী গ্রামে। প্রখ্যাত শিবচন্দ্র রায় ও তর্করত্ন মহাশয়ের বাড়ীর দূরত্ব পাঁচশ' গজের বেশী হবে না। তর্করত্ন মহাশয় 'জাগগানের' আলোচনা করতে

গিয়ে অত্যাচারী দেবী সিং-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে প্রজারা যে 'নূরুল-উদ্দীন'কে নবাব পদে বরণ করেছেন, এ কোটেশনটিও সম্ভবত বিশ্বকোষের দেবী সিং হতে তিনি নিয়েছেন। যাই হোক, শিবচন্দ্র রায় ও দেবী চৌধুরাণী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তর্করত্ন মহাশয় 'নূরুল-উদ্দীন' সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত শিবচন্দ্র ও জয়দুর্গা দেবীর সহিত মিলিতভাবে 'নূরুল-উদ্দীন' সংগ্রাম করেছেন। অবশ্য নূরুল-উদ্দীন (বাকের মুহাম্মদ) ইংরাজদের মজনু শাহ্ এ তিনটি নাম একই ব্যক্তির। সুচতুর ইংরাজদের এ-শিয়ালের কুমির-ছানা দেখানোর ন্যায় কৌশল মাত্র। যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখেছেন, নূরুল-উদ্দীন, বিশ্বকোষে লেখা আছে 'নূরুল মুহাম্মদ'। তবে কুচবিহারের ইতিহাস লেখক আমানতুল্যাহ্ চৌধুরী সাহেব যে 'নূরউদ্দীন'-এর কথা উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও আংশিক ঠিক। প্রজাদের নির্বাচিত নবাব বলে ঘোষিত নবাবের আসল নামটি হবে সুবাদার নবাব নূরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জং বাহাদুর।

এই যে নবাব নূরুল-উদ্দীন বা নূরুল মুহাম্মদ নূরউদ্দীন, ইনি কোথাকার নবাব? ইংরাজরা এক-দেড়টা পরগনার জমিদারী দিয়েও নবাব খেতাব অনেককে দিয়েছেন। এমনকি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেক্টরকে পর্যন্ত নবাব খেতাব দিয়ে বসেছেন।

এ-তো সেরকম নবাব নয় এবং সে সময় নবাব হতে গেলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বা অযোধ্যার নবাব হতে হতো। ইতিহাসে ডেপুটি নবাব বলেও উল্লেখ নেই। সুতরাং এ নবাব যে সম্রাটের প্রতিনিধি হবে এতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আসল নবাব মানে নায়েব, আরবী নায়েবের অন্যতম রূপ হলো নওয়াব। কার নায়েব? দিল্লী মসনদের মালিক সম্রাট শাহ্ আলমের, না ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর? মীর জাফর, মীর কাসিম হলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়েব। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পূর্বের প্রভুও ঐ সময়কার কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র (আলী গওহর) সম্রাট পদে বরিত শাহ আলম সানীর প্রতিনিধি বাংলা-বিহার উড়িষ্যার কোথায় তিনি ছিলেন? স্বাধীন নবাব বলে যে কথাটি প্রচলিত তা ঐতিহাসিক সত্য নয়! 'স্বাধীন নবাব' কথাটি নাট্যকারদের লেখা। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন মিল নেই।

নবাব কোনদিন স্বাধীন হয় না; তিনি যাঁকে উপরস্থ মানেন তারই নবাব (নায়েব) তিনি থাকেন।

“শাহ্ আলম এলাহাবাদ হতে বিহার প্রদেশে যেয়ে অবস্থান করছিলেন। তৎকালে তাঁর পিতা শত্রু কর্তৃক নিহত হন। শাহ্‌আলম এই সংবাদ পেয়ে অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে পিতৃ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৫৯ খৃস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তিনি দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

১৭৬৪ খৃস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে শাহ্ আলমের প্রধান উযীর শুজাউদ্দৌলা পরাস্ত হয়ে পলায়ন করেন। শাহ্ আলম নিরুপায় হয়ে ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করেন। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ১২ই আগস্ট আজীমাবাদে এসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বঙ্গদেশের দেওয়ানী ভার প্রদান করে এক সনদ লিখে দেন ঃ

> শাহ্ আলম নামমাত্র সম্রাট ছিলেন। তিনি জেনারেল স্মিথের কর ধুর্ত পুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। জেনারেল স্মিথই প্রকৃতপক্ষে শাসনকর্তা ছিলেন।......ইত্যাদি। —বিশ্বকোষ

> ২রা আগস্ট ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে মীর কাসিমের বিপুল বাহিনী ইংরাজদলের নয়ন পথে পতিত হইল। ‘সুতীর সুরক্ষিত গড়খাতের মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া গিরিয়ার সম্মুখে ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে নবাব সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। ইংরাজ সৈন্য বাঁশলুই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিলে, বাঁশলুই ও ভাগিরথীর মধ্যবর্তী স্থানে বিপক্ষের বিনাশ সাধন নবাব মীর কাসিমের উদ্দেশ্য ছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরাজের জয় হইল। —বিশ্বকোষ

১৭৫৯-এর শেষের দিকে যুবরাজ শাহ্-আলম বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার নবাব থাকাকালীন পাটনার নিকটবর্তী স্থানে ইংরাজ, রাম নারায়ণ ও মীরজাফরের পুত্র মীরনের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। যা হোক আসলে কিন্তু ঐ সময়েই মীরন নানা উপঢৌকন দিয়ে আলী গওহরের মনস্তুষ্টি করবার ইচ্ছা করায় মীরন তার শিবিরে আকস্মিকভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এই হত্যা যে ইংরাজরা করে তা ইতিহাস পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝতে পেরেছেন।

মীরন কোম্পানীর নায়েবী বা অধীনতা হতে মুক্ত হয়ে দিল্লীর সম্রাটের নায়েব বা অনুগত হতে চাওয়ায় ইংরাজ চক্রান্ত করে তাঁকে হত্যা করে ও রটিয়ে দিতে চায় যে, সিরাজের আত্মীয়রা মীরনকে অভিসম্পাত দিয়েছিল—'মীরন যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরে'—তাই ঐভাবে মীরনের মৃত্যু হয়েছে।

১৭৬৩ খৃস্টাব্দের ২রা আগস্ট মীর কাসিম পরাজিত হন। শাহ্ আলম ঐ সময় দিল্লীর বাদশাহ্। অযোধ্যা প্রদেশের সুবাদার নবাব শুজাউদ্দৌলা ছিল শাহ্ আলমের প্রধান মন্ত্রী। শুজার আশ্রয়ে মীর কাসিম আসলেন। ১৭৬১ খৃস্টাব্দে শাহ্ আলম মেজর কার্নাক কর্তৃক বন্দী হন। আবার ঐ সালেই মারাঠা বীর মাধোজী সিন্ধিয়া কর্তৃক মুক্ত হয়ে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

সুতরাং ইংরাজদের কর্তৃত্ব হতে ঐ সনেই শাহ্ আলম মুক্ত হন। এখন কথা হলো, ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী রংপুরের মসিমপুরে রামনারায়ণের সহিত সম্রাটের যুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে রামনারায়ণ পরাজিত হয়। ১৭৫৯ খৃস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর দিল্লীতে গিয়ে সিংহাসনে শাহ্ আলম অধিষ্ঠিত হন এবং ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী এই একমাস চৌদ্দ দিনের মধ্যে আলী গওহর সম্রাট শাহ্ আলম সানী দিল্লী হতে সুদূর বঙ্গের উত্তর প্রান্ত রংপুরে এসে যুদ্ধ করতে পারলেন, অথচ সম্রাট বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করতে পারলেন না?' এও কি বিশ্বাসযোগ্য? সম্রাটের সুবাদার নিযুক্ত করা ও সুবাদার হওয়ার মত আকাঙ্ক্ষিত লোক কি একটিও ছিল না? না থাকলেই কি বাংলা বিহারের সুবাদারী পদে কাউকেও রাখিতে নাই? না রাখিলে কি চলে?

১৭৬৩ সালের ২রা আগস্ট মীর কাসিম পরাজিত হন এবং শুজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখন কথা হলো, ১৭৫৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর হতে ১৭৬৩ সালের ২রা আগস্ট প্রায় তিন বছর ৭ মাস ৮ দিন এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কি সম্রাট সুবে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন নি? এও কি বিশ্বাস করতে হবে? ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে মীর কাসিম, শুজাউদ্দৌলা এবং শাহ্ আলম যুদ্ধে পরাস্ত হন। ১৭৬৩-এর ২রা আগস্ট যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে মীর কাসিম আশ্রয় নিলেন শুজার নিকটে। সম্ভবত ১৭৬৪-র ২৩শে অক্টোবরের পূর্বে

কোন এক সময়ে শুজার প্ররোচনা ও চাপে শাহ্ আলম মীর কাসিমকে সুবে-বাংলার নবাবী সনদ দান করেন। এটা কোন্ সালে ও কোন্ তারিখে দান করেছিলেন তা আমরা অবগত নই। যা হোক, ১৭৬৪ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সুবে-বাংলার কোন সনদী নবাব ছিল না। এটা কি করে বিশ্বাস করা যায়? এ যেমন বিস্ময়কর, তেমনি অত্যাশ্চর্যও বটে। অথচ, সম্রাট ও তৎপক্ষীয় লোকেরা ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয়দের নাম শুনে ভয়ে ঘরের কোণে বসে ছিলেন! এতদ্সম্পর্কে ইতিহাস একেবারেই নীরব।

অথচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নায়েব (নবাব) ১৭৫৭-র-২৩শে জুন থেকে মীরজাফর, মীর কাসিম, আবার মীরজাফর, মীরজাফরের অন্যতমা নর্তকী পত্নী মনি বেগমের দুই পুত্র নজমউদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃস্টাব্দ হতে ১৭৬৬ পর্যন্ত ও দ্বিতীয় পুত্র সৈফউদ্দৌলা ১৭৬৬ হতে ১৭৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত নবাব হিসেবে এঁরা উভয়েই বালক ছিল বলে মনি বেগম অভিভাবিকা স্বরূপ রাজকার্য করিতেন। মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক উদ্দৌলা পর্যন্ত ইংরাজদের খেলার গুটির মত নবাব ছিল। অথচ যাঁরা শত বছর বাদশাহী ও নবাবী করে এসেছেন, সেই দিল্লীর বাদশাহ্গণ বাংলার জন্য নবাব করলেন না কেন? সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে বেনিয়া ইংরাজ নবাব নির্বাচিত করল একটার পর একটা সুবে বাংলার জন্য; অথচ অপরপক্ষে সম্রাট পক্ষ নবাবই নিয়োগ করলেন না। এ কি করে বিশ্বাস করব?

ইংরাজ পক্ষ মসিমপুরের যুদ্ধের কথা গোপন করে কেন? কেনই বা গোপন করে বাকের জঙ্গের সুবাদারীর কথা? রংপুর ও এর চতুষ্পার্শ্বস্থিত জেলাগুলোর বিদ্রোহীদের কথা কি কারণেই বা গোপন করে? বাকের জঙ্গের পুত্র-পৌত্র আত্মীয়দের মুজাহিদ ওহাবী আন্দোলন বা সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণের কথা গোপন করে কেন? অন্যে যা-ই কিছু মনে করুক, আমি বলব, ইংরাজরা অত্যন্ত ধূর্ত, কৌশলী ও বাস্তববাদী ছিল। তারা জানতো বাকের জঙ্গ দিল্লীর শেষ নিবু নিবু বাতির উজ্জ্বল আলোক।

বাকের জঙ্গ প্রথম থেকে হিন্দু-মুসলিম, ফকির-সন্ন্যাসী, জমিদার-প্রজা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একক বিদেশী লুণ্ঠনকারী দস্যু ইংরাজ

বিবেকহীন ও মনুষ্যত্ব-বিসর্জনকারী এদেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের হস্ত ও চক্রান্ত হতে এদেশীদেরকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং সে জন্য তিনি তাঁর জীবনপাত পর্যন্ত করেছেন। যদিও তিনি দেশকে বিদেশীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেন নি; কিন্তু তাঁর মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তরসূরিরা প্রায় দু'শ' বছর পর ইংরাজদের কবল থেকে এদেশকে মুক্ত করেছেন। এ জয় নবাব বাকের জঙ্গ ও তদীয় সঙ্গী-সাথীদেরই জয় বলতে হবে।

আমাদের এটা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ইংরাজরা এদেশবাসীকে প্রকৃত মানুষ করতে কিম্বা এদেশকে সমৃদ্ধিশালী করতে আসেনি, এসেছিল লুণ্ঠন, দস্যুতা ও মনুষ্যত্ব হরণ করতে। যে কৌশলের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্য দাঁড়িয়েছিল, কৌশলটি হলো আমিত্ব বিসর্জনকারী একজন বিবেক-বিবেচনাবর্জিত চাকর, চটকদার গালভরা নাম রাজা, নবাব, মহারাজ, মহারাজাধিরাজ, খান, মহোগ্র প্রতাপ জমিদার, মালিক ইত্যাদি উপাধিশালী সমর্থকদের। তা ইংরাজরা পেয়েছিল। এ সব ইংরাজানুগত মনুষ্যরূপী জীবগুলিই এদেশের সর্ববিধ অমঙ্গলের কারণ। এই দেশদ্রোহীরা ইংরাজদেরকে খুশী করতে গিয়ে দেশের যে কি অপরিমেয় ক্ষতি করেছে তা কারো অজানা নেই। ইংরাজরা সব থেকে ভয় করতো জাতীয়তাবাদকে। হিন্দু মুসলিম এক জাতি হয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। তাই তারা বাকের জঙ্গ ও তদবংশীয় বা তাঁর বন্ধুদেরকে গোপন করে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইতিহাস চিরদিন সত্যকেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে; আর মিথ্যাকে আঁধারে নিক্ষেপ করেছে।

এ প্রসঙ্গে এও বলতে চাই যে, যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় তা বিজ্ঞান-সম্মত। দস্যু ইংরাজরা আমাদের বিপ্লবী নায়ক নায়িকাদের সম্বন্ধে কিছুই লেখেনি বলা চলে; তবু আমরা যুক্তি, তত্ত্ব ও তথ্য এবং দৃষ্টান্ত দিয়ে আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি প্রমাণ করছি। পুরানো বই কিতাব ও ফাইল ঘেঁটে যা প্রমাণ করা হয়, তাকে যাই বলা হোক, গবেষণা (রিসার্চ) বলা চলে না, বিশেষ করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের লেখার উপর প্রত্যয় করে গবেষণা করা হলে তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়ার আশংকাই অধিক।

প্রায় দু'শ' বছরের বিজয়ী ও দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ইংরাজরা 'মজনু' শাহর আসল নামটি পর্যন্ত বের করতে পারেনি, এটা কি করে বিশ্বাস

করা যায় ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ নবাব বাকের জঙ্গ ভবানী পাঠক প্রমুখের কার্যাদি নিয়ে 'অগ্নিগিরি' নাম দিয়ে যে নাটক লিখেছেন তাঁর নির্বাচিত নামটির মধ্যে বহু কিছু বিষয় ভাববার ও চিন্তা করবার রয়েছে। রঙ্গপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন কারমাইকেল কলেজের অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক সাহেবান বাকের জঙ্গ তদ্বংশীয় তদ্বন্ধুদের অনেকগুলি কীর্তি সম্বলিত স্থান পরিদর্শন করেন, তাঁরা বাকের জঙ্গ যে সুবাদার ছিলেন, এ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হন।

ইংরাজ আমলে আমাদের স্বাধীন মত বলতে কিছুই ছিল না। তা আমরা দেশ বিভাগের অনেক পূর্ব হতে স্থানীয় ইংরাজ সামরিক অফিসার লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান যা বলেছে তার কিছুটা এ স্থানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো ঃ

> ভবানী পাঠক নামে এক বিখ্যাত দস্যুর সহিত এই স্ত্রীলোক ডাকাত দেবী চৌধুরাণীর যোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণীর নৌকাতেই থাকত তার বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ (সিপাহী) এবং এতদস্থলে তার প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল খুব বেশী। দেবী চৌধুরাণী নিজেও ডাকাতি করত। ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিরও ভাগ পেত। চৌধুরাণী উপাধি থেকে মনে হয় দেবী চৌধুরাণী হয়তো জমিদার ছিল। তবে তার জমিদারী বৃহৎ ছিল না। কেননা তা হলে ধরা পড়ার ভয়ে সে নৌকাতে নৌকাতে থাকবে কেন ?

বঙ্কিম স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি
অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা
২০শ-ভাগ, ২য় সংখ্যা
—১৩৪৬ সাল, ৬২ পৃষ্ঠা

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর উক্ত বঙ্কিম স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রবন্ধে বলেন ঃ

> এখানে জিজ্ঞাস্য এই, দেবী চৌধুরাণী যদি সাধারণ ডাকাতই হতো, তবে যে অঞ্চলে সে ডাকাতি করেছে, সেই অঞ্চলে তার এত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে কিরূপে এবং থাকা সম্ভবপরই বা হয় কি করে ?

ইংরাজ কর্মচারী ব্রেনানের জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর আসল নাম না দিয়ে শুধু দেবী চৌধুরাণী বলবার হেতু বা কারণটা কি ? ব্রেনান না

বললেও আমরা জানি সাম্রাজ্য রক্ষা করবার মতলবেই জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নাম বেমালুম গোপন করে গেছে।

সুবাদার নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ ও অধঃস্তন তদ্‌বংশীয়দের নাম মসিমপুরের যুদ্ধ প্রভৃতির বেলায় যদ্রূপ গোপন করা হয়েছে, তদ্রূপই জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর নামও গোপন করা হয়েছে ঠিক একই উদ্দেশ্যে।

উল্লেখ্য, বামনডাঙ্গা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন। সেই পরিবারের পবিত্রা দেবী নামে এক মেয়ে ছিল। এই পবিত্রাকেই কর্ণওয়ালিস অথবা তার কিছু পূর্বে হেস্টিংসের সময়ে বামনডাঙ্গা পরগনার জমিদারী দেওয়া হয়। এর পূর্বে প্রফুল্লের (অর্থাৎ চৌধুরাণীর) সেবিকারূপে বঙ্কিম ব্রাহ্মণীর (নিশির) কথা উল্লেখ করেছেন বলে কেশব লাল বাবু প্রফুল্লকে পবিত্রা নামে প্রচার করতে সাহস পাননি। বঙ্কিমচন্দ্র তার 'দেবী চৌধুরাণী'র মধ্যে আর একজন সেবিকার নাম 'দিবা' বলে উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে যে 'নিশি'কে প্রফুল্লের সেবিকা বা বান্ধবী বলে উল্লেখ করেছেন—তার প্রকৃত নাম পবিত্রা, এ কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এর জন্ম বামনডাঙ্গা গ্রামে। হেস্টিংস একে বড় জমিদারী দিয়ে দেয়। এই পবিত্রার ভাইয়েরা পরবর্তীকালে এই জমিদারীর মালিক হন। আর দিবার আসল নাম হলো—অলকা দেবী। এ হচ্ছে কাকিনার (১১৭৬-এর মন্বন্তরের সময়) কায়স্থ রমণী। তার সম্বন্ধে লোকে ছড়া বেধেছিল।

অলকা নটির কপাল ভাল
হাত্তিত চড়ি' রঙ্গপুর গেল।

উল্লেখযোগ্য যে, বামনডাঙ্গা গ্রামে ইংরাজ-বিরোধী সন্ন্যাসীদের মঠ ও সৈন্য থাকবার দুর্গ ছিল এবং এখনও তার অনেক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের মূল আখড়া ছিল নগরে-র পশ্চিম পাশে সাহাগঞ্জে (সাহেবগঞ্জে)। পূর্বে এ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেও এখানে বিশদভাবে বলছি। বামনডাঙ্গা গ্রামে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার নাম হলো পবিত্রা। এই পবিত্রাকে ইংরাজ-বিরোধী সন্ন্যাসীরা যেভাবেই হোক নিয়ে গিয়ে তাদের নিকট রাখেন এবং কাকিনার জমিদার-স্ত্রী অলকাকেও ঐ সন্ন্যাসীরা তাদের আশ্রয়ে রাখেন। উভয়কেই ইংরাজ তাঁবেদাররা গোপনে হাত করেছিলেন। যখন ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরাজ ও কুচবিহারের রাজার সহিত লড়াই করতে

পাটগ্রামে যায়, তখন ইংরাজ গুপ্তচর রামকান্ত মুন্সী জমিদারীর লোভ দেখিয়ে পবিত্রা ও অলকার সাথে গোপনে পরামর্শ করে এবং যখন নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ বাহাদুর 'সুবার কোর্ট' হতে পাটগ্রাম যাবার মানসে কাকিনার দেড় ক্রোশ পূর্বে পলাশী নামক গ্রামে নবাব-নির্মিত সজ্জিত কুঠির সম্মুখীন হন, ঐ সময় নবাবের সাথে মাত্র ৫০ জন দেহরক্ষী ও মন্ত্রী রাজা দয়াশীল ছিলেন। উক্ত অলকা ও পবিত্রা সন্ন্যাসীদের পাঞ্জা দেখিয়ে নবাবকে ভুল পথে চালিত করে এবং আদিত-মারীর দিকে ঠেলে দেয়। নবাব ঐ পথে গিয়েই ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ম্যাকডোনাল্ডের সৈন্য-চক্রের মধ্যে পড়ে যান। তখন স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে নবাব গুরুতরভাবে আহত ও রাজা দয়াশীল হত হন। স্থানীয় লোকেরা এবং আমরাও মনে করি যে, শাহজাদা নবাবকে আদিত মারী (আদতমারী)-তে গুরুতররূপে আহত করা হয়। পরে তাঁর দেহ-রক্ষীরা নবাবকে ফুলচৌকি নগরে নিয়ে আসেন এবং অল্প কয়েক দিন পরে নবাব নগরেই (ফুলচৌকিতে) ইন্তিকাল করেন। যাহোক, ঐ সময়ের পর হতে পবিত্রা জমিদার হয় এবং পবিত্রার মৃত্যুর পর তার ভাইয়েরা ঐ জমিদারীর মালিক হয়ে পুরুষানুক্রমে ঐ জমিদারী ভোগ করতে থাকে। এর কোন ছেলে পেলে ছিল না। অলকানন্দার পোষ্য পরবর্তী কালে কাকিনার জমিদার বলে পরিচিত। 'পবিত্রা' অর্থাৎ 'নিশি' ছিল ব্রাহ্মণী ও অলকানন্দা অর্থাৎ 'দিবা' ছিল কায়স্থ। অলকানন্দার স্বামী-শ্বশুর এরা আগে হতেই ছোট-খাটো জমিদার ছিলেন বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। গ্রন্থের কিছু কিছু অংশের টিপ্পনী লিখে আমরা পাঠকের কাছে হাযির করে দিলাম। উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় বঙ্কিম বাবু লিখেছেন, 'প্রফুল্ল স্পন্দনহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল।'

আসলে প্রফুল্লের নামই জয়দুর্গা—তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। জয়দুর্গা আসল নামটি না দিয়ে বঙ্কিম বাবু গ্রামের নাম দুর্গাপুর দিয়েছেন।

> সুন্দরী (অর্থাৎ নিশি) জ্ঞান হইবার আগে হইতে বাপ-মার কাছ ছাড়া। ... ... ছেলেবেলায় আমায় ছেলে-ধরায় চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। (৫২ পৃঃ)

এ ছেলে-ধরা আর কেউ না, সন্ন্যাসীরা।

> ও বামুনির মনটা বড় কুৎসিত। (৫২ পৃঃ)

আমি বামুনের মেয়ে, এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামুনি নই। (৫২ পৃঃ)

যাঁরা বঙ্কিমের গ্রন্থ কোন দিন পড়েন নাই, সেই সুপ্রাচীন অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত বৃদ্ধেরা বলেন, পবিত্রার বিয়ে হয় নাই। তার ভাইয়েরা ইংরাজ-দত্ত সম্পত্তি পায়।

"নিশি ঠাকুরাণী রাজার ঘরে থাকিয়া পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।" (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ৫৯ পৃঃ)

ভবানী ঠাকুর মানে ভবানী পাঠক। ইনিও রাজাই ছিলেন। 'ফুল খাঁ চাকলার ইনি জমিদার এবং যে সন্ন্যাসীরা নিশিকে নিয়ে যায়, তাঁরাও জমিদার ছিলেন।

ভবানী পাঠক মোটেই সন্ন্যাসী ছিলেন না। ইংরাজকে তাড়াবার প্রতিজ্ঞায় তিনি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন বলে মনে হয়। তাই ইংরাজরা অনেক সন্ন্যাসীকে ভন্ড সন্ন্যাসী বলে ইতিহাসে উল্লেখ করেছে।

"প্রফুল্লকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে নিশি, ছেলে-ধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক-বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না। তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল।" (৬২ পৃঃ)

উক্ত স্থানে বঙ্কিম বাবু তারকা চিহ্ন দিয়ে লিখেছেনঃ একথা ওয়ারেন হেস্টিংস নিজে লিখেছেন, সন্ন্যাসীরা বলিষ্ঠ ছেলে নিয়ে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়ে চুরি, ডাকাতি করাতেন।

এ কথা ঠিক নয়, সন্ন্যাসীরা তাদের দিয়ে ইংরাজদের এ দেশ ছাড়া করবার মরণপণ সংগ্রাম করতেন।

ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন যে, দেবী সিং আর হররাম ও দেবী সিং-এর প্রভু হেস্টিংস প্রমুখ রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে জনগণের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার চালিয়েছে। যদ্দরুন হেস্টিংস ও দেবী সিংকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কোম্পানীর সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গিয়ে হেস্টিংস বেঁচে যায়। ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ দেবীসিং-এর বিরুদ্ধে এমন প্রবল আকারে প্রপাগান্ডা চালায় যে, হেস্টিংস-এর নিপীড়নের ইতিহাস চাপা পড়ে তার পরিবর্তে দেবীসিং ও হররাম প্রধান অত্যাচারী বলে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে স্বদেশীয়রা যে ঐ সময়টিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাল, তাও প্রপাগান্ডার ধূম্রজালে একরূপ অদৃশ্য হয়ে গেল। উল্লেখযোগ্য,

বিপ্লবীগণ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর যে অতুলনীয় ত্যাগ, দুঃখ বরণ ও জীবনপাত করেছেন, সে-জাতীয় দৃষ্টিকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কথাগুলো বলেছি ঃ “ভারতবর্ষে ডাকাইত শাসন করিতে মারকুইস অব হেস্টিংসকে যত বড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পাঞ্জাবের লড়াই-এর পূর্বে আর কখনো তত করিতে হয় নাই।” উত্তর বাংলায় হেস্টিংস প্রমুখ যে দীর্ঘ বৎসর বাধার সম্মুখীন হয়, অতবড় ও দীর্ঘ স্থায়ী বাধা ইংরাজ আর কোথাও পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দেবী চৌধুরাণীতে লিখেছেন ঃ

> সোমবারের প্রাতঃসূর্য প্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রাণীর ‘দরবার’ বা ‘এজলাস’। সে এজলাসে কোন মামলা মোকদ্দমা হইত না; রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।
>
> নিবিড় জঙ্গল, কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে কিন্তু বড় গাছ কাটা হয় নাই, তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। জমি খণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে। তাহারই মাঝখানে দেবীরাণীর এজলাস। একটা বড় সামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙ্গানো হইয়াছে। তার নীচে বড় বড় মোটা রূপার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদোয়া টাঙ্গানো। তাতে মতির ঝালর। তাহার উপর চন্দন কাষ্ঠের বেদী। বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোট রকম রূপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ পাতা, তাহাতেও মতির ঝালর·········ইত্যাদি।।”
>
> —দেবী চৌধুরাণী ঃ ১১১—১১২ পৃঃ

জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর জমিদারী খুব বড় ছিল না। তা আমরা ইংরেজ লেফটেন্যাণ্ট ব্রেনান-এর লেখা হতে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

“দেবী চৌধুরাণীর হয়তো জমিদারী ছিল, তবে তার জমিদারী বৃহৎ ছিল না।” দেবী চৌধুরাণীর বংশের লোকদের নিকট হতে জানা যায় যে, দেবী চৌধুরাণী ও তার স্বামী নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর জমিদারীর আয় ১ লাখ টাকার অধিক ছিল। দেবী চৌধুরাণী এরূপ শান-শওকতের মধ্যে বিচার করেন নি; যিনি ঐ ভাবে বিচার করেছেন, তার নাম বঙ্কিম না দিলেও আমরা দিচ্ছি। যার এজলাসে এসে বিচার করবার কথা বঙ্কিম বলেছেন, তার নাম হলো কামাল উদ্দীন। বঙ্কিম যেমন সোমবারে

বিচারের কথা বলেছেন, তদ্রূপ জহুর উদ্দীন ফকিরও কামালের সোমবারে ও বৃহস্পতিবারে বিচারের কথা ছড়াগানে উল্লেখ করেছেন ঃ

সোমবারে বেসদবারে কাচারিতে বসিয়া,
বিচার করে লোকজন নিয়া।
আসামী ফৈরাদীর জবানবন্দী নেয় হাসিয়া হাসিয়া,
সাক্ষী প্রমাণে যদি দোষে যেই হয়
দরবারের লোক নিয়া তাকে সেই শাস্তি দেয়।

ফুলচৌকি নগরে বিচার ও সরকার হওয়া সম্বন্ধে পায়রাবন্দের জমিদার টাটি শেখ চৌধুরীর পৌত্র ও আবু আলী চৌধুরীর পুত্র মোহাম্মদ মছিহুজ্জামান আবুল ওছামা ছাবের চৌধুরী তার জবানবন্দীর এক স্থানে বলেন ঃ

বাবাজানের ও লোকের মুখে শুনিয়াছি, ফুলচৌকিতে পূর্বে সরকার ছিল, জমিদার বরদা সুন্দরী ও প্রজা সানজুয়া প্রামাণিকের সহিত কাঁঠাল গাছ উঠান লইয়া মামলা হয় ফুলচৌকিতে।

ঐ মামলায় সানজুয়া প্রামাণিক কাঁঠাল গাছ পায় এবং সানজুয়া প্রামাণিক ঐ কাঁঠাল গাছের তক্তায় মাইপোষ তৈরী করে। সেই মাইপোষ আমার শ্যালক আবদুল ওয়াহেদের নিকট এখনো আছে। আমার বাড়ীর কাছে আবদুল ওয়াহেদ মিঞার বাড়ী। [তাং—৮-১১-৫৮]

"বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে দেবী চৌধুরাণীর ডাকাইতের দল জমায়েত বদ্ধ হইয়াছে।" [১১৩ পৃঃ]

এই 'বৈকুণ্ঠপুর' বঙ্কিম বাবু মহাশয় কোথায় বলতে চেয়েছেন? একি রংপুর শহরের আট মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বৈকুণ্ঠপুর? না, জলপাইগুড়ির নিবিড় অরণ্য বৈকুণ্ঠপুর? বিখ্যাত রায় পরিবারের বাড়ীর জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের নিবিড় জঙ্গল মেরে এখন চা বাগান করা হয়েছে। যখন জঙ্গলের মধ্যে বলা হয়েছে, তখন জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরই হবে। নায়েব-নবাব রাম নারায়ণ যে বৈকুণ্ঠপুর ও দেওডোবা প্রভৃতি স্থানে থেকে সম্রাট শাহ্ আলম ও তাঁর নিযুক্ত সুবাদার নবাব নুর উদ্দীন বাকের মুহাম্মদ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন সে-বৈকুণ্ঠপুরে কিন্তু জঙ্গল নেই। সেখানে এখন লোকালয় হয়েছে। ইংরেজ কর্তৃক বাকের জঙ্গ, ভবানী পাঠক, জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখের কাজ-কারবার গোপন করার

জন্য এইভাবে হয়তো লেখা হয়েছে। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তা নিপুণ হস্তে সমাধা করেছেন এবং পুরস্কারস্বরূপ রায় বাহাদুর প্রভৃতি খেতাব পেয়েছেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, 'আনন্দ মঠের' প্রথম সংস্করণে বিদ্রোহীদের স্থান বঙ্কিম বাবু নগর বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে আর তা বলেন নি। মিঃ হাণ্টার, ফুলচৌকি-রাজ কামালের নগরকে যেমন সুকৌশলে এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যা সাধারণ পাঠক 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থ পাঠ করলে মনে করবে এ 'নগর' বীরভূমের নগর। বঙ্কিম বাবুও তদ্রূপ ১৮৭৬-এর পূর্ব, মধ্য ও পরবর্তী সংস্করণে উত্তর বঙ্গে নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যেও হয়তো তার প্রভুদের ইঙ্গিত ছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র এসব বিদ্রোহী অঞ্চলে এসেছিলেন কি না। বঙ্কিম বাবুর চাকরীর খতিয়ান দেখলে বোঝা যায় তিনি এদিকে আসেন নি। কিন্তু অনেক প্রাচীন লোক বলেছেন, বঙ্কিম বাবু রংপুর এসেছিলেন। আমার বয়স যখন ১০/১১ বছর ঐ সময় আমার বড় মামা রহিমুল্লাহ আহমদ ও মেঝ মামা ডাক্তার শহরউল্লাহ্ আহমদ এবং খালু আবদুস সামাদ চৌধুরী প্রমুখ আমাদের বাড়ীতে বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন, তা নিম্নরূপ ঃ

> বঙ্কিম বাবু ও তাঁর স্ত্রী কোলকাতা হতে রংপুর ট্রেনে আসার পথে 'বদরগঞ্জ' স্টেশনে যে-কামরায় ছিলেন, ঐ কামরায় এক যুবক উঠে। ঐ কামরায় আমার ডাঃ মামাও উঠেন। কামরায় চঞ্চলমতি যুবকটি বঙ্কিম বাবুর স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কেমন বেয়ারা ভাবভঙ্গি করতে থাকে। সুচতুর বঙ্কিম বাবুর দৃষ্টি কিন্তু যুবকটির প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বঙ্কিম বাবুর স্ত্রী তার পান-বাটার বাক্স হতে একটি পান বঙ্কিম বাবুকে দেন আর একটি পান নিজে খাবার জন্য প্রস্তুত করেন। ঐ সময় বঙ্কিম বাবু বলেন, "ওকেও (যুবকটিকে) একটি পান দাও।" বঙ্কিম বাবুর স্ত্রী যুবকটিকে পান দিলে যুবকটি ইতস্ততঃ করে পান নিতে। বঙ্কিম বাবু তখন যুবকটিকে বলেন, "দেখ হে ! আমি সারা জীবন ধরে এর পদসেবা করেও মন পাই নাই, আর তুমি এত সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও ?" উক্ত কথা বলামাত্র কামরাস্থিত সমস্ত যাত্রী হেসে ফেটে পড়ে। বদরগঞ্জের পরে শ্যামপুর স্টেশনে যুবকটি লজ্জায় নেমে পড়ে।

উপরোক্ত ঘটনাটি সাহেবগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ মহন্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী মহন্ত ডাঃ মামুজীর নিকট

শুনেছেন বলে আমার কাছে প্রকাশ করেন। এ সব ঘটনা হতে বোঝা যায়, বঙ্কিম বাবু চাকরী করতে এখানে না আসলেও উপন্যাস লেখার খাতিরে এখানে (রংপুর) এসেছিলেন।

“বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রাম। সেখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরালয়।” ভূতছাড়া গ্রামের সিকি মাইল দূরে প্রফুল্লমুখী বা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর পিত্রালয় কুরশা গ্রামে ছিল, শ্বশুরালয় নয়। ভূতছাড়াকে ভূতনাথ হয় তো বলেছেন বঙ্কিম বাবু তাঁর উপন্যাসে। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যখন উপন্যাসটি লিখেছেন, তখন কুরশা জনপদটি ভূতছাড়া মৌজার অন্তর্গত থাকতেও পারে। স্থানীয় লোকেরা এখনও জনপদটিকে ‘বামনপাড়া’ বলে থাকে।

এখন যে রংপুর শহর, তা আগে ছিল মৌজা রাধাবল্লভ। উক্ত স্থানের শাহী মসজিদের পুরনো কাগজপত্রে দেখা যায় এর নাম রাধাবল্লভ। পরে নবাব ও নবাবপুত্র কামাল এখানে কাশানা কুঠি, রংমহল প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এ স্থানটিকে রংপুর-দিনাজপুরের লোকেরা ‘জমপুর’ বলতো। ইংরাজরা একে রংপুর বলবার সুযোগ নিয়েছে এদের নাম-নিশান সব মুছে ফেলবার বদ মতলবে। ফুলচৌকি বা নগরে যে স্থানে বীরাঙ্গনা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী স্বয়ং ডেপুটি নবাব রাম নারায়ণ ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে সম্রাট শাহ আলম ও বাকের জঙ্গ-এর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ঐ স্থানটিকে এখনও বলা হয় দুর্গাপুর। ঐ স্থানে সৈন্যদের পানি ও গোসল করার জন্য একটি দীঘি খনন করা হয়। এখনও সে দীঘি বর্তমান। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী মীর কাসিমের বিপক্ষে উক্ত দুর্গাপুরে লড়াই করেছিলেন। যে স্থানে মীর কাসিম সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন, সে স্থানে একটি সুবৃহৎ দীঘি এখনও বিদ্যমান। দীঘিটাকে এখনও লোকে ‘বেল পুকুর’ বলে। উক্ত দুর্গাপুর ও কাশিমপুর গ্রাম মুখোমুখি অবস্থায় অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য যে, ১৭৬০ সালে মীর কাসিম কোম্পানীর নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু তা ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর পরে, সম্ভবতঃ উক্ত ৯ই ফেব্রুয়ারীর মসিমপুর যুদ্ধে ইংরাজ ও তাদের তাঁবেদার নবাব মীর জাফর পক্ষ হেরে যাওয়ায় ইংরাজরা চিন্তিত হয়ে পড়ে; পরে তারা মীর কাসিমকে কোম্পানীর তাঁবেদার নবাব করে।

নগরের মূল প্রাসাদের দেড় মাইল দক্ষিণে ‘দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স’ গ্রন্থে হাণ্টার বর্ণিত নগরের সরোবরের যে স্থলে দ্বীপের কথা রয়েছে সে দ্বীপের পাঁচ শ’ গজ উত্তর পূর্ব পার্শ্বের পূর্ব পারে জয়দুর্গা দেবী

চৌধুরাণীর গ্রীষ্মাবাস ছিল। উহার সম্মুখের দহটিকে এখনও জয়দুগ দহই বলা হয়। মূল প্রাসাদের (বাকের জঙ্গ ও তাঁর বংশীয়দের) এক মাইল পশ্চিম দিয়ে সরোবরটি আরো মাইল দু-এক উত্তর দিকে গিয়েছে এবং এরই এক অংশ দক্ষিণ দিকে এক মাইল গিয়ে কাঠগড়ি (নবাবের কাটা খাল) নাম্নী নদীতে গিয়ে মিশেছে। উক্ত সরোবরটিকে এখন লোকে 'শাব গড়ির বিল' বলে এবং উক্ত সরোবরের অন্য একটি শাখাকে 'আইনশার বিল' বলে। মূল প্রাসাদের এক মাইল দক্ষিণ দিক দিয়ে সরোবর (খাল) প্রবাহিত হয়ে পূর্বের তিস্তায় গিয়ে ঠেকেছে। মূল প্রাসাদের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল স্থান জুড়ে অসংখ্য ঝর্ণা ফোয়ারার পানি দালানের সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে ঘাটগুলি বেয়ে নিম্নাভিমুখী হয়ে সরোবরগুলির মুখে গিয়ে ঠেকেছে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে সেই জলধারা তিস্তা (বর্তমান যমুনেশ্বরী) নদীতে গিয়ে পড়েছে। এক একটা ঝর্ণা ও ফোয়ারার মুখ ছ' ইঞ্চি থেকে পঞ্চাশ ইঞ্চি পর্যন্ত। এ রকম লক্ষ লক্ষ ঝর্ণা ও ফোয়ারা ছিল। এখনও কোথাও কিছু কিছু আছে। ফোয়ারা ও ঝর্ণার পানি গ্রীষ্মের সময়গুলিতে ঝরান হতো। কলের মুখ খুলে দিলে ঐ সব ফোয়ারার পানি গড়িয়ে চতুর্দিক জলমগ্ন হতো এবং ঠাণ্ডা পানির হাওয়া ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ফিরতো মূল প্রাসাদ ও গ্রীষ্মাবাস গুলীতে। শীতের দিনের ফোয়ারার পানি প্রয়োজন ছাড়া ঝরান হতো না। এ স্থানের ফোয়ারার পানি স্বচ্ছ শীতল ও সুপেয় ছিল। একজন লোককবি লিখেছেন ঃ

রাজপুরী দুই দিকে পানির সরোবর।
পাহাড় থাকি কাটি আনছে সেই নহর।
কত ঝর্ণা ফোয়ারা আছে কে করে শুমার।
রাজপুরীর চৌদিকে যে ইন্দ্রের বাজার।।
কি কব রাজপুরীর কথা কহা নাহি যায়।
সাজিয়া আছে ইন্দ্রপুরী যেন বা মনে হয়।।
মোঘল বাদশার গনাগণ পুরীর মধ্যে থাকে।
কুর্নিশ করি যায় আইসে দরবারে সব লোকে।।

—জহুর ফকীর

এখন হতে প্রায় ২২/২৩ বৎসর পূর্বে আমি ছোট বেলায় দেখেছি আরও অনেকে দেখেছে—শিকুর পাড়া গ্রামের শরিতুল্লা ফকির বা শরি ফকির

নামে ১২০/১২৫ বৎসর বয়সের এক সুপ্রাচীন বৃদ্ধ ভিক্ষুক মুল প্রাসাদের পার্শ্বের রাস্তা দিয়ে যখন যাওয়া-আসা করতেন, তখন যাওয়ার পথে কুর্নিশ আরম্ভ করতেন। বর্তমান ছকির উদ্দীন আকন্দ সাহেবের বাড়ীর রাস্তার উত্তর পার্শ্বের বড় আমগাছের তলা হতে (সে গাছটি এখনও আছে) ভিক্ষা করে ফিরে আসার পথে আদিল আকন্দের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তার তেমাথায় এসে যখন উত্তর দিকে রাস্তায় হাঁটা পথে চলতেন ঐ স্থান থেকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ও মস্তক উঠা-নামা করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতেন। এমতাবস্থায় ইনি সর্বদাই মুল প্রাসাদের দিকে মুখ করতেন এবং কখনো প্রাসাদের দিকে পিছন ফেরাতেন না। তিনি নিজের বাড়ীর পার্শ্বের বড় বড় আম গাছের নীচে গিয়ে কুর্নিশ করা বন্ধ করতেন। আমরা ছেলেরা ফকিরের এই আচরণ দেখে হাসতাম ও বলতাম, "ফকির পাগল হয়েছে রে ! পাগল হয়েছে !" বড় হয়ে বুঝতে পারলাম এ পাগলামী নয়, এ হলো পূর্বেকার কুর্নিশ করার অভ্যাস–যা তিনি বৃদ্ধ বয়সেও ত্যাগ করতে পারেন নি।

ইংরাজের দালাল দেবী সিংহের অত্যাচার সম্পর্কে এবং নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গের নবাব হওয়ার কারণ সম্পর্কে এবং ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের প্রজাবিদ্রোহের উপরে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন যে দীর্ঘ মর্মবিদারী আলোচনা করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

> যে আশংকা করিয়া লোকে কাঁপিয়াছিল, কার্যতঃ তাহাই ঘটিল। ১৭৮১ খৃঃ দেবী সিংহ বেনামী করিয়া একজন মুসলমানের নামে রংপুর, দিনাজপুর ও ইদ্রাকপুর ইজারা লইলেন। ইজারা লইয়া তিনি সমস্ত জমিদারদিগের নিকট বৃদ্ধি জমা তলব করিলেন। একে ১৭৭০ খৃঃ দুর্ভিক্ষে লোকসংখ্যা হ্রাস হওয়ায় জমিদারের আয় হ্রাস হইয়াছিল, তারপর ১৭৭২ খৃঃ পাঁচসনী বন্দোবস্তের সময় হেস্টিংসের নিকট সকলকেই বৃদ্ধি জমায় জমি লইতে হইয়াছিল, কেহই পৈতৃক জমিদারী পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; কিন্তু যে বৃদ্ধিতে জমি লইয়াছিলেন যথাযথ সে পরিমাণ টাকা কোম্পানীকে দিতে পারেন নাই, কিছু কিছু বাকী পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় জমা আরও বৃদ্ধি হইলে জমিদারদিগের তাহা দিবার ক্ষমতা ছিল না, কাজেই; যাহারা এখন কবুলতি দিতে অস্বীকার করিলেন, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করা হইল, আবার যাহারা ইস্তফা দিতে চাহিলেন, তাহারাও বাকী রাজস্ব না দিয়া ইস্তফা

দিতে পারেন না, এই হেতু কয়েদ হইলেন। কোন দিকে রক্ষা নাই দেখিয়া অত্যাচার হইতে আপাততঃ নিস্কৃতি পাইবার আশায় সকলেই কবুলতি দিলেন। কবুলতি দিবার কয়েকদিন পরেই দেবী সিংহের লোকেরা খাজানা আদায় আরম্ভ করিল। সেকালে নারায়ণী টাকা ছিল। কোম্পানীর টাকার হিসাবে সে টাকার উপর বাঁটা ধার্য হইল, নানাবিধ রাজস্বের পরিমাণ বিস্তার বাড়িয়া গেল; কেহই টাকা দিতে সমর্থ হইলেন না। জমিদার, রাইয়ত সকলেই ধৃত হইয়া দেবীসিংহের কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন। হাহাকারে দিনাজপুর ভরিয়া গেল। তখন এখনকার মত কারাগার ছিল না। ছাদহীন গৃহমধ্যে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইত ও পাহারা থাকিত। দেবীসিংহের প্রতাপে লক্ষপতি জমিদার ও কপর্দকহীন কৃষক এক গৃহে একই রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া রহিল। শেষে কারাগারে স্থান কুলাইল না, প্রাঙ্গনে অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে সকলের স্থান হইল। দেবী সিংহকে দিনাজপুরেই থাকিতে হইত। তিনি কালেক্টরের দেওয়ান, রাজার ও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত, তিনি ইচ্ছা করিলেই রংপুর যাইতে পারিতেন না, সেইজন্য রংপুরে কৃষ্ণ প্রসাদ নামে একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিনিধি গিয়া জমিদারদিগের নিকট কর বৃদ্ধির বার্তা জানাইলে অনেকে দেবী সিংহকে আপন আপন দুঃখের কথা ও দেশের দুর্দশার কথা জানাইতে গেলেন। কোম্পানীর রোকারিতে এ বৎসর খাজানা বৃদ্ধি করা নিষেধ ছিল। দেবী সিংহ সে আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া ঐ সকল জমিদারদিগকে কয়েদ করিয়া রংপুর পাঠাইয়া দিলেন ও আপন প্রতিনিধিত্বে কৃষ্ণপ্রসাদের পরিবর্তে হররামকে নিযুক্ত করিলেন। হররাম আসিয়া সকল জমিদারকে তলব করিলেন। সকলেই জমা বৃদ্ধির কবুলতি দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন হররাম তাহাদের প্রতি প্রহারের আজ্ঞা দিলেন এবং তাহাদিগকে ঢাক বাজাইয়া বৃষভারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিতে বলিলেন। সামাজিক শাসনে এইরূপ দণ্ডে জাতিচ্যুত হইতে হইত। দুই-চারি জন জমিদারের এইরূপ দুর্দশা দেখিয়া বাকী সকল জমিদারই কবুলতি দিলেন, কবুলতি দিবার পরেই টাকা আদায় আরম্ভ হইল। কেহই টাকা দিতে পারিলেন না। জমিদারদিগের জমি নাম মাত্র মূল্যে দেবী সিংহ বেনামিতে স্বয়ং

কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তাহাতেও সম্পূর্ণ রাজস্ব আদায় হইল না। কাজেই, তখন জমিদারবর্গ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে লাগিলেন। কাহারও টাকা নাই, প্রহার-অপমানে জর্জ্জরিত হইয়া অসংখ্য লোক করালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর কৃষকদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া কৃষককুল দেশ ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করিল। হররাম তাহা নিবারণ করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে পাহারা রাখিল। আবার এই পাহারাওয়ালাদিগের বেতন দিবার জন্য 'চৌকিবন্দী' নামক নূতন করের সৃষ্টি করিল। দিনাজপুরে দেবী সিংহ অষ্টাদশ প্রকারের কর আদায় করিতেছিলেন। হররাম রংপুরে একবিংশতি প্রকারের কর সৃষ্টি করিল। এইরূপ অত্যাচার করিয়া হররাম কিছু আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু দেবী সিংহের তাহাতে মন উঠিল না। তবে হররামের কার্যপটুত্বে তাঁহার কোন দিন অবিশ্বাস জন্মে নাই, অথচ সূর্যনারায়ণ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। সূর্যনারায়ণ আসিয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। জমিদারদিগের তো কথাই নাই, স্ত্রীলোকদিগের উপরও ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল, অন্তঃপুরচারিণীগণ প্রকাশ্য স্থানে আনীত হইতে লাগিলেন। দেবী সিংহের অনুচরবর্গ বলপূর্বক সেই সব কুলকামিনীর অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া অলংকার উন্মোচন করিতে লাগিল। কখনও বা তাহাদিগকে বিবস্ত্র অবস্থায় সাধারণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রাখা হইল। স্ত্রী জাতির শেষ অপমান, সর্বসম্মুখে তাহাই সংঘটিত হইতে লাগিল। ক্ষোভে, রোষে, অপমানে কত সহস্র কুলললনা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কে জানে ? কত উষ্ণ শ্বাস উঠিয়া ঈশ্বরের সিংহাসন উত্তপ্ত করিয়াছে কে বলিবে ? তাহাদিগকে বিবস্ত্র করিয় বেত্রাঘাত করা হইত। বংশখণ্ড অর্ধ চন্দ্রাকারে চাঁছিয়া তাহার দুই প্রান্ত স্তনদ্বয়ে বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। বংশখণ্ড স্তন ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ কলঙ্কিত দৃশ্য জগত কখনো দেখে নাই। এইরূপ নারকীয় ঘটনা কখনো ইতিবৃত্তের কলেবর কলঙ্কিত করে নাই। এইসব অত্যাচারেও আশানুরূপ ফল হইল না দেখিয়া দেবী সিংহ নিজ ভ্রাতা ভেকধারী সিংহকে রংপুরে প্রেরণ করিলেন। ১৭৮১ হইতে ১৭৮২ খৃস্টাব্দের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত এইরূপ চলিল। ১৭৮২ সালে এইবার দেবী সিংহ কার্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যন্ত্রণা দিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়া কার্যে পরিণত হইতে লাগিল। দলিত, নিগৃহীত, উৎপীড়িত প্রজার চক্ষুর জলে দেশ ভাসিয়া গেল। প্রতিগ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতি গৃহে অত্যাচার হইতে লাগিল। ১৭৮৩ খৃঃ নিরীহ প্রজার যখন আর পলায়নের সুবিধা রহিল না, মরিবার ভয় দূর হইয়া গেল, তখন সকল প্রজা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। প্রতিজ্ঞা করিল কোম্পানীর লোকদিগকে আর এদেশে রাখিবে না, যে প্রকারে হউক, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবে। না হয় আপনারা মরিবে। খৃস্টান—পুঙ্গব গুডল্যাড সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজ-কর্ম দেবী সিংহই করেন। দেবী সিংহের কীর্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শোনেন না। উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে? যথাসময়ে গুডল্যাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পৌঁছিল। তিনি শুনিলেন, নূরুল মুহাম্মদ-কে প্রজারা 'নবাব' পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি ত্বরায় লেফ্‌টন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহী দল এক স্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? তখন গুডল্যাড এক হুকুম যাহির করিলেন যে, ম্যাকডোনাল্ড যাহাকে ধরিবেন, তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন। তাহাতেও বিদ্রোহ দমন হইল না। লেফটেন্যান্ট সাহেব শুনিলেন, নূরুল মুহাম্মদ মুঘল হাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরুল মোহাম্মদ মাত্র পঞ্চাশ জন লোক লইয়া মোগল হাটে ছিলেন, তাঁহার দলবল সকলেই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাকডোনাল্ডে অতর্কিতভাবে মোগলহাটে নূরুল মুহাম্মদকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। নূরুল মোহাম্মদ আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এই সময় গুড্‌ল্যাড সাহেব প্রচার করিলেন যে, অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে প্রজার আর কোন ভয় নাই, রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের উপর আর কোন অত্যাচার হইবে না। ১৭৮০ খৃস্টাব্দে তাহারা যে হিসাবে খাজনা দিয়াছিল তাহাই দিতে হইবে, খাজনা বৃদ্ধি রদ হইয়া যাইবে, এই কথা শুনিয়া প্রজাবর্গ গৃহে ফিরিল, যে কয়জন অবশিষ্ট ছিল, লেফটেন্যান্ট সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলেন। যাহা হউক, দেবী সিংহের অত্যাচারে নিরীহ প্রজারাও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।

রঙ্গপুর বিদ্রোহ যত সহজে মিটিল, কথাটা তত শীঘ্র মিটিল না। কলিকাতা কাউন্সিল এই বিদ্রোহের কারণ অবধারণের জন্য পিটারসন সাহেবকে রঙ্গপুরে প্রেরণ করিলেন। পিটারসন আসিয়া প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। শেষে তিনি জমিদারদিগকে হাযির হইতে ইস্তাহার দিলেন। অধিকংশ জমিদারই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। একজন ব্যতীত কেহই হাযির হইল না। পিটারসন সাহেব তাঁহার জবানবন্দী লিখিয়া গুড্‌ল্যাডের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। গুড্‌ল্যাড তাহাকে দেবী সিংহের যিম্মা করিয়া দিলেন। ইহার পর আর কেহই সাক্ষ্য দিতে হাযির হয় নাই। পিটারসন জমা ওয়াশীল বাকী তলব করিলে দেবী সিংহ তাহা দাখিল করিল, গুড্‌ল্যাড সাহেব তাহার নকল রাখিবার ছলে তা'হা চাহিয়া লইয়া গেল, আর ফিরাইয়া দিল না। এইরূপ নানারূপ ব্যর্থ মনোরথ হইয়াও পিটারসন সাহেব সব বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। হেস্টিংস বেগতিক বুঝিয়া পিটারসনকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তদন্তের জন্য এক নূতন কমিশন বসাইলেন। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে কমিশন বসিল। ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে হেস্টিংস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতে গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া রঙ্গপুর বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে লাগিলেন। ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে কমিশনের কার্য শেষ হইল। দেবী সিংহকে বাধ্য রাখিবার জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, অনেকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। কাজেই দেবী সিংহের অপরাধ সাব্যস্ত হইল না। হররামই অত্যাচার করিয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইল। হররাম এক বৎসরের নিমিত্ত কারারুদ্ধ হইলেন। দেবী সিংহের অপরাধ প্রমাণিত না হইলেও লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহাকে কোম্পানীর চাকুরী হইতে এককালে বিদায় দিলেন। দেবী সিংহের কার্য জীবনের এইখানেই শেষ হইল। জীবনের অবশিষ্টকাল দেবী সিংহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নসীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। শেষাবস্থায় তিনি অনেক দান ও দেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নসিপুরে দেবী সিংহের উত্তরাধিকারিগণ এখনও বাস করিতেছেন।

—বিশ্বকোষ, ষোড়শ ভাগ, রঙ্গপুর—১৫৩ পৃঃ দ্রঃ। শ্রী নগেন্দ্র নাথবাবু সংকলিত ও প্রকাশিত 'দেবী সিং' ১৩০৪ সালে, ৯-১০-১১ পৃঃ দ্রঃ]

উপরের উদ্ধৃতির সঙ্গে আর হান্টার সাহেবের বক্তব্যের সঙ্গে অনেক গরমিল। সন্দেহের কারণগুলি নীচে আমি দেখাবার চেষ্টা করবো ঃ

১. "১৭৭০ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অন্নক্লিষ্ট উদ্ধত প্রজাবৃন্দ একযোগে প্রায় ৫০ হাজার লোক একত্রিত হইয়া গ্রামাদি ধ্বংস এবং নানা স্থানে লুণ্ঠন করিতে থাকে।" এটা কেমন কথা !

২. আরও দেখা যাচ্ছে, ১৭৭২ খৃস্টাব্দে দেশীয় সেনাবিভাগের কর্মচ্যুত সিপাহীদলে পরিপুষ্ট ডাকাত দল।

৩. ১৭৭০ খৃস্টাব্দে যা-তা নয়, একেবারে ৫০ হাজার প্রজা সাধারণের বিদ্রোহ দেখছেন। আবার ১৭৭২ খৃস্টাব্দে দেশীয় সেনাবিভাগের কর্মচ্যুত সেনাগণের ডাকাতিও দেখছেন। সুধী পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, স্যার ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার সাহেব বলেছেন যে, 'নূরুল উদ্দীন' নিজেই নিজেকে নবাব করেছেন। অথচ বিশ্বকোষের লেখক মহোদয় বলেছেন, প্রজারা 'নূরুল মোহাম্মদকে' নবাব পদে বরণ করে নিয়েছিল। হান্টার সাহেব কি মিথ্যাবাদী নন ? ঘটনা পর্যালোচনা করলে তাই বলতে হয়। সত্যকে ঢেকে রেখে মিথ্যাকে জোর করে দৃঢ়রূপে প্রচার করাটা কি চরিত্রহীনতার মধ্যে পড়ে না ? নবাবের প্রধান ঘাঁটি পাটগ্রামে ছিল, স্যার উইলিয়াম হাণ্টার সাহেব বলেছেন। অথচ আমরা জানি, রংপুর-দিনাজপুরের শত সহস্র লোক জানেন যে, নবাবের প্রধান ঘাঁটি হলো ফুলচৌকি নগরে। পাটগ্রাম হতে ফুলচৌকি নগরের দূরত্ব হবে ৫০/৬০ মাইল উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি। আবার একই মুখে হাণ্টার সাহেব বলেছেন 'নূরুল মোহাম্মদ' নিজেকে নিজেই নবাব করেছেন। এটা আর একটা জঘন্য মিথ্যা ও বানানো কথা। এদেশীয় তিনজন প্রখ্যাত মনীষী লেখক বলেছেন, নূরুল উদ্দীন বা নূরুল মোহাম্মদকে 'প্রজারা নবাব পদে বরণ করেছেন।" ঐ সময়ের ঘটনাগুলি যা সামান্যমাত্র ছিটেফোঁটা পাওয়া যায় বই, পুঁথি-পত্রে এবং মানুষের মুখে মুখে, উক্ত আলোচিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, এ দেশীয়রা আগ্রহ নিয়ে নবাবকে বরণ করে নিয়েছেন এবং মরণপণ সংগ্রাম করে চলেছেন বৎসরের পর বৎসর ধরে। এটা ইতিহাসের পাঠকদের অজ্ঞাত নয় যে, **W. W. Hunter** সাহেবের ঐ দেশীয় বিশ্বখ্যাত নাট্যকার ও কবি সেক্সপীয়র সাহেব বলেছেন, "চরিত্র যার নষ্ট, তার সবকিছুই ক্ষতির

মধ্যে গণ্য।” মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজিকে কি চরিত্রের মধ্যে গণ্য করা যায় না? মিথ্যা বলাটা কি চরিত্রহীনতার মধ্যে পড়ে না? না সত্যাশ্রয়ীকে চরিত্রবান বলবো। আসল কথা হলো, নবাব বা বিদ্রোহী দলের প্রধান ঘাঁটি ছিল ফ্লচৌকি নগরে। তা না বলে হাণ্টার সাহেব ৫০/৬০ মাইল দ্রের পাটগ্রামকে দেখিয়ে দিচ্ছেন কেন? একে জঘন্য মিথ্যা আর ধাপ্পা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? নবাবের আসল নাম পরিচয়, বংশ, কোথাকার লোক ইত্যাদি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরাও যেমন বলেন নি, গোপন করে গেছেন, এ দেশীয়রাও তেমনি কোন গ্রন্হাদিতে প্রকাশ্যভাবে বলেন নি। এ দেশীয় লেখকদের এসব তত্ত্ব ও তথ্য যে অজ্ঞাত ছিল তা আমাদের মনে হয় না। হয়তো কোন কোন লেখক জেনে-শ্নেও ইংরাজদের লেখাগ্লিকে হ্বহ্ অন্সরণ করে যতট্ক্ পারা যায় সংশোধন করে লিপিবদ্ধ করে, বই, পত্র-পত্রিকায় প্রচার করবার প্রয়াস পান। আবার কোন কোন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী প্রেমিক, এ দেশীয় লেখক ইংরাজদের লেখাকে অন্সরণ করেছে। আবার কোথাও ইংরাজদের লেখা বিষয়গ্লিকে কাটছাট করে একেবারে বিক্ত করা হয়েছে। ম্সলিম বিদ্বেষের কারণেও এর্প করেছে। এটাও নিঃসন্দেহে দ্ভাগ্যজনক। হয়তো এরকম মনোভাবও এদেশীয় কোন কোন লেখকের ছিল। তা না হলে কেমন করে ঘটনাগ্লি ষোল আনাই একেবারে নিশ্চিহ্ন গ্ম হয়ে যায়। এ রকম ছলনাকারী গ্রন্হাদিতে মিথ্যা ও ধাপ্পা সাজানো কথা লিখে **W. W. Hunter** সাহেব ব্টিশ ভারতের ম্সলমানদের নেতা সাজবার ভানও করেছেন। ম্সলমানদের ভেকধারী পীর করম আলী শাহ্ ওরফে কর্নেল লরেন্স গোটা আরবকে জ্বালিয়েছে, প্ড়িয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে, আজও ঝরাচ্ছে অঝোর ধারায়। তদ্র্প ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের স্চতুর ফরওয়ার্ড এক্সপার্ট খেলোয়াড় হাণ্টার সাহেবও একই খেলা খেলেছে ভারত উপমহাদেশে। আজও খেলছে, যার শেষ নেই, বিরাম নেই। এর প্রতিকার কি? তাও আমরা খ্ঁজছি না, চিন্তাও করছি না, আবার করলেও এলোমেলোভাবে। তাতে কোন বিশেষ ফল হয়নি, হচ্ছে না। আসল কথা হলো হাণ্টার সাহেব গয়রহের ভয় ছিল এই যে আমাদের আলোচিত নবাব হলেন মোগল প্রিন্স, গণ আন্দোলনের স্রষ্টা। এই মোগল রাজ বংশটাকে বা সিংহাসনকে ভয় করছিলেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা। কারণ ভারতের জনগণ মোগল সিংহাসনকে তখনও মনে-প্রাণে মেনে আসছিলেন। তারই

জন্য এত ঢাকা-ঢাকির প্রয়াস সাম্রাজ্যবাদীদের। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণবিদ্রোহের কি ভয়াবহ ধ্বংসকারী শক্তি তাহা সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজেরা প্রত্যক্ষভাবে জানতেন। তাই আমাদের আলোচিত নবাব নূরউদ্দীন ও তদবংশীয় এবং তাঁর সহকারীদের নিয়ে তাদের ছিল সীমাহীন সাবধানতা ও দুশ্চিন্তা।

৪. শুধু প্রজাবর্গ ও দেশীয় পদচ্যুত সেনাগণই নয়, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী দলের সহিত ইংরাজ সেনাদলের সংঘর্ষও দেখতে পাচ্ছেন।

৫. আরো দেখা যাচ্ছে, প্রথমে একটি ইংরাজ সেনাদল বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হয়ে প্রত্যাবৃত্ত হলো। ইহাও নিবেদিত যে, উক্ত সন্ন্যাসী দলের সহিত মুসলমানও ছিল। কারণ, "ভবানী পাঠক এণ্ড মজনু শাহ উইথ লীগ।" এটা স্বীকার্য যে, প্রজা ও কর্মচ্যুত দেশীয় সিপাহী দলে যে মুসলমান এবং হিন্দু উভয়েই ছিল এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৬. ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে কাপ্তেন টমাস কর্তৃক পরিচালিত ইংরাজ বাহিনী উক্ত দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে দস্যুদলের সাথে দেশপ্রেমিক স্বদেশীয় বিদ্রোহী দলের নিকট ক্যাপ্টেন টমাস–সহ তার সম্পূর্ণ দলবল নিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়। ব্যাপক গণবিদ্রোহ না হলে এটা কি করে বিদ্রোহীদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ?

এ সম্পর্কে কুচবিহারের ইতিহাস কি বলে, তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

> ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভে কাপ্তেন টমাস সন্ন্যাসী এবং ফকীরের দলবদ্ধ প্রায় তিন সহস্র ডাকাতকে রঙ্গপুরের নিকটে আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন।
>
> —কোচবিহারের ইতিহাস, ২২৮ পৃষ্ঠা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সুতরাং এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, এই বিদ্রোহ একেবারে গণবিদ্রোহের আকার নিয়েছিল। এমনকি, ঐ সময় (১৭৭৩) গুলীতে উক্ত বিদ্রোহীদেরকে দমন করবার জন্য ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি ৪টা ব্যাটেলিয়ন সৈন্য প্রেরণ করেও রংপুর জেলা ও তৎসন্নিহিত জেলাগুলির দেশপ্রেমিকদেরকে হতোদ্যম ও নিরুৎসাহিত এবং দমন করতে পারেন নি। বিশ্বকোষের রংপুর জেলা-বিবরণীতে এটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে 'নবাব নূরউদ্দীন'কে আহত করার পরও বিদ্রোহীদেরকে নিরুদ্যম ও দমন করা যায়নি।

৭. "—১৭৮৯ খৃস্টাব্দে দেশের শান্তিহারক দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং কালেক্টর বাহাদুর তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।"

এরপর বলা হচ্ছে ঃ "অতঃপর এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫৪৯ জন দস্যু ধৃত হইয়া ইংরেজের আদালতে বিচারার্থে আনীত হইয়াছিল। এই দস্যু-দলপতিদিগের মধ্যে ভবানী পাঠকই আমাদের পরিচিত।"

যাক সে কথা। এখন এই দেখাতে চাই, হান্টার সাহেব যে বলেছেন, রংপুরের প্রজারা '**Suddenly**' হঠাৎ করে বা অপ্রত্যাশিতভাবে '**Rebellion**' বিদ্রোহাচরণ করেছিলেন। এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং সাজানো তা বিশ্বকোষের উক্ত লেখার সন ও বিদ্রোহের কথাগুলো হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে ওঠেনি কি ?

রংপুর—অধ্যায়ে 'বিশ্বকোষ'-এ ১৭৭০ খৃস্টাব্দে ৫০ হাজার প্রজার একত্রে বিদ্রোহের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং হান্টার বর্ণিত ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে 'প্রজাদের হঠাৎ বিদ্রোহে'র এ কথা যেমনি মিথ্যাপূর্ণ তেমনি অলীক ও সাজানো বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এখানে একথা বলা যায় যে, রংপুর জেলাস্থ নিলফামারী মহকুমার কিশোরগঞ্জ থানাধীন 'কচুকাটা' নামক বিরাট প্রান্তরে ইংরেজদের একটা ব্যাটেলিয়ান স্বদেশীয় বিদ্রোহীদের দ্বারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় বলে প্রাচীনরা এখনও বলে থাকেন। এসব কথা তাঁরা বংশ-পরম্পরায় পূর্ব হতে শুনে আসছেন। স্থানটির নাম বিরাট ডাঙ্গা। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে এখানে একটি মেলা বসেছিল। অধুনা লোকবসতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন অনেক বসতি হচ্ছে। তবে 'কচুকাটা' নামটি সেই হতে এখন অবধি চলে আসছে। ক্যাপ্টেন টমাস কি এখানেই সদলে নিহত হন ?

যাক এ সম্পর্কে 'কোচবিহারের ইতিহাস' হতে ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের আগে রংপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

> সেই সময়ে কোচবিহার রাজ্য এবং তাহার নিকটবর্তী রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জেলায় ডাকাতদিগের অত্যাচার অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ও মজনু শাহ্ প্রমুখ দস্যু-দলপতিগণের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই ডাকাতগণকে নির্মূল

> করিতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘকালব্যাপী বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইয়াছিল। —কোচবিহারের ইতিহাস, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ২২৮ পৃষ্ঠা

রংপুরের প্রজা সাধারণ এবং সর্বশ্রেণীর লোক মিলে ইংরেজদের রাজস্ব বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটা ইতিহাসের নিম্নোক্ত কথা হতে বোঝা যাবে ঃ

> "তাহারা (প্রজারা) রাজস্ব প্রদানের নিষেধাজ্ঞা সর্বত্র ঘোষণা করিয়াছিল।"
> —কোচবিহারের ইতিহাস, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ২১৯ পৃষ্ঠা

এখন কথা হলো নূরউদ্দীন (মজনু শাহ্)-কে হান্টার 'The self styled Nawab' বলেছেন, অথচ সত্যিকার ইতিহাস বলছে তিনি বিদ্রোহী প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত নবাব।

এ প্রসঙ্গে 'কোচবিহারের ইতিহাস' লেখক জনাব আমানতুল্যা চৌধুরী বলেছেন ঃ

> রঙ্গপুরের প্রজাবৃন্দ অবশেষে দেবীসিংহের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রঙ্গপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্যভাবে প্রজাবিদ্রোহ দেখা দেয় এবং নূরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি তাহাদের নবাব ও দয়াশীল নামক এক ব্যক্তি সেই নবাবের দেওয়ান নির্বাচিত হন।
> —কোচবিহারের ইতিহাস, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ২১৯ পৃষ্ঠা

এটা এবং বাংলা 'বিশ্বকোষ'-এ যা বলা হয়েছে ঃ

> যথাসময়ে গুডল্যাডের কর্ণে এ সংবাদ পেণীছিল। তিনি শুনিলেন, নুরুল মোহাম্মদকে প্রজারা নবাব পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে।

উক্ত দুই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক মহোদয় ব্যতীত আদি বাসিন্দা পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১৩১৫ বাংলা সনের 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়' 'জাগগান'-এর উপরে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু আমাদের আলোচ্য নবাব সম্পর্কে তিনি তাঁর উক্ত প্রবন্ধে যা বলেছেন তা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা আবশ্যক বলে মনে করি। তিনি নবাব সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> খৃস্টানপুঙ্গব গুডল্যাড সাহেব আহার করেন আর নিদ্রা যান। কাজ-কর্ম দেবী সিংহই করেন। দেবী সিংহের কীর্তিকলাপ তিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না। উৎকোচের মায়া কে পরিত্যাগ করে।

যথাসময় গুডল্যাডের কর্ণে এ সকল সংবাদ পেঁছিল। তিনি শুনিলেন, নূরুল উদ্দীনকে প্রজারা নবাব পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। তিনি ত্বরায় লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহী দল এক স্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? তখন গুডল্যাড এক হুকুম জারী করিলেন যে, ম্যাকডোনাল্ড যাহাকে ধরিবেন তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন। তাহাতেও বিদ্রোহ দমন হইল না। লেফটেন্যান্ট সাহেব শুনিলেন নূরুল উদ্দীন মোগলহাটে আছেন। তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নূরুল উদ্দীন পঞ্চাশ জন মাত্র লোক মোগলহাটে লইয়াছিলেন। তাঁহার দলবল সকলেই পাটগ্রামে ছিল। ম্যাকডোনাল্ড অতর্কিতভাবে মোগলহাটে নূরুল উদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। একটু ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল। নূরুল উদ্দীন আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এবং নূরুল উদ্দীনের দেওয়ান দয়াশীল হত হইল।

যাদবেশ্বর মহাশয় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জনগণ-স্বীকৃত নবাব ছিলেন, স্বঘোষিত নবাব নন।

লক্ষ্য করার বিষয়, হান্টার সাহেব বলছেন, যে তাঁকে বন্দী করা হয় কিন্তু উপরিউক্ত তিন বিখ্যাত ঐতিহাসিকই সে কথা বলেন নি। যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলেছেনঃ "নূরুল উদ্দীন আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।" এ কথা শুধু তাঁর নয়, এতদঞ্চলের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কথা। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর বংশধররাও অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন।

সত্যকে গোপন—এমনকি, একেবারে উল্টো বলতে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার কিরূপ উস্তাদ ও দক্ষ, তা বিশ্বকোষের নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক কথাগুলো হতে প্রমাণ করা যেতে পারে।

১৬১৩ শকে যজ্ঞ নারায়ণের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। এই সময়ে রাজার অনিচ্ছায় দর্পনারায়ণের পুত্র শান্ত নারায়ণ ছত্র-নাজির হইলেন। ১১শ বর্ষ মাত্র রাজত্বের পর মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যু হইল। নানা গোলযোগের পর ১৬১৬ শকে জগৎ নারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ রাজা হইলেন। হান্টার প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে, রাজা মহেন্দ্র

> নারায়ণের মৃত্যুর পর ভগীদেব ও জগদেব রায়কত কোচবিহারের সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু মোঘল সৈন্যের সাহায্যে রূপনারায়ণ তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। —**W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. X, Page 414**

কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথার উপর রায়কত বংশ বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। রাজোপাখ্যানে লিখিত আছে, মহেন্দ্র নারায়ণের জীবদ্দশায় জগদেবের মৃত্যু হয় এবং ভুজদেব রায়কত পীড়িত হন। এরূপ স্থলে জগদেব ও ভুজদেব কর্তৃক কোচবিহার আক্রমণ অসম্ভব।

এর পরে আছে ঃ

> যাহা হউক, সমস্ত কোচবিহার রাজ্য ভুটিয়াদের করতলগত হইল। বীজেন্দ্র নারায়ণের[১] মৃত্যুর পর নাজির দেব খগেন্দ্র নারায়ণ, ধৈর্য্যেন্দ্র নারায়ণের পুত্র কুমার ধরেন্দ্র নারায়ণকে রাজা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ভুটিয়ারা তাহার বিরোধী হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নাজির পরাস্ত হইলেন, ভুটিয়ারা রাজা ধৈর্য্যেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষেক করিল। নাজিরদেব পালাইয়া আসিয়া ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কাহারও মতে, এই সময় বৈকুণ্ঠপুরের দর্পদেব রায়কত ভুটিয়াদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ততদূর বিশ্বাস-যোগ্য নহে।
>
> ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে ৫ই এপ্রিল ইংরাজের সহিত রাজা ধরেন্দ্র নারায়ণের এক সন্ধি হয়। তাহাতে ইংরেজ বাহাদুর পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া কোচ-রাজের সাহায্য করিতে সম্মত হন। তৎপরে নাজির দেবের সহিত ইংরেজ সৈন্য কোচবিহারে প্রবেশ করিল। ভুটিয়া সেনাপতি জিম্পে অসাধারণ সামর্থ্য দেখাইয়া যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। —বিশ্বকোষ, চতুর্থ ভাগ, শ্রী যোগেন্দ্র বসু সংকলিত ও প্রকাশিত 'কোচবিহারের ইতিহাস' ১৩০০ সাল; পৃষ্ঠা ৫২৪-৫২৫

বীজেন্দ্রকে **W. W. Hunter** 'রাজেন্দ্র' নামে তাঁর লিখিত '**Statistical**

---

[১] হান্টার প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিক 'রাজেন্দ্র' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুন্‌সি যদুনাথ লিখিত দেশীয় ইতিহাসে 'বীজেন্দ্র' নামই আছে। (১২৯২ সালে ডাকহরকরা প্রেসে মুদ্রিত রায়কত বংশ ৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন)

Account of Bengal "গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিনা তা আমরা জানি না। তবে এটা যে একটা বিরাট ইচ্ছাকৃত ভুল তা নীচের বিষয়গুলি দেখলেই বোঝা যায়। হান্টার বলেছেন ঃ 'ভগীদেব ও জগদেব রায়কত কোচবিহারের' সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন।' কিন্তু রাজা রায়কতের বংশীয়েরা সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, 'রাজোপাখ্যান' প্রভৃতি মুন্সি যদুনাথ প্রমুখ—লিখিত দেশীয় ইতিহাসে লিখিত আছে, 'মহারাজ মহেন্দ্র নারায়ণের জীবদ্দশায় জগদেবের মৃত্যু হয় এবং ভুজদেব রায়কত পীড়িত হন।" জগদেবের যেখানে মৃত্যু হয়েছে বলে উক্ত ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, ভুজদেব রায়কত পীড়িত এ কথাও বলা হয়েছে; অথচ হান্টার প্রমুখ ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেছেন যে, রাজা মহেন্দ্র নারায়ণের মৃত্যুর পর ভগীদেব রায়কত এবং জগদেব রায়কত একবারে কোচবিহারের সিংহাসন অধিকার করবার চেষ্টা করেন। কথাটা আদৌ সত্য নয়।

এই যে 'বীজেন্দ্র'কে হান্টার রাজেন্দ্র বলেছেন। তদ্রূপ শাহাজাদা 'বাকের'কে 'বাবরে' রূপান্তরিত করা হয়নি তো ?

আরও একটি বিষয়ের প্রতি সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো এই যে, ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল ইংরাজ কোম্পানীর সহিত ধরেন্দ্র নারায়ণের এক সন্ধি হয়। পঞ্চাশ হাজার টাকা ইংরাজরা নিয়ে কোচবিহার রাজ্যের রাজাকে সাহায্য করতে সম্মত হয়। এই সময়ের পূর্বে কোচবিহার ভুটিয়াদের অধিকারে আসে। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, ভুটিয়া সেনাপতি জিম্পে অসাধারণ শৌর্য দেখিয়ে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তাহলে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে উক্ত সময়ে কোচবিহার রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ভুটিয়াদের অধিকারে এসেছিল। সময়টা যদি ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে হয় তাহলে ভুটিয়ারাও কি পুনরায় স্বাধীনতা আনয়নকারী বাঙ্গালীদের সাথে একজোট হয়ে ইংরাজ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ? ঐ সময় ও তার পূর্ব এবং পরবর্তী সময়গুলিতে কোচবিহারের জনসাধারণ রাজার বিরুদ্ধে ছিলেন। ইংরাজদের ইতিহাসে দেখা যায় যে, নাগারা (সন্ন্যাসী) বাঙ্গালীদের সাথে একত্র হয়ে একযোগে ইংরাজ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন।

তনখার প্রসিদ্ধ পরিবার মধ্যে মোগল বাদশার পক্ষীয় শেষ ফৌজদার

আলদাদ খাঁ ও তৎবংশীয় জামাল খাঁ নামীয় ব্যক্তি বঙ্গভাষায় সহিযুক্ত একখানি পাট্টায় বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষকে নিষ্কর ভূমি দান করেন।

এসব কথা আমি বর্তমান মালিক বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর খাজানা আদায়কারী তহশীলদার শহর উল্যা সরকারের কাছে শুনেছি। রংপুর জেলার মিঠা পুকুর থানার ময়েনপুর গ্রামে উক্ত শহর উল্যা সরকারের বাড়ী অবস্থিত।

আরও একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আলদাদ খাঁ সাহেবের উক্ত পাট্টাখানি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নিকট দেখেছেন বৃটিশ আমলের শেষ সেটেলমেন্টের সময়। তাঁর নাম হলো ডাক্তার সতীশ চন্দ্র মণ্ডল। গ্রাম—লোহানি পাড়া, থানা—বদরগঞ্জ, জেলা—রংপুর। উক্ত সতীশ চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের বাড়ীতে বৈদ্যনাথ বাবু তাঁর নিষ্কর ভূমির খাজানা আদায় করতে সময় সময় এসে বাস করতেন। উক্ত দুই ব্যক্তির স্মরণ থাকা পাট্টাখানির বিষয় এইরূপঃ "আলদাদ খাঁ ও জামাল খাঁ ১১৯৬ সাল ৫ই চৈত্র, কোট কাছারী লোহানী পাড়া।"

তনখার জমিদার কোববাদ খাঁর দেয়া একখানি দলিলের অবিকল নকল এখানে দেয়া হলোঃ

১. শ্রী বাহার উদ্দীন মণ্ডল, পিতা মৃত্যু আসমতুল্যা সরকার, ময়েন পুর পরগণে বাতাসন ষ্টেশন মোলঙ্গ, জেলা—রংপুর।

২. পরগণা বাতাসন অন্তর্গত

৩. কিসমত ময়েনপুর মধ্যে পিরপাল সন ১২০৭ সাল লাখেরাজ 'রজেষ্টারী বহি লিখিত নং ১১৯৩৬ নং

৪. গুলি মহম্মদ

৫. ওয়ারিসি সুত্রে

৬. এক সালের বাবত মত্তাজী ৯ বিঘা পিরপাল ওনাকে ষোলআনা আমি ভোগবান আছি ও তাহার বার্ষিক ১০ টাকা উৎপন্ন হয়।

৭. খোদাই মসজিদ

৮. ঈদায়নে নামাজ ও চেরাগ সোজী থাকহজী করিয়া অবশিষ্ট উৎপন্ন নিজে ভোগবান সর্ত।

৯. জেলা রংপুর চৌকি বদরগঞ্জ ষ্টেশন মোলঙ্গ পরগণা বাতাসন তৌজি ২২৪ নং মহলাধীন মৌজে ময়েনপুর মধ্যে মত্তাজী ৯ বিঘা পিরপাল জমি।

১০. ১২৮০ সাল মাহ্ ফাগুন।

১১. উক্ত পরগণার পূর্ব জমিদার কোব্‌বাদ খাঁ ১১৪৩ সালে ৯ই বৈশাখ তারিখে এক সনদ দ্বারা ৯/, বিঘা জমি নইমুল্ল্যাকে পিরপাল প্রদান করল। গ্রহীতা মজকুর ভোগদখল করতে লোকান্তর হওয়ায় তষ্য পুত্রগুলি মহম্মদ তদাভাবে তষ্যপুত্র আসমতুল্যা ও তদাভাবে তষ্যপুত্র সমদান মণ্ডল এবং তাহার লোকান্তরে ওয়ারিশি সূত্রে পাইয়া ভোগাধিকার করিয়া আসিতেছি। অতএব, প্রার্থনা যে, পূর্ব মোনটা প্রাপ্য ফিস ।০ আনা ও আবিষশক মত প্রমাণাদি গ্রহণে ১৮৭৬ইং ৭ই মার্চ মত পূর্ব নাম খারিজ আমার নাম জারি করিয়া একেওকালী পরওয়ানা প্রদানান্তে নিবেদন ইতি সন ১২৮৪—১৭ই বৈশাখ।

আমি শ্রী বাহারউদ্দিন ইহা জানাইতেছি যে, এই দরখাস্তের লিখিত বিবরণ সকল আমার জ্ঞানবিবেচনামতে সত্য অদ্য অত্র কাছারিতে এই সত্যতায় আমি দস্তখত করিলাম—ইতি

১২৮৪/১৭ই বৈশাখ

আরাজিয়াত নাখারাজ রেজেষ্টারী বহি মোতাবেক কালেক্টর। জেলা রংপুর সন ১২০৭ বাংলা

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
নম্বর রেজেষ্টারী	রকম ভূমি	ভূমি-দাতার নাম	ভূমি গৃহীতার নাম	হাল ভোগ-করনি-ওয়ালার নাম	হাল ভোগ করনিওয়ালা পূর্ব গৃহীতার সহিত কোন সম্পর্ক আছে কিনা অন্য কোন সূত্রে ভূমি ভোগ করে।	ভূমিদানের নিদর্শন লিখনি ও সন তারিখ	পরগণার নাম	মৌজা ও কিসমতের নাম	তায়দাদ জমি বিঘা কাঠা	কৈফিয়ত
১৯৩৬	পিরপাল	কবাজমা	নয়মল্ল্যা	উলি-মাসন্দ	পৌত্র	ইহার সনদ জাহির সন ১১৪৩ সাল ৯ই বৈশাখ	পং বাতাসন	ময়েন-পুর	৯/.	

Date of application for the copy-108 16.11.59	Date on which the copy was ready for delivery 9.12.59	Copied by 9.12.59	Compared by 9.12.59	Palcitan court fee No 302 চার আনার ষ্ট্যাম্প

১০৫ নম্বর বি, মৌজা লোহানী পাড়ায় এবং আরও কয়েকটি মৌজায় প্রদত্ত জমিগুলি রয়েছে। যখন বৈদ্যনাথ বাবু এসব এলাকায় শেষ বারের মত এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ৮০ বছরের কম ছিল না। বৈদ্যনাথ বাবুর পিতার নাম আশুতোষ চক্রবর্তী, পিতামহ পিতাম্বর চক্রবর্তী ও গোপাল চক্রবর্তী এই সমস্ত নাম উক্ত ব্যক্তিগণ বহুবার বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নিকট শুনেছেন। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী দিনাজপুর শহরের মুন্সী পাড়ায় বাস করতেন। অবশ্য এদের আসল নিবাস হলো পাবনা জেলা। সম্পত্তি চলে যাওয়ায় তিনি পশ্চিম বঙ্গে চলে যান। তাঁর সেখানকার ঠিকানা হলো শিলিগুড়ি, বর্ধমান রোড, জেলা-দার্জিলিং। উক্ত ঠিকানায় আলদাদ খাঁর দানকৃত পাট্টাখানি এখনও বৈদ্যনাথ বাবু অথবা তাঁর পুত্রদের নিকট থাকতে পারে।

যা হোক নবাব নূর উদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর মাতুল ফৌজদার আলদাদ খাঁ সাহেব ১১৯৬ বাংলা সনে বেঁচেছিলেন যে তা উক্ত পাট্টার কথা অনুযায়ী বোঝা যায়।

শাহজাদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ যে মোঘল রাজবংশীয় তাতে সন্দেহ নেই। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলম তখনও এদেশীয় সর্বশ্রেণীর সর্ব ধর্মের প্রজাসাধারণের কতখানি প্রিয় ছিলেন, তা বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং চিন্তাবিদ রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নিম্নোক্ত সুচিন্তিত কথা হতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে ঃ

> যখন সিপাহী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহার অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে হইতে দিল্লীর মোগল অধিপতি সম্পত্তিচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত হইয়া বৃটিশ কোম্পানীর সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহার বংশের পূর্ব্বতন গৌরব, পূর্ব্বতন সম্মান ও পূর্ব্বতন প্রভু-শক্তির কথা অন্তর্হিত হয় নাই। আকবর শাহ্ যেরূপ ক্ষমতায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, শাহ্জাহান যেরূপ প্রভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া আত্মপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব ভারতের সর্বত্র আপনার প্রভুত্ব বদ্ধমূল রাখিতে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা তখনও লোকের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। যদিও এখন মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, মোঘল পতাকা যদিও এখন ভারতের অনেক স্থান হইতে অপসারিত হইয়াছিল, তথাপি মোগলের ক্ষমতা ও মোগলের গৌরবের নিকট এখনও সকলেই মস্তক অবনত করিতেছিল। এই ক্ষমতা

ও গৌরবের কাহিনী এখন জনশ্রুতিতে পরিণত হইলেও উহা সাধারণের মনে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, কেহই সেই জনশ্রুতির অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই।

ভারতে বৃটিশ কোম্পানীর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও কিছু কাল মোগল ভূ-পতির নামে টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন এই ভূপতির অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু অবস্থান্তরপ্রাপ্তিতেও তিনি সাধারণের অনাদর বা অশ্রদ্ধার পাত্র হন নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই সমভাবে এক সময়ে মোগলের সরকারে প্রধান রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন, উভয়েই সমভাবে মোগলের সৈন্য চালনা করিতেন, রাজনৈতিক বিষয়ে মোগলকে সৎপরামর্শ দিতেন এবং মোগলের অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনাদের ক্ষমতা ও সৎকার্য্যে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিতেন। এখন তাহাদের সন্তানগণ দেখিলেন, যে তাহাদের সেই ক্ষমতা, সেই প্রাধান্য, সেই প্রভুত্ব বর্তমান শাসনকর্তাদের রাজনীতির গুণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মোগলের রাজ্যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ যে গৌরবে সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন, ইংরেজের অধিকারে তাঁহাদের গৌরব চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা ইংরেজরাজ অপেক্ষা বর্তমানে মোগল অধিপতিকেই অধিকতর শ্রদ্ধা ও অধিকতর সম্মানের সহিত চাহিয়া দেখিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহার পূর্ব্বপুরুষের সমদর্শিতা ও সুরাজনীতির গুণে সেনাপতি, রাজস্ব মন্ত্রী, সুবাদার প্রভৃতি হইতেন, তাঁহার বর্তমান অধোগতিতেও তাঁহারা সেই অতীত গৌরবের কথা ভুলিয়া যান নাই। দিল্লীর সুরম্য রাজপ্রাসাদ এখনও শোভা বিকাশ করিতেছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এই রাজপ্রাসাদ দেখিয়া ভাবিতেন, যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এক সময়ে এই রাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়া রাজানুগ্রহে এবং আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যের মহিমায় গৌরবান্বিত হইতেন, এখন তাহাদিগের সে দিন অন্তর্হিত হইয়াছে, এখন সে আশা ও সে বিশ্বাসও সুদূরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। এখন তাঁহারা বর্তমান ভূ-পতির বিচারে ক্ষমতাচ্যুত, অধিকারচ্যুত ও সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছেন। মোগল সম্রাট তাঁহাদের পিতা বা তাহাদের পিতামহগণের প্রতি যে অনুগ্রহ জন্মাইতেন, বর্তমান ইংরাজ রাজ তাঁহাদিগকে সে অনুগ্রহে বঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং দিল্লীর ভূ-পতি অবনতিগ্রস্ত হইলেও

তাঁহাদের পূর্ব্বতন গৌরব ও পূর্ব্বতন সম্মানের উদ্দীপক ছিলেন। দিল্লী এখনও রাজলক্ষ্মী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও আপনার পূর্ব্ব গৌরবে সাধারণের আদরণীয় ছিল।........

...খৃষ্টীঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লর্ড লেক ও ওয়েলেসলি দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলমকে পরাক্রান্ত মরহাট্টাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। এই সময় শাহ্ আলমের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। তিনি জরাজীর্ণ ও অন্ধ হইয়া দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মরহাট্টাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বৃদ্ধ মোগল সম্রাট এখন ইংরেজের হস্তে পড়িলেন।........

...দিল্লীর যুদ্ধে লর্ড লেক যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া শাহ্ আলমের নিকট উপনীত হন, তখন তিনি মারহাট্টাগণ অপেক্ষা অধিকতর উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। মারহাট্টাগণ শাহ্ আলমের ভরণ-পোষণার্থে যে সম্পত্তি বা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেন, লর্ড লেক তাহার কিছুই বাড়াইয়া দিতে সমর্থ হন নাই।...

...দিল্লীর অধিপতি এখন আপনার ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ-জন্য বার্ষিক কিছু অধিক ১০ লক্ষ টাকা বৃত্তি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরাক্রান্ত তৈমুর বংশের এইরূপে অধঃপতন হইল। সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট অপরিসীম প্রভু-শক্তির অদ্বিতীয় অবলম্বন এইরূপে আপনার অসীম প্রভুত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া ইংরেজ কোম্পানীর নির্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। এই শোচনীয় অবস্থাতেও বৃদ্ধ শাহ্ আলম ধীরতায় ও আত্মসন্তোষে নিজেকে বিসর্জ্জন দেন নাই।...

...শাহ্ আলম সম্পত্তি-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের সম্মান হইতে স্খলিত হন নাই।...

—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়
(দিল্লী), তৃতীয় সংস্করণ ১৩১৭, পৃষ্ঠা ১৪১—১৪৫

উপরের কথাগুলো হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে, যে মোগল সিংহাসনের প্রতি তখনও মানুষ অনুগত, অনুরক্ত এবং ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত ছিল। আর এই ভয়ই হলো ইংরেজদের আসল কারণ। যাক, এখন আমরা পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাই।

হাণ্টার সাহেব তাঁর লেখায় বলেছেন, পাটগ্রামে নূর উদ্দীনের দলবল

ছিল। পাটগ্রাম যেমন মোগলকুঠি হতে উত্তরে অবস্থিত, মোগলহাট বা মোগলকুঠি হতে নবাবের অসমাপ্ত রাজধানীটিও তদ্রূপ দক্ষিণে। আর রাজধানীটিতে তো আরো সৈন্য থাকবার কথা। কিন্তু সুচতুর হান্টার সাহেব লোকের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন উত্তরদিকে—পাটগ্রামে। অথচ রাজধানী ফুলচৌকি বা নগরের নাম একবারও উল্লেখ করেন নি। অসাবধানতা বশতঃ তিনি তা করেন নি—তা নয়, আসলে সাবধানতাবশতঃ তা তিনি করেন নি। নবাব নূরউদ্দীনের মোগলহাটস্থিত কুঠি বাড়িটিতে ইষ্টক নির্মিত পাকা কয়েকটি সৌধ ছিল। কুঠির সম্মুখে ফুল ও ফলের বিরাট বাগান শোভিত ছিল।

মোগলকুঠির সম্মুখস্থ প্রান্তরে এখন হাট বসেছে। স্থানীয় লোকেরা হাটটির নাম দিয়েছে 'দুড়ার কুঠির হাঠ'। কচ্ছপকে আঞ্চলিক ভাষায় দুড়া বলা হয়। কচ্ছপের উপরিভাগের মত মোগলকুঠির স্থানটির জন্য অধুনা উক্ত নামকরণ স্থানীয়রা করেছেন। বর্তমানে মোগলহাট হতে মোগল কুঠির দূরত্ব দু'মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হবে।

স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ায় লোকে প্রান্তরটিকে ফুলের গাছের জঙ্গল বলে থাকে। উক্ত মোগল কুঠির দু'মাইল উত্তরদিকে দুর্গাপুর গ্রাম অবস্থিত। দুর্গাপুর গ্রামে 'জয়দুর্গার বুরুজ' নামীয় একটি সুউচ্চ বুরুজের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। ইংরেজদের বুকে ভীতি-সঞ্চারকারী জয়দুর্গা দেবীর নামে উক্ত বুরুজটি নির্মিত হয়। শোনা যায়, জয়দুর্গার বুরুজ নামীয় দুর্গাপুরের উপর্যুক্ত বুরুজ হতে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত কান্তেশ্বরের মন্দির দেখা যেত। শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করবার এবং তাদের বাধা দেবার জন্য উক্ত বুরুজটি নির্মিত হয়। বুরুজ হতে কান্তেশ্বরের মন্দির ছয় মাইল উত্তরে অবস্থিত। উল্লেখযোগ্য যে, কুচবিহারের রাজা ইংরেজ পক্ষে সবসময় ছিল। আশ্চর্য ও দুঃখজনক হলেও দুর্গাপুরের কতিপয় লোকের নিকট থেকে যা শুনেছি তা হলো—বুরুজের মালিক জয় দুর্গাদেবী কে ছিলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তারা বলে, 'এক বেশ্যা'। তিনি এই বুরুজের উপরে উঠে নৃত্য করতেন এবং ডাকাতিও করতেন। বুরুজের উপরে উঠে কান্তেশ্বরের মন্দিরও দেখতেন। তারা আরও বলে, এই মহিলা গরীবদের বাপ-মা ছিলেন। কেন ছিলেন প্রশ্ন করায় উত্তরে তারা বলে যে, তিনি অকাতরে গরীবদের

মধ্যে ধন ও খাদ্য বিতরণ করতেন এবং অত্যাচারী ফিরিঙ্গীদের সহিত লড়াই করেছেন। —তবে অধিকাংশ লোক বীরাঙ্গনা জয়দুর্গা দেবীর আসল নাম জানে ও বলে। এদের সম্পর্কে, পরে ইংরাজদের প্রচারণা যা হয়েছিল সেই ভুল ধারণা থেকে 'বেশ্যা', 'ডাকাত' এসব কথাও তাদের কেউ কেউ বলেছে। উক্ত দুর্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে খোড়া নদী নামে মজে-যাওয়া একটি খাল রয়েছে। পূর্বে গীরিধারী নদীটির সাথে ঐ খালের যোগ ছিল। যাতে করে মোগলকুঠিতে যাওয়া-আসা করা যায়—মালামাল এবং লোক-লস্করসহ। তাদের নানা প্রশ্ন করার পর তারা বললো, আর বুরুজের অর্ধমাইল পূর্বদিকে 'ডাকাত পাড়া' বলে জনশূন্য একটি স্থান দেখিয়ে দিল। উক্ত স্থানটি গীরিধারী নদীতে অধিকাংশ ভেঙ্গে নিয়েছে।

কয়েক বছর হলো, লোকদের কথিত 'ডাকাত পাড়ায়' আগের দিনের একটি প্রকাণ্ড ইঁদারা বালুচর থেকে বের হয়েছে। ইঁদারাটির মুখের বেড় ৪২ হাত। উক্ত ইদাঁরাটি পাকা ইট, চুন ও সুরকি দিয়ে নির্মিত। ইদাঁরাটি এখনও আগের মত অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। জয়দুর্গা দেবীর নামানুযায়ী উক্ত জনপদের নাম দুর্গাপুর হয়েছে। এ কথাও দুর্গাপুরের অনেক লোকই বল্‌লেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, উপরোক্ত নদীটির ঐ স্থানের নাম 'গীরিধারী' ও 'ডাকাত পাড়া' হওয়ার মধ্যে সন্ন্যাসীদের এবং আরও অনেকের স্মৃতি মনে জাগিয়ে দেয়। সন্ন্যাসী এবং ফকিরেরা যে ডাকাত ছিল না, বরং ইংরাজ ও তাদের তাঁবেদার নবাব মীরজাফরের ঘোরতর দুশমন এবং মীরজাফর ও ইংরাজদের এদেশ হতে ক্ষমতাচ্যুত ও বিতাড়িত করবার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করে এসেছেন তা বোঝা যায়। এরা যদি ডাকাতই হবে, তবে এই ডাকাতদের সাথে সম্রাট শাহ্ আলমের যোগ-সূত্র থাকে কি করে ? ফকির সন্ন্যাসীর রাজা দুলর্ভরামের নিকট হতে টাকা ও চিঠি নিয়ে সম্রাটের কাছে যায়, তা মোতাখ্খারিন ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ হতে পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। যদিও মোতাখ্খারিন ইতিহাসের লেখক গোলাম হুসেন ছিলেন মুর্শিদাবাদী মীরজাফরের পক্ষে, তথাপি তাঁর ইতিহাস হতে যে সত্য বেরিয়ে আসছে, তাতেই বোঝা যায় ফকির-সন্ন্যাসীরা ডাকাত-দস্যু ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন এদেশকে মুক্ত করবার সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ সৈনিক। নিম্নোক্ত কোটেশন হতে তার প্রমাণ মিলবে ঃ

এ সময়ে ছোট পার্শ্বেলে করে শাহী খাজাঞ্চীখানার জন্য সন্ন্যাসী

> ফকিরদের সূত্রে রাজা দুর্লভ রামের কাছ থেকে অনেক টাকা আসে। সন্ন্যাসী, ফকিরেরা এমন সব চিঠিও নিয়ে এল যাতে রাজার সম্রাটপদে ভক্তির বিশেষ স্থির নিশ্চয়তা রয়েছে।
>
> —মুতাখ্‌খারিন ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ

এখন আমরা পূর্বের কথায় আসি। যদিও রংপুরের অনেক লোক জানতো যে, নবাব নূর উদ্দীন কে আর তাঁর পরিচয়ই বা কি ?

নূরউদ্দীনের আসল নাম হলো, বাকের মুহাম্মদ অর্থাৎ শাহজাদা সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। এই নামই স্থানীয় লোকরা বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে বলে আসছে। আর একটি বিষয়ের দিকে পাঠকদের আমরা দৃষ্টি দিতে বলি, তা হলো এই, যে নূরউদ্দীন ও তার সঙ্গী রাজা ভবানী পাঠকের কোথায় কোন স্থানে কিভাবে মৃত্যু হলো সঠিকভাবে কিছুই জানা যাচ্ছে না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, একমাত্র যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বলেছেন ঃ

"নূরুল উদ্দীন আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন।" কিন্তু হান্টার অথবা অন্য কোন ইংরেজ কর্মচারী লেখক কিংবা এদেশীয় কোন ঐতিহাসিকই নবাব নূরউদ্দীন আহত হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু কখন হলো এবং কোথায় হলো একথা বলছেন না। অথচ মজনু শাহ্‌র মৃত্যুর কথা ইংরাজ লেখকগণ এবং রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ তাঁর সম্পাদিত বা লিখিত 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের মধ্যে রংপুরের কালেক্টরের বরাত দিয়ে বলেছেন, ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে মজনু শাহ্‌ ইহলীলা ত্যাগ করেন। কিন্তু কোথায় কোন স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তা অবশ্য বলা হয়নি। নবাব নূরউদ্দীন বা মজনু শাহ্‌ সম্পর্কে যেমন মৃত্যুর সঠিক কারণ, স্থান, সন ও তারিখ ঠিক-ভাবে দেওয়া হচ্ছে না, তদ্রূপ মজনু শাহ্‌ বা নবাব নূরউদ্দীনের মত ভবানী পাঠকেরও কিভাবে মৃত্যু হয়েছে অথবা কি হয়েছে, তা সঠিকভাবে জানা যাচ্ছে না। বিশ্বকোষের নিম্নোক্ত টীকায় লেখা হয়েছে ঃ

> শুনা যায় ইংরাজ বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের সৈনাপত্যে যুদ্ধে ভবানী পাঠক ও তাঁর অধীনস্থ তিন জন সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।
>
> —বিশ্বকোষের ভবানী পাঠক হতে উদ্ধৃত

তৎকালীন দেশপ্রেমিকরা কি ধরনের ডাকাত-দস্যু ছিলেন, তা ইতিহাসের নিম্নোক্ত কথাগুলো হতে পরিষ্কার হয়ে আসবে ঃ

> বিদ্রোহীদের দলভুক্ত প্রায় ২ হাজার সন্ন্যাসী বরকন্দাজ কামান ও বন্দুক লইয়া বাংলা ১১৯৫ সনের ১৬ই শ্রাবণ তারিখে নাজিরগঞ্জে (কোচবিহার) কোম্পানীর সিপাহী দলকে আক্রমণ করে।
>
> —কোচবিহারের ইতিহাস, ৩২৫ পৃষ্ঠা

যেখানে সন্ন্যাসী, ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদিগকে ডাকাত, দস্যুদল বলা হচ্ছে, তারা ইংরাজ কোম্পানীর সিপাহী দলকে আক্রমণ করবে কেন? ডাকাত হলে তো সাধারণ বিত্তবানদের বাড়ীতে লুটতরাজ করবে। আবার তাদের সঙ্গে কামান, তাও সেকালের বৃহদাকার কামান। এত বড় ভারী অস্ত্র নিয়ে কি ডাকাতেরা কখনো ডাকাতি করে? বড় আশ্চর্যের কথা! এখানে আরো একটি কথা না বললে হয়তো আমাদের বক্তব্যগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ১৭৬০ খৃস্টাব্দের প্রথম হতে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ নতুন নবাব হয়ে বাংলায় বিশেষ করে রংপুরকে কেন্দ্র করে বাংলার সকল শ্রেণীর লোকদের সহযোগিতায়, ইংরাজ ও তাদের তাঁবেদার নবাবের বিরুদ্ধে নানাভাবে, নানা কায়দায় বিরোধিতা ও যুদ্ধ করে আসেন। ঐ সময় 'মজনু মোল্লা' নামে পীর ফকির খান্দানের এক মশহুর সম্মানী লোককেও সঙ্গে করে তাঁর পরিবার-পরিজনসহ নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ নিয়ে আসেন দিল্লী হতে।[১] উক্ত মজনু মোল্লা ও তাঁর বংশধররা খুবই সম্মানী বলে সেই হতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দ্বারা জমিদারী উঠে যাওয়ার সময় পর্যন্ত শুভ পুণ্যাহের কার্যাদি করে এসেছেন। এই মজনু মোল্লা এবং তদবংশীয়েরা ধর্মীয় নেতা ছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই মোল্লা সাহেবরা লোকের যে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অথবা শুভ কাজে দোয়া-দরূদ পড়তেন। লোকে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গরু, ছাগল, মুরগী, পোলাও মানত হিসেবে রান্না করে কেউ ভক্ষণ না করে আগে মোল্লা সাহেবের বাড়ীতে বা চিল্লায় (দরগায় শিরনি দেওয়া বলা হতো) কিছু অংশ নিয়ে আসতো এবং মোল্লা সাহেব কুরআন শরীফের আয়াত ও দোয়া-দরূদ পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর ঐসব জিনিস অন্যান্য

---

[১] মজনু মোল্লার আসল নাম রহমত উল্যা মোল্লা—ডাকনাম 'মজনু'। এবার পাকা বাঁধানো কবর উহাদের বাস্তুভিটায় আজ অবধি রয়েছে।

অংশের সহিত মিশ্রিত করে সবাই খেতেন। মোল্লা সাহেবের দরগায় লোকে ফুল ও ধুলি নিয়ে আসতো। সেই ফুল ও ধুলিতে মোল্লা সাহেবেরা কুরআন শরীফের আয়াত ও দোয়া-দরুদ পড়ে ফুঁ দিতেন এবং লোকেরা ঐ ফুল নিয়ে খেত এবং ধুলি গায়ে মাখতো। যে কোন অসুখ এবং যে কোন মনস্কামনা পূর্ণ হবার জন্য এরূপ করা হতো। মোল্লাদের পূর্বের উক্ত ব্যবহৃত ইষ্টকে নির্মিত পাকা দালান দরগাগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখন অবধি রয়েছে। যেমন কলকাতা মওলা আলীর দরগাহে ফুল, মিঠাই-মণ্ডা প্রভৃতি দেওয়ার রেওয়াজ আছে এবং তা লোকে নিয়ে যেয়ে খায়, লোকে তদ্রূপ মোল্লা সাহেবদের দরগাহে করতেন। এক কথায় মুসলমানদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং যে কোন শুভ কাজে মোল্লারা এই মোগল রাজ-পরিবার এবং অন্যান্য লোকের প্রধান পীর বা ইমাম ছিলেন। ধর্মীয় পীর ছিলেন বলে জানা যায় না। কারণ তাদের পীরগিরির ব্যবসা ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এখানে আরো একটি কথা এই যে, আমার ৯/১০ বছর বয়স হতে এই প্রবন্ধ শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত কোন প্রাচীন, অপ্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিকট শুনি নাই এবং কেউ বলেনও নি যে, মজনু মোল্লা সাহেব কিম্বা তাঁর পুত্র-পৌত্ররা ইংরাজ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। যুদ্ধের সহযোগিতা করেছেন এ কথাও কারো কাছে শুনি নাই অথবা কেউ বলেনও নি। তবে মনে হয়, নবাবের সাথে এবং নবাবের অন্যান্য লোকের সাথে এঁরা দোয়া-দরুদ পড়বার জন্য কখনও কখনও যুদ্ধ শিবিরে গিয়ে থাকতে পারেন। প্রাচীনরা যখনই এইসব প্রাচীন কথা ওঠাতেন, তখন কথা প্রসঙ্গে বলতেন—শাহজাদা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে ইংরাজরা মজনু শাহ্ বা মজনু ফকীর বলতেন। এমনকি মজনু মোল্লা সাহেবের নামটি পর্যন্ত যুদ্ধাদি সম্পর্কের কোন আলোচনাতেই প্রাচীনদের উথাপন করতে শুনিনি। তবে হয়তো সুচতুর ইংরাজরা নবাব নূরউদ্দীনের প্রধান ইমামকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাল্পনিক নায়ক কাগজে-কলমে আর প্রচারের মাধ্যমে করে এসেছে। কিন্তু ইংরাজ বিরোধীদের রাজধানী ফুলচৌকি এবং রংপুরের জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজদের এসব মিথ্যা প্রচারের কোন প্রভাবই আজ পর্যন্ত পড়েনি।

‘বাংলা বিশ্বকোষ’-এ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সুচিন্তিত আলোচনায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ভবানী পাঠক এবং প্রধান সহকারীরূপে দেবী

চৌধুরাণী ও মজনু শাহের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে ইংরাজদের রিপোর্ট-সূত্রে দেখা যায়—কোন এক লেখক 'হনুমানগীরি'-কে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বলেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, বিশ্বকোষের লেখক ইংরাজদের ঐ কথাকে কোন আমলই দেননি। 'কোচবিহারের ইতিহাসে'ও 'বিশ্বকোষের' অনুসরণ করা হয়েছে। বিশ্বকোষের লেখক মহোদয় বেশ ভাল করে জানতেন (ঐ সময় জানবার সুবিধাও ছিল এখনকার থেকে অনেক বেশী)। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীদের দলপতি ছিলেন ভবানী পাঠক। আমাদের কথা হলো মজনু মোল্লা বা তার লোকেরা যুদ্ধ সমর্থন ও প্রচার আর লোক-সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে হয়তো থাকতেন, তবে নেতা ছিলেন শাহযাদা স্বয়ং। আরও কথা হলো মজনু মোল্লা এবং মজনু শাহ্ এক নাম হলেও পদবী এক হচ্ছে না। 'মুগল প্রিন্স' দেরকেও 'শাহ' বলা হতো—এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। হয়তো পরে মজনু শাহ্‌কে (প্রিন্স বাকেরকে) বিদেশীয় লেখকরা তাদের পক্ষপাতিত্বপূর্ণ লেখার মাধ্যমে তাদের গ্রন্থাদিতে ফকিরে রূপান্তরিত করেছেন। তবে 'বিশ্বকোষ' এবং 'কোচবিহারের ইতিহাসে'র লেখকরা যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইংরাজ-কথিত প্রধান নায়ক স্বীকার করে নিতে পারেন নি, তদ্রূপ আমরাও মজনু মোল্লাকে[১] ফকির বিদ্রোহের নেতা মেনে নিতে পারছি না। আসল কথা হলো, বৃটিশ-বিরোধী এই অভিযান অভিন্ন এবং একই খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা আন্দোলনের বিভিন্ন নাম দিলেও আন্দোলন যে মূলত একই খাতে, একই নেতৃত্বে হয়েছিল তা ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আশা করি অভিজ্ঞ পাঠক বৃটিশদের 'Divide and rule' নীতি ধরতে এবং বুঝতে পেরেছেন। আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো নবাব নুরউদ্দীনের মৃত্যু ইতিহাসের কথামত ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে এবং ইংরাজদের কথিত মজনু শাহ্ ফকিরের মৃত্যু হয় ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে। তা হলে ধূর্ত ইংরাজরা মোল্লার মৃত্যুর কথাই কি এখানে বলেছেন? তবে মজনু মোল্লা যে ইংরাজ বিরোধী নায়ক

---

[১] মজনু মোল্লার কবর যেমন রয়েছে ফুলচৌকির মোল্লা বাড়ীতে, আমাদের আলোচ্য নবাব নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ (ইংরাজদের মজনু শাহ মজনু ফকীর)-এর কবর রয়েছে ফুলচৌকি শাহী খান্দাদের মসজিদের সামনে তাদের নিজস্ব কবর স্থানে। অথচ যামিনী ঘোষ বলছেন ধুলির দক্ষিণে মেওয়াট রাজ্যে মজনু ফকিরকে কবরস্থ করা হয়েছে। ইহা সম্পূর্ণ অলীক, মিথ্যা ও কাল্পনিক গল্প মাত্র।

ছিলেন না, বরং শাহযাদা বাকের-মনোনীত ইমাম ছিলেন তা ঘটনাগুলি হতে পরিষ্কার হয়ে পড়েছে। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর বংশধররা উক্ত মজনু মোল্লার বংশধরদের পরস্পর বংশ-পরম্পরায় সম্মান ও প্রতিটি শুভ কাজে তাঁদের (মজনু মোল্লার বংশধরদের) সহযোগিতা নিয়ে এসেছেন—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি মজনু মোল্লার বংশধররা জমিদারী উঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নবাব নূরউদ্দীনের বংশধরদের 'শুভ পুণ্যাহের ঘট' উদ্বোধন করে এসেছেন প্রতি বৎসর—এসব কথাও বলা হয়েছে। এখন কথা হলো, সুচতুর ইংরাজরা ইংরাজ বিরোধী নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর নাম পরিচয় গোপন করে এই মজনু মোল্লার প্রচারটাকেই কি চালিয়েছেন ? এখনও উক্ত নবাব সাহেবের বংশীয়দের নবাবী বালাখানার সন্নিকটে সেই সময় থেকে মজনু মোল্লার বংশধররা (ফুলচৌকি) বসবাস করে আসছেন।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। তা হলো এই যে, আমার জন্মভূমি উক্ত ফুলচৌকি নগরে। আমি একবার নয়, বহুবার, বহু সময় অনেক কথার মাধ্যমে ছোটবেলায় শুনেছি, প্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলতেন যে, ফিরিঙ্গীরা মুগল শাহয়াদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে মজনু শাহ বলত এবং লোকদের বলবার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে বেড়াতো। এইসব লোকদের মধ্যে যে দু'জন লোক স্বচক্ষে তাঁদের ছোট বেলায় নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদকে দেখেছেন, তাঁদের একজনের নাম হলো শরিতুল্যা সরদার, দ্বিতীয় জনের নাম হলো খড়িয়া বরকন্দাজ। অপর একজন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে দেখেন নি, তবে বাকের মুহাম্মদ এর পুত্র-কন্যাদের দেখেছেন ৩০/৩৫ বৎসর বয়স অবধি এবং ইনি তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। এর নাম আমীর মিঞা বা আমির খাঁ। ইনি তনখার মিঞাদের বংশধর। তাছাড়া নবানু ফকির, শহরউল্ল্যা সরকার প্রমুখ সুপ্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পূর্বোক্ত লোকদের মত বহু বার বহু সময় বলতেন যে, ফিরিঙ্গীরা শাহযাদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে মজনু শাহ বলত এবং লোকদের বলবার জন্যে জোর তাকিদ দিত। যে মজনুর মৃত্যু 'রংপুরের কালেক্টরের কথামত' ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে বলা হচ্ছে, তাকে আমরা মজনু মোল্লা মনে করি। দিল্লীর নিকটবর্তী আলোয়ার রাজ্যের অন্তর্গত মেওয়াট জেলায় ধুল্লি নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে

তাঁকে কবরস্থ করা হয়। এত দূরের খবর তিনি রাখলেন অথচ তাঁর (রংপুরের কালেক্টর) 'জুরিসডিকশনের' খবরটা কোন্ থানার কোন্ গ্রামে বা জনপদে মজনু ফকিরের মৃত্যু হলো, তা তিনি জানেন না; বলেছেন না, এ কেমন কথা? অবশ্য মজনু মোল্লার বংশীয়রা এ সমস্ত কথা ইংরাজদের মনগড়া বানানো কথা বলে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন। তাদের কথামত মজনু মোল্লার কবর ফুলচৌকিস্থ তাদের পরিবারের কবর স্থানে হয়েছে। তবে তিনি কত সালে মারা গেছেন সে-খবর তাঁরা জানেন না বা বলতে পারেন না। সুতরাং রংপুর কালেক্টরের বরাত দিয়ে পরিবেশিত মজনুকে কবরস্থ করার সংবাদ ইংরাজদের বানানো কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়। তা'ছাড়া ইতিহাসকে জটিল করে তোলার উদ্দেশ্যেই তারিখটি গোপন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে আরো বলা চলে, ১৭৮৭ সালের মার্চ অথবা মে মাসে ইংরাজদের কথিত মজনু শাহ অথবা মজনু ফকিরের মৃত্যুর কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু কথিত নবাবের বিদ্রোহের পূর্বে আরও একজন যে নেতা ছিল, এই কথা পাঠকদের জানবার জন্য কি? মজনু মোল্লা রংপুর জেলার কোন স্থানে অথবা জনপদে মারা গিয়েছেন সে কথাও কিন্তু একেবারে বলা হয়নি। তবে নেতা যে একজনই ছিলেন এবং সে নেতা যে শাহযাদা নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ, তা' তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে আন্দোলনের তীব্রতা বহু পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় বেশ বোঝা যাচ্ছে। ইংরাজদের কথিত মজনু শাহ বা ফকির, যদি আলাদা নেতাই হতেন, তবে নবাব নূরউদ্দীনের ১৭৮৩ সালে (মার্চ মাসে অথবা মে মাসে) মৃত্যুর পর আন্দোলন এভাবে ঝিমিয়ে পড়তো কি? তবে লোকদের ধোঁকায় ফেলে রাখবার জন্য সম্ভবত মজনু মোল্লার মৃত্যুর তারিখটি দেখান হয়েছে। ১৭৮৭ সালে মার্চ মাসে অথবা মে মাসে মজনু মোল্লা মারা গেলেন, অথচ এর সঠিক তারিখটিও প্রতাপশালী ইংরাজের গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারলো না!

'মুতাখ্খারিন'-এর লেখক তাঁর উক্ত গ্রন্থে যা লিখেছেন তার ভাবার্থ হলো, "বাদশা দ্বিতীয় আলমগীরের ভাতিজা এবং জামাতা শাহযাদা বাবর।" উক্ত ইতিবৃত্তের লেখক তার ঐ গ্রন্থে আরও বলেছেন, "তাঁর (লেখকের) পিতা সৈয়দ হিদায়েত আলী বাদশাহ শাহ আলমের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি (মুতাখ্খারিনের লেখক) নিজে ইংরাজ ও তাদের এদেশীয় নবাবের পক্ষে ছিলেন।" আরও ভাববার বিষয় যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

প্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী নবাব নূরউদ্দীন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুকুমে উক্ত ফার্সী 'মুতাখ্খারিন' ইতিহাস কখনও ফার্সী ভাষায় ছাপা হয়েছিল কি না তাও আমরা অবগত নই। সে যা হোক, ইংরাজ পক্ষীয় মুতাখ্খারিনের লেখক অথবা ইংরাজী ভাষায় অনুবাদক—এঁদের দু'জনের মধ্যে যে কোন একজন বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের ভাতিজা ও জামাতা শাহযাদা বাকেরকে বাবর হিসেবে যে চিত্রিত করেছেন তা আমরা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি এবং লোকেরাও তাই করে। কূটবুদ্ধি বিশারদ, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ইংরাজদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। উক্ত শাহযাদা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ সম্বন্ধে ফুল চৌকিস্থ তাঁর বংশধররা এবং রংপুরের সাধারণ শত শত পরিবারের লোকেরা এখনও বলেন যে, "শাহযাদা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ ছিলেন বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের ভাতিজা ও জামাতা।" উভয় পক্ষের কথাই হচ্ছে এক রকম। শুধু নামের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। মুতাখ্খারিনের সঙ্গে সবটাই মিলছে, শুধু মিলছে না 'বাকের'। ব্যাপারটা একই। হান্টার হলওয়েল প্রমুখ ইংরাজ তাদের সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করার জন্যেই মিথ্যার ইতিহাস তৈরী করেছে।

উল্লেখযোগ্য যে, মুতাখ্খারিন (ইংরাজী অনুবাদ) পাঠে জানা যায় যে, ১৭৬০ সালে নবাব মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিম ঐ সময়ের মধ্যে রংপুরে ফৌজদার ছিলেন। এ থেকে ঐ সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, যাদবেশ্বরের সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পাদনায় কাকিনা রাজবাড়ীতে ঐ বংশীয় রাজাদের হস্তলিখিত ইংরাজী ভাষার একখানি ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৬০ খৃস্টাব্দে বা ঐ সময়ের মধ্যে রংপুরের ফৌজদার ছিলেন আলদাদ খাঁ। ওদিকে ইংরাজী মুতাখ্খারিন লিখছে, মীরজাফর ও ইংরাজ পক্ষীয় ফৌজদার মীর কাসিম আলী খাঁ। তা'হলে আলদাদ খাঁ তাঁর বিপক্ষীয়দের ফৌজদার যে হবেন বা ছিলেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! এই আলদাদ খাঁ হলেন রংপুর জেলাস্থ মিঠাপুকুর থানাধীন তন্খা মৌজার বাসিন্দা। এঁরা বংশ-পরম্পরায় পাঠান ও মুগল বংশীয়দের সাথে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এঁরা সৈয়দ বংশোদ্ভূত। এই স্থানের লাখেরাজ ভূ-স্বামী ও জমিদার ছিলেন। শোনা যায়, উক্ত ফৌজদার আলদাদ খাঁর

বংশীয়রা পুরুষানুক্রমে সম্রাটদের বড় বড় পদে কাজ করে এসেছেন। আমাদের আলোচ্য নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর মামা হলেন উক্ত ফৌজদার আলদাদ খাঁ সাহেব। এই বংশের লোকেরা ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী (ব্যাটেল অব মসিমপুর) মসিমপুরের যুদ্ধ হতে ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ পর্যন্ত ইংরাজ ও তার তাঁবেদার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সর্বস্বান্ত এবং শহীদ হয়েছেন; তথাপি আত্মসমর্পণ করেন নি। উক্ত আলদাদ খাঁর পিতা অথবা পিতৃব্য হলেন কোব্বাদ খাঁ।

ঐতিহাসিক শ্রী অশোক মেহতা লিখিত 'আঠার শ' সাতান্নের বিদ্রোহ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে ঃ

> তালিয়ার খানের দুই ছেলে তংখা থেকে এসেছিল দিল্লীতে বেড়াতে—
> বিদ্রোহ ঘটাতে। তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। তাদের গুলী করে
> হত্যা করা হয়েছে আজ। —গালিব রচিত উদ-ই-হিন্দ

এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তংক বলতে পশ্চিম ভারতের তংক বা টংকের নবাবের রাজ্যকেই মনে করতে পারেন। কিন্তু ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, টংকের নবাবরা ঐ সময়ে (১৭৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহে) ইংরাজদের পক্ষে ছিল। সুতরাং তাদেরকে গুলী করে মারার কোন প্রশ্নইওঠে না। কবি গালিব বর্ণিত তালিয়ার খাঁ নামীয় কুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও ভ্যালোয়ার সরোবরের (আর্টিফিশিয়াল লেক) পূর্ব পাড়ে বিরাজমান রয়েছে। লোকে এখনো 'তালিয়ার খাঁর কুঠি' 'তালিমগঞ্জের কুঠি' বলে থাকেন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মসিমপুরে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আছালৎ খাঁ, দিলির খাঁ এবং তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামগর খাঁ—এই তিন ভাই অদ্ভুত যুদ্ধ কৌশলে নবাব মীরজাফর ও তাঁর সাহায্যকারী ইংরাজ বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এসব কথা 'মুতাখ্খারিনে' এবং 'বিশ্বকোষে' রয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি, নবীন বাদশাহ শাহ আলম স্বয়ং মসিমপুরের যুদ্ধে এসেছিলেন। ঐ সময় যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে একজন নবাবকে অবশ্যই নির্বাচিত করা হয়েছিল। সেই নবাবটি কে, তা কেন ইংরাজ ঐতিহাসিকরা বলছেন না? এত বড় লোভনীয় বাদশাহের প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ খেতাবটি নেওয়ার মত লোক কি ঐ দলে ছিলেন না? মীরজাফর ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হচ্ছে এবং সেই যুদ্ধে ইংরাজরা চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করল। অথচ দেখা যায়, কেউ নবাব নাই ! এটা কি করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে ? ইংরাজরা তাদের পক্ষপাতী ইতিহাসে উল্লেখ না করলেও এতদঞ্চলের লোকেরা জানেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা যাকে মজনু শাহ বলেছেন বিভিন্ন সময়ে। সর্বশেষ ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে নবাব নূরউদ্দীন (বাকের মুহাম্মদ) যাকে বলা হচ্ছে, তিনিই সম্রাট-পক্ষীয় নবাব ছিলেন। কারণ সম্রাট যেখানে যুদ্ধের মধ্যে প্রতিনিধি নিযুক্ত করছিলেন, সেখানে দুর্বল অথবা সন্দেহভাজন ও স্বজনপ্রিয় কোন লোককে অবশ্যই প্রতিনিধি নির্বাচন করেন নি। প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়েছিল বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রজা-সাধারণের মতামত নিয়ে। অত্যন্ত যোগ্য ও সবল নেতৃত্বশীল বিশ্বস্ত এক ব্যক্তিকে যিনি মুগল রাজবংশজ এবং মুগল সিংহাসনের সহিত একই রক্তে ও সূত্রে গ্রথিত—যিনি সম্রাটের আপন চাচাতো ভাই এবং ভগ্নিপতি, যাঁকে বাংলার জনগণ সাগ্রহে 'নবাব' পদে বরণ করে নিয়েছেন।' এসব কথা এদেশীয়দের ইতিহাসে স্পষ্ট করে উল্লেখ রয়েছে। যদিও সেসব রচনায় নামের উল্লেখ নেই। আমাদের মতে ইনিই হলেন শাহযাদা সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ, ইংরাজদের কথিত মজনু শাহ্। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর আমাদের নিম্নলিখিত কথাগুলো মনে হয়েছে ঃ

১. ফরাসী (ফ্রান্স) দেশের এক লোক, ইংরাজীতে গ্রন্থখানি (মুতাখ্খারিন) অনূদিত করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদেশে যখন গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ হতে অনুবাদককে নিশ্চয়ই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে।

২. ফার্সী ভাষায় অথবা আরবীতে 'বাকের'কে 'বাবর' করতে খুব বড় একটা অসুবিধা হয় না।

৩. শাহ্যাদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর সময়ে অর্ধনির্মিত মসজিদ নির্মাণ তৎপুত্র কামালউদ্দীন মুহাম্মদ শেষ করেন। মসজিদগাত্রের শিলালিপিতে উক্ত পিতা-পুত্রের নাম যুক্তভাবে ফার্সী ভাষায় এই লেখা রয়েছে,—"বাকের মুহাম্মদ ও কামাল মুহাম্মদ।" এ থেকে পরিষ্কার হয়ে পড়ে যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা শাহযাদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-নামকে গোপন করবার জন্য যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কসুর করেনি।

এখানে একথা বলা যায়, নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর কবর যে বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ-স্থানের কাছাকাছি কোন এক স্থানে হবে, তা সহজ হয়ে পড়েছে। যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের লেখায় পাওয়া যায়, "নূরুল উদ্দীন আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ (১৭৮৫ খৃঃ) করিলেন।"[১]

নূরুলউদ্দীন বা নূরউদ্দীন কোথায়, কোন্ স্থানে ইহলোক ত্যাগ করলেন এবং কবরস্থ হলেন, এখন তা-ই হলো কথা। ইংরাজ লেখকরা নূরুলউদ্দীনের মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে একেবারেই নীরব। যাহোক, নূরুল উদ্দীনের কবর ফুলচৌকিতে যে হয়েছে এবং সেখানে এখন অবধি রয়েছে, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং এ কথা এখন বলা যায় যে, ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও প্রজা বিদ্রোহের এক ও অবিসম্বাদিত নেতা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর কবর ফুলচৌকিস্থ তার অর্ধ নির্মীয়মান মসজিদের সামনে রয়েছে।

ইংরাজদের লেখা ইতিহাসের নামে মিথ্যা ও ছলনার বেসাতী দেখে ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু যা বলেছেন, তা যেমনি সত্য তেমনি হৃদয়গ্রাহী। আমরা এখানে তাঁর লিখিত ইতিহাস থেকে তার কিছুটা উল্লেখ করে দিয়ে ইংরাজদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত লেখাগুলোর কোন কোন বিষয়ের অসারতা প্রমাণ করতে চাই। নেহরু লিখেছেন ঃ

> ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত একজন ইংরাজ লিখেছেন—আমাদের কৃতকর্মের মধ্যে আমরা ভারতবাসীদের কাছে সবচাইতে বেশী বিরাগভাজন হয়েছি ঐ দেশের ইতিহাস লিখে।
>
> —ভারত সন্ধানে জওহর লাল নেহরু, সপ্তম
> পরিচ্ছেদ অন্তিম পর্যায়, পৃষ্ঠা ৩১৭

ইংরাজ আমলের ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত জনৈক ইংরাজ লেখকের সঙ্গে একমত হয়ে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে ইতিহাসের নামে

---

[১] স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, মুগল কুঠি হতে নবাবকে ভুল পথে নিয়ে আসা হয় বর্তমান আদিতমারী নামক স্থানে। ঐ স্থানে নবাব গুরুতররূপে আহত হন ও তাঁর মন্ত্রী নিহত হন। নবাবকে আহত করার পর ঐ স্থানের লোকদের উপর বৎসরের পর বৎসর ধরে অত্যাচার করা হয়, যার ফলে লোকেরা সুবাদার, নবাব না, বলে বলতেন আদতমারা অর্থাৎ মূলকে বা নবাবকে ঐ স্থানে আহত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'আদতমারা' নাম থেকে অপভ্রংশে আদিতমারী হয়ে পড়ে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লেখা দিয়ে জাতির যেমন জাতীয় উন্নতি হতে পারে না, তেমনি জাতি নানা জটিলতার ঘূরপাকেই শুধু খাবি-খায়।

অত্যাচারী দেবী সিংহের আলোচনায় নবাব নূরউদ্দীনকে জুড়ে দেবার মধ্যে ইংরাজ লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল। দেবী সিংহ খুব নীচু স্তরের একজন কর্মচারী এবং এই দেবী সিংহের অত্যাচারে প্রজাগণ অত্যাচারিত হয়ে বিদ্রোহ করেছে। সহজভাবে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রজাদের যত রাগ দেবী সিংহের উপর ছিল। সুতরাং দেবী সিংহের অত্যাচারের দরুনই এই বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। দেবী সিংহ এদেশীয় একজন ইংরাজদের নীচু স্তরের কর্মচারী মাত্র। সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ওয়ারেন হেস্টিংস হতে জেলা কালেক্টর পর্যন্ত এরা সব অত্যাচারের জন্য দায়ী ছিল।

১৭৮৩ খৃস্টাব্দের পেছনের দিকে অর্থাৎ ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী (মসিমপুরের যুদ্ধ) অবধি তার সময়গুলো নিয়ে ইতিহাসের যে সামান্য ছিটে-ফোটা অংশ পাওয়া যায়, সেটা বিশ্লেষণ করে দেখলে (কিছু পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি) সহজেই বোঝা যায় যে, রংপুর তথা এতদঞ্চলের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ কখনও বা সম্মুখ, কখনও বা গেরিলা যুদ্ধ করে তখনকার সংগ্রামী বীর ও বীরাঙ্গনারা ইংরাজদের ও তাদের এদেশীয় সমর্থকদের নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির সহিত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে ঘটেনি। পূর্বের ঘটনাগুলির সহিত সম্পূর্ণ যুক্ত হয়েছিল ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের ইংরাজ-আখ্যায়িত ‘প্রজা বিদ্রোহ’। পূর্বেও বলা হয়েছে যে, ইংরাজদের সম্পূর্ণভাবে উৎখাত করার জন্য নবাব নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজ শাসক ও লেখকগণ চাতুর্যের সহিত বলতে লাগলো যে, **Self Styled**, (স্বকথিত) নবাব। কিন্তু যেখানে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে স্বকথিত নবাবের কথা শুনে কেউ কি সাক্ষাৎ ধবংস ও মরণের পথে যেতে পারে? অথচ আমরা ইংরাজদের ইতিহাসে তাই দেখেছি। আর অতি উচ্চ স্তরের সম্ভ্রান্ত নেতাসহ সর্বশ্রেণীর সর্বপূজনীয় মাননীয় ব্যক্তিরা এমন মরণযজ্ঞে বছরের পর বছর ধরে নানা ধরনের যুদ্ধে কি কখনও মেতে থাকতে পারেন! অথচ ১৭৭০-৭২-৭৩-৭৫ প্রভৃতি সনের সময়গুলোতে নেতৃস্থানীয় নায়ক মজনু শাহ-এর আসল বা পূর্ণ নাম কি, তা বলা হয়নি।

ভবানী পাঠকের বাসস্থান কোথায় ছিল, এরও কোন নির্দেশ নেই। ইংরাজ-বিরোধী অন্যতম নায়ক মুসা শাহের আসল নামটি পর্যন্ত কোন সময় উল্লেখ করা হয়নি। দেবী বা 'চৌধুরাণী' বড় জোর 'ছোট জমিদার' এমনি ধরনের সংক্ষিপ্ত কথা। এ দেশীয় ইংরাজ কর্মচারী লেখকদের কেন এই কারচুপি? কেন এই একদেশদর্শিতা? কেন এই কৌশল প্রয়োগের প্রয়াস? ইতিহাস রচনার নীতি ও আদর্শ কি এই?

ইংরাজ-বিতাড়নী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় নায়ক-নায়িকাদের নাম পরিচয় প্রভৃতি কেনই বা এভাবে গোপন করা হলো! অথচ এই সব এক-পক্ষীয় মিথ্যা লেখাকে আমাদের ইতিহাস বলে মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। যাহোক 'Self styled Nawab'-এর জন্যই নূর উদ্দীনকে দেবী সিংহের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। এও যে আমাদের এক জাতীয় অবমাননা, আমরা কি তা জানি? কিন্তু এ কথাও আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ পরাধীন এবং পরাজিত আর ইংরাজরা ছিল জয়ী। পরাজিতদের ভাগ্যে এমনি ধরনের বিড়ম্বনা, নিন্দা, কুৎসা চিরকাল সর্বদেশে একই রূপ পরিগ্রহ করে আসছে।

> তিনি (গুডল্যাড) ত্বরায় লেফটেন্যাণ্ট ম্যাগডোনাল্ড সাহেবকে সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। বিদ্রোহী দল একস্থানে নাই, সাহেব কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন?

উক্ত কথা হতে বেশ বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা-পিয়াসী যোদ্ধাগণ শুধু যে সম্মুখ সমর করে অনেক সময় ইংরাজদের হারিয়ে দিয়েছেন তা-ই নয়, বরং অনেক সময় কচুকাটা করে পর্যন্ত তাদেরকে নির্মূল করেছেন। তবে এরা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেরিলা লড়াই করতেন, তা উক্ত উদ্ধৃতি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্বাধীনতা পিয়াসী দেশ-প্রেমিক দল যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের নির্যাতন, জুলুম ও হত্যাকেও ভয় না করে বেপরোয়াভাবে নিজেদের কাজে অবিচলিত হয়ে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে মরণপণ সংগ্রাম করে অগ্রসর হয়েছেন তা নিম্নোক্ত কথা হতে পরিস্ফুট হয়ে পড়েঃ "তখন গুডল্যাড এক হুকুম জাহির করিলেন যে ম্যাকডোনাল্ড যাহাকে ধরিবেন, তাহাকেই বধ করিতে পারিবেন।" তাহাতেও বিদ্রোহ দমন হইল না।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। তা হলো এই যে, লেফটেন্যাণ্ট

ম্যাকডোনাল্ড নুরুল মুহাম্মদকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলো, আর সে সময় নুরুল মুহাম্মদের সঙ্গে মাত্র পঞ্চাশ জন লোক ছিল। এই যে পঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে ম্যাকডোনাল্ড অতর্কিত আক্রমণ করে নবাবকে আহত করলেন। এটা কি সত্যই একটা যুদ্ধ ছিল? একে কি যুদ্ধ বলা যাবে? এখানেও ইংরাজ বেনিয়াদের যুদ্ধের শক্তির চেয়ে কূটবুদ্ধিটাই বেশী ছিল। স্থানীয় লোকেরা এখনও বলেন, ইংরাজদের নিযুক্ত রামকান্ত মুন্সী (এর সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এখানে আর কিছু বলা হলো না) সন্ন্যাসীদের অজান্তে তাদের এই রক্ষিতাকে টাকা ও জমিদারী দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সাহায্যে নবাবকে ছলনায় মুগল কুঠি হতে বাইরে এনেছিল, উপরে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার ফলে ফিরিঙ্গীরা খুব সহজেই নবাবকে আহত করেন। আর মন্ত্রী দয়াশীলকে হত্যা করেন। উক্ত মহিলা দু'জনের একজনের নাম অলকা এবং অপর জনের নাম হলো পবিত্রা। অলকা কায়স্থ, পবিত্রা ব্রাহ্মণ বংশীয়া। যা হোক, এসব কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বলা বাহুল্য, হান্টার প্রমুখ লেখক নবাব নুরউদ্দীনের প্রধান ঘাঁটি পাটগ্রামে যে ছিল, একথা যেমনি বলছেন না, তেমনি কোথায় রাজধানী ছিল তারও কোন উল্লেখ করছেন না। W. W. Hunter সাহেবের ভাষায়ঃ

> A party of sepoy under Lieutenant Macdonald marched to north against the principal body of insurgents. A decisive engagement was fought near Patgram on the 2nd February 1783.

নবাব নুরউদ্দীনের প্রধান দল যুদ্ধে বিশেষ কোন কারণে পাটগ্রামের নিকটবর্তী স্থানে যেতে পারে বা থাকতে পারে, এটা অসম্ভব কিছুই নয়। কিন্তু হান্টার সাহেব নবাব নুরউদ্দীনের রাজধানী কোথায় ছিল তা যেমন বলছেন না, ঠিক তদ্রূপ একথাও বলছেন না যে, নুরউদ্দীনের প্রধান ঘাঁটি পাটগ্রাম আক্রমণ করা হয়। এখানে আমরা 'বিশ্বকোষ' হতেও ঐ সম্পর্কীয় কথা উদ্ধৃত করে দিলামঃ

"তাঁহার দববল সকলেই পাটগ্রামে ছিল।"

হান্টার সাহেবের মত এখানেও (পাটগ্রামে) নবাব নুরউদ্দীনের প্রধান ঘাঁটি বলা হয়নি। তবে পাটগ্রামেও যে নবাব নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ

যেতেন অথবা তাঁর দলবলও থাকতো, পাটগ্রামের নিকটবর্তী 'জঙ্গরা' গ্রামই আজও তার সাক্ষী বহন করছে। জঙ্গরা গ্রামে মৃত্তিকা-নির্মিত এখনও একটি দুর্গের প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

'কোচবিহারের ইতিহাসে'র এক স্থানে টীকায় নিম্নোক্ত কথাগুলি রয়েছে ঃ "পাটগ্রামে এখনও 'জংরা' 'জমপুর' 'গড়' ও কোট প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।" পাটগ্রাম হলো রংপুর ও কোচবিহারের সীমানা স্থল। এখন কথা হলো, রংপুরের সাধারণ লোক তাদের স্থানীয় শব্দে রংপুরকে বলেন, 'অমপুর' মাহিগঞ্জকে 'মাইগ'ইজ'। 'জমপুর না হয়ে 'জঙ্গপুর' হবে। এই 'জঙ্গরা' বা 'জংরা' কারা ?[১] এটা স্বীকার্য যে, ফকির সন্ন্যাসী, প্রজা বিদ্রোহের সময় উক্ত পাটগ্রাম এলাকাগুলিতে বিদ্রোহীরা আস্তানা গেড়েছিলেন। মুগল প্রিন্স নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ ব্যতীত আর কোন্ জঙ্গ তার দলবল নিয়ে ঐ সব এলাকায় এসেছিলেন ? এখনও রংপুরের প্রাচীন লোকেরা বলে থাকেন, নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-ই এসব এলাকায় প্রায় ২৪—২৫ বছর ধরে যুদ্ধ করে এসেছেন। সাধারণ লোকেরা যখন কথা বলেন, তখন ব্যাকরণের বাঁধুনী নিয়ে কথা বলেন না। এই যে উক্ত টীকায় বলা হচ্ছে 'জংরা' এখানে সহজেই বোঝা যাচ্ছে দিল্লীর মোগল বংশীয় নেতৃস্থানীয় কোন জঙ্গ অথবা অনেক 'জঙ্গ' হবে। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয় ? তা হলে বোঝা যাচ্ছে, এস্থানে বিদ্রোহী লোকদের নেতৃত্ব দেবার জন্য নিশ্চয়ই কোন 'জঙ্গ' ছিলেন। তার সঙ্গে আরও উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে ঃ 'গড়' 'কোট' প্রভৃতি। কোচবিহারের ইতিহাসের উক্ত উদ্ধৃতিতে যেমন 'জঙ্গরা' বলা হয়েছে, তদ্রূপ বর্তমান রংপুর শহরকে পূর্বের শিক্ষিত লোকেরা 'জঙ্গপুর' বলতেন। অশিক্ষিত লোকেরা বলতেন 'জমপুর'। এসব কথা আমি ছোট বেলায় বহুবার শুনেছি। আরও একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, রংপুর-গাইবান্দা মহকুমার বাসিন্দা, রংপুর 'কারমাইকেল' কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক জনাব কলিমউদ্দীন আহমদ বলেন যে ঃ আমি ছোট বেলায় শুনেছি, বিদ্রোহীদের কথা উঠলেই আমার

---

[১] একজন জঙ্গ-এর সঙ্গের লোকজনকে মিলিয়ে তো বলা যায় জঙ্গরা বা জংরা। যেমন কারমাইকেল কলেজের ফিলোসফির অধ্যাপক মাননীয় কলিমউদ্দীন সাহেবের দাদী সাবেহা বলতেন, "মুগল ফকিরেরা খাজনা আদায় করতেন। এতে তো আর মুগলরা ফকির হয়ে যায় নাই। বরং এতে বোঝা যাচ্ছে, মুগলদের সহিত ফকিরেরাও ছিলেন।" এসব কথা উক্ত অধ্যাপক সাহেব নিজে বলেছেন।

দাদী-আম্মা বলতেন, মুগল ফকিরেরা বহু লোক লশকর সহ এসে, তাঁবু খাটাতেন এবং তাঁরা লোকের নিকট হতে 'খাজনা' আদায় করতেন।

উক্ত সম্মানীয়া বৃদ্ধা বলেছেন, 'মুগল ফকিরেরা'। তাহা হলে কি মুগলরা ফকির ছিলেন? ভিক্ষা করতেন? অথচ যুদ্ধের সময়গুলির কথাই তিনি এখানে বলেছিলেন। তা হলে এটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, ফকিরের সঙ্গে নিশ্চয়ই মুগল ছিলেন? অথবা মুগলদের হুকুমে বা নামে খাজনা আদায় করা হতো। এই মুগলই হলেন প্রকৃতপক্ষে প্রিন্স নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। উক্ত পাটগ্রামে নিম্নোক্ত নামগুলো পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো এই ঃ

'সাহেব দাঙ্গার মাঠ'– পাটগ্রাম রেলস্টেশন হতে আধা মাইল পূর্বদিকে ধরলা নদীর তীরে অবস্থিত। 'টুং টিং দাঙ্গার মাঠ'—(ইংরাজদের ভাষাকে লক্ষ্য করে টুং টিং বলা হয়েছে) 'সাহেব দাংগার মাঠ' হতে প্রায় চার মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত।

উক্ত স্থানগুলো এখনও স্থানীয় লোকেরা দেখিয়ে দেয় এবং শাহযাদা মীর্জা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর নামও বলে থাকেন।

সাম্রাজ্যবাদী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসকবর্গ এবং তাদের ইংরাজ কর্মচারী লেখকগণ বলতে চাচ্ছেন যে, ১৭৮৩ সালের প্রজা-বিদ্রোহ একটি আকস্মিক ব্যাপার ও ঘটনা মাত্র। তাই হয়তো বা তাঁরা বিদ্রোহী নবাবের রাজধানী কোথায় ছিল বলছে না। তবে আমাদের অনুসন্ধানে এবং ঐ সময়কার ইতিহাস, তা যতটুকুই হোক, পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত আন্দোলন ও যুদ্ধগুলির সহিত ১৭৮৩ সালের বিদ্রোহ একই নেতার অর্থাৎ নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে এসেছে। 'কোচবিহারের ইতিহাসে'র আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। তা'হলো এই যে, বিদ্রোহী ডাকাত দলে হস্তী অশ্ব, উষ্ট্র ছিল এবং তারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ডাকাতদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র থাকবে, এ আবার কেমন কথা! এরা রাতে চলতো, কি দিনে চলতো তা অবশ্য বলা হয়নি। চোর-ডাকাত হলে রাতের অন্ধকারেই চলতে হয়। তবে 'কোচবিহারের ইতিহাস'-এর লেখক মহোদয় লিখেছেন যে, "এই সব সন্ন্যাসী দলকে ধরিয়ে দেওয়া অথবা তাদের গতিবিধির সন্ধান জনসাধারণ কখনও দিতে চাইত না।"

যদি তা'ই হয়, তবে এরা ফিরিঙ্গীদের বৈরী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী দল যে ছিল তাতে আর সন্দেহ-সংশয় করা চলে কি ?

মুগল প্রিন্স এই বিদ্রোহগুলির নেতৃত্ব করায় ইংরাজদের যেমন ভীষণ-ভাবে ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিল, তদ্রূপ প্রজা সাধারণ ও প্রভাবশালী নেতৃ স্থানীয় অধিকাংশ লোকেই দিল্লীর রাজসিংহাসনের অনুরক্ত ও অনুগত তখন অবধি ছিলেন।

ফরাসী বিপ্লব ও তৎপরবর্তীকালে ইংরাজরা ইউরোপের প্রত্যক্ষ ঘটনা-গুলিতে জানলো, দেখলো এবং বুঝলো যে, সর্বসাধারণ বিদ্রোহে যোগ দিলে রাজশক্তি যত শক্তিশালী ও নিষ্ঠুরই হোক না কেন, সে আন্দোলন দমানো অসম্ভব। তারা এও হয় তো ভাবলো যে, ফরাসী বিপ্লবে জাতীয়তা-বাদের যে উন্মেষ ফরাসী জাতির এবং ইউরোপের আরও অন্যান্য জাতির মধ্যে নব জাতীয়তাবাদের জোয়ারের যে বন্যা এসে দেখা দিয়েছিল, মুগল প্রিন্স নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর সাংগঠনিক শক্তির যাদুময়ী স্পর্শে ভারতীয়দের মধ্যে তেমন জাতীয়তাবাদ, আধুনিক (নব ইউরোপের মত) বাংলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এটাও অভিজ্ঞ সুচতুর ইংরাজ শাসক ও লেখকগণের পক্ষে কম ভীতির কারণ হয়ে দেখা দেয়নি। যাতে ইউরোপের নব জাতিগুলির জাতীয়তাবাদের মত করে, এদেশে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে না পারে, তারই জন্য সুচতুর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিক জ্ঞানে—পরিপুষ্ট ইংরাজরা ১৭৫৭-এর পলাশীর পর হইতে ১৮৫৮ সাল অবধি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠবার মূল বিষয়গুলো নানাভাবে, নানা কায়দায় বিকৃত, অর্ধবিকৃত অথবা গোপন করবার প্রয়াস পেয়ে এসেছে। যা আমরা বিখ্যাত চিন্তাবিদ 'মসীয়েরে নো' প্রমুখ চিন্তাবিদ, দার্শনিকদের লেখায় জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠে কি করে, কি উপায়ে জানতে পারা যায়। তাই মুগল প্রিন্স বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ আর তাঁর প্রধান সহকারীদের নাম পরিচয়াদি বলতে ইংরাজদের এত কুণ্ঠা, এত অনিচ্ছা। সুচতুর ইংরাজরা আমাদের সব থেকে বেশী ক্ষতি করেছে, এই সময়কার ইতিহাস লিখে। তাই আমাদের আধুনিক ইতিহাস কুজ্ঝটিকাময়। আমাদের জাতীয় জীবনও হয়ে উঠেছে জটিলতাময়। একেকটা ভুল, একেকটা মারাত্মক ক্ষতের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাক্ষাৎকার বিবরণী

বিভ্রান্ত ইতিহাস থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আমরা যে অনুসন্ধান করেছি তা থেকে ইতিহাসের অনেক সত্য উপাদান বেরিয়ে এসেছে। এই অনুসন্ধান কাজে আমাদের আলোচ্য ইতিহাস ধৃত পুরুষের আত্মীয় উত্তর পুরুষ এবং তাঁর সময়কালীন জনগণের উত্তর পুরুষদের আমরা কয়েকটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ও প্রশ্নোত্তরে যে সব কথা আমরা পেয়েছি, সেগুলি আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম। আমরা মুগল খান্দানের এক বধূ বেগম শাহবানুর[১] নিকট থেকে ১৯৫২ সালের অক্টোবরে গ্রহণ করা সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রথমে তুলে দিলাম ঃ

১. সাক্ষাৎকার বিবরণ ঃ বেগম শাহবানু

প্রশ্ন ঃ আপনার এখন বয়স কত এবং লেখাপড়া কি শিখেছেন ?

উত্তর ঃ আমার বয়স এখন ৯৯ বছর। বাংলা ও ফার্সী ভাষা কিছু পড়েছি।

প্রশ্ন ঃ ফুলচৌকীর এই মুগল খানদানে কত বছর বয়সে আপনি বধূ হয়ে আসেন।

উত্তর ঃ ষোল বছর বয়সে।

প্রশ্ন ঃ এখন আপনার পুরানো দিনের কথাগুলি, যা জানেন, তা জানালে খুশী হব।

উত্তর ঃ আমার বয়স যখন দশ/বার বৎসর তখন আমি দুবার ফুলচৌকীর এই প্রাসাদে পূর্বের আত্মীয়তা সূত্রে এসেছিলাম।[২] তখন আমার দাদা শ্বশুর শাহযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও তাঁর স্ত্রী আমিরন নেসা জীবিত

---

[১] বেগম শাহবানুর স্বামীর নাম নজমুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌নে নেহাল এবং দুই পুত্রের নাম নজির হোসেন ও মুহাম্মদ হোসেন।

[২] শাহযাদা বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের এক পুত্রের নাম জামালউদ্দীন মুহাম্মদ, তৎপুত্র খাজের-উদ্দীন মুহাম্মদ। শাহযাদা বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের এক কন্যার নাম লালবিবি, তৎকন্যা খোদেজা বিবি। এই খোদেজা বিবির বিবাহ হয় খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ-এর সংগে। ইহাদের একমাত্র কন্যা খুশিমন নেছার বিবাহ হয় রংপুর জেলাস্থ পালিচড়ার চৌধুরী বংশে।

ছিলেন। চাল-চলন আদব-কায়দা সব শাহী খানদানের মতই চলতে দেখেছি। দক্ষিণ দিকে মাঝের গেটের পাশে নহবতখানা ছিল। প্রতিদিন নহবত বাজত। আমরা দেখেছি দাদা-শ্বশুরের নিকট বাহিরের যে কোন দর্শনপ্রার্থী আসা-যাওয়ার সময় কুর্নিশ করত। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ছিল সাধারণ ধরনের। তবে তেল কচিৎ খেতেন, ঘি সব সময় খেতেন। একটি ডেকচিতে পোলাও তিন চার রকমের পাক হত। তদ্রূপ একটি ডেকচিতে তিন চার রকমের কোর্মা পাক হত এবং তার সুগন্ধে বহু দূর পর্যন্ত আমোদিত হত। সোনা-রূপার থালা-বাসনে খানা খেতে দেখেছি। দাদাজীর চেহারা ছিল লালচে উজ্জ্বল সাদা, বেশী লম্বা নয়, খাটও নয়, দেড়হারা ধরনের শরীরের গঠন, মাথার চুলগুলো ছিল লাল ধরনের, চোখ কটা রং, বুক উঁচা ও চওড়া। নামায পড়তেন পাঁচ ওয়াক্ত এবং গভীর রাতেও নামায পড়তেন। প্রাসাদের বাইরে যাওয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপরেই ইংরাজদের নিষেধ ছিল। সাহেবগঞ্জের সন্ন্যাসীরাও মাঝে-মধ্যে আসতেন।[1]

এনারা বোধ হয় বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। আহসান উল্লাহ দেওয়ানজী, ছলুক খাঁ দেওয়ানজী—এনারা তখনও দেওয়ান-হিসাবে দেখাশোনা করতেন এবং সেই হিসাবে আসা যাওয়া করতেন। তবে সকলকেই কুর্নিশ করতে দেখেছি। আমার দেখার মাত্র দেড় দুই বছরের মধ্যেই দাদাজী (দাদা শ্বশুর) মৃত্যুবরণ করেন। দাদী আম্মার গায়ের রং ছিল দুধে-আলতা রং-এর মত। লম্বাও নয়, খাটও নয়, দেড়হারা ধরনের চেহারা, গলায় সবসময় মনিহার ছিল। দাদাজীর মৃত্যুর পর তিনি আর কোন গহনা বা দামী শাড়ী পরতেন না। ইনি আরও দশ বছর বেঁচেছিলেন।

প্রথমবার যখন প্রাসাদে লুট ও লোক লশকর হত্যা করে ইংরাজ ফিরিঙ্গীরা, তাদের সঙ্গে ছিল মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের মাড়ওয়ারী জগৎসিং দুগড়। আরও আরও অনেক মাড়ওয়ারী। রংপুরের ডিমলার জমিদার, পায়রাবন্দের জমিদার আরও বিভিন্ন জেলার অনেকে। সিংহাসন এবং সোনা,

---

সেই বংশের মেয়ে হিসাবে, শাহবানু বেগম সাহেবা খুশিয়ন নেছার সহিত ফুলচৌকী প্রাসাদে অপ্রাপ্ত বয়সেও আসতেন। খুশিয়ন নেছা বিবাহের পর ২৷৷/৩ বৎসরের মধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করেন, তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। শহীদ শাহযাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ-এর একমাত্র সন্তান ছিলেন উক্ত খুশিয়ন নেছা। তিনি মারা গেলে ঐ শাখা শেষ হয়ে যায়।

[1] রাম দয়াল চন্দ্রের পুত্র ও পৌত্র আলাদ চন্দ্রশীল ও নবীন চন্দ্রশীল—ইঁহারাও মাঝে মধ্যে আসতেন।

রূপা, হিরা, জহরতের গহনা-পত্র, সোনা-রূপার থালা-বাসন, সোনা, রূপার আসা, সোটা, দামী কাপড়-চোপড়, গালিচা, খাট-পালঙ্ক, তাঁবু ছামিয়ানা, রৌপ্য নির্মিত ছাতা, রৌপ্য নির্মিত পাল্কি—এই রূপ অনেক কিছুই ফিরিঙ্গী ও মাড়ওয়ারীরা নিয়ে যায়। শুনেছি সিপাহী যুদ্ধের সময় ফিরিঙ্গী ইংরাজরা প্রাসাদ লুট ও বহু লোককে হত্যা-যখম করে। তিন বছর পর্যন্ত প্রাসাদ দখল করে ইংরাজ সেনারা পাহারা দেয়, যাতে বাইরের লোক প্রাসাদের ভিতর না আসতে পারে এবং ভিতরের লোক বাইরে না যেতে পারে। অনেক দিন দেখেছি, আমার দাদী শাশুড়ী সোনার চাদরে আবৃত দামী মোড়ায় বসে ইংরাজ ফিরিঙ্গীদের খুব গালি-গালাজ দিতেন।[১] দাদী আম্মার মাথার চুলগুলি পাটের মত সাদা ছিল। নামায পড়তেন পাঁচ ওয়াক্ত ও অজিফা পড়তেন। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন বাড়ীতে আর কোন নূতন বৌ ছিল না। আমার শ্বশুর নেহাল উদ্দিন মুহাম্মদ তাঁর একমাত্র পুত্র আমার স্বামী নজমউদ্দীন মুহাম্মদ। আমার চাচা শ্বশুর দু'জন—নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ ও লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ। আমার বড় চাচা শ্বশুরের তিন পুত্র, ছোট চাচা শ্বশুর বিবাহের পূর্বে মারা যান। এই বিশাল রাজবাড়ীতে বউ মাত্র আমি একা ছিলাম আর যাঁরা সবাই বিধবা ছিলেন। প্রাচীন পুরুষ, চাকর-চাকরানীরা পুরানো কথা আমাকে বলে বলে শুনাতো।[২] ভেকু ফকির সাহেব খুব পুরানো লোকদের মধ্যে

---

[১] দাদাজীর মৃত্যুর ছয়-সাত মাস পূর্বে ইংরাজ সরকারের প্ররোচনায় মহিগঞ্জের বক্স সাহার সর্দারীতে ২য় বার প্রাসাদ লুট করা হয়। অন্যকথা না বলে শুধু হাতির গায়ের পায়ে পড়া পর্যন্ত লম্বা চাদরের কথা বললেই যথেষ্ট হবে। এক এক খানা হাতির গায়ে জরির চাঁদর পুড়ে সোনা পায় ২০০/২৫০/৩০০ ভরি পর্যন্ত।

[২] মোঃ ভেকু ফকির ও নবানু ফকির : ভেকু ফকির সাহেব সুবাদার নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গের দেহরক্ষীদের নায়ক ছিলেন। তাঁর পুত্র মোঃ নবানু ফকির সাহেব শাহযাদা কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ, শাহযাদা নসিরউদ্দীন। তাঁরা বংশানুক্রমে দীর্ঘায়ু ছিলেন। মুহাম্মদ এর দেহরক্ষী কমণ্ডার ছিলেন। ১৮৫৭ সালের পরাজয়ের পর শাহযাদা নসিরউদ্দীনের সঙ্গে ইনি সব সময় তাঁর দল সহ ছিলেন। এ সময় তাঁদের বাড়ী ছিল, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চ্যাচেয়া নামক গ্রামে। তাঁদের বংশধরগণ এখনও জগদীশপুর ও ফুলচৌকী গ্রামে আছেন। তাঁদের বংশের এক শাখা খামার পাড়ার (ফুলচৌকী) বাচ্চা শাহ, বনিজ শাহরা এদের বংশধর। জগদীশপুরের হাজী ছফিরউদ্দীন আকন্দ সাহেবেরা ইহাদের বংশধর। ইহারা স্বাস্থ্যবান, লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ ও খুবই সচ্চরিত্র ছিলেন। এখনও ঐ বংশের লোকেরা অনেকটা তাই আছেন।

একজন। তিনি নবানু ফকিরের পিতা খড়িয়া বরকন্দাজ, শরিতুল্যা সরদার[১] এনারা আমার শ্বশুর-বংশের পাঁচ পুরুষ দেখেছেন এবং চাকুরী করে আসছেন। কারও বয়স ১৩৫, কারও ১২৫, কারও ১২২, কারও ১২০। এত বয়সেও এঁরা চাকুরী করতেন। লোকজন আসলে আদর করে বসাতেন এই কাজ তাদের ছিল। আরও অনেক চাকর ছিল; তবে এনারাই প্রধান ছিলেন। ভেকু ফকির সাহেব আমার শ্বশুর বংশের পূর্বপুরুষ শাহজাদা বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর পল্টনে নিয়মিত পল্টন ছিল। তার পিতা গেন্টা ফকিরও পল্টন ছিল। খড়িয়া বরকন্দাজ শরিতুল্যা সরদার সুবাদার শাহজাদা বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে দেখেছেন। তখন এঁদের বয়স ১০/১২ বছর ছিল, কিন্তু নিজেরা সব কিছু নিজের চোখে দেখেছেন। এই সব প্রাচীনরা আমার নিকট এই শাহী খানদানের অনেক কথা বলেছেন অনেক বছর ধরে। ইহা ব্যতীত তনখার মিঞা বংশের শেষ বংশধর আমির মিঞা ও তমিজ মিঞা[২] এসব কথা বহু বৎসর ধরে আমাদিকে বলে এসেছেন। শাহজাদা সুবাদার প্রথমে এইখানে এসে লোক-লশকর নিয়ে তাঁবুতে থাকতেন। এখান হতে দেড়-দুমাইল দূরে সন্ন্যাসীরা থাকতেন সাহেবগঞ্জ গ্রামে। সন্ন্যাসীদের সেরা নেতা ছিলেন প্রথম হনুমান গিরী গোঁসাইজী। দ্বিতীয় হনুমান গিরী গোঁসাইজীকে আমি দেখেছি প্রাসাদের মধ্যে। সন্ন্যাসীরা যেমনি ছিলেন বিদ্বান তেমনি ধন-সম্পত্তিরও মালিক ছিলেন। কাঠ-গড়া নামক খালের উপরে সন্ন্যাসী গোঁসাইরা একটি ইষ্টক-নির্মিত পুল দেন ফুলচৌকী নগরে আসা-যাওয়ার মানসে। তনখার মিঞারা পূর্ব হতে মোগল রাজ খানদানের আত্মীয় ছিলেন। তাঁরা একদিকে জমিদার, ফৌজদার এবং

---

[১] খড়িয়া বরকন্দাজ ও শরিতুল্যা সরদার—ইহারা বরকন্দাজদের (সিপাহী) সরদার ও জমাদার ছিলেন। কামালউদ্দীন মুহাম্মদ ও তৎপুত্র নসিরউদ্দীন ও গউসউদ্দীন মুহাম্মদ এর সদর প্রাসাদে (ফুলচৌকী নগরে) আজীবন চাকুরীর দায়িত্বে ছিলেন। ইহারা অপ্রাপ্ত বয়সে শাহজাদা সুবাদার নবাব বাকের জঙ্গকে স্বচক্ষে দেখেছেন। বাকের মুহাম্মদ ঐ সময় তাঁবুতে বাস করতেন। নগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে এঁদের বাড়ী ছিল। এঁদের বংশধর এখনও আছেন।

[২] আমির মিয়া ও তমিজ মিয়া সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়কে তনখা থেকে এনে ফুলচৌকী নগরে ইংরাজরা আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইহারা ফুলচৌকী,—জগদীশপুরেই ইহলীলা ত্যাগ করেন। ইহাদের বংশধররা এখনও আছেন। ইহারা বংশানুক্রমে দিল্লীর মোগল রাজবংশীয়দের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। শাহজাদা ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের দৌহিত্র হল আমির খাঁ ও তমিজ খাঁ। বিদ্রোহের পর ইহারা 'খাঁ' খেতাব ব্যবহার করতে পারেন নাই।

অন্যদিকে ধর্মীয় পীর ছিলেন। মুসা শাহ ফকির নওয়াবের প্রধান সেনানায়ক বা সিপাহ্‌সালার ছিলেন। রাজা দয়াশীলের বাড়ী ছিল ময়েনপুর গ্রামের কদমতলীর দক্ষিণ প্রান্তে। শাহজাদা সুবাদার মোগল কুঠির নিকট আহত হয়ে ফুলচৌকী নগরে নীত হয়ে মারা যান, এখানে তাঁর কবর রয়েছে। রাজা দয়াশীল ঐ যুদ্ধে নিহত হন। সুবাদার শাহজাদাকে মজনু শাহ্‌, মজনুন ফকির বলতো ইংরাজরা। এ সব কথা আমি প্রাচীনদের মুখে বহুবার শুনেছি। এই পরিবারের সবাই ফুল শয্যায় শয়ন করতেন। শাহজাদা সুবাদার বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর দুই কন্যা—লালবিবি ও চাঁদবিবি এবং দুই পুত্র—কামালউদ্দীন মুহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মুহাম্মদ। দুই ভাই-ই দিল্লীর মোগল রাজবংশে বিয়ে করেন। শাহজাদা কামালের স্ত্রীর নাম যতন বিবি, ডাকনাম কোকিলা। শাহজাদা জামালের স্ত্রীর নাম আছিয়া বিবি। লালবিবির বিয়ে হয় বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের সহিত। তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্রের নাম বাদশাহ বাহাদুর শাহ্‌। চাঁদবিবির বিয়ে হয় শাহজাদা শাকেরউদ্দীনের ছেলে ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ-এর সাথে। ওয়ালিদাদ মুহাম্মদের এক কন্যার বিয়ে হয় তন্‌খার মিঞা ফাজিল খাঁর সাথে। সিপাহী যুদ্ধের পরে ফাজিল খাঁর ফাঁসি হয়। তন্‌খার মিঞাদের বাড়ীর নারী-পুরুষ সবাইকে ইংরাজরা নির্দয়ভাবে হত্যা করে। দৈবক্রমে ফাজিল খাঁর দুই পুত্র বেঁচে যান—আমির মিঞা ও তমিজ মিঞা। ফুলচৌকীর শাহী খান্‌দানের মত তন্‌খার মিঞাদেরও সমস্ত কিছু বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমির মিঞা ও তমিজ মিঞাকে প্রাসাদ হতে পালিয়ে যেখানে সেখানে থেকে জীবন বাঁচাতে হয়। তন্‌খার মিঞারা সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। এঁরা মোগল বাদশাহদের বড় পদে অভিষিক্ত থাকায় তাঁদের খাঁ বা নায়ক নেতা অর্থাৎ শাসক উপাধি দেওয়া হয়। সিপাহী যুদ্ধের পরে তন্‌খার মিঞাদের, মোগল খান্‌দানের সাহেবদের, সাহেবগঞ্জের সন্ন্যাসীদের, রাজা দয়াশীলের বংশীয়দের, রাজা ভবানী পাঠকের বংশীয়দের একটা পা ফেলবার মত জমি ছিল না। সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমান রংপুর শহরটাই শাহী খান্‌দানের রঙ্গমহল ছিল। সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ছ'মাস আগে শাহজাদা কামালকে ইংরাজরা বিষ খাইয়ে হত্যা করে রংপুর শহরের কামাল কাশানায়। ইংরাজ বিরোধী একটি স্বদেশী বাহিনী ফুলচৌকী নগর হতে বের হয়ে পূর্বের রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া প্রভৃতি শহর-জনপদ দখল করে দিল্লীর

দিকে চলে যান। এসব কথা আমি প্রাচীন লোকদের মুখে বহুবার শুনেছি। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত দিল্লীর লালকেল্লা প্রাসাদে এই সব খানদানী মোগলেরা সময় সময় বাস করতেন। খানদানী মোগলদের মধ্যে এনারাই ছিলেন ধনে মানে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে শীর্ষস্থানীয়। যুদ্ধের পরে শাহজাদা গউসউদ্দীন মুহাম্মদ, শাহজাদা ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ আরও শত শত লোককে প্রাসাদের বাইরে ও ভিতরে হত্যা করে। ইংরাজরা গউসউদ্দীন মুহাম্মদ ও ওয়ালিদাদ মুহাম্মদকে হাতীর পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে হত্যা করে। শাহজাদাদের দু'খানি পা হাতীর পিছনের দুইখানি পায়ের সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। হাতীর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে মর্মান্তিকভাবে হোচট খেয়ে খেয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১]

গউসউদ্দীন মুহাম্মদের পাকা বাঁধানো কবর রয়েছে কারমাইকেল কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে বালাটাড়ি নামক গ্রামে। শাহজাদা ওয়ালিদাদ মুহাম্মদের পাকা কবর রয়েছে। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের গোর পরবর্তী কালের লিচু বাগানের মধ্যে (বর্তমান সালেক পাম্পের নিকটে)। শাহজাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদকে ও তনখার দুই মিঞাকে দিল্লীতে হত্যা করা হয়। শাহজাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ ২য় আকবর শাহের সহোদরা ভগ্নীকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ফুলচৌকী নগরের প্রাসাদে অনেক দিন পরে মারা যান। কলিকাতার সুতানুটির কারবারের কুঠি হতে রাজা রামমোহন রায়কে বিলাত যাওয়ার টাকা দেওয়া হয়। রাজাজী নিজে একজন বড় ইংরাজ-বিরোধী ছিলেন। এ সব কথা প্রাচীনদের মুখে বহুবার শুনেছি। তাঁর ব্রাহ্ম মন্দির এখনও রঙমহলের নিশ্চিহ্ন স্থলের নিকট আছে। পূর্বে এই মন্দির কিছুটা ছোট ছিল। পরে আরও বড় করা হয়। উক্ত মন্দিরের অল্প কয়েক গজ পশ্চিম পার্শ্বে ভবানী পাঠকের মন্দির রয়েছে। ব্রাহ্ম মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক গজ দূরে ফকিরদের

---

[১] প্রত্যক্ষদর্শী শিকারপুর নিবাসী সাদাতুল্যা সাহেবের নিকট জগদীশপুর নিবাসী শাহ মুহাম্মদ আবদুস সালাম শাহ্ ফকির সাহেব শাহজাদাদ্বয়কে হাতির পায়ে বেঁধে হত্যা করার বিষয়ে উপরোক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ: শাহজাদাদের জোর করে ধরে মাটিতে চিত করে শুইয়ে তাঁদের পা দুটি হাতীর পিছনের পায়ের সঙ্গে এক একটি পায়ের সঙ্গে এক একটি পা বেঁধে দিয়ে ইংরাজরা হাতীতে চড়ে হাতী চালিয়ে দেয়। হাতীর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে হোচট খেতে খেতে এদিক সেদিক ছিটকাতে ছিটকাতে ও ছেঁচড়ে আসতে আসতে এই দেশপ্রেমিক মহাবীরদের প্রাণ-বায়ু দেহপিঞ্জর থেকে করুণভাবে বেরিয়ে যায়।

মসজিদ আছে। তিনটি তপালয় একই সঙ্গে ছিল। বৃদ্ধ নবানু ফকির এ সব জায়গা আমাকে দেখিয়েছেন। রঙ্গমহলের কোথায় কোথায় শীশমহল ছিল, কোথায় কোথায় এক মহলা, দুই মহলা দালান ছিল, ফুল-ফলের বাগ-বাগিচা কোথায় কোথায় ছিল, এই জংদের আসা যাওয়ার ঘাটের নাম অদ্যাবধি জংঘাট নাম ধারণ করে আছে। প্রজারা যে ঘাট দিয়ে দর্শনপ্রার্থী হয়ে আসত, সেই ঘাটের নাম 'দর্শনা' ধারণ করে আছে কারমাইকেল কলেজের পশ্চিম-দক্ষিণে। সৈন্য ও সেনানায়করা যে ঘাট দিয়ে রঙ্গমহলে প্রবেশ করত, সেই ঘাটের নাম আজও লোকেরা 'ফকির বক্শীর ঘাট' বলে থাকেন। কোথাও কোথাও ঘাট বাঁধান পুকুর ছিল, কোথাও কৃত্রিম হ্রদ ছিল, কোথাও সরোবর ঝিল ছিল—বৃদ্ধ ফকিরজি এসব কিছু আমাকে দেখিয়েছেন। আমার সঙ্গে মাত্র দুইজন দাসী ও একজন খানসামা ছিল। মহামান্য বেগম লালবিবির কবর ও অন্য সকল আত্মীয়-স্বজনের কবর আমি যিয়ারত করি। বেগম লালবিবির কবরের পাক সৌধের দক্ষিণ পাশে প্রাচীরের বাইরে রাজা ভবানী পাঠক শায়িত আছেন তাঁর কবরে। ঐখানে আরও ৪০/৫০ জন শহীদের কবর আছে। ইংরাজরা গোপনে সংবাদ নিয়ে মহানায়কদিগকে শহীদ করেন উক্ত মীরগঞ্জ নামক স্থানে। ইংরাজদের যাঁরা গুপ্তচর হয়ে সংবাদ দেন তাঁরা হলেন টাটি শেখ, খয়রুদ্দীন ও গুরুবাবু লাহিড়ীর পূর্বপুরুষ এক লাহিড়ী। উক্ত ঘৃণিত কার্যের দরুন ইংরাজরা এঁদের বহুলক্ষ টাকার জমিদারী ও লাখেরাজ সম্পত্তি দান করে।

আমার দাদা শ্বশুর নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদকে হাত করার জন্য ইংরাজ ফিরিঙ্গীরা ফুলচৌকীতে আসেন কলিকাতা হতে নৌকাযোগে নগরে। সাহেবরা এসে প্রাসাদ ও নগরের সব কিছুর নক্সা করে নেয়। ইংরাজ-দলপতির নাম ছিল হাণ্টার সাহেব। এই নামটি ৯/১০ বছর ধরে বলা কওয়া হত প্রাসাদে।[1] শাহজাদা নাসিরউদ্দীন আফসোস করলে 'ভুল

---

[1] প্রাসাদের ভিতরে এবং বাইরে প্রায় সকলেই গোপনে শাহজাদা নেহালউদ্দীনকে সমর্থন করতেন। এবং তাঁর যুক্তি ঠিক বলে বলা হত। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন ও বেগম আমিরন নেসাকে ভয় করে কেউ প্রকাশ্যে বলার সাহস পেত না যে, হাণ্টার সাহেবের প্রস্তাব মেনে নেওয়া ঠিক হবে। পুত্র নিজামউদ্দীন ও লতিফউদ্দীন পিতা নাসিরউদ্দীন ও মাতা আমিরন নেসাকে সমর্থন দিতেন।

হয়েছে’ এই একটিমাত্র কথা বললে ইংরাজ সরকার খুশী হতো। হান্টার সাহেব সাতদিন নৌকায় ছিলেন, কিন্তু শাহজাদা নাসিরউদ্দীন তাকে সাক্ষাৎ দিতে রাযী হন নি এবং সাক্ষাৎ দেনও নি।[১] শাহজাদা, ছলুক খাঁ উকিল দেওয়ানজীকে বললেন, ‘তুমি হান্টার সাহেবকে গিয়ে বল আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। সুযোগ আসলে আবার লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে। আমি বেঈমান নই; হাজার হাজার শহীদের সাথে আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করব না। মান, ধন-সম্পত্তি কারও চিরস্থায়ী নয়। আমি অর্থের দাস হব না। যাও, হান্টার সাহেবকে গিয়ে বল, আমার সাথে দেখা করার কোন কারণ নেই। আমরা যা করেছি ন্যায় ও সঠিক করেছি। ব্যক্তির মানের চাইতে আমি দেশের মানকে অনেক উপরে স্থান দেই, তাই করব। অর্থ সম্পত্তির লোভে দেশের প্রাণশক্তিকে আমি হত্যা করতে পারবো না।’ এরপর হান্টার সাহেব তাঁর সঙ্গী-সাথী নিয়ে কলকাতায় ফিরে যান। হান্টার সাহেব ফুলচৌকী নগরে আসার কিছুদিন আগে দেওয়ানজী আহছান উল্ল্যা সাহেব মারা যান। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী এই সময় ভীষণ মনোমালিন্যে তপ্ত হচ্ছিলেন। আমার শ্বশুর নেহালউদ্দীন মুহাম্মদের কথা হল—হান্টার সাহেবকে ডেকে নিয়ে কথা বললে ভাল ছাড়া খারাপ হত না।[২] কিন্তু দাদা শ্বশুর ও দাদী শাশুড়ী ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নি। পিতা-পুত্রে ও মাতা-পুত্রে কোন কথা-বার্তা হত না। ভীষণ মন-দুঃখে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য নিয়ে আমার শ্বশুর এক মাসের মধ্যে হার্টফেল করে মারা যান। এর বেশ কিছু দিন পর দাদাজী শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ মারা যান। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ দাদাজী মারা যাবার ১০ বৎসর পর দাদী আম্মা মারা যান। সিপাহী যুদ্ধের পরে এঁরা গৃহবন্দী হিসাবে থেকে উভয়েই মারা যান। দাদী আম্মার গায়ে যখন জ্বরের ভীষণ তাপ, তখন মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন, “বিদ্রোহী দলের অনেক নেতা, অনেক দলপতি,

---

[১] শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ ও তৃতীয় পুত্র শাহজাদা লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ পিতা-মাতার আদর্শের প্রতি পবিত্র বিশ্বাস নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা মেনে চলে এসেছেন।

[২] ‘অবশ্য’ পরে তিনি হান্টার সাহেবের সাথে দেখা দেন কিন্তু হান্টার সাহেবের কোন কথাই তিনি অনুমোদন করেন নাই। অবশেষে সপ্তাহ খানেক পর ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার সাহেব ফুলচৌকী নগর হতে কলকাতায় ফিরে যান।

আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন শেষ দেখা করার জন্য নয়,—শেষ বিদায় নেওয়ার জন্য। এসেছিলেন রাজা ধুঞ্জুপন্থ নানাজি; সঙ্গে এসেছিলেন তার বিশ্বস্ত মন্ত্রী আজিমুল্যা খান। রাজা নানাজী ভীষণ অসুখ, তাঁর হাত, পায়ে, পেটে ও মুখে শোথ হয়েছিল। গায়ে জ্বরের তাপ ভীষণ ছিল। তাঁরা দেখা করে বিদায় চাইলেন। তোমার দাদাজী আর আমি যেতে দিলাম না। আমরা বললাম, এত বড় ব্যামারী নিয়ে যেতে দেব না। মরতে হয় এক সংগেই মরব। একমাসের মধ্যে নানাজী মারা গেলেন। চিকিৎসাও হয়েছিল। কিন্তু রাজা বাঁচলেন না। তোমার দাদাজী ও রাজা পাশাপাশি কামরায় থাকতেন। আমাকে পূর্ব হতে নানাজী বৌমা বলে ডাকতেন, আমি ভাশুর হিসাবে মানতাম। চন্দন কাঠের খাট ও জানালার কপাট ভাংগিয়ে চিতা জ্বালাবার খড়ি করা হল। সন্ন্যাসী দ্বিতীয় হনুমান গিরি ও শুকদেব গিরি বাবাজী এঁরা উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। যমুনাশ্বরী নদীর পূর্ব পাড়ে হাশিয়ার ডাঙ্গায় ঘি ও চন্দন কাঠের চিতা করা হয়েছিল দাহ করার জন্য। মুখে আগুন দেন দ্বিতীয় সন্ন্যাসী হনুমান গিরি মহারাজ।”

“আজিমুল্যা খান আরও তিন বৎসর বেঁচে ছিলেন প্রাসাদে। অধিক সময় হুজরায় থাকতেন ও তপস্যা করতেন। মুন্সিজী বলে বাড়ীর সকলে ডাকত তাঁকে। এই ছদ্ম নাম নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি অপরিচিত থেকেই মারা যান। আমাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয় আমার আদেশে।”

এই সব কথা বলার ৫।৬ দিনের মধ্যেই দাদী-আম্মা মারা যান। তাঁর শ্বশুর বংশের বিপুল বিশাল ধন-সম্পদের কিছুই ছিল না, ছিল শুধু ঐ পাকা মসজিদটি। সন্ন্যাসী ও শীলরাজ বংশীয়দেরও মন্দির ঘরটি ব্যতীত পা-ফেল্‌বার মত এক ধাপ মাটিও পায়ের নীচে ছিল না। ইংরাজ ফিরিঙ্গীরা সব কিছু বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

বাড়ীর এদিক-ওদিক যা কিছু সামান্য স্বর্ণ রৌপ্য দাদি-আম্মা পান, তা দিয়ে ফুলচৌকীর পত্তনী ও আরও কিছু জমিদারী এবং চার পাঁচ হাজার বিঘা জমি ক্রয় করেন মাত্র। সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে বাইশটি কুঠিবাড়ী ভাংনীর কুঠি. মিঠাপুকুরের কুঠি, বলদি পুকুরের কুঠি, চান্দামারীর কুঠি, বহাল ছিল রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে। যেমন—হারিয়ার কুঠি, মাহীগঞ্জের কুঠি, শঙ্কর পুরের কুঠি, জগদীশ পুরের কুঠি, গুটি বাড়ীর কুঠি—এই রকম

বাইশটি কুঠি ছিল। প্রতিটি কুঠিতে চার পাঁচ হাজার বিঘা করে জমি ছিল। সেখানে নীল, চিনি, রেশম ও শাল-বানাত তৈরী হত। পরে একত্রিত করে বিভিন্ন জায়গায় চালান হত। কুঠি-বাড়ীতে হাতী, ঘোড়া, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী পালন করা হত। কলা, আম, কাঁঠাল, পেঁপে কলাই ও ধান প্রতিদিন এই সব দ্রব্য সামগ্রী প্রাসাদে আসতো প্রয়োজনুযায়ী। সিপাহী যুদ্ধের পরে পরেই এসব কুঠি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বাহান্ন লক্ষাধিক টাকার জমিদারী এবং দেশের বিভিন্ন শহর বন্দরে ব্যবসা বাণিজ্যের কারবারগুলিও একই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দুই মহলা, তিন মহলা চকমিলানী বাড়ীর আঙ্গিনার দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দাদী-আম্মা বসার জন্য বহুমূল্য মোড়া সোনার চাদরে আবৃত ছিল। এই রূপ বহু মোড়া বারান্দাগুলিতে সাজানো অবস্থায় ছিল। মূল আঙ্গিনায় মখ্‌মলের উপরে জরির কাজ করা চাঁদোয়া ছিল। স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্মিত খড়মগুলি স্থানে স্থানে সাজানো অবস্থায় ছিল। বাড়ীর প্রত্যেক বেগম সাহেবার ব্যবহৃত খড়ম সাজানো ছিল। বাড়ীর বাইরে গেলে মেয়েছেলেরা বহু মূল্যবান নাগরা জুতা ও রেশমের মোজা পরতেন। আঙ্গিনার পশ্চিম পার্শ্বে বহু মূল্যবান আরাম কেদারায় দাদী-আম্মা মাঝে মধ্যে বসতেন। ঐরূপ আরাম কেদারা বিভিন্ন বারান্দায় সাজানো ছিল। ঘরের মধ্যেও বহুমূল্য খাট-পালঙ্ক ও চোখ-ঝলসানো মূল্যবান কাপড়-চোপড় সাজানো অবস্থায় ছিল। একটি রৌপ্য-নির্মিত বিরাট আকারের ছাতা বার চৌদ্দজন জোয়ান পুরুষ পালকির উপরে ধরতো। পালকিগুলিও রৌপ্য-নির্মিত ছিল। এই রকম বহু ছাতা ও পাল্‌কি সব সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকত।

দরবার কক্ষে সাজানো অবস্থায় ছ'টি বড় ছোট সিংহাসন ছিল। হীরামণি মানিক্য স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত সিংহাসনগুলি সাজানো অবস্থায় ছিল। নানা ধরনের বড় বড় পাংখা হিরা-পান্নায় ঝলমল করত। নানারূপ ফানুষ ও ঝাড়বাতি সাজানো অবস্থায় প্রতি কামরায় ও বাড়ীর বিভিন্ন জায়গায় সাজানো অবস্থায় ছিল। ফুলশয্যা ও ফুলদানীতে ফুলের তোড়া সাজানো অবস্থায় প্রতি দিন থাকত। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিল্পীরা এই সব জিনিস সাজাতো। দিল্লী ও বাগদাদের শিল্পী ও মিস্ত্রীরা হাজার হাজার লোক নিয়ে ২১/২২ বছরের মধ্যে প্রাসাদ ও অন্যান্য দালান কোঠা, ঝরনা, সরোবর, ফোয়ারা, বালাখানা, কাশানা ও বিভিন্ন স্থানে থাকবার কুঠিবাড়ী ও

রঙমহল প্রভৃতি নির্মাণ করেন। এ সবের ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে। প্রাসাদ নির্মাণের শেষের দিকে মূল মিস্ত্রী ছাড়া অন্য সব লোককে বিদায় দিয়ে শাহজাদা কামালউদ্দীন ও মূল মিস্ত্রী ২৪ ঘণ্টা প্রাসাদের ভিতরে কি যেন করেছেন। স্থানীয় লোকের ধারণা—সেই সময় বহু ধন-রত্ন, মণিমানিক্য প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে গোপনে রাখা হয়েছে।

ফুলচৌকী নগরে মূল প্রাসাদ ব্যতীত নানারূপ পুকুর, দীঘি, চৌবাচ্চা, শত সহস্র ঝরনা ফোয়ারা, সরোবর, মসজিদ, দরগা ছিল। সরোবরের দুই ধারে নানারূপ মনোহর ফুলের বাগিচা, দুই ধারে কোথাও কোথাও ইষ্টক-নির্মিত এক মহলা, দুই মহলা বাড়ী—চলতি নাম কুঠিবাড়ী, বিস্তীর্ণ মাঠ, বালাখানা, ঝিল, কাঠগড়া, নানারূপ ফল ও ঔষধপাতির ও ফুলের বাগ-বাগিচা ইত্যাদি দিয়ে ফুলচৌকী নগরী সাজানো ছিল। শাহজাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদ এর সব কিছু নির্মাণ করান। ঘুরিয়া খাল নামক স্থানে, ঘুরিয়া খালের মধ্যবর্তী স্থানে বহু হাতী পালন করা হত বিক্রয় করার জন্য। শাহী খানদানের মধ্যে এদের মত আর কেউ ধন-দৌলতে বড় ছিল না। লালকেল্লার প্রাসাদে এই খান্দানের কেউ না কেউ সব সময় থাকতেন। বাড়ীর সব মুরুব্বী মেয়েছেলেই নরম মেজাযের ছিলেন। শুনেছি দাদী-আম্মাই সব মেয়েছেলের মধ্যে সব থেকে বেশী জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। আমার দেখা অবস্থার মধ্যে যে-সব বেগম সাহেবাকে দেখেছি, তাঁরা সবাই স্বামীহারা বিধবা ছিলেন। বিধবারা শ্বেত বস্ত্র পরতেন এবং নিরামিষ অধিক সময় খেতেন। দাদী-আম্মাজিও তাই করতেন। দাদাজী মারা যাবার পর নহবত খানায় আর নহবত বাজত না। তবে দুপুরে খাওয়ার সময় ও রাত্রে খাওয়ার সময় ঢোল কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে চাকর-বাকরদের খাওয়ার সংকেত দেওয়া হতো।

আমার ছোট দাদা শ্বশুর লতিফউদ্দীন মুহাম্মদের দারুণ অসুখ হয়। হাত পা চিকন হয় ও পেটটা খুব ফুলে যায়। শোথ হয়ে এরূপ অসুখে তিনি মাসের পর মাস ভুগতে থাকেন। কি কারণে জানি না—ইংরাজ ফিরিঙ্গীদের লোক এসে জানালেন যে, রোগীর চিকিৎসা করতে যে টাকা লাগবে তা সরকারই দেবে। কলকাতা অথবা লণ্ডনে রেখে রোগীর চিকিৎসা করা হবে। এই প্রস্তাব আমার দুই চাচা শ্বশুরই প্রত্যাখ্যান করেন। দেড় মাসের মধ্যেই আবার ইংরেজ সরকারের লোক আসে এবং বলে যে, কলকাতার সুতানুটির কুঠিতে রেখে রোগীর চিকিৎসা করা হবে। কিন্তু

সেই প্রস্তাবও শাহজাদা নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ ও শাহজাদা লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কিছুদিন পরে আমার চাচা শ্বশুর লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৩০৪ সালে বড় ভূমিকম্প হয়। ১৩০৫ সালে শীতের সময় আমার চাচা শ্বশুর নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার দেবর তিনজনই নাবালক ছিল। নাবালকদের বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনা করার জন্য ইংরাজ সরকার রিসিভার নিয়োগ করেন। রিসিভারের নাম হল রাধাকান্ত লাহিড়ী। ইনি নদিয়া জেলার ঢোড়াদহের অধিবাসী। আমার দেবরদের রিসিভার চাল কলাই পর্যন্ত খেতে দিত না। বৃদ্ধ দাস-দাসীরা আশেপাশের বাড়ী হতে চাউল, তালু, লংকা চেয়ে নিয়ে এসে খাওয়াত। দুই তিন বৎসরের মধ্যে দেড় দুই হাজার বিঘা খাস জমি পত্তন দিলেন বিভিন্ন লোকের মধ্যে ও সেই টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন রিসিভার মহাশয়। এই দুঃখজনক সময়ের মধ্যে আমার চাচী শাশুড়ী মারা যান। তিনি যে খড়ের ঘরের মেঝেতে মাটির নীচে তিন পাতিল সোনার মোহর ও স্বর্ণের অলংকার পুতে রেখেছিলেন তা তিনি মারা যাওয়ার পর ঘরের মেঝে খুড়ে মসিমপুরের তখের মামুন জমাদার ঐ সব জিনিস ও আরও আরও মালামাল তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যায়, তা আর ফিরিয়ে দেন নি।

এদিকে রিসিভার রাধাকান্ত প্রাসাদের মাঝে মাঝে জায়গা ভেঙ্গে ইট ও বীম বিক্রি করতে শুরু করলেন। মসজিদের সংস্কারের নামে মসজিদের সামনের পাকা বাঁধানো কবরগুলি ভেঙ্গে মাটির সমান করে দিয়ে সে স্থানটি ইট-সুরকি চুন ইত্যাদি দিয়ে পাকা উঠান তৈরী করে দিলেন। ফুলচৌকী ও এর আশেপাশের জিনিসগুলি থেকে কেনবার জন্যে শালবন ও কাটাযুক্ত বেড়ু বাঁশবন ও বেতবন লাগান হল রিসিভারের চেষ্টা তদবীরে, যাতে লোকের দৃষ্টি থেকে ঐতিহাসিক স্মৃতি চিহ্নগুলি অস্তিত্বশূন্য হয়ে যায়। যখন স্থানীয়, বাইরের ও রংপুর শহরের লোকজন রিসিভার রাধাকান্ত লাহিড়ীর উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, তখন মামলা মোকদ্দমা করে রিসিভার রাধাকান্ত লাহিড়ীকে সরিয়ে দেন। আমার বড় দেবর রহিমউদ্দীন মুহাম্মদ নিজে সম্পত্তি দেখাশোনা করতে থাকেন। আমার ফুফু শাশুড়ী নাদেরন নেসা বিবির সম্পত্তি ১০ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী ও বহু খাস সম্পত্তি নিয়ে গেনার পাড়া স্টেটের মুতোয়াল্লীদ্বয়ের সাথে মামলা-মোকদ্দমা করে শেষ পর্যন্ত তিনি পাগল হয়ে মারা যান।

উল্লেখ্য য, উক্ত মুতোয়াল্লীদের সহিত মালিক বেগম নাদেরন নেসা বানুর নিজের বা তাঁর স্বামীর কোন সম্বন্ধ-সম্পর্ক ছিল না। মুতোয়াল্লীদ্বয় বেগম নাদেরন নেসার কোন প্রকার আত্মীয়ও ছিল না। আমার দেবররাই প্রকৃত ওয়ারিস ছিলেন। বেগম নাদেরন শাহজাদা গউসউদ্দীন মুহাম্মদের এক মাত্র কন্যা। আমার এই ফুফু শাশুড়ীর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। আমার শ্বশুরকুলই একমাত্র ওয়ারিস ছিল। ঐ মুতোয়াল্লীরা রক্তের দিক দিয়ে কোন হকদার ছিল না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা ঐ সম্পত্তি ভোগ-দখল করে খেয়েছে। আমার দ্বিতীয় দেবর ৪০ বছর বয়সে থাইসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তৃতীয় দেবর বিবাহ করার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার ও আমার দুই দেবরের ছেলেমেয়ে আছে। এই হলো আমাদের করুণ কাহিনীর সারাংশ।

পীর সাহেব চতুষ্টয়

আমার অনুসন্ধান বিষয়গুলি সম্পর্কে যারা বংশ পরম্পরায় শুনে এসেছেন ও আমাকে অনেক সময় বলেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাঁদের জন্ম তারিখ—অন্তত মৃত্যু তারিখ—সৈয়দ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ কৃষ্ণপুরী পীর সাহেব (মৃত্যুঃ ১৯৩৬)। আরও যাঁরা এসব কথা জানতেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বর্তমান কালের অন্যতম তাপস, সিদ্ধ পুরুষ মনীষী হযরত মাওলানা শাহ আফতাবুজ্জামান দিনাজপুরী (মৃত্যুঃ ১৯৪৫) পীর সাহেব ও ডাক্তার কবি শাহ্ আছিমউদ্দীন পীর সাহেব (মৃত্যুঃ ১৯৫৫)। গেনার পাড়া পীর শাহ মোঃ ইসহাক ফকির পীর সাহেব। ইঁহারা ফুলচৌকী নগরের শাহী খানদানের আত্মীয় বটে।

উক্ত মহা সম্মানীয় সুধীগণ ব্যতীত ফুলচৌকী নগরের হাজী জমির উদ্দীন, আলম বরকন্দাজ ও ইদু মুহাম্মদ এবং লোহানী পাড়া সাকিনের বাচ্চা মিয়া প্রমুখ বংশ পরম্পরায় শাহজাদা সুবাদার নুরুদ্দীন মুহাম্মদ বাকের জঙ্গ ও তাঁর অধঃস্তন বংশীয়দের কথা আমাকে বহুবার বলেছেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এদের সাক্ষাৎকার পেশ করলাম না।

২. সাক্ষাৎকার বিবরণীঃ স্বর্ণময়ী চৌধুরাণী[১]

'আমার বিবাহের পূর্ব হতে আমার শ্বশুরকুলের পূর্ব বংশীয়দের সম্পর্কে অনেক কিছুই আমি অবগত ছিলাম। আমার বাবা এবং ভাইয়েরা

---

[১] নিজামউদ্দীন মুহাম্মদের পুত্রবধূ এবং রহিমউদ্দীন মুহাম্মদের স্ত্রী।

সকলেই, বিশেষ করে বাবা ও বড় ভাইয়েরা সবাই আমার শ্বশুরের পূর্ব বংশীয়দের কীর্তিকলাপ নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁরা যে দিল্লীর মোগল রাজবংশের লোক ছিলেন, সেসব কথা প্রায় সময় উঠত। সুবাদার নবাব নুরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ এবং তাঁর ছেলে ও পৌত্রদের ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ও দুঃখ বরণের কথা প্রায় সময় উঠত। আমার বাবা ও ভাইয়েরা সকলেই ইংরাজ শাসনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন—কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলগুলির কার্যকলাপে সমর্থন দিতেন। আমার পিতাজী ছিলেন প্রত্যক্ষ কাজের লোক, বাতাসন রায়ত সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন। যা হোক, ত্যাগ ও দুঃখ বরণের কথা উঠলেই ফুলচৌকীর কথা উঠত। আমার বিয়েতে যিনি ঘটকালি করেছেন, তিনি আমার বাবার বাল্য-বন্ধু, নাম আমির মিঞা। ইনি তৎকার মিঞা বংশীয় লোক। আমির মিঞা ও তমিজ মিঞা তৎকার মিঞাদের শেষ বংশধর ছিলেন। শেষ গাযী যুদ্ধে (১৮৫৭) তৎকার মিঞাদের সকলকে হত্যা করা হয়। উক্ত দুই ভ্রাতা কি করে যে বেঁচে গেছেন তা তাঁরাও ঠিক মত বলতে পারেন নি। ফুলচৌকীতে উক্ত আমির মিঞা আমার স্বামীর বাড়ী এবং ভাশুরের বাড়ীর মধ্যখানে বাড়ী করেছিলেন। আমির মিঞা' তমিজ মিঞা আত্মীয়তা সম্পর্কে আমার স্বামীর চাচা হন। তাই আমি চাচা শ্বশুর হিসাবে এঁদের মানতাম। শেষ গাযী-যুদ্ধের সময় (১৮৫৭ সাল) এঁরা যুবক ছিলেন। আমার বাবাজী যেমন উক্ত গাযী-যুদ্ধের সময় স্বচক্ষে অনেক কিছু দেখেছেন, তিনিও দেখেছেন। আমির মিঞা চাচাজী দিনের প্রায় সময় বই নিয়ে বসে পড়া-শুনা করতেন। প্রতিদিন বিকালবেলা আমির মিঞা চাচাজী আমাকে নানা ধরনের বই পড়ে শোনাতেন। মাঝে-মধ্যে আমার শ্বশুর বংশীয়দের কথা আর তাঁর নিজের বংশীয়দের কথাও তিনি বলতেন। সুবাদার নুরুদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর যুদ্ধের কথা বলতেন। তিনি তাঁবুতে থাকতেন, হাতী, ঘোড়া, লায়্-লশকর সব তার সঙ্গে থাকত। ফকির সন্ন্যাসী জমিদার, প্রজারা তাঁর সঙ্গে থেকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। তিনি মোগল কুঠির বাইরে কিভাবে ইংরাজদের নিকট আহত হলেন এবং ফুলচৌকীতে নিয়ে এসে কয়েকদিন থাকার পর তাঁর মৃত্যু হল—সবই বলতেন। কামাল-উদ্দীন মুহাম্মদকে কিভাবে ইংরাজরা রঙমহলে শরবতের সাথে বিষ খাইয়ে হত্যা করল—এই সংবাদ দিল্লীতে তাঁর পুত্ররা ও বংশীয়দের

নিকট পৌঁছার পর রংপুর শহর আক্রমণ করলেন। ইংরাজরা ও তাদের অন্যান্য লোকজন কিভাবে পালিয়ে গেল—এসব কথা বলতেন। আমার দাদা শ্বশুর নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ শেষ গাযী যুদ্ধের সময় বাংলার সুবাদার এবং ইংরাজদের বিপক্ষদলের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আমার দাদা শ্বশুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গউসউদ্দীন মুহাম্মদ হিন্দুস্তানের আর এক সুবার সুবাদার ছিলেন। ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ হিন্দুস্তানের আর এক সুবার সুবাদার ছিলেন। আমির মিঞার পিতা ফাজিল খাঁ সাহেব হিন্দুস্তানে যুদ্ধের সময় সুবাদার ছিলেন। হিন্দুস্তানেই ইংরাজরা যুদ্ধের সময় তাঁকে ধরে ফাঁসি দেয়। এমনি ধরনের অনেক কথা আমির মিঞা তমিজ মিঞা চাচাজীর নিকট যেমন শুনেছি, আমার পিতার নিকটেও তেমনি শুনেছি। ফুলচৌকীতে বৃদ্ধ বয়স অবধি আরও অনেক প্রাচীন লোকের নিকট এ সব কথা শুনেছি। ফুলচৌকীর নগর আক্রমণের কথা এবং বিভিন্ন স্থানের হাজার হাজার লোককে ইংরাজরা গুলী করে ও গাছের ডালে ফাঁস দিয়ে মারার কথা অনেকবার অনেকের নিকট শুনেছি। কামান দিয়ে অনেক প্রাসাদ ভাঙ্গার কথাও শুনেছি। মাহিগঞ্জের সন্ন্যাসীদের মঠ এবং গোলাপ বাবুর প্রাসাদ (গোলাপ সিংহ শাহজী) আগুন দিয়ে পোড়ার কথা ও তাদের বাড়ীর অনেককে নির্মমভাবে হত্যার কথাও শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ আপনার বয়স এখন কত আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ প্রায় ৮০/৮২ বছরের মত হবে।

প্রশ্ন ঃ মোগল রাজবংশীয়রা ফুলশয্যায় শয়ন করতেন। কিভাবে ফুলশয্যা সাজানো হত তা শুনেছেন কি ?

উত্তর ঃ হাঁ; অনেকবার অনেক সময় ফুলচৌকীর মেয়ে পুরুষ অনেকের নিকট শুনেছি। তাদের মধ্যে সুখীর মা এবং আমির মিয়া চাচাজী—এই দুইজনের কথা বলব। শেষের দিকে ফুলশয্যা যাঁরা সাজাতেন, সেই সব মেয়েছেলেদের মধ্যে সুখীর মা প্রধান ছিলেন (কামালউদ্দীন মুহাম্মদের বৃদ্ধ বয়সের সময়) ডালায় করে মালীরা অনেক ফুল এনে দিত। অনেক সময় দাসীরা নিজেরাই বাগান হতে ফুল চয়ন করে আনতো। ফুলগুলি চিরে মাঝের ডাটা এবং বোটা ফেলে দেওয়া হত। তার পর ফুল দিয়ে চাদর তৈরী করা হত বিকাল বেলা। ফুলের হার, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া,

নানারূপভাবে তৈরী করা হত। ফুলের চাদর বিছানো হত। তোড়া, হার মালা—এ সব পালঙ্কের চতুষ্পার্শ্বে দেওয়া হত।

প্রশ্ন : এঁরা খুব বিলাসী ছিলেন, মানে আরামপ্রিয়। তবে যুদ্ধ করেছিলেন কি ভাবে ?

উত্তর : আমি যাহা শুনেছি, তাহা হল এই—এঁরা সত্যই খুব বিলাসী ছিলেন। কিন্তু নিয়মমাফিক এঁরা প্রতিটি কাজ করতেন। ভোর হওয়ার সাথে সাথে এঁরা ফুলশয্যা হতে উঠতেন, নামায পড়তেন। এরপর শরীর চর্চা করতেন। ভোরে ও বিকাল বেলায় নারী-পুরুষ সকলেই ঘোড়ায় চড়তেন এবং নানারকম যুদ্ধের কসরত-কায়দা শিখতেন। আরও শুনেছি—যুদ্ধের কৃত্রিম মহড়া করা হত হাতী-ঘোড়া, লোক-লশকর নিয়ে। নারী-পুরুষ সবাই সেই মহড়ায় যোগ দিতেন।

প্রশ্ন : ফুলচৌকীর মূল প্রাসাদটি আপনি অক্ষত অবস্থায় দেখেছেন কি ?

উত্তর : হাঁ, দেখেছি। তবে লোক থাকতে দেখিনি।

প্রশ্ন : আপনার শ্বশুর বংশীয় লোকেরা গরীবদের উপর কোন সময় অত্যাচার করেছিলেন কি ?

উত্তর : তাঁদের অজ্ঞাতে কোন সময় অত্যাচার যে হয়নি এমন কথা বলা যায় না। তবে তাঁদের জ্ঞাতসারে বা তাঁদের হুকুমে গরীবদের প্রতি অত্যাচারের কথা আমি কখনও কারও নিকট শুনি নি।

প্রশ্ন : সুবাদার নবাব বাকের জঙ্গ এবং তৎপুত্র-পৌত্রদের কবর কোথায় দেওয়া হয়েছে তা কখনও শুনেছেন কি ?

উত্তর : হাঁ; অনেকবার অনেক সময় শুনেছি। মসজিদের সামনে পাকা এবং কাঁচা জায়গাগুলিতে তাঁদের কবর রয়েছে। শুধু নবাব গউসউদ্দীন মুহাম্মদ দাদাজীর কবর রংপুর কারমাইকেল কলেজের নিকটে বালাটাড়ী গ্রামে রয়েছে। ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের কবর রংপুরের রঙমহলের লিচু বাগানে (রাস্তার ধারে) রয়েছে। মহামান্যা বেগম লালবিবির কবর মীরগঞ্জে রয়েছে। আমার শ্বশুর বংশের তিন জনের কবর ফুলচৌকীর বাইরে রয়েছে। আর সকলের কবর ফুলচৌকীতে রয়েছে।

এই মাননীয়া বেগম সাহেবা ব্যতীত ফুলচৌকীর নিম্নোক্ত লোকেরা এ সব কথা বলেছেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার বিবরণ আমরা না দিয়ে শুধু তাদের নাম দিচ্ছি—আদিলউদ্দীন আকন্দ, নূরুদ্দীন ফকির, নজর মামুদ ফকির,

নছিরউদ্দীন সরকার, আফতাবউদ্দীন ফকির, আলেফউদ্দীন, আলমউদ্দীন, কলমউদ্দীন, সোবহানউদ্দীন, জামালউদ্দীন এবং আরও অনেকে।

কামালউদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জামালউদ্দীন মুহাম্মদের একমাত্র পুত্র খিজিরউদ্দীন মুহাম্মদ দিল্লীর রাজপ্রাসাদে ইংরাজদের গুলীতে নিহত হন। ইনি দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের কনিষ্ঠা ভগ্নীর স্বামী ছিলেন। ওনার স্ত্রীর কবর বাঁধানো অবস্থায় ফুলচৌকীর প্রাসাদের ভিতরে অবস্থিত আছে।

মাননীয়া বেগম সাহেবাকে জিজ্ঞাসায় তিনি আরো বলেন ঃ

"আমার পিতা হাজি আছিমুল্যা মণ্ডল কিরূপ জনপ্রিয় লোক ছিলেন তা নিম্নোক্ত ঘটনা হতে জানা যাবে ঃ

বাতাসন পরগনার জমিদারের ম্যানেজার আমার পিতাকে হত্যা করার জন্য হত্যাকারীদের সহিত পরামর্শ করার সময় গভীর রাত্রিতে ঈশ্বর বৈরাগী ও তাঁর স্ত্রী নীরোদ বালা বৈষ্ণবী কাছারীর পিছনে বৃষ্টিতে ভিজে হত্যা করার পরামর্শ শুনে স্বামী-স্ত্রী বাড়ীতে ফিরে এসে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যেভাবেই হউক বাবাকে[১] বাঁচানো চাই। ঈশ্বর বৈরাগীর পা দু'টি বাঁকা থাকায় তার স্ত্রী নীরোদ বালা আষাঢ় মাসের কূল-ছাপা নদীতে একটা কলসীর সাহায্যে যমুনেশ্বরী নদী সাঁতরিয়ে পার হয়ে গিয়ে আমার বাবাকে বলেন, "বাবা, পাগলা ম্যানেজার এখনই আপনাকে খুন করার জন্য কতিপয় খুনীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এর ফলে সারারাত সতর্কতার সহিত থাকার পর বিপদ কেটে যায়।

আমার পিতা ও ভ্রাতাদের সহায়তা দ্বারা এই শাহী খানদানের শেষের দিকে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তা বহু চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়।

পিতা—আছিমুল্যা মণ্ডল (লোহানী)[২]
ভ্রাতা—রহিম উল্যা মণ্ডল ,,

---

[১] এলাকার সকলে লোকহিতৈষণার জন্য তাঁকে 'বাবা' বলতেন।

[২] আছিমূল্যা মণ্ডল লোহানী সাহেব এক অসাধারণ লোকহিতৈষী এবং সর্বজনপ্রিয় মহাত্মা ছিলেন। অর্থ ও নামের কাঙ্গাল তিনি কোন সময় ছিলেন না। উচ্চ হতে নীচ পর্যন্ত সকল জাতের সকল ধর্মমতের নরনারী ছেলেমেয়েকে আপন জন মনে করতেন। রংপুর শহরের রেল স্টেশন হতে কাছারী পর্যন্ত দীর্ঘ দু'মাইল পথ যখন গরুর অথবা ঘোড়ার গাড়িতে করে তিনি যাওয়া-আসা করতেন, তখন দুই পাশের লোক শুধু 'আদাব' 'আদাব' বলতেন এবং ইনি হাত নেড়ে দুই পাশে বলতেন 'আল্লাহ্ ভাল করুক' 'আল্লাহ্ ভাল করুক'। বাজার, বন্দর সবখানেই লোকে ঐ ভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতেন। অসীম সাহসী নীরোদ বালা

ভ্রাতা—শহর উল্যা মণ্ডল (লোহানী)
,, —দারাজউদ্দীন মণ্ডল ,,
,, —তছিরউদ্দীন মণ্ডল ,,
,, —সিরাজউদ্দীন মণ্ডল ,,
,, —দিলদার আলী মণ্ডল ,,
,, —ছবির উল্যা মণ্ডল ,,
,, —ছলিম উল্যা মণ্ডল ,,
,, —সোলায়মান মণ্ডল ,,
,, —কছিরউদ্দীন মণ্ডল ,,

জেঠাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেরামত উল্যা মণ্ডল।

হাজরে মামুদ (মামুজী)

ইমাম উল্যা গাছুয়া (কাঁকড়ু বেটা)। এনাদের ত্যাগ সেবা চিরদিন স্মরণ রাখবার মত-(লেখক)

দেবীকে আমি ছোটবেলায় দেখেছি। তাঁর সৎ ছেলে কাটু বৈরাগী এখনও বেঁচে আছে। আছিমুল্যা মণ্ডল লোহানী সাহেব কেবল মানবপ্রেমিক ছিলেন তা নয়, জীব-প্রেমিকও ছিলেন। তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন একটি ছোট্ট আকারের আম বাগান ছিল। আম বাগানে বহু জাতের পাখি ছিল। প্রতিদিন পাখিগুলিকে তিনি নিজ হাতে পুটি মাছ ও কৈ ছিটিয়ে দিয়ে খাওয়াতেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যু হল রাত বারটার দিকে। মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আমবাগানের সমস্ত পাখিগুলি কোলাহল করে উড়ে উঠে দিক্‌বিদিক্‌ চলে গেল। কিন্তু ঐ বাগানে নানা জাতের পাখিগুলি আর কখনও ফিরে আসেনি। তাঁর মৃত্যুর দিন সকল ধর্মের মানুষের কি কান্না আর হৃদয়বিদারক হাহুতাশ। ওঁরাও, বুনো, সাঁওতাল নরনারীদের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কান্নাকাটি হতে থাকে, আর তারা বলতে থাকে, 'এখন বাবা নাই, কে আমাদের ধান দিবে, চাউল দিবে, টাকা দিবে ?'' এই ভাবে বিলাপ করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। সকল জাতের লোকের কি এক সকরুণ দৃশ্য ঐ শোকের দিনটিতে। তাঁর প্রজাহিতৈষণার দিনগুলিতে আমি দেখেছি মণ্ডল লোহানী সাহেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু একান্ত সহযোগী সহকর্মী বদরগঞ্জের জনগণের প্রসিদ্ধ নেত। ঠাকুর প্রসাদ রায় মহাশয় এবং আরও অনেকে।

হাজী আছিমুল্যা মণ্ডল লোহানী এবং তার সহকারী সহযোগী বন্ধু বদরগঞ্জের গণনেতারা বাতাসন পরগনা 'রাইত সমিতি' নামে একটি রেজিস্ট্রিভুক্ত সংগঠন গঠন করে তার মধ্যস্থতায় জনসেবা এবং প্রজাসাধারণের উপর জমিদারদের অত্যাচার অবিচার নিবারণ করবার চেষ্টা করতেন। তাঁর উক্ত সংগঠনে অনেক দেশপ্রিয় নরনারী ছিল।

আমি (লেখক) ছোট বেলায় দেখেছি নীরোদ বালা বৈরাগিনী গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে কাঁচের চুড়ি বিক্রি করতেন। তাঁর ছেলে ফুকরা বৈরাগীকে আমি দেখেছি। সে এখন আর এই জগতে নেই। নীরোদ বালার দেশপ্রেম ও দুর্জয় সাহসের কথা এখনও অত্রাঞ্চলের লোকেরা সব সময় আলোচনা করে।

৩. সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ মহারাজ সত্যনারায়ণ গিরি সন্ন্যাসী[১]

[১৩৬০ সালের ১২ই বৈশাখ এই বিবরণী গ্রহণ করা হয়]

প্রশ্ন ঃ মহারাজ বাহাদুর ! সন্ন্যাসী, ফকির ও প্রজা বিদ্রোহ সম্বন্ধে আপনি যদি কিছু জানেন, ঐ সম্পর্কে বললে আমরা উপকৃত হব। এই সব বিদ্রোহের সব নায়ক এবং মূল নায়ক কে বা কারা ছিলেন, তা একটু বিস্তারিত বলুন।

উত্তর ঃ শাহজাদা সুবাদার নওয়াব নূরুদ্দীন বাকের জঙ্গ প্রবীন নেতা ছিলেন, যাঁকে ইংরাজরা ফকির নেতা মজনু শাহ্ বলত। জমিদার ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, রাজা দয়াচন্দ্র শীল ও মুসা শাহ্ প্রমুখ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ সুবাদার বাকের জঙ্গের পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানেন কি ?

উত্তর ঃ ইনি মোগল রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ্ শাহ্ আলমের চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি। মোগলহাটের যুদ্ধে ইনি আহত হন। তাঁর সঙ্গী লোকেরা নবাবকে নগরে (ফুলচৌকীতে) নিয়ে যান। অল্প দিন পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ঃ নবাব কি অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়েছেন ?

উত্তর ঃ না, দুই পুত্র এবং দুই কন্যা সুবাদারের ছিল। পুত্রদের নাম হল—কামালউদ্দীন মুহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মুহাম্মদ। কন্যাদের নাম—বেগম লালবিবি[২] ও বেগম চাঁদবিবি। মাহিগঞ্জের দক্ষিণে লালবিবির কবর রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ মাহিগঞ্জের দক্ষিণে মীরগঞ্জে যে লালবিবির কবর রয়েছে, তিনি কি সুবাদার বাকের জঙ্গের কন্যা ?

উত্তর ঃ হাঁ, এই লালবিবির বিয়ে হয় বাদশাহ শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের সাথে। বাদশাহ বাহাদুর শাহের আপন মাতা হলেন সম্রাজ্ঞী লালবিবি। এই মহিয়সী বেগম পিতার মত অসীম সাহসী ও তেজস্বিনী এবং ইংরাজ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

---

[১] সন্ন্যাসী নেতা সত্যনারায়ণ গিরির গুরুপিতা সুমেরু গিরি মহারাজ। সত্যনারায়ণ গিরি রংপুর মাহিগঞ্জস্থিত প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী গোঁসাঈ বংশীয় জমিদার। সাক্ষাৎ বিবরণ গ্রহণ কালে তার বয়স ছিল ৯৬ বছর।

[২] বিশ্বকোষে রয়েছে 'লালবাঈ' : অবশ্য 'বাঈ', 'বিবি' 'বেগম'—এসব কথার মানে একই রূপ। (লেখক)

ইনি দিল্লী হতে গোপনে সময় সময় পিত্রালয়ে এসে ইংরাজ-বিরোধীদের সংগঠিত করবার চেষ্টা করতেন। সম্রাজ্ঞী লালবিবিকে' ইংরাজরা খুঁজবার জন্য বাড়ী বাড়ী তল্লাসী চালাতো এবং প্রতি বাড়ী বা যে কোনগ্রামে গিয়ে "কাঁহা লাল বিবি" "কাঁহা লাল বিবি" বলে খোঁজাখুঁজি করত। কোন লোকই তাঁর খোঁজ ফিরিঙ্গীদের জানাতো না।

প্রশ্ন : মহারাজ বাহাদুর, তবে মীরগঞ্জে সম্রাজ্ঞী লালবিবির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়ে ছিল কি ?

উত্তর : না, ইংরাজরা তাদের চরদের সাহায্যে সম্রাজ্ঞীকে গুলী করে শহীদ করে উক্ত মীরগঞ্জে। সম্রাজ্ঞী লালবিবি সাহেবা গোপনে ফুলচৌকী পিত্রালয় হতে সন্ন্যাসীদের এবং ফকিরদের নিকট আসার পথে ঐ স্থানে তাঁকে গুলী করে শহীদ করা হয়।

প্রশ্ন : গুপ্তচর এবং ইংরাজদের মধ্যে যারা গুলী করে মেরেছে, তাদের কারো নাম আপনার স্মরণ আছে কি ?

উত্তর : ইংরাজদের নাম আমার স্মরণ নেই। তবে এ দেশীয়—এই অঞ্চলের গুপ্তচরদের নাম আমার এবং আমার মত এই জেলার বহু লোকের জানা আছে।

প্রশ্ন : ওরা কারা বলুন ?

উত্তর : পায়রাবন্দের প্রথম জমিদার টাটিশেখ, ভাংনির প্রথম জমিদার খয়রুদ্দীন এবং গুরুবাবু লাহিড়ী জমিদারদের এক পূর্বপুরুষ তার নাম আমার স্মরণ নেই। এ সম্পর্কে সুন্দর একটি ছড়াগানের দুটি পংক্তি আমার স্মরণ আছে এবং এই রংপুর জেলার অনেক লোকের মুখে আমি এটা ছোট বেলা হতে শুনে এসেছি।

প্রশ্ন : সেই ছড়াগানের যে সামান্য অংশ আপনার জানা আছে, সেটা বলুন না শুনি।

উত্তর :

টাটি পাইল মাটি,
খায়েরুদ্দী পাইল নাট (লাট),
নাড়ী (লাহিড়ী) পাইল ঠাকুর বাড়ী,
তার তামাশা দেখ।

উক্ত লোকেরা বেগম সাহেবা লালবিবিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে গুপ্তচরের কাজ করায় রাতারাতি বিপুল জমিদারী, নিষ্কর ভূমি এবং অনেক দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক হয়।

প্রশ্ন ঃ সুবাদারের কন্যা বেগম চাঁদবিবির বিয়ে কোথায় হয়েছিল ?

উত্তর ঃ চাঁদবিবির বিয়ে হয়েছিল আপন চাচাতো ভাই ওয়ালিদাদ মুহাম্মদের সহিত।

প্রশ্ন ঃ কামালউদ্দীন মুহাম্মদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল কি ?

উত্তর ঃ ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের প্রথম দিকে, যখন রংপুরের বিদ্রোহী দলগুলি দিল্লীর দিকে চলে যায়, ঠিক ঐ সময়ের অব্যবহিত পরে রংপুরের রঙমহলে কামাল কাশানা প্রাসাদে শাহজাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদকে ইংরেজরা শরবতের সাথে বিষ প্রদানে হত্যা করে এবং শাহজাদা জামাল-উদ্দীন মুহাম্মদ-এর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

প্রশ্ন ঃ সুবাদার নবাব নুরুদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর পুত্র কামালউদ্দীন ও জামালউদ্দীনের কোন পুত্র-কন্যা ছিল কি ?

উত্তর ঃ হাঁ। কামালউদ্দীন মুহাম্মদের দুই পুত্র—নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ, গউসউদ্দীন মুহাম্মদ। জামালউদ্দীনের এক মাত্র পুত্র—খিজিরউদ্দীন মুহাম্মদ। ইনি ১৮৫৭-এর যুদ্ধের সময়ে দিল্লীর প্রাসাদে ইংরাজ কর্তৃক নিহত হন।

প্রশ্ন ঃ এ'রা কি ইংরাজদের আর কোন বিরোধিতা করেছেন অথবা শান্ত ছিলেন ?

উত্তর ঃ এ'রা শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের বিরোধিতা করে এসেছেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এ'রা প্রধান ভূমিকায় ছিলেন। শাহজাদা বাকেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, শাকের মুহাম্মদের পুত্র ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ—এ'রা সকলেই সিপাহী বিপ্লবে মরণপণ সংগ্রাম করে এসেছেন। শাহজাদা ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ এবং গউস্উদ্দীন মুহাম্মদকে ইংরাজরা বহু নির্যাতনের মধ্য দিয়ে হত্যা করে। ওয়ালিদাদ 'মুহাম্মদের কবর রংপুরের বর্তমান শহর লিচুবাগানে (খানবাহাদুর আবদুর রউফ সাহেবের বাসার সামনে); ফকিরেরা সমাহিত করেন। শাহজাদা গউসউদ্দীন মুহাম্মদ-এর কবর রয়েছে রংপুর কারমাইকেল কলেজের উত্তর-পশ্চিম দিকে বালাটাড়ি গ্রামে।

প্রশ্ন ঃ এ'দের এখানে ইংরাজরা ধরে হত্যা করেছেন কি ?

উত্তর ঃ না, ফুলচৌকী প্রাসাদ হতে ধরে হাতীর পায়ে বে'ধে দিয়ে নিয়ে আসে। পরে বহু নির্যাতনের মধ্য দিয়ে মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। শুনেছি এই সঙ্গে হাজার হাজার লোককেও গুলী করেও ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন ঃ মহারাজ বাহাদুর; সিপাহী যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কি বক্‌ত খাঁ ছিলেন ?

উত্তর ঃ ইংরাজদের ইতিহাস পড়লে তো তাই দেখা যায়।

প্রশ্ন ঃ আমি ইতিহাসের কথা আপনার কাছে জানতে চাই না। এ সম্পর্কে কিছু যদি জানেন তবে দয়া করে বলুন।

উত্তর ঃ আমি বহু সম্ভ্রান্ত লোকের মুখে যা শুনে এসেছি তা হল এই, শাহজাদা কামালউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ সিপাহী বিপ্লবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বক্‌ত খাঁ নহে। তিনি ও তাঁর ছোট ভাই সৈন্য পরিচালনা এবং কামান চালাতে নাকি খুব দক্ষ ও পটু ছিলেন। গউস্‌উদ্দীন মুহাম্মদ আলিগড়ের সুবাদার এবং ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ মধ্য প্রদেশের সুবাদার ছিলেন। শুনেছি বিপ্লবীরা জয়ী হলে ফুলচৌকীতে ভারতের রাজধানী হত।

প্রশ্ন ঃ এ তো আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন, মহারাজ বাহাদুর ?

উত্তর ঃ এখন সময় এবং অবস্থা গতিকে অদ্ভুতই মনে হবে। তবে যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে ন্যায়সঙ্গতই ছিল।

প্রশ্ন ঃ দয়া করে ব্যাখ্যা করে বলুন, আমরা শুনি।

উত্তর ঃ শুনেছি সমস্ত রাজবংশের মধ্যে এঁরা ধন-ঐশ্বর্যে সব চাইতে ঐশ্বর্যবান ছিলেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্থানে ও বঙ্গ আসামে বিরাট আকারে এঁদের ব্যবসা ছিল। যেমন—'লোহা, রেশমের শাল বানাত, নীল, চিনির কারবার ও কুঠি। হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি বিষয়ের কারবারও ছিল এবং সততা, ন্যায়পরায়ণতা—সর্বোপরি ইংরাজদের বিরোধিতায় অগ্রণী ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ এবং শাহজাদাদের এঁদের নানারূপ সাহায্যে চলতে হত। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত লালকেল্লায় এঁদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট প্রাসাদ ছিল। এও শুনেছি—প্রজারঞ্জক এবং জনপ্রিয়তায় এঁদের অনুরূপ অন্য কোন মোগল বাদশাহজাদারা ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান, বড়-ছোট—সকলেই এঁদের ভালবাসত এবং এঁরাও তাদের সঙ্গে, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন।

প্রশ্ন ঃ ইংরাজরা কেন এভাবে এঁদের কথা গোপন করে এসেছে, সে সম্পর্কে কিছু যদি জানেন তবে বলুন ?

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে আমি খুব একটা বেশী কিছু বলতে পারবো না।

আমার বয়স ৯৫-এর উপরে। স্মরণ শক্তি অনেক কমে গেছে; অনেক কথা মনে থাকে না। স্মরণ নেই। আপনি অনেকবার আমার কাছে এসেছেন। স্মরণ করে করে আমাকে অনেক কথা বলতে হয়।

প্রশ্ন ঃ এঁদের বংশধররা এখন কোথায় আছেন; স্মরণ থাকলে বলবেন কি ?

উত্তর ঃ (উচ্চ হাসি হেসে) হাঁ, তারা এখন ফুলচৌকীতে আছেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন শাহজাদাকে আমি চিনি। ঐ জন্য আমরা তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করে থাকি।

প্রশ্ন ঃ এই সব সন্ন্যাসী কি এই স্থানের ?

উত্তর ঃ না, নানা স্থানের, নানা জেলার। তাঁরা আমাদের রাজবাড়ীতে আসতেন, খেতেন, থাকতেন। লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহের বারান্দায় সন্ধ্যায় বসতেন ও নানা গল্প করতেন। ওতে মাঝে মাঝে এই সব কথাও উঠতো। এঁরা মাঝে মধ্যে এই সব কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। নূতন কোন লোক এলে আলোচনা একেবারে বন্ধ করে দিতেন। মাঝে মধ্যে এক বছর, দু'বছর, পাঁচ বছর পর কথা প্রসঙ্গে এই সব কথা উঠত।

প্রশ্ন ঃ মহারাজ বাহাদুর ! শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীরা এবং অপর ভদ্র লোকেরা অন্য কোন লোক এলে কেন আলোচনা বন্ধ করতেন ?

উত্তর ঃ এটা খুবই স্বাভাবিক, দেশটা ছিল সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের অধীন। তা ছাড়া ১৮৫৭ সালের ও তার পূর্ববর্তী এক শতাব্দীর অত্যাচার—যে অত্যাচারের কোন নজির নাই এবং এই সব অত্যাচারের অনেক ঘটনা এদের অনেকে স্বচক্ষে দেখেছেন। ইংরাজদের কড়া নিষেধ ছিল, নবাব নূরুদ্দীন, তাঁর বংশের লোকদের এবং তাঁদের অন্যান্য সহকর্মীর সম্পর্কে যেন কোন কথা আলোচনা করা না হয়। এ ধরনের প্রশ্ন আমিও করেছিলাম ঐ সব প্রাচীনদেরকে। শেষের দিকে ইংরাজরা অনেকটা সভ্য ও নম্রতা প্রকাশ করেছিল, কিন্তু পূর্বে তা ছিল না। এখন দেশ স্বাধীন হবার পর লোকে যা খুশি তাই বলছে। কিন্তু যতটা সহজ এখন মনে হচ্ছে, স্বাধীনতার পূর্বে ঠিক তা ছিল না। নীচের ভদ্র লোকেরা রাজবাড়ীতে সময় সময় এই সব গল্প করত। আমার ছোট বেলার বয়স হতে আমি কখনও কখনও তাঁদের কাছে এসব কথা শুনেছি। এঁরা হলেন মহারাজ পরনট গিরি, মহারাজ গঙ্গা গিরি, শান্তি ভারতি, মহারাজ কপ'ট চটপট গিরি, মহারাজ

শুখান গিরি, মহারাজ গোপাল গিরি। এই সব শ্রদ্ধাস্পদ সন্ন্যাসী ছাড়া শ্রীযুক্তবাবু কেদার নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু কান্তি ভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ চাকী, শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্ল নাথ তালুকদার, শ্রীযুক্ত বাবু ফণীভূষণ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বাবু রাম গোপাল চক্রবর্তী (ইনি গোঁসাঈ সন্ন্যাসী রাজবাটিস্থ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত)। রঙ্গপুর গয়া বাড়ীর মহারাজ ডুম্বর গিরি, বগুড়ার সন্ন্যাসী মহারাজ গিরিরাজ দুন্ধির, সন্ন্যাসী আনন্দ মহারাজ, সুমেরু গিরি, সন্ন্যাসী জগতকণ্ঠ নিয়োগী, সন্ন্যাসী পরপট গিরি বাবাজী, সন্ন্যাসী বিমলানন্দ স্বরস্বতী, শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামানন্দ জমিদার, শ্রী বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ (আফান উল্যা মাইনর স্কুলের হেড মাস্টার) জমিদার শ্রী কমলা কান্ত ভট্টাচার্য, ডঃ কিশোরী মোহন হালদার এবং আরও অনেকে।

রংপুর গয়া বাড়ীর সন্ন্যাসী মহারাজ ডুম্বর গিরি ও বগুড়ার কেশব পুরের সন্ন্যাসী মহারাজ গিরিরাজ দুন্ধির—এই দুই জন লর্ড হেস্টিংস এর আমলের লোক ছিলেন। এঁরা প্রথম দিকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে, স্বদেশীয়দের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। পরে যে কোন কারণে হোক, ইংরাজদের পক্ষাবলম্বন করেন। আমাদের রাজবাড়ীর সামনে যে কামান দুটি আছে, তা ঐ সময়কার।

প্রশ্নঃ আচ্ছা, মহারাজ ! সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ ও প্রজা বিদ্রোহ এক না পৃথক পৃথক ছিল ! আপনি কি মনে করেন ?

উত্তরঃ না, মূলত এ সব বিদ্রোহ একই ছিল। ইংরাজরা তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছে।

প্রশ্নঃ এ সব কথা আপনি কোথায় শুনেছেন ?

উত্তরঃ পূর্বোক্ত লোকদের কাছে অনেকবার অনেকদিন শুনেছি।

প্রশ্নঃ মহারাজ বাহাদুর, রায় সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ লিখিত এবং গভর্নমেণ্ট হতে প্রচারিত 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থখানি আপনি কি কখনও পড়ে দেখেছেন ?

উত্তরঃ হাঁ, একাধিকবার পড়ে দেখেছি। উক্ত গ্রন্থখানি আমার কাছে এখনও আছে। আমার মালদহের জমিদারীর কোন এক মামলা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে গ্রন্থখানি আমাকে ক্রয় করতে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে মজনু

শাহকে যে ফকির এবং ফকির নেতা বলা হচ্ছে, সে সম্পর্কে আপনার কি মত এবং কি বলতে চান ?

উত্তর ঃ উক্ত গ্রন্থে মজনুন শাহ্‌র পরিচয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভূয়া ও মিথ্যা। আমি পূর্বোক্ত লোকদের নিকট এবং আরও অনেকের নিকট ছোটবেলা হতে শুনে এসেছি—মজনুন শাহ সম্পর্কে তা হল, ইনি ছিলেন দিল্লীর মোগল প্রিন্স। ইনি যেমন ছিলেন সকল বিদ্রোহী দলের মূল নেতা, তেমনি ছিলেন সুবা বাংলার সুবাদার নওয়াব।

প্রশ্ন ঃ এই বিদ্রোহী দলের এবং নওয়াবের রাজধানী কোথায় ছিল ?

উত্তর ঃ রংপুর জেলার ফুলচৌকী নামক স্থানে। এ'দের নির্মীয়মান রাজধানী ছিল। সেই স্থানে অসংখ্য দালান-কোঠা গড়ে উঠেছিল। সরোবর, ঝর্ণা, ফোয়ারার ধ্বংসাবশেষগুলি এখনও সেখানে বর্তমান রয়েছে। সেই আমলের দালান-কোঠাগুলি এখন আর নেই বটে। তবে তার ধ্বংসাবশেষগুলির চিহ্ন এখনও সে স্থানের বিভিন্ন স্থানগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা ১-১২-৫৬ ইংরাজী তারিখে ফুলচৌকীর ঝর্ণা ফোয়ারার ছবি তুলে নিয়ে আসি এবং আরও অনেকে তুলে নিয়ে আসে।

প্রশ্ন ঃ মহারাজ বাহাদুর ! আচ্ছা বলুন তো, রংপুর শহর এখন যেখানে অবস্থিত, সেইখানে ছিল, না কোথায় ?

উত্তর ঃ না, ওখানে নবাব নুরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ এবং তৎপুত্রদের রঙমহল ছিল। বাকের কাশানা, নওয়াবগঞ্জ, কামাল কাশানা, কাশানা একই ধরনের নামীয় কাঁচ নির্মিত বিরাট বিরাট আকারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দালান ছিল এবং পৃথিবীর নানা জাতীয় ফুল শোভিত বাগান ছিল। বহু জাতীয় ফলের বাগান ছিল। হাতীশালা, ঘোড়াশালা বহু কিছু ছিল। যা ভাবলে এবং শুনলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। মাহিগঞ্জ ও এর পূর্বদিকে ও দক্ষিণ দিকে পুরানো রংপুর ছিল। এ সব মৌজার নাম এখন পুরানো কাগজ পত্রে রংপুরই রয়েছে। বর্তমান রংপুরের নাম পুরানো কাগজপত্রে রাধা বল্লভ, কামাল কাশানা প্রভৃতি নামের উল্লেখ রয়েছে। আমার গুরু পিতা সন্ন্যাসী মহারাজ সুমেরু গিরি এবং সন্ন্যাসীভুলন গিরি ছোট রংপুর শহরে কাকিনার রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মাইনর স্কুলে পড়েছেন। স্কুল ঘরটি দো-মহলা বিশিষ্ট দালান ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ আমি দেখেছি। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন মাহিগঞ্জে সমস্ত কারবার ব্যবসাদি ছিল।

বর্তমান রংপুর শহরে ছোট খাট অতি ক্ষুদ্র সামান্য কিছু দোকান ছিল। ধুতি বা শাড়ী খরিদ করতে হলে লোকদের মাহিগঞ্জে এসে কিনতে হত। বাংলা ১৩০৪ সালে এ সব অঞ্চলে ভীষণ আকারে ভূমিকম্প হয়। নিচ থেকে মাটি ফেটে এত জল উঠে ছিল যে, কলার ভেলায় চড়ে এদিক ওদিক আসা যাওয়া করতে হতো। এই সময় বহু পুরাতন দালান কোঠা ভেঙে যায়।

প্রশ্ন ঃ পূর্বে মোগল আমলের শেষের দিকে বিশেষ করে ইংরাজদের আগমনের সময় জেল হাজত কোথায় ছিল, শুনেছেন কি ?

উত্তর ঃ হাঁ, মাহিগঞ্জ রেল ক্রসিং-এর পার্শ্বে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। পূর্বে ‘মন্হনার জমিদার, শীবচন্দ্র রাজা এবং কাকিনা প্রভৃতির জমিদারের কাছারী বাড়ী এখানেই ছিল। ডিমলা, মাহিগঞ্জ, তাজহাট রাজবাড়ী এবং আমাদের বাড়ী এখন অবধি রয়েছে।

৪. সাক্ষাৎকার বিবরণী : সৈয়দ মকদুম মিয়া

[১৯৪৭ সালের ৩রা নভেম্বর এই বিবরণী গৃহীত হয়]

[ইনি রংপুরের মুন্সী পাড়ার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ১৯৩৯ সাল হতে পাকিস্তান হওয়ার তিন বছর পর অবধি প্রায় দিনই উক্ত সৈয়দ সাহেবের নিকট গিয়ে যা শুনেছি তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।]

“মীরজাফর ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম নেতৃত্ব দান করেন, তিনি দিল্লীর লালকেল্লার অধিবাসী শাহাজাদা নুরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। ইনি সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের আপন ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। এঁর ছোট ভাইয়ের নাম শাকেরউদ্দীন মুহাম্মদ। ইনি লড়াই টড়াই করতেন না। তবে বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন। ফুলচৌকীতে প্রশস্ত মাঠ তৈরী করে তাঁবুতে ফুলসজ্জায় থাকতেন; সেই জন্য ফুলচৌকী নাম হয়েছে। ইনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার পদ নিয়ে ফুলচৌকীতে আসেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট জমিদার, ফকির, সন্ন্যাসী ও প্রজা সাধারণকে নিয়ে বিরাট এক বাহিনী গড়ে ইংরাজ-আশ্রিত সুবাদার মীরজাফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের মামা তন্‌খার ভূস্বামী সৈয়দ বংশীয় জমিদার আলদাদ খাঁ, সাহেবগঞ্জের ভূস্বামী সন্ন্যাসী হনুমান গিরী আরও অনেক

সন্ন্যাসী লালবাড়ীর ঘিরলাই গ্রামের প্রসিদ্ধ ফকির নেতা মুসা শাহ (কাদের উল্লা), ময়েনপুরের কদমতলা নিবাসী রাজা দয়াশীল, ইটাকুমারীর প্রসিদ্ধ জমিদার শিবচন্দ্ররায়, মন্হনার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, তিনি স্বর্গবাসী হ'লে তাঁর স্বনামধন্য স্ত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী, পাঠক পাড়া নিবাসী রাজা ভবানী পাঠক; এই জেলার ও আরও বিভিন্ন জেলার খ্যাতনামা লোক এবং প্রজা সাধারণকে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মসিমপুর নামক যুদ্ধে নূতন সম্রাট শাহ আলমও এসেছিলেন। মোগলহাটে তাঁর কুঠি ছিল; সেই কুঠির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধিও আছে, মোগল কুঠি নাম। সন্নিকটে আদিতমারী নামক স্থানে ক্যাপটেন ম্যাকডোনাল্ড-এর অতর্কিত আক্রমণে শাহজাদা আহত এবং রাজা দয়াশীল নিহত হন। ঐ সময় নবাবের সঙ্গে ৫০ জন দেহরক্ষী ছিলেন। তাঁরা শাহজাদাকে ফুলচৌকীতে নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ফুলচৌকী মস্‌জিদের সামনে নবাব ও তাঁর পরিবার-পরিজনের কবর দেওয়া হয়। মসজিদটি তৎপুত্র কামালউদ্দীন মুহাম্মদ দেন।

এঁকে ইংরাজরা মজনু শাহ বা মজনু ফকির বলত। দিল্লীর এই মোগল শাহ্‌জাদাকে ইংরাজ শাসকরা সুকৌশলে ফকিরে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করে। রায়বাহাদুর যামিনী ঘোষ—ইনি ইংরাজদের এক চাকুরীজীবী ছিলেন। ইংরাজরা তাঁকে দিয়ে 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থ লেখান। ইংরাজদের প্রধান সরকারী কার্যালয় রাইটার্স বিল্ডিং-এর ছাপাখানা থেকে ছাপিয়ে প্রকাশও করেন। এ সব কথা গ্রন্থের মধ্যেই লিখিত আছে, গোপন কিছু নয়। 'টেরর মজনু শাহ' (Terror Majnu Shah; এই দস্যু সর্দারের কথা রাজখরচে প্রচার প্রকাশ করবার কি প্রয়োজনটা ছিল? ইংরাজ সরকারের যখন ভারত উপমহাদেশে ইংরাজ-বিরোধী আন্দোলন বিশেষ করে বাংলাদেশে দানা বেঁধে উঠতে থাকলো বিদ্রোহের আকার নিয়ে, তখন সুকৌশলে এই মোগল প্রিন্সকে একেবারে মজনু শাহ ফকিরে পরিণত করা হলো ইংরাজ চাকুরিয়া যামিনী মোহন ঘোষের দ্বারা। যা কিছু মেটিরিয়াল্‌স তাও ইংরাজরা দিয়ে দিলেন নিজ হস্তে। পূর্বের মত আর যেন কোন ইংরাজ-বিরোধী সাংঘাতিক ধরনের সংগ্রাম সংঘটিত না হয় এজন্যে নয় কি? যে সব দেশের মানুষ এই শাহজাদাদের এবং তাদের সাথী-বন্ধুদের জানে, তারা ইংরেজদের ও তাদের

তাবেদারদের লেখার উপর কোনদিনও বিশ্বাস করেনি। ছোটবেলা হতেই সুপ্রাচীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকট শুনে এসেছি ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, প্রজাবিদ্রোহ—এ সবগুলি মিলে একটি মাত্র বিদ্রোহী দল ছিল। নায়ক ছিলেন শাহজাদা নবাব নুরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। এই রাজবংশীয় লোকেরা তাঁবুর ভিতরে ফুলশয্যায় শয়ন করতেন। নবাবের দুই পুত্র কামালউদ্দীন ও জামালউদ্দীন; দুই কন্যা লালবিবি ও চাঁদবিবি। আমি দেখেছি ঐ কবরের চিহ্নমাত্র মস্‌জিদের সামনে নেই, সমান জমিন ক'রে স্থানটি পাকা করে দেওয়া হয়েছে। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের পুত্র নেজামউদ্দীন মুহাম্মদ মারা যান ১৩০৫ সালের প্রথম দিকে। ইংরাজ সরকার দয়াপরবশ হয়ে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শাহজাদাদের সম্পত্তি রক্ষা করার নাম নিয়ে বাবু রাধাকান্ত লাহিড়ী নামক এক ব্যক্তিকে রিসিভার করে ফুলচৌকীতে পাঠান। তিনি মস্‌জিদ সংস্কারের নামে পূর্বের কবরগুলিকে সমান করে স্থানটি পাকা করে নিশ্চিহ্ন করে দেন। লাহিড়ী বাবু এক অত্যাচারী নৃশংস মালিকে পরিণত হলেন, সুরম্য অট্টালিকার অনেক জায়গা ভেঙে ইট, বীম ইত্যাদি বিক্রয় করতে লাগলেন। ফুলচৌকীতে শালগাছ, কাঁটাযুক্ত বেড়ুবাঁশ, বেত ইত্যাদি পুতে জঙ্গলের বাগান গড়ে তুললেন।

রিসিভার নাবালকদের বিপুল সম্পত্তি পত্তন দিতে থাকলেন। উক্ত রিসিভার আমিরন নেসাকে প্রাসাদ হতে বের করে দেন। তিনি প্রাসাদের পশ্চিম পার্শ্বে খড়ের ঘর করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন। নিজামউদ্দীন মুহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রহিমউদ্দীন মুহাম্মদ অনেক লোকের সহায়তা ও চেষ্টায় মামলা করে রিসিভারকে তাড়ান। তাঁর সম্পত্তি আবার অন্য লোকেরা নানাভাবে বেঈমানী করে নেওয়ায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করে শেষে তিনি পাগল হয়ে মারা যান। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানা রকম দুশ্চিন্তা ও অশান্তিতে ভুগে থাইসিস রোগে মারা যান। এঁদের বংশধর অদ্যাপি ফুলচৌকীতে আছেন।

নকীবের নাম-হাঁকা শাহজাদা কামাল পর্যন্ত ছিল। নহবত বাদ্য শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ পর্যন্ত ছিল বলে শুনেছি। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন ও তাঁর স্ত্রী আজীবন গৃহবন্দী ছিলেন।

যিনি শাহজাদা বাকের, তিনিই শাহজাদা বাবর, তিনি মজনু শাহ নুরুল মুহাম্মদ, নুরউদ্দীন। ইংরাজরা নানাভাবে এই নামটি ডুবাবার

চেষ্টা করেছিল। আমার নিকটতম প্রতিবাসী ও আত্মীয় খান বাহাদুর আসফ খাঁ বি. এল. এর পিতা ছলুক খাঁ উকিল সাহেব শাহজাদা নাসির-উদ্দীন মুহাম্মদের দেওয়ান ছিলেন। ১৮৫৭ সালে পূর্বের দেওয়ান আহসান উল্ল্যা দেওয়ানজি সিপাহী যুদ্ধের কিছু পূর্ব হতে দিল্লীর লালকেল্লায় ছিলেন যুদ্ধের গোপন প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। দিল্লীতে তিনি হাকিম চিকিৎসক রূপে ছিলেন, ছদ্মভাবে ছলুক খাঁ উকিল দেওয়ানজির নিকট এ সব কথা বাল্যকাল থেকে যুবক হওয়া পর্যন্ত আমি অনেক কিছুই শুনেছি।

লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় শাহজাদা কামাল মুহাম্মদের এক রফা হয়। সম্ভবতঃ ইংরাজ শাসকদের চাপে পড়ে ঐ সময় হতে চৌধুরী হয়ে যায়। ঐ সময় থেকে বিভিন্ন নগর বন্দরে এবং রংপুর দিনাজপুরের অনেক স্থানে হরেক রকম ব্যবসা ও প্রায় ৫২ লক্ষাধিক টাকা বার্ষিক আয়ের জমিদারী ক্রয় করেন। ঐ সময় কলকাতায় সুতানুটিতে এঁদের ব্যবসার কুঠিবাড়ী ছিল। সুদূর বাগদাদ ও দিল্লী হতে মিস্ত্রী আনিয়ে এক স্বর্গতুল্য প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণা ফোয়ারা ও সরোবর ইত্যাদির কাজ করান। বর্তমান রংপুর শহরটি জুড়ে, এঁদের রঙমহল ও বাগ-বাগিচা ছিল। শাহজাদা কামালের জ্যেষ্ঠা ভগ্নি মহামান্যা বেগম লালবিবির স্বামী ২য় আকবর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রেঙ্গুনে নির্বাসিত বাদশাহ বাহাদুর শাহ। মহামান্যা বেগম লালবিবিকে ইংরাজরা মীরগঞ্জ নামক স্থানে হত্যা করার পর ইংরাজদের বিরুদ্ধে ফুলচৌকীর এই মোগল পরিবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং ভিতরে ভিতরে বিভিন্ন ইংরাজ-বিরোধীদের সাথে যোগাযোগ করে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ ঘটান।

বৃদ্ধা মহামান্যা লালবিবিকে হত্যার পর তার বংশীয়রা দিল্লী ও ফুলচৌকীর সকলে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইংরাজদের বিপক্ষে। তেমনি ইংরাজরা রাজমহিষীকে হত্যা করার ইনামস্বরূপ গুপ্তচর পায়রাবন্দের টাটি শেখ, ভাংনির খয়রুদ্দিন ও জনৈক লাহিড়ীকে বহু লক্ষ টাকার জমিদারী দিয়ে দেন। সিপাহী যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পূর্বে রংপুরের রঙমহল কামাল কাশানায় শাহজাদা কামালউদ্দীনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এর পর পরেই সিপাহী বিদ্রোহ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কুণ্ডি জমিদার বংশের ইতিহাসে দেখা যায়, সিপাহী যুদ্ধের সময় রংপুরের ফিরিঙ্গী কালেকটর বাহাদুর কুণ্ডির জমিদারদের বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে

ছিল। যুদ্ধের সময় তিন বছর পর্যন্ত ফুলচৌকী নগরের প্রাসাদ ইংরাজরা দখল করেছিল। নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ দিল্লীতে কামান পরিচালনাকারী গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ছিলেন। শাহজাদা গউসউদ্দীন মুহাম্মদ ও শাহজাদা ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ আলিগড় ও মধ্য প্রদেশের নওয়াব ও যুদ্ধের প্রধান ছিলেন। বেগম আমিরন নেসাও নানাভাবে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সৈনিকদের উৎসাহিত করতেন। যুদ্ধে ইংরাজরা জয় লাভের পর অন্যান্য সবাইকে হত্যা করেন। মওলানা কেরামত আলী ইংরাজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন ও ইংরাজদের পক্ষে প্রচার অভিযান চালান। এইভাবে ইংরেজদের প্রিয়পাত্র হয়ে কেরামত আলী সাহেব নিজ অন্তরঙ্গ সুহৃদ শাহজাদা নাসিরউদ্দীনের জীবন ভিক্ষা নেন। জীবন ভিক্ষা নেওয়ার এক বছর পর নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও তাঁর স্ত্রী আমিরন নেসা ফুলচৌকী প্রাসাদে আসেন।

১৮৬০ সালে শীতের সময় ফুলচৌকী প্রাসাদ ইংরাজেরা, তাদের চাকর-বাকর ডিমলার জমিদার, পায়রাবন্দের জমিদার, আরও অনেক জমিদার দিয়ে লুট করায়। এর কিছু দিন পরই বঙ্কসাহা নামক দস্যু সর্দার আবার প্রাসাদ লুট করে। পরে এই দস্যু সর্দার জমিদারও বিপুল ধনের অধিকারী হয়। এই ঘটনায় কিন্তু নাসিরউদ্দীন ইংরাজদের কোর্টে কোন নালিশ করেন নি। মওলানা কেরামত আলী সাহেব ১৮৫৭ সালে নিজে যুদ্ধ করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও নিরাশ্রয় এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলার জীবন রক্ষা করেন বলে মহিলার সুপারিশে ও নিজে ভুল স্বীকার করায় ইংরাজদের রোষাগ্নি হতে বেঁচে যান। তিনি বলতেন, 'ভারতবর্ষ দারুল ইসলামও নয়, দারুল হরবও নয়। ভারতবর্ষ হল দারুল আমান।' এখানে ধর্ম-কর্ম করতে ইংরাজরা বাধা দেয় না। সেইজন্য ইংরাজদের বিরোধিতা করার কোন অর্থ হয় না।'

১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পরে ইংরেজদের সীমাহীন অত্যাচারের পর যারা কোন রকম প্রাণে বেঁচেছিল তাদের মধ্যে দু'জনের সাথে আমার পরিচয় ছিল। এদের এক জনের নাম গোপাল সিংহ। যুদ্ধের পরে তিনি নিজের নাম পালটিয়ে রাঁখেন সুকারু বর্মন। আর একজনের আসল নাম আদিল মৌলভী। পরে তিনি নিজের নাম রাখেন কেরু শেখ। এঁরা বিদ্বান ও অমায়িক চরিত্রের লোক ছিলেন। এঁরা ১৮৫৭ সালের যুদ্ধফেরত হতভাগ্য

গোলন্দাজ সৈন্য। অনেক দিন ধরে বহু বলা-কওয়ায় কিছু কথা শুনেছিলাম। বর্তমান রংপুর শহরের সেন পাড়ার নাম আগে ছিল পানাতি পাড়া। দূর থেকে সেখানে এসে এ'রা দুজন বসতি স্থাপন করেছিলেন। দুই বন্ধু বিভিন্ন হাটে পান কেনা-বেচা করতেন। ভয় ও সংকোচ নিয়ে নিজ মুখে তারা যা বলেছেন তা হ'ল এই ঃ

"শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ছিলেন দিল্লীতে আগত সকল দলের শ্রদ্ধান্বিত সর্ব প্রধান নেতা ও সংগঠক। শাহজাদার বর্ণ ছিল উজ্জ্বল লাল সাদা আভাযুক্ত, মধ্যম উ'চু দেড়হারা বলিষ্ঠ চেহারা। খাকী রং-এর মিলিটারী পোশাক পরে পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে কোমরে পিস্তল নিয়ে ও তলোয়ার নিয়ে এবং মাথায় হ্যাট দিয়ে যখন রাস্তায় সৈন্যদের সামনে দিয়ে যেতেন, তখন তাঁকে ফিরিঙ্গী বলে ভ্রম হত।"

৫. সাক্ষাৎকার বিবরণী ঃ শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায় সরকার[১]

[১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮০-তে তিনি এই অংশটির বিবরণ দেন।]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসানের পর ভারতবর্ষে—ইংরাজ সাম্রাজ্য পত্তনের সময় উত্তর বঙ্গ তথা বাংলাদেশের জনগণ ইংরাজ-এর বিরুদ্ধে যে জীবন-মরণ সংগ্রাম করেছিলেন লোকমুখে শোনা তার কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে বলবার চেষ্টা করব। মোগল প্রিন্স বিপ্লবী নেতা নবাব নূরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ বাহাদুরের নেতৃত্বে বহু জমিদার, তালুকদার, জোতদার, প্রজাসাধারণ ধর্মীয় নেতা অর্থাৎ ফকির সম্প্রদায় ও হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু নেতৃবৃন্দ ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ এবং জীবন-মরণ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাতে দেখা যায়, জমিদার রাজা ভবানী পাঠক, ইটাকুমারীর জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী, রঙ্গলাল, সন্ন্যাসী শুকদেব গিরি, সন্ন্যাসী নেতা হনুমান গিরি, সুবাদার নূরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর কীর্তিকলাপ তাঁদের বংশের—পরবর্তী কালের আত্মীয়-স্বজনেরা বহুবার বর্ণনা করেছেন—যেমন লালবাড়ীর শহর উল্যা চৌধুরী, সাফায়েত উল্যা চৌধুরী, জহুরুল হক চৌধুরী, আবদুস সামাদ চৌধুরী, প্রখ্যাত ধর্মগুরু হিন্দু-মুসলমানের

---

[১] শ্রী যোগেন্দ্রনাথ রায় সরকারের পিতার নাম হরলোচন সরকার। ইনি রংপুর জেলার বুজরুক হাজীপুর গ্রামের অধিবাসী। এই সাক্ষাৎকার বিবরণী নেওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল ৮০ বছর।

মান্য পীর মাওলানা শাহ্ আফতাবুজ্জামান সাহেব (ইনি আরবী পার্সী ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত ভাষায় এক অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন)। উপরিউক্ত ব্যক্তিরা যেমন মোগল বংশীয়দের আত্মীয়, তেমন অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে খাগড়া বন্দের ডাঃ শাহ্ আছিমউদ্দীন সাহেব ও স্থানীয় বৃদ্ধ লোকদের মুখে প্রাচীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। এতে উপলব্ধি করতে পারা যায়, ইংরাজ রাজশক্তির পক্ষাবলম্বনকারী দেশীয় জমিদারের সৃষ্টি ও কবি-সাহিত্যিকগণের লেখা উপন্যাস, ইতিহাস এবং কাহিনী ও গল্পের বইতে লেখা আমাদের মহান বিপ্লবী নেতাদের ডাকাত দস্যু, ফকির, ভিক্ষুক সন্ন্যাসী প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে ইংরাজ প্রভুদের মনস্তুষ্টি সাধন এবং আমাদের বিপ্লবী নেতাদের অযোগ্যতা প্রমাণে আত্মতুষ্টি লাভ করেন। উত্তরবঙ্গের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা খুবই উজ্জ্বল, এখানে বহুজন হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করে আসছিলেন। ইংরাজদের পদলেহী তথাকথিত বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকরা তাদের অন্ত্যজ হিন্দু অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বলে ঘৃণা করত। কিন্তু কাজের লোকেরা তাদের ভাই বা সমশ্রেণী বলে আদর করত।

উল্লিখিত বিপ্লবী নেতাদের পুরোভাগে ছিলেন শাহজাদা সুবাদার বাকের জঙ্গ বাহাদুর। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন। তাঁর অধস্তন বংশধররা আজও বিদ্যমান আছেন এবং জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির জন্য তাঁরা সাধারণ দুঃস্থ কৃষকের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। যা হোক, উল্লিখিত বিপ্লবী নেতাদের বিপ্লবী বাহিনীতে সক্রিয়ভাবে রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিন্দুরা দলে দলে যোগদান করে আত্মাহুতি দিয়েছিল। তার প্রমাণ রাজবংশী কবি রতিরাম দাশের বর্ণনায় আছে ঃ

রাজবংশী, মুসলমান আসিল ইংরাজ মারিবার
বাবুগুলা আসিল তার মজা দেখিবার।

ইংরাজদের মনতুষ্টি করিয়া উপন্যাস লেখা, গল্প ও কবিতা লেখা ইতিহাসে সুকৌশলে বিপ্লবীদের কথা কাহিনী এড়িয়ে যাওয়ায় তৎকালীন সমাজের বর্ণনাকারী লেখকেরা কি সত্য ঘটনার অপলাপ করেন নি? ইংরাজের চৌথ আদায়কারী অত্যাচারী দেবী সিংহ, হররাম সেন এদের অত্যাচারের কাহিনী কি লোকসমাজে দেশে প্রচার করা হয়েছিল,

লেখার মাধ্যমে কি মৌখিক ভাবে ? হয় নি। কারণ ইংরাজ তোষণ তাতে চলবে না। জমিদারণী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর শ্লেষাত্মক তেজোদ্দীপ্ত বাণী কবি রতিরামের ভাষায় ফুটে উঠেছে ঃ

মাইয়া হইয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে
খণ্ড় খণ্ড করি কাটিবারে পারোঙ তলোয়ারে।

ইংরাজ ফিরিঙ্গীদের মারবার জন্য গ্রাম্য মহিলারা তাদের স্বামী ছেলে-দের লড়াই করবার জন্য উৎসাহ দিয়ে শ্লেষাত্মক বিদ্রূপাত্মক কথা এই ভাবে ছড়ার আকারে বলছে ঃ

মরদ হইয়া চুপি থাকা নুর নুর
বাঁচি পাঠানি পিণ্ডা বেটা ছাওয়া, টেপো বউ তোমাক কইছে,
ভুল করিয়া বিধাতা তোমাকে বেটা ছাওয়া সাজাইছে
হামরাতো বেটী ছাওয়া হামার হিয়াও ভাল,
আসুক লুচ্চা গোলামের বেটা গাইনদি নিকামো ছাল।

গ্রাম্য মেয়েছেলেরা পুরুষদের এইভাবে উত্তেজিত করতেন ইংরজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। ইংরাজ দস্যুরা নারীর গুপ্ত অংগে তামাকুর আগুনে তাপ দেওয়া লালগুল বসিয়ে হাসাহাসি করত। কাবারির ফারাটি দিয়ে মেয়েছেলেদের স্তন তুলে নিয়ে নানারূপ বিদ্রূপাত্মক কথা বলে ইংরাজ ও তাহার শাগরিদরা হাসি তামাশা করত।

এই সব লোকহর্ষক সত্য কাহিনী আমাদের লেখকরা বক্তারা এড়িয়ে যেতেন বা ঢেকে রাখতেন। সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের আয়ার-ল্যাণ্ডের মহামতি ব্রিটিশ পারলিয়ামেণ্টের মেম্বর এড্মন্ড বার্ক এ সব কথা তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। ভারত উপমহাদেশের গৌরব যাদবেশ্বর তর্করত্ন একমাত্র ব্যক্তি, যিনি এড্মন্ড বার্কের কথা দিয়ে এ সব কথা রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রথম, তিনি হয়তঃ শেষ। আমার পিতা হরলোচন সরকার এবং বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম শিব প্রসাদ সরকার—বর্তমান বাসস্থান রংপুর সদর মহুকুমার বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত বুজরুক হাজীপুর। তিনিও এই বিপ্লবী দলের সৈনিক ছিলেন এবং সরকার উপাধিতে ঐ বিপ্লবী নেতাদের দ্বারা ভূষিত হইয়া ৫ হাজার বিপ্লবী সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন ১১৭৬ এর মন্বন্তরের সময়।

আমার পিতা হরলোচন সরকারের নিকট শুনেছি আমাদের দুয়ানী

হাজীপুর সাকিনের মধ্যে হরিপুকুর নামে এক প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে, ঐ পুকুর এখন বুজে গেছে—আমার পিতা বলেছেন—ঐ পুকুরে দশ হাজার বিপ্লবী সৈনিকের হাল হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল।

১৭৬০ সালের দিকে ফুলচৌকীকে কেন্দ্র করে ইংরাজ বিরোধীদের যে রাজধানী গড়ে উঠছিল সেখানে নয়ন মন জুড়ান সৌধ এবং নানারূপ বাগ-বাগিচা, সরোবর, ঝরনা ও ফোয়ারা ছিল এবং মোগল রাজবংশীয়রা ফুলচৌকীতে ছিলেন। ঐ সবগুলিকে লুপ্ত অবলুপ্ত করবার মানসে সুচতুর ইংরাজরা সেখানে শালবন, বেড়ু বাঁশবন ও বেতবন প্রভৃতি লাগিয়েছিল আসল সত্য ঢেকে রাখবার জন্য। বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকই দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল। শিক্ষিত জনরা যাঁরা এ সব কাহিনী জানতেন তাঁরা ডাইনে, বাঁয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দু'চারটি কথা ফাস ফুস করিয়া বলিত। অশিক্ষিত লোকেরা বংশ পরম্পরায় যা দেখেছে এবং শুনে এসেছে তা বে-পরওয়াভাবে বলত। উচ্চ শিক্ষিত বড় চাকুরে ব্যক্তিরা এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত নায়করা ইংরাজ আর তাদের কার্যকলাপকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করে সেই মত চলত।

১৮৫৭ সালে ইংরাজ শাসন বিরোধী যুদ্ধ পরিচালিত হয়। ফুলচৌকীর এই মোগল রাজবংশীয় ব্যক্তিরাই সে বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও নায়ক ছিলেন। এই সমস্ত কথা আমি আমাদের সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিশেষ ক'রে জমিদার বাবু কামিনীমোহন রায়, নিলফামারী মহকুমার শিমুল বাড়ী সাকিনের স্বর্গতঃ জমিদার হরিকিশোর বর্মা, ঘোড়ামারা সাকিনের জমিদার বিজয়প্রসাদ বর্মা, কাটালির জমিদার চন্দ্রকিশোর বর্মা, ডিমলা সাকিনের জমিদার কামিনী মোহন সিংহ-এর মুখে শুনেছি। জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর পরগনার রাজবাড়ীর উত্তরাধিকারী প্রসন্ন দেব রায়কত তাঁর সেরেস্তার প্রাচীন কাগজ-পত্রের উল্লেখ দেখিয়ে আমাদের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করেন। আরও বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে এ সব কথা ছোটবেলা থেকে আমি শুনে আসছি। এখন আমার বয়স ৮০ বছর। লোকমুখে শুনেছি রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাথায় দিয়ে ঘুমাতেন। সত্যই গ্রন্থখানি আমাদের জাতীয়তাবাদের একখানি নিশান ব'লে আমি মনে করি। তিনি তার উক্ত গ্রন্থে জনৈক ইউরোপীয় কামান চালক ইংরাজদের লেখা মিথ্যা কথা অনুবাদ করেছেন।

উক্ত কামান-চালক ফুলচৌকীর শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ এবং আজিজননেসাকে 'বারবণিতা' আজিজন ব'লে উল্লেখ করেছেন। উক্ত আজিজনের নাম আমিরন নেসা। ইনি শাহজাদা নাসিরউদ্দীনের একমাত্র সহধর্মিণী ছিলেন। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন দেখতে অনেকটা ইউরোপীয়ানদের মত ছিলেন। ইংরাজরা জেনে শুনে সত্যকে গোপন করবার জন্য এত সব মিথ্যা কথা ইংরাজদের গ্রন্থাদিতে স্থান দিয়াছে।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান জজ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সাহেব দুবার কলকাতা হ'তে নৌকাযোগে ফুলচৌকীতে এসেছিলেন। হান্টার সাহেবের আসার উদ্দেশ্য শাহজাদা নাসিরউদ্দীন জানতেন না। শাহজাদা মৃত্যুবরণ করতে রাযী ছিলেন—তথাপি ইংরেজদের হাতের দাবার গুটি হতে রাযী হন নি। এমনকি সাক্ষাৎ দানও করেন নি। এটা হান্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই জন্য 'রাজাস্ অব নগর' উল্লেখ করা হয়েছে এবং এঁরা যে মোগল রাজবংশের এ কথাও উল্লেখ করেছেন। ষোল বছর বয়স হতে এ যাবত যাহা শুনিয়াছি তাহার জবানবন্দী লিখিয়া দিলাম।

৫. সাক্ষাৎকার বিবরণী : আবদুল করিম মিঞা

[রংপুর জেলাধীন পীরগাছা থানার অন্তর্গত 'হাড়ভাঙ্গা' মৌজা নিবাসী খন্দকার আবদুল করিম, পিতা মরহুম খন্দকার আবদুল আজিজ জন্ম ১২৯৯ বাংলা সন।]

সম্রাজ্ঞী লালবিবির পিতার নাম নবাব নূরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। ইনি মোগল রাজবংশের লোক ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ তাত ভ্রাতা এবং ভগ্নিপতি ছিলেন। শাহজাদী লালবিবির স্বামীর নাম বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর। পুত্রের নাম দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

সম্রাজ্ঞী লালবিবির কিভাবে মীরগঞ্জে মৃত্যু হল, প্রশ্ন করায় তিনি বলেন—সম্রাজ্ঞী দিল্লী হতে ফুলচৌকী নগরে আসেন। ভ্রাতা কামালউদ্দীনের প্রাসাদ হতে মীরগঞ্জে ফকির ও সন্ন্যাসী দলপতিদের সহিত দেখা করতে গোপনে আসা-পথে হঠাৎ আক্রমণ করে ইংরাজরা তাঁকে গুলী করে মারেন। ইংরাজদের পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডে যারা গুপ্তচরের কাজ করে তারা হল, পায়রাবন্দের টাটি শেখ, ভাংনির খয়েরুদ্দীন এবং গুরু বাবু

লাহিড়ী জমিদারদের পূর্বপুরুষ। সম্রাজ্ঞীকে হত্যা করায় সাহায্য করাতে তারা রাতারাতি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে টাটি শেখ ও খয়রুদ্দীন ইংরাজদের নিকট হতে বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি জমিদারী ও লাখেরাজ পায়। লাহিড়ীরা পায় সন্ন্যাসীদের বাজেয়াপ্ত দেবোত্তর। বর্তমান ফুলচৌকীতে উক্ত সময়কার বাংলার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের অনেক চিহ্ন এখনও রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এখন কি এসব কথা লোকে বিশ্বাস করতে চাইবে ?

উত্তর ঃ কেন বিশ্বাস করবে না ? এদের কথা ও কীর্তি কাহিনীর ধ্বংসাবশেষ বহু লোকে জানেন এবং রংপুর-দিনাজপুরের বহু স্থানে তা' ছড়িয়ে রয়েছে। তবে অনুসন্ধান-বিমুখ মূর্খ ব্যতীত এসব কথা কারও অবিশ্বাসযোগ্য নহে।

প্রশ্ন ঃ সম্রাজ্ঞী লালবিবিকে কোন্ সময় ইংরাজরা হত্যা করেন, তা কি আপনি কখনও শুনেছেন ?

উত্তর ঃ সম্ভবত ইংরাজী ১৮৩২-৩৩ সনে। অবশ্য এসব কথা আমি কখনও প্রশ্ন করে প্রাচীনদের নিকট হতে জেনে নিই নি। ইতিহাসের কাজে পরবর্তীকালে লাগবে—এ ধারণা কোন দিন করি নি। এসব বিষয় যাতে কোনভাবে প্রচার না হতে পারে, তার জন্য ইংরাজরা কঠোরতার সঙ্গে সব বিধি-ব্যবস্থা ঠিক রেখেছিল। কারণ শিক্ষিত প্রাচীনরা এসব কথা যখন কোন কথা প্রসঙ্গে উঠাতেন বা বলতেন, তখন সে-সব কথা বলতে গিয়ে তাঁদের মুখ পাণ্ডু বর্ণ হয়ে যেত। মুখে-চোখে তাঁদের রক্ত থাকত না। ভয়-কম্পিত কণ্ঠে এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে কথাগুলি তাঁরা বলতেন। কখনও কেউ এসব কথা সংক্ষেপ ছাড়া লম্বা করে বলতেন না; বলতে চাইতেনও না।

প্রশ্ন ঃ নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদের কবর কোথায় হয়েছে, শুনেছেন কি ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, বহুবার শুনেছি। ফুলচৌকী নগরে মসজিদের সামনে।

প্রশ্ন ঃ প্রিন্স সুবাদারের মৃত্যুর পর তাঁর বংশীয়রা কি আর কখনও ইংরাজদের বিরোধিতা করেছেন ?

উত্তর ঃ শুনেছি লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মুহাম্মদ ইংরাজদের সঙ্গে একটা আপোস করেন

এবং সেই সঙ্গে বহু জমিদারী পান। সেই সঙ্গে বহু রকম বিপুল ব্যবসা করতে থাকেন। শুনেছি সুবাদারের কন্যা ইংরাজদের সাথে আপোসে কখনও সম্মত হন নি। তবে সম্রাজ্ঞী লালবিবিকে ইংরাজরা হত্যা করায় কামালউদ্দীন ও তৎবংশীয়রা ইংরাজদের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। এদের চেষ্টা এবং বহু অর্থ সাহায্যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কামালউদ্দীন মুহাম্মদকে ছলনা করে (রংপুর) রঙমহলে নিয়ে এসে ইংরাজরা বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা করে। বিদ্রোহ-সময়ে কামালউদ্দীন মুহাম্মদের চাচাতো ভ্রাতা ও ভগ্নিপতি ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ, পুত্র নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও গউসউদ্দীন মুহাম্মদ, ভাতিজা খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদ—এঁরা বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছিলেন। বাহাদুর শাহের মাতা লালবিবিকে হত্যা করার জন্য ঐ একই কারণে পুত্র বাহাদুর শাহ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন। সমস্ত মোগল রাজবংশের মধ্যে কামালউদ্দীনের মত ধনী এবং প্রতাপশালী ঐ সময়কার সম্রাটদেরও ছিল না।

প্রশ্ন ঃ এঁরা কি জনসাধারণের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিশতেন ?

উত্তর ঃ না, দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় ছিল। তবে ঐ সময় যে-কোন লোক এসে দেখা করত। জহুর ফকিরের গানে যা আছে তাই।

প্রশ্ন ঃ জহুর ফকিরের গানে কি আছে বলুন।

উত্তর ঃ প্রজাপাইটে আসে যদি দেখা করিবারে।
মধুমাখা কথা কয় কুকিলের স্বরে।

এতে তাঁদের বচন ও আচরণ সহজে বুঝতে পারা যায়।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে এই বংশীয়দের হত্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় খন্দকার সাহেব বলেন, সে এক ভয়াবহ কথা। বৃদ্ধারা বিশেষ করে আমার দাদী-নানী আমার ছোট বেলায় শুয়ে শুয়ে গল্প করতেন। এমন ধরনের অত্যাচারের কথা বলতেন, ভয়ে আমি লেপ কাঁথার ভিতরে মাথা দিয়ে মুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়তাম।

ওয়ালিদাদ মুহাম্মদ, গউসউদ্দীন মুহাম্মদকে হাতীর পায়ে বেঁধে নিয়ে আসেন। রংপুর নিয়ে আসার সময় রঙমহলের রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় ফেলে দেয়। কিন্তু ধরবার সময় বহু অত্যাচার করে এবং চামড়া ছিলিয়ে সারা গায়ে লবণ দেয়। এঁদের কবর রংপুর শহরের লিচু বাগান এবং কারমাইকেল কলেজের বালাটাড়ী নামক গ্রামে রয়েছে। যুদ্ধে ইংরেজের

বিজয়ের পর শুরু হয় আগুন জ্বালা আর হত্যা, লুণ্ঠন আর ফাঁস। কোন বিচার ছিল না ইংরাজদের।

শাহযাদা খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদকে দিল্লীতে ইংরাজরা হত্যা করে। নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদকে মেরে ফেলে নি। জৌনপুরের মওলানা কারামত আল সাহেবের চেষ্টায় নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের জীবন রক্ষা হয়।

সিপাহী যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন শাহযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ। শুনেছি ইনি কখনও ইংরাজদের কাছে কোন জিনিস নিজে চেয়ে নেন নি। তাঁর বংশধররা এখনও ফুলচৌকীতে রয়েছেন। তঙ্কার মিঞাদের সাথে এই মোগল বংশের আত্মীয়তা ছিল। তঙ্কার মিঞারা পূর্ব হতে ঘোড়াঘাট সরকারের ফৌজদার ছিলেন। ফৌজদার এবাদত খাঁ, তৎপুত্র ফৌজদার কোববাদ খাঁ, তৎপুত্র ফৌজদার আলদাদ খাঁ। এই আলদাদ খাঁ শাহযাদা সুবাদার নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের মাতুল ছিলেন। এঁরা সৈয়দ বংশের লোক এবং খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ঐ সময় শাহযাদা সুবাদার নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের ফুলচৌকীস্থ 'মোগল কোট' (সেনানিবাস) 'মোগল গড়' (মসিমপুর) হতে বর্তমান রংপুরের রঙমহল এবং পূর্বে 'ধুমের কুটি' ও 'সরাইখানা' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে এঁদের স্থায়ী-অস্থায়ী সব কিছু ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত এবং বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে এঁদের নির্মিত বৃহৎ বৃহৎ দালান, কুঠি ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে। আমার বাড়ীর কাছে রেল স্টেশন অন্নদানগরের পার্শ্বে প্রতাপ-জয়সেন মৌজায়, কালা মৌজায়, যাদু-লশকর মৌজায় এঁদের কীর্তি এখনও অক্ষয় রয়েছে। এসব কথা আমি যাঁদের নিকট শুনেছি, তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করলাম ঃ

কাজী জয়দল হায়াত, বয়স ১২৪ বছর, ইয়ার মিঞা ১২০ বছর, সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ ৭৩ বছর, ডাক্তার মুহাম্মদ মজাম্মেল হক মিঞা (৭৪), খান বাহাদুর আসাদ খাঁ বি. এল.-(৬৫), তাঁর পিতা সলুক খাঁ উকিল সাহেব। ইনি ১৮৫৭-এর পর শাহাযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের দেওয়ান ছিলেন। কামাল কাশানার মৌজার মোহর খাঁ মিঞা (১১০), উজীর আলী খাঁ মোক্তার (৬০ বছর) প্রভৃতি লোকের নিকট আমি ছোটবেলা হতে শুনে আসছি।

৬. সাক্ষাৎকার বিবরণী— শরীফউদ্দীন মুন্সী

[ইংরাজী ৭।৬।১৯৫৭ তারিখে রংপুর জেলাস্থ মিঠাপুকুর থানাধীন শালিকাদহ গ্রামের বিখ্যাত মোগলি গড়ের নিকটস্থ উক্ত গ্রামে যাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল এখানে এক জ্ঞানী লোকের সহিত দেখা করা এবং তাঁর নিকট হ'তে পুরানো খবর সংগ্রহ করা। আমি যথাসময়ে উক্ত গ্রামের শরীফউদ্দীন মুন্শী সাহেবের সাথে দেখা করি। বয়স ৮০ বছর। এঁর পিতার নাম উমরউদ্দীন মুন্শী। এতদঞ্চলের সম্মানী এবং জ্ঞানী লোক যে এতে কোন সংশয় নেই।

প্রশ্ন ঃ আপনি মসিমপুরস্থ 'মোগলিগড়' সম্পর্কে কোন কিছু জানেন কি ?

উত্তর ঃ মোগলিগড়ের পূর্বদিকে তিস্তানদীর পশ্চিম পাড়ে সম্রাট আকবর এবং তৎপিতা হুমায়ুনের মৃত্তিকা নির্মিত একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এরই পশ্চিম দিক দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি গড় রয়েছে। এই গড়ের নাম মোগলিগড়। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি শাহযাদা সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ। সেনাপতি কাদের উল্যাহ্ ফকির (ইংরাজদের মুসা শাহ) সেনাপতি ভবানী পাঠক, মন্ত্রী রাজা দয়াশীল, জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায়, জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী, তংকর মিঞা, ফৌজদার আলদাদ খাঁ, সন্ন্যাসী নেতা মহারাজ হনুমানগিরি প্রমুখ নেতা মীরজাফর ও ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য মোগলিগড়, মোগল কোট সেনানিবাস (হিন্দী মুলক), বামনগড়—এই সব স্থানে যুদ্ধের দুর্গ নতুনভাবে নির্মাণ করান। এসব স্থানীয় নেতা এবং লোকজনদের স্বেচ্ছাকৃত সহায়তায় নির্মিত হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনি এসব কথা কি করে জানেন ?

উত্তর ঃ সন্ন্যাসীদের লেখা একখানি বাংলা ইতিহাসে আমি পড়েছি। তা ছাড়া আরও অনেক প্রাচীন লোকদের নিকট শুনেছি। যাঁরা নিজের চোখে এসব দেখেছেন, তাঁদেরও কয়েক জনের নিকট আমি শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ যাঁদের নিকট শুনেছেন, তাঁদের নাম পরে শুনব। তবে সন্ন্যাসীদের লেখা যে ইতিহাস পড়েছেন, সে ইতিহাসের নাম আপনার স্মরণ আছে কি ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ আছে। 'অজ্ঞাতর ইতিহাস'।

প্রশ্ন ঃ উক্ত ইতিহাসখানি এখন আপনার নিকট আছে কি ?

উত্তর ঃ না, নেই। পুড়িয়ে ফেলেছি।

প্রশ্ন ঃ কেন পুড়িয়ে ফেলেছেন ?

উত্তর ঃ লোকে দুশমনি করেছিল। পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করে। একদা পুলিশরা রাতে এসেছিল। তখন আমি টের পেয়েছিলাম। পুলিশের বাইরে থাকা অবস্থায় আমার মা এবং স্ত্রী উক্ত 'অজ্ঞাতর ইতিহাস' চুলোয় দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

প্রশ্ন ঃ এরপর কি আপনার বাড়ী পুলিশের লোকেরা আর খানাতল্লাসি করে ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। একেবারে ভোরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে খানাতল্লাসী করে, যদিও তারা এই ইতিহাস পায় নি, তবু আমাকে হাত বেঁধে রংপুর হাজতে নিয়ে যায়। সেখানে আমি ১২ দিন হাজতে বাস করি এবং ছ'মাস পর আবার আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং হাজতে সাতদিন রাখে।

প্রশ্ন ঃ কত সালে আপনাকে পুলিশের লোকেরা ধরে নিয়ে গিয়ে সদরের জেলখানার হাজতে রাখে ?

উত্তর ঃ বাংলা ১৩০১ সালের পৌষ মাসে সম্ভবত ১২ই পৌষ হবে।

প্রশ্ন ঃ উক্ত ইতিহাসের মধ্যে কি কি লেখা ছিল ?

উত্তর ঃ মসিমপুরের মোগলিগড়ে মীরজাফর, রাম নারায়ণ এদের সঙ্গে বাদশাহ শাহ্ আলমের লড়াই হয়। তাতে বাদশাহ সেই লড়াইয়ে জয় লাভ করেন। আরও বহু জায়গার লড়াই-এর কথা লেখা ছিল। সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গের কথা এবং তাঁর বংশীয়দের কথা, কাদের উল্যাহ্ ফকির, মহারাজ হনুমানগিরি, মন্ত্রী রাজা শিবচন্দ্র রায়, মন্ত্রী রাজা দয়াশীলের কথা ছিল। জয়দুর্গাদেবী চৌধুরাণীর সাথে মীর কাসিমের লড়াই এবং মীর কাসিমের যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে যাওয়ার কথা লেখা ছিল এবং আরও অনেক লোকের নাম ও যুদ্ধের বিবরণ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার কথা এবং ইংরাজের বিরুদ্ধে আবার সকলে একজোট হওয়ার কথাও লেখা ছিল।

প্রশ্ন ঃ কোথাকার সন্ন্যাসী উক্ত ইতিহাস লিখেছেন তার নাম জানেন কি ?

উত্তর ঃ সন্ন্যাসীর নাম ইতিহাসের উপরে লেখা ছিল না, 'বানভট্ট'

লেখা ছিল। তবে আমার বাবার কাছে শুনেছি, ইতিহাসের উপরে যে নাম ছিল, সেটা ছদ্মনাম। আসলে সাহেবগঞ্জের ইংরাজ-বিরোধী সন্ন্যাসীরা 'অজ্ঞাতর ইতিহাস' লিখেন।

প্রশ্ন ঃ আপনার গ্রাম এই 'শালকাদহ' হতে সাহেবগঞ্জের দূরত্ব কতদূর হবে ?

উত্তর ঃ তিন ক্রোশ হবে।

প্রশ্ন ঃ সাহেবগঞ্জ হতে ফুলচৌকী নগরের দূরত্ব কত ?

উত্তর ঃ নগরের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে হল 'কাঠগড়া'। কাঠগড়া হতে পাঁচশত গজ পশ্চিমে হল পূর্বের বুড়া তিস্তা নদী। নদীর পশ্চিম প্রান্তে সাহেবগঞ্জ অবস্থিত। এখানেই সন্ন্যাসীদের প্রধান নেতা হনুমানগিরির বাসস্থান ছিল। সিপাহী বিপ্লবের পরে এদের সমস্ত সম্পত্তি 'লাখেরাজ' 'দেবোত্তর' বাজেয়াপ্ত করে এবং অনেক-কে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

প্রশ্ন ঃ নগরে কি সন্ন্যাসীদের কোন মঠ ছিল ? শুনেছেন অথবা জানেন কি ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, শুনেছি। নিজ চোখেও দেখেছি অনেকবার।

প্রশ্ন ঃ কোথায় ছিল নির্দিষ্ট করে বলুন না শুনি ?

উত্তর ঃ এখন যে 'গোসাইপুল' নামে ইষ্টক-নির্মিত বৃহৎ পুল রয়েছে কাঠগড়ার উপরে লোকজনের পারাপার হবার জন্য, সেই পুলের উত্তর-পূর্ব কোণে পঞ্চাশ গজ দূরে সন্ন্যাসীদের 'মঠ' রয়েছে এবং 'ভেলোয়া সরোবরের' পশ্চিম পাড়ে সন্ন্যাসীর কুঠি, বৈরাগীর কুঠি নামে বিরাট কুঠির যে ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে, ঐ সব কুঠিতে সন্ন্যাসীরা থাকতেন। উক্ত কুঠির সংলগ্ন স্থানে আর একটি কুঠি রয়েছে। তার নাম 'বামনের কুঠি'। আরও উত্তরে 'বড়কুঠি' ও 'ছোটকুঠি' নামে আর দু'টি কুঠি রয়েছে। সর্বদক্ষিণে মসিমপুরের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষে যে কুঠি রয়েছে, তার নাম 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণীর কুঠি'। এ সব কুঠি সরোবরের পশ্চিম পাড়ে ছিল। পূর্ব পাড়ে ছিল 'তালিয়ার খাঁর কুঠি' এবং 'মোগল কোট', তার দক্ষিণে 'আন্দার কোটা জেলখানা'।

প্রশ্ন ঃ উক্ত কুঠিগুলিতে কে বা কারা বাস করতেন, তা জানেন কি ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অনেক লোকের নিকট অনেকবার শুনেছি। বড় কুঠি

ও ছোট কুঠি সুবাদার বাকের জঙ্গদের বড় ছেলে শাহযাদা কামাল এবং শাহাযাদা জামালউদ্দীনের নামে নির্মিত হয়। সন্ন্যাসী-কুঠিতে মহারাজ হনুমানগিরি সময় সময় বাস করতেন। বৈরাগীর কুঠিতে অন্যান্য সহকারী সন্ন্যাসীরা বাস করতেন। বামন কুঠিতে বামন রাজা ভবানী পাঠক বাস করতেন। তালিয়ার খাঁর কুঠিতে তৎকার মিঞারা বাস করতেন।

প্রশ্ন ঃ নবাবের দেওয়ান রাজা দয়াশীলের কুঠি ছিল না ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ছিল। রাজা দয়াশীলের কুঠি হল বালাখানার পশ্চিম পাড়ে। সন্ন্যাসী মঠের পূর্ব দিকে এবং বালাখানার পূর্বপাড়ে হল বকশির কুঠি। এখানকার যে বড় বটগাছটি আছে উক্ত বটগাছের চারপাশ ঘিরে কুঠি ছিল।

প্রশ্ন ঃ নবাব কোথায় বাস করতেন, শুনেছেন কি ?

উত্তর ঃ জিব হ্যাঁ। নবাব তখন অবধি তাঁবুতে বাস করতেন।

প্রশ্ন ঃ আমীর-ওমরা সবারই কুঠি আছে, অথচ নবাবের কুঠি ছিল না—এ কেমন কথা ?

উত্তর ঃ নবাবজাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদ নবাবের ইন্তিকালের পর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। সেই প্রাসাদের সামনে যে মসজিদ আছে, সেই মসজিদের তিনহাত মাত্র যখন নবাব দেওয়াল নির্মাণ করান, তখন নবাব মোগল কুঠির সামনে (মোগলহাটের কাছে) আহত হয়ে মারা যান। উক্ত মসজিদ সম্পূর্ণভাবে নির্মাণ করেন নবাব-জাদা কামাল মুহাম্মদ এবং মসজিদের উত্তর পাশ ঘেঁষে অতি খুবসুরতওয়ালা মনোরম এক প্রাসাদও তিনি নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন ঃ নবাবের মোল্লা হাজী মওলানা আজিমউদ্দীন এবং তাঁর ভাতিজা মজনু মোল্লা সাহেবরা এবং অন্যান্য আমীর ওমরাহ কুঠিতে বাস করতেন কি ?

উত্তর ঃ জিব না। ফুলচৌকী মসজিদের নিকট নবাব তাঁবুতে বাস করতেন। উক্ত মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি বৃহৎ গোল দীঘি রয়েছে। দীঘি হতে ৫।৬ শত গজ আরও দক্ষিণে ঐ সময় মোল্লাজীরা সপরিবারে তাঁবুতে বাস করতেন। এঁরা কোন সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অন্যের অনুরোধেও কুঠিতে বাস করেন নি। খড়ের ঘরে পূর্ব হতে বাস করে এসেছেন—বিলাসিতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। মোল্লাজীরা নবাবের এবং

তৎপুত্র কামালউদ্দীনের যত নিকটে বাস করতেন, তত নিকটে অন্য কোন আমীর-ওমরা বাস করার সুযোগ পেতেন না।

প্রশ্ন ঃ এই সব কুঠি বা প্রাসাদগুলি আপনি কি নিজে দেখেছেন ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, দেখেছি। ১৩৩০—৩৫ সালের মধ্যেও উক্ত কুঠিগুলির অধিকাংশ দালান অক্ষত অবস্থায় ছিল। তবে দালানের গায়ে বট পাইকর ও অন্যান্য আগাছার ঝাড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

প্রশ্ন ঃ কোন কুঠি বাড়ীতে লোকজন দেখেছেন কি ?

উত্তর ঃ না। জঙ্গলে সব ঢাকা ছিল 'বেড়ুবাঁশ' কাঁটাযুক্ত সরু লম্বা এক প্রকার বাঁশ। হাজার হাজার বাঁশ ইংরাজ কোম্পানীর তাবেদার ঐ স্থানের নূতন পত্তনী জমিদার মুর্শিদাবাদ-নিবাসী লছমিপৎ সিংহ দুগড়, ছত্রপৎ সিংহ দুগড়, ধনপৎ সিংহ—এঁরা যেখানে যত সুন্দর প্রাসাদ ছিল রাজধানী ও চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি জুড়ে, এর সবখানে হাজার হাজার বেত বাঁশ ও শাল গাছের বীজ রোপণ করে, যার ফলে কুঠিবাড়ীগুলির চতুর্দিকে ভীষণ এক জঙ্গল হয়। সেটা এতবড় ঘোর জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলে দিনের বেলায়ও অন্ধকার দেখা যেত। সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না। যার ফলে বাঘ, হরিণ, বড় বড় অজগর সাপ, বন্য মহিষ, বন্য গাই প্রভৃতি জনোয়ারের চমকপ্রদ বাসোপযোগী স্থান হয়ে পড়ে। শুধু মাত্র শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদের প্রাসাদটি পূর্বের মত অক্ষত অবস্থায় ছিল। কিন্তু ওর পশ্চিম দিক ও দক্ষিণ পূর্ব দিক শালবন ও বেড়ু বাঁশের জঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

প্রশ্ন ঃ রাজধানীকে লোকজনদের দৃষ্টির বাইরে রাখবার জন্য ইংরাজ সরকার এই কৌশল করেছিল কি ?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ। নিশ্চয়ই এই হীন কৌশল ইংরাজরা করেছিল। এক দিকে জঙ্গলে রাজধানীকে ঢেকে ফেলা হয়েছিল। অন্যদিকে কঠোর নিষেধ ছিল রাজধানী, নবাব এবং তাঁর বংশধরদের ও নবাবের সহকর্মী আমীর ওমরার কথা—কেউ যেন কোনভাবে আলাপ-আলোচনা না করে। এই কড়া নিষেধাজ্ঞা প্রতি বাড়ী বাড়ী বলে বেড়ান হ'ত।

প্রশ্ন ঃ কোন লিখিত ইশ্‌তাহার জারী করত কি ?

উত্তর ঃ না। মুখে মুখে থানার পুলিশ, চৌকিদার-কে সঙ্গে নিয়ে বেড়াত।

প্রশ্ন ঃ এই নিষেধাজ্ঞা আপনি কখনও কি শুনেছেন ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। প্রায় মাঝে-মধ্যে এসে বড়দের বাড়ীতে বসত। আমাদের বাড়ীতে বসত এবং এ সব কথা আলোচনা করতে নিষেধ করত।

প্রশ্ন ঃ সিপাহী যুদ্ধের সময় যে অত্যাচার হয়, তা কি আপনি নিজে দেখেছেন, না শুনেছেন ?

উত্তর ঃ আমি দেখি নি। তবে শুনেছি।

প্রশ্ন ঃ কি ধরনের অত্যাচার হয়েছিল, তা কখনও শুনেছেন কি ?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ। বহুবার শুনেছি। মাঝে-মধ্যে প্রাচীনরা গল্প করতেন। ঘরবাড়ী পোড়ান, হত্যা করা, ফাঁস দেওয়া—এইভাবে হাজার হাজার লোক শেষ হয়েছে। নারী পুরুষ, জোয়ান, বুড়ো, ছোট ছোট ছেলে—কেউ বাদ যায় নি। বহু লোক আসামের জঙ্গলে পালিয়ে গেছে আর ফিরে আসে নি।

প্রশ্ন ঃ যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এতদঞ্চলের লোকজন ইংরাজদের কি অনুগত হয়ে পড়েছিল ?

উত্তর ঃ জি না। রাজধানী ও আশেপাশের লোকজন ইংরাজকে ভীষণ-ভাবে ভয় করত। যেমন—আমার বাবা, দাদা, নানা আরও বহু লোক ইংরাজদের কথা বললেই রাগে গোস্বায় গর্‌গর্‌ করতেন।

প্রশ্ন ঃ এই যে এতদঞ্চলে দেখি হিন্দু মুসলমানে একতা ও আত্মীয়ের মত চাল-চলন হাঁক-ডাক—এ সব কি এখন হয়েছে ? না, পূর্ব হতে ছিল ?

উত্তর ঃ পূর্ব হতে ছিল। বরং এখন অনেকে ভাঙ্গাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা হয় না।

প্রশ্ন ঃ শাহযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদকে আপনি দেখেছেন কি ?

উত্তর ঃ জি না। তাঁর পুত্র শাহযাদা নিজামউদ্দীন মুহাম্মদকে দেখেছি।

প্রশ্ন ঃ এঁদের কি পূর্বের মত লোকজনরা সম্মান করে এসেছিলেন ?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ। এদের প্রতি বড় ছোট প্রজা সাধারণের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সব সময় ছিল। আমরা এঁদের দেবতার মত মেনে এসেছি।

প্রশ্ন ঃ এঁরা লোকজনের উপর কোন অত্যাচার করেছিলেন, জানেন কি ?

উত্তর ঃ না, দেখিও নি, শুনিও নি। যে কোন প্রার্থীর প্রার্থনা যত

কষ্টেই হোক, তা পূরণ করতে চেষ্টা করতেন। প্রাসাদের দক্ষিণ ও উত্তর দিকে ফলের যত বাগান আছে, রক্ষী শুধু গাছ পাহারা দিত; ফল পাহারা দিবার হুকুম ছিল না। ধানের গোলা হতে কেউ যদি ধান চুরি করে নিয়ে যেত—আর কেউ যদি বলত, "হুযুর অমুকে ধান চুরি করে নিয়ে গেছে!" শুনে চোখ তুলে শুধু একবার চাইতেন। কোন কথা বলতেন না। তখন ভয় করে আর কেউ ধান চুরির কথা উঠাত না। রাজবাড়ীকে সবাই সরকারী বাড়ী বলত।

প্রশ্ন ঃ কেন সরকারী বাড়ী বলত ?

উত্তর ঃ এ'রাই খোদ মালিক সরকার ছিলেন। মালিকের মত, পিতার মত মন ছিল। তাই প্রাসাদটিকেও সকলের বাড়ী—সরকারী বাড়ী বলত।

প্রশ্ন ঃ লোকে বলে শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদের প্রাসাদ খুবই সুন্দর ছিল। আপনার কি ধারণা ?

উত্তর ঃ বাবা! সে কথা কি বলতে আছে ? এমনভাবে সাজান ছিল, মনে হ'ত, যেন একটা বেহেশত, বাবা, বেহেশত। কোথাও এমন সুন্দর রাজবাড়ী দেখি নি আমি।

প্রশ্ন ঃ শাহযাদা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের কবর কোথায় দেয়া হয়েছিল, তা শুনেছেন কি ?

উত্তর ঃ জিু হ্যাঁ। রাজবাড়ীর মসজিদের সামনে কবর আছে। সিপাহী যুদ্ধের সময় অন্য কবরগুলির সঙ্গে এ কবরটিও ভেঙে ফেলা হয়। শাহযাদা নিজামউদ্দীনের সময় কবরের উপর চুন-সুরকি দিয়ে জমিনের মত সমান করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি মারা গেলে ঐ এস্টেটের রিসিভার রাধাকান্ত লাহিড়ী যাতে লোকে বুঝতে না পারে সেইভাবে বেশীদূর দিয়ে সমান করে পাকা করেছে। ঘরের মেঝের মত বা আঙিনার মত সমান করেছে।

প্রশ্ন ঃ কোথায় কবর আছে, তা কেউ কি আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছেন ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। আমার ছোট বেলায় মসিমপুরের মিঞা কাদেরুল্যাহ সরকার, ফকির মামুদ সরকার, হাজী করিমুল্যাহ্, নানাজী কেসমতুল্যাহ্ মণ্ডল, বসির সর্দার—এ'রা একেক সময় আমাকে এবং অনেককে নবাবের কবর কোথায় আছে দেখিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : শুনতে পাওয়া যায় ফুলচৌকীর এই মোগল রাজবংশীয়রা নাকি খুবই ধনী ছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, এঁদের মত ধনী দিল্লীর আর কোন মোগল বংশীয়রা ছিলেন না—একথা সবাই বলতেন। এঁদের প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ার পর এই সব স্থানের নতুন পত্তনি জমিদার হন লছমিপৎ সিংহ দুগড়, ধনপৎ সিংহ দুগড়। এঁরা ফুলচৌকী প্রাসাদের অনেক মূল্যবান জিনিস এঁদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের 'জিয়াগঞ্জে' নিয়ে যান। মূল্য দিয়ে নিয়ে যান কিনা তা জানি না। তবে উক্ত বংশের মহারাজ বাহাদুর সিংহ দুগড়ের কাছে শুনেছি ফুলচৌকীস্থ মোগল রাজবংশীয়দের হাতীর পায়ের চাদরের কথা, হাতীর পায়ের শেষ দিক পর্যন্ত সে সব চাদর ঢাকা পড়ত। তার একেকখানি চাদর পুড়িয়ে সাড়ে চার শ হ'তে সাড়ে পাঁচ শ তোলা স্বর্ণ বের হয়েছে বলে আমি শুনেছি। শুনেছি তার মসিমপুর কাচারীতে কোন এক কথা প্রসঙ্গে। এই সব চাদর উক্ত বংশের জমিদাররা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের নিকট কলকাতায় বিক্রি করেছেন। আর কোন্ কোন্ জিনিস নিয়ে গেছেন তা জিজ্ঞাসা করি নি, শুনিও নি। কারণ আমি জানতাম, অনেকে হঠাৎ লাখপতি কোটিপতি বনে গিয়েছে এঁদের ধন-সম্পত্তি নিয়ে।

প্রশ্ন : আপনি লালবিবি সম্পর্কে কিছু জানেন কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, জানি। ইনি শাহযাদা সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। বাদশাহ বাহাদুর শাহের আপন মাতা ছিলেন আম্মাজী লালবিবি। এনাকে সবাই—'আম্মাজী লালবিবি' বলতেন—প্রাচীনদের নিকট আমি শুনেছি। ফুলচৌকীস্থ ভাই-এর প্রাসাদ হতে মীরগঞ্জে ইংরাজ বিরোধী ফকির সন্ন্যাসী নেতাদের নিকট গোপনে যাওয়ার কালে ইংরাজরা হঠাৎ আক্রমণ করে আম্মাজী লালবিবি ও তাঁর বৃদ্ধ সেনাপতি ভবানী পাঠককে একই সঙ্গে গুলী করে মারে। সেখানেই তাঁর কবর আছে।

প্রশ্ন : এসব কথা বৃদ্ধরা সব সময় বলতেন কি ?

উত্তর : না। হঠাৎ কোন সময়, ছয় মাসে, এক বছর, দু'বছর, তিন বছর, পাঁচ বছর পর হয়ত কোন কথা প্রসঙ্গে বলতেন।

প্রশ্ন : কেউ শুনতে চাইলে বলতেন কি ?

উত্তর : না, রাগ করে উঠতেন।

প্রশ্ন : কেন রাগ করে উঠতেন ?

উত্তর : ভয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস। হয়ত কেউ ইংরাজদের গুপ্তচর হয়ে আসতে পারেন। ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠতেন, "আমি জানি না।" অথচ জানতেন অনেক কিছুই।

প্রশ্ন : তবে কখন কিভাবে প্রশ্ন করলে বলতেন ?

উত্তর : খুব বিশ্বস্ত লোক হলে কোন ক্ষতি হবার আশংকা না থাকলে সংক্ষেপে বলে যেতেন।

প্রশ্ন : এ সব কথা যাদের নিকট হতে শুনেছেন, তাঁদের নামগুলি কি স্মরণ আছে ? যদি থাকে তবে বলুন ?

উত্তর : আমার পিতা ওমরউদ্দীন মুন্‌শী (বয়স ১১৬ বছর), সাদাতুল্যাহ্‌ মুন্‌শী (১০০), সাদুল্যাহ্‌ আকন্দ, আমার দাদাজী জমিরউদ্দীন হাজী (বয়স ১২২ বছর—এখন হতে ৫৮ বছর পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে), রহমতুল্যাহ্‌ মুন্‌শী (৯৭), কদর উল্যাহ্‌ সরকার (১৩০), ফকির মামুন সরকার (১১০ এর মত বয়স হবে, ৪০ বছর পূর্বে মারা যান), বরম উল্যা হাজী (১১০ বছরে মারা যান ৪২ বছর পূর্বে), নানাজী কেসমত মণ্ডল (১১৬ বছরে তাঁর মৃত্যু হয় ৪৬ বছর পূর্বে), বছির সরদার (৮২, মৃত্যু হয় ২০ বছর পূর্বে) করমতুল্যাহ্‌ সরকার (১০০), করিমুল্যাহ সরকার (৯০-এরা জীবিত আছেন) এই সব বৃদ্ধদের কাছে শুনেছি।

প্রশ্ন : যে সব কথা আপনি বললেন এসব কথা আপনার পঠিত ইতিহাসে লেখা রয়েছে কি ?

উত্তর : জিব্‌ হ্যাঁ, এর প্রতিটি কথাই লেখা রয়েছে 'অজ্ঞাতর ইতিহাসে।'

প্রশ্ন : রাজধানীর কথাও কি লেখা আছে ?

উত্তর : জিব্‌, হ্যাঁ।

৭· সাক্ষাৎকার বিবরণী : জামাল চৌধুরী

[জামালউদ্দীন চৌধুরীর বিবৃতি। সাং মুন্‌শী পাড়া, থানা—কোতয়ালী জেলা—রংপুর। তাং ১২।১২।১৯৫৮ ইং সন।]

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। যখন বয়স ছিল আমার ১৪/১৫ বছর। তখন আমি রংপুর কৈলাশরঞ্জন হাইস্কুলে পড়তাম। সেই সময় একদল গোরা সৈন্য (ইউরোপীয়), সংখ্যায় অনুমান ৪/৫ শ হবে—এসে আমাদের কালেক্টরি ময়দানে ছাউনি ফেলেছিল। উক্ত গোরা সৈন্যের কতিপয় শহরের বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে

জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগল, "লালবিবি কা কবর কাঁহা" "বাহাদুর শাহর মাতাজীকা কবর কাঁহা।" তখন মেয়ে-পুরুষ সকলেই বাড়ী ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করল। কেউ লালবিবির কবর দেখিয়ে দিয়েছিল কিনা, আমার জানা নেই। বর্তমানে আমার বয়স ৬০ বছর হবে।

৮. সাক্ষাৎকার বিবরণী : বাবু রামগোপাল চক্রবর্তী[১]

আমার পিতা ও অন্যান্য লোকের নিকট নিম্নোক্ত কথাগুলি আমি অনেকবার অনেক সময় নানা কথা প্রসঙ্গে শুনে এসেছি। শাহযাদা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ মুর্শিদাবাদের মীরজাফরের প্রতিদ্বন্দ্বী সুবে বাংলার নবাব হিসাবে বাংলায় আসেন। ফুলচৌকীতে তিনি নতুন রাজধানী পত্তন করেছিলেন। ইঁনি দিল্লীর মোগল রাজবংশের লোক ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের খোদ ভগ্নিপতি এবং আপন চাচাত ভাই ছিলেন। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ হিন্দু সন্ন্যাসী, মুসলমান পীর মৌলবীদের সঙ্গে নিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছেন। লর্ড ক্লাইভ ও হেস্টিংস্ সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের গণবাহিনীর নিকট পরাজিত ও তাড়িত হয়েছিল। সুবাদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা লালবিবির সহিত সম্রাট শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাট আকবর শাহের বিয়ে হয়েছিল। সম্রাট-মহিষী বেগম লালবিবিকে ইংরাজরা অতর্কিত আক্রমণ করে মীরগঞ্জের নিকট হত্যা করে। সেখানে তাঁর পাকা কবর রয়েছে। সুবাদারের এবং তৎপুত্র কামালউদ্দীন মুহাম্মদ, জামালউদ্দীন মুহাম্মদের রঙমহল ছিল বর্তমান রংপুর শহরটা জুড়ে। 'কামাল কাশানা' 'বাকের কাশানা' 'নওয়াব কাশানা' 'কাশানা' নওয়াবগঞ্জ, আলমনগর, নূরপুর, জঙ্গঘাট, লালবাগ প্রভৃতি নাম তাঁদের স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে এখন অবধি। নবাবপুত্র কামালউদ্দীন মুহাম্মদের ফুল-চৌকী প্রাসাদ স্থাপত্য শিল্পের অকল্পনীয় সৌন্দর্যের খনি ছিল। কিন্তু হায়! তা বিলীন করা হয়েছে। বৃদ্ধরা সুবাদার ও তৎবংশীয়দের কথা, যুদ্ধ ও তাঁদের প্রধান সহযোগীদের কথা বেশী বলতে চাইত না। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ জঙ্গ ছিলেন। তিনি বখত খাঁ নন বলে অনেকের নিকট শুনেছি।

---

[১] মাহিগঞ্জস্থ সন্ন্যাসী গোসাঁই রাজ এস্টেটের প্রধান পুরোহিত শ্রীযুক্ত বাবু রাম গোপাল চক্রবর্তী। বয়স ৭২ বছর। তাঁর পিতা শম্ভুনাথ চক্রবর্তী। বয়স ১০২ বছর বয়সে ৫৫ বছর পূর্বে মারা যান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ

"কাপ্তেন হড্‌সনের দলের একজন সৈনিক এই দুর্গে অবরুদ্ধ ছিল। সে পালাইয়া আসিয়া ব্রিগেডিয়ার ওয়াল পোলকে দুর্গের অবস্থা এবং নৃপৎ সিংহের অভিসন্ধি জানায়। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার তাহার কথায় বিশ্বাস করে নাই। তিনি দুর্গ-পর্যবেক্ষণেও অগ্রসর হন নাই, বিনা পরীক্ষায় তিনি দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। ১৫ই এপ্রিল দুর্গ আক্রান্ত হয়। দুর্গস্থিত সৈনিকগণ আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে নিরস্ত হয় নাই। তাদের নিক্ষিপ্ত গুলীতে অনেকে নিহত হয়। দুর্গের অন্তর্ভাগে একটি উন্নত বৃক্ষ ছিল। কথিত আছে, একজন ইউরোপীয় এই বৃক্ষে অবস্থান করছিল, ইহার গুলীতে সেনানায়ক আড্রিয়ান হোপ দেহ ত্যাগ করেন। কেউ কেউ নির্দেশ করেছিলেন যে, উপস্থিত বিপ্লবে বিপক্ষ সিপাহীদিগের দলে ইউরোপীয় ছিল।"

১. যাহারা উপস্থিত বিপ্লব সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, বিপক্ষ সিপাহীদিগের মধ্যে ইউরোপীয় ছিল। রীজ সাহেব চিনহীটের যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কোক্রইল সেতুর নিকটে একজন ইউরোপীয় সিপাহীদিগের পরিচালনা করিয়াছিল। এই ব্যক্তি সুগঠিত ও সুশ্রী ছিল। বয়স প্রায় ২৫ বৎসর হইয়াছিল। তাহার মস্তকে জরির কাজ-করা টুপি ছিল। রীজ সাহেব অনুমান করেন, এই ব্যক্তি রুশীয় বা স্বধর্ম-দ্রোহী খৃস্টান।

২. রুইহার দুর্গস্থিত বৃক্ষ হইতে যে ব্যক্তি আড্রিয়ান হোপকে গুলী করিয়াছিল, সেও ইউরোপীয় বলিয়া নির্ধারিত হয়। যেহেতু তাহাকে বিশুদ্ধরূপে ইংরাজী কথা বলিতে শোনা গিয়াছিল। অধিকন্তু ফর্‌বস্‌ মিচেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবের পর তাহার অধীন কোন কুঠিতে দ্বারবানের কাজ খালি হয়। জমাদার পদপ্রার্থী কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া আইসে, ইহাদের মধ্যে দুর্গাসিংহ নামক এক ব্যক্তি নিয়োজিত হয়। দুর্গাসিংহ ১৮৫৭ অব্দের বিপ্লবে ৯ সংখ্যক পদাতিক দলে ছিল। এই পদাতিক দল অফিসারদিগের জীবন হানি করে নাই। দুর্গাসিংহ কহিয়াছে

যে. সে স্বয়ং দুইজন ইউরোপীয়কে দেখিয়াছে। একজন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহী দলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়।

৩. অপর ব্যক্তি রোহিলাখণ্ডের বেরিলীর সিপাহীদিগের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হয়। এই ব্যক্তি পদগৌরবে সেনাপতি বখত খাঁর অব্যবহিত নিম্নে ছিল। দিল্লী-অবরোধকালে ইহার উপর কামান পরিচালনার ভার ছিল। কোথায় কিভাবে কামান সন্নিবেশিত করিতে হইবে, কামান কত উচ্চ করিলে গোলা-বৃষ্টির সুবিধা ঘটিবে, উক্ত ইউরোপীয় সৈনিক এই কর্মে ব্যাপৃত থাকিত। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই ব্যক্তি শয়তানের ন্যায় অপূর্ব পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

৪. দিল্লী অধিকৃত হইলে উক্ত ইউরোপীয় সেনানায়ক মথুরায় গিয়া সিপাহীদিগের যমুনা পার হওয়ার বন্দোবস্ত করে। এই সময়ে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য বখত খাঁর এবং ফিরোজ শাহের অধীন ছিল। ইহাদের শৃঙ্খলা সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সিপাহীগণ বখত খাঁ ও ফিরোজ শাহ অপেক্ষা উক্ত ইউরোপীয়কেই অধিক মানিত। এই সিপাহীরা অযোধ্যায় উপনীত হয়। ইউরোপীয় সেনানায়ক তাহাদের সঙ্গে কিছু দিন থাকে।

৫. অতঃপর দুর্গাসিংহ ইহাকে রুইয়ায় দেখিতে পায়। ইহারই নিক্ষিপ্ত গুলীতে আড্রিয়ান হোপ দেহ ত্যাগ করেন।

৬. রুইয়া হইতে ঐ ব্যক্তি বেরিলীতে যায়। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে বখত খাঁ নিহত হইলে অনেক সিপাহী নেপালে যায়। অনেকে মহারাণীর ঘোষণা পত্র অনুসারে আত্মসমর্পণে উদ্যত হয়। ইউরোপীয় সেনানায়ক তাহাদিগকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবর্তিত করিতে অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

৭. অবশেষে সে অশ্রুপাত করিতে করিতে কহে যে, তাহার বাড়ী নাই, দেশ নাই, ফিরিয়া যাইবার কোন স্থান নাই। দুর্গা সিংহের সহিত তাহার এই শেষ দেখা। ইহার পর তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছিল, জানা যায় নাই।

(Reminisences Ex. c. Appendix–B" সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত, পঞ্চম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, 'রুইয়ার যুদ্ধ', পৃষ্ঠা ৩৭৭-৭৮)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় সিপাই দুর্গা সিংহ স্বয়ং দুইজন

ইউরোপীয়কে দেখেছে। হ্যাঁ, তা দেখতে পারে? নিম্নপদের সিপাই দুর্গা সিংহ দেখতে পারে। হয়ত বা পরম সৌভাগ্য হলে দুই একদিন দুই একটা কথাবার্তাও বলতে পারে, যদিও তা নিম্নমানের সৈনিকের ভাগ্যে জোটার কথা নয়। বিশেষ করে যুদ্ধের এই ভীষণ উত্তেজনাময় হার-জিতের সময়ে। তবে একথা ধরে নেওয়া যায় যে, দূর হতে দুইজন ইউরোপীয়কে সিপাই দুর্গাসিংহ দেখেছে। 'একজন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহী দলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়।' একথাও আমরা মেনে নিচ্ছি। যিনি যুদ্ধে শহীদ হলেন তিনিও যে ইউরোপীয় অপরজনও যে ইউরোপীয় এর প্রমাণ তারা কিছুই উল্লেখ করে নাই। আর বিশুদ্ধ ইংরাজী বললেই যে ইউরোপীয় হবে এও কি করে মানা যায়? কারণ বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ ইংরাজী কি করে দুর্গাসিংহ বুঝল? এমন কি চেহারার মধ্যেও চাল-চলন পোশাক-আশাক ইউরোপীয় ধরনের বা কায়দার হলেও সে ব্যক্তি যে ইউরোপীয় নাও হতে পারে তার প্রমাণ ইংরাজদের লেখায় সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের পাতা উল্টালেই পাওয়া যায়। আমরা এদেশীয় সেই ইঞ্জিনিয়ারের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি, যিনি ইংরাজদের যুদ্ধ শিবিরে যুদ্ধের খবর আনতে গিয়ে এ দেশীয় এক লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষে ধরা পড়েছিলেন। পরে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মোহাম্মদ আলী

এখানে আমরা মোহাম্মদ আলী ওরফে জেমী গ্রীন এবং মিকি সম্পর্কে সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস হতে কিছু বস্তু নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"মালিসন প্রভৃতির গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। কিন্তু ঘটনাটি ঐতিহাসিকদের উপেক্ষণীয় নহে। ৯৩ সংখ্যক হাইলাণ্ডার দলের একজন সার্জেণ্ট উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সূত্রের অনুরোধে উহার সারাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইতেছে। ফরবস্ মিচেল এইভাবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন !

'এই সময় আমাদের বিশেষ কোন কর্ম ছিল না। আমি আমার তাঁবুতে শুইয়া স্বদেশ হইতে আগত সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম। এমন সময়ে একজনকে আমাদের শিবিরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিলাম, চাই পিঠা, চাই আঙ্গুর কিস্‌মিসের পিঠা, বড় ভাল পিঠা, কিনিবার আগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন।' পিঠেওয়ালা পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন, দেখিতে বেশ

সুন্দর, দাঁড়ি ও গোঁফ কৃষ্ণবর্ণ। কোম্পানীর সিপাহীরা যেভাবে দাঁড়ি ও গোঁফের বিন্যাস করে, আগন্তুক বিক্রেতার দাঁড়ি-গোঁফও সেইভাবে বিন্যস্ত। তাহার ললাট বিস্তৃত, নাসা ঈষৎ বঙ্কিম, চক্ষু তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। সংক্ষেপে শিবিরের অনুচর বা পরিচারকদিগের আকৃতি হইতে এই আগন্তুক ব্যবসায়ীর আকৃতি সর্বাংশে ভিন্ন। কিন্তু যে-ব্যক্তি তাহার পিষ্টকের ঝুড়ি লইয়া আসিয়াছিল, তাহার আকৃতি দেখিলে তাহাকে বদমায়েশ বলিয়া বোধ হয়। রেজিমেন্টের নির্দিষ্ট বাজার থাকিত। যাবতীয় দ্রব্য এই বাজার হইতে আনিতে হইত। যাহারা বাজারের দোকানদার নয়, তাহারা অধিনায়কের স্বাক্ষরযুক্ত পাস ভিন্ন রেজিমেন্টের শিবিরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিতে পারিত না। আমি পিষ্টক-বিক্রেতার নিকটে পাসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ইংরাজীতে বলিল, 'ব্রিগেডিয়ার-আড্রিন হোপ আমাকে পাস দিয়াছেন। আমার নাম জেমি গ্রীন। আমি মেস খান-সামা ছিলাম।' জেমি গ্রীনের আকৃতি দর্শনের পর তাহার পরিশুদ্ধ ও সরল ইংরেজীর অনর্গল উচ্চারণ দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ইংরাজীতে তাহার অধিকার ছিল। যেহেতু সে আমার পার্শ্বে বসিল এবং আমার নিকটে সংবাদপত্র দেখিতে চাহিল, আমার বোধ হইল যে, উপস্থিত সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে বিলাতের পত্র সম্পাদকদের কিরূপ অভিমত,—জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ জন্মিয়াছে। কথোপকথনকালে আমি তাহার অনর্গল ইংরেজী উচ্চারণের প্রশংসা করিলাম। সে কহিল, তাহার পিতা ইউরোপীয় রেজিমেন্টের মেস-খান-সামা ছিল। সে বাল্যকাল হইতে ইংরেজী বলিতে শিখিয়াছে। রেজিমেন্টের স্কুলে তাহার লেখাপড়ার অভ্যাস হইয়াছে। সে দীর্ঘকাল সৈনিকদলের মধ্যে লেখাপড়ার কর্ম করিয়াছে। যাবতীয় হিসাব তৎকর্তৃক ইংরেজীতেই লিখিত হইত। জেমি গ্রীনের সহিত যখন এইরূপ কথা হইতেছিল, তখন পিষ্টকের মূল্য লইয়া একজনের সহিত জেমি গ্রীনের ভৃত্যের বচসা ঘটিল। আমি জেমি গ্রীনের ভৃত্যের রুক্ষ দৃষ্টির বিষয় কহিলাম। জেমি গ্রীন উত্তর করিল, 'ইহার সম্বন্ধে কিছু মনে করিবেন না। এই ব্যক্তি আইরিশ, ইহার নাম মিকি। ইহার মাতা ৮৭ সংখ্যক আয়াল্যান্ডের সৈনিক দলের বাজারে থাকে। পিতৃত্ব সম্বন্ধে সার্জেন্ট মেজরের বাবুর্চি পর্যন্ত সমগ্র রেজিমেন্টের উপর ইহার দাবী আছে। সম্প্রতি এই ব্যক্তি পাঞ্জাব হইতে আসিয়াছে। কানপুরের সৈন্যাধ্যক্ষের একটি যুবতী ভার্যা আছে। মিকির আকৃতি এই যুবতী নারীর প্রিয়দর্শন বলিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ

ইহাকে কর্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার পর জেমি গ্রীন কহিল,—'তামাসা ও তামাসা, কিন্তু একজনের আঙুর কিশ্‌মিশের পিষ্টক খাইয়া উহার মূল্য না দেওয়া হাইলন্ডের তামাসা।' জেমি গ্রীনের এই বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া তাঁবুর সকলে, যে ব্যক্তি মূল্য দিতে অসম্মত হইয়াছিল, তাহাকে নির্দিষ্ট মূল্য দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। সুতরাং ঐ ব্যক্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া মূল্য দিল। জেমি গ্রীন ও মিকি অন্য তাঁবুতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে জেমি গ্রীন আমার নিকট হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র চাহিয়া লইল। এইরূপে পিষ্টক বিক্রেতার সহিত প্রথমবারের দেখাশুনা শেষ হইল।

দ্বিতীয়বারের আলাপ পরিচয় ইহা অপেক্ষা অধিকতর কৌতূহলজনক এবং উহার পরিণাম অধিকতর শোচনীয়। যে-দিন উক্ত পিষ্টক-বিক্রেতা আমাদের শিবিরে আসিয়া পিষ্টক বিক্রি করে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে শিবিরে পাহারা দিবার ভার আমার উপর ছিল। সূর্যাস্ত সময়ে একজন সৈনিক আসিয়া কহিল যে, আঙুর-কিশ্‌মিশের পিঠেওয়ালা লক্ষ্ণৌর একজন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এখন রাত্রি হওয়াতে তাহার ফাঁসি হইবে না। তাহাকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখা হইবে। শিবিরে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত প্রহরীও থাকিবে। এই সংবাদে আমি যে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যদিও চরেরা সকল সময়েই সৈনিকদলের মধ্যে সাতিশয় ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে এবং যদিও তাহাদের প্রতি কাহারও দয়া প্রকাশ হয় না, তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার সাতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। অলপক্ষণের আলাপেই আমি তাহার ক্ষমতা বুঝিয়াছিলাম। এইরূপ সৌম্য দর্শন ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে সামান্য অনুচর বা পরিচারকের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর করণীয় কর্মভার গ্রহণ করিল, আমি তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, চর বলিয়া এই ব্যক্তি উক্তরূপ সামান্য বেশে আসিয়াছিল।

"যাহারা আমাদের সহিত যুদ্ধে উদ্যত এবং আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের উপর আমাদের যাবতীয় শ্রেণীর যে কিরূপ বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল এ স্থলে তাহার বর্ণনা করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি চর বলিয়া ধৃত হইলে ইন্ধনযুক্ত অগ্নির ন্যায় ঐ ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষ ভাবের উদ্দীপক হইত মাত্র। এশিয়াবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ সাতিশয় নির্দয়ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আমি যে বিদ্রোহঘটিত যুদ্ধের কথা বলিতেছি, উহা এশিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর অপকৃষ্ট।"………

"ফতেগড় হইতে কানপুরে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে তিনি যখন কোন এক আমের বাগানে প্রবেশ করেন, তখন ঐ বাগানের প্রত্যেক বৃক্ষের শাখা বিলম্বিত গলিত শবে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ইহা দেখিয়া সাতিশয় বিরক্তিসহকৃত ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে পূর্বোক্ত শ্রেণীর একজন বিচারক কোন সৈনিকদলের সহিত যাইবার সময়ে এইভাবে ফাঁসির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।

"এখন আমার কথা বলিতেছি। জেমি গ্রীন চর বলিয়া ধৃত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবার পরক্ষণেই প্রবোস্ট মার্শেলের[১] সহযোগীবর্গের মধ্যে কতিপয় সৈনিক পুরুষ তাহাকে আমাদের তাঁবুতে আনিয়া, আমার হস্তে সমর্পণ-পূর্বক প্রাতঃকাল পর্যন্ত সাবধানে রাখিতে কহিলেন। তাহার সহিত পিষ্টকের চুপড়ীর পূর্বোক্ত বাহকও ছিল। সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, যে সকল লোক ১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে কানপুরে ইউরোপীয় নর-নারীদিগকে বধ করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যক্তি ছিল। আমি যেমন কয়েদী দুইটির রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছি, অমনি কতিপয় প্রহরী ইহাদের জাতি-নাশের জন্য বাজার হইতে শূকর মাংস আনিবার প্রস্তাব করিল। তখন ফাঁসি-দিবার পূর্বে এইভাবে কার্য হইত। আমি এই প্রস্তাবের একান্ত বিরোধী হইলাম এবং স্পষ্টাক্ষরে কহিলাম, আমি যে পর্যন্ত প্রহরীদিগের অধ্যক্ষ থাকিব, সে পর্যন্ত কিছুতেই ইহা করিতে দিব না। অপর প্রহরীদিগকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিলাম যে, যদি কয়েদীদিগের ধর্মনাশের জন্য কেহ কোনরূপ চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার সৈনিক-চিহ্নের পরিচয়সূচক কোমরবন্ধ খুলিয়া লওয়া হইবে।

আদেশ পালন না করাতে এই ব্যক্তি আবদ্ধ থাকিবে। অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বভাব প্রহরীরা আমার প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। যে হতভাগ্য আপনার নাম জেমিগ্রীন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিল, আমার এই আদেশ শ্রবণে তাহার মুখ-মণ্ডলে যেরূপ কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হইল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। সে কহিল যে, আমার নিকটে এইরূপ সদয় ভাবের কখনও প্রত্যাশা করে নাই। উহার জন্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ যুদ্ধের সময়ে আমাকে যাবতীয়

---

[১] যে কর্মচারী সৈনিক বিভাগে কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধান; কর্তৃপক্ষের আদেশমত অপরাধীদিগের শাস্তি বিধান, সৈনিক বিভাগের নিয়মানুসারে শৃঙ্খলা সাধন প্রভৃতি পুলিশের কর্ম করেন।

বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবেন। আমি কয়েদীর এইরূপ প্রার্থনার জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং সে সায়ন্তন উপাসনা করিতে পারে, এজন্য তাহার হস্তের বন্ধন খুলিয়া দিলাম। আমার এইরূপ সদয় ব্যবহারে তাহার সহচরের কেবল রুক্ষভাব পরিস্ফুট হইল। কিন্তু সে স্বীকার করিল যে, সার্জেণ্ট সাহেব মুসলমানের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যেহেতু, তিনি তাহাকে শূকরের রক্তালেপন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

"কয়েদীদিগকে তাহাদের সায়ন্তন উপাসনা সাঙ্গ করিতে দিলাম। সময় ও অবস্থা অনুসারে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে, তাহারা ততটুকু স্বাধীনতা পাইল। আমি বিনা-নিদ্রায় রাত্রি যাপনে কৃত-সংকল্প হইলাম। যেহেতু যদি কয়েদী দুইটির কেহ পলায়ন করে, তাহা হইলে উহা নিরতিশয় দোষের মধ্যে গণ্য হইবে। আমি রেজিমেন্টের বাজার হইতে একজন মুসলমানকে আনাইয়া আমার ব্যয়ে কয়েদীদিগের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতে কহিলাম। ইহাতে মুসলমান দোকানদার উত্তর করিল, 'আপনি যখন মুসলমানের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থার সময়ে তাহার প্রতি এইরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন যদি আপনি ইহার জন্য আমাদিগকে একটি পয়সাও ব্যয় করিতে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমাদের স্বধর্মের সম্মান হানি হইবে।

"বাজার হইতে খাদ্য আসিল। জেমি গ্রীন উহা খাইয়া একখানি মাদুরের উপর বসিয়া হুংকা টানিতে টানিতে কহিল,—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমাকে জীবনের এই শেষ রাত্রিতে এইরূপ দয়াশীল সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছেন। ইহার পর সে আমাকে কহিল,—'আপনি আমাকে আমার জীবনের ঘটনা বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা যথার্থ বটে যে, আমি চর। কিন্তু চর বলিলে সচরাচর যাহা বোঝায়, আমি কখনও সে শ্রেণীর লোক নহি। আমি সাধারণ চরের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি লক্ষ্ণৌর বেগমের সৈনিকদলের একজন কর্মচারী। আমাদের বিরুদ্ধে যে সৈন্য ও কামানাদি যাইতেছে, তাহাদের বলাবল সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ জানিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।

আমি লক্ষ্ণৌর সৈনিকদলের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার। বিপক্ষদিগের অবস্থা ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছি। কিন্তু আল্লাহ্ আমার কার্য সিদ্ধ হইতে দিলেন না। আমি আজ সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে ফিরিয়া যাইতে

ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইত তাহা হইলে কল্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই তথায় পৌঁছিতে পারিতাম। কিন্তু যেহেতু, যাবতীয় অভীষ্ট বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উনাত্ত লক্ষ্ণৌর পথে থাকাতে আপনাদের কামান এবং গোলাগুলী বারুদ প্রভৃতি লক্ষ্ণৌতে যাইতেছে কিনা দেখিবার জন্য আর একবার এই স্থানে আসিয়াছিলাম। কিন্তু একটি অসতী-পুত্র আমাকে চর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে। এই পাষণ্ড ফাঁসির কাষ্ঠ হইতে আপনার গলা বাঁচাইবার জন্য এইরূপে তাহার স্বদেশের এবং স্বধর্মের লোকদিগের জীবননাশের কারণ হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য, সেই ব্যক্তি জাহান্নামের (নরকের) আগুনে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পাইবে।[১]

আপনি আমার নাম জানিতে চাহিয়াছেন, আমার দুর্ভাগ্যের বিবরণ স্কট্ল্যান্ডে আপনার বন্ধুদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নাম ইত্যাদি বলিতে কোন আপত্তি নাই। ইংলন্ডের—ইংলন্ড অর্থে আমি স্কটল্যান্ড সমেত ইংলন্ড বলিতেছি—লোক ন্যায়পর। আল্লাহ্‌র এই ভৃত্যের অদৃষ্টলিপিতে তাহাদের কেহ কেহ দুঃখিত হইতে পারেন। আমি দুইবার লন্ডন এবং এডিনবরা দেখিয়াছি। এই দুই স্থানে আমার অনেক বন্ধু আছেন। আমার নাম মোহাম্মদ আলী খাঁ। রোহিলাখণ্ডের সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে আমার জন্ম। বেরিলী কলেজে আমার শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমি সেখানে যাবতীয় ইংরেজী পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। বেরিলী কলেজ হইতে রুড়কির গভর্নমেণ্ট ইঞ্জিয়ানিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া সেখানে কোম্পানীর চাকুরী পাইবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়াছি। এই কলেজের শেষ পরীক্ষায় সৈনিক এবং সাধারণ বিভাগের কর্মপ্রার্থী সমুদয় ইউরোপীয় ছাত্র অপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়াছি।

“আমি পিতাকে এ বিষয়ে জানাইয়া তাঁহার নিকটে চাকুরী ছাড়িয়া দিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, রাজবংশীয়গণ এইভাবে কোম্পানীর চাকুরী করিতে পারেন না। আমি অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দীনের সরকারে কর্ম করিবার ইচ্ছা করিয়া, চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ী গেলাম। যখন আমি লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত

---

[১] যে ব্যক্তি জেমিগ্রীনকে চর বলিয়া ধরাইয়া দেয়, বেরিলির বিপ্লব-কালে সে আপনার প্রতিপালক ইউরোপীয়কে বধ করে। এই অপরাধে পরবর্তী মে মাসে তাহার ফাঁসি হয়।

হই, তখন নেপালে জঙ্গ বাহাদুর ইংলন্ডে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার একজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ সেক্রেটারীর প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি অবিলম্বে এই কর্মের জন্য আবেদন করিলাম। অনেক রাজা এবং ইংরেজ রাজ-কর্মচারী আমার আবেদনের সমর্থন করিলেন। আমি মহারাজের সেক্রেটারী হইয়া তাঁহার সহিত ইংলন্ডে উপনীত হইলাম। অন্যান্য স্থানের মধ্যে এডিনবরায় গিয়াছিলাম। সে সময়ে মহারাজের সম্মানার্থে আপনাদের ৯৩ সংখ্যক হাইলান্ডার রেজিমেন্ট সামরিক বেশে সজ্জিত হইয়া, দণ্ডায়মান ছিল। যখন আমি হাইলন্ডের পরিচ্ছদধারী এই রেজিমেন্ট দেখিলাম, তখন ইহা ভাবি নাই যে, হিন্দুস্তানের সমতল ক্ষেত্রে ইহাদের শিবিরে আমি বন্দী হইব। কিন্তু কে অদৃষ্টের কথা বলিতে পারে এবং উহার হাত ছাড়াইতে পারে ?

'আমি ভারতবর্ষে' ফিরিয়া আসিয়া ১৮৫৪ অব্দ পর্যন্ত স্বদেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজদরবারে চাকুরী করি; ঐ অব্দে আজিম উল্লার সহিত পুনর্বার ইংলন্ডে যাই। আপনি উপস্থিত বিপ্লব প্রসঙ্গে আজিম উল্লার নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন। পেশওয়ার দেহত্যাগের পর নানা সাহেব আজিম উল্লাকে আপনার এজেন্ট করেন। আমার ন্যায় আজিম উল্লা-খাঁও কানপুরের গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গঙ্গাদীনের প্রদত্ত শিক্ষাগুণে ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে যদি তিনি ইংলন্ডে যাইতে পারেন, তাহা হইলে তদীয় প্রভুর বিরুদ্ধে লর্ড ডালহৌসীর নিষ্পত্তি বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে পারিবেন। আজিম উল্লাহ্ সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারজীবীদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্যে এবং যদি আবশ্যক হয়, উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষদিগকে উৎকোচ দিবার নিমিত্ত বহু অর্থ লইয়া ইংলন্ডে যাত্রা করেন। আপনি জানেন যে লন্ডনের সমাজে তাঁহার সম্মান লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আপনার রাজনীতি সংক্রান্ত কর্মে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পাঁচ-লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়া আমরা ১৮৫৫ অব্দে কনস্টানটিনোপল দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ইংলন্ড পরিত্যাগ করি। কনস্টান্টিনোপল হইতে ক্রিমিয়া দেখিতে যাই। এই স্থানে ১৮ই জুন ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণ এবং পরাজয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শিবাস্তোপলের পুরোভাগে উভয় সৈন্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে আমাদের মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটে। আমরা কনস্টান্টিনোপলে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই স্থানে কতিপয় ব্যক্তির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইহারা রুশিয়ার রাজকর্মচারী বলিয়া

আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহারা আজিম উল্লা খাঁকে বলিয়াছিলেন যে, যদি তিনি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটাতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা কার্যত যথোচিত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। এই সময় আমি এবং আজিম উল্লা কোম্পানীর গভর্নমেন্টের বিপর্যয় সাধনে কৃতসংকল্প হই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমরা এ বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছি। আপনি আমাকে যে সকল সংবাদপত্র দিয়াছেন, তৎসমুদয়ে দেখিলাম যে, কোম্পানীর রাজত্ব গিয়াছে। তাহাদিগকে আর পরস্বহরণ বা পররাজ্য অধিকারের জন্য সনদ দেওয়া হইবে না। যদিও আমরা এই দেশ ইংরেজদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে পারিলাম না, তথাপি আমরা কিয়দংশে ভাল কাজ করিলাম। আমাদের জীবনেরও বৃথা উৎসর্গ হইল না, যেহেতু আমার বিশ্বাস যে, শাসনকার্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পার্লামেন্টের অধীন হইলে উহা কোম্পানীর অধিকারে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়ানুগত হইবে এবং আমি দেখিয়া যাইতে না পারিলেও আমার বিশ্বাস যে, আমার নিপীড়িত ও পদদলিত স্বদেশীয়গণ ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। সাহেব! আপনার তোষামোদ বা আপনার অনুগ্রহ লাভের জন্য বলিতেছি না। আমি আপনার যথোচিত অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনি ইহা অপেক্ষা আমার আর অধিক কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন না। উহা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও আপনার কর্তব্য জ্ঞান করিতে দিবে না। আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আপনি আমার প্রতি যেরূপ অচিন্ত্যপূর্ব দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মনের কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। আমার হৃদয়ে আপনাদের প্রতি ঘৃণার ভাব নিহিত আছে। আমার মুখে—আপনাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায়—এরূপ কঠোর কথাও রহিয়াছে। আমি এইভাবেই আপনাদের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্যের প্রতি আপনার দয়া দেখিয়া, আমি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর এই দ্বিতীয়বার উপস্থিত বিপ্লব-ঘটিত অত্যাচারের জন্য লজ্জিত হইতেছি। কয়েকদিন পূর্বে কানপুরে থাকিতে একটি ঘটনায় প্রথমবার আমার লজ্জার উদ্রেক হইয়াছিল। যখন কর্নেল নেপিয়ার কানপুরের ঘাটে কয়েকটি হিন্দু দেব-মন্দির কামানে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হয়েন, তখন পাণ্ডারা তাঁহার নিকটে গিয়া, মন্দির রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কর্নেল নেপিয়ার এই প্রার্থনার উত্তরে তাঁহাদিগকে বলেন, 'এখন আমার কথা শুনুন। যখন আমাদের কুল-নারীগণ, আমাদের বালক-বালিকাগণ নিহত হয়, তখন আপনারা সকলেই এখানে ছিলেন। আপনারা জানেন

যে, আমরা প্রতিহিংসা-প্রযুক্ত এই সকল মন্দিরের বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হই নাই। নৌ-সেতু নিরাপদে রাখিবার জন্য মন্দিরগুলি বিনষ্ট করিতেছি। কিন্তু আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে পারেন যে, তিনি একটি খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু সন্তানের সম্বন্ধে কিয়দংশে দয়ার কার্য করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি-এরূপও প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, তিনি একটি খৃস্ট-ধর্মাবলম্বী পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু-সন্তানের সম্বন্ধে কিয়দংশে দয়ার কার্য করিয়াছেন, অন্ততঃ তিনি যদি এরূপও প্রমাণ দেখাইতে পারেন যে, ইহাদের জীবন রক্ষার জন্য একটি কথাও বলিয়াছেন, আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তিনি যে স্থানে দেবারাধনা করেন, আমি সেই স্থান যথাবৎ রাখিব।' আমি এই সময়ে জনতার মধ্যে কর্নেল নেপিয়ারের নিকটে দণ্ডায়মান ছিলাম। কর্নেল নেপিয়ার বেশ কথা বলিয়াছিলেন। কেহ এই কথার উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণেরা নীরবে চলিয়া গেল। কর্নেল নেপিয়ার ইঙ্গিত করিলেন। মুহূর্ত মধ্যে মন্দিরগুলি বায়ুস্তরের মধ্যে উড়িয়া গেল। নেপিয়ারের ন্যায়সঙ্গত কথায় আমি লজ্জাভরে অধোবদন হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

"এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'যখন বিদ্রোহ ঘটে, তখন আপনি কানপুরে ছিলেন কিনা? বন্দী উত্তর করিলেন, 'না' ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তখন আমি রোহিলাখণ্ডে আপনার বাড়ীতে ছিলাম। আমি কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত করিয়াছি। অন্যরূপে কাহারও শোণিতে আমার হস্ত কলঙ্কিত হয় নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঝটিকার সঞ্চার হইয়াছে, সুতরাং স্ত্রী ও সন্তানদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য বাড়ী গিয়াছিলাম। যখন আমি বাড়ীতে ছিলাম, তখন মিরাট এবং বেরিলীর বিপ্লবের কথা আমার শ্রুতিগোচর হয়। আমি অবিলম্বে বেরিলিতে গিয়া তত্রত্য-সৈনিকদলের সহিত সম্মিলিত হই; এবং তাহাদের সহিত দিল্লীতে পদার্পণ করি। আমি দিল্লীতে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্মে নিয়োজিত হইয়া নগর রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজেরা নগর অধিকার করেন। আমি ঐ পর্যন্ত দিল্লীতে থাকি। পরে পরস্পর বিচ্ছিন্ন সিপাহীদের মধ্যে যাহাদিগকে একত্র করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাদিগকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। আমরা প্রথমে মথুরায় উপনীত হই, সৈনিকদিগের পারের জন্য যমুনার উপর যে পর্যন্ত নৌ-সেতু প্রস্তুত না হয়, সে পর্যন্ত ঐ স্থানে থাকি। শাহযাদা ফিরোজ শাহ এবং

সেনাপতি বখ্‌ত খাঁর অধীন এখনও ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হইলে আমাকে প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কর্ম দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসে যখন আপনাদের সৈনিক দল রেসিডেন্সির উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হয়, তখন আমি লক্ষ্ণৌতে ছিলাম। আমি সেকেন্দার-বাগের ভয়ঙ্কর নরহত্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যেদিন উহা আক্রান্ত হয়, তাহার পূর্ব রাত্রিতে আমি উহার রক্ষার জন্য যাবতীয় বিষয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলাম। যখন আপনারা শাহনজিফ আক্রমণ করেন, তখন ঐ স্থান হইতে আমি আপনাদের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। আমি লক্ষ্ণৌর সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত সৈনিকদিগের মধ্যে তিন হাজারের অধিক লোক সেকেন্দারবাগ রক্ষার জন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। ইহাদের একটিও রক্ষা পায় নাই। পূর্ব রাত্রিতে যখন আমার স্থাপিত দণ্ড হইতে আমাদের সবুজ পতাকা তুলিয়া আপনাদের হাইলন্ডের টুপী বসান হয়, তখন আমি মূর্ছিত প্রায় হইয়াছিলাম। আমার প্লীহা ভাল হইয়া গিয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের সমস্তই শেষ হইল। সেকেন্দারবাগে গোলা বর্ষণের জন্য শাহনজিফে কামান সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। এই সময় হইতে আমি লক্ষ্ণৌ শহরে এবং উহার চারিদিকে যেভাবে প্রাচীর প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা ঠিক করি এবং তৎসমুদয়ের নির্মাণ কার্যের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকি। আপনি লক্ষ্ণৌ গেলে উহা দেখিতে পাইবেন। যদি সিপাহীরা এবং গোলন্দাজ উহার পশ্চাতে দৃঢ়তা সহকারে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ অধিকারের পূর্বে আপনাদের অনেক সৈন্য নষ্ট হইবে।'

ইহার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমাদের প্রথম পরিচয়কালে যাহার নাম মিকি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে জুলাই মাসে কানপুরস্থিত স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের নিধনের জন্য নানা সাহেবের নিয়োজিত লোকের মধ্যে ছিল কি না? বন্দী উত্তর করিলেন,-আমার বিশ্বাস ইহা সত্য। কিন্তু যখন আমি ইহাকে নিযুক্ত করি, তখন এ বিষয় আমার গোচর হয় নাই। এই ব্যক্তি বিশ্বাসী, ইহা শুনিয়া, ইহাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। যদি জানিতাম যে, এই ব্যক্তি স্ত্রীলোক এবং শিশু সন্তানদিগকে বধ করিয়াছে, তাহা হইলে কখনও ইহার সংস্রবে থাকিতাম না।' এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—নিধনের পূর্বে ইউরোপীয় কুলনারীদিগের সম্ভ্রম নষ্ট করা হইয়াছে—এ কথার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি কিছু জানেন কিনা? বন্দী বলিলেন—সাহেব! আপনি বিদেশী, তাহা না হইলে এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিতেন না। যিনি

এই দেশের আচার-ব্যবহার এবং জাতিগত কঠোর নিয়ম অবগত আছেন, তিনি জানেন, এই কথা মিথ্যা। কেবল জাতিগত বিদ্বেষ বাড়াইবার জন্য ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। আমি স্বীকার করি যে, কুলনারীগণ এবং বালক-বালিকারা নিহত হইয়াছে। কিন্তু কাহারও ইয্যত নষ্ট হয় নাই। আমরা অসভ্যদিগের ইচ্ছার উপর রহিয়াছি। ইহারা যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেরই সম্ভ্রম নষ্ট করিয়াছে। এইরূপ নানা কথা কানপুরের গৃহগুলির দেওয়ালে লিখিত হইয়াছে। এই সকল কথা এ দেশের ইংরেজী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। এ দেশের সংবাদ এই কথা বিলাতের সংবাদপত্রে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু কানপুরের দেওয়ালের ঐ সকল লেখা জালমাত্র। সেনাপতি আউট্রাম এবং হ্যাবেলকের সৈন্য কানপুর পুনরধিকার করিলে দেওয়ালে উহা লিখিত হইয়াছিল। যদিও আমি সে সময়ে তথায় ছিলাম না, তথাপি যাহারা ছিল, তাহাদের কথাই আমি বলিতেছি। আমি যাহা বলিলাম তাহা সত্য।’

“নানা সাহেব কি জন্য সাতিশয় নির্দয়ভাবে উক্তরূপ পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমি বন্দীর নিকটে অতঃপর তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন,—এশিয়াবাসিগণ দুর্বল প্রকৃতির। তাহাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব সংকল্পিত বিশ্বাসঘাতকতা হইতে এইরূপ অব্যবস্থিততার উৎপত্তি হয় না। যখন তাহারা কোন বিষয়ে প্রতিশ্রুত হয়, তখন তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু অসুবিধা দেখিলেই উহা ভুলিয়া যায়। আমার বিশ্বাস, নানা সাহেব সম্বন্ধে এইরূপ ঘটিয়াছিল।

“নানা সাহেব স্ত্রীলোক এবং বালিকাদিগের জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে একটি দানবী অবস্থিতি করিতেছিল। এই নারী পূর্বে বাঁদী ছিল। নানা সাহেবের পার্শ্বচরদিগের মধ্যে অনেকে (আজিমউল্যা খাঁ ইহাদের মধ্যে একজন) যাহাতে নিষ্কৃতি লাভ অসম্ভব হয়, সেই ভাবে উপস্থিত বিপ্লবে নানা সাহেবকে জড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সুতরাং অনেকে দৃঢ়তার সহিত দানবীর ভয়ংকর প্রস্তাবের সমর্থন করিল। উক্ত দানবী ইংরেজ মহিলাদিগকে বধ করিবার অনুমতি পাইল। যখন ৬ সংখ্যক পদাতিক দলের সিপাহীগণ এবং নানা সাহেবের প্রহরীগণ এই ভয়াবহ কর্ম সাধনে অসম্মত হইল, তখন ঐ নারী কতিপয় দুরাত্মাকে আনিল। ইহাদিগ কর্তৃক এই কর্ম সম্পাদিত হইল। আমি সেনাপতি তাত্যাটোপের নিকট ইহা অবগত হইয়াছি। অনুমতি দেওয়ার জন্য

তাত্যাটোপের সহিত নানা সাহেবের বিবাদ হইয়াছিল। আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য। কানপুরে ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকার নিধন নারীর কর্ম। নরদানব অপেক্ষা নারী দানবী অধিকতর ভয়ংকর। কিন্তু কি জন্য অভাগিনী-মহিলাদিগের প্রতি ইহার শত্রুতা জন্মিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আমি কখন এ বিষয়ের অনুসন্ধানও করি নাই।'[১]

"ইহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সেনাপতি হুইলারের কন্যা পিস্তলের গুলীতে চার-পাঁচ জনকে বধ করিয়া, শেষে কানপুরের কূপে ঝাঁপ দিয়াছিল—এ কথা এখন প্রচারিত হইয়াছে। ইহা সত্য কিনা? বন্দী বলিলেন, 'এই সকল গল্প নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক। উহার মূলে কোন সত্য নাই। সেনাপতি হুইলারের কন্যা এখনও জীবিত আছেন। তিনি এখন লক্ষ্ণৌতে অবস্থিতি করিতেছেন। যে মুসলমান তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তিনি মুসলমানী হইয়া, মুসলমান ধর্মানুসারে তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।'

'বন্দীর সহিত এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমি বন্দীকে প্রাতঃকালের উপাসনা সমাপন করিতে দিলাম। উপাসনা শেষ করিয়া তিনি এইরূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য আবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। যখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী এবং তাহার দুইটি পুত্র রোহিলাখণ্ডের বাড়ীতে আছে, এখানে হতভাগ্য পিতার অদৃষ্টের বিষয় পুত্রদ্বয় জানিতে পারে নাই, তখন কেবল একবার তাঁহার দৃঢ়তার পরিবর্তে দুর্বলতা দেখা গিয়াছিল। পরক্ষণেই তিনি এই ভাবের গোপন করিয়া বলিলেন—আমি ইংলণ্ডের ইতিহাসের ন্যায় ফরাসীদিগের ইতিহাস পড়িয়াছি। দাঁতুনের বিষয় আমার মনে আছে। আমি কোনরূপ দুর্বলতা দেখাইব না।

…"এই কথা শেষ হইবার পরক্ষণেই একজন প্রহরী উপস্থিত হইল। আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহার হস্তে বন্দীকে সমর্পণ করিলাম।"

"পরক্ষণে লক্ষ্ণৌ যাত্রার আদেশ প্রদত্ত হইল। মার্তণ্ড ভগগনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে আমরা আমাদের অবস্থিতির স্থল পরিত্যাগ করিলাম। পথবর্তী একটি বৃক্ষের তল দিয়া যাইবার সময়ে সভয়ে দেখিলাম যে, আমার বন্দী এবং তাহার সহচর ঐ বৃক্ষে বিলম্বিত রহিয়াছে। আমি ইহা দেখিয়া

---

[১] উপাস্থিত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে-কানপুরের নিদারুণ শোচনীয় ঘটনা এই ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, তখন ফরবস্ মিচেল সাহেবের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

অতিকষ্টে অশ্রুবেগের সংবরণ করিলাম। ১১ই মার্চ বেগম কুঠি আক্রমণকালে মোহাম্মদ আলী খাঁকে স্মরণ করিয়াছিলাম।"

…"এইরূপে মোহাম্মদ আলী খাঁর কথা শেষ হইল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, মোহাম্মদ আলী যেরূপ সু-শিক্ষিত, সেইরূপ দূরদর্শী ছিলেন না। তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, কনস্টান্টিনোপলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ক্রিমিয়ার রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংরেজের বসতিস্থলে, তুরুকিদিগের রাজধানীতে, ইউরোপীয় সৈন্যদিগের বীর্যবহ্নির বিস্ফুরণ ক্ষেত্রে তাঁহার সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বকীয় শিক্ষার গুণে এই সকল স্থানেও প্রকৃত জ্ঞানের সংগ্রহে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি নিতান্ত অল্প ছিল। তিনি যে বীর পুরুষের সেক্রেটারী হইয়া সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, সেই বীর পুরুষের ন্যায় ইংরেজদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিমাপ করিতে পারেন নাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আকস্মিক ব্যাপারে তাঁহার মতিভ্রম হইয়াছিল তিনি এই ভ্রম-প্রযুক্ত স্বদেশে ইংরেজের ক্ষমতার বিপর্যয় সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। ইংরেজের প্রদত্ত কর্ম তাঁহার নিকট অবমাননাকর বোধ হওয়াতে তিনি ইংরেজের প্রতি জাতবিদ্বেষ হইয়াছিলেন। এই বিদ্বেষ ভাবও তাঁহার উক্ত অসম সাহসিক ও অসাধ্য সংকল্পের পরিপোষণে সহায় হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর প্রকৃত বীরপুরুষ। তিনি বীরকুলের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন। মুহম্মদ আলী ইহা বুঝিতে না পারিয়া, অধঃপতনের পথে অগ্রসর হয়েন। যৌবনকালেই সুশিক্ষিত ও কর্মক্ষম পুরুষের এইরূপ অদৃষ্ট বিপর্যয় নিরতিশয় শোচনীয় ভাবের উদ্দীপক।"

—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত,
পঞ্চম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৪৯ হইতে ৩৬৩

মোহাম্মদ আলী (জেমি গ্রীন) সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক নেপালের রাজা জঙ্গ বাহাদুরকে প্রকৃত বীর বলেছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি. মোহাম্মদ আলী প্রকৃত বীর ছিলেন, জঙ্গ বাহাদুর নহে। প্রকৃত বীরের পায়ে বেড়ী উঠে। কিন্তু তিনি অন্যায়কারীদের নিকট নতি স্বীকার করেন না। মুহাম্মদ আলী সাহেব তুলনাহীন দেশপ্রেম এবং মৃত্যুভয়ে কখন সামান্য মাত্রও বিচলিত হন নাই, লেখকের দীর্ঘ লেখার মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে। অন্য সকল লেখকদের মত ইংরাজ লেখকদেরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তোমরা ভারতীয়রা জেমিগ্রীন এবং মিকির মত হইও না। নেপালের রাজা প্রভৃতির মত পোষা জানোয়ার হও। তবে দেশটা

যাদের, তাদের ঐরূপ ভাবে মুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। এতে মুহাম্মদ আলীর দেশবাসী মুহাম্মদ আলীর নামে গর্ব করবে যুগ যুগ ধরে। যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দেশের স্বাধীনতা আনয়নের সময়-গুলিতে তারা ইংরাজদের বাহবা পেলেও দেশের মানুষ তাদের 'কুইসলিং' ছাড়া আর কিছুই মনে করে না, করবে না।

দুর্গাসিংহের মত অশিক্ষিত নির্বোধ নিম্নশ্রেণীর ও নিম্নঘরের স্বাভাবিক বয়স্ক জোয়ান কি করে, কেমন করে জানল যে, এরা ইউরোপীয় ? যুদ্ধের পরে যে লোক দারওয়ানের কাজ করে, সে কি ধরনের বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক ছিল ? যেখানে ইংরাজ দুর্গের পছন্দ কর্মচারীরা পর্যন্ত একজন বা দুইজন এদেশীয় লোককে একাধিক দিনেও আলাপে কথা-বার্তায় ধরতে পারে নাই যে এই ফলের ব্যবসায়ী ইউরোপীয় নয়, এ দেশীয় বিপক্ষীয় দলের একজন কর্মকর্তা ব্যক্তি, যিনি ইউরোপীয় সেজে ইংরাজদের সেনা-বাসের গোপন তথ্য নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন, যেখানে শিক্ষিত ইংরাজ পদস্থ অফিসারগণ পর্যন্ত উক্ত এ দেশীয় গুপ্তচরকে ধরতে বা চিনতে এবং বুঝতে পারেন নাই, সেখানে দুর্গাসিংহের সকল কথা আমরা কিছুতেই হুবহু মানতে পারি না। আর না মানবার পেছনে যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি রয়েছে। এই ইউরোপীয়কে—তা ইংরাজ লেখকরা জানল না – জানতে পারল না, জানল দুর্গাসিংহ ইংরাজের পরবর্তীকালের এক দারওয়ান। যুদ্ধের মাঠে বসে ইতিহাস লেখা এবং ছাপানো হয় নাই। ইতিহাস লেখা হয়েছে যুদ্ধকালের পরবর্তী সময়গুলিতে। দশ, বিশখানি ইতিহাস ইংরাজরা ১৮৫৭-৫৮ সালের বিপ্লবময় সময়গুলি নিয়ে লিখে নাই। উক্ত সময়কার এত বেশী-ইতিহাস ইংরাজরা লিখেছে, যা দিয়ে একটা লাইব্রেরী হতে পারে। এ সম্পর্কে 'গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী' আলোচনা করতে গিয়ে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনী কান্ত গুপ্তের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "ইংরাজীতে এই একটা ঘটনা লইয়া এত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে যে, তাহাতে একটা লাইব্রেরী হয়।" একথা বলা বাহুল্য যে, ইংরাজদের ইতিহাস লেখা সম্পর্কেই উক্ত কথাগুলি বলা হয়েছে। উক্ত উদ্ধৃতি হতে বোঝা যাচ্ছে যে, ইংরাজ লেখকরা এ সম্পর্কে একটি পাঠাগার হওয়ার মত ইতিহাস নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু খোঁজ-খবর অনুসন্ধান না করে, তারা কি

সকলেই ইতিহাস লিখে পুস্তক আকারে ছাপিয়েছেন ? আরও ভাববার বিষয় এই, যে জনৈক ইউরোপীয়ের দলের সৈন্যরা সকলে তো আর হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি। সকলকে যুদ্ধে মেরেও ফেলা সম্ভব হয়নি। ইংরাজদের রাজ্যের চৌহদ্দির সীমানায় তাদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিল। সুতরাং যুদ্ধের পরবর্তীকালে তাদের নিকট হতে ঐ ইউরোপীয়ের সংবাদ পাওয়া ইংরাজ শাসক এবং গোয়েন্দাদের পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল কি ? জীবিত ইউরোপীয় যিনি ধরা পড়লেন না, তাঁর পরিচয় ইত্যাদি কথা ইংরাজ ঐতিহাসিক বেমালুম চেপে যাচ্ছে। আসল কথা হল, নখদর্পণে সবকিছু জানা ও গণা ইংরাজদের ছিল। কিন্তু পূর্বের ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মত এখানেও ঐ একই কৌশলের অবতারণা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত ইউরোপীয় ব্যতীত ভারতীয়রা কখনও এরূপ দক্ষতা নিয়ে যুদ্ধ করতে পারে না, এটিও ভারতীয়দের বোঝানো হয়েছে লেখার কায়দা ও কৌশল দেখিয়ে। "শয়তানের মত যুদ্ধ করেছে" এসব কথা কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক কি বলতে পারেন, না, লিখতে পারেন ? সুতরাং বিদেশীয়রা বিদ্বেষ নিয়ে ইতিহাস লিখেছে। এ সম্পর্কে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর উক্তি যেমনি প্রণিধানযোগ্য, তেমনি যুক্তিযুক্ত।

"ভারতে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস নানারূপ আধুনিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আজকের দিনের মোহ ও বিদ্বেষ দ্বারা আধুনিক ভারতের ইতিহাসের সত্যরূপ আবৃত ও আচ্ছন্ন। এই ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ভারতীয় ও ইংরেজ উভয়েই ভুল করতে পারে, যদিচ তাদের পরস্পরের ভুল হবে বিপরীতমুখী। সে সকল দলীল-দস্তাবেজ নথিপত্রের উপর নির্ভর করে ইতিহাস লিখতে হয় তার অধিকাংশই ইংরেজ-কর্তাদের হাতে গড়া, সুতরাং সে গুলির উপর ইংরাজ পক্ষপাত থাকতে বাধ্য। ইংরাজের হাতে পরাজয় ও তারপরে দেশের মধ্যে যে ভাঙ্গাচোরা অরাজকতার অবস্থা গেছে, তার ফলে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস বিহিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়নি। উপরন্তু যে সামান্য নথিপত্র ছিল তার অধিকাংশই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।"…

…"প্রকাশ করার দুঃসাহস হবে কি করে—প্রাণের ভয় তো আছে।"… "ইংরেজের চোখে যে শয়তান, ভারতীয়ের চোখে অনেক সময় সে দেবতার তুল্য। ইংরেজ যাদের খেতাব, ইনাম, জায়গীর দিয়ে সাগ্রহে সম্মানিত

করেছে, দেশের বেশীর ভাগ লোকের কাছে তারা দেশদ্রোহী। কুইসলিং ছাড়া আর কিছুই নয়।”…

…“আমেরিকান বিপ্লবের ইতিহাস ইংরেজ লিখেছে একভাবে, আমেরিকানরা লিখেছে আর একভাবে।”

…তাছাড়া যেসব ইংরেজ ভারতে এসেছিল তাদের সঙ্গে রাজনীতি-বা সামাজিক বিপ্লবের অতি সামান্যই সম্বন্ধ ছিল। তাদের বেশীর ভাগ লোক ছিল রক্ষণশীল দলের। এই রক্ষণশীল দল ছিল ইংলন্ডের সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের আস্তানা। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, তখনকার দিনে ইংলন্ডের মত এমন প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল একটা দেশ ইউরোপে খুব কমই ছিল।

—ভারত সন্ধানে, জওহরলাল নেহরু পৃষ্ঠা ৩১৭-৩২০

“দুর্গাসিংহ সিপাই বলছে যে, “অপর ব্যক্তি বেরিলীর সিপাহীদিগের সহিত দিল্লীতে উপস্থিত হয়।”

একথা আমরা মেনে নিতে পারি। কারণ বেরিলি মুজাহিদ আন্দোলনে ১৮৫৭ সালের পূর্বে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। সুতরাং বেরিলির সিপাহী বা মুজাহিদ দলের সঙ্গে উক্ত ইউরোপীয় দিল্লীতে উপস্থিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুর্গাসিংহ বলেছে যে, “সে স্বয়ং দুইজন ইউরোপীয়কে দেখেছে। একজন মিরাটের উত্তেজিত সিপাহী দলে ছিল। এই ব্যক্তি বুদলে-কা-সরাইর যুদ্ধে নিহত হয়।”

যিনি মারা গেছেন, তার কথা আর এখানে আমরা টেনে আনতে চাই না। তবু এটুকু বলা যায় যে, উক্ত মৃত ব্যক্তি যে ইউরোপীয় ছিলেন, এর কোন প্রমাণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা দিচ্ছে না। দুর্গাসিংহের বরাত দিয়ে কথাগুলি তারা বলে যাচ্ছে মাত্র। বেরিলির সিপাহীদলের সাথে দিল্লীতে যিনি উপস্থিত হন, তার কথাই এখন আমরা আলোচনা করব।

বলা হচ্ছে, “এই ব্যক্তি পদগৌরবে সেনাপতি বখত খাঁর অব্যবহিত নিম্নে ছিল।” উক্ত ইউরোপীয় পদগৌরবে বখত খাঁর অব্যহিত নিম্নে ছিলেন। যুদ্ধে অপূর্ব সাহস, কৌশল ও দক্ষতা দেখিয়েছেন। যিনি বখত খাঁ ফিরোজ শাহ অপেক্ষা সৈন্যদের অধিক প্রিয় ছিলেন, সেই লোকটি ইউরোপীয় হলেও কে—একথা যুদ্ধ-পরবর্তীকালেও ইংরাজ গোয়েন্দা এবং শাসকরা খুঁজে নিজেদের রাজত্ব করার মধ্য দিয়েও খুঁজে বের করতে পারল না—এ কেমন কথা? এ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তবে ইচ্ছা করে নানা স্বার্থে উক্ত সেনানায়ককে যে অপরিচিত করে রাখা

হয়েছে—এ কথা আমরা বিশ্বাস করি। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম কায়দা ও কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

তবে আমরা ঐ সময়কার (১৮৫৭—৫৮ সালের যুদ্ধ সময়কার) লোকদের নিকট যা শুনেছি তা হল এই যে, নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতি বখ্‌ত খাঁ প্রধান সেনাপতি ছিলেন না। সেনাপতি বখ্‌ত খাঁকে প্রধান সেনাপতি হিসাবে মেনে নেওয়া নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের শৃঙ্খলা-বোধ এবং মহত্বের পরিচয়ই রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে এও দেখতে পাওয়া যায় যে, সেনাপতি সরদার সিংহ, সেনাপতি ঘাউস খাঁ (গাউস উদ্দীন মোহাম্মদ) প্রমুখ বখ্‌ত খাঁকে সেনাপতি হিসাবে মেনে নেন নি। যা হোক, এসব কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে ইতিহাস-পাঠক অনেক ভদ্রলোকও রয়েছেন। অবশ্য ইংরাজদের ইতিহাসের উপর এসব ভদ্রলোকদের কোন আস্থাই ছিল না। বরং আমাদের আলোচ্য ঘটনাগুলির কথা উঠলে তাঁরা ইংরাজদের লেখার কথা শুনলেই নাক সিট্‌কাতেন। এমনকি কেউ কেউ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। এদের কথা হল, নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও তাঁর গোটা পরিবারের লোকেরা যুদ্ধে বিদ্রোহীদের উপর প্রবলভাবে প্রভাবশীল ছিলেন, জনপ্রিয়ও ছিলেন। সেই হিসাবে এ কথা বলা যায় যে, নাসিরউদ্দীনকে যে সিপাহীরা মানবে, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। নাসিরউদ্দীনের চেহারা কি রকম ছিল তাও তাঁরা অনেকবার বলেছেন। ইনি লম্বা ধরনের ছিলেন কিন্তু খুব লম্বা ছিলেন না। না পাতলা, না মোটা—এই হল শরীরের গঠন। গায়ের রং একেবারে সাদা সোনালী, মস্তক স্বাভাবিক, কিঞ্চিৎ লম্বাটে নাসিকা উন্নত স্বাভাবিক লম্বা। চক্ষু দুইটি কটাযুক্ত বড় আকারের ছিল। মাথার চুল অনেকটা সোনালী বরণের ছিল। চুল আলবার্ট-কাটা ছিল। বক্ষস্থল উন্নত এবং সুদৃঢ় ছিল। হস্ত না মোটা না লম্বা এবং দৃঢ় পেশীযুক্ত। যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। কাঁধের নিম্নভাগ দিয়ে পৃষ্ঠে যুদ্ধের সময় বন্দুক ঝুলানো থাকত এবং কোষবদ্ধ তরবারী কটিদেশে ঝুলানো অবস্থায় থাকত। ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত থাকলে নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদকে, অচেনা লোক ইউরোপীয়ই মনে করতেন। পায়ে দৃঢ়কায় জুতা থাকত। ইনি খুব নম্র হলেও কথা কম বলতেন। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। যুদ্ধ-পূর্ব সময়ে এবং যুদ্ধের পরেও যারা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদকে দেখেছেন তাঁর আত্মীয় প্রতিবেশী এবং কর্মচারী

হিসাবে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হচ্ছেঃ আমীর খাঁ, বেগম শাহবানু চৌধুরাণী, শরিতুল্যা সরদার, খড়িয়া বরকন্দাজ, শহর উল্যা সরকার, নবানু ফকির, মতিউল্যা সরকার, ইজ্জত উল্যা শেখ, কলম বরকন্দাজ, দিলু মামুদ, রকিবুল্যা বরকন্দাজ, জহীরউদ্দীন সরকার, ডাক্তার মোজাম্মেল হক, সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, সাদাতুল্যা মুন্সী—এমনি ধরনের আরও অনেক প্রাচীন লোকদের নিকট আমি ছোটবেলা হতে ২০ বছর বয়স অবধি বা তার উপরে শুনে এসেছি কারও কারও নিকট। তা ব্যতীত জহুর ফকির ও তৎবংশীয়দের গানগুলিতেও যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতেও বেশ বোঝা যায় নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদকে যে ইউরোপীয় বলা হচ্ছে তা বুঝতে আর কষ্ট হচ্ছে না। ইংরাজরা ইচ্ছাকৃতভাবে সবকিছু জেনে-শুনেও নাসিরউদ্দীনকে ইউরোপীয়রা বারবার চেষ্টা করে এসেছে তাদের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। এ স্থানে আমরা জহুর ফকিরের ছড়া গানের কিছুটা উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্যগুলি প্রমাণ করব। গানগুলি হলো এইঃ

আরো একনা গান ভাই শুন দিয়া মন।
নওয়াব নসীর জঙ্গের কথা করিব বর্ণন।।
গান করিলাম শুরু এখন মন কর স্থির।
চৌদিকে সব্বাই বলে সাব্বাস সাজাদা নসীর।।
মারাঠি নানাজী আর মোগল নসীর বীর।
লড়াই করিল ইংরাজের সনে দিল ভাই শির।।
...সাহেবী লেবাছ আর সোনার টুপি মাথায় দিয়া।
ছাউনী ছাউনী ঘোরে নসীর ফিরীঙ্গি সাজ নিয়া।।
তার মত কামান চালায় সাধ্য আছে কার।
যথা ইচ্ছা তথা মারে নওয়াব জোরওয়ার।।
ছুরৎ নুরানী তার যেন বা রাঙ্গা সোনা।
ফিরীঙ্গি সাজ নিলে সাজত ইংরাজ সেনা।। ...

যেখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুহাম্মদ আলী ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর সঙ্গের লোককে খাস ইংরাজ সেনানায়করা তাঁবুতে যাওয়া-আসা ও কথাবার্তা বলার মধ্যেও কিছুতেই চিনতে পারেন নি, আর দুর্গাসিংহ নামক একজন সাধারণ সিপাই চিনল যে, এরা ইউরোপীয় ছিল, এ বড় আশ্চর্যের কথা। দিল্লী অবরোধকালে কথিত ইউরোপীয়ের কামান চালনার ভার ছিল।

এও দুর্গাসিংহ দেখেছে। কামান কোথায় কিভাবে সন্নিবেশ করতে হবে তাও দুর্গাসিংহ দেখেছে। ১৪ই সেপ্টেম্বর এই ব্যক্তি অপূর্ব পরাক্রমের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন তাও দুর্গাসিংহ দেখেছে। দুর্গাসিংহ বিদ্রোহী এক-দলের সাধারণ একজন সিপাই মাত্র। সে ইংরাজদের নিয়োজিত গুপ্তচর ছিল না তথাপি উক্ত ইউরোপীয়কে অনুসরণ করে চলছে। দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পর উক্ত ইউরোপীয় জোয়ান মথুরায় যান। তখন নবম সংখ্যক সিপাহী দলের সিপাই দুর্গাসিংহ পূর্বের মত উক্ত ইউরোপীয়কে মথুরায় দেখেছে। সেনানায়ক বখ্‌ত খাঁ প্রিন্স ফিরোজ শাহ্‌র মধ্যে বিবাদ বাঁধে সৈন্যদের শৃংখলা সম্বন্ধে। তাও দুর্গাসিংহ দেখেছে। শাহযাদা ফিরোজ শাহ ও বখ্‌ত খাঁ অপেক্ষা উক্ত ইউরোপীয়কে সিপাইরা অধিক মান্য করত—এসব খবরও দুর্গাসিংহ জানত। অতঃপর দুর্গাসিংহ এঁকে দেখতে পায়। রুইয়া হতে উক্ত ইউরোপীয় বেরিলীতে যায়। সেখানেও দুর্গাসিংহ তাকে দেখেছে কি? আসলে উক্ত ইউরোপীয়ের ছায়া ছিল দুর্গাসিংহ। নবাবগঞ্জের যুদ্ধে বখ্‌ত খাঁ শহীদ হলে অনেক সিপাহী নেপালে যায়। যা হোক উক্ত ইউরোপীয় পুনর্বার সিপাহীদের যুদ্ধ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং ব্যর্থ হয়ে বলেন, "আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমি কোথায় যাব" এসব কথাও দুর্গাসিংহ শুনেছে। ইংরাজ ঐতিহাসিক তার সাজানো কথা দিয়ে তাদের জানা ঘটনাগুলিকে দুর্গাসিংহের নামে বলেছে। যুদ্ধে জয়ী-সাম্রাজ্যবাদীরা সবকিছুই জানত এবং জেনে শুনেও শাহযাদা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর যোগ্য পৌত্রকে এভাবে ইউরোপীয় সাজিয়ে ঢেকে ফেলবার এক হীন ও ঘৃণিত চেষ্টা করে এসেছে। এই হীন ষড়যন্ত্রগুলি যাতে আর দেশবাসী ও বিশ্ববাসী জানতে না পারে, তারই জন্য রঙ্গপুরের ঐতিহাসিক লেখকদেরও মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল চিরদিনের মত করে।

এখানে আমরা জহুর ফকির ও তাঁর বোন আছিরনের গানের উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি :

জহুরউদ্দীনের ভণিতা[1]

মুই তো জহুর কথায় কাহুর মোর নাই গিয়ান,
থাকোঁ মুই বিল বাচুয়ার উপর বাড়ী মহিষ বাতান।

---

[1] কেয়াম উদ্দিন মণ্ডল, বয়স ৯০ বৎসর, গ্রাম তিলক পাড়া, থানা মিঠাপুকুর, জেলা রঙ্গপুর। ৯।৬।৫৭ তারিখে তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থ থেকে নকল করে আমাকে দেন। ১৩১৯ সনে মণ্ডল সাহেব ছড়া গানগুলি সংগ্রহ করেন।

আছিরনের ভণিতা

রাজ বাড়ীর কাছে আমার বসতি,
বাপ মোর নাম রাখিলেন আছিরন সতী;
মুই বড় ভাগ্যহীনা ভাই জহুরদ্দি।

"বিছমিল্লা বলি নিব নাম আল্লা আর নবী,
মন দিয়ে শুন সবে চৌদ্দ বৎসর আগের কবি।
মধুলী গড়ের কেচ্ছা কিছু বলিতে চাই ভাই,
সেখ্না কেচ্ছা সক্কলকে আগে বলিয়া শুনাই।
নওয়াব বাকের মির্জ্জা নুরউদ্দিন জঙ্গ বাহাদুর,
সুবাদার হইয়া আইল বাঙ্গেলা মশহুর।
নওয়াব মুর্শিদাবাদের বড় দুশমন আছিল,
তে কারণ মজনু শা নাম তার রটনা করিল।
মসিমপুর নওয়াব গড় নির্ম্মাইল।
মঘুলী গড় নাম তার ঘোষণা করিল।
মুঘলী গড়ে রণ দিল রাজা রামু নারায়ণ,
দিন দশ যুঝি দুশমন পালাইল তখন।
নওয়াব মুর্শিদাবাদের আর ইংরেজ নস্কর,
নড়াই[1] হারি পালেয়া গেল কলিকাতা শহর।
সে তো শাহাজাদা, তাকে রোক্কে[2] সাধ্যকার,
ইংরাজ পশ্চিমা সেনামারি করিল একাকার।
সেই শাহজাদার পুত্র কামালউদ্দিন একজন,
তাহার বাড়ী নুট[3] করিল শুন দিয়া মন।
জমপুর[4] জেলা মাঝে ফুলচৌকি গ্রাম,
তথায় বসতি ছিল চদুরী[5] কামাল উদ্দীন নাম।
সেই কামাল উদ্দিন জমিদার হাজার কি একজন,
তাহার বাড়ীতে ডাকু পইল শুন বিবরণ।

---

[1] যুদ্ধ।

[2] বাধা প্রদান করা।

[3] লুট।

[4] জঙ্গপুর। বর্তমান রংপুরকে পূর্বে জঙ্গপুর বলা হত। কারণ এখানে মোঘল, রাজবংশীয় কামাল ও তৎবংশীয়দের রঙ্গমহল, কুঠি, শিশ মহল প্রভৃতি ছিল।

[5] চৌধুরী।

দিন সন্ধ্যা খাটিয়া গেল রাইতের দুই পহরে,
শোল্লক[১] কহিয়া ফিরিঙ্গী ডাকু রাজ পুরী ঘেরে।
একতালা দুই তালা ভাঙ্গি কল্ল[২] খান্ খান্,
টাকা করি লইল বাতশাল বানাতের থান।
ঝুট শিং এ কয়বা কথা, এতেক কাঁহা গোল,
ডাকু বলে চুপরে বেটা ! কামাল কাঁহা বোল।
এই কথা কহিয়া ইংরাজ ডাকু কতেক পুরীত ঢুকিল,
আর কতেক ডাকু ভূত বহিরে রহিল।
পুরীর ভিতর যেন ভূই কম্প[৩] চলিল,
তনহীন সেরাজউদ্দিন বক্‌সী ছিল।
তার ভাই গলায় ছিল জকা[৪] কাশ,
খিরকী পার হইতে তার দমের নাই আশ।
জয়ের উদ্দিন রহীমুল্লা বক্সী বলে ভাই কি করি উপায়,
ডাকুদের হাতে বুঝি প্রাণ মারা যায়।
দুই বক্‌সী বুদ্ধি করি বাঁচি কোন কলে,[৫]
আমরা দুই জন যায়া নুকাই[৬] তক্তপোষের তলে।
কতেকক্ষণ পরে ডাকু সব বাহিরে বারাইল,
একত্র হইয়া ডাকু শোল্লক কহিল।
শোল্লক কহিয়া ডাকু সব চলি গেল,
যেখানে যে লুকাইয়া ছিল সকলে বাহির হৈল।
কি কব সে ডাকাতির কথা কহা নাহি যায়,
যেই শুনে সেই পস্তায় করে হায় হায়।
তার পরে শুনো ভাই বাড়ীর ঘটনা,
একে একে করি আমি তাহার বর্ণনা।
বাড়ীর ভিতর এমন লুঠ পাট[৭] করিছিল,
১৮৩ মোহর আঙ্গিনায় পড়ে ছিল।

---

[১] কমাণ্ড।
[২] করিল।
[৩] ভূমিকম্প।
[৪] যক্ষা।
[৫] কৌশল।
[৬] লুকাই।
[৭] লুটতরাজ। ভিতরে দিকে পাঁচ ইট গাথ্‌নী ছিল।

রাজপুরীর এমন দশা হইল,
তিন বছর ইংরাজ ডাকু ঘিরিয়া রহিল।
পাত্তর দিয়া বান্দা যত কব্বর ছিল,
একে একে সব ভাঙ্গি গুড়া করি দিল।
ছঙ্গে মর্মরের যত গাঁথুনী আর মাজিয়া আছিল,
ছাব্বল মারি তাহা ভাইরে দূরে ফেলি দিল।
ধনমাল নিল ভাইরে সোনা আর চান্দি,
কর্তার বাড়ীত ছিল ১৭ জন বান্দি।
তার পরে শোন ভাই চাকরদের কথা,
বাড়ীর চৌদিকে ভাই বাসা যথা তথা।
কোন চাকর কোন কাজ করে কে করে শুমার,
পুরির ভিতর যেন সদা গুলজার।
তার পরে শুন ভাই খাবার সরঞ্জনা,
বাসন কোসন ছিল সব চান্দি আর সোনা।
চান্দির হুক্কা চান্দির কল্কি চান্দির ঢাকনা চান্দির ও
গোলদানী,
সোনার নলে খায় খোশ্বু তামাক লোকে করে কানাকানি।
কুরসীতে বসিয়া রাজা যখন খাইত তামাক,
সুগন্ধি শুঙিয়া[1] লোকে হইত অবাক।
সমবারে বেসদবারে কাচারিত বসিয়া বিচার করে লোকজন
নিয়া;
আসামী ফৈরাদীর জবান বন্দী নেয় হাসিয়া হাসিয়া।
সাক্ষী প্রমাণে যদি দোষী সেই হয়,
দরবারের লোক নিয়া তাকে সেই শাস্তি দেয়।
খাট পালং চে'র[2] সোনাচান্দির কাঠ রূপার কথা কি বলিব ভাই,
দুই শত আড়াই শত গাড়ী তাতে ঠেকা নাই।
গ্রামের নাম ফুলচৌকি বাড়ী যেন ইন্দ্রপুরী,
রাজরানী দাসী বান্দী যেন স্বর্গের বিদ্যাধরী।

---

১. শুঁকিয়া।
২. চেয়ার।

বাড়ীর চৌদিকে ভাই কত দীঘি আছে,
ভরা পূর্ণ সব দীঘি নানা জাতি মাছে।
বড় দীঘির ছিল তিন পাকে ঘাট,
পূর্ব পাকে লাগাইয়াছিল কোকিল জঙ্গী[১] হাট।
দুই পাকে চাইয়া দেখ পানির সরোবর,
পাহাড় থাকি কাটি আনছে সেই নহর।
বড় ছোট কত ঝরণা ফোয়ারা কে করে শুমার,
রাজপুরীর চৌদিকে যেন ইন্দ্রের বাজার।
কি কব রাজপুরীর কথা কহা নাহি যায়,
সাজিয়া আছে ইন্দ্রপুরী যেন মনে হয়।
মোগল বাদশার গনাগন পুরির মধ্যে থাকে।
কুর্নিশ করি যায় আইসে দরবারে সব লোকে।
সুবাদারের বেটা বেটির কথা বলিব এখন,
কুলাভর্ত্তি ধান দিয়া শুন মাও লক্ষ্মীগণ।
কামাল জামাল দুই পুত্র ছিল,
লালবিবি চান্দবিবি কন্যা আছিল।
আর কেহ লইবে নাম ভাই বেগম ছাহেবার,
তার ভিটায় ঘুঘু[২] চরবে বইলেছে কোম্পানী সরকার।
সে লালবিবি জননী যে দিল্লীর ঈশ্বরী,
বাদশা আকবর শাহার বিয়াস্তী স্ত্রী।
ইংরাজ হারামজাদা ডাকাইতের সর্দ্দার,
গাঁয়ে ঘুরিয়া কহে নাম কেহ লইও না মজনু কন্যার।
যাহার জন্য হায় তামাম দেশের লোক কান্দেরে,
নিষ্ঠুরে গুলি করি মারিল মিরগঞ্জ বন্দরে।
লাল বিবি বলে আল্লা মোকে শহিদ কবুল কর,
দোয়া কর দেশের লোক ফিরিঙ্গীকে না ডর।

---

[১] এই স্থানে বিপুল ধুমধামের সহিত 'বেরা' নামক এক উৎসব হতো। এখন হতে মাত্র ১০/১২ বৎসর হয় ঐ উৎসব উঠে গেছে।

[২] বিনাশ করে দেওয়া।

আরে বাহে ![১] জানেন নাকি বাহাদুর শার জননী লাল বিবি মাই
হামাক নুন মরিচ দিয়া চাইরটা পান্তাভাত দেন নাই।
এই গুলা কেচ্ছা তোমরা আর শুনবার চান,
মিঞার বাড়ীতে যায়া শুনি খান গুয়া পান।
আর ঢাল নারিকেল আমজাম বাগানে কত গাছ আছে,
গরীব দুখিনীর ছেলেরা ভাই তাই খাইয়া বাঁচে।
দিন গুজারিয়া সন্ধ্যাকাল পড়ে পুরীর মাঝারে,
সরিষ্যার তেল বাতি জ্বলে ঘরে ঘরে।
সেই কালের কথা কি বলিব হায়,
ত্রিশ সের তেল দিন বাতিত পোড়ায়।
ঘরের ভিতর আসবাব ছিল থাকে থাক,
রেশমী পশমী জরি শাল বানাত।
তামা কাঁসার কথা কিছু না বলিব ভাই,
বাড়ীর বাহিরের কথা সক্কলকে জানাই।
বাড়ীর দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখ শত্তটা হাতী বান্দা আছে,
সেই হাতীর চাকুরী করি মাহুত সব বাঁচে।
বকর মাউতের ঝাউলি হাতি অলি মাউতের হাতীর নাম হীরা,
সেই হাতীর নিকটে যাইতে মাহুত কাড়ে কিরা।
আর এক হাতী ছিল নাম তার গণেশ,
দোছা নামে মাহুত ছিল হাতী সাদা বেশ।
শত্ত হাতী তিন শত্তটা মাউত ছিল,
উত্তর দিকের কথা এখন বলিতে হইল।
নীল চিনি রেশম লোহার কারখানার নেকা জোকা নাই,
কিষান পাইটে কারখানাও খাটে কি বলিব ভাই,
পশ্চিম দিকের কথা এখন কিছু বলিয়া জানাই।
পশ্চিম দিকে রাস্তার ধারে পাকা মজিদ আছে,
দিন রাইতে মৌলভী পাঁচ বেলা আজান হাঁকে।
নামাজ পড়ে জামাত করিয়া,
গোষ্ঠি কুটুম্বের বাড়ীত যায় পালকিত চড়িয়া।

---

[১] বাবা হে অর্থাৎ হে বাবা।

প্রজা পাইটে আসে যদি দেখা করিবারে,
মধু মাখা কথা কয় কোকিলের স্বরে।
সেত নওয়াব জাদা[১] বড়ই সাদা চন্দ্র লেখা মুখ,
ফকির মিছকিন গরীব দেখ্‌লে দুঃখে ফাটে বুক।
সেত বুক ফাটে নিজে হাঁটে গরীবের বাড়ীত যায়,
টাকা পয়সা আধ্‌লী সিকি গরীবকে বিলায়।
শুন দিয়া মন মৃত্যুর কিচ্ছা এখন করহে শ্রবণ;
একদিন নওয়াব জাদা শ্বশুর বাড়ী যায় পাল্‌কিত চড়িয়া,
নকীব সঙ্গে যায় নাম ডাকিয়া ডাকিয়া।
সম্মুখে ডাকিয়া কাগ[২] ডাকে ঘনে ঘন।
কাগের ডাকে রিদয়[৩] ফাটে কি বলিব হায়,
বেহারা পালকি সহ করিল বিদায়।
জমপুর থাকি বেহারা ফিরিয়া আসিল,
তিন দিন পরে তার মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।
রাজবাড়ীর ভিতরে যেন কেয়ামত[৪] নাজেল হইল।
কে কোথায় কান্দে করে হায় হায়,
মাটিত পড়িয়া বেগম ধুলাত লুটায়।
এই রকম করি রাজপুরীত রোল পৈল,
এ বাড়ীর ও বাড়ীর[৫] লোক সব জমা হইল।
সকলের মাথে যেন বজ্রাঘাত পইল।
তারপরে শুনহে সবায় শাজাদি গেল পালকিত চড়িয়া,
কেহ গেল ঘোড়া দাবারিয়া অবশিষ্ট লোক গেল পায়ে দৌড়িয়া।

---

[১] সুবাদার নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর পুত্র শাহযাদা কামালউদ্দীন।

[২] কাক।

[৩] হৃদয়।

[৪] মহাপ্রলয়।

[৫] শাহাযাদা কামালউদ্দীন ও জামালউদ্দীনের বাড়ী।

মওলানা কেরামত আলী

এখন আমরা মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী পীর সাহেব সম্পর্কে কিছু বলব। ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলবী সাহেবের খলীফা ছিলেন। মওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়-ও সৈয়দ আহমদ সাহেবের খলীফা ছিলেন। এঁরা সকলেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিলেন, তা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। সৈয়দ আহমদ সাহেবের উক্ত খলীফাত্রয় বাংলার প্রতি জেলায় নানাভাবে নানা কায়দায় ইংরাজ বিরোধী বাণী দিয়ে ও সংগঠন করে বেড়িয়েছেন। কখনও প্রকাশ্যে, কখনও বা ধর্ম প্রচারের নাম করে। আমি ফুলচৌকি নিবাসী কফিলউদ্দীন ফকির (৮২ বৎসর বয়স) সাহেবের নিকট শুনেছি যে, তিনি তাঁর পিতার নিকট শুনেছেন, মওলানা কেরামত আলী সাহেব ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মাথার পিছন দিকে তলোয়ারের আঘাত পেয়েছিলেন। সে জন্যে তাঁর মাথার পিছন দিকে আর কখনই চুল গজায় নি। রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে রংপুরের আলমনগরস্থ মওলানা বক্‌স মিঞার বাড়ীতে এবং মওলানা সাহেবের মাযার ও মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত, উক্ত স্থানে বহু লোকের সম্মিলনে উরস শরীফ হয়। উক্ত উরস শরীফে মওলানা কেরামত আলী সাহেবের বংশধরগণ মওলনা বক্‌স মিঞার বাড়ীতে উক্ত উরস উপলক্ষে আসতেন। যা হোক, আমি ও অধ্যাপক কবি মুফাখখারুল ইসলাম সাহেব উক্ত মওলানা সাহেবানের নিকট যাই। আমরা কথা প্রসঙ্গে তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করি যে, মওলানা কেরামত আলী সাহেব ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় ইংরাজদের বিরুদ্ধে ছিলেন কি না? তাঁদের মধ্যে দুজন বলেন, "হ্যাঁ, ইংরাজদের বিপক্ষে মওলানা কেরামত আলী সাহেব ছিলেন। সেই অপরাধে তাঁকে ফাঁসি মঞ্চের কাছে পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসি দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুইজন ইংরাজ সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলা ছুটে গিয়ে মওলানা সাহেবকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'ইনি অমাদের জীবন বাঁচিয়েছেন।' সুতরাং তাঁকে আর ফাঁসি দেওয়া হয় নি। পরে ইংরাজরা খোঁজ করে দেখে যে, মওলানা সাহেব অন্যায়ভাবে কোন মহিলা, শিশু ও বেসামরিক ইংরাজদের মারবার জন্য কোন রূপ হুকুম দেন নাই। এর পরে তাঁকে ইংরাজরা ছেড়ে দেয়। আমাদের কথা

হল, মওলানা কেরামত আলী সাহেব ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের পর হতে তাঁর মনের অবস্থা অন্যরূপ হয়। যার ফলে তিনি বলেছিলেন, "ভারত বর্ষ দারুল ইসলাম নয়, দারুল হরবও নয়।" তিনি বললেন, "ভারতবর্ষ মুসলমানদের পক্ষে দারুল আমান" অর্থাৎ মাঝামাঝি স্থান। এইসব ও আরও এই ধরনের ফতওয়া দেওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা তাঁর উপরে খুবই খুশী হন।

এখানে আমরা মওলানা কেরামত আলীর উত্তর পুরুষ মওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরীর উর্দুতে লেখা এবং মৌলবী ইছমত আলী-এম. এ. সাহেব কর্তৃক বাংলায় অনূদিত মওলানা কেরামত আলী সাহেবের জীবনী হতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

> ১৮৫৭ ইং সনের বিদ্রোহের সময় মাওলানা সাহেব দুইজন উচ্চ বংশীয় ইংরাজ মহিলাকে হত্যার হাত হইতে রক্ষা করেন এবং নিজে আশ্রয় প্রদান করেন। দুইজন নেতা ডব্লিও. এফ. লেগ ও আর. এম. এডওয়ার্ডস উপরোক্ত ঘটনাটিকে তাদের নিজের লেখায় নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ মওলনা কেরামত আলী সাহেব ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের সময় জৌনপুরের দুর্গের মধ্যে দুইজন ইংরাজ মহিলাকে বেনারস হইতে ইংরাজ সৈন্য জৌনপুরে না আসা পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। মওলানা সাহেব মানবতার বিশেষ রক্ষক ছিলেন। বিদ্রোহ শেষ হওয়ার পরে ঐ দুইজন ইংরাজ মহিলা সরকারী কর্মচারীদের নিকট মওলানা সাহেবের সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারের কথা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ইংরাজ সরকার মওলানা সাহেবকে উহার পরিবর্তে রাজা এদারাৎ জাহানের জমিদারিটি (যাহা গভর্নমেন্ট দখল করিয়াছিল) পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি উহা কবুল করিলেন না। কেননা মওলানা সাহেব এবং তাঁহার বংশধরদের পক্ষে ইহা প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।[১]

আপনারা অবগত আছেন যে, মওলানা কেরামত আলী সাহেব রংপুরের নানা স্থানে বহুবার সফর করেছেন। মওলানা কেরামত আলী সাহেবের পীর সৈয়দ আহমদ বেলরেবী সাহেব কামাল মোহাম্মদ ও তৎবংশীয়দের

---

[১] মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেবের জীবনী, মওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী প্রণীত। অনুবাদক মৌলবী ইছমত আলী এম. এ.। পরিচ্ছেদ ইংরেজী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ : দুইজন ইংরাজ মহিলাকে আশ্রয় প্রদান, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

পীর ছিলেন। শোনা যায়—সৈয়দ আহমদ সাহেব দুবার ফুলচৌকিতে এসেছিলেন। যুদ্ধের পরেও মওলানা কেরামত আলী সাহেব দু-একবার করে ফুলচৌকিতে প্রতি বৎসর আসতেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিন বৎসরের মত নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও বেগম আর তাঁদের তিন পুত্রকে নিয়ে তিনি নানা স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন মওলানা কেরামত আলী সাহেবের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী। এও শোনা গেছে যে, শাহাযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ বেসামরিক ইংরাজ ও নারী ও শিশুদেরকে মারবার হুকুম দেন নি।

যাহোক, তীক্ষ্ন বুদ্ধিওয়ালা মওলানা সাহেব ইতিমধ্যে ইংরাজদের নিকট খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। মওলানা সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও তাঁর বেগম আমিরন নেছা (আজিজন) ও নাবালক পুত্রত্রয় ইংরাজদের ফাঁসি হতে রক্ষা পান বটে। তবে স্ত্রীদের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সব কিছু ইংরাজরা বাজেয়াপ্ত করে নেয়, শুধু মুল বালাখানাটা রেখেছিল। কিন্তু নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের মৃত্যুর পর সে প্রাসাদটিও আর ইংরাজরা আমিরন নেছা ও তাঁর পুত্রদের মধ্যে দুই ছোট পুত্রকে বাস করতে দেওয়া হয় না। নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের কবর দর্শন করতে ফুলচৌকিতে গিয়ে মওলানা কেরামত আলী সাহেব ফুলচৌকি মসজিদের প্রথম দরজা বন্ধ করেছেন। এইজন্যই যে, গেটের সামনেই কবর দেওয়া হয়েছিল। কবর পাড়িয়ে মসজিদে ঢুকতে হত বলে এই মওলানা সাহেব এটা করেছিলেন। ইংরাজ শাসকদের নির্দেশে ঐ ভাবে কবরস্থ করা হয়েছিল। যাতে করে কবরগুলির কোন চিহ্ন আর না থাকে। যা হোক, মওলানা সাহেবের নির্দেশেই আর একটি নতুন গেট করে সেই দিক দিয়ে এখন অবধি মসজিদে লোকজন যাওয়া-আসা করেন। এ না বললেও চলে যে, সুবাদার শাহাযাদা বাকের জঙ্গ হতে নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ পর্যন্ত সকলের কবর জমিন বরাবর সমান এবং নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ইংরাজদের হুকুমে লোকের দৃষ্টিতে না পড়বার জন্য নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের দুজন বিশিষ্ট বন্ধু, রাজা ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেব ও তাঁর মন্ত্রী আজিমুল্যা সাহেবও ফুলচৌকি বালাখানায় গোপনে থেকে ইহলীলা ত্যাগ করেন। এ সব কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ সিপাহী বিপ্লবের ৭ বছর পর ইহলোক ত্যাগ

করেন। তাঁর এক স্ত্রী—আমিরন নেছা, তিন পুত্র নেহালউদ্দীন—মুহাম্মদ, নেজামউদ্দীন মুহাম্মদ, লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ, তাঁর কন্যার নাম অজ্ঞাত।

আমিরন নেছা (আজিজন)

এখন আমরা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের একমাত্র বেগম আমিরন নেছা এবং ইংরাজদের কথিত 'আজিজন' সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে আমিরন নেছা (আজিজন) এর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

> ষড়যন্ত্রকারিগণ, আপনাদের বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে নানা সাহেবকে বিমুগ্ধ করুক বা না করুক নৌকায় আত্মগোপন করিয়া কার্যপ্রণালীর অবধারণে উদ্যত হউক বা না হউক, তাহাদের কেহ কল্পনার সম্মোহন ভাবে ও আশার তৃপ্তিদায়ক মন্ত্রে প্রফুল্ল হইয়া বিলাসিনী প্রণয়িনীর নিকটে আত্মগৌরব প্রকাশ করুক বা নাই করুক, জুন মাসের প্রথম চারি দিন যে, অশ্বারোহী দলের উত্তেজিত সিপাহীগণ আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে ইতিহাসের নির্দিষ্ট আছে।
>
> কথিত আছে, আজিজন নামে একটি বারবিলাসিনী দ্বিতীয় দলের অশ্বারোহীদিগের প্রিয় পাত্রী ছিল। সমস উদ্দীন নামক একজন সোয়ার তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহে, দুই একদিনের মধ্যেই নানা সাহেব সর্বময় কর্তা হইবেন। আমরাও তোমার গৃহ মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিব।—Trevelyan Cawnpur P.89
>
> ...ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইলে উত্তেজিত মুসলমানেরা ফিরিঙ্গীর শোনিতপাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। পরদিন অর্থাৎ ৮ই জুন সোমবার গঙ্গার খালের দক্ষিণে মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হইল। মুসলমানের সম্মানিত পুরোহিত ঐ পতাকার নিম্নভাগে উপবিষ্ট হইয়া বিধর্মীর পরাক্রমনাশের জন্য, বিজয়িনীর শক্তির উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহীদলের প্রণয়িনী আজিজন যুদ্ধবেশে বিভূষিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে লইয়া, উক্ত আরাধনাস্থলে যাইতে কুন্ঠিত হয় নাই।...

ননী নবাব নামক একজন ধনী মুসলমান এই স্থানের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে হিন্দু সিপাহীরা ইহার ও বাকর আলী নামক আর

> একজন মুসলমানের গৃহ বিলুণ্ঠিত করে। ননী নবাব ও বাকর আলী উভয়েই কারারুদ্ধ হয়েন। মুসলমান সিপাহীরা এজন্য বিরক্ত হওয়াতে উভয়েই মুক্তিলাভ পূর্ব্বক নানা সাহেবের সমান সম্মান লাভ করেন। কথিত আছে, এই অবধি ইঁহারা উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক করেন। আজিজন অস্ত্র পরিগ্রহপূর্ব্বক এই স্থানে কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বারোহীদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। প্রাচীরের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মীর নবাব আপনার কামান স্থাপিত করিয়া, নিরন্তর গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্ব্বদিকে বাকর আলী সন্নিবেশিত কামানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।[১]

ইংরাজ লেখকরা বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিয়ে কত মিথ্যা বলেই না কলম ও শাসনকার্য চালিয়েছে, তার হিসাব কে করে ? সুখের বিষয় এই যে উপরোক্ত ইংরাজ ঐতিহাসিকদের কথাগুলি-ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় সত্য বলে মেনে নিতে পারেন নি। আমরাও তদ্রূপ মেনে নিতে পারছি না। রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বলেছেন, "বিলাসিনী প্রণয়িনীর নিকট আত্মগৌরব প্রকাশ করুক বা নাই করুক।"

গুপ্ত মহাশয়ের ইতিহাস লেখার নানা বাধা-বিপত্তি যাঁরা অবগত আছেন এবং ঐ সময়কার দেশের অবস্থা যারা ওয়াকিফহাল রয়েছেন, তাঁরা ঐতিহাসিক গুপ্ত মহাশয়ের উক্ত নম্রভাবে অস্বীকারকে, কেউই ছোট করে দেখবেন না। এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আরও ভাববার ও যুক্তিযুক্ত কথা হল. মুসলমানের সম্মানিত ধর্মীয় পুরোহিত সবুজ পতাকার নিম্নে উপবিষ্ট হয়ে যুদ্ধজয়ের আশায় যেখানে কুরআন শরীফের আয়াত অথবা হাদীস শরীফ পাঠ করে দোয়া দরুদ পড়ছিলেন, সেখানে একজন বারবিলাসিনী যায় বা যেতে পারে কি করে। তাও আবার "অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়ে নিষ্কোশিত তরবারী হস্তে লয়।" এই সব মিথ্যা কথার প্রতিবাদ ছাপাবার উপায় এ দেশীয়দের তখন ছিল না। তাছাড়া "ননী নবাব" লোকটি কে ছিলেন, এর উল্লেখ বিজয়ী ইংরাজ লেখকরা করেন নি। তবে বেগম আমিরন নেছা মহোদয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নেহালউদ্দীন মুহাম্মদ। যুদ্ধ সময়কালে এর বয়স ১৪/১৫ বৎসর ছিল বলে জানা যায়। আবার 'বাকর

---

[১]. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস: শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত, তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, কানপুর, পৃষ্ঠা—১৬০-১৬১-১৭৯-১৮০-১৯৩।

'আলী' এই লোকই বা কে ছিলেন ? নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদের নামে কি সে সময়ে কানপুরে কোন কারবারের কুঠি ছিল ? নানা সাহেব একজন বিখ্যাত দেশীয় রাজার সন্তান এবং তার অর্থ-সামর্থ্য ও শক্তির কথা সবাই জানেন। তথাপি ননী নবাব ও বাকর আলী—উভয়েই নানা সাহেবের সমান সম্মান লাভ করেন। এ কেমন কথা ? যতবড় ব্যবসায়ী হোক না কেন, সে কি করে রাজার সমান মর্যাদা লাভ করে ? আমরা কিন্তু নানা সাহেবের সমান মর্যাদা লাভ করা দুজনকে, অন্য কোন রাজবংশীয় সম্মানী সম্ভ্রান্ত লোক বলে মনে করছি। যদিও আজ এ সম্পর্কে একটা সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে আমিরন নেছার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অন্য দুই পুত্র দুজনই মায়ের সঙ্গে ছিলেন—যুদ্ধ সময় ও পরবর্তীকালেও। বিদ্বেষভাব নিয়ে মনের ঝাল মিটাবার জন্য। বীরাঙ্গনা বেগম আমিরন নেছাকে যত কুৎসিতভাবে চিত্রিত করা হোক না কেন, ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ বিচার ও বিশ্লেষণে তা ধরা পড়ে যায়, সেকালে শুধুমাত্র "কথিত" নাম দিয়ে আর যাই লেখা যাক ইতিহাস লেখা চলে না। ট্রেভেলিয়ান (Trevelyan)-এর লেখকের আজিজন ও জহুর ফকিরের আমিরনের গানগুলি পড়লেই বোঝা যাবে যে, উক্ত আজিজন আমিরন ব্যতীত আর কেউই নয়।

এখানে আমরা আমিরন সম্পর্কে ঐখানে যা লেখা রয়েছে তা উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

গুড়ুম গড়ুম কামান দাগে নসির পালোয়ান।
মা ও জননী আমিরন বলে হও যে সাবধান॥
ওর নাই আগবাড় যেত্‌না হো ভাইয়া গাজীসঙ্গী।
আগবাড় আগবাড় ভাগ্‌তা হায় শয়তান ফিরিঙ্গী॥
সেই ইন্দ্রানী আমিরন মার আইজ কিবা দশা হইল।
নজরবন্দী হইয়া তারা সব রাজপুরীতে রইল॥
যার কথার চোটে আগুন ছুটে মুখে ফুটে খৈ।
সেই পাটরানী মা ও জননীর দুঃখের কথা কই॥
সোনা রুপার থাল-বাসনে যায়বা খাইল খানা।
শেষ খড়ের ঘরে সেই মাও জননীর হইল আস্তানা॥

বীরাঙ্গনা আমিরন নেছাকে যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাঁর সঙ্গে উঠা-বসা করেছেন তাদের মধ্যে বেগম শাহ বানু চৌধুরানীর সাক্ষাৎকার বিবরণী আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

বেগম শাহ্ বানু চৌধুরানী, বয়স ৮৫ বৎসর। ইনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন—'আমার দাদী শাশুড়ীকে (আমিরন নেছা) আমি ছোটবেলা হতে অনেকবার দেখে এসেছি। ঐ সময় আমার মুরব্বিদের সঙ্গে পালকিতে চড়ে ফুলচৌকিতে আসতাম। ইনি না লম্বা না খাটো ধরনের ছিলেন। মোটাও নন, ঠিক পাতলাও নন—এমনি ধরনের চেহারা ছিল। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ ছিল। চক্ষু বড় ও কপাল উঁচু ছিল। মাথার চুলগুলি সাদা দেখেছি। কিন্তু বলিষ্ঠতা শরীর হতে যায় নাই। শ্বেত মস্‌লিন কাপড় পরা দেখেছি। কিন্তু কোন অলংকার পরা দেখি নাই। শুনেছি আমার দাদা শ্বশুর (নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ) যখন বেঁচেছিলেন তখন ইঁনি বহু মূল্যবান জড়োয়া অলংকারে সব সময় সজ্জিত থাকতেন। তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও আমি দেখেছি; সাত জোড়া পাদুকা নিয়ে তিনি শোবার ঘর হতে পায়খানা পর্যন্ত বদল করে আসা যাওয়া করতেন। পাদুকা ছিল সোনালী জরীর কাজ করা নাগরা। স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত খড়মও ছিল। গোসল করতেও পঞ্চাশ ঘড়া পানি তিনি ব্যয় করতেন।

ইনি ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন। তবে খুবই তেজস্বিনী ছিলেন। বাড়ীর চাকর-চাকরাণী দাস-দাসী ভয়ে সব সময় কম্পমান থাকত। কিন্তু মৃদু স্বরে তিরস্কার করা ছাড়া তাদেরকে অন্য কোনভাবে গালিগালাজ করতেন না। গাজীদের শেষ যুদ্ধের (১৮৫৭—৫৮ সালের যুদ্ধ) পর ইঁনি আর প্রাসাদের চৌহদ্দীর বাইরে কোথাও যেতে পারেন নি। ইংরেজদের বন্দিনী হিসেবে প্রাসাদে ছিলেন। এমনকি পিত্রালয়ে কখনও আর যাওয়া-আসা করতে পারেন নি। তাঁর ছোট ভাই; ভাতিজা এনারা মাঝে মধ্যে এসে দেখে যেতেন। পূর্বের কিছুই ছিল না। শুধু প্রাসাদটি ব্যতীত। শেষে নানা কারণে প্রাসাদ হতে তাঁকে বের হয়ে আটচালা খড়ের ঘর নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে হয়। রাজা নানাজী ও আজিমুল্যা খান প্রাসাদে থেকে মারা গিয়েছেন। এই সব খবর ইংরেজরা পায়। তারপর তাঁকে প্রাসাদে না থাকতে দিয়ে খড়ের ঘরে থাকতে বাধ্য করেন। দাদী আম্মা যখন মাঝে মধ্যে পূর্বের কথাগুলি বলতেন, তাঁর শ্বশুর ও স্বামীর ধন ঐশ্বর্যের কথা বলতেন তখন আমরা যারা উপস্থিত থাকতাম, তারা মনে করতাম এসব যেন স্বপ্ন।

দাদী আম্মা ফিরিঙ্গীদের ভীষণভাবে ঘৃণা করতেন। তাদের নাম

শুনলেই যেন জ্বলে উঠেছেন—এমনি তার মুখ চোখের ভাব হতো। দাদী আম্মার যে সামান্য মাত্র গহনা ছিল, তা কলকাতায় বিক্রি করে। তাতে যাহা মূল্য হয়েছিল, তাই দিয়ে পরে কিছু জমিদারী এবং কয়েক হাজার বিঘা জমি ক্রয় করেন। সেই সব সম্পত্তি আমার শ্বশুররা ভোগ করে আসছিলেন। তিনি মরবার সময় সাত ঘড়া মোহর মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। দাদী আম্মা মারা যাওয়ার পর সে সব মসিমপুরের একের মামুদ জমাদার এবং আরও অনেকে নিয়ে যায়। কারণ লুট করেছে লোকে ইংরেজদের প্ররোচনায়। ইঁনি খুবই দানশীলা মহিলা ছিলেন। যে কোন লোক কোন কিছু প্রার্থনা করলে তাহা সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিতেন। গরীব লোকেরা অভাবের দিনে চাউল, ধানের জন্য আসলে তাদের চাউল, ধান, টাকা দিয়ে বিদায় করে দেওয়ার পর বলতেন, "ফিরিঙ্গীরা দেশটাকে আকাল আর অভাব দিয়ে শেষ করে দিল।" ইঁনি প্রতিদিন সকালবেলা কুরআন শরীফ পড়তেন। উর্দু, ফার্সীতে ইঁনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন। পশ্চিমা ও বিদেশী সওয়ালি ফকিরদের সঙ্গে এনাকে উর্দু ও ফার্সীতে কথা বলতে আমি দেখেছি। প্রায় ৭০ বছরের মত বয়স হওয়ার পর ইঁনি ইন্তেকাল করেন।

শাহ বানু চৌধুরানী তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণীতে যা বলেছেন, তন্মধ্যে এই কথাগুলিও ছিলঃ প্রাসাদের দক্ষিণ দিকের গেটের উপরে নাকাড়া বাজাতে আমি দেখেছি। পাহারাদাররা খাবার সময় হলে নাকাড়া বাজিয়ে খাবার জন্য চাকরদের ডাকত। ২০ ঘন্টা ধরে প্রাসাদের দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকের গেটে সঙ্গীনওয়ালা বন্দুকধারী পাহারাদাররা পাহারা দিত। রাত্রি বেলা ৩০।৪০ জন পাহারাদার পাহারা দিত। ১৩০৫—৬ সাল পর্যন্ত বরকন্দাজরা পাহারা দিত। পরে আরও অবস্থা খারাপ হওয়ায় আর পাহারা দেওয়া হত না। বিরাট আকারের রৌপ্যনির্মিত একটি ছত্র আমি দেখেছি। শুনেছি পাল্কীর উপরে উক্ত ছত্র ১০।১২ জন লোক তুলে ধরে সঙ্গে সঙ্গে যেত। ফুল শয্যায় শয়ন করা আমি দেখিনি। তবে যে সব দাসী বাগান হতে ফুল চয়ন করে এনে ফুলশয্যা সাজাত, তাদের কোন কোন দাসীকে আমি দেখেছি। ইহারাও জ্ঞান ও আদব কায়দায় খুবই উন্নত চরিত্রের ছিল। উক্ত সব দাসীদের মধ্যে সুখির মা যেমন জ্ঞানী, তেমনি ফুলের হার, মালা, তোড়া, ডালা এবং ফুলশয্যা সাজাতে খুবই নাকি দক্ষ ছিলেন। আমি নতুন বউ হয়ে এলে, সুখির মা

আমাকে নয়া বৌমা বলে ডাকতেন। তখন ইঁনি খুবই বৃদ্ধা ছিলেন। মালখানায় পুরানো গাদা বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার ভূ পাকার ভাবে আমি পড়ে থাকতে দেখেছি। পরে অস্ত্র আইন আরও বেশী কড়া হওয়ার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজো দেবর রহিমউদ্দীন মুহাম্মদের শ্যালক ডাঃ শহর উল্যা আহমদ, দারাজউদ্দীন মিঞা, হাজেরউদ্দীন মিঞা, আমাদের বাড়ীর ইমাম উল্যা (কারী) এবং বাড়ীর চাকররা দুই খানা গরুর গাড়ীতে করে রাত্রে বুড়া তিস্তা নদীর 'খুকসিরদহ' নামক স্থানের পানিতে উক্ত বন্দুক ও তলোয়ারগুলি ফেলে দিয়ে আসে। আমার দাদী শাশুড়ী আমিরন নেছা প্রাসাদ ছেড়ে খড়ের ঘরে যখন বাস করতে থাকেন, ঐ সময় আমার চাচা শ্বশুর নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ মায়ের সঙ্গে গিয়ে প্রাসাদের পশ্চিম পার্শ্বে খড়ের বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। আমার শ্বশুর নেহালউদ্দীন মুহাম্মদ মারা গেলে পর আমার শাশুড়ী আরও কয়েক বৎসর প্রাসাদেই ছিলেন। তবে চোর-দস্যুর ভয়-ভীতি বিশেষ করে, ইংরাজ আমলাদের অহরহ আসা-যাওয়া এবং তাদের উপদেশ দেওয়া এই বাড়ী ছেড়ে শাশুড়ীর বাড়ীর পাশে বাড়ী করা ভাল হবে। এ ছাড়া জ্বীন-ভূতের ভয় ঐ সব আমলা ও অন্যান্য লোকও এসে দেখাত। তারা বলত, এত বড় প্রাসাদে আপনারা কি করে থাকবেন। যা হোক, শেষে আমার স্বামী নজমউদ্দীন মুহাম্মদ তাঁর দাদীর বাড়ীর পাশে বাড়ী করেন। কিছুদিন পর আমার শাশুড়ীও ছেলের সঙ্গে গিয়ে থাকেন। এমনি করে উক্ত প্রাসাদের আসন্ন ধ্বংস নেমে আসে। আমার শ্বশুরের একমাত্র ছেলে আমার স্বামী। মেজো চাচা শ্বশুরের তিন ছেলে—রহিমউদ্দীন মুহাম্মদ, মশিহউদ্দীন মুহাম্মদ, লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ। ছোট শ্বশুরের নাম হল লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ। ইনি অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেছেন। মারা যাওয়ার পূর্বে ইনি ১০।১২ মাস ধরে অসুখে ভুগতে থাকেন। হঠাৎ একদিন দেখি এক ফিরিঙ্গী ইংরাজ এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। পরে জানলাম উক্ত ইংরাজের সঙ্গে লতিফ চাচাজীর বন্ধুত্ব ছিল কলকাতায়। সাহেব নৌকা চড়ে এসেছিলেন কলকাতা হতে। দুই জনের বয়স প্রায় একই রূপ ছিল। সাহেব চাচাজীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিলাতে যাবেন চিকিৎসা করতে; খরচ সব বাড়ী হতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে অসুখ বেশী হওয়ায় চাচাজী ফিরে এলেন বাড়ীতে। কয়েকদিন

থাকার পর তিনি মারা গেলেন। আমার মেজো চাচা শ্বশুর যখন মারা যান, তখন আমার দেবররা সকলে নাবালক ছিল। ঐ সময় তাদের এস্টেটের দেখাশোনার জন্য রাধাকান্ত লাহিড়ী নামক এক লোক রিসিভার হয়ে ফুলচৌকিতে আসে। উক্ত রাধাকান্তই স্বর্গীয় তুল্য এই প্রাসাদ ধ্বংসের মূল। এতে গভর্নমেন্টের হাত ছিল কিনা জানি না। আমরা তখন খুবই দুর্বল ও অসহায় ছিলাম। সুতরাং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার শক্তি ও ক্ষমতা আমাদের ছিল না। এর অনেক পরে আরও অনেকে এই বাড়ী ভেঙ্গে ইট নিয়ে গিয়ে নানা জিনিস তৈরী করে। আমার দাদী শাশুড়ীর পিত্রালয় হল—দিনাজপুর জেলার 'ইকোর' নামক গ্রাম। এনার পিতার নাম মুহাম্মদ সানাউল্যা চৌধুরী। ইনি আমার দাদা শ্বশুরের পিতা কামালউদ্দীন মুহাম্মদের খাস মুন্সী (প্রাইভেট সেক্রেটারী) ছিলেন।

পূর্বের আত্মীয়তাসূত্রে আমি এসবও জানতাম যে, আমার শ্বশুর বংশীয় মোগল রাজ-পরিবারের যিনি প্রথম বাংলায় ক্ষমতা বিস্তার মানসে আসেন, তাঁর নাম সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। এনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সাকেরউদ্দীন মুহাম্মদ, তৎপুত্র ওয়ালীদাদ মুহাম্মদ। বাকের মুহাম্মদের পুত্র, আমার দাদা শ্বশুরের পিতা, কামালউদ্দীন মুহাম্মদ। গোউসউদ্দীন মুহাম্মদ দাদাজীর একমাত্র কন্যা নাদেরুন্নেছা আম্মাজীকে আমি দেখেছি। তিনি আমাকে খুবই আদর করতেন। কারণ এত বড় বাড়ীতে এক মাত্র বৌ হওয়ায় সব সময় আমাকে স্নেহ করতেন। পূর্বের কথা, বিশেষ করে, তাঁর পিতা এবং আত্মীয়গণের নৃশংসভাবে হত্যার কথা উঠলেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। পিত্রালয়ে স্বামী হত্যা হওয়ার পর তিনি কুমেদপুরে চলে যান স্বামীর বাড়ীতে। ফুলচৌকির লোকেরা তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে ও শ্বশুর বাড়ীতে এঁদের নাম ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আমি ছোট বেলা হতে, অনেকবার অনেক সময় অনেক লোকের মুখে শুনে এসেছি। ফিরিঙ্গীরা মূল প্রাসাদ ও অন্যান্য প্রাসাদের উপর আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন এবং দুঃখজনক ঘটনার কথা পূর্বের অনেক প্রাচীনদের নিকট শুনেছি।

ইজ্জাতুল্যা খানসামা, বকর খানসামা, নবানু ফকির এবং আমিরউদ্দীন মিঞা, তমিজউদ্দীন মিঞা চাচাজী—এমনি ধরনের বহু লোকের নিকট

পূর্বে সুখ-দুঃখের কথা শুনেছি। আমিরউদ্দীন মিঞা ও তমিজউদ্দীন মিঞা—এঁরা তংকর মিঞাদের বংশধর। তংকর মিঞাদের মধ্যে এই দুই ভাই শুধু জীবিত ছিলেন। আর সকলকে ইংরাজরা গুলী করে অথবা ফাঁসি দিয়ে মেরেছে। আমিরউদ্দীন মিঞার পিতা ফাজিল মিঞার ফাঁসি হয় যুদ্ধের সময় হিন্দুস্তানে। ফুলচৌকিতে উক্ত দুই ভাই আজীবন ছিলেন ইংরাজদের নজরবন্দী হিসাবে। প্রাসাদের উত্তর পার্শ্বে খড়ের বাড়ী ঘর নির্মাণ করে তারা প্রথমে থাকেন। পরে আমার স্বামী ও দেবরেরা অভিভাবকশূন্য হওয়ায় আমার স্বামীর বাড়ীর আর দেবরদের বাড়ীর মাঝামাঝি স্থানে তাঁদের থাকবার ঘর করে দেওয়া হয়। ওনারা দুই ভাই আমাদের অভিভাবক হিসাবে ছিলেন এবং এখানেই ইহলীলা সংবরণ করেন। আমির মিঞা যুদ্ধের সময় যুবক ছিলেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক কিছু দেখেছেন। তাঁর কাছে শুনেছি, দিল্লী হতে তংক আত্মীয়-স্বজনেরা এলে নিজেদের তাঁবুতে থাকতেন, নিজেদের খাওয়া খেতেন। আগদলি, পাছদলি, আসা ও সোটা নিয়ে চলত। মধ্যখানে মেয়েছেলেরা পাল্কিতে, পুরুষেরা ঘোড়া ও হাতীতে থাকতেন। পাল্কির উপরিভাগে জরির কাজ করা ছত্র ধরত ছত্রধরেরা। আবার তংকর মিঞারা যখন দিল্লীতে আত্মীয়ের বাড়ীতে যেতেন, তখন নিজেরা নিজেদের খানা খেতেন। এই রকম আড়ম্বর নিয়ে তাঁরা চলতেন। দুই তিন সন্ধ্যা মাত্র আত্মীয়দের খানা খেতেন। শত শত লোক, লয়-লস্কর তাঁদের-সঙ্গে থাকত। কামালউদ্দীন মুহাম্মদ যখন কোথাও যেতেন, তখন আগদলি, পাছদলি তাঁর আগে পিছে থাকত স্বর্ণ রৌপ্যের আসা-সোটা নিয়ে। সারি সারি হাতী ঘোড়া চলত তাঁর সঙ্গে। তিনি পাল্কিতে থাকতেন, কখনও বা ঘোড়ায়। একেক দিন একেক রকম বাহনে তিনি চলতেন। নকীব সঙ্গে সঙ্গে নাম হাঁকতে হাঁকতে অগ্রে অগ্রে চলত। যুদ্ধের পূর্ববিস্থায় যখন কোন আত্মীয় বাড়ীতে আমার স্বামীর বাড়ীর লোকেরা যেতেন, তখন উক্ত আড়ম্বরে তাঁরা চলতেন এবং সঙ্গে হাঁস-মুরগী নানা ধরনের পাখী, পালে পালে খাসি, গরু এসবও যেখানে যেয়ে মঞ্জিল বা সরাইখানা সে স্থানে গিয়ে দাঁড়াত। সেখানে এসব জিনিস পূর্বে নিয়ে রাখা হত। খাওয়ার সময় যত গরীব দুঃখীই আসুক তাদের না খাইয়ে তাঁরা সেখান থেকে রওয়ানা হতেন না। আমির মিঞা ও তমিজ মিঞা চাচাজীরা বলতেন, ফুলশয্যায় শুধু মোগল বংশীয় লোকেরা শয়ন করতেন। এদের বংশীয় লোকেরা ফুলশয্যায় শয়ন

করতেন না। তাঁদের পালঙ্কের চতুষ্পার্শ্বে ফুলের হার, তোড়া এই সব শুধু থাকত। তমিজ মিঞা চাচাজী পূর্বে মারা গেছেন। আমির মিঞা চাচাজী জ্যেষ্ঠ এবং তমিজ মিঞা চাচাজী কনিষ্ঠ ছিলেন। ফুলচৌকি ও তংকর মিঞাদের সব কিছু ইংরাজরা বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তংকর মিঞাদেরকে হত্যা, তাঁদের বাড়ীর নারী-পুরুষ-শিশু—সকলকে হত্যা, একমাত্র তংকর আমির মিঞা চাচাজী ও তমিজ মিঞা চাচাজী কোন রকমে পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছেন। তংকর মিঞাদের অনেক মেয়ে জীবন এবং ইজ্জত বাঁচাবার ভয়ে গভীর রাতের অন্ধকারে তংক হতে পালিয়ে এসেছিলেন জারুল্যাপুরে বক্শীর বাড়ীতে। কিন্তু হায় ! বক্শীর বাড়ীতে লুকিয়ে তাঁরা জীবন বাঁচাতে পারেন নি। পর মুহূর্তে দুর্বৃত্তেরা বাড়ী ঘিরে বকশীর বাড়ীর নরনারীকে হত্যা করে এবং তংকর মিঞাদের বাড়ী হতে যে ১২ জন মেয়ে পালিয়ে এসেছিল জীবন বাঁচাবার জন্য, সঙ্গে তাঁদেরও হত্যা করে। লুণ্ঠন শেষে ফিরিঙ্গী ডাকাতরা বকশির বাড়ী[1] জ্বালিয়ে দেয়। শেষ গাজী যুদ্ধের (১৮৫৭) সময়ে ও পরে লুট করতে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে আর যে সব জমিদার বড় লোক এসেছিল ধনমাল লুণ্ঠনের আশায়, তাদের মধ্যে ডিমলার জমিদার খোন্দর্দ মুরাদপুরের (পায়রাবন্দের) জমিদার, মাহিগঞ্জের বঙ্কসাহা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতার আরও অনেক জমিদার তাদের লাঠিয়াল বাহিনীসহ এসেছিল। হত্যা, লুণ্ঠন, ঘর জ্বালানি—এই সব তারা করেছিল। বহু মূল্যবান দ্রব-সামগ্রী সকলে নিয়ে গিয়ে পরে খান্দানী হয়।

আর একজন সাক্ষী

আমার নাম ইমানউল্যা (ডাকনাম কাক্ড়ু)। আমার পিতামাতা এই প্রাসাদেই কাজকর্ম করে শেষ জীবনে এখানেই ইন্তেকাল করেছেন। সেই অবধি এই বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁদের বাড়ীতে আমি আছি। বেগম আমিরন নেছাকে আমি ছোট বেলা হতে দেখে এসেছি। সে সময় তিনি বৃদ্ধা ছিলেন। তাঁর আশ্রয়ে থেকে আমি বড় হয়েছি। আমিরন নেছা বেগম সাহেবা গম্ভীর

---

[1] শাহ কাদেরুল্যা ওরফে মুন্নাশাহ বকশীর ছেলে তখন উক্ত জারুল্যা গ্রামে বাস করছিলেন। পরে মৃতদের কবরগুলি বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। বকশীর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও পড়ে রয়েছে। লোকেরা বকশীর বাড়ীর দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ, বকশীর পুকুর, কবর সব কিছু সম্পর্কে এখনও বলে এবং দেখিয়ে দেয়। তক হতে জারুল্যাপুরের দূরত্ব ৩ মাইল হবে।

প্রকৃতির ছিলেন। দেখতে উজ্জ্বল, শ্যামবর্ণ গায়ের রঙ ছিল, না মোটা না চিকন, না লম্বা, না খাটো এই ধরনের ছিলেন। চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী সবাই তাঁকে ভয় করে চলত কিন্তু কারও উপর কোন দিন কড়াভাবে কোন কথা বলতেন না। শোবার ঘর হতে পায়খানা পর্যন্ত যাতায়াত করতে ৭ জোড়া জুতা ও সোনারূপার খড়ম ছিল। তিনি খুবই আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। শুনেছি এনার স্বামী নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ জীবিত থাকা পর্যন্ত এনারা ফুল শয্যায় শয়ন করতেন। বিধবা হওয়ার পর ফুলশয্যায় শয়ন আর কোন দিন করতে দেখিনি। এই মোগল রাজবংশের লোকেরা দিল্লীর রাজবংশীয়দের থেকে অনেক বেশী ধনী ছিলেন। এদের সোনা-রূপা হীরা-মণি-মানিক্যের কথা তখনকার প্রাচীন লোক এবং দাসদাসীদের কাছে যা শুনে এসেছি তাতে শুধু অবাক ও বিস্মিতই হয়েছি। এদের কখনও কোন গরীবদের উপর নির্যাতন বা অন্যায় করতে আমি দেখি নি। ক্ষমা, উদারতা এই ছিল এঁদের অঙ্গের ভূষণ। বাংলা, হিন্দুস্তান, আসাম—এঁদের সব জায়গায় বড় বড় ব্যবসার কুঠি ও আড়ত ছিল। যে কোন লোক পাহারাদারকে এড়িয়ে কর্তাদের সামনে গিয়ে যে কোন জিনিস প্রার্থনা করলে তা সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হত। নানা ফলের বাগানে লোক অবাধে পাকা ফল মাটি থেকে কুড়িয়ে খেতে বাধা ছিল না। পাহারাদার গাছ পাহারা দিবে কিন্তু মাটিতে পড়া ফল যে কোন লোক নিয়ে যেতে এবং খেতে পারে। বাগানের সামান্য ফল মালিকেরা নিত আর সমস্ত ফল লোকদের বিলিয়ে দিত। যারা যত বেশী গরীব এবং দুঃস্থ থাকত তাদের তত বেশী এঁরা ফল-মূল, ধান-চাউল, টাকা-পয়সা দান করতেন। এই প্রাসাদের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের ভিতরের প্রধান গেটের সামনে আমি ২৪ ঘণ্টা ধরে পাহারা দিতে দেখেছি। সঙ্গীনওয়ালা বন্দুকধারী বরকন্দাজরা পাহারা দিত। বাংলা ১৩০৪ সাল ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিবাগত রাত্রে উমরউদ্দীন চৌধুরীকে যখন খুন করে, তখন আমার বয়স ১৪/১৫ বছর হবে।"

কেন খুন করে ? প্রশ্ন করায় তিনি বলেনঃ "রামধন্ধু পন্থ নানাজী ও তার উজীর আজীমউল্যা খান খুব গোপনে রাজবাড়ীতে থেকে মারা যায়। উমরউদ্দীন চৌধুরী এই সব কথা পরে সরকারকে জানায়। এই সন্দেহ নিয়ে বহু হট্টগোল বিবাদ হয়। পরে নিজামউদ্দীন মুহাম্মদের জীবিতকালে উমরউদ্দীন চৌধুরী দ্বারা এই মোগল রাজবংশের যাঁরা

হিতৈষী ছিলেন তাঁদের উপর নানারূপ অত্যাচার হতে থাকে দারোগা ও পুলিশের দ্বারা। নিজেও অনেক পদস্থ সম্ভ্রান্ত লোককে গালি-গালাজ ও মারপিট করেন। এমনকি, আহ্সানউল্যা দেওয়ানজীকেও অপমান করেন। দাওয়ার বক্শ সরকারকে মারপিট করেন। সন্ন্যাসী হনুমান গিরি (ইনি প্রধান সন্ন্যাসী নেতা হনুমান-গিরির পৌত্র) তাঁকেও অপমান করেন। নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ সকলকে নানা কথা বলে নিরস্ত করে এসেছেন। তিনি মারা গেলে পর প্রাসাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সব কিছু তার বাড়ী কুমেদপুরে নিয়ে যাবেন এবং নাবালকদের ওছি সেজে তাঁদের পথের ভিখারী করবেন—এই তার ইচ্ছা। যেদিন সকাল বেলা প্রাসাদ হতে জিনিস-পত্র গো-গাড়ীতে নিয়ে যাবে, সেই দিন আগের রাত্রে উমরউদ্দীন চৌধুরীকে খুন করে। এতে ৪ জনের ফাঁসি হয়; দাওয়ার বকশ সরকার এর গ্রাম ছিল দুর্গাপুর; খরকু আকোন্দ, হেদাতুল্যা শেখ, কালকুট শেখ—এদের বাড়ী ছিল জায়গীর। ৯ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়—এদের একজন সরকার। এর বাড়ী ছিল দুর্গাপুর। অন্য আট জনের নাম মনে নাই। তবে সাকিন ছিল মোলঙ্গ ও জায়গীর। একজন দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসেছিলেন। আরও বহু লোকের জেল হয়েছিল। যাঁদের ফাঁসি হয় তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—দাওয়ার বক্শ সরকার। সকলের রংপুরে বিরাট মাঠের মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি হয়েছিল। ফাঁসির দিনে বহু লোক সেখানে জমা হয়েছিল। দাওয়ার সরকারের প্রথম ফাঁসি হয়। সকলের গায়ে কাল কাপড় ছিল। ফাঁসের দড়ি দাওয়ার সরকার বাঁ হাত দিয়ে ধরে লোকদের দিকে তাকিয়ে ডান হাতে রুমাল (গামছা) নেড়ে হাসতে হাসতে বলেন—'আমি মরছি। এতে আমার কোন দুঃখ বা আফসোস নাই। আমার প্রভু বংশের সন্তান-সন্ততিরা এখন কিছুটা নিরাপদ বলে আমি মনে করি। ঘরের শত্রুই প্রধান শত্রু। সেই শত্রুকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছি হত্যা করতে। এতে আমি সুখী ও গর্বিত। আমার প্রভুরা যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে চললাম। এ কথা বলে তিনি নিজের হাতে ফাঁসের দড়ি গলায় দিয়ে হাসতে হাসতে ঝুলে পড়েন। অপর তিন জনেও হাসতে হাসতে ফাঁসিতে ঝুলে পড়েন দাওয়ার সরকারের মত। কিন্তু তাঁরা কোন কথা উপস্থিত লোকদের বলেন নি। অনেকের সঙ্গে আমিও ফাঁসি দেওয়া দেখতে রংপুরে গিয়েছিলাম। এই হত্যা রাজনীতিক হত্যা হয়েছিল। এই হত্যার পর

বেগম নাদেরন নেছা বানু সাহেবা, পিত্রালয় হতে কুমেদপুরে স্বামীর পৈতৃক বাড়ীতে চলে যান। অবশ্য মাঝে মধ্যে তিনি তাঁর ভাতিজাদের দেখতে ফুলচৌকীতে আসতেন। এই মোগল রাজবংশীয়রা খুবই বড় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ফুলচৌকীর রাজবাড়ীকে স্থানীয় লোকেরা 'সরকারী বাড়ী' পূর্বে যেমন বলেছে, এখনও পূর্বের মত তাঁদের বংশীয়দের বাড়ীটিকেও 'সরকারী বাড়ী' বলে। নতুন অস্ত্র আইন হওয়ার কথা যেদিন আমরা শুনি, সেই দিন গত রাত্রে আমি লোহানী পাড়ার ডাক্তার শহর উল্যা আহমদ, দারাজউদ্দীন সাহেব, হাজেরউদ্দীন মিঞা প্রমুখ সহ মালখানায় যায়। পূর্বের সব বন্দুক ও তলোয়ার ছিল লাইসেন্স-বিহীন। সে সব আমরা রাত্রে দুইখানা গরুর গাড়ীতে করে নিয়ে তিস্তা নদীর খুকসির ঘাটের গহীন দহে ফেলে দেই। এই বন্দুকগুলির মধ্যে যে বন্দুকটি দেখতে ভাল ছিল, সেই বন্দুকটি দারাজ মিঞা সঙ্গে করে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান এবং পরে তার বাবার তিরস্কারে একটি বট গাছের গর্তে বন্দুকটি ফেলে দেন। উক্ত তিনজন রহিমউদ্দীন মুহাম্মদের শ্যালক ছিলেন। প্রথম দু'জন ছিলেন বিখ্যাত কৃষক নেতা আসিমউল্যা মণ্ডলের পুত্র। তৃতীয়জন ছিলেন তার পালিত পুত্র।

বেগম অমিরন নেছা সম্বন্ধে রইসউদ্দীন চৌধুরীর সাক্ষাৎকার বিবরণী

বেগম আমিরন নেছার কনিষ্ঠা ভগ্নি বেগম জিন্নাতন নেছা।[১] তাঁর পৌত্র রইসউদ্দীন চৌধুরী সাহেব তাঁর সাক্ষাৎকার-বিবরণীতে বলেনঃ আমার দাদি বেগম জিন্নাতন নেছা সব সময় বলতেন যে, আমার ভগ্নি বেগম আমিরন নেছা সব সময় সাত রাজার ধন, মানিক, হীরা-পান্নার গহনা মাথায় গলায় হাতে পরে থাকতেন। তাঁর মত আমিরানা ঠাঁটবাটে চলা মণি-মানিক্য খচিত নানা বস্ত্রের শাড়ী পরিধান করে চলাফিরা করা মোগল হেরেমে আর কাউকেও আমি দেখিনি। আমার দাদী আম্মা ৯৩ বছর বয়সে মারা যান। ঐ সময় আমার বয়স ১৬। ১৮ বছর। এখন আমার বয়স ৮২ বছর।

---

[১] জিন্নাতন নেছার স্বামীর নাম সদরউদ্দীন চৌধুরী। পুত্রের নাম রহিমউদ্দীন চৌধুরী ও পৌত্রের নাম রইসউদ্দীন চৌধুরী। এঁরা দিনাজপুরের রাজারামপুর গ্রামের অধিবাসী।

গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদ

এখন আমরা ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের ভাতিজা এবং খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদের আপন বড় চাচার বড় ছেলে গৌউসউদ্দীন সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করবো। কিন্তু ইতিহাসের এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা কত যে কঠিন তা নিজে বুঝতে পারলেও যা সত্য ভিত্তিক তাহা না বললে দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর কাছে অপরাধী হব বলে এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা আধুনিক নানারূপ আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে, পাশবিক অত্যাচারের মাধ্যমে এদেশীয়দের তাদের অধীন করে রেখেছিল। আমার মনে হয়–তারা সিপাহী যুদ্ধের উপরে অসংখ্য বই লিখে এদেশীয়দের মধ্যে বন্দুক, কামান, পিস্তলের চেয়েও শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহার করে এসেছে। তা দিয়ে বিদেশীরা একদিকে নানারূপ ভয়-ভীতি এবং অন্যদিকে খয়রাত বর্ষণ করে এসেছে। বর্তমান আলোচনার সময় হতে শতাব্দীকাল ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা এদের কারো বা পরিচয় দিয়েছে সংক্ষিপ্তভাবে কারো দিয়েছে আংশিক নাম। কারও নাম গুপ্ত করা হয়েছে, কাউকে করা হ'য়েছে একেবারে ইউরোপীয়, ঘৃণার উদ্রেক করে কারও নামে সিটানো হয়েছে কলঙ্ক। বিপক্ষীয় নেতাদের সম্পর্কে তারা এমনি ধরনের জুয়াচুরির মত কাজ করে এসেছে। বিদেশীয়দের স্বার্থে যা লেগেছে তার প্রচার করা হয়েছে ফলাও করে এবং তাদের স্বার্থে ক্ষতিকর যা, তার অবস্থার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। যা হোক এখন আমরা প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের ইতিহাস হতে ইংরেজদের দেওয়া নাম—"ঘাউস খাঁ" এবং "গোশ খাঁ"-কে উদ্ধার করছি। আমাদের মতে এই মহাবীরের নাম হবে গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদ। এর সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্বে গুপ্ত মহাশয়ের ইতিহাস হতে, ঐ সম্পর্কীয় বিষয় কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব ঃ

> সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ বিপ্লবপূর্ণ হইয়াছিল। আগ্রার পার্শ্ববর্তী স্থানে ক্ষমতাশালী লোকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া, দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে শাসন দণ্ডের পরিচালনা করিতেছিল। আলীগড়ে গাউস খাঁ নামক এক ব্যক্তি আপনাকে দিল্লীর বাদশাহের সুবাদার

বলিয়া ঘোষণাপূর্বক জনশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্নেল কটন ইহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যাহারা ইচ্ছা করিয়া অশ্বারোহী সৈনিকের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি এই অভিযানে নিয়োজিত হইল। মৈনপুরীর প্রসিদ্ধ সাহসী অধিনায়ক ডি-কান্টাজো এই সৈনিকদিগের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। সমস্ত সৈনিকদলের কর্তৃত্ব মেজর মন্টগোমারির উপর সমর্পিত হইল। বিপক্ষদিগের দমন ব্যতীত হাথ্রাসনগর রক্ষা করা এবং স্থানীয় তালুকদারদিগকে আশ্বাস দেওয়া, এই সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল। মেজর মন্টগোমারি সৈন্য লইয়া ২০শে আগস্ট আগ্রা হইতে যাত্রাপূর্বক ২৪শে তারিখ আলীগড়ে উপনীত হয়েন। ঠাকুর গোবিন্দ সিংহ কতিপয় অশ্বারোহী দিয়া ইহার সাহায্য করেন। গাউস খাঁর মুসলমান সৈন্য ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, এমন বেগে ইংরেজের পদাতিক সৈন্যকে আক্রমণ করে যে, ইংরেজ অধিনায়ককে তাহাদের সম্মুখে কামান সন্নিবেশ করিতে হয়। গাজীগণ তরবারী হস্তে করিয়া, "দিন্ দিন্" রবে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহারা প্রথমত বিচলিত হইল না। কয়েক ঘন্টাকাল উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হইল। ইংরেজ সৈন্য সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র লইয়া, সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ধর্ম্মোন্মত্ত গাজীগণও সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দিতে বিমুখ হইলেন না। তাহারা কাফেরের শোণিতপাত করা আপনাদের ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছিল, এই ধর্ম রক্ষার জন্য তাহাদের উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাহারা কামানের মুখে বুক পাতিয়া, নির্ভীক চিত্তে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। শেষে তাহাদের বলক্ষয় হইল। তাহারা ইংরেজের অসীম শক্তি সম্পন্ন আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে স্থির থাকিতে না পারিয়া আলীগড় পরিত্যাগ করিল।……

একদিকে তিনি (লক্ষ্মীবাঈ) যেমন বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রকৃত বীরেল্যায় দৃঢ়তা দেখাইতে লাগিলেন ঃ অপরদিকে সেইরূপ কোমল প্রকৃতির মাতার ন্যায় স্নিগ্ধভাব দেখাইয়া, অনাথ দুঃখীদিগের হৃদয়ে শান্তি বিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

২৫শে তারিখ দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রান্ত হইল। এই সময়ে রাণীর গোলন্দাজ গোশ খাঁ দক্ষিণ দিগের বুরুজ হইতে এরূপ তীব্র বেগে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, উহাতে আক্রমণকারীদিগের তোপ বন্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মীবাঈ এই বীর পুরুষের উৎসাহ বিধানে

উদাসীন থাকিলেন না। তিনি এক তোড়া টাকা পারিতোষিক দিয়া; তাহাকে উৎসাহিত ও পরিতোষিত করিলেন। এইরূপে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত আক্রমণকারিগণ আক্রান্তদিগের সহিত তুল্য পরাক্রমে ও তুল্য সাহসে যুদ্ধ করিল। তাহারা যদিও আক্রমণকারীদিগের ন্যায় সুশিক্ষিত বা উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদিতে বল সম্পন্ন ছিল না; তথাপি তাহাদের এরূপ পরাক্রম, এরূপ সাহস, এরূপ লক্ষ্যভেদ কৌশল পরিস্ফুট হয় যে, উহাতে ইংরেজ সেনাপতি অতিমাত্র বিস্মিত হয়েন ৩১শে মার্চ পর্যন্ত বীর রমণী এইরূপ বীরোচিত রণকৌশল প্রদর্শনপূর্বক প্রতিপক্ষের যাবতীয় উদ্যম ব্যর্থ করিয়া ফেলেন। তিনি সর্বদা সৈনিকদিগকে সুশৃংখলভাবে রাখিতেন; সর্বদা উৎসাহ বাক্যে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার ক্ষমতা দর্শনে; তাঁহার উৎসাহ বাক্য শ্রবণে স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকারা পর্যন্ত শক্তি সম্পন্ন ও উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা দুর্গ প্রাচীরের সংস্কারে সাহায্য করিত, যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈনিকদিগের জন্য খাদ্য ও পানীয় আনিত, কোথায় কি অভাব ঘটিয়াছে, জানিয়া তৎপূরণে উদ্যত থাকিত।[১]

গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদের বীরত্ব গাঁথা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা, অনেক চাপা-চাপির মধ্য দিয়েও যা বলেছেন, তা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কামানের মুখে বুক পেতে দিয়ে অস্ত্র চালাতে লাগল ঃ এই যে সাহসিকতা তার কি কোন তুলনা আছে! স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে, পতঙ্গের মত আগ্নেয়াস্ত্রের সামনে বুক পেতে দিয়ে কত সৈনিক শহীদ হয়েছেন—তার খবর কতটুকুইবা আমরা রাখি বা জানি। তবু শত্রুপক্ষীয়দের বিদ্বেষপূর্ণ পক্ষপাতী লেখা হতে যা পাওয়া যায় তা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পৃথিবীর যে কোন বীরের সমকক্ষতায় তাদের পাশে ১৮৫৭-এর অনেক বিপ্লবী বীরকে দাঁড় করান যায়। কিন্তু পরিতাপ ও আফসোসের বিষয় তাদেরকে আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। এতে তাঁদের কোন ক্ষতি না হলেও, দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

যা হোক, নওয়াব গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদ বাংলার রংপুরস্থ ফুল-চৌকির মোগল রাজ পরিবারের লোক। ইনি অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ পঞ্চম ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, 'আগ্রা' পৃষ্ঠা ১৭৪—১৭৫, পঞ্চম ভাগ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, লক্ষীবাঈ, পৃষ্ঠা ৪০৯—১০।

সাংঠনিক কাজ করে এসেছেন—যা ইতিহাসের পাতায় ছিটে ফোটা পাওয়া যায় তাতেই বোঝা যায়। যুদ্ধ কৌশল ও কামান চালাবার অদ্ভুত দক্ষতা তাঁর ছিল—তাঁর বড় ভাই নাসিরউদ্দীনের মতই। তবে তাঁর সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। আগ্রা, দিল্লী, আলীগড় প্রভৃতি জায়গায় যিনি এদেশীয়দের পক্ষ হয়ে মরণ-পণ সংগ্রাম করে এসেছেন বীরোচিত ভাবে। অবশ্য এত দীর্ঘদিন পর তাঁর বা তাঁদের মত এদেশীয় বীরদের অনেক কিছু জানা এখন হয়তো আর সম্ভবপর নয়। ইনি ধরা পড়েছেন অথবা মারা গিয়েছেন যুদ্ধ সময়ে, তা ঠিক। যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে হেরে যাওয়ার পর ইনি ফুলচৌকি প্রাসাদে আসেন। আমাদের পূর্বে বর্ণিত এঁর চাচা ও ফুফা ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের যেমন করে, যেভাবে মৃত্যু হয়েছে এঁরও ঠিক সেইভাবে মৃত্যু হয়েছে। একই সময় এঁরা ধরা পড়েন এবং একই দিনে এঁদের মৃত্যু হয়। গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদকে আগে নির্দয়ভাবে মারপিট করা হয়। পরে গায়ের চামড়া ছিলে লবণ দেওয়া হয়। এর পূর্বে কাঁটার ডাল দিয়ে বেদম প্রহার করা হয় লোকেরা যাতে দেখতে পায় এমনি প্রকাশ্য স্থানে। তারপর ইংরেজরা হাতীর পিছনের বাঁ পায়ে বেঁধে নিয়ে রংপুর আসাকালে রঙ মহলের কাছে রাস্তার পার্শ্বে ফেলে দেয়। মহিপুরের ফকির সাহেবরা একে দাফন-কাফন ও কবরস্থ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজদের সহিত ডিমলার জমিদার, পায়রাবন্দের জমিদার, মাহিগঞ্জের বঙ্ক সাহা—এই সব ইংরেজ পক্ষীয় লোকেরা তাহাদের লোক-লস্করসহ উক্ত সময় ফুলচৌকিতে ইংরেজদের সহিত তাদের পক্ষে গিয়েছিল। এসব কথাও আমি ফুলচৌকি ও তার আশে-পাশের আর রংপুর, দিনাজপুর জেলার বহু লোকের কাছে শুনেছি। তাদের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। এঁদের কারো কারো নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাদের নাম দেওয়া হয় নাই, তাদের আরও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর নাম দেওয়া হল। আমার ১০/১২ বছর বয়স হতে ১৬/১৭ বছর বয়স অবধি আমি নিম্নোক্ত লোকদের নিকট অনেক সময় নানা কথার মধ্যে নবাব শাহজাদা গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদের কথাও শুনেছিঃ শহরউল্যা সরকার (বয়স ৯০ বছর) খড়িয়া বরকন্দাজ (বয়স ১২৮ বছর) শরিতুল্যা সরকার, বয়স ১২৫ বছর—উক্ত তিন লোক "জ্ঞানার" পাড়া 'ওয়াকফ স্টেটের" পক্ষ হয়ে জমিদারীর খাজনা আদায় করতেন। আমাদের এদিকে এলে আমাদের বাড়ীর সামনে যে একটি প্রকাণ্ড আমগাছ ছিল উক্ত আমগাছের

তলায় বসে নানা কথার মাধ্যমে মোগল রাজ-পরিবারের কথা এই তিন সুপ্রাচীন লোকেরা বলত। এদের এবং এতদঞ্চলের প্রতিটি গ্রামের অনেক লোক এই ফুলচৌকির রাজবাড়ীতে চাকুরী করতেন প্রত্যেকের যোগ্যতানুযায়ী। যার ফলে প্রাসাদের ভিতরের এবং বাইরের কথা, এমন কি যে কোন গোপন কথাও এদের অজানা থাকত না। এদের আরও অনেকের কথা আমরা শেষের দিকে উদ্ধৃত করে দিবার আশা করি। জহুর ফকির ও তৎবংশীয়দের পল্লী গানগুলির মধ্যে এদের কারো কারো নাম সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। উক্ত গানে গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদের যুদ্ধ এবং কামান চালানোর কথা রয়েছে। গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদের একমাত্র কন্যার কথাও লেখা রয়েছে। অবশ্য উক্ত জহুর ফকির ও তৎবংশীয়রা শুধু যে, ঐ সব গানই রচনা করে গাইতেন তা নয় কার্যত বহু বিষয়েও এ'রা গান রচনা করতেন। যেমন ভূমিকম্প, হঠাৎ বন্যা হওয়া নুতন হাট বসা অথবা যে কোন বিষয়ের ব্যাপার নিয়ে এ'রা মুখে মুখে গান রচনা করতেন এবং মহররমের সময় এদের নিজেদের রচিত 'মর্সিয়া' গানও রচনা করতেন এবং গাইতেন। রঙ্গপুরের এতদাঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় মর্সিয়া গানকে 'মাওখ' বলে।

শাহজাদা গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদের চেহারা প্রত্যক্ষদর্শীরা যা বলেছেন তা নিম্নোক্তরূপ। গায়ের রং স্বর্ণ বর্ণ, একটি লম্বা ধরনের কিন্তু খুব বেশী লম্বা নয়। দোহারা সুদৃঢ় গঠনের শরীর। লম্বা হস্ত, মোটা এবং সুদৃঢ়। বক্ষঃস্থল প্রশস্ত এবং উ'চু। মাথা ঈষৎ লম্বা ও বড়। চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ও মায়াযুক্ত। মাথার চুল আলবার্ট কাটা, দাড়ি গোঁফ কামানো, যুদ্ধের সময় ফিরিঙ্গীদের মত খাকি শার্ট ও ফুল প্যান্ট পরতেন। মাথায় অনেক সময় খাকির কাপড় যুক্ত সোনার টুপি (হ্যাট) দিতেন। তিনি তার বড় ভাই নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের খুবই অনুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন। সে জন্য ঐ সময়কার দাস-দাসীরা এ'দেরকে 'রাম লক্ষণ—দুই ভাই বলতেন। এর দুই স্ত্রী ও এক কন্যা ছিলেন। মেয়ের নাম নাদের নেছা। নাদেরনেছার কোন ছেলে পেলে হয় নাই। রাজা ধুন্ধ পন্থ নানাজীর ফুলচৌকিতে থাকার সংবাদ ইংরাজদের দেওয়ার কথা বিপ্লবীরা সন্দেহ করায় শাহযাদী নাদের নেছার স্বামী ওমরউদ্দীনকে ফুলচৌকি প্রাসাদে হত্যা করেন। সে বিষয় নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। পূর্বোক্তদের মত এদের সমস্ত সম্পত্তি, ব্যবসা, বাণিজ্য, সোনা, রূপা হীরা, মুক্তা, সব কিছু লুন্ঠিত এবং বাজেয়াপ্ত হয়।

ওয়ালীদাদ মুহাম্মদ

আমরা এখন এমন একটি বিষয়ের কাছাকাছি এসে গেছি, যে বিষয় সম্পর্কে তেমন কোন দলীল দস্তাবেজ বা নথিপত্র নেই বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বিষয়টি হল ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের কথা। দলীল দস্তাবেজ, নথিপত্র কেন নেই সে কথা অবশ্যই আপনারা আমাদের মতই অবগত আছেন। আমরা যেমন পরাধীন ছিলাম বিদেশীদের কাছে, তেমনি দেশবাসীর পক্ষ হয়ে যারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ও শোষণকে এ দেশ হতে উৎখাত করবার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তাঁরা যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজিত হন। সেই সঙ্গে এত বেশী অত্যাচার দেশবাসীর অনেকের উপরে নেমে আসে যা কল্পনাও করা যায় না; যেতে পারে না। ইতিহাসের পাঠকমাত্র তা অবগত আছেন। আমরা এখানে বাংলাদেশের ঐ সময়কার (১৮৫৭-৫৯ সালের বিদ্রোহ) কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী নেতা সম্পর্কে আলোচনা করব। তৎপূর্বে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লেখক রজনীকান্তগুপ্ত মহাশয় লিখিত ইতিহাস হতে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করবার প্রয়াস পাব। উক্ত ইতিহাসকে আমরা আমাদের চলার পথের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেছি। এ কথা না বললেও চলে যে, বৃটিশ রাজত্বের এক শতাব্দীর শেষের দিকেও রাজবংশের প্রতি দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। সেটা অনুধাবন করবার জন্য এখানে উক্ত ইতিহাস হতে কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

"কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ ও জনসাধারণের স্মৃতিতে যে চিত্র বিরাজ করিতেছিল তাহার অপসারণে সমর্থ হইলেন না। এখনও দিল্লীর রাজপ্রাসাদ সাধারণের সমক্ষে অপূর্ব শোভা বিকাশ করিতেছিল। শাহজাহান যেখানে আপনার ভুবন বিখ্যাত রত্ন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব সেখানে 'জগজ্জয়ী' উপাধি পরিগ্রহ করিয়া শাসনদণ্ড অক্ষুন্ন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত সাধারণের মনে পূর্বতন মহত্ত ও গৌরবের কাহিনী বদ্ধমূল রাখিয়াছিল। ইংরেজ কোম্পানী এই মহত্ত ও গৌরব কাহিনী ধ্বংস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যতই কঠোরতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, আত্মপ্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতই রাজনীতির নির্দেশ দেখাইতে লাগিলেন ততই সাধারণের স্মৃতিতে সেই

পুরাতন কথা নবীন ভাবে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সাধারণের দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সহিত সমগ্র ভারতের অদ্বিতীয় অধিপতির শোচনীয় পরিণাম চাহিদা দেখিল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত আকবর ও শাহজাহান কীর্তি-কলাপ স্মরণ করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।”

“অতএব এই সময়ে অবিশ্বাসীদিগের সহিত সমস্ত ধর্মানুরক্ত মুসলমানেরই যুদ্ধ করা উচিত। ঘোষণা পত্রে মুহাম্মদ সাদিকের নাম ছিল; কিন্তু মুহাম্মদ সাদিক কে তাহা কেহই জানিত না। জনসাধারণকে যে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা হইতেছিল উপস্থিত ঘোষণা পত্রেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক উহা দীর্ঘকাল জুম্মা মসজিদে সংলগ্ন ছিল না, সুতরাং সর্ব সাধারণে উহা দেখিতে পায় নাই। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উহা ছিড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু ঘোষণাপত্র দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও এবং উহা সর্বসাধারণের চোখে না পড়িলেও উহার মর্ম প্রকারান্তরে সাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছিল। কথিত আছে এই সময়ে এতদ্দেশীয় কোন কোন সংবাদপত্রে উক্ত বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সম্পাদকগণ নানা ভাবে, নানা ছাঁদে এ সম্বন্ধে নানা সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন। তাঁহারা সোজা ভাবে কিছু না বলিয়া রূপকে বা দ্ব্যর্থভাবে সংবাদ লিখিতে থাকেন। এক সময়ে লিখিত হয়—ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই কাশ্মীর গ্রহণ করা হইবে। এ স্থলে কাশ্মীর স্বনাম প্রসিদ্ধ দেশ নহে—দিল্লীর কাশ্মীর তোরণ।

সুতরাং উক্ত সংবাদে ইহাই জানান হয় যে, কয়েক সপ্তাহ মধ্যে দিল্লীর কাশ্মীর দরওয়াজা গভর্নমেণ্টের অধিকৃত হইবে। এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র এইরূপ দ্ব্যর্থভাবে নানা সংবাদ প্রচার করুক বা নাই করুক, উপস্থিত সময়ে দিল্লীর মুসলমানগণ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দিল্লীর রাজবংশের সম্বন্ধে আন্দোলিত হয়। অনেকেই কহিতে থাকে যে, শীঘ্র গুরুতর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই বিপ্লবে কোম্পানীর রাজ্য উৎসন্ন হইয়া যাইবে।”

...“রণমত্ত আগন্তুক সিপাহীদিগের কোলাহল শুনিয়া দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতি প্রাসাদ রক্ষক সৈনিকদিগের অধ্যক্ষ কাপ্তেন ডগলাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ানি আমে ভূপতির সহিত ডগলাসের সাক্ষাৎ হইল। ডগলাস

কহিলেন যে, এই সৈনিকদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিবার জন্য তিনি নীচে যাইতে নিষেধ করিলেন; যেহেতু নীচে গেলে সিপাহীরা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। ভূপতির চলিবার তত শক্তি ছিল না, যষ্টির উপর ভর দিয়া এবং হাকিম আসানুল্লার হাত ধরিয়া তিনি দেওয়ানি আমে আসিয়াছিলেন। ডগলাস নীচে যাইতে চাহিলেও বৃদ্ধ ভূপতি, পাছে তাঁহার প্রাণনাশ হয়, এই আশংকায় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। সুতরাং ডগলাস গবাক্ষ দ্বার দিয়া আগন্তুক সিপাহীদিগকে কহিলেন যে, তাহাদের উপস্থিতিতে ভূপতির বড় বিরক্তি বোধ হইতেছে; সুতরাং তাহাদের এখনি ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু ডগলাসের কথায় কোন ফল হইল না, তাঁহার কথা যেন শূন্যে মিশিয়া গেল। উহা উত্তেজিত সৈনিক পুরুষদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল না। এদিকে দিল্লীতে অনেকগুলি প্রবেশ পথ ছিল। এক পথ দিয়া নগরে প্রবেশ করার সুযোগ না হওয়াতে আগন্তুক সৈন্য অপর পথে নগরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যমুনার দিকে যে কয়েকটি প্রবেশ-দ্বার আছে, তাহার দুইটির নাম কলিকাতা দরওয়াজা ও রাজ ঘাট দরওয়াজা। কলিকাতার দরওয়াজা সেতুর অতি নিকটবর্তী ছিল। যখন এই প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইল, তখন আগন্তুক অশ্বারোহীরা যমুনা নদী ও প্রাসাদ প্রাচীরের মধ্যবর্তী রাজপথ দিয়া রাজঘাট দরওয়াজার দিকে ধাবিত হইল। তদ্রূপ মুসলমানরা এই দ্বার খুলিয়া দিল। মীরাটের উত্তেজিত সৈনিক দল উক্ত দ্বার দিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল।...

..."খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ কেবল ইউরোপেই আপনাদের অত্যাচারের পরিচয় দেন নাই। ইঁহাদের আক্রমণে কেবল ইউরোপের সুদৃশ্য লোকরাই বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই. ইউরোপের ইতিহাস কেবল ইহাদের এই ভয়ঙ্কর কার্য্যের চিত্র দেখিয়া অপরকে চমকিত করিয়া তুলে নাই। ভারতের এই সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাসেও ইহাদের বলবতী উত্তেজনা বলবতী প্রতিহিংসা এবং তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহারা দিল্লীর উক্ত দুর্ঘটনার পর পথিমধ্যে সাতজন লম্বর দারের (ইজারাদারের) ফাঁসি দেন। এবং চারি খানি গ্রাম জ্বালাইয়া ফেলেন। যেহেতু ইহাদের সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, লস্করদারেরা পলায়িত ইংরেজ মহিলাদিগের হত্যা করিয়াছিল। আর একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সৈনিক পুরুষ (সেনাপতিশীল) এলাহাবাদ হইতে যাত্রাকালে এত লোক বিনষ্ট করেন যে, শেষে তাঁহার সৈনিক দলের একজন অফিসার, আর এক লোক পাওয়া যাইবে না বলিয়া,

তাঁহাকে সেই সর্ববিধ্বংস হইতে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। খ্রীস্ট-ধর্মাবলম্বী সৈনিক পুরুষ নিরস্ত্র লোকদিগকে গুলী করিয়া বধ করিয়াছেন। হিন্দুর পবিত্র দেব-মন্দির বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন অধিক কি শরণাগত নিরপরাধ বালকেরও প্রাণনাশ করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন।…

“উত্তেজিত সিপাহীরা এখন বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া স্বীকার করিল। ইংরেজরা মিরাটে নিগৃহীত হইলেন এবং দিল্লীতে দুরবস্থার একশেষ ভোগ করিলেন। সিরাজ উদ্দৌলার আক্রমণ ও তৎসহকৃত অন্ধকূপ ঘটনার পর হইতে, বোধ হয় তাহাদিগকে আর কখনও এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। তাহারা আপনাদের দেশীয়দিগকে নিহত হইতে দেখেন এবং আপনারা আপনাদের আধিপত্য ও ক্ষমতা ভুলিয়া গিয়া সমস্ত সম্পত্তি দূরে রাখিয়া নগ্ন দেহে নগ্ন পদে পলাইতে থাকেন। উত্তেজিত সিপাহীরা নগরের উন্মত্ত মুসলমানেরা বৃদ্ধ সম্রাটের নামে তাঁহাদিগকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। সম্রাট কিছু না করিলেও, কেবল তাঁহার নামই, এই উত্তেজনার সময়ে সিপাহী ও নগরবাসীদিগের হৃদয়ে অপরিসীম বল ও অপরিসীম সাহসের সঞ্চার করে।

কবির উক্তি ঃ

“ভূপতির নামই উচ্চ শক্তির মন্দির” সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়া ছিল। দিল্লীর মোগল সম্রাট সাধারণের হৃদয়ে এইরূপেই আধিপত্য স্থাপন করিয়া ছিলেন; পূর্ব্বতন আধিপত্যের মহিমায় তাহার নাম সাধারণকে এইরূপেই সাহস ও শক্তি দিয়াছিল।”

… “দিল্লীর সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া ব্রিটিশ শাসন বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল। ইংরেজের আধিপত্য দূর করিয়া-বৃদ্ধ মোগল-ভূপতিকে হিন্দু স্থানের সম্রাট বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল এবং সমগ্র দিল্লীতে অকুতোভয়ে ও অক্ষুণ্ণভাবে আপনাদের প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছিল। এইরূপ কৃতকার্য্যতায় তাহাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। তাহারা আপনাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর বাহিরে আইসে এবং আম্বালার সৈন্যদিগের সহিত সম্মিলনের পূর্বে মিরাটের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা আপনাদের সন্নিবেশিত স্থানের দক্ষিণ ভাগে কয়েকটি কামান স্থাপন করিয়া

বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ইংরেজ সৈন্যও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে।”[১]

উক্ত উদ্ধৃতিগুলো হতে পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে মোগল রাজবংশীয়দের বিশেষ করে বাহাদুর শাহ নামেমাত্র সম্রাট হলেও তখন অবধি সাধারণ লোকের ভক্তি-শ্রদ্ধা যেমন সম্রাটের প্রতি সীমাহীন ছিল, তেমনি সাধারণের প্রেরণার উৎস ছিল সম্রাট। এ কথাগুলি দ্বিধাহীনভাবে প্রমাণ করে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের উক্ত ইতিহাসের উদ্ধৃতিগুলো।

এখানে আর একটি বিষয় নিবেদন করতে চাই, ফুলচৌকিস্থ মোগল রাজবংশীয়রা সবাই বাংলায় কথা বলতেন। বাংলায় দলীল-দস্তাবেজ লিখতেন এবং দস্তখতও বাংলায় করতেন। কিন্তু সে কথা যাক, এখন এখানে আমরা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় লিখিত ‘সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস’ লিখিত রয়েছে। “নবাব ওয়ালীদাদ খাঁ’ সেই ওয়ালীদাদ সম্পর্কে এখানে আমরা কিছুটা আলোচনা করব। কিন্তু আলোচনার পূর্বে উক্ত ইতিহাস হতে কিছু অংশ এখানে নবাব ওয়ালীদাদ সম্পর্কে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

“বুলন্দ শহরের যুদ্ধের পর সেনাপতি এক মাইল দূরে কাম্পী নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করেন। ঐ দিন অপরাহ্ন কালে তাঁহার সৈনিকেরা মালঘরে উপস্থিত হয়। মালঘরের নবাব ওয়ালীদাদ খাঁ দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের নামে উক্ত জনপদ শাসন করিতেছিলেন। ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতিতে তিনি প্রস্থান করেন। তাঁহার দুর্গে নানাবিধ দ্রব্য ছিল। ১লা অক্টোবর এই দুর্গ বিনষ্ট করা হয়। দুর্গ ধ্বংসকালে প্রজ্বলিত বারুদস্তূপে একজন ইংরেজ সৈনিক দেহ-ত্যাগ করেন।”

উক্ত ওয়ালীদাদ সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যা কিছু লিখেছেন তাই আমাদের ও ইতিহাসের সম্বল ছাড়া উপায় নাই। ইনি দিল্লীর মোগল রাজ-বংশোদ্ভূত। উক্ত পরিবারে ইনি বিয়ে করেছিলেন। এঁর পিতার নাম শাকেরউদ্দীন মুহাম্মদ। এঁর পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন ফকির, সন্ন্যাসী ও প্রজাবিদ্রোহী দল বলে ইংরাজ কথিত দলের নেতা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ। এর কনিষ্ঠ কন্যা বেগম চাঁদীবিবিকে

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫০, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ২২৩, ২৩৪, ২৩৫ ; তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃষ্ঠা ৪৪।

আমাদের বর্ণিত ওয়ালীদাদ মুহাম্মদ বিয়ে করেন। উক্ত বিদ্রোহগুলির পূর্ব সময় হতে বাংলার রংপুর জেলাস্থিত নগরে (ফুলচৌকিতে) এ'রা অবস্থান করছিলেন।

"ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতিতে তিনি প্রস্থান করেন।" ঠিকই, ইনি কোন যুদ্ধে বিপক্ষীয়দের নিকট ধরা পড়েন নি। কিন্তু সে সব আলোচনা করবার পূর্বে ওয়ালীদাদ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ওয়ালিউল্লাহ্ সাহেবের লেখা এখানে উল্লেখ করা হল।

"মধ্য ভারতের আর একজন খ্যাতনামা বিদ্রোহী নেতার নাম ওয়ালীদাদ খাঁ। তিনি দিল্লীর রাজবংশোদ্ভূত এবং তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। ইনি মালগড়ের বিখ্যাত দুর্গটি তিনমাস স্বীয় দখলে রাখিয়াছিলেন। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের পর ধৃত হইয়া ইনি ইংরেজদের হাতে নিহত হন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের অনেককেও ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইয়াছে।" —আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃষ্ঠা—১২৪

"কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের পর ধৃত হইয়া ইনি ইংরেজদের হাতে নিহত হন।"

একথা ঠিক বলে আমরা জানি। তবে কোথায় ধৃত হন, সে কথার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইনি ফুলচৌকি প্রাসাদের পার্শ্বস্থিত বালাখানায় প্রায় অধিকাংশ সময় সপরিবারে বাস করতেন। যদিও এটা নগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সেই স্থানটির নাম হল 'কৃষ্ণনগর।' কৃষ্ণনগর বালাখানায় তিনি থাকতেন বলে তাঁকে বালার মিয়া বলা হতো। কারণ চাকর বাকর বা অন্য লোকেরা কখনও এদের নাম ধরে ডাকত না। তাই ঐ নামে সম্বোধন করতো। এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখিত ছড়াগানের গায়ক জহুর ফকিরের ও তৎবংশীয়দের গাওয়া গানের কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি। যাদের কাছ থেকে আমি গানগুলি সংগ্রহ করেছি তাঁরা হলেন ঃ

কেরামউদ্দীন মণ্ডল। গ্রাম তিলোক পাড়া, থানা মিঠাপুকুর জিলা রংপুর।
পীর হাফেজউদ্দীন মিঞা। গ্রাম ধরমপুর, থানা ফুলবাড়ী জিঃ দিনাজপুর।

ছড়া গান

আরো একনা কথা এখন বলিব তোমাদিগকে ভাই।
সে তো দুঃখের কথা পরানের ব্যথা গান গাহিয়া শুনাই ॥
হায়রে ব্যথা দুঃখে হৃদয় ফাটে চোখে আইসে পানি।
হুজুর গৌউস খিজির ওয়ালীদাদ হইল কোরবানী ॥

ওয়ালীদাদ মুহাম্মদ কুরবানী হয়েছেন। যদিও সরাসরি তাঁকে কুরবানী করা হয় নি। তবুও কুরবানীর চেয়েও কঠিনতর কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্য দিয়ে হত্যা করা হয়। ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের এক মেয়ে ব্যতীত সকলকে পিস্তলের গুলীতে হত্যা করা হয়। এমনকি ছোট ছোট মাসুম বাচ্চাকেও পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয় নাই। এদের ছোট বড় বাঁধানো কবরগুলি এখনও ফুলচৌকি নগরের পার্শ্বে, বালাখানা মসজিদের কাছে রয়েছে। ফুলচৌকির প্রাসাদ ইংরাজ পক্ষীয় এদেশীয়রা তিনবার বন্দুক কামান দিয়ে লুঠতরাজ করে। এই লুঠতরাজ সম্পর্কে জহুর ফকির এবং তৎবংশীয়রা যে গান গেয়েছেন, তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

কথা শুরু

আরো একনা কথা এখন বলিব তোমাদিগকে ভাই।
সে ত দুঃখের কথা পরানের ব্যথা গান গাহিয়া শুনাই॥
হায়রে ব্যথা দুঃখে হৃদয় ফাটে চোখে আইসে পানি।
হুজুর গৌউস খিজির ওয়ালীদাদ হইল কোরবানি।
কামান চালা তলোয়ার যুদ্ধে তামার কাছে ফিরীঙ্গি কি লাগে।
লড়াইয়ে ফিরীঙ্গি জিতিয়া নিল ভাল করি একতা হবার আগে।
এক যে ছিল দাতা ভাইরে আরবের হাতেম তাই।
এই দাতাদের মত সাউকার কখনও দেখি নাই॥
নব্বই কাছে বয়স গেল কি বলিব ভাই।
বাঙ্গেলা হিন্দুস্থানে কভু দেখি নাই॥
যুদ্ধের সময় আগুন মরদ ঠান্ডার সময় পানি।
আমীর ফকির সক্কলকে ভাই বক্ষে নেয় টানি॥
শয়তানী ঘুষ এঁর পাত অ'য় ইংরাজ গুলোর হইল বাহে চাল।
লড়াই ছাড়িয়া কায় কিবা হইবে এইটায় হইল ভাই হে কাল॥
গুড়ুম গুড়ুম কামান দাগে নসীর পালোয়ান।
মাও জননী আমীরন বলে'হও যে সাবধান॥
তর নাই আগবাড় যেতনা হো ভাইয়া গাজী সঙ্গী।
আগবাড় আগবাড় ভাগতা হায় শয়তান ফিরীঙ্গি॥
সেই ইন্দ্রানী আমিরন মার আইজ কিবা দশা হইল।
নজর বন্দী হইয়া তারা সব রাজপুরীতে রইল॥

যার কথার চোটে আগুন ছুটে মুখে ফুটে খই।
সেই পাটরানী মাও জননীর দুঃখের কথা কই ॥
সোনারুপার থাল বাসনে যায় বা খাইল খানা।
শেষে খড়ের ঘরে সেই মাও জননীর হইল হে আস্তান! ॥
ও হো যার কত পুরী বালাখানা কামালউদ্দীন নাম।
তার মত ধনী ছিল কেবা মায় বাঙ্গেলা হিন্দুস্থান ॥
সেই রাজা কামালের বড় ছাইলা সাজাদা নসীর জঙ্গবটে।
বাঙ্গেলা হিন্দুস্থানে মান্য মানে তামার কাছে কেবা আটে ॥
নগর হইল গ্রাম জগদীশপুর প্রকাশ্য ফুল চৌকিঘর।
এমন ইন্দ্রপুরী যায়না দেখিছে মিছা জন্ম তার ॥

দ্বিতীয় প্যারা

আরো একনা গান ভাই শুন দিয়া মন।
নওয়াব নসীর জঙ্গের কথা করিব বর্ণন ॥
গান করিলাম শুরু এখন মন কর স্থির।
চৌদিকে সব্বাই বলে সাব্বাস সাজাদা নসীর ॥
মারাঠা নানাজী আর মোগল নসীর বীর।
লড়াই করিল ইংরাজের সনে দিল না ভাই শির ॥
বড় দোস্তি ভাই ভাই এক সঙ্গে রয়।
কেহ কারে না দেখিলে দুঃখ তাতে পায় ॥
বয়সে নানাজী বড় আর ভাই নসীর জঙ্গ কনিষ্ঠ।
কত আর কইম মুই মোকেনা কইমেন দুষ্ট ॥
কত শত গাজী মোল্ল্যা আর কত ধন অধিপতি।
তাহাদিগের সনে ভাইরে পাতিল দোস্তি ॥
সাহেবী লেবাছ আর সোলার টুপী মাথায় দিয়া।
ছাউনি ছাউনি ঘোরে নসীর ফিরিঙ্গী সাজ নিয়া।
তার মত কামান চালায় সাধ্য আছে কার।
যথা ইচ্ছা তথা মারে নওয়াব তোরওয়ার।।
ছুরৎ নুরানী তার যেনবা রাঙ্গা সোনা।
ফিরিঙ্গী সাজ নিলে সাজত ইংরাজ জনা।।
লড়াই ভারী নসীর জঙ্গ ঘুরিয়া বেড়ায় হেলা আর হোত্তা।
সল্লা করি ঘুরিয়া আনিল পীর কেরামত আলী কত্তা।

রাজা ধুন্দ পন্থ নানাজী শমসের হায়াৎ জঙ্গ খাঁ।
মইল থাকিয়া রাজপুরীতে কেউত জানলো না।।
মায়ে যেমন ছাও রাখে ভাই বক্ষে করি ধরি।
ঐ মত রাখি ছিল নওয়াব নসীর তাহাকে ঘেরি।।
কানাঘুষা করে সব লোকে ভয়ে বলে আল্লাহরি।।
এ খবর পাইয়া ফিরীঙ্গি রাজ গোস্বায় যায় ভরি।
কমরের ছুরি পেট কাটে ভাই জানেন সব্বাই।
ওমর উদ্দীন আছিল এক কত্তার জামাই।।
ওমর বেহুদা খবর দিল ফিরিঙ্গী আসিল তরিৎ।
প্রজা পাইটে সকলে বলে এ বাত নহে নহে ঠিক।।
যাহা আছিল শেষ সম্বল লইলরে হরি।
রাজপুরীটাও লিখিয়া লইল নানা ছুতা করি।।
পিঞ্জিরায় থাকি সিংহ যেমন ডাকে আর ঘোরে।
ঐ মত নসীর জঙ্গ এক এক হুংকার ছাড়ে ।।
ফুলচৌকি হইল যে দিল্লীর রাজধানী।
গাজীগণ তাহারই লাগি হইয়াছিল ভাই কোরবানী।
তাহারা কুমুটি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া নিছিল শপথ।
লড়াই এ হাড়িয়া গাজীদিগের পড়িল কত শত আপত।।
শেষে উমরের লোভে পাপ পাপে বিনাশ হইল সর্ব লোকে কয়।
ভাইহে পাপী উমরকে মারিল দেওয়ানজী খাঁ আছানউল্ল্যা মহাশয়।।
মারীতে কত লোক আছিল দাওয়ার খড়কু খটু কেবা করে কার নাম।
প্রজা পাইট ধনপতি গাজী ফকির গোসাইজী সন্ন্যাসী দিকের কাম।।

তৃতীয় প্যারা

(কথা শুরু)

কামান দাগিয়া তারা ফেলিল আগুনের গোলা।
ছ্যায়ে ছ্যায়ে দালান ভাঙ্গিয়া হইল হাড়ির খোলা।।
খুব ছুরত খান আছিল আকারে কুশাইরের গুড়া।
ডাকাইত ফিরিঙ্গী ভাঙ্গিয়া তাক একেবারে করিল গুড়া।।
যত আছিল আমলা বরকন্দাজ দিল্লী যায় মারিতে অরি।
এ খবর পাইয়া ফিরিঙ্গী রাজ গোস্বায় গেল ভরি।।

হুজুরের ঘরে সাথে দিল্লী গেল গাজী সিপাই আর পেয়াদা।
এই সুযোগে ফিরীঙ্গি গুলা পাইয়াছিল বড় ভাল কায়দা।।
ছোট হুজুরের কথা কওয়া না যায় বুক ধড়পড় করে।
খিজিরউদ্দীন নাম যার মইল যায়া দিল্লী শহরে।।
সেই হুজুরের কেহ নাই ভাই একনা কন্যা ছাইলা আছে।
যারা তামান দেশের বড় আছিল তারা আজ সবার পাছে।।
একনা খালি কন্যা আছে হুজুর গৌউসউদ্দীনের হায়।
ইংরাজ আজরাইল যাক দেখিলে যমহেন ভয় পায়।।
বড় হুজুর নসিরউদ্দীন তার তিন বেটা এক বেটি আছে।
সোনা রূপা হিরামণি সব নিয়াছে কি দিয়া তারা আইজ বাঁচে।।

জহুর ফকিরের ভাষায় শুনুন ঃ

দিন সন্ধ্যা কাটিয়া গেল রাইতের দুই প্রহরে।
শোল্লক[১] কহিয়া ডাকু রাজপুরী ঘেরে।।

কামানের গোলা নিক্ষেপ করে স্থানে স্থানে দালান ভেঙ্গে ফেলা হয়। অতি সুন্দর সুন্দর দালানের থাম পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। আমলা বরকন্দাজ প্রভৃতিরা মনিবের সঙ্গে দিল্লী চলে যায়। অনেক গাজীও তাঁদের সঙ্গে যায়। এমনি ধরনের কথা এখানে গানে বলা হচ্ছে। এই রাজবাড়ীর আরও কয়েকজনের নাম কবি বলেছেন তাঁর গানে। তাঁদের আলোচনার পরে আমরা সে সব কথা বলবো। যে স্থান হতে প্রথম কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেই মাঠের নাম এখন অবধি লোকে বলে থাকেন 'আগুন গরাস'। বিরাট আকারের আগুনের হল্কা এক সঙ্গে বের হয়ে যাওয়াকে 'আগুন গরাস' স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় বলে থাকে। শোনা গেছে ডিমলার জমিদার পায়রাবন্দের জমিদার মাহিগঞ্জের বংকু সাহা ও ইংরাজ এবং তাদের এ দেশীয় লয়লস্কর সহ, ফুলচৌকি প্রাসাদ আর আশেপাশের জনপদগুলির শত শত লোককে হত্যা ও বিনা বিচারে গাছে গাছে ডালে ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই অত্যাচার ফাঁসি ও লুটতরাজ-তিন বছর ধরে চলে। ফুলচৌকির প্রাসাদটিও সিপাহীরা তিন বৎসর পাহারা দিয়ে রেখেছিল। এ সব কথাও আমীর মিঞা এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী লোকেরা

---

[১] শোল্লক অর্থ এখানে কমাণ্ড বুঝিতে হবে।

বলেছিলেন। ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের এক মেয়ে ব্যতীত তাঁর বংশের আর কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের দৌহিত্র, তংক বা তংকা নিবাসী আমীর মিঞাকে আমি (লেখক) ছোট বেলায় দেখেছি। তাঁর কাছে আমি এ সব কথা অনেক বার শুনেছি। আমীর মিঞা, আত্মীয়তা সম্পর্কে আমার দাদু হন। আমাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীটিই তাঁর ছিল।

সিপাহী বিপ্লবে এ দেশীয়েরা হেরে যাওয়ার পর ইংরাজরা আমীর মিঞা ও তমিজ মিঞাকে তাঁদের পৈতৃক বাড়ীতে আর ফিরে যেতে দেয় নি।

তংকায় ও লোহানী পাড়ায় আর তাঁদের কোন সময় ফিরে যেতে দেওয়া হয় নি। এ কারণে তাদের স্থাবর অস্থাবর সব কিছু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। এদের কোর্ট কাছারী ও বালাখানা সেখানেও আর যেতে পারে নি। এসব কথা আমীর মিঞার মুখে আমি (লেখক) শুনেছি। বিদ্রোহের সময় তার বয়স ১৯।২০ বছর ছিল। এ কথাও তিনি বলেছেন। আমীর মিঞা তাঁর নানার মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> রাত্রি দুই প্রহরের সময় কামানের গোলার শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ, মানুষের কোলাহল চিৎকার এর মধ্যে দিয়ে চললো, হত্যা ও লুটতরাজ। রাত ভোর হয়ে গেল কিন্তু তখনো হত্যা চলছিল। এরপর দুর্বৃত্ত কসাইরা নানাজীকে মানুষের সামনে খুব মারলো। মারলো নয়। লাথি আর লাথি। এরপর আধমরা যখন হল, তখন তাঁর গা ছিলে গায়ে লবণের ছিটা দেওয়া হয়। তারপর আবার মারে। নানাজীকে প্রথম হাত তুলে ফিরিঙ্গীদের সালাম করার কথা বলে। কিন্তু নানাজী সাহেব ফিরিঙ্গীদের কখনো সালাম দেননি। নানাজীকে হাতীর পাঁয়ে বেধে রংপুরে নিয়ে যাবার আদেশ হয়। এ জন্যে নানাজীদের হাতীশালা হতে সব হাতী নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু কোন হাতীই তাঁকে পায়ে বাঁধতে দেয়নি। শুড়ে ও লেজ উপরে তুলে চিৎকার দিয়ে পালিয়েছে। ডিমলার জমিদার যে হাতীতে চড়ে এসেছিল সেই হাতীর সামনের বাঁ পায়ে বেঁধে রংপুরে নিয়ে যাওয়ার পথে, হাতীর পায়ে বাঁধা অবস্থায় নানাজীর মৃত্যু হয়। নানাজীদের রঙমহলের লিচু বাগানে তাকে ফেলে দেয়। মহিপুরের ফকির সাহেবরা রঙমহলের লিচু বাগানে তাঁকে কবর দেয়। পরে নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ মামুজী, নানাজীর

কবর বেঁধে দেন। (বর্তমান রংপুর শহরের খান বাহাদুর আবদুর রউফ সাহেবের বাসার সামনে লিচু বাগান ছিল)।

ছালেক মটোর পাম্প ঘেষে উক্ত কবর এখনও রয়েছে। এ সব কথা আমীর মিঞা ব্যতীত ফুলচৌকির আরো অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের কাছে আমি (লেখক) শুনেছি। তাঁরা এসব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন। পরে ধীরে ধীরে তাদের সকলের নাম ও কথা বিবৃত করা হবে। জনাব ওয়ালিউল্ল্যাহ সাহেব ঠিকই বলেছেন, "পরাজয়ের পর ধৃত হইয়া ইনি ইংরেজদের হাতে নিহত হন।" বিদেশীয়দের হাতে ধৃত হয়ে আমাদের বর্ণিত মত একে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

শাহযাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ (সুলতান)

শাহযাদা হত্যা

শাহযাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমে আরো নিরস্ত্র তিনজন মোগল শাহযাদাকে কিরূপে নির্দয়ভাবে ইংরাজ সৈনিক ক্যাপ্টেন হড্‌সন পিস্তলের গুলীতে হত্যা করল তার বিবরণ নীচের উদ্ধৃতিতে দেখাবো—

> কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সনের মৃগয়ানুরাগ ইহাতেই অন্তর্হিত হইল না। এখনও বৃদ্ধ ভূপতির পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়গণ লুক্কায়িত ভাবে ছিলেন। হড্‌সন সাহেব বিশ্বস্ত—এক চক্ষু রজীব আলীর নিকটে ইঁহাদের সংবাদ পাইলেন। এদিকে এলাহি বক্স ইঁহাদিগকে বন্দী করিবার আয়োজন করিলেন। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং দিল্লীর সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এখন এই দুইজনই তাঁহাদের আত্মীয়দিগের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। তিনজন শাহযাদাকে খাজের সুলতান, মীর্জা মোগল এবং আবুকে বৃদ্ধ মোগল ভূপতির অবরোধের স্থল—সমাধিভবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কাপ্তেন হড্‌সন ইহাদিগকে ধরিবার জন্য সেনাপতি উইল্‌সনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি কাপ্তেন হড্‌সনের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরং অনুমতি দিতে দোলায়মানচিত্ত হইলেন। শেষে সেনানায়ক নিকেল্‌সনের আগ্রহে অনেক কষ্টে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অনুমতি দিলেন। কাপ্তেন হড্‌সন একশত সৈনিক পুরুষ এবং তাঁহার সহযোগীর সহিত পুনর্ব্বার হুমায়ুনের সমাধিভবনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। রজীব আলী ও এলাহি বক্স অশ্বারোহণে উক্ত স্থলে গমন করিল। শাহযাদাদিগের মুক্তির কোন উপায় রহিল না। ইহাদের অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। সর্বাপেক্ষা সাহসিক শাহযাদা আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অপর দুইজনের মনঃপূত হইল না। বৃদ্ধ পিতার দৃষ্টান্ত ইহাদিগকে জীবন রক্ষার জন্য কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে

করুণাভিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল ইহারা বিজেতার নিকটে কাতরভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাপ্তেন হড্‌সন্ কিছুতেই এই প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে তিনজন শাহযাদা বিজেতার মহানুভবতার উপর নির্ভর করিয়া, আত্মসমর্পণে প্রস্তুত হইলেন।

রথের মত গোবাহিত বস্ত্রাচ্ছাদিত যানে তিনটি রাজকুমার আপনাদের অবস্থিতি স্থল হইতে বহির্গত হইলেন। তাহার কাপ্তেন হড্‌সনের নিকটে আগমন পূর্বক বাহিরে কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন না দেখাইয়া, কাপ্তেনকে গম্ভীরভাবে সেলাম করিয়া কহিলেন যে, অবশ্য আদালতে তাঁহাদের বিষয়ে রীতিমত বিচার হইবে। কাপ্তেন হড্‌সন প্রত্যাভিবাদন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রাজকুমারগণ তাঁহাদের অসহায় বালক-বালিকা ও কুলনারীর শোনিতপাত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাহাদের শোনিতপাতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বলবতী প্রতিহিংসার আবেগে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি এ সময়ে নিতান্ত অকার্য্যকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সর্বপ্রথম অনুগমনকারী, সশস্ত্র লোকদিগের অস্ত্র গ্রহণে উদ্যত হইলেন। এ সময়ে ইংরেজের ক্ষমতা দর্শনে লোকের সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল। লোকে সম্রাটের প্রাসাদে ইংরেজের জয় পতাকা উড্ডীন দেখিয়াছিল, সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা অসম সাহসিক কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল। হড্‌সন্ সাহেব অনুচরদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাপ্তেনের সৈনিকরা ইহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র, ঘোটক ও যানাদি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একত্র করিল।

অবশেষে কাপ্তেন হড্‌সন্ চালকদিগকে নগরের অভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহারা সৈনিক যানের পার্শ্বে যাইতে লাগিল। বহু সংখ্যক লোক নির্ব্বাকভাবে ইঁহাদের অনুগমন করিল। রথ নগরের সমীপবর্তী হইল। কাপ্তেন হড্‌সন্ আপনার সৈনিকদিগকে সম্বোধনপূর্বক পাশ্ববর্তী লোক শুনিতে পায়, এইভাবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, এই শাহযাদারা নরঘাতক। ইহারা আমাদের কুলমহিলা ও বালক বালিকাদিগকে বধ করিয়াছে। গভর্নমেন্টের ইচ্ছানুসারে এখন ইহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইবে। ইহা কহিয়া, তিনি শাহজাদাদিগকে

রথ হইতে নামিয়া নিম্নভাগের গাত্রচ্ছদ খুলিতে আদেশ দিলেন। শাহজাদারা কম্পিত হৃদয়ে আদেশ পালন করিলেন। অবশেষে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার রথে চড়িতে আদেশ দেওয়া হইল। অনন্তর কাপ্তেন্ হড্‌সন্ আপনার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সওয়ারগণ তদীয় আদেশ পালন না করিতে পারে, ইহা ভাবিয়াই হউক, অথবা তিনি স্বয়ং আততায়ী বধ করিয়া, প্রতিহিংসার তৃপ্তিতে আমোদিত হইবেন, এই ইচ্ছাতেই হউক, কাপ্তেন হড্‌সন্ একজন সওয়ারের হস্ত হইতে পিস্তল লইলেন এবং আপনার নিরস্ত্র বন্দীদিগকে নিজ হস্তে গুলী করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর তিনি আপনার শিকার লইয়া হৃষ্টচিত্ত নগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সাধারণে দেখিতে পায়, এইজন্য কোতয়ালির সম্মুখে নিহত রাজকুমারদিগের দেহ রাখা হইল।...

ঐতিহাসিক মার্টিন সাহেবও এই বিষয়ে অনুমোদন করেন নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে লর্ড রবার্টস উপস্থিত সময়ে দিল্লী সৈনিকদলে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি অপরাপর লোকের সহিত দিল্লীর ভূপতিকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে যারপর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বোধ হইয়াছিল।[১] ফিরিয়া আসিবার সময়ে ভূপতির দুইটি পুত্র এবং একটি পৌত্রের শব দেখিয়া চমকিত হইয়াছিলাম। উহা কোতয়ালির সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর পড়িয়া রহিয়াছিল।" ইহার পর তিনি এই শাহাজাদাদিগের নিধনের বিবরণ দিয়া, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।[১]

একটা জাতির জাতীয় মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন অত্যন্ত নীচু প্রকৃতির মানুষ তাদের মধ্যে এসে জন্মায়। যেমন, এক চক্ষু কানা রজীব আলী এবং এলাহী বক্সের মত লোক জন্মায়। এই উভয় ব্যক্তি দিল্লীর সম্রাট পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং সম্রাটের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। এরা মোগল রাজবংশের লোক হলেও ঐ বংশ এবং গোটা ভারতের অধোগতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কারণ এরা বিদেশীয়দের নিকট এদেশীয় বিদ্রোহীদের মূল্যবান সংবাদগুলি নিয়মিত সরবরাহ করত।

গোয়েন্দা ক্যাপ্টেন হড্‌সন্ তিনজন নিরস্ত্র মোগল শাহজাদাকে

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত, পঞ্চম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, দিল্লী, পৃষ্ঠা ২৭৬—২৭৭—২৭৮—২৮২।

পাশবিকভাবে গুলী করে হত্যা করেছে। এই তিনজন শাহজাদার মধ্যে বিদেশীয় ইংরাজ কর্মচারী সৈনিক সম্ভবত যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, লর্ড হয়েছিল বলে মনে হয়। এদের কথার গাথুনি, বলার ভঙ্গিমা ও দরদের আবেগময় উচ্ছ্বাস যেমনি নিখুঁত তেমনি চমৎকার বটে। তা না হলে, "সম্রাটের দুই পুত্র এক পৌত্র" এই কথা মিস্টার রবার্টস বলল কি করে! এই বিদেশীদের যখন যা মুখে এসেছে, তাই যে বলেছে এবং যখন যা কলমে এসেছে তাই যে লিখেছে তাই নয়। ইহারা মোলায়েম কথা এবং দয়া দেখাবার ভান করে অনেক সময় আসল সত্য এড়িয়ে গেছে। নইলে খোদ ইংরাজ লর্ড রবার্টস্ শাসকের ভূমিকায় থেকেও কি করে বলল যে, "দুই পুত্র এক পৌত্র।" প্রকৃত সত্য হল; দুই পুত্র, এক সম্রাটের আত্মীয় ভাই। ভাই যিনি, তাঁর নাম খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদ। ইনি সম্রাট বাহাদুর শাহের আপন মামা—জামালউদ্দীন মুহাম্মদের একমাত্র পুত্র। বাংলার ফুলচৌকি নগরে এর জন্ম। সম্রাট পরিবারে ইনি বিয়ে করেছিলেন। অবশ্য ইনিও মোগল রাজবংশোদ্ভূত ছিলেন। শোনা যায়—যুদ্ধ সময় খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদের বয়স ২০ বছরের বেশী ছিল না। পূর্বোক্ত ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের ইনি ভাতিজা ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে উক্ত খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদ; তৎকার মিঞা তালিয়ার খাঁর দুই পুত্র, আর আহ্সান উল্যা খাঁ প্রভৃতি ঐ সময় যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে দিল্লীতে ছিলেন। ঐ সঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদের গোটা পরিবারটাকে ইংরাজরা সব সময় সতর্কতার সাথে আগে থেকে নজরে রেখেছিল। এখানেও তাই দেখা যাচ্ছে। সম্রাট-পুত্রদ্বয়ের নামের পূর্বে প্রথমে খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদের নাম আছে। এঁর আপন জ্যাঠাতো দুই বড় ভাই নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদ। যুদ্ধকালে এঁরা অসাধারণ দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করেন। সে সব কথা আমরা পরে আলোচনা করব। খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদের সমস্ত সম্পত্তি এবং বিপুল ব্যবসা জমিদারী স্থাবর অস্থাবর মালামাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এঁর একমাত্র কন্যা তাঁর নাম খুশীউন্নেছা (খুরশীদুন্নিসা)? উক্ত খুশীউন্নেছা যুদ্ধের পরে সাবালিকা হলে বিবাহিত হয়। বিয়ের অল্প পরে এঁর মৃত্যু হয়। তদবধি ঐ বংশ একরূপ শেষ হয়ে যায়। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের ভীতির কারণ হয়ে যে রাজনীতিবিদ সব সময় ছিলেন সেই নূরউদ্দীন বাকের

মুহাম্মদ জঙ্গ-এর পৌত্র ছিলেন উক্ত খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ। জহুর ফকির ও তৎবংশীয়দের রচিত ধুয়া ও ছড়াগানে, খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদের নাম এবং মেয়ের কথা উল্লেখ রয়েছে। উক্ত খুশীউন্নেছার সাথে যার বিয়ে হতে (যাচ্ছিল নানা কারণে তা হয়নি), সেই ভদ্রলোকের সহিত ফুলচৌকিতে আমার দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক এসেছিলেন দৌহিত্রীর বাড়ী বেড়াতে। উক্ত ভদ্রলোকের নাম কাজী জায়দুল হক। রংপুরের পীরগঞ্জ থানাধীন খোলাহাটি গ্রামে এঁর নিবাস। সিপাহী যুদ্ধের সময় ইনি দারোগা ছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজরা চাকুরী হতে অবসর দিয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে পেনশন দিয়ে এসেছে। যখন তিনি বেড়াতে আসেন তখন তাঁর বয়স ১২০ বছর। আমি তখন একেবারে কিশোর। আমার বয়স ১৪/১৫ হবে। কাছারী ঘরের সামনে কাঁঠাল গাছের নীচে কাজী সাহেব একটা চেয়ারে বসেন। আর অন্য লোকেরা চেয়ার ও চৌকিতে বসেছিলেন। আমিও চৌকির এক কোণে বসেছিলাম। যদিও ১২০ বছর বয়স কিন্তু কথা বলবার শক্তি তাঁর ঐ সময়েও বেশ ছিল। ফুলচৌকির মোগলরাজ পরিবারের অতীতের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে নানা কথা হচ্ছিল। সকলেই শ্রোতা। বক্তা হলেন উক্ত কাজী সাহেব। কাজী সাহেবের সাথে খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদের কন্যা খুশীউন্নেছার বিবাহের কথা হয়েছিল; সে কথাও তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন। পরিবারের কে কোথায় কেমনভাবে মারা গেল, কিভাবে এঁদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেল প্রভৃতি কথা তিনি গম্ভীরভাবে বিবৃত করেছিলেন। তিনি সেদিন যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল এই খেজেরউদ্দীন মুহাম্মদকে গুলী করে ফিরিঙ্গীরা হত্যা করে দিল্লীতে। ওয়ালীদাদ মুহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদকে, বহু অত্যাচার করে ফিরিঙ্গীরা মেরে ফেলে দেয় রঙমহলের রাস্তার পাশে। ফুলচৌকি এবং বিভিন্ন জায়গায় অন্ততঃ ২৫ হাজার লোককে গুলী করে না হয় ফাঁসি দিয়ে মারে। কিয়ামতের মত মানুষের দুর্দিন ঐ সময়টিতে নেমে এসেছিল। বহু মানুষ দূর-দূরান্তর এমন কি আসামের জঙ্গলেও পালিয়ে গেছে। এঁরা যে কত বড় ছিলেন, তাহা এখনকার মানুষ অনুমান করে বুঝতে পারবে না। পূর্ব হতে দিল্লীর বাদশাহ ও শাহযাদা শাহযাদীদিগকে এঁরা নানারূপ খরচা যুগিয়ে এসেছেন। এঁরা একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন, তেমনি মানুষের উপকার ও মেলামেশা করতেন তাঁদের সঙ্গে। সকল মানুষ এঁদের সামনে পিছনে খুবই সম্মানের সহিত দেখে আসতো। অতীত দিনের

এমনি ধরনের কথা তিনি বলে আসছিলেন নানা প্রশ্নের মাধ্যমে। "যুদ্ধের পূর্বে আপনি ফুলচৌকির প্রাসাদে এসেছিলেন কি ?"

এই প্রশ্ন হঠাৎ কেন যেন আমার মুখ থেকে বের হয়ে এসেছিল। প্রশ্ন করে আমি লজ্জিত হলাম। কারণ আরো অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ লোক ওখানে ছিলেন। কিন্তু কাজী সাহেব ধীর ও শান্তভাবে আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনি মূল প্রাসাদের স্থানটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, এর চতুর্দিকে দুই মাইলের ভিতরে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, কোন রাজা, জমিদারও বিনানুমতিতে আসতে পারতো না। চতুর্দিকে সঙ্গীন-ওয়ালা বন্দুকধারী ও কোষবদ্ধ তলোয়ার ঝুলিয়ে পাহারাদাররা পাহারা দিত দিন রাত সমান ভাবে। তাদের সঙ্গে থাকতো নাকাড়া, বিপদ এলে সে সব সিপাই সান্ত্রীরা বাজাত। শান্তির সময় বাজাত দামামা জয়ঢাক এবং শানাই। তাই তিনিও সে সময়ে আসেন নাই।

বলা বাহুল্য নিরস্ত্র মোগল শাহজাদাত্রয়ের হত্যাকারী ক্যাপ্টেন হড্সন, লাখনৌয়ে এদেশীয় বীর সৈনিকের গুলীর আঘাতে মৃত্যুবরণ করল। তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে বোঝা যাবে।

যিনি দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে শাহ-জাদাদিগকে বধ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে অপকীর্তির ভাগী হইয়াছিলেন, বেগম কুঠী আক্রমণকালে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। উক্ত কুঠির ভিন্ন ভিন্ন গৃহে সিপাহীগণ অবস্থিতি করিতেছিল। সুতরাং ইংরেজ সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন গৃহ আক্রমণ করে। একটি গৃহের দ্বারের একাংশ দিয়া দেখা গেল যে, অন্তর্ভাগে সশস্ত্র সিপাহী রহিয়াছে। প্রজ্বলিত বারুদ দ্বারা ইহাদিগকে উড়াইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। সুতরাং আক্রমণকারিগণ বারুদের বস্তার প্রতীক্ষায় রহিল। কিন্তু অসম সাহসিক হড্সন অল্পক্ষণও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে করিয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। সার্জেন্ট ফর্বস্মিচেল তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি বারণ করিলেন। কিন্তু হড্সন তাহার কথা শুনিলেন না। তিনি এক পা অগ্রসর হইতে হাত দিয়া, তাঁহাকে বহির্ভাগে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময়ে দুঃসাহসিক কাপ্তেন 'মা গো' বলিয়া পড়িয়া গেলেন। একজন সিপাহীর নিক্ষিপ্ত গুলীতে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ হইয়াছিল। কাপ্তেন হড্সন আপনার হঠকারিতা এবং দুঃসাহসের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।"[১]

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত, পঞ্চম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, লক্ষ্ণৌ অধিকার, পৃষ্ঠা ৩৬৭-২৬৮।

ফজিল খাঁ।

আমরা মুহাম্মদ ফজিল খাঁ সম্পর্কে আলোচনা করবার পূর্বে রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় বর্ণিত ইতিহাস হতে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম :

> স্যার হিউরোজ্ মধ্য ভারতবর্ষে বিপ্লবের নিবারণে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইন্দোর হইতে কাল্পী পর্যন্ত এরূপ বিপ্লব ঘটে যে, উহার নিবারণের জন্য উক্ত ইংরেজ সেনাপতিকে সবিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয়। রথগড়, সাগর, চন্দেরি, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে সৈনিকবলে বিপ্লবের শান্তি ঘটে। রথগড় মধ্য ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন গিরি দুর্গ। উহা সাগরের চব্বিশ মাইল দূরবর্তী মুহাম্মদ ফজিল খাঁ নামক এক ব্যক্তি 'মুন্দেশ্বরের নবাব' উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সেই দুর্গে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতিপক্ষের পরিচালক হয়েন। ১৮৫৮ অব্দের জানুয়ারী মাসে স্যার হিউরোজ দুর্গ আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষের অধিকাংশ পলায়ন করে ফজিল খাঁ ধৃত হয়েন। দুর্গের প্রধান দ্বারের নিকট ইহার ফাঁসি হয়।[১]

"ফজিল খাঁ,' এনার নিবাস বাংলার রঙ্গপুর জেলাস্থ তংকা (তংক) নামক স্থানে। সহৃদয় পাঠক 'তংক' বা 'তংকা' নামক স্থানের নাম শুনে হয়তো সহজ ভাবে মনে আসতে পারে, এ বুঝি রাজপুতনার টংক' হবে। তবে তা ঠিক নয়। কারণ রাজপুতনার টংকের নবাবরা '১৮৫৭-এর বিদ্রোহে ইংরাজ পক্ষে ছিল। পরবর্তী সময়গুলিতেও ইংরাজদের মোসাহেবী করেছে তারা। এ সব কথা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। যে তংকের নাম 'আঠারোশ সাতান্নর বিদ্রোহ' নামক অনূদিত বাংলা গ্রন্থে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং ঐতিহাসিক শ্রী অশোক মেহতা উল্লেখ করেছেন :

> তালিয়ার খানের দুই ছেলে তংক থেকে এসেছিল দিল্লীতে বেড়াতে। বিদ্রোহ ঘটাতে তারা আর ফিরে যেতে পারেন নি। তাদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে আজ। —গোলিব রচিত উদ-ই-হিন্দ, পৃষ্ঠা ৮২

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : রজনীকান্ত গুপ্ত, পঞ্চম ভাগ, পঞ্চম অধ্যায়, 'সাগর ও নর্মদা প্রদেশ, পৃষ্ঠা ৩৮৩।

উক্ত তালিয়ার খাঁ হলেন আলোচ্য ফজিল খাঁর আপন চাচা। তালিয়ার খাঁর কুঠিবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনো (আধুনাভ্যালোয়া নামীয়) সরোবরের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত রয়েছে। লোকে এখনো 'তালিয়ার খাঁর কুঠি' 'তালিমগঞ্জের কুঠি' বলে থাকেন। 'মুন্দেশ্বরের নবাব' উপাধি ধারণকারী মুহাম্মদ ফজিল খাঁ উক্ত তঙ্কের মিঞাদের লোক। এঁরা পাঠান ও মোগল আমল হতে উক্ত তংকা নামক স্থানে বাস করে এসেছেন। পাঠান ও মোগল রাজবংশীয়দের সাথে এঁদের বৈবাহিক সূত্র পূর্ব হতে ছিল। এঁরা সৈয়দ বংশীয় হলেও খাঁ এদের উপাধি। রঙ্গপুর ও ইহার পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন তংকার মিঞা এই খাঁ গণ। হিন্দু, মুসলমান বিশেষ করে হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এদের খুবই মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে জানা যায়। ফকিরদের এঁরা অগ্রণী ছিলেন। কারণ সৈয়দ বংশের জন্য এঁদেরকে লোকেরা খুবই মান্য করতো। এ জন্য ফকিরদেরও এঁরা অগ্রণী ছিলেন। এখন তংকা একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হলেও এদের নির্মীয়মান তংকার মসজিদে প্রতি শুক্রবার এত শিরনী আসে, যা উত্তরবঙ্গের আর কোন মসজিদে আসে না। তংকার মসজিদে, 'কদম রসূল' [পাথরের চিহ্নিত হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি পায়ের দাগ] আছে। এই বংশের শাখা-প্রশাখার সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং ফাঁসি দিয়ে মারা হয়। এই বংশের মধ্যে শুধু ফজিল খাঁর দুই পুত্র কোন রকমে বেঁচে যায়। তাদের নাম হল আমীর খাঁ ও তমিজ খা। আমাদের বর্ণিত উক্ত ফজিল খাঁ শাহজাদা ওয়ালীদাদ মুহাম্মদের জামাতা ছিলেন। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য ফজিল খাঁর পূর্বপুরুষগণ যে উক্ত এলাকাগুলির জমিদার ছিলেন তা উপরে বর্ণিত বিষয় হতে জানা যায়। তাদের পূর্বপুরুষ জমিদার কোববাদ খাঁ নামীয় (১১৪৩ সালে ৯ই বৈশাখ), মোয়েনপুর মৌজাস্থিত ৯ বিঘা লাখেরাজ জমি, নইমুল্লাকে পিরপাল, (মসজিদে) দান করা প্রসঙ্গ হতে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ফজিল খাঁ মিঞাদের 'কোর্ট'' দুর্গ বা কিল্লা এবং 'কাছারী' বা বিচারালয়ের দূরত্ব হল, ফুলচৌকি (নগর) হতে পশ্চিম দিকে পাঁচ মাইল লোহানী পাড়া নামক স্থানে। এখনো লোকেরা 'আলদাদ খাঁর কোর্ট'' 'চাপড়ার কোর্ট''' বলে থাকেন। চাপড়া হল এক জাতীয় মাছ। তারই আকার দীঘি চওড়া হওয়ার জন্য, স্থানীয় লোকেরা উক্ত কোর্টের নাম 'চাপড়া' দিয়েছে।

কোর্টের চতুর্দিকে বিরাট আকারের পাকা গভীর পরিখা এখনো রয়েছে। পরিখার পানি এখনো সব সময় থাকে। কোর্টের সম্মুখভাগে সুবিস্তৃত দীঘি। দীঘির পূর্ব পাড়ে 'আর্টিফিশিয়াল লেক্' রয়েছে। এ সব ঐতিহাসিক জায়গাগুলি ধ্বংস করবার জন্যে স্থানীয় লোকেরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দু-তিন বছর পর হয়তো এ সব এলাকার চিহ্ন আর পাওয়া যাবে না। কয়েক বছর পূর্ব হতে কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বের ফাঁসের ভিটাগুলি এখনো লোকেরা দেখিয়ে দেয় এবং 'ফাঁসের ভিটা' বলে ঐ নাম প্রচলিত রয়েছে। ঐ সব জায়গাতে গুরুতর অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা এই সব এলাকার জমিদার ও লাখেরাজদার ছিলেন। শোনা যায়, ঐ সময়ে রংপুর, দিনাজপুর এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বহুলোককে গুলী করে এবং গাছের ডালে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সে সব মর্মবিদারক কথা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই বটে। তবে ভারতের অন্য প্রান্তে ঐ সময়গুলিতে কিভাবে যে এ দেশীয়দের হত্যা করা হয়েছে, তা নিম্নের বর্ণনা হতে বোঝা যাবে :

> বিদ্রোহীরা ঝাঁসিতে ৭৫ জন ইংরেজের জীবন নাশ করেছিল, তাঁর প্রতিশোধ হিসাবে ইংরেজ ঝাঁসিতে ৫০০ জন ভারতীয়কে হত্যা করল। প্রতি একজন ইংরেজের জীবনের শোধ ব্রিটিশ নিয়েছে একশ' ভারতীয়ের প্রাণ নাশ করে। ঝাঁসি নগরী দখল করে ইংরেজ এক সপ্তাহকাল ধরে লুণ্ঠন চালিয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক ঝাঁসির লুণ্ঠন ও নরহত্যা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আছে বিষ্ণু-গোডসেভার সাইকার লিখিত 'মাজা প্রভাস' গ্রন্থে। দিল্লীতে জনকয়েক ব্রিটিশ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল ২৬,০০০ ভারতীয়কে গুলীর আঘাতে, ফাঁসি দিয়ে বা কামানের মুখে হত্যা করে। শহরে গ্রামে সর্বত্র এই হত্যালীলার তাণ্ডব চলেছে বেপরোয়াভাবে, দিনের পর দিন। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপারের নৃশংসতা কিছুতে ভুলবার নয়। লাহোরে অবস্থিত সিপাহীরা বিদ্রোহ করে দু'জন ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে। সিপাহীদের উপর তার যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল তার বর্ণনা কুপারের নিজ ভাষায়ই করা ভালো।

১৫০ জনকে হত্যা করার পর ঘাতকদের মধ্যে একজন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। তাকে খানিকটা বিশ্রাম করতে দিলাম। তারপর আবার নিধন-পর্ব শুরু হলো। নিহতের সংখ্যা যখন ২৩৬-এ দাঁড়িয়েছে জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে খবর দেওয়া হলো। সে খবর শুনে কয়েদ-খানায় আর যে সব বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেওয়ার অপেক্ষায় আটক রাখা হয়েছিল তারা আর সেখান থেকে বাহিরে আসতে চায় না। দরজা খুলে দেখা গেল, অজ্ঞাতভাবে হলওয়েলের অন্ধকূপ হত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। ৫৪টি মৃতদেহ কুঠুরীর ভিতর থেকে টেনে বাইরে আনা হলো। লোকগুলি ভয়ে, ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে, গরমে ও আংশিক শ্বাসকষ্টে আপনা হতেই মরে গেছে। [এফ. কুপার লিখিত দি ক্রাইসিস্ ইন্ দি পাঞ্জাব.][১]

নির্মীয়মান নগরী

নির্মীয়মান নগরের মূল প্রাসাদটি ও বাগ-বাগিচা সরোবর প্রভৃতি নিয়ে স্থানটি অতন্তঃ বিষ লক্ষ বিঘা জমিরও উপরে অবস্থিত ছিল। ধনকুবের রাজা কামালের এই নগরটি মূল প্রাসাদসহ সাতটি সশস্ত্র সৈন্য চক্রের মধ্যে-অবস্থিত ছিল। মুসলিম হিন্দু ধর্মের যে রূপ বেহেশ্ত বা স্বর্গের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এখানেও তদ্রূপ কবি-কল্পনার সাহায্যে মৃত্তিকার উপরে বাস্তবেই বেহেশ্ত বা স্বর্গ নির্মিত হয়েছিল। সরোবরগুলির পাশ দিয়ে সুবেদার অর্থাৎ কামালের পার্শ্বচরদের পুরী বা গ্রীষ্মাবাস নির্মিত হয়েছিল। পরীস্থানের গল্পের মত ফল-ফুলের বিরাট কানন; আবার বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে ছোট-বড় নানা রকম দীঘি তার মাঝে পরীরা দীঘিতে গোসল করেন। আবার মাঠ, আবার বাগান, ফল ফুলের সুন্দর সুন্দর হর্ম্যরাজি সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে; এরূপ পুরা-কাহিনী বা স্বর্গের কাল্পনিক তুলিকায় শিল্পীর আঁকা এই স্বর্গপুরী একদিন বিরাজমান ছিল। কিন্তু আজ সেখানে স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবীরা দিল্লীর পরিবর্তে আমাদের আলোচ্য নগরকেই ভারতের রাজধানী করবার সংকল্প নিয়েছিল। এ সব কথা আমরা সিপাহী যুদ্ধের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এখানকার ইঞ্জিনিয়ারদের এই সব স্থান পরিদর্শন করার জন্য আহবান

---

[১] আঠারোশ সাতান্নর বিদ্রোহ, অশোক মেহতা, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

জানানো হচ্ছে। কেননা এর মধ্যে অনেক কিছু জানবার ও শিখবার রয়েছে বলে আমরা মনে করি। এই সরোবর প্রভৃতির মালিক বাকের জঙ্গ, নবাব জাদা কামাল-এর এক একটা কুঠির চতুষ্পার্শ্বে বিরাট পরিখা ছিল এবং পরিখার মধ্যস্থিত স্থানটির অন্তত আড়াই হাজার হতে ত্রিশ হাজার বিঘা জমির উপরে কুঠি অবস্থিত ছিল। বিভিন্ন জায়গায় এরূপ প্রায় শত খানিক কুঠি লোকে দেখিয়ে দেয়। যা হোক, অর্থনীতিবিদদেরও এ সব স্থান পরিদর্শন করা দরকার বলে মনে করি। শুধু ভারত যে ঐ সময় পৃথিবীর সর্বশ্রেঠ ধনী ছিল এবং সত্য সত্যই ভারত যে ঐ সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনৈশ্বর্য্যশালী দেশ ছিল, এ স্থানগুলির কুঠি ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করলে তা উপলব্ধি করতে পারা যায়। এখানে এলে কবি ও সাহিত্যিক পাবেন তাঁদের কাব্য ও সাহিত্যের অফুরন্ত উপাদান, নাট্যকার দিতে পারবেন দেশকে নতুন ও গৌরবোজ্জ্বল পথের সন্ধান এবং অর্থনীতিবিদ দেখতে পারবেন এখন থেকে মাত্র দুশ বছরে কি করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনৈশ্বর্যশালী এই উপমহাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গরীব দেশে পরিণত হল।

"সেই ত্রিস্রোতের কুলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরাখানি নানা বর্ণে চিত্রিত তাহাতে কত রকম মূর্তি আঁকা আছে। তাঁহার পিতলের হাতল, দাস্তা প্রভৃতিতে রূপার গিনটি সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল আবার নিস্তব্ধ। ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙ্গুল পুরু বড় নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত।"

—দেবী চৌধুরানী—৭৪ পৃঃ

পথ প্রদর্শক বঙ্কিমের এ বজরা কাল্পনিক নয়, দেবী চৌধুরানীর প্রকৃতপক্ষে এ বজরা ছিল না; তিস্তা নদীতেও এ বজরা ভাসমান অবস্থায় থাকত না বটে, তবে যে সরোবরটির পাশে জয়দুর্গাদেবী চৌধুরানীর বালাখানা (গ্রীষ্মাবাস) ছিল, ঐ সরোবর থেকে ওয়ালীদাদ এবং শিবচন্দ্র রায়ের 'বালাখানার' পার্শ্বস্থিত সরোবরটিতে পৌঁছতে তিস্তা নদী হয়ে প্রায় আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করতে হত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিম চন্দ্রই শুধু আনন্দমঠ লিখতে গিয়ে প্রথমত প্রথম সংস্করণে বীরভূম জিলাকে তার ঘটনাস্থল করে, দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আবার আসল ঘটনাস্থল রংপুরে ঘটনা স্থানান্তর করেন নি। তাঁরই অনুসারী ও মুসলমানকে চিতিয়ে দেওয়া ইংরেজ লেখক হাণ্টার সাহেবও তাঁর 'ইণ্ডিয়ান্ মুসলমানস' গ্রন্থে অনুরূপ কার্য করেছেন।

কাজেই বীরভূমের ন্যায় ও রংপুরের নগরে তার লেখার ভিতরও গোলমাল অবধারিত। এখানে হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থের ১৪৭—১৪৯ পৃষ্ঠায় এই নগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন ঃ

> জবীন নামে একটি বজরা বিশেষ গর্বভরে পানি কেটে খিড়কির ঘাট থেকে বাগান শোভিত সরোবর মধ্যস্থ একটি দ্বীপে যাতায়াত করত।

উক্ত দ্বীপের কাছেই ছিল জয়দুর্গাদেবী চৌধুরানীর গ্রীষ্মাবাস। বজরাটি হল নবাব-পুত্র। কামালের বেগমেরা ঐ বজরায় হাওয়া খেয়ে বেড়াতেন। এ কথা সত্য যে, কামালউদ্দীন মুহাম্মদের এই নগর নির্মাণের কৌশল ও রুচি সম্পূর্ণ অভিনবত্ব অতীব চমৎকার।

কামালের এই নগর ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে অন্তত কদিন এখানে থেকে ঘোরাফেরা করা দরকার। না হলে দুনিয়ার সর্বনিম্ন গরীব দেশের লোক আমরা ধরতেই পারব না নগর নির্মাণের কলা-কৌশল। কারণ যে সময় এই স্বর্গীয় রাজপুরী নির্মিত হয়েছিল এ সময় ভারত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী দেশ এবং ভারতের মধ্যে কামাল ঐ সময় ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী ধনী সৌখিন মানুষ।

হান্টার বলেছেন ঃ

> এবং প্রত্যেক জিলাতেই কোন না-কোন শাহী খান্দানের বংশধর বিষণ্ণ-ভাবে কোন ছাদের ইমারতে আর খাগড়া বোঁজা দীঘির ধারে আত্মনাশ করে যাচ্ছে। —দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্ ঃ পৃষ্ঠা ১৪৭-৪৯

প্রত্যেক জিলাতেই বাদশাহী বংশধর ছিল না, এটা হান্টার অমূলক-ভাবে বলেছেন জনসাধারণের কাছে বাদশাহী খান্দানের মর্যাদা হানি করবার কুমতলব নিয়ে। হান্টার যেমন নগরের সরোবরের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—সেখানে এক সময় তৃণ খণ্ড পর্যন্ত ছিল না, পরে খাগড়া বোঁজা ও কোন কোন স্থান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমাদের এ দিককার স্থানীয় লোক-কবিদের গানেও তার আভাস পাওয়া যায় ঃ

ভালোয়া নদীর ধারে ধারে নানান বা জাতিফুল।
ছারিয়াদেরে চেংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্ধো চুল।।

পরে যখন সরোবরে নল খাগড়া বা বিন্না গাছ থোকায় থোকায় হয়, তখন আবার কবি গাইলেন ঃ

ভালোয়া নদীর বাতায় বাতায় (পাড়ে পাড়ে) বিন্না থোকা থোকা।
ছাড়িয়া দেরে চেংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্ধোঁ খোঁপা।।

নগরের স্বর্গ সদৃশ স্থানগুলিকে চক্ষুর অন্তরালে নিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পরদেশ লুণ্ঠনকারী দস্যু ইংরেজরা সিপাহী যুদ্ধের পরে বিদেশীদের দ্বারা নিযুক্ত নতুন জমিদার ছত্রপৎ সিং দুগড় ও ধনপৎ সিং দুগড় দ্বারা ঐ সব এলাকাকে দুর্গম জঙ্গল করবার মানসে শাল গাছের বীজ ও চারা রোপণ করে ঐতিহাসিক স্মৃতি বিলুপ্ত করে। উল্লেখযোগ্য যে, সর্বপ্রধান সরোবরটিকে স্থানীয় লোকেরা ভালোয়া নদী বলে। কারণ ভেলায় চড়ে নদীটি এপার-ওপার করতে হত। তাই স্থানীয় লোকগীতিকারগণ গান রচনা করেছেন, তার ক'লাইন এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

যারে কালা; কালা তোর পিরিতি গাছতলায়
যারে কালা।
ভালোয়া নদীর বাতায় বাতায় ভাসিয়ে যায়রে
শাল পাতা।
হায়রে ভাসিয়ে যায়রে শাল পাতা।
কালা তোর পিরিতির গাছতলায় যারে কালা।।
সেই-না পাতায় দেখা যাওরে আমার
প্রাণের বন্ধুর নাম লেখা
যারে কালা।।

এই বিস্তৃত রাজপুরীর মধ্যে মাত্র একটি সাজান বন্দর ছিল। বন্দরটির নাম 'কোকিলা জং'। উক্ত কোকিলা বন্দরটিকে নিয়ে একটি সুন্দর গীত এতদঞ্চলে আজও মেয়েদের মধ্যে গাওয়া হয়ে থাকে; গীত হল এই ঃ

ওরে বুড়ী কোনা গেল তাঁতিয়ার বাড়ী
তাঁতিয়ার আসছে জ্বরোরে।
কেমন করে বানাবো শাড়ী বুড়ী ?
বড় বউয়েকে পাঠেয়া দে।
বড় বউ গেল তাঁতিয়ার বাড়ী
তাঁতিয়া হাসে মনে মনে রে,
কও তো সুন্দরী কোন বা রংগের বানাবো শাড়ী
তাক বা বলিয়া দে।

দশো দিকে দশো তোরা শরু ময়নামতি অঞ্চলে,
তাহার মধ্যে নারায়ণী কমোলা,
হরিচন ছাকিয়া দে।
সেই শাড়ী পরিয়া গেল বউ
কোকিলা জাংগিয়ার বন্দরে।
কোকিলা জাংগিয়ার
রসিক সওদাগর
অঞ্চল ধরিয়া টানে।
শ্বশুরও হইল মোর গাঁয়ের পঞ্চাইত
ভাসুর চৌকিদার ওরে;
তাহারও হুকুমে বানাইছোঁ শাড়ী
সওদাগর অঞ্চল ছাড়িয়া দেও ওরে।

চৌধুরানী রেলস্টেশনের জায়গাটি জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর নামানুসারে হয়। পীরগাছা থানার যে স্থানে 'মঙ্গকুঠি' (মোগল কুঠি) অদ্যাবধি বলা হয়, উহা নবাব বাকের জঙ্গ ও তৎপুত্র কামালউদ্দীনের কুঠি ছিল। উহার অনতিদূরে জয়দুর্গা দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে একটি দীঘি খনন করিয়ে জয়দুর্গার নামানুসারে তার নামকরণ করা হয়।

পরিশেষে জয়দুর্গাদেবী চৌধুরানীর যে পীরগাছার ভূম্যাধিকারিণী তা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় নিম্নোক্ত উক্তি হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে ঃ

> ঐতিহাসিক হিসাবেও [রতিরাম দাসের] এ কবিতাগুলি সামান্য নহে। এই কবিতা প্রকাশ করিয়াছে যে, রঙ্গপুরে এক কালে একটি বিরাট পণ্ডিত সমাজ বিদ্যমান থেকে সমগ্র বাংলার গৌরবস্থানীয় হয়েছিল। রঙ্গপুরের প্রজাবিদ্রোহ, দেবী সিংহের অত্যাচার শ্রবণে পীরগাছার প্রাতঃস্মরণীয়া ভূম্যাধিকারিণী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী উক্ত নবীনচন্দ্রের লিখিত পলাশীর যুদ্ধে রানী ভবানী, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি উক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রতিরাম বহু পূর্বে যাহা গ্রাম্য ভাষায় রচনা করে গেছেন নবীন কবি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র করে আজ বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। উত্তর বঙ্গের এই গ্রাম্য কবির স্থান এখন কোথায় দেওয়া যেতে পারে, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ নির্ণয় করুন। হায়

আমাদের অনুসন্ধিৎসার অভাবে এরূপ বহু রত্ন লুপ্ত।[১]

স্বর্গীয় কেশব লাল বসু ও মধুসূদন দেব মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক। কেননা ১৯০৮ সালের সাহিত্য পরিষদের সু-প্রাচীন কর্ম-কর্তারাও বলেছেন, জয়দুর্গা পীর গাছার ভূম্যাধিকারিণী। উপরন্তু শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিজ ও পৈত্রিক গ্রাম হল জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের গ্রাম ইটাকুমারীতে। উক্ত ইটাকুমারী হতে পীরগাছার দূরত্ব মাত্র ৬ মাইল। পীরগাছা ও ইটাকুমারীর সকল জমিদারের খবর বৃদ্ধ তর্করত্ন মহাশয় ভালভাবেই রাখতেন। সুতরাং সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তা ও যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মতের সহিত আমরা একমত যে, মন্থনা পরগনার পীরগাছার খাঁটি কর্ত্রী হলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী।

মন্থনা পরগনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর পীরগাছা সদর কাছারীর দলীল হতে নিম্নোক্ত বিষয়টি দেওয়া গেল।

প্রয়োজন হলে আরও অনেক দলীল ও কাগজপত্র আমরা পেশ করতে প্রস্তুত আছি।

> পেট-ভাতার দলীল ৭ পাতা হইতে দেবোত্তর উপঢৌকী মহাল হারের স্থিতবাহি হইতে সদর তোক মহালের মৌজা অনন্তরাম বাংলা ১১৯৮ সালের শ্রী জয়দুর্গা দেব্যার নামীয় জমিদারের তালুক মিলানী কাগজ মতে ঐ সময়ের ৪৩২/৩ পাই সিক্কা টাকা।

এ দলীলখানায় যে সন দেওয়া হয়েছে তা বাংলা ১১৯৮ সন। ইংরেজী ১৭৯১ সনের দিকে এ দলীল রচিত হয়েছে। তখন বাকের জঙ্গের জ্যেষ্ঠ-পুত্র কামালউদ্দীন লর্ড কর্নওয়ালিসের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়ে শান্তিমত নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিস্তারে মন দিয়েছেন এবং নগর নির্মাণ সম্পূর্ণ করবার পথে গিয়েছেন। তাঁর নগরের পরিকল্পনার ভিতরে ইংরেজ-বিরোধী জমিদার কর্তা-কর্ত্রীদের গ্রীষ্মাবাস-গুলিও ছিল। যেমন মুর্শিদাবাদে ছিল, রানী ভবানী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইত্যাদির আবাস স্থল। সেই পরিকল্পনা মুতাবেক নগরের যে স্থানে যাঁর বালাখানা নির্মিত হয়েছিল, সেই সব স্থান আজও সেই সেই কর্তা-কর্ত্রীর পরিচয় লোকের মুখে মুখে বহন করছে।

---

[১] ১১ই ভাদ্র ৩০শে আগস্ট; ১৯০৮ইং চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় অধিবেশন স্থান রংপুর চতুষ্পাঠী গৃহ। সভাপতি আশুতোষ লাহিড়ী। আগগানের সংগ্রাহক পণ্ডিত রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়।

আমরা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর স্বামীর বংশতালিকা নিম্নে দিলাম ঃ

স্বামী	স্ত্রী
১. নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী	জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী
২. রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী	সর্ব্বলক্ষ্মী দেবী চৌধুরানী
৩. হরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	মহামায়া দেবী চৌধুরানী
৪. মহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী	রাধাপ্যারী দেবী চৌধুরানী
৫. জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী	ভাসুন্দরী দেবী চৌধুরানী
৬. ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী	

এই সংগে আমরা সুবাদার নবাব নুরুদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গের বংশতালিকা ও তাঁর দেওয়া রাজা দয়াশীল (দয়াল) চন্দ্রশীল এর বংশ তালিকা এবং বাকের জং এর প্রধান সেনাপতি ও সহকারী মিঞা কাদের উল্ল্যাহ ওরফে মুছা শাহের বংশ তালিকাও দিলাম ঃ

স্বামী	স্ত্রী
১. শাহযাদা সুবাদার নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ।	১. কিসমত বানু
২. শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদ	২. যতন বিবি
৩. শাহযাদা নছিরউদ্দীন মুহাম্মদ শাহযাদা গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদ এবং শাহযাদা জামালউদ্দীনের পুত্র শাহযাদা খাজেরউদ্দীন মুহাম্মদ (সুলতান)	৩. আমিরন নেছা, খয়রতননেছা ও করিমননেছা। নাদেরন বানু গৌউসউদ্দীনের একমাত্র মেয়ে।
৪. শাহযাদা নেহালউদ্দীন মুহাম্মদ, শাহযাদা নিজামউদ্দীন মুহাম্মদ ও ৩ ভাই শাহযাদা লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ (অপ্রাপ্ত বয়সে অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু)।	শাহযাদা খাজেরউদ্দীনের স্ত্রীর নাম (খোদেজা) খাদিজা ইনি ২য় আকবরের কনিষ্ঠা ভগ্নি)।

৫. নাজিমউদ্দীন মুহাম্মদ (নেহাল একমাত্র কন্যা শাহবানু) রহিমউদ্দীন মুহাম্মদ + স্বর্ণ-মাইবিবি, মসিহউদ্দীন মুহাম্মদ + মাইজন বিবি ও লতিফউদ্দীন মুহাম্মদ বিবাহের পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

৬। নঈমউদ্দীন মুহাম্মদের ২ পুত্র নজির হোসেন ইত্যাদি। রহিম উদ্দীনের ১ পুত্র মোজাফফুর হোসেন-তারেফন নেছা ইনি ইন্তেকাল করেছেন কটি পুত্র ও কন্যা বর্তমান।

মসিহউদ্দীনের ৫ পুত্র। আবদুল মজিদ-নুরুননাহার ইত্যাদি। আবদুল লতিফ বিয়ে করার আগেই ইন্‌তেকাল করেন।

সুবাদার নুরউদ্দীনের দেওয়ান দয়ালশীল ও চন্দ্রশীলের বংশধর :

১. রাজা দয়ালচন্দ্র শীল
২. জয়দেবচন্দ্র শীল
৩. নবীনচন্দ্র শীল
৪. বানেশ্বরচন্দ্র শীল ও রাজমোহনচন্দ্র শীল
৫. হরিমোহন শীল
৬. নগেন্দ্রচন্দ্র শীল, ক্ষিতীশচন্দ্র শীল ইত্যাদি এঁরা এখনও জীবিত আছেন।

সুবাদার নুরউদ্দীন-এর প্রধান সেনাপতি ও সহকারীর বংশ তালিকা :

১. মিঞা কাদের উল্লাহ্ (মুছা শাহ্)
২. মিঞা কাসিমউদ্দীন শাহ্
৩. নঈমউদ্দীন শাহ্
৪. আইনউদ্দীন শাহ্
৫. মফিজউদ্দীন শাহ্।

তনখার মিঞাদের বংশতালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

১. দারাব খাঁ
২. দারাজ খাঁ
৩. কোব্‌বাদ খাঁ
৪. আলদাদ খাঁ
৫. জামান খাঁ
৬. তালিয়ার খাঁ
৭. ফজিল খাঁর পুত্রদ্বয়
৮. আমির খাঁ
ও
তমিজ খাঁ।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার সাহেবের লেখার কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল তার সাম্রাজ্যবাদীসুলভ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করবার জন্য।

"In January 1783 the Rangpur cultivators suddenly rose in rebellion and drove out the revenue officers· They set forth their grievances in a statement submitted to the Collector of the District. ·· ··· One of the leaders assumed the title of the Nawab, and a tax ding kharcha or sediton tax was levied for the expences of the insurrection.

Matters now looked serious, and active measures were taken to put down the rising. Forces of Barkondazs were sent out in various directions and several encounters took place. In an attempt to burn Magalhat. The self styled Nawab forces were defeated, and the Nawab himself wounded and taken prisioner. A party of sepoy under Lieutenant Macdonald marched to north against the principal body of insurgents. A decisive engagement was fought near Patgram on the 22nd February, 1783. The Sepoys disguised themselves by wearing white clothes over their uniform and by the means got close to the rebels who were utterly defeated, Sixty were left dead on the field and many others were wounded and taken prisoner.

এর পর বিচারের কথা।

"Two commissions set to enquire into this insurrection and it was not till the 1789, in the time of Lord Cornwalis, that the final orders of the Government were issued. Hunter. W. W. Ibid

ডব্লিউ, ডব্লিউ. হান্টারের কথামত এই বলা যায় যে, ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে রঙ্গপুর জেলার প্রজারা হঠাৎ বা অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্রোহ করে বসল। কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে পূর্বের ইতিবৃত্তে, ১৭৭০ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহে প্রজাবৃন্দ একযোগে প্রায় ৫০ হাজার লোক একত্র হয়ে নানা স্থান লুন্ঠন ও গ্রামাদি ধ্বংস করতে থাকে। এই দেখা যাচ্ছে। আবার ইতিহাসে এও দেখা যায় যে, ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের বিদেশী কথিত সন্নাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাত প্রায় ৫০ সহস্র লোক ইংরাজদের মনে

আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। যেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক সশস্ত্র ভাবে বিদ্রোহ করেছে, তারা হঠাৎই কি এতগুলো লোক দলবদ্ধ হতে পারে! এটা কি সম্ভব? তবে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টার সাহেব যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের জন্য মিথ্যা বলেছেন, তারই প্রমাণ হিসেবে আমরা পুনরায় এই কথার অবতারণা করছি। কারণ হাণ্টার সাহেব এখন সকলের না হলেও কার কার নিকট ঋষি বনে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা হাণ্টার সাহেব করবেন, তার যাদুময়ী লেখার চাতুর্য দিয়ে এতে আর আশ্চার্যরই বা কি আছে? তৎসহ তার বৈদেশিক রাষ্ট্রীয় শক্তি সঙ্গে তো আছেই। হান্টার সাহেব ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বেতনভুক্ত একজন উঁচু-স্তরের কর্মচারীও বটে? সুতরাং সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে গিয়ে মিথ্যা না বলে উপায়ই বা কি ছিল? সে কথা যাক, এখন কথা হল ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টার সাহেব বলেছেন, "Rebellion" মানে হঠাৎ বা অপ্রত্যাশিতভাবে প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে খাজনা আদায়কারী গোমস্তা প্রভৃতিকে যত্রতত্র বধ করতে লাগল। ভাববার কথা যে, হাণ্টার বর্ণিত উক্ত বিদ্রোহীদের দলে এক হাজার নয়, দু হাজার নয়—একেবারে পঞ্চাশ হাজার প্রজা কোন কোন সময় ছিল; তা ঐ সময়ের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়। তবে কথা হল যে, ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে এই বিদ্রোহ হঠাৎ করে হয়নি। হান্টার প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ লেখকের লেখার বাকপটুতা এবং চাতুর্য থাকতে পারে। তবে তা ধোপে টেকে না। টেকে যে না, তা রঙ্গপুরের ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের পরবর্তী বিদ্রোহের ঘটনাবলী থেকে আমাদের কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে। তবে একথাও ঠিক যে, ভাগ্যে বাংলা বিশ্বকোষ সনগুলি উল্লেখ করে কথাগুলি বলেছেন, নইলে অসুবিধার অন্ত থাকত না।

বিশ্বকোষের কথাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করে দিয়ে আমাদের কথাগুলি পরিষ্কার করতে এবং সেই সঙ্গে হাণ্টারের 'হঠাৎ' বিদ্রোহের অসারতা প্রমাণ করতে চাই।

> কিন্তু ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রাজস্ব সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত রাজা দেবী সিংহ নামক জনৈক রাজপুরুষের কর নিষ্কাশন-রূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এখানকার কৃষক প্রজাবৃন্দ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এই বিদ্রোহে ডাকাইত দলের লুণ্ঠন ও অত্যাচারে রংপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ উৎসন্ন প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজ গভর্নমেন্ট তখন বাধ্য হইয়া স্বতন্ত্র রূপ বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হন। তাঁহারা তখন আর ব্যক্তি বিশেষের উপর কর সংগ্রহভার ন্যস্ত না করিয়া প্রকাশ্যভাবে জমিদারবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দেশীয় সেনা বিভাগের কর্মচ্যুত সিপাহী দলে পরিপুষ্ট ডাকাইত দল এবং ১৭৭০ খৃঃ দুর্ভিক্ষে অন্নক্লিষ্ট উদ্ধত প্রজাবৃন্দ একযোগে প্রায় ৫০ হাজার লোক একত্র হইয়া এই জিলার নানাস্থান লুণ্ঠন পূর্বক গ্রামাদি ধ্বংস করিতে থাকে। তৎকালে রংপুর প্রদেশে নেপাল, ভুটান, কুচবিহার ও আসামের সীমান্তরূপে গণ্য ছিল এবং এরূপ দীর্ঘ ও বিস্তৃত একটি প্রদেশের শাসনকার্য একজন মাত্র কালেক্টরের দ্বারা সুশাসিত করা সর্বতোভাবে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজে কাজেই সেই সময় রঙ্গপুরের সুদূর প্রান্তদেশে ডাকাইতদল নিরাপদে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ দস্যুদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট বাহাদুর সময় সময় সশস্ত্র সিপাহীসেনা প্রেরণ করিতেন। এই রূপে সময় সময় ডাকাইতদল ও ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদলের সহিত ইংরাজ সেনাদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। প্রথমে একটি ইংরাজ সেনাদল ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল।

১৭৭৩ খৃ. কাপ্তেন টমাস কর্তৃক পরিচালিত ইংরাজ বাহিনী দস্যুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত হয়। দস্যুদলের হস্তে কাপ্তেন টমাস সদলে নিহত হন, এমন কি, সেই সময় চারিদল সেনা প্রেরণ করিয়াও তাহাদিগকে নিরুদ্যম করা যায় নাই। ১৭৮৯ খৃ. দেশের শান্তিহারক দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং কালেকটর বাহাদুর তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ইংরাজ সেনাদলকে সম্মুখীন দেখিয়া ডাকাইতদল প্রথমে বৈকুণ্ঠপুরের গভীর অরণ্যে যাইয়া আশ্রয়লাভ করে। কালেকটর বাহাদুর দুইশত বরকন্দাজ লইয়া সেই বনে গোলাবৃষ্টি করিতে থাকেন। অবশেষে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫৪৯ জন দস্যু ধৃত হইয়া ইংরাজের আদালতে বিচারার্থ আনীত হইয়াছিল। এই দস্যুদলপতিদিগের মধ্যে ভবানী পাঠকেই আমাদের পরিচিত। শাসনবিভাগের সুবিধার্থ রঙ্গপুর জেলার আংশিক পরিবর্তন ভিন্ন; এখানে বর্তমান

সময়ে ঐতিহাসিক আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব ভাগে গোয়ালপাড়া নামক স্বতন্ত্র জেলা গঠিত হইয়া আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তরের তিনটি পরগনা লইয়া জলপাইগুড়ি জেলা এবং দক্ষিণের কিয়দংশ লইয়া বগুড়া জেলা গঠিত হইয়াছে।

—বিশ্বকোষ রঙ্গপুর দেখুন

ভবানী পাঠক বারেন্দ্র ভূমিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। দস্যু সরদার বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্র চর্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির দুঃখে কাতর হন। মুসলমান রাজের যদৃচ্ছ শাসন হইতে স্বদেশীয় দীন-দুঃখী প্রজাবর্গের ক্লেশাপনোদন জন্য তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী সেনা সাহায্যে মুসলমান রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত-প্রজার হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও দেবী রঙ্গপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা ইতিহাসে ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাত। প্রায় ৫০ সহস্র সন্ন্যাসী অনুচর পরিবৃত পাঠক খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিল রাশি ও তীরভূমি আলোড়িত করিয়া ইংরাজ হৃদয়ে আতংক উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনু শাহ। শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শ দেবী ও মজনুর করাল কৃপাণের সহযোগিতা পাইয়াছিল। একে এই সময় দেশ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, তাহাতে হেস্টিংস বাহাদুরের অমানুষিক অত্যাচার, অনাহারে প্রজাবৃন্দ হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতা পূর্বক প্রজার রক্ত শোষণের তিলমাত্র বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া নিরীহ শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তিনি অন্নবস্ত্রহীন দুঃখী প্রজাদিগকে, “রাজার দোষে প্রজার কষ্ট” দেখাইয়া উত্তেজিত করিলেন. ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহী দলে পরিণত হইল। কিন্তু ইংরাজের কামানের গুলীর সম্মুখে তরবারি, তীর ও সড়কী লইয়া বাঙ্গালী সৈন্য কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। যে সময় তিনি ইংরাজের বল অধিক দেখিতেন, তখন নিবিড় অরণ্যে লুক্কায়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। শুভাবসর পাইলে, তিনি ইংরাজকে শাস্তি দিতে বিরত হইতেন না। এই রূপে সেনানী টমাস প্রভৃতি সসৈন্য বিদ্রোহীর হস্তে জীবন দান করেন। তিনজনের উপদ্রবে অস্থির হইয়া রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাড সাহেব লেফটেন্যান্ট রেনান বে একদল

সিপাহীর সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহার বন্দেই ভবানী পাঠকের সহিত ব্রেনানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সন্ন্যাসীগণ পরাজিত না হইলেও পরিণামদর্শী ভবানী পাঠক ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশংকা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন।[১]

শুনা যায়, ইংরাজ বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানী পাঠক ও তাহার অধীনস্থ তিনজন সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।

---

১. বিশ্বকোষের ভবানী পাঠক অনুচ্ছেদ হতে উদ্ধৃত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার

ডব্লিউ, ডব্লিউ হাণ্টার রংপুরস্থিত নগরের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। হান্টার ও অন্যান্য ইংরাজ লেখকরা যা বলেন বা বলেছেন, এ সব প্রমাণ আমরা যেমন দিয়েছি, অনেক এ দেশীয় লেখক ও ঐতিহাসিকও তাই দিয়েছেন। হাণ্টার সাহেব আমাদের আলোচিত নগরে এসেছিলেন বলে স্থানীয় লোকেরা এখনও বলেন। কলকাতা হতে নৌকাযোগে তিনি এসেছিলেন নগরে।'' ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ও তার শাখা রংপুর জেলার মধ্যে বিস্তৃত হয় (বাংলা বিশ্বকোষ')। ১৮৬৪ সালে হাণ্টার সাহেব ফুলচৌকিতে একবার এসেছিলেন এবং তার তিন বছর পূর্বে আরও একবার এসেছিলেন। ১৭৬০ খৃস্টাব্দে মীরণকে হত্যা করা হয় অথচ ইংরাজ লেখকরা বলেছেন, বজ্রাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। হলওয়েল মনুমেন্টের মিথ্যার কাহিনী কারও অজানা নয়। নবাব নুরউদ্দীনকে প্রজারা নবাব করেছেন একথা বলেছেন রংপুর, কুচবিহার এবং বিশ্বকোষের লেখক মহোদয়গণ; আর হাণ্টার তাঁর 'স্ট্যাটিস্টিকেল একাউন্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন, তিনি নিজকে নিজেই নবাব করেছেন। হান্টারের নাম পরিচয়হীন নগরের বর্ণনায় 'আরটিফিশিয়্যাল লেক' 'ঝরনা' ইত্যাদি বিষয় পড়লেই আমাদের আলোচিত নগরের কথাই যে হান্টার বলছেন এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে মজনু শাহের সহকারী যে মুসা শাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই স্বনামধন্য মুসা শাহের পুত্র কবি জামালুদ্দীন শাহের ১২৬০ সালে লেখা প্রসিদ্ধ ছাপানো পুথি হতে আমাদের আলোচ্য নগর সম্পর্কে কিছুটা উদ্ধৃত করব। কিন্তু তার পূর্বে আরও কিছুটা কথা বলতে চাই। এই পুথিখানা ১৮৫৭ সালে যুদ্ধের সময় ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এই পুথিখানা এই সব অঞ্চলের সাধারণ লোকদের নিকট এত প্রিয় যে সম্পূর্ণ পুথিটি শত শত লোকের কণ্ঠস্থ আছে। শোনাযায় রংপুর, দিনাজপুরের বাইরেও এই পুথিখানা আছে।[1] পুথিতে

---

১. শুনেছি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করা কালে (১৯৫০—৫৩) কবি মুহম্মদ খায়রুল ইসলাম সাহেব তাঁর আবদুর রহমান নামক ছাত্র মারফত এর একটি কলমী পুথি পেয়েছেন।

মুসা শাহের নাম, বংশ-পরিচয় ইত্যাদি রয়েছে। রংপুরের ফুলচৌকিস্থিত নগরের পরিচয় ইত্যাদি রূপকভাবে সত্য কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু নগরের যে সৌন্দর্য কতখানি ও কত ব্যাপক আকারের ছিল তা আমি ১৯৪৭ ইং সালে মূল প্রাসাদের ভাঙ্গা জীর্ণ অবস্থায় যা দেখেছি, তাতে কলকাতা হতে উভয় বাংলায় এত সুন্দর বাড়ী আমার চোখে আর কোথাও পড়ে নাই। এই বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের কিছুটা যারা দেখেছেন, তারাও আমার সাথে একমত হবেন। এর সৌন্দর্য লেখা কারও পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বা ছিল না।

এখন বর্তমানে ভাংগা টিলা ইটের স্তূপ বা কোথাও তাও নেই এবং ঝরনা, ফোয়ারা যা' ছিল তা আর অবশিষ্ট নেই বললেই চলে। উভয় বাংলায় হাজার হাজার ঝরনা ফোয়ারাওয়ালা প্রাসাদ আর কোথাও খুব বেশী আছে বলে আমার জানা নেই। উপরোক্ত মুসা শাহ্ যেমন নবাব শাহযাদা নূর-উদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর সেনানায়ক বা সহকারী ছিলেন, তদ্রূপ শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদের মন্ত্রী ছিলেন কবি শাহ্ জামালউদ্দীন বক্‌শী। অবশ্য বক্‌শীকে ফারসী-ভাষায় সেনানায়কই বলা হয় কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এখনও বক্‌শী বলেন। কবি তাঁর লেখায় নিজেকে মন্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। তবে নগরের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর 'প্রেমরত্ন' গ্রন্থে, তবে সম্পূর্ণ এলাকাটিকে তিনি তাঁর গ্রন্থে 'কুসুম্ব ভুবন' এই রূপক নাম দিয়েছেন। শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদের রূপক নাম দিয়েছেন 'কমলা কিশোর'। কবির পৈতৃক নিবাসের স্থানটির নাম দিয়েছেন 'বিম্বুবাস'। আসলে হবে 'লালবাড়ি'। আর এক ইংরাজ বিরোধী রাজা খেতাব পাওয়া বাটিস্থ এলাকাটির নাম দিয়েছেন রূপকভাবে 'সহস্র নগর'। আসলে হবে 'হাজারী'। ১৮৫৭ সালের আড়াই হতে তিন বছর পূর্বে 'প্রেমরত্ন' পুথিখানি প্রথম মুদ্রিত হয় বাংলা ১২৬০ সালে।[১] এর পর যুদ্ধের সময় হতে পুথিখানি বাজেয়াপ্ত ছিল। বাজেয়াপ্ত কেন হয়েছিল তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় মুসা শাহের স্পষ্ট নাম ও পরিচয় এবং নগরের রূপকভাবে হলেও সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব কারণেই পুথিখানা বাজেয়াপ্ত ছিল। কবির রূপক নাম ভামিনী, শাহযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের নাম 'রাজবালা' দেওয়া হয়েছে।

---

[১] জনপ্রিয় প্রেমরত্ন পুথিখানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ায় দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ১৩৫৭-৫৮ সালে।

আমাদের আলোচ্য নগরের সবকিছু নির্মাণের আগে পিতা-পুত্রে যে মসজিদটি নির্মাণ করেছেন, বাংলা ১২২৯ সালে ২৫শে ভাদ্র নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে, মসজিদটির গাত্রে শিলালিপিতে আরবী ভাষায় বাংলা ১২২৯ সাল ২৫শে ভাদ্র লেখা রয়েছে। শিলালিপিতে লেখা রয়েছে খাদেম 'বাকের মোহাম্মদ কামাল মোহাম্মদ' এবং ১৯৫৭—৫৮ সালের পরে এই নগরে নাটকীয়ভাবে অবনতি নামতে থাকে। ফুলচৌকী নগরের এই শিলালিপি এবং পায়রাবন্দের জমিদারদের প্রথম জমিদার টাটিশেখ বলদিয়ার মসজিদ গাত্রের শিলালিপি এবং বাদশাহ ২য় শাহ্ আলমের নাম খোদিত একটি পাথর এবং সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত কয়েকটি ঢাল তলোয়ার ঢাকা মিউজিয়ামে আমি জমা দিয়েছি। এখন আমরা ইংরাজ বিরোধী প্রখ্যাত কবি জামালুদ্দীনের 'প্রেমরত্ন' হতে নগরের কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করে দিলাম। তৎপূর্বে কবির ভণিতাও দেওয়া হল।

পিতা মোরে প্রভু প্রেমী, চিরস্থায়ী ধামে নামী,
এ সংসার অস্থায়ী জানিয়া।।
মুনশী কাদেরুল্লা নাম, বিদ্যাসিন্ধু গুণধাম
ওরফে মহাম্মদ মুছা মিঞা।।
আমি জামালুদ্দীন হীন, সাধিতে নারিনু দিন।।
কেবল ভরসা দয়াময়।।
দিনধীন দিনদান, ঘিরলাই গ্রামে বাস,
পরগনে লাল বাড়ী কয়।।
বলবস্ত পরগণা, এলাকা হাবড়া থানা,
দিনাজপুরে অন্ত পাতি।।
যে বিধি করিল সৃষ্টে, সে দাতার দয়াদৃষ্টে,
প্রজাগণে দ্বারে বান্ধে হাতী।।
"কুসুম্ব ভুবন ঠাম,[1] ততুল্য কি ইন্দ্রধাম,
সুরপুর জিনিয়া সুবেস।
কুসুম্ব কানন বন, নানা পুষ্পে সুশোভন,
ভূতলে সাজিছে স্বর্গ দেশ।।

---

[1] কুসুম্ব ভুবন ঠাম—ফুলচৌকী নগরের ও প্রাসাদাদির কবিকৃত বর্ণনা।

দেখি কুসুম্ব কানন, কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ বন,
লাজে গিয়া রহে বৃন্দাবনে।
গন্ধময় পারিজাত, পাইলে লজ্জার ঘাত,
লুকায়া রহিল-দেবস্থানে॥
নীলকান্তি শ্বেত ছিল, ভাবিয়া কজ্জন হৈল,
শতদল ছিল শতরঙ্গ।
সর্ব্বরঙ্গ গেল তার, একরঙ্গ হৈল সার,
সে ভাবিছে কুমদিনী সঙ্গ॥
পদ্ম পুষ্প জলে ভাসে, ছিল সেই বার মাসে,
লজ্জা পায়া ডুব দিল জলে।
পাতা পুষ্প হইল নাস, না রহিল বার মাস,
ভাসিছে কেবল গ্রিসুম কালে॥
চিন্তিয়া কেতকী ফুলে, অন্তর পুরিল ধুলে,
মধু তারে গেল শুকাইয়া।
কি কব পলাশ গুণ, পুষ্পে মধু পরিপূর্ণ,
মধু তারে পড়িল টলিয়া॥
কন্নিষ্ঠা নিচে ছিল, মুখ পসরিয়া নিল,
মধু মক্ষি নৈলে কতগুলা।
শ্রীফল সুরঙ্গ ফুলে, মিষ্ট মধু বহু ছিলে,
লাজে শুখাইয়া হৈল তুলা॥
গন্ধহীন পুষ্পচয়, চিন্তাযুক্ত অতিশয়,
লজ্জা শোকে শুখাইল কলি।
কুসুম্ব ভুবন মাঝ, রহিল কুসুম্ব বাজ,
সেখানে যাইবে শ্রেষ্ঠ অলি॥
গোলাব সেওতি জুতি, কস্তুরী বেলী মালতী,
চামিলি কামিনী সুশোভন।
যত পুষ্প গন্ধ ধারী, চারি পাশে সারি ২,
মনোহর কুসুম্ব কানন॥
কুসুম্ব কানন বনে, দীন বন্ধু বন্ধু সনে
পীরিতে মজিবে দিনমণি।
'জামালুদ্দিদ কহে তায়, না বাঁচিবে প্রেম দায়,
পীরিতি করিতে হবে ধনি॥

কহিবারে নারি ব্যাখ্যা কুসুম্ব ভুবনে।
করিয়াছে অতি শোভা কুসুম্ব কাননে।।
কহিতে অক্ষম আমি রাগবের [১] ঠাট।
কত দীঘি সরোবর বান্ধা চারি ঘাট।।
কনক নগর জিনি কুসুম্ব ভুবন।
করিয়াছে বাস কত পণ্ডিত সজ্জন।
কত লোক মধুবন্ত কত সাধু পতি।
করিলে তাহার বাসে বাস দিনমণি।।[২]
কহিলে নগর-বাণী কবি হয় ভারী।
কহিবাতে ক্ষেন্ত হৈনু ধিক কৈতে নারি।
সভাগুণ মহাগুণ কহে পুনঃ ২।
যে সভায় বৈসে নিথী ধরে সেই গুণ।।
পাইলে পণ্ডিত সভা বিদ্যা আলোচন।
বাণিজ্য সভাতে বৈসে ব্যবসায় মন।।
চোর সভা পায় যদি সাধুর নন্দনে।
সভা গুণে চোর হইয়া পড়িবে বন্ধনে।।
অতএব কর্ত্তব্য জে সভা চাই ভাল।
তবেত আপনা বংশ রহিবে উজ্জল।।
ধন উপার্জ্জন করা সভা পায় ধনি।
ধন উপার্জ্জিতে মন হৈল দিনমণি।।
হস্তে ধন না থাকিলে নাহি কান্দে ধন।
পাখি কান্দে দিয়ে পাখি ধরিছে যেমন।।
করে ধন নাহি বালা [৩] ভাবে মনে ২।
কান্দে পাখি নাহি পাখি ধরিব কেমনে।।
পুনঃ কহে বিদ্যা ধন করেছি সাধন।
বিদ্যাধন হৈতে আমি উপার্জ্জীব ধন।।
চাকুরী করিয়া কিছু মুদ্রা কবি করে।
বাণিজ্য ব্যবসা করি সাধু হব পরে।।

---

[১] রাগবের—শাহজাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদের কবিকৃত ছদ্মনাম।

[২] দিনমণি—কবির ছদ্মনাম।

[৩] বালা—কবির ছদ্মনাম।

ধন হৈতে সর্ব্ব সিদ্ধি এ মহিমণ্ডলে।
ধন বিতরিলে মুক্তি হয় পরকালে।।
অনার্থ ভ্রমিয়া কেন ফিরী দেশে ২।
করিলে সঞ্চিত ধন হিত হবে শেষে।।
চাকুরী শিকার করে সাধুর সংসারে।
ক্রেমে যত কার্য্য সাধু অর্পিল তারে।।
নানা দ্রব্য ক্রয় করি করিছে বিক্রয়।
ব্যয় ছাড়া লভ্য তাথে চতুর্গুণ হয়।।
বিদ্যাগুণে দিনমণি বুদ্ধি অতি ধীর।
কমলা কিশোর ধনের কুবের।।
বিধাতার দয়াদৃষ্টে ভাগ্য হৈল তেজা।
সে রাজ্যে ভূপতি মৈল সাধু হৈল রাজা।।
মন্ত্রী হৈল দিনমণি নিলৈক্ষ কৃপাতে।
সকলি করিতে পারে সয়ালের নাথে।।
সকলে বিদ্যার জন্যে দুষ্ক গিছে বৈয়া।
বিদ্যাগুণে রাজমন্ত্রী হৈল নারী হৈয়া।।
নারী অঙ্গ বটে তাহে কে চিনিতে পারি।
সাজিছে পুরুষ ভাল কেঠা কবে নারী।।
সাজাইল রাজসভা নৃপ মহামতি।[১]
যেন সভা সাজিলে উজ্জ্বল অধিপতি।
দান ধর্ম্মে সদারত ধর্ম্ম পথে মন।
দুষ্টের নাশক ভূপ[২] শিষ্টের পালন।।
সুবিচারে প্রজাগণ সুখী রাত্রি দিন।
গহণী গম্ভীর জলে যেন নন্দমিন।।
পাত্র দিনমণি মনে করি নানা আশা।
কুসুম্ব কানন পাশে নির্ম্মাইল বাসা।।
জন চারি দাসি রাখে নিজ অন্তঃপুরে।
পুরী মধ্যে অন্য কেহ যাইতে না পারে।।

---

[১] নৃপ মহামতি-শাহজাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদ।

[২] ভূপ—শাহযাদা কামালউদ্দীন মুহাম্মদ।

ধ্বংস করাটা খুবই সহজ কিন্তু সৃষ্টি করাটা খুবই কঠিন; কালজয়ী এই সৃষ্টি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের চক্রান্তে কি ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে ধ্বংস হয়ে গেছে তা হয়ত সুধীগণ ভালভাবে বুঝতে পারছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার এবং তার ইংরাজ সঙ্গীরা সহ দু'বার এসে এর নক্‌শা পর্যন্ত এঁকে নিয়ে গেছেন; যারা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন তাদের মুখেই আমি এ সব কথা আমার ছোট বেলায় শুনেছি। কলকাতা, দিল্লী অথবা লণ্ডনের কোথাও হয়ত এ সব হস্তে আঁকা চিত্র থাকতে পারে। রংপুরের খৃস্টান মিশনের পাদরী আয়ারল্যাণ্ডনিবাসী সাহেব রেভারেণ্ড স্মিথ আমার এই লেখাগুলি সম্পর্কে বেশ কিছু দিন খোঁজাখুঁজি এবং পড়াশুনা করার পর আমার লিখিত ইতিহাসের বিষয়-বস্তুগুলি সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> ইংরাজরা এদেশ সম্পর্কে যা লিখেছে তার বাইরে আর কি কোন সত্য নাই ? তারা কি প্রফেট হিসাবে এদেশে এসেছিল, যে তাদের কথাই খোদার কথা, উহাই চূড়ান্ত সত্য ? ইংরাজরা এদেশে কি জন্য এবং কি কারণে এসেছিল তা বিশ্ববাসী ভালভাবেই জানে।১

আমি একজন অতি মূর্খ, অজ্ঞ, পাড়াগেঁয়ে লোক হলেও ভয়ে ভয়ে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে কয়েকটি কথা বলবার প্রয়াস পাব—সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় এবং তার পরবর্তী সময়গুলিতে এমনকি ১৯৪৭-এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চরম ও হাস্যকরভাবে কংগ্রেস নেতৃত্ব ব্যর্থতার বোঝা বয়ে এসেছে। আমার বিবেচনায় এই দেশটিকে শাসন শোষণ চালাবার প্রধান মূল স্তম্ভটি হল পূর্বের অসাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও ছুতমার্গের বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে গোটা দেশকে বিষাক্ত করে তোলা। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের

---

১. (ক) স্মিথ সাহেব আরও বলেন—বৃটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে যা কিছু বলা ও কলা-কৌশল করা, তা তারা করেছেন। কোথাও সত্য প্রকাশ করেছেন, যা তাদের উপকারে আসে, যেখানে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেই সত্যকে তারা প্রকাশ করেন নাই। আমাকে লক্ষ্য করে স্মিথ সাহেব বলেন—আপনার এই ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ইংরাজিতে লিখে আমাকে দেন, আমি তাহা ইংলণ্ডে ইংলণ্ডের লোকের টাকায় প্রকাশ করব।

(খ) ইংলণ্ডের লোকেরাই সর্বপ্রথম আপনার লিখিত ইতিহাস সমর্থন করবেন সত্য বলে মেনে নিবে। নানারূপ অসুবিধা ও ঘাতপ্রতিঘাতে রেভারেণ্ড স্মিথ সাহেবের অনুরোধ ও একান্ত ইচ্ছা আমি পূর্ণ করতে পারি নাই। (১৯৬৫ সালের মে মাসের রংপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের বৈঠকখানায় আমাদিগকে বলেন, ঐ সময় আমার সঙ্গে ছিলেন রংপুরের সর্বজনমান্য আবদুল কাদের মিয়া।)

সে চাতুর্য-পূর্ণ, ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন, কুটনীতির ধ্বংসের শয়তানী খেলা ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সন্দেহাতীতভাবে প্রতিদ্বন্দী ছিল ভারতীয় কংগ্রেস, কিন্তু গভীর আফসোস, দুঃখ এবং হতাশার কথা হল ভারতীয় জাতীয় কংগেস নিজের গোলের মুখেই শুধু বল নিয়ে জটলা করেছেন; প্রতিদ্বন্দ্বীদের গোলের দিকে বল শর্ট করা তো দূরের কথা সেন্টারেও বল ধরে রাখতে পারেন নি। আমার মনে হয়, জাতীয় কংগ্রেস দুটি বিষয়ে ভুল করেছেন। প্রথমটি হল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে কোন মূল্যে প্রবল ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এর প্রয়োজনীয়তা এখনও পূর্ণভাবে রয়েছে এবং চিরদিন তা থাকবে এবং দ্বিতীয়টি হল প্রাচীন মধ্য এবং ইংরাজ আমলের ঝকঝকে তকতকে আয়নার মত পরিষ্কার উজ্জ্বলভাবে ইতিহাস ইতিবৃত্তি তুলে ধরা। এমনকি বৃটিশ আমলের প্রথম হতে ১৮৫৭—৫৮ সালের বিদ্রোহ বিপ্লব পর্যন্ত যে সব স্বদেশী বীর ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হটাবার জন্য অস্ত্র ধারণ করে শহীদ হয়েছেন অথবা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন, এদের খোলাখুলিভাবে উত্তরাধিকার-হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া। আফসোস ও পরিতাপের বিষয় গোটা কংগ্রেস নেতৃত্ব তা করেন নি। বরং অতীত দিনের মরা পচা বোঝা মাত্র তারা মনে করে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন তাঁদের দিক হতে। আমার মনে হয় এইখানেই গোটা নেতৃত্বকে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্বজ্ঞানী, বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী ঝানু খেলোয়াড়, পাক্কা ওস্তাদরা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে বৃটিশ শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দল একমত ছিলেন। এমনকি সাম্রাজ্যবাদীর কঠোর সমর্থক চার্চিল সাহেব ও লন্ডনের ব্যবসায়ী সমিতিও একমত ছিলেন। এখানে আমি ভয়ে ভয়ে সকল গুরুজনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে জগতবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও দেশের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেশ প্রেমিকদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার বক্তৃতাবলী গ্রন্থে বলেছেন, "একটা ইংরেজ ছাত্র এক ঘণ্টা সময় পড়ে যেটা বুঝবে, বাঙ্গালী ছাত্র সেটা ঐ মত করে বোঝতে ৭ ঘণ্টা সময় লাগবে। একই রকম পাস উভয় হলেও জ্ঞানের দিক দিয়ে, বোঝার গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে, পরবর্তীকালে ইংরাজ ও বাঙ্গালী বা ভারতীয়টি একই রকম বা সমান জ্ঞানী হবেন কি? না, বহু বেশী-কমবেশ হবে; জ্ঞানের দিক দিয়ে, বোঝার দিক দিয়ে, চাতুর্য্য কৌশলের দিক দিয়ে, গভীরতা এবং দূরদৃষ্টির দিক

দিয়ে ? বাংলার এই রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় একটি কথা প্রবাদের মত ফিরছে; সে কথাটি হল এই–"পড়িলে পড়া না হয় বুঝিতে হয়; বুঝিলে বুঝা হয় না, ভাবিতে হয়, ভাবিলে ভাবা হয় না, ভেদিতে হয়।"

সাম্প্রদায়িকতা কত বড় খারাপ, মানুষকে কিভাবে পাগল অমানুষ করে তোলে, তা আমার এই লেখার সময় দৈনিক বাংলা পত্রিকায় যা পড়লাম তা থেকে বোঝা যাবে। বর্ণনাটি হল এই রূপ—"নয়া দিল্লী—১৯ মার্চ ৮১ রয়টার খবর দিচ্ছে গুজরাটে দু'সপ্তাহে ৩৭ জন নিহত। হরিজন ও নিম্ন-বর্ণের হিন্দুদের জন্য মেডিকেল কলেজে আসন সংরক্ষণ নিয়ে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে এই হত্যা হয়।"

সুতরাং বিবেক-বর্জিত হলে মানুষ কতখানি পশু হয়ে যায়—এই রচনাটি মনে না করে উপায় বা কি ! দেশটি যদি দেহ হয় তাহলে দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সবল করতে হবে। এই বিবেচনাটি যদি সব শিক্ষিত ভদ্রবেশীদের না থাকে সেখানে দেশ রসাতলে যাবে না তো কি ! ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার সাহেব তার চাতুর্যপূর্ণ কুটিল পন্থা নিয়ে "রাজাস্ অফ নগরের" কথায় প্রকাশ্য-ভাবে নাম প্রভৃতি উল্লেখ না করলেও আমরা সে নগরে যে রংপুর জেলাস্থ ফুলচৌকির মোগল খানদানের প্রতিষ্ঠিত নগরের উল্লেখ করেছেন তা আমাদের লেখায় ধীরে ধীরে প্রকাশ হয়ে পড়বে। হান্টার সাহেব নগরের যে বর্ণনা দিয়েছেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তাও আমরা কিছুটা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করার প্রয়াস পাব। এখন আর সে সব নেই বললেই চলে। হান্টার সাহেব যে সময় ফুলচৌকি মূল নগরে তার কথা মত ১৮৬৪ সালে গিয়েছিলেন, তখনই ফোয়ারাগুলি বন্ধ করে ধান ক্ষেত করা হচ্ছিল—এ কথা তিনিও উল্লেখ করেছেন।"

এসব অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কারিগরী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নির্মিত ঝরনা ফোয়ারাগুলির জল যেমন স্নিগ্ধ, সুপেয় এবং বরফ-গলা-সদৃশ সুপেয় পানীয়। এ সব কিভাবে এবং কি কৌশলে নির্মিত হয়েছিল এটা এখনও আমার জ্ঞানের পক্ষে রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে।

নগরের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি জামালুদ্দীন তাঁর প্রেমরত্নে লিখেছেন ঃ

কহিলে নগর বাণী   কবি হয় ভারী।
কহিবারে ক্ষ্যান্ত হইনু ধিক কইতে নারি।।

আর এক জায়গায় আছে ঃ

পিতা মোর 'দীনবন্ধু' [১] নগরে প্রধান।
তাহার সন্তান আমি এত অপমান।

এই নগরকে রাজধানীও বলা হয়েছে ঃ

একদিবা দিনমণি (কবি স্বয়ং) আপনার কামে।
নাহি যায় রাজধানী আছে নিজ ধামে।।

প্রেম রত্নে শাহজাদা কামালকে রাজবালা বলা হয়েছে ঃ

চাকুরী মঞ্জুর করি হইল মন্ত্রিনী (মন্ত্রি কবি স্বয়ং)
রাজা হইল মহাসিদ্ধা প্রভু আরাধনি।

—প্রেমরত্ন—ছাপা বাংলা ১২৬০ সাল

হান্টার লিখেছেন :

অনুরূপ পরিবারের অনেকের সাথেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে। এদের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদগুলি বয়োঃপ্রাপ্ত ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনী ও ভাইপো-ভাইঝিতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং ক্ষুধার্ত বংশধরদের কারো সামনেই আত্মোন্নতির কোন সুযোগই আর নেই। তারা জীর্ণ ছাদযুক্ত ভগ্ন বারান্দায় বসে বসে ধুঁকছে, এবং ক্রমাগত ঋণের দরিয়ায় ডুবে যাচ্ছে, প্রতিবেশী হিন্দু মহাজনের সাথে ঝগড়া বিবাদে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ অবলম্বনটিও তার কাছে বাঁধা দিচ্ছে। এই ভাবেই এই প্রাচীন মুসলিম পরিবারগুলোর শেষ চিহ্ন মুছে যাচ্ছে।

ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত কেউ জানতে চাইলে আমি নগর-এর রাজাদের কথা উল্লেখ ক'রব। বৃটিশরা যখন প্রথম তাদের সংস্পর্শে আসে, তখন দুই শতাব্দীর ভ্রান্তি ও অপচয়ের পরেও তাদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। রাজারা প্রাসাদের গম্বুজ শোভিত দরবারে বসে ইংলণ্ডের দুটো জেলার সমান বিরাট এলাকার উপর শাসন চালাতেন। কৃত্রিম হ্রদের এক পাশে মসজিদ এবং অন্যপাশে রাজাদের গ্রীষ্মকালীন প্রমোদ-বাংলোগুলি শোভা পাচ্ছিল। এই সব সৌধরাজির ছায়া হ্রদের জলরাশির ওপর অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। হ্রদের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ফুল-বাগিচায় শোভিত এক খণ্ড দ্বীপ। একটা চমৎকার নৌকাহ্রদের বাঁধানো ঘাট থেকে ঐ দ্বীপটা পর্যন্ত যেন বুক ফুলিয়ে যাতায়াত করছে। দুর্গ প্রাকারের সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে এবং অস্তগামী সূর্যের নরম আভা অপসৃত হওয়ার সময় বহু সংখ্যক ছেলে-

---

১. দীনবন্ধু—কবির পিতা মুসা শাহের কবিকৃত ছদ্মনাম।

মেয়ের কলরব ভেসে আসছে। বিরাটাকৃতির ফটকছাড়া দুর্গের আর কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই। ছাদহীন মসজিদের দেয়াল গাত্রে খোদিত অলংকার-রাজি অনেক আগেই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। কৃত্রিম খাল শোভিত বিরাট বাগানগুলি এখন জঙ্গল অথবা ধানক্ষেতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাদের যে দীঘিগুলি একদিন মৎস্যরাজিতে পূর্ণ ছিল এখন তা এঁদো ডোবায় পরিণত হয়েছে। তাদের গ্রীষ্মকালীন বাংলাগুলি এখন ইটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ধ্বসে পড়া দেয়ালের খণ্ড খণ্ড ভগ্নাবশেষ এখানে সেখানে পরিদৃশ্যমান এবং মুর স্থাপত্যরীতি অনুসরণে নির্মিত বিরাটাকৃতি জানালাগুলি নীরবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু প্রাচীন রাজকীয় হ্রদের বর্তমান অবস্থাটাই হচ্ছে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক। হ্রদের অদূরবর্তী রাজপ্রাসাদ, যা এখন একটা পাতাল-পুরীর রূপ পরিগ্রহ করছে, একদিন তার সুদৃশ্য প্রাচীরের মনোরম ছায়া ফেলতো হ্রদের পানির ওপর। (এখানে তিনি টীকায় বলেছেন—প্রাসাদ ও দীঘিটার অবস্থা আমি ১৮৬৪ সালে যেমন দেখেছি এখানে তার বিবরণ দিচ্ছি। এর পর আমি শুনেছি দীঘিটার সংস্কার করা হয়েছে এবং প্রাসাদটি প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে)। কারুকার্যশোভিত নাট্যশালা এখন ভগ্ন পরিত্যক্ত বাড়ীতে পরিণত হয়েছে। দুর্দশা কবলিত মহিলারা, যারা এখনও নিজেদেরকে প্রিন্সেস (রানী) উপাধিতে ভূষিত করেন, এখন আর রাজকীয় হ্রদে সন্ধ্যাকালীন নৌবিহারে গমন করেন না। এক কালের রানীরা এখন আর ছাদের নীচে বসবাস করেন না। একদিন যারা ছিলো প্রাসাদের বাসিন্দা, তারা এখন আস্তাবল সদৃশ জীর্ণ কোঠায় বসবাস করছে। নগর রাজাদের বিলীয়মান ঐশ্বর্যের মধ্যে হ্রদের ছোট্ট জলস্রোতটি ছাড়া এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পুরানো এই রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাঁড়িয়ে পথিকের মনে জেগে ওঠে প্রাচীন রোমের চোখ ধাঁধানো ঐশ্বর্যের অনুরূপ ধ্বংসাবশেষের স্মৃতি ঃ

টাইবারের ঐশ্বর্য দ্রুত অপসৃয়মান,
নিয়তির লিখন কে পারে খণ্ডাতে ?
বিশ্বকর্মার একি পরিবর্তনশীল লীলা !

যা কিছু কঠিন অবশেষে তাই পড়ে ধ্বসে
যা কিছু উপযুক্ত তাই টিকে যায় শেষে।
—বেলী রচিত স্পেন্সারের 'রোমের ধ্বংসাবশেষ'

ভগ্ন প্রাসাদরাজির এক কোণায় বসে রাজ পরিবারের বংশধররা মজে যাওয়া হ্রদের দিকে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি মেলে নিকৃষ্ট ধরনের মিষ্টান্ন চিবোচ্ছে আর নিজেদের দুঃখ দুর্গতির কাহিনী আলোচনা করছে।[১]

শুধু মওলানা কেরামত আলী সাহেবের অনুরোধেই মাত্র ইংরেজের অন্যতম প্রতিদ্বন্দী ও বৈরী শাহ্‌যাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ এবং তার স্ত্রী আমিরন নেছার শুধুমাত্র জীবনটিই রক্ষা পেয়েছিল। ফাঁসিকাষ্ঠে না ঝুলিয়ে অথবা হত্যা না করে ছেড়ে রেখেছিল। ইংরাজ লেখকদের লেখায় স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, হত্যা করলে তার কবরে দলে দলে লোক গিয়ে আবার শপথ করবে ঐ পথে নিজেরা যাওয়ার জন্য। গৃহবন্দী করে রাখাই তারা উত্তম পন্থা মনে করেছিল বিপ্লবের বিদ্রোহের শেষের দিকে। তা ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টারের নিম্নোক্ত লেখাটি পড়লে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে আশা করি। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও তার স্ত্রী বেগম আমিরন নেছাকে আজীবন গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল। নিজ প্রাসাদে নগরে। ইংরাজদের ইচ্ছায়, কারও অনুরোধে নহে।

হাণ্টার লিখেছেন ঃ

> '(জনৈক চামড়ার ব্যবসায়ী) গত ত্রিশ বছর যাবৎ তাঁর রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন এবং তিনিও জানতেন যে সরকার তার মতলব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ১৮৪৯ সালে তাঁকে সরকারী ভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়। তার পর ১৮৫৩ ও ১৮৫৭ সালে তাঁকে উপর্যুপরি সতর্ক করা হয়। এবং ১৮৬৪ সালে তাঁকে প্রকাশ্যে আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তলব করে শেষ বারের মত হুঁশিয়ার করা হয়। কিন্তু এসব সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করায় ১৮৬৯ সালে তাকে নজরবন্দী করা হয়। এ জাতীয় তৎপরতা দমন করা খুবই অসুবিধাজনক। নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে নিজ পথ অনুসরণকারী এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা কোন সরকারই

---

১. "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস" ডব্লিউ, ডব্লিউ হাণ্টার, অনুবাদক : এম. আনিসুজ্জামান, প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৭৫ ইং, পৃষ্ঠা—১৩৪, ১৩৩, ১৩৫ ।

> গ্রহণ করতে চায় না এবং এ ক্ষেত্রে কেবল অন্যের ক্ষতি করা থেকে বিরত করার উদ্দেশ্যে তাকে নজরবন্দী রাখা ছাড়া আর কোন বিকল্প সম্ভবতঃ নেই।
>
> —দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস

ফকির সন্ন্যাসী প্রজা বিদ্রোহের নায়কদের যেভাবে ডাকাত, দস্যু লুটেরা বলা হয়েছে, এমনকি শেষের দিকে 'নন্-কোঅপারেশন' আন্দোলনের নায়ক-নায়িকাদের দস্যু ডাকাত বলা হয়েছিল, তদ্রূপ আযাদী আন্দোলনের মহানায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান সেনানী সৈয়দ আহমদ- বেরেলভী সাহেবকে হাণ্টার দস্যু, লুটেরা বলবার সাহস পেয়েছেন, তা তার ইন্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থের প্রথমের দিকে দেখলেই বুঝতে পারবেন আশা করি। এর মূল কথাই হলো মুসলমানদেরকে সৈয়দ আহমদের উপর থেকে বিরূপ বিদ্রোহী করে তোলা। এই মূলনীতি হাণ্টার-এর প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। এখন হাণ্টারের কথাগুলি দেখুন ও অনুধাবন করুন।

> পাঞ্জাব সীমান্তে বিদ্রোহী শিবিরের গোড়াপত্তন করে সৈয়দ আহমদ। অর্দ্ধ শতাব্দী আগে আমরা পিণ্ডারী শক্তিকে নির্মূল করার ফলে যে কয়জন তেজস্বী পুরুষ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, সৈয়দ আহমদ তাদের অন্যতম। কুখ্যাত এক দস্যুর অশ্বারোহী সৈনিক হিসাবে যে জীবন আরম্ভ করে এবং বহু বৎসর যাবত মালওয়া অঞ্চলের আফিম সমৃদ্ধ গ্রামসমূহ লুটতরাজ চালায়।
>
> —অনুবাদ দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস্ গ্রন্থ, পৃঃ ৩

হাণ্টার সাহেব ভারতীয় মুসলমানদের যে হিতৈষী ছিলেন না; অথচ তাদের পক্ষে ওকালতী করবার যে মনোভাব দেখিয়েছেন তিনি সুকৌশলে তা তাঁর নিম্নোক্ত লেখাতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

> সার্বিক দমন নীতি প্রয়োগের দ্বারা ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদের চেষ্টার পরিণতি দাঁড়াবে ধর্ম্মান্ধদের উৎসাহকে অগ্নিশিখায় পরিণত করে সমস্ত ধর্ম্মভীরু মুসলমানদের সহানুভূতি তাদের দিকে আকৃষ্ট করা। অসন্তোষের সামান্যতম মনোভাব সৃষ্টির আগেই অবাধ্য শ্রেণীকে অবশ্যই আলাদা করে ফেলতে হবে এবং এটা করতে হবে সম্পূর্ণ ভদ্র প্রক্রিয়ায় অথচ সামগ্রিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে। —পৃষ্ঠা ১২৬

সাধারণ মুসলমানদের থেকে স্বদেশের স্বাধীনতা পিয়াসী বীরযোদ্ধা মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার কৌশলগুলির মধ্যে হত্যা না করে সমস্ত

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে অসহায় করে ফেলা এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে যে ওহাবী বলা তা হাণ্টারের কথা থেকে বোঝা যাবে। এই অবাধ্য শ্রেণীকে অর্থাৎ স্বাধীনতা-পিয়াসী বীরদিগের প্রতি নানারূপ মিথ্যা দুর্নাম ছড়িয়ে বিচ্ছিন্ন করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে হাণ্টার সাহেব যে সফলকাম হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। হাণ্টারের কথায় দেখুন ঃ

> ভারতে বৃটিশ সরকার এখন এত শক্তিশালী যে তাকে দুর্বল ভাবার কোন অবকাশ নাই। রাজদ্রোহীদের সকলকেই সরকার কারান্তরালে আটক রাখতে পারেন, কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহী দলটাকে কোণঠাসা করার আরও একটা মহত্তর উপায় আছে; সেটা হলো সাধারণ মুসলমান সমাজ থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা।
>
> আমাদের আলোচ্য সময়ের নায়কগণ যেমন কৃষক প্রজা সাধারণের ঘরে ঘরে গিয়ে ইংরাজবিরোধী প্রচারপ্রচারণা চালিয়েছিলেন, তদ্রূপ বই-পুস্তক এস্তাহার দিয়েও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালিয়েছেন। এটা কমকৃতিত্ব ও দুরদর্শিতার কথা নহে। এটাই সঠিক ও সুন্দর হয়েছিল। এজন্য তাদের নেতৃত্বের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
>
> অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে-কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মাঝে রাজদ্রোহমূলক কাজের উৎসাহ সৃষ্টির জন্য ওয়াহাবীরা একটি চতুর্থ সংগঠনও গুড়ে তুলেছে। প্রাথমিক খলীফারা যে সব এলাকায় অনুকূল সাড়া পাওয়া যাবে সেখানেই প্রচারকদের স্থায়ী ভাবে বসবাসের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছিলেন। —পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

আরবের মহানায়ক দূরদর্শী ও পুরা বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কারক আবদুল ওহাব নজদী সাহেব যেমন খাঁটি মুসলমান সুন্নাহ্ পন্হী।' ভারতীয় বাঙ্গালী মুসলমানেরাও সেইরূপ সুন্নাহ্‌পন্হী খাঁটি মুসলমান। কোন কোন বিষয়ে এদের সামান্য মতবিরোধ ছিল বা আছে। বাঙ্গালী ও ভারতীয় মুসলমানরা আবদুল ওহাব সাহেবের পুরা মতের ও পথের এবং সংস্কারের বিরোধী অধিকাংশ এদেশীয় মুসলমানরা তাই বাঙ্গালী ও ভারতী ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই মহান জাতীয় নায়ককে ওহাবী নামে আখ্যায়িত করার মানেই হল, তাদের সাধারণ মুসলমানদের নিকট হতে

বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই মিথ্যা ও শয়তানী কৌশলে হান্টারপন্থীরা জয়ী হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

মিঃ হান্টারের নিম্নোক্ত কথাগুলি হতে বোঝা যাবে তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলিমদের দেশ স্বাধীন করবার কি বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল ঃ

> ১৮৫৮ সালের সীমান্ত সংঘর্ষে আমাদের অফিসাররা লক্ষ্য করেন যে, যুদ্ধে নিহতদের অনেকের চেহারায় দক্ষিণ বঙ্গের জলাভূমি অধ্যুষিত এলাকার কাল বা শ্যামল বর্ণের সৌসাদৃশ্য রয়েছে। এই নির্দেশনের অনুবর্তন তৎক্ষণাৎ সম্ভব হয়নি। অভিযানের শেষে অনিয়মিত অশ্বারোহীদের সংখ্যা হ্রাস করা হয় এবং যোগ্য লস্করদের অনেককে অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি করা হয়। তাদের একজন ছিল পাঞ্জাবী মুসলমান (টিকায় তার নাম দিয়াছেন :—গুজান খান।) এবং অতিশীঘ্র সে আম্বালার নিকটবর্তী একটা জেলায় (কার্নাল) সার্জেন্ট পদে উন্নীত হয়। ১৮৬৩ সালের মে মাসে একদিন সকালে টহলদানের সময় সে উত্তরের মহা সড়ক দিয়ে গমনরত চারজন বিদেশীকে দেখতে পায়। তাদের খর্বাকৃতি, লালচে রং এবং নাতিদীর্ঘ দাড়ি দেখে বৃদ্ধ সৈনিকটির মনে পড়ে যায় যে, ১৮৫৮ সালের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত বাঙ্গালী বিদ্রোহীদের যে সমস্ত লাশ সে দেখেছিল তাদের আকৃতিও ঠিক এই রকম ছিল। সে তাদের সংগে কথাবার্তা শুরু করে তাদের গোপন তথ্য কিছু অবগত হয় এবং জানতে পারে যে, তারা মুলকা থেকে আগত বাঙ্গালী প্রচারক, বিদ্রোহী শিবিরে পাঠাবার জন্য নূতন করে অর্থ ও লোকজন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা নিজ প্রদেশে ফিরে যাচ্ছে।
>
> দীর্ঘদেহী উত্তরাঞ্চলীয় সৈনিক তৎক্ষণাৎ উক্ত চারজন রাজদ্রোহীকে গ্রেফতার করে। তারা মুসলমান ভাই হিসাবে তার কাছে আবেদন জানিয়ে বলে যে, তাদের ছেড়ে দেওয়া হলে উৎকোচ হিসাবে সে যা চাইবে তাই দেওয়া হবে এবং পার্শ্ববর্তী থানেশ্বর বাজারে জাফর খান নামক জনৈক দূতের মারফত উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু বৃদ্ধ সৈনিকটি নিমকহারামী করতে সম্মত না হয়ে ধৃত ব্যক্তিদের তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সোপর্দ করে। —পৃষ্ঠা ৭১, ৭২

উক্ত গাজান খান সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের মোসাহেব ছিল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৮৫৭—৫৮ সালের বিদ্রোহ বিপ্লব এবং পূর্ববর্তী কালের সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সাহেবের নেতৃত্বে এবং তার শহীদ হওয়ার পর যুদ্ধ-বিগ্রহে দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষকারীরা, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তাকারী, দেশদ্রোহী গাজান খানের মত আর কোন কোন দেশদ্রোহী ইংরাজ সম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে গিয়ে দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন কারা কারা এবং ইংরাজদের নিকট হতে জমিদারী, জায়গীরদারী পেয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে শেষটায় পাঞ্জাবে এবং গোটা ভারতে পাপ অর্থে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নেতা সেজেছেন। এ সবের ইতিহাস ইতিবৃত্ত জানবার, দেশকে জানাবার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেশের কল্যাণ মঙ্গল ও সংহতির পক্ষে। এদের অপকর্ম ও গুরুতর অপরাধের জন্য গোটা পাঞ্জা দায়ী নয়, দায়ী কতকগুলি দেশদ্রোহী মানুষ। এ সম্পর্কে 'বৃটিশ ভারতের ইতিহাস লেখা খুবই দরকার হয়ে পড়েছে। এদের অপকর্ম ও দেশদ্রোহিতার স্বরূপ উদঘাটন করলে দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হবে এবং দেশের নব সভ্যতার পথ খুলে যাবে। এদিকে উদ্যোগী সুধী নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি। কারণ পাপ শুধু পাপই বাড়ায়। দুর্নীতি আরও দুর্নীতিবাজদের সৃষ্টি করে।'

বিষয়টির বিশদরূপ দেখানোর জন্য আমি হান্টার থেকে আরও উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

> "ধৃত লোকগুলি মুক্তি পাওয়ায় অশ্বারোহী পুলিশের সার্জেন্ট ভয় পেয়ে যায়। তার রিপোর্ট সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এ কথা ভেবে তার পাঞ্জাবী মনে ভীষণ আঘাত লাগে এবং তখনও সে এই বিশ্বাসে অবিচল ছিল যে, সাম্রাজ্যের উপর এক ভীষণ বিপদ নেমে আসছে।"
>
> "কিন্তু সুদূর উত্তরে স্বগ্রামে তার ছেলে ছিল এবং একমাত্র পারিবারিক মর্যাদা ছাড়া দুনিয়ার আর যে কোন বস্তুর চেয়ে ছেলেটি তার সর্বাধিক প্রিয়। তার গ্রাম এবং সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায় আমাদের অনেকগুলি ঘাঁটি ছিল এবং প্রত্যেক ঘাঁটির সৈনিকরা সন্দেহ ভাজন পথিক ও আত্মগোপনকারী বিদ্রোহীদের ধরার জন্য সদা সতর্ক ছিল। সীমান্তের অপর পার্শ্বে ছিল ধর্মান্ধ বিদ্রোহীদের ঘাঁটি, যারা তখন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হামলা চালাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। 'কাজেই, কোন সন্দেহভাজন নবাগতকে দেখতে পেলে তারা নিঃসন্দেহে তাকে সরকারী

বাহিনীর গুপ্তচর মনে করে হত্যা করবে এটা ছিল অবধারিত। আমাদের বাহিনীর নজর এড়িয়ে যেতে পারলেও সীমান্তের ওপারে ওয়াহাবীদের হাতে ধরা পড়লে তার ছেলে যে রেহাই পাবে না, এ কথা সম্যক অবগত হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ সিপাই পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে মুলকা নির্দেশ দিয়ে বলে যে, বাইরের বিদ্রোহীদের সাহায্যার্থে আমাদের এলাকার মধ্যে যে সব রাজদ্রোহী কর্মরত রয়েছে তাদের নাম সংগ্রহ না করে সে যেন ফিরে না আসে।

পিতার চিঠি পেয়ে ছেলেটি পরের দিনই গ্রাম ত্যাগ করে। অন্তর্ধানের পর তাকে কি যে দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছে তা শুধু তার স্বজনরাই জানে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, ছেলেটি আমাদের ঘাটিতে প্রহরারত সৈনিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে সীমান্ত শিবিরে গিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয় এবং তারপর ওয়াহাবীদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সাথে মিশে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের পর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে রোগজীর্ণ শরীরে একদিন সন্ধ্যায় কয়েক শ' মাইল অভ্যন্তরে পিতার কুটিরে ফিরে আসে। সে এই গোপন তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসে যে, "থানেশ্বরের সেই মুনশী জাফর, লোকে যাকে খলিফা বলে ডাকে, সে হচ্ছে ওয়াহাবী এজেন্ট এবং বাঙ্গালীদের সীমান্ত শিবিরে গমনাগমনে সাহায্য করা, তাদেরকে রাইফেল ও রসদ যোগানোই হচ্ছে তার কাজ।

স্মরণ থাকতে পারে যে, এই জাফরই হচ্ছে থানেশ্বর বাজারের সেই দলিল লেখক যে নাকি উল্লেখিত চারজন পথিককে ছেড়ে দেয়া হলে সার্জেন্টকে ঘুষের টাকা সরবরাহ করত।

উল্লেখিত দৃঢ়চেতা পাঞ্জাবী পিতার কর্তব্য-নিষ্ঠার সাথে জনমের মত আর কোন হৃদয় স্পর্শকারী ঘটনা আমার জানা নেই। সেদিন এমন একজন কর্তব্য-নিষ্ঠ সিপাই যে গর্বভরে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে নীরবে বিড় বিড় করতে করতে প্রতি দিনের টহল দান কার্য সমাধা করেছে এবং ছেলের ভাগ্যে কি ঘটল না ঘটল সেই চিন্তায় প্রতি মাসে বারবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ রক্ষা এবং পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে যেয়ে সে তার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। — পৃষ্ঠা ৭২-৭৩-৭৪

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ শুরু হবার পর জাফর তার বারজন সর্বাধিক বিশ্বস্ত অনুচরকে বিদ্রোহী শিবিরে প্রেরণ করে। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা অর্জনের শিক্ষার প্রতি জাফর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং তার ফলে সর্বাধিক বিপদজ্জনক রাজদ্রোহমূলক কাজের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত বলে মনে করা হতো। দিল্লীতে বিদ্রোহীদের সমস্ত আশা-ভরসার পতন ঘটার পর সে থানেশ্বরে তার আইন ব্যবসায়ের জায়গায় ফিরে আসে এবং আল্লাহ্ কেন অবিশ্বাসীদের জয়ী করলেন তা নিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হয়। দলিল লেখকের গ্লানিকর জীবিকার প্রতি তার বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পায়। প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে এবং অতঃপর গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা কিছু করা যায় কিনা তা দেখতে বাকী রইল। ব্যাপকভাবে সংগঠিত ওয়াহাবী সংস্থার একজন সদস্য হিসাবে জাফর যোগ দিল। যে জীবিকার প্রতি তার মনে অনীহা জমেছিল। এখন গুপ্ত তৎপরতার বদৌলতে সে পেশার প্রতি ধর্মীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হলো। জাফর নিজেই লিখেছে ঃ

জেনে রাখা উচিত যে, গুপ্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কোন এক ব্যক্তির নির্দেশে আমি এটা করেছি।

তিনি টীকায় লিখেছেন ঃ

স্যার হার্বার্ট এডওয়ার্ডস দণ্ড প্রদানের সময় জাফরের চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "এই আসামীর চরম শত্রুতামূলক মানসিকতা, রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ এবং নাশকতামূলক কাজের দক্ষতার দ্বিতীয় নজির নেই। সে একজন শিক্ষিত লোক এবং তার গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে তার অপরাধ ক্ষমার অতীত। —১৮৬৪ সালের আম্বালা বিচারের সরকারী রেকর্ড থেকে সংগৃহিত, পৃষ্ঠা ৭৫—৭৬

তাহার মতে হাণ্টার মুসলমানদের বন্ধু ছিলেন না, তবু স্বজাতি ইংরেজদের চাটুকারিতায় তিনি ব্রাহ্মদের মত কেন হতে পারলেন না। বীর ইয়াহিয়া আলী সাহেব সে কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ অনেক ব্রাহ্মরা ইংরাজদের তোষামোদ করে নিজেদের অনেক সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন। ইংরেজরা যা ছিটেফোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ব্রাহ্মদের মুখে। সব ব্রাহ্মরাই যে ইংরাজদের উদ্ধারকারী অবতার মনে করেছিলেন, তা আমরা জানি না। তবে তাদের অনেকেই যে করেছেন তা জানি। তবে যারা ইংরাজদের গুণগান করে এ দেশে ইংরাজ রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করবার প্রয়াস

পেয়েছিলেন। তাঁরা দেশদ্রোহিতার কাজ যে করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। শুধু যে ব্রাহ্মণরাই ইংরাজদিগকে তাদের উদ্ধারকারী প্রফেট-এর মর্যাদা দিয়ে বিশ্বাস করে এসেছেন তা নয়। গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ইংরাজ সাম্রাজ্যকে গভীরভাবে সমর্থন করে এসেছেন উদ্ধারকারী বলে এবং তিনি যে বিষবৃক্ষের সৃষ্টি করে গেছেন অর্থাৎ তিনি যে ইংরাজদের সহায়তায়, সমর্থনে শিষ্য সৃষ্টি করেছেন ভারত উপমহাদেশে তার তুলনা নেই। শুধু হিন্দুই যে তাঁর শিষ্য তা নয়, বহু মুসলমানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এদিক দিয়ে বঙ্কিমকে এক অনন্য ও অসাধারণ বলতে হবে। তাঁর সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার জন্যে গোটা দেশটাই একটা জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা দেশদ্রোহিতা করেছে, তারাও সেজন্যে দায়ী। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা দেশদ্রোহিতা করেছে তারা যেমন দায়ী, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও যাঁরা দেশদ্রোহিতা করেছেন তাঁরাও তেমনি দায়ী। আমরা কাউকে দোষী করতে চাই না এবং নির্দোষও বলতে পারি না। এ সব আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আনন্দমঠ

'আনন্দমঠ' নামে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক উপন্যাস পড়েছি। সে উপন্যাসে তিনি যবন-বিদ্বেষী সন্তান সন্ন্যাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন। যদিও সেই সন্ন্যাসীরা যবন-বিদ্বেষী ছিল না। কিন্তু এই আনন্দমঠ যে বাস্তবে ছিল তা হয়ত অনেকে জানেন না। আমরা এখানে সেই সত্যিকার আনন্দমঠের পরিচয় তুলে ধরব।

সম্ভবত মঠটি পূর্বে এক মহলা বিশিষ্ট দালান ছিল। কাছারী বাড়ীর সংলগ্ন দুর্গা মন্দির, তার সামনে দেউড়ী ঘর, দুর্গামন্দির এর উত্তরে অবস্থিত। ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে পশ্চিম দিকে এখনও একটি পূর্বেকার আমলের ফুলের বাগান রয়েছে, তবে তাহা সংস্কারের অভাবে বিলুপ্তির পথে। সেখানে শ্যামরায়ের (রাধাকৃষ্ণ) মন্দির এখনও রয়েছে। পূজা-পার্বনাদি এখনও হয়। প্রায় ৪ শত বৎসর পূর্বেকার বাদশাহী আমলের একটি শিবমন্দির এখনও রয়েছে ও পূজাও চলিতেছে। মন্দিরটি লম্বায় ২২ হাত প্রস্থে ১৫ হাত একটি পাকা দালান। বাড়ীর সংলগ্ন পশ্চিম দিকে একটি বিরাট ফলের বাগান (আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি) এখনও রয়েছে। এই বাগানের পশ্চিম দিকে একটি প্রকাণ্ড দীঘি রয়েছে। বাড়ীর পূর্বদিকে পুরানো আমলের একটি বিরাট দীঘি রয়েছে। ঘাটগুলি শান বাঁধানো। বাড়ীর সংলগ্ন দক্ষিণে—সামনেই—একটি হাট অবস্থিত। হাটটির নাম বাবুর হাট। উক্ত বাবুর হাটের পশ্চিমে জমিদারদের পুরানা আমলের 'যতীন্দ্রকুমার ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্‌পেনসারী' ও একটি পোস্ট অফিস অবস্থিত। পোস্ট অফিসটির নাম 'ইটাকুমারী'। বাবুর হাটের সংলগ্ন দক্ষিণে আর একটি বিরাট দীঘি রয়েছে। দীঘিটির নাম 'দেবী ভাসানো' দীঘি। হাটের পশ্চিম-দক্ষিন কোণে একটি শান বাঁধানো পুষ্করিণী রয়েছে। বাড়ীর দক্ষিণে সামান্য দূরে রাস্তার ধারে একটি কালী মন্দিরে 'পঞ্চমূর্তি' আসন রয়েছে। এটিও বহু পুরাতন—প্রায় ৫ শত বছরের পূর্বেকার। বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরগুলি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তবে সবগুলিই ধ্বংসের পথে।

বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রাস্তার ধারে জমিদারদের দেওয়া একটি পূর্বের মধ্য ইংরেজী এম. ই. স্কুল ছিল। স্থানীয় কতিপয় লোক জবরদস্তি করে জমিদারদের অমতে তাদের কাছারী বাড়ীতে একটি জুনিয়র হাইস্কুল বসিয়েছে। ইহা ঘোরতর অন্যায় বলে আমরা মনে করি। জমিদারদের থাকবার ঘরগুলি এখন প্রায় ধ্বসে পড়ছে। কাছারীঘরে তারা থাকতে পারত, যদি না জোর করে সেখানে উক্ত স্কুল বসানো হত।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর স্মৃতিমন্দির ও তাঁর স্ত্রী ক্ষীরোদা সুন্দরী রায় চৌধুরানীর স্মৃতিমন্দির বাড়ীর পশ্চিম দিকে বাঁশদহ নামক শ্মশানে মন্দির দুইটি পাশাপাশি এখনও রয়েছে।

ইটাকুমারীর জমিদারদের দেওয়া বাদশাহী আমলের নির্মিত 'আনন্দমঠ' নামীয় মঠটিই, জমিদার বাড়ী হতে দেড় ক্রোশ উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। লোকেরা বলে থাকে স্থানটির নাম 'তপস্বীদাঙ্গার মাঠ'। অবশ্য আঞ্চলিক ভাষায় নাম সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আনন্দমঠ সংলগ্ন স্থানে শত শত তপস্বী থাকত অর্থাৎ ইংরাজ-বিরোধী সন্ন্যাসীরা 'আনন্দমঠে' থাকতেন এবং তাঁরা মঠে পূজা-অর্চনা করতেন। মঠের পূর্বধারে তপস্বীডাঙ্গার বিল একটি জলাশয়কে বলা হয়ে থাকে। পূর্বে সম্ভবত উহা খনিত হয়েছিল।

যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর কন্যা ননীবালা দাসগুপ্তা, বয়স ৭০ বৎসর, উষারানী দাসগুপ্তা, বয়স ৬৫ বৎসর— তাঁরা ওদের সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেন: "আমরা ছোট বেলায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেওয়া আনন্দমঠে অনেকবার বেড়াতে গিয়েছি। সে সময় মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে পড়া দেখেছি। ওর আশে-পাশে আরও কয়েকটি মন্দির ছিল কিন্তু 'আনন্দমঠ' নামীয় মঠটি খুবই বৃহদাকার ছিল। ঐ সময় আমরা শিবলিঙ্গ দেখেছি। এর সম্পূর্ণ জায়গাটিকে নিয়ে 'আনন্দমঠ' বলা হত। আনন্দমঠ ও অন্যান্য মন্দিরগুলির উপরে বিরাট আকারের বট গাছ দাঁড়িয়ে থাকা আমরা দেখেছি। আনন্দমঠ সংলগ্ন চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান ব্যাপী বাঁশ ও অন্যান্য গাছ-গাছড়ায় বিরাট জঙ্গল পূর্ণ ছিল। এত ভীষণ জঙ্গল যে দিনের বেলায়ও জঙ্গলের অনেক জায়গায় সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না। লোকজন ভয়ে একাকী ঐ সব এলাকায় পূর্বে যাওয়া-আসা করত না।"

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের দেখার সময়েও কি আনন্দমঠে পূজা উৎসব হত?"

উত্তরে তাঁরা বললেন, "না, ওসব কিছু হত না।"

শ্রীযুক্তা ননীবালা দাসগুপ্তা এবং উষারানী দাসগুপ্তার ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীযোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, বয়স ৪৮ বৎসর—তিনি তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেন ঃ

> আমি ৩০/৩৫ বছর পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষদের দেওয়া আনন্দমঠ দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৬/১৭ বছর। আমার সম্পর্কীয় কাকাবাবু শ্রী জগৎচন্দ্র দত্ত গুপ্ত মহাশয় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহের শেরপুর টাউনের অধিবাসী। আমরা প্রথমে গিয়ে দেখি, রেল লাইনের পশ্চিমে একটি বাঁশঝাড়ের কাছে আনন্দমঠের ভগ্নাবশেষ এবং শিবমন্দিরের ভিটার উপর শিবলিঙ্গ অবস্থিত রয়েছে এবং রেল লাইনের পূর্ব দিকে তপস্বীদাঙ্গা বিলের দক্ষিণ পাড়ে একটি বিরাট জঙ্গলের মধ্যে উল্লিখিত আনন্দমঠের সরু পথ দিয়ে পশ্চিম দিকে আমি ভিতরে গিয়ে দেখি, জায়গায়, জায়গায় অনেকগুলি ভগ্ন মঠ ও মন্দিরের উপরে বট পাকুড়ের গাছ হয়ে রয়েছে এবং দুর্গম পথ গভীর জঙ্গলের জন্য আমি আর সামনে যেতে পারি নাই। এত ভীষণ জঙ্গল ছিল যে, দিনের বেলাও জঙ্গলের অনেক স্থানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না।

আগের সময়কালে তপস্বী দাঙ্গার মাঠ এবং আনন্দমঠের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি বিরাট জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। ইংরাজদের অত্যাচারের ভয়ে অযত্নে স্থানগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছিল। অথবা ইংরাজরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে অন্য ঐতিহাসিক স্থানগুলির মত লোকচক্ষুর বাইরে রাখবার জন্য এভাবে ভীষণ জঙ্গল করে রেখেছিল। নবাবের উযীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের সময়কালে এই সব এলাকা বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল। জঙ্গল ছিল না। ঐ সময়গুলিতে ইংরাজদের বিপক্ষীয়দের শক্তি খুব একটা কম ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য পরে প্রচারের মাহাত্ম্যে এবং যে কোনভাবে হোক যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ইংরাজদের অজেয় দেখানো হয়েছে। এখন এই ভীষণ জঙ্গলের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বর্তমানে লোকে আবাদযোগ্য জমি করেছে। স্থানে স্থানে বসত বাড়ী করা হয়েছে দেখলাম। এই ঐতিহাসিক স্থানটি অযত্নে অবহেলায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে নামগুলি এখনও লোকেরা বলে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বর্ণিত আনন্দমঠের নাম নিয়ে তার বিখ্যাত

‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসখানির নাম দিয়েছেন কি? আমাদের কিন্তু তাই মনে হয়। কাতনিয় রেলওয়ে জংশন হতে দক্ষিণ দিকে এক ক্রোশ দূরে রেল লাইনের একবারে পাশে ‘আনন্দমঠের’ স্থানটি অবস্থিত। অন্নদানগর রেল স্টেশন হতে উত্তরে প্রায় এক ক্রোশ দূরে উক্ত আনন্দমঠের তপস্বীদাঙ্গার দীঘি। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে তপস্বী বলেছেন। আসলে এখানে এই তপস্বীদাঙ্গার দীঘির পার্শ্বস্থিত মাঠে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তপস্বীরা এক মাঠে আলাদা আলাদাভাবে তাঁবু খাটিয়েছিলেন এবং তাঁরা একই সঙ্গে ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয় নবাবের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। জমিদার শিবচন্দ্র রায় সম্রাট পক্ষীয় সুবাদারের একজন বিশিষ্ট উযীর ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করার জন্য বঙ্কিমের আনন্দমঠে তপস্বী বলতে শুধু হিন্দু সন্ন্যাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা সত্য নয়।

তপস্বীদাঙ্গার দীঘি

স্থানীয় লোকেরা উক্ত দীঘিটিকে এখন বিল বলে থাকে। দীঘির কোন চিহ্নই অবলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি সুবৃহৎ বলে বিল বলা হয়ে থাকে মনে হয়।[১] এই স্থানটি যেমনি ঐতিহাসিক, তেমনি দেশপ্রেমিকদের নিকট এক কালে স্মরণীয় বরণীয় এবং আদরণীয় ছিল। আজও তাই থাকবে বলে আমরা আশা করি। তপস্বীদাঙ্গা দীঘিটি হল রঙ্গপুর জেলার সদর মহকুমাধীন কাউনিয়া থানার অন্তর্গত। দীঘিটি জলস্থিত এবং পাড়ের কোন কোন অংশের নাম হল ‘আরাজী শাহবাজ’। আসলে হবে ‘অরাজী শাহবাজ’। অ-টাকে স্থানীয় শব্দে আ' করে ফেলা হয় উচ্চারণের অস্পষ্টতার জন্য। যেমন আম বাবু গেলেন রাম আনতে, এখানিও ঠিক তেমনই হয়েছে বলে মনে হয়। তপস্বীদাঙ্গার দীঘির পশ্চিম প্রান্তের নাম হল ‘খোপাতী’। আশপাশের কোন কোন স্থানের নাম হল শাহবাজ, হরিচরণ লস্কর, বটু বাড়ী। তপস্বীদাঙ্গার দীঘির দক্ষিণ পাড়ে ‘আনন্দমঠ’ অবস্থিত ছিল। আনন্দমঠের ৪০ গজ উত্তরে শিবমন্দির। শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গ এবং শিঙ্গের নীচে থালার মত বৃহৎ পাথর (যোনিপাট) বসানো ছিল। শিঙ্গে

---

[১] চৈত্র মাসে দীঘির পানি কমে। তথাপি কোন কোন জায়গায় ১৮ হাত হতে ২০ হাত পর্যন্ত গভীর থাকে।

দুধ ঢেলে দিলে যে পাথরে এসে পড়ত, সেই পাথর এবং লিঙ্গটি স্থানীয় এক ভদ্রলোক তার বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। আনন্দমঠের চিহ্ন ইংরাজী ১৯০৩/১৯০৪ সনের মধ্যে ধ্বংস করা বা উৎখাত করা হয়েছে। পার্শ্বস্থিত শিবমন্দিরের গায়ে বিশালাকায় বটবৃক্ষ হওয়ায় এবং অযত্নের ফলে মন্দিরের চূড়া ও পাশ আপনা হতে ভেঙ্গে পড়েছে। পরে দেওয়ালের নীচের অংশ এবং মেঝে লোকেরা খুঁড়ে নিয়ে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। কারণ স্থানগুলি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হয়েছিল। সে কথা আমরা পড়ে বলছি।

গাজীর দরগাহ ঃ তপস্বীদাঙ্গা দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে হল 'গাজীর দরগাহ'। এই গাজীরা আর কেউ নন, ইংরাজদের সহিত যুদ্ধকারী ফকীর দরবেশ এবং তাঁদের দলবল।

কালীর থান ঃ গাজীর দরগাহ হতে ২৫০ গজ পূর্বদিকে দীঘির উত্তর পাড়ে 'কালীর থান'। এখানে একটি কালী মন্দির ছিল। দরগাহ ও কালী মন্দিরের চিহ্নমাত্র এখন নেই, নামগুলি শুধু রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা স্থানগুলি দেখিয়ে দেন।

বুড়াবুড়ীর থান ঃ কালীর থানের ২৫/৩০ গজ পার্শ্বে বুড়াবুড়ীর থান। স্থানীয় অশিক্ষিত হিন্দুগণ মহাদেব ও তাঁর স্ত্রী কালী দেবীকে বুড়াবুড়ী বলে থাকেন। উক্ত স্থানেও একটি শিব ও কালী মন্দির ছিল। ইহারও চিহ্নমাত্র নেই।

আনন্দমঠের ৬০০ গজ উত্তর দিকে আরও একটি বুড়াবুড়ীর মন্দির ছিল। তারও কোন চিহ্নমাত্র নেই। সম্ভবত বুড়াবুড়ী নামীয় মন্দিরগুলি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু যোদ্ধাগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তারা ঐ দুইটি মন্দিরে পুজা-অর্চনা করত।

রাজঘাট ঃ তপস্বীদাঙ্গা দীঘি বা বিলের দক্ষিণ পাড়ের একটি ঘাটের নাম হল 'রাজঘাট'। উক্ত নামটি ইংরাজ-বিরোধী জমিদার নবাবের উযীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়।

বামনী ঘাট ঃ রাজঘাটের পূর্ব-দক্ষিণে আর একটি ঘাটের নাম হল 'বামনী ঘাট' (ব্রাহ্মণী ঘাট)

ইংরাজ-বিরোধী জয়দুর্গাদেবী চৌধুরানী ব্রাহ্মণী ছিলেন বলে উক্ত নামকরণ হয়েছে। ঘাটের পার্শ্বস্থিত স্থানগুলিতে উযীর রাজা শিবচন্দ্র রায় এবং ব্রাহ্মণী জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী সময় সময় এসে তাঁবু

ফেলতেন। দীঘির পূর্ব পাড়ের নাম 'বনগাও'। এই সব অঞ্চল যখন আমি পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াই, ঐ সময় আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। তাই পূর্ব দিকের বর্ণনা দিতে পারলাম না। তবে যেটুকু জেনেছি তা এখানে উল্লেখ করবার চেষ্টা করব।

মানস-নদী ও দেশীয় সন্তানদের আস্তানা

তপস্বীদাঙ্গা দীঘির চতুষ্পার্শ্বস্থ কয়েক মাইল জুড়ে ইংরাজ বিরোধী দেশীয় সন্তানদের আস্তানা ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী ধর্মীয় কাজ করতেন। হিন্দু, মুসলমান সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক মিলে বিদেশী ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতেন। কাউনিয়া থানার উত্তর-পশ্চিম দিকে হল 'ধুমির কুঠি'। ধুমির কুঠির পাশে সরাইখানা। ধুমির কুঠির সামনে দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে মানস-নদী।

সুবা ঘাট ঃ ধুমির কুঠিতে যাওয়া-আসার ঘাটকে এখন অবধি বলা হয়ে থাকে 'সুবাঘাট'। মানস নদী দক্ষিণ দিকে সোজা চলে এসেছে জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের বাড়ীর পূর্ব দিক দিয়ে আনন্দমঠের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে কুঠির পাড় (মোগলকুঠি)। উক্ত কুঠির উত্তর পার্শ্ব দিয়ে মানস-নদী আরও দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে।

চৌকির ঘাট ঃ কুঠির পাড়ের সংলগ্ন একটি ঘাটকে এখনও 'চৌকির ঘাট' বলা হয়ে থাকে। তপস্বীদাঙ্গা দীঘির চতুষ্পার্শ্ব নিয়ে চৌকির ঘাট, কুঠির পাড় প্রভৃতি স্থান ইংরাজ-বিরোধীদের 'সংরক্ষিত' স্থান ছিল বলে মনে হয়। তা না হলে চৌকির ঘাট বা পাহারা দেওয়ার ঘাট বলা হয় কেন ?

চান ঘাট ঃ এরই এক পার্শ্বের ঘাটকে বলা হয় 'চান ঘাট'। সম্ভবত স্নান করার ঘাট ছিল বলে মনে হয়। আনন্দমঠের বা তপস্বীদাঙ্গার বিলের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি ঘোরতর জঙ্গল করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা রেখেছিল। তন্মধ্যে বেতবন খুব ঘন করে লাগান হয়েছিল, যার ফলে বেতগাছের অসংখ্য কাঁটা হওয়ায় সাধারণ লোকজনের পক্ষে এই বনে প্রবেশ একরূপ অসাধ্য হয়ে পড়েছিল। আরও নানা গাছ বট, পাইকড়, ডুমুর, পুকুরের পাড় দিয়ে বাঁশ, বেত বাঁশ, নানা কাঁটার গাছ সুচতুর ইংরাজরা লাগিয়েছিল। বনে চিতা বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার), বুনো শূকর পালে পালে চরে বেড়াত। নানা

জাতের সর্প এবং বিষধর সর্প এই সমস্ত জঙ্গলে বিচরণ করত। এই লেখার ৫/৬ বছর পূর্বেও একটি ভীষণ বড় চিতাবাঘ মারা হয়েছিল। বাঘটিকে যে লোক মারেন তার নাম ময়েজউদ্দীন। ময়েজউদ্দীন দোনালা বন্দুক দিয়ে বাঘকে প্রথম গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ লাফ দিয়ে এসে ময়েজউদ্দীনের একটি হাত কামড়ে ধরে। ময়েজউদ্দীন অবিচলভাবে মাটিতে ঠেস দিয়ে বন্দুকের নল বাঘের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় গুলী ছুড়েন। এইভাবে বাঘটি সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়।

ময়েজউদ্দীনের হাতটি যখম হয় কিন্তু ময়েজউদ্দীনের জীবন রক্ষা পায়। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পর আনন্দমঠ যে স্থানে অবস্থিত ছিল, ঐ স্থানে ৩ জন যুবক বনের ভিতর ঢুকে। জমিরউদ্দীন নামে এক যুবক দেয়াশলাইর কাঠি দিয়ে বনে আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এক পাল বুনো শুকর ওদের তাড়া করতে করতে আসে। যুবক ৩টি উপায়ান্তর না দেখে ডুমুর গাছে উঠে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দেওয়ায় আশে-পাশের কাজ করা লোকজন এসে ওদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

তখন চতুর্দিকে জঙ্গল প্রায় একরূপ শেষ হয়ে গেছে। শুধু আনন্দমঠের চতুষ্পার্শ্বে উক্ত জঙ্গল ছিল। এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। লোকজন বসত-বাড়ী নির্মাণ করে প্রায় জায়গাগুলিকে আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত করেছে। এই সমস্ত এলাকা উযীর জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল।

নবাবের উযীর শিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর বংশ-পরিচয়

আমরা ইতিপূর্বে যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরীর যে দুই কন্যা ননীবালা দাসগুপ্তা ও উষারানী দাসগুপ্তার সাক্ষাৎ বিবরণী দিয়েছি, তারা নবাবের উযীর শিবচন্দ্র চৌধুরীর বংশধর। তাঁরা তাদের বংশ-পরিচয় নিম্নোক্ত ভাবে দিয়েছেন ঃ

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁর দত্তক পুত্র শ্রী যতীন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী। তাঁর ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে। ছেলে তিনজনের নাম—(১) যোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, (২) গিরীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, (৩) শচীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী। ৪ মেয়ের মধ্যে জীবিত তিনজদের নাম হচ্ছে—ননীবালা

দাসগুপ্তা, উষারানী দাসগুপ্তা ও বিজলী প্রভা সেনগুপ্তা। যোগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর দুই পুত্র— ওপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ও নৃপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী। গিরীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী এঁর একমাত্র পুত্র ও কন্যা তিনজন। ছেলের নাম গোপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী। মেয়ের নাম গৌরী রায় চৌধুরী, তৃপ্তি রায় চৌধুরী ও শিপ্রা রায় চৌধুরী। শচীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর ৩ ছেলে ও ৭ মেয়ে। ছেলেদের নাম—সত্যেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, অমরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী ও সমরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী। মেয়েদের নাম—মীনা রায় চৌধুরানী, কণা রায় চৌধুরানী, ঋণা রায় চৌধুরানী, খনা রায় চৌধুরানী, মঞ্জু রায় চৌধুরানী, ইতিরায় চৌধুরানী, বীথি রায় চৌধুরানী।

উপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী এবং ননীবালা দাসগুপ্তা ও উষারানী দাসগুপ্তা—এঁরা তাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে রাজা শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী হতে অধস্তন কত পুরুষ হল ইহা সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তবে তাঁরা যে সব নাম দিয়েছেন, তা উপরে দেওয়া হল।

রানী ভবানী

আমাদের আলোচ্য অন্যান্যদের মত ইতিহাস প্রসিদ্ধ রানী ভবানী সম্পর্কে ছিটেফোটা দু-একটা কথা ব্যতীত আর কিছুই ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবুও কিছুটা আমরা এই মহিয়সী মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করব। বিশ্বকোষ হতে রানী ভবানী এবং রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ রায় ও রাজশাহী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তার কিছুটা উদ্ধৃত করে দিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি।

ভবানী, নাটোর-রাজকুল লক্ষ্মী। রাজারাম কান্ডের মহিষী। 'রানী ভবানী' নামে সমগ্র বাংলা রাজ্যে পরিচিতা। তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা রূপিণী ব্রাহ্মণ প্রতিপালিনী ও দীন-দুঃখী জননী ছিলেন।

নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রায় রায়াঁ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের নায়েব কানুনগোর কার্য করিয়া স্বীয় ভ্রাতা রাম জীবনের নামে যে সকল জমিদারী লাভ করেন, রাম জীবন পুত্রবধূ রামকান্ত পত্নী ভারত বিখ্যাত রানী ভবানী তাহার সদ্ব্যয় করিয়া পুণ্যশ্লোক নাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ১১৫৩ সালে রাজা রামকান্ত পরলোকগমন করিলে রাজবধূ রানী ভবানী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। তৎকালে তাঁহার সমুদয় ভূ-সম্পত্তি হইতে দেড় কোটি টাকা কর আদায় হইত, তন্মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা সরকারে রাজস্ব স্বরূপ প্রদত্ত হইত।

রানী ভবানী বড় নগর ও তাহার নিকটবর্তী দেবালয়ের জন্য প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। তৎসমস্তই দেব কার্যে ব্যয়িত হইত। তিনি উহার এক কপর্দকও কখনও গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের জন্য এবং তাহার সহচরী বিধবা মণ্ডলীর জন্য গভর্নমেন্টের নিকট বৃত্তি প্রার্থিনী হন। এরূপ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হইয়া স্বার্থত্যাগ পূর্বক, ইংরাজের বৃত্তি-ভিক্ষা কঠোর ব্রহ্মচর্যের শেষ সীমা বলিতে হইবে।

এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক দেব ব্রাহ্মণ ও দীনজনের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া রানী ভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে

দেহ পরিত্যাগ করেন। বর্তমানে বঙ্গভূমিতে সেই রানী হিন্দু বিধবার আদর্শ চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন।

রানী ভবানী রাজপ্রাসাদের নীচের তলায় বাস করিতেন। এখন ঐ রাজবাটি ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। উহার দক্ষিণে দেওয়ান খানা, তাহার দক্ষিণে রানী ভবানীর ব্রাহ্মণ ভোজের বাটি। এখানে তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন।[১]

তখনকার নাটোর রাজ্যের অধীন ভূপরিমাণ ১২,০০০ বর্গমাইলেরও অধিক হইবে। মোট ১৩৯ পরগনার ১৭৪১১৯৮৭ টাকা নবাব সরকারে রাজস্ব ধার্য্য ছিল।

১৭৩৪ খৃস্টাব্দে রাজা রামকান্ত ১৮শ বর্ষ বয়সে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে ১৬৪ পরগনা নাটোর রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে ১৮৫৩৩২৫ টাকা রাজস্ব দিতে হইত। দেখা যাইতেছে, রাম জীবনের সময় অপেক্ষা রামকান্তের সময়ে ২২ পরগনা বেশী হইয়াছিল। ইহাতে রাজা রামকান্তের বিষয়-বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাম জীবনের জীবতকালেই ছাতানী গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ভবানীর সহিত রামকান্তের বিবাহ হয়। ঐ কন্যাই ইতিহাস প্রসিদ্ধা প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানী।

১৭৮৪ খৃস্টাব্দে রাজা রামকান্ত রানী ভবানী ও একমাত্র কন্যা তারাকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সুবিস্তীর্ণ নাটোর রাজ্যের ভার এখন রানী ভবানীর উপর পড়িল। রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হয়। রানী ভবানী তাঁহার হস্তে রাজ্য-ভার অর্পণ করিবার ইচ্ছায় নবাব সরকারে জামাতার নাম জারি করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে সেই প্রিয় জামাতার মৃত্যু হওয়ায় আবার তাঁহাকে রাজ্যভার বহন করিতে হইল।

হলেওয়েলের উদ্ধৃত বিবরণী হইতেও জানা যাইতেছে যে, ৩৫ দিনের পথ ব্যাপিয়া রানী ভবানীর রাজ্য ছিল। ইহার দেয় রাজস্বে ৭০ লক্ষ টাকা, রাজস্ব আদায় প্রায় দেড় ক্রোর টাকা হইবে। এরূপ অতুল ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া রানী ভবানী ব্রহ্মচারিণী, বিষয়-সুখে এক কালে

---

[১] বিশ্বকোষ, ত্রয়োদশ ভাগ। ১৩০১ সাল। প্রথম হতে দ্বাদশ সংখ্যার 'রানী ভবানী' পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১-৩০২।

নির্লিপ্ত হইলেন, তিনি যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তেমনি ধর্মনিষ্ঠ, পরদুঃখকাতরা আড়ম্বর পরিশূন্যা।

রানী ভবানীর সময়েই সাতাত্তরে মন্বন্তর হয়। এ সময়ে নাটোরের অন্নপূর্ণা রানী ভবানী আপনার বিপুল রাজকোষ শূন্য করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার অন্নকষ্ট নিবারণে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন। সেই মন্বন্তরের হাহাকারে দয়াময়ী দেব প্রতিমা ভবানীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তাহার উপর ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্ব্যবহারে, দেশে শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি, নিজ প্রভুত্বের খর্ব্বতা এই সকল লক্ষ্য করিয়া তিনি নিজ দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যভার দিয়া গঙ্গাবাস করিলেন। যেদিন রানী ভবানী রাজ্য ছাড়িলেন, বলিতে কি সেই দিন হইতেই যেন রাজশাহীর গৌরবও নষ্ট হইতে চলিল।

প্রবঞ্চকদিগের কথায় ভুলিয়া কাদিহাটি পরগনা নড়াইলের কালীশংকর রায়কে বিক্রয় করিলেন। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে যশোহরের কালেক্টরীভুক্ত হাবেলী মকিমপুর, নসিব শাহী, সাঁতোর ও নলদী পরগনা নিলামে বিক্রয় হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোরের উপর অত্যধিক রাজস্ব ধার্য হয়। একে রামকৃষ্ণের বিষয়ে নিস্পৃহতা, তাহার উপর রাজস্ব বৃদ্ধি, এই সকল কারণে উপযুক্ত খাজনা আদায় না হওয়াতে সূর্যাস্ত নিলামে তাঁহার বহু সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময় তাঁহার দেওয়ান ও পরে ইজারাদার নড়াইলের কালী শংকর রায় বহু সম্পত্তি ক্রয় করেন। ময়মনসিংহের চৌধুরী গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় এবং কালীশংকর ও গোপী মোহন ঠাকুরও তাঁহার কোন কোন পরগনা খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে যোগী রামকৃষ্ণের সময়ে বহু সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া সামান্য অংশই অবশিষ্ট রহিল।

রামকৃষ্ণ রায়, নাটোর রাজবংশের জনৈক রাজা। বিখ্যাত রানী ভবানী ইঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সম্রাট শাহ আলম ইঁহাকে মহা রাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিসের দশসালা বন্দোবস্তের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবস্থামতে যখন নাটোরের অধীনস্থ তালুকদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজকে কর দিতে আদিষ্ট হইলেন, তখন তিনি আপনার ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া বিস্তর আপত্তি উথাপন করেন। এই গোলযোগ এবং ধর্ম-কর্মে

অত্যধিক নিষ্ঠাহেতু রাজা রামকৃষ্ণ সুশৃংখলে রাজকার্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার অধিকৃত কতগুলি পরগনা বিক্রয় হইয়া যায়। এই সময়ে রানী ভবানী নাটোর সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর একবার কার্যভার গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের শ্যামাপূজার ঐকান্তিক ভক্তি থাকায় তিনি বিজয় কামনা বর্জন করিতে চেষ্টা পান। তাহার ফলে অনেক সম্পত্তি দীঘাপতিয়ার দয়ারামের ও নড়াইলের কালীশংকর রায়ের কবলিত হয়। একটি সম্পত্তি গোবরডাঙ্গার খেলারাম মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতার গোপী মোহন ঠাকুর ক্রয় করেন। রামকৃষ্ণ সাধকও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।[১]

বিশ্বকোষে দেখা যাচ্ছে যে, দেড় কোটি টাকা প্রজাদের নিকট হতে রানী ভবানী খাজনা স্বরূপ পেতেন। তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা সরকারের রাজস্ব স্বরূপ প্রদত্ত হত। এ হতে বোঝা যায় রানী ভবানীর ঐশ্বর্যের পরিমাণ কিরূপ ছিল।

বিশ্বকোষে আরও একটি কথা এই লেখায় রয়েছে যে, রানী ভবানী যেমন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, তেমনী ধর্মনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা ও আড়ম্বর পরিশূন্যা ছিলেন। এ সব গুণ বা এর থেকেও বেশী গুণ সম্পন্না রানী ভবানী ছিলেন—তাহা আমরাও মানি। তবে পূর্বোক্ত বিদেশী ও এদেশীয় লেখকরা তাঁর সম্পর্কে যাই লেখুক না কেন, আমরা বলব তিনি তেজস্বিনী বা বাঘিনীও ছিলেন। তা না হলে, বলা হচ্ছে অসাধারণ বুদ্ধিমতী। অসাধারণ বুদ্ধিমতীর কেন মতিভ্রম হয়ে এত বড় বিরাট-বিপুল জমিদারী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে চলে যায় হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের সময়কালের মধ্যে। বিশ্বকোষে আরও লেখা রয়েছে, ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্ব্যবহার। এখানেই সন্দেহের গূঢ় কারণটা আমাদের সব থেকে বেশী করে হয়েছে। হেস্টিংসের সহিত কি কারণে, তার মনোমালিন্য বাধল কি নিয়ে? এবং আরও লেখা আছে নিজ প্রভুত্বের খর্বতা। এই যে প্রভুত্ব ও তার খর্বতা? তার গতিবিধি, চলাফেরা এক কথায় স্বাধীনতার খর্বতা কেন করা হয়েছিল? চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোর রাজ্যের অত্যধিক রাজস্ব ধার্য হয়। অবশ্য রামকৃষ্ণের সময়। কিন্তু তখন অবধি রানী বেঁচে

---

[১] "বিশ্বকোষ" ষোড়শ ভাগ। "রাজশাহী" পৃষ্ঠা ৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৪৪২।

ছিলেন এবং তাঁর হস্তেই মূল কর্তৃত্ব ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করি। ইহা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই যে অত্যধিক রাজস্ব ধার্য হয় বলা হচ্ছে—এতে বেশ বোঝা যায় যে, ঐ সময় নাটোর রাজ্যের যে হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে, সম্ভবত ঐ সময়গুলিতে অন্য কোন জমিদারদের এভাবে অত্যধিক হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করা হয় নাই। তবে ইংরাজদের, রানী ও তৎবংশীয়দের উপর খড়গহস্ত হয়ে এই অন্যায়ভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করবার কারণ কি? রানীর অধীনস্থ এই যে, তালুকদারদের সরাসরি ইংরাজ কোম্পানীকে খাজনা দিবার জন্য বলা হচ্ছে; রানীকে খাজনা না দিয়ে—এর কারণ কি? কেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই হীন দুর্ব্যবহার রানীর উপরে করতে যাচ্ছেন? কেন, কি সে কারণ? এমনি ধরনের অনেক কথাই এসে সন্দেহের কারণগুলিকে আরও জোরালো ও মজবুত করে তুলছে না কি? ঐ সময়গুলির মধ্যে বিশেষ করে হেস্টিংসের সময়ে, বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন যে অত্যাচার চলছে, সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নারী জাতির উপরে তাহা দেখে শুনে এই মহিয়সী মহিলাটি কি নিরব হয়ে থাকতে পেরেছিলেন? না—ছিলেন? আমাদের কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎ অন্ন-পূর্ণার মত যাঁর দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, মানুষের প্রতি, তাঁর সম্মান ও ঐশ্বর্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। আত্মমর্যাদা ও আত্ম-সম্মান গুণে যিনি ছিলেন অনন্যা। তিনি কি মহা অত্যাচারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে এত কিছু দেখে শুনে নতি স্বীকার করেছিলেন? নিজের দুঃখ বলে যাঁর কোন দুঃখ ছিল না; পরের দুঃখে যিনি সব সময় দুঃখী ও কাতরা ছিলেন, সেই রানী ভবানীর সহিত হেস্টিংস কিসের কারণে এরূপ অন্যায়ভাবে দুর্ব্যবহার করল? রঙ্গপুরে এ সব অঞ্চলে রানী ভবানী সম্পর্কে একটি কথা এখনও লোকে বলে থাকে। তা হল—নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে মসনদচ্যুত করার ষড়যন্ত্রের সময় রানী বলেছিলেন, "বাবা খাল কেটে কুমীর আন না।"

এই কুমীর হল ইংরেজদের সম্পর্কে রানীর হুঁশিয়ারী। এসব অঞ্চলের অনেক লোক এখনও আরও বলে থাকেন, রানী ভবানী কখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি।

'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে যা আছে, তার মানে এই হয় ফকীর নেতা মজনু শাহ রানী ভবানীকে' একখানি

পত্র লিখেছেন, কতকগুলি অভিযোগ করে। অবশ্য পত্রের সামান্য অংশ তাতে উদ্ধৃত রয়েছে। সে কথা থাক, কিন্তু রানী ভবানী তার ঐ পত্র সম্পর্কে কি উত্তর দিয়েছেন সে কথা অবশ্য উক্ত গ্রন্থে লেখা নেই। ইহা ব্যতীত বাংলার বাঘিনী, স্বাধীনতা পুনরানয়ন ব্রতে আপোসহীনা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রানী ভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ রায়কে সম্রাট শাহ আলম 'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধি দান করেছিলেন। এ সব থেকেও বোঝা যায় যে, দেশের সম্রাট এবং বাংলার সুবাদার প্রভৃতি মহামান্য নেতাদের সহিত রানীর সম্পর্ক ছিল এবং সে সম্পর্ক যে খুবই নিবিড় এতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবস্থামতে কর্নওয়ালিসের সময় দশসালা বন্দোবস্তে নাটোর রাজ্যের অধীনস্থ তালুকদারগণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে আদিষ্ট হলেন।

এখানেও বোঝা যাচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রানীর অধীনস্থ তালুকদারদের নিকট হতে কর নেবার ব্যবস্থা করেন।

এখন কথা-হল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধানগণ হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস—এদের রানীর ও তাঁর বংশীয়দের প্রতি এই বৈরী ভাবটা কেন; কিসের জন্য-এর সহজ সোজা উত্তর এই দেওয়া যায় যে, ইংরাজদের কর দিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর সাধ্যমত তিনি এর বিরোধিতা করে এসেছেন। দূরদর্শিনী রানী ভবানী জানতেন, এই বিদেশী খাজনা আদায়কারীরা; সুযোগ পেলে একদিন এই দেশের সর্বেসর্বা হয়ে বসবে। এতে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। রানীর সেই দূরদৃষ্টি হয়ত সত্য-হয়েছে। সে কথা থাক, ১৭৮৩ সালে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ আহত ও মারা যাওয়ার পর, শোনা যায়, তৎপুত্র কামালউদ্দীন মুহাম্মদ লর্ড কর্নওয়ালিসের সহিত একটি আপোস করেন। অবশ্য সে আপোস নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করবার জন্য হলেও আপোস তো বটেই। কিন্তু এই বীরাঙ্গনা কোন সময়ে ইংরাজদের সহিত আপোস বা নতি স্বীকার করেন নাই বলে আমাদের বিশ্বাস। এর দুটি কারণ আমাদের এই সাক্ষ্য দেয়। একটি হল অল্প কয়েক বৎসরে দেড় কোটি টাকা আদায়ের জমিদারী-নিলামে উচ্ছন্ন বা ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি হল—বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকে যেমন—ইংরাজরা বৃত্তি দিয়ে বাদশাহর ঘরে নজরবন্দী করে রেখেছিল,

যাহা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়, দূরদর্শিনী রানী মাতা ভবানীর ভাগ্যে হয়ত বা ইংরাজদের ঐরূপ কঠোর বিধান বিধি-নিষেধ নেমে এসেছিল।

স্বাভাবিকভাবে এটা বোঝা যায় যে, লক্ষ লক্ষ এমন কি, কোটি কোটি মুদ্রা যিনি অকাতরে ব্যয় করেছেন মানুষের হিতার্থে তিনি কিনা তাঁর যম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভিক্ষা প্রার্থিনী হন, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানে যিনি হিমালয়ের মত অটল ছিলেন, যাঁর চোখের সম্মুখে মনে হয় বাংলা তথা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদারী চলে যাওয়া দেখেও যিনি কখনও কোম্পানীর নিকট নিজের হীনতা স্বীকার করেন নি। এই তো আমরা ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি। আর তিনি ইংরাজদের নিকট বৃত্তি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করবেন, এ কেমন কথা; এও কি বিশ্বাস করতে হবে? আমরা কিন্তু এ সব দেখেশুনে মনে করি যে রানী সম্পর্কে আসল কথা এড়িয়ে গিয়ে ইংরাজরা প্রচারের দিকটাই হয়ত বেশী করেছে। আর সেই 'ভিক্ষা' রানী মাতা চাচ্ছেন নিজের সর্বনাশকারী ইংরাজ শত্রুদের কাছে যাঁরা তাঁর সমস্ত জমিদারী নানা কায়দায় ও উসিলায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে শেষ করে দিল; এও কি বিশ্বাস করতে হবে? আমরা কিন্তু তাহা পারছি না।

"তিনি নিজের জন্য এবং তাঁহার সহচরী বিধবামণ্ডলীর জন্য গভর্নমেন্টের নিকট বৃত্তি প্রার্থিনী হন"—এ কেমন কথা!

যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা রানীর সর্বস্ব শেষ করে দিল সেই ইংরাজদের কাছে রানী কি করে বলতে পারেন যে, "হুযুর আমাকে এবং আমার সহচরী বিধবাদের ভিক্ষা বৃত্তি দিয়ে কৃতার্থ করুন।" এও কি বিশ্বাস করতে হবে?

পাখীর পাখা উপড়িয়ে দিলে যে রকমভাবে উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, স্বাধীনতা পুনঃ আনয়নে উল্লেখ্য বীরঙ্গনা রানী ভবানীর সমস্ত জমিদারী উচ্ছেদ করেও তাঁকে নিঃস্ব করে, ডানা কাটা পাখীর মত অবস্থা করে ফেলে রাখা হয় নাই কি?

অবশ্য বিশ্বকোষের লেখক মহোদয়ের উপর আমাদের কোন অভিযোগ নাই; করছিও না। হয়ত বা তাঁরা ইংরাজদের প্রচারণামূলক অথবা ইংরাজ তোষামুদে লোকদের নিকট হতে শুনে কিম্বা কোন সূত্রের উপর নির্ভর করে লিখেছেন, তাহা আমরা জানি না।

বিশ্বকোষ অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে, যদি এসব কথা যত সংক্ষেপেই হোক না লিখে যেতেন, তবে আরও অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে আমাদের থাকতে হত। আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলির সম্পর্কে বীরাঙ্গনা রানী ভবানীর বংশীয়দের নিকট হতে এবং এ সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিফহাল আছেন, এতদসম্পর্কে তাঁদের মুখে কিছুটা আলোকপাত হলে দেশবাসী উপকৃত হত বলে আমরা মনে করি।

রতিরামের কবিতায় শিবচন্দ্র ও দেবী চৌধুরানী

রংপুরের বিখ্যাত লোক-কবি রতিরামের জাগগান থেকে এখানে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেওয়া হ'ল। এই কবিতায় রতিরাম ইটাকুমারী নিবাসী প্রজা বিদ্রোহের নেতা-শিবচন্দ্র রায় এবং পীরগাছার দেবী চৌধুরানীর বীরত্বগাথা যেমন গেয়েছেন তেমনি দেবীসিংহের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, টীকা-সমেত এই গানটি সংগ্রহ ও আলোচনা করেছেন পণ্ডিত যাদ-বেশ্বর তর্করত্ন। গানের পরিশেষে টীকাও সংযুক্ত-হ'ল ঃ

রঙ্গপুরে ফতেপুর প্রকাণ্ড চাকেলা [১]।
রাজা রায় রাজা তায় আছিল একেলা।।
ধর্মে মতি রাজা রায় কত কৈল দান।
ব্রহ্মোত্তর ভূমি কত ব্রাহ্মণেতে পান।।
ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর আর বৈদ্যোত্তর আদি।
কত দান করিয়াছে নাহি যে অবধি।।
মইনা বামন ভাঙ্গা প্রভৃতি পরগনা।
ফতেপুরের অন্তর্গত সব যায় গনা।।
অনুগত ব্রাহ্মণ জানিয়া কৈল দান।
ফতেপুরের এত বড় এই জন্য মান।।
কোম্পানীর আমলতে রাজা দেবীসিংহ।
সে সময়ে মুল্লকেতে কৈল বার ঢিং[২]।।
যেমন যে দেবতার মুরার্ত গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন।।

---

[১] চাকেলা = কয়েকটি পরগনার সমষ্টিকে চাকেলা বলে।
[২] বার ঢিং = হররাম প্রভৃতি সহচর।

রাজার পাপেতে হৈলো মুল্লুকে আকাল।[১]
শিয়রে রাখিয়া টাকা গুহী[২] মারা গেল[৩] ॥
কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই[৪] ।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার॥
সোয়ারিত[৫] চরিয়া যান পাইকে মারে জোতা[৬] ।
দেবী সিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা[৭] ॥
পারে না ঘাটায় চলতে ঝিউরী বউরী।
দেবী সিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি॥
পূর্ণ বালি অবতার দেবী সিংহ রাজা।
দেবী সিং-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা॥
রাজা রায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বুলি সর্ব্ব লোকে গায়॥
ইটাকুমারীতে তার আছে রাজা বাটি।
দেখিতে প্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটি॥
কত ঘর কত দুয়ার কত যে আঙ্গিনা।
তার সনে কোন বাড়ীর তুলনা লাগে না॥
বড়ঘর চণ্ডী মণ্ডপ টুঁই[৮] অতি উচা।
দুই চালে ঘরখানি কোণাগুলো নীচা॥
পশ্চিম দুয়ারী মণ্ডপ আর কোন নাই।
এ ঘর হতে যে ঘর যাইবে সেটাও দেখবার পাই॥

---

১. আকাল = দুর্ভিক্ষ।
২. গুহী = গৃহস্থ।
৩. গেল = উঃ গ্যাল।
৪. নেকা = ন্যাকা লেখা।
৫. সোয়ারিত = সোয়ারিতে পাল্কিতে।
৬. জোতা = জুতা।
৭. ভোতা = অকর্মণ্য।
৮. টুঁই = চালের অগ্রভাগ।

কত পাইক পেয়াদা আছে কত দারোয়ান।
কত যে আমলা আছে কত দেওয়ান।
মন্হনার কর্ত্রী জয় দুর্গা চৌধুরানী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজা সকলে বাখানি ॥
শিবচন্দ্রের কাজকর্ম তার বুদ্ধি নিয়া।
তার বুদ্ধির পতিষ্ঠ[1] করে সঙ্কল[2] দুনিয়া[3] ॥
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারি ধরি লুট করে বদমাইস পাকা ॥
শিবচন্দ্রের হৃদে এই সব দুঃক বাজে।
জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে ॥
দেবীসিংহের দরবারে শিবচন্দ্র গেল।
প্রজার দুঃকের কথা কইতে লাগিল ॥
রাজপুত কালাভূত দেবী সিং হয়।
চেহারায় মৈষাসুর হইল পরাজয় ॥
শুনি চক্ষু কট-মট লাল হৈল রাগে।
‘কৌন হ্যয় কৌন হ্যয়’ বলি দেবী হাঁকে ॥
শিবচন্দ্রক কয়েদ করে দিয়া পায়ে বেড়ি।
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদ খালাত পড়ি ॥
দেওয়ান শুনিয়া পরে অনেক টাকা দিয়া।
ইটাকুমারীতে আনে শিবে উদ্ধারিয়া ॥
বৈদ্য বংশ জন্ম শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবী সিংহের অত্যাচার আর নাহি সয় ॥
রংপুরে আছিল শতেক জমিদার।
সবাকে নিখিল পত্র যেটঠে[4] আসিবার।
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সকল প্রজাক ডাকে রোকা[5] দিয়া তার।

---

[1] পতিষ্ঠ = প্রতিষ্ঠা।
[2] সঙ্কল = সকল।
[3] দুনিয়া = পৃথিবী।
[4] যেটঠে = যেইখানে।
[5] রোকা = ক্ষুদ্র চিঠি, অনাবৃত পত্র।

হাতি-ঘোড়া বরকন্দাজ ইটাকুমারী রে।
সব জমিদার আইসে শিবচন্দ্রের ঘরে ।।
পীরগাছার কর্ত্রী আইল জয় দুর্গা দেবী।
জগ মোহনতে[১] বৈসে একে একে সবি ।।
রাইয়ত প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাতজুড়ি চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া ।।
পেটে নাই অন্ন তাদের, পৈরনে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড়খানি করি উপবাস ।।
শিবচন্দ্র খাড়া হইয়া কয় হাতে জোড়ে।
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে ।।
প্রজাদেক দেখাইয়া জমিদারগণে।
এদের দুষ্ক না ভাবিয়া অন্ন ঋণ কেনে ।।
উত্তর হাতে ভাল ভাসিয়া বড় লাগে বান।
সেই বানে খায়া ফেলায় কত কিছু ধান ।।
কত দিনে কত কষ্টে কত টাকা দিয়া।
ক্যারোয়ার মুখ[২] আমি দিয়াছি বান্ধিয়া ।।
রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল।
বছরে বছরে এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খ্যাড়[৩] কারো ঘরে নাই চাল ।।[৪]
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া[৫]
বেটা ছাড়ে বেটী ছাড়ে নাই কারো মায়া[৬]
দুষ্ট রাজা দেবী সিংহে বুঝাইতে গেলাম
আমার পায়ে বেড়ি দিল দেওয়ানের গোলাম ।।[৭]

---

১. জগমোহন = নাটমন্দির।
২. ক্যারোয়া মুখ = নদী বিশেষের মোহনা।
৩. খ্যাড় = খড়।
৪. চাল = চাউল।
৫. মাইয়া = পত্নী।
৬. মায়া = মমতা।
৭. দেওয়ানের গোলাম = দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের গোলাম হইয়াই বোধ হয় কবির বলিবার অভিসন্ধি।

প্রজার অবস্থা দেখি যাক জরিতে হয়।
কর জমিদারগণ তোমরা মহাশয়॥
কারো মুখে নাই কথা হেটমুণ্ডে[১] রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয়॥
যেমন হারামজাদা রাজপুত ডাকাইত।
খেদাও[২] সব্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত।
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই।
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারো তলোয়ারে॥
করিতে হৈবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজা গুলা করিবে সব হইব না নীচু॥
রাগি কয় শিবচন্দ্র থর থর কাঁপে।
ফ্যানা[৩] ধরি উঠে যেমন রাগি গোমা সাপে[৪]।
শিবচন্দ্র নন্দী কয় শুন প্রজাগণ।
রাজার তোমরা অন্ন তোমরাই ধন॥
রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার।
দেবী সিংহের বাড়ী লুট বাড়ী ভাঙ্গ তার॥
পরিষদ বর্গসহ তারে ধরি আন।
আপন হস্তেতে তার কাটিয়া দিমো কান॥
শিবচন্দ্রের হুকুমতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষাপে॥
লাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাচি দাও।
আপত্য বারিতে আর না থাকিল কাঁও॥
ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিল হালের জোয়াল।
জাঙ্গালা বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল॥
চারি ভিতি হাতে আইল রংপুরে প্রজা।
ভদ্র গুলা আইল কেবল দেখিবার মজা॥

---

১. হেটমুণ্ডে = অধো মুখে।
২. খেদাও = তাড়াও।
৩. ফ্যানা = ফণা।
৪. গোমা সাপে = গক্ষুর সর্পে।

ইটা দিয়া পাইটকা দিয়া পাটকেলার খুব।
চারি ভিতি হাতে পড়ে করিয়া ঝুপ ঝুপ ॥
ইটার ঢেলের-চোটে ভাঙ্গিল কায়ো হাড়।
দেবী সিংহের বাড়ী হৈল ইটার পাহাড় ॥
খিড়ি কির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিংহ।
সাথে সাথে পালাইয়া গেল সেই বার চিং ॥
দেবী সিংহ পালাইল দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা ॥ *
ইংরাজের হাতে রাজা দিলেন চক্রপানি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানী ॥
ইংরাজ বিচার করে এজলাস করি।
একে একে ঘাট কেতে রাখে চিং এ ধরি।*
সেই শিবচন্দ্র রাজা ইটাকুমারীর।
সেই গ্রামে বাস করি জানিবেন থির ॥
কুড়া আছে বশে দুই নদী আলাই কুড়ী।
কালী আছেন জাগ্রত আরো আছেন বুড়ী ॥
ঠাকুর পাড়া বামন পাড়া আছে বৈদ্য পাড়া।
পাড়ায় পাড়ায় গ্রাম খানি সব জোড়া ॥
কায়েত পাড়া পাড়া, কর্ণি পাড়া আছে।
কামার পাড়া, ছুতার পাড়া কুমার পাড়াও আছে ॥
মালী-পাড়া, নাউয়া পাড়া, রাচির পাড়াও কাছে।
তাঁতী পাড়া গিরস্ত পাড়া আছে গ্রামের পাছে ॥
গ্রামের দক্ষিণে আছে জোলা পাড়া বড়।
দুসুতি তৈয়ার করতে তামরা বড় দড় ॥
গুড় কিনতে চাও যদি গুড়াতি পাড়া যাও ॥
কড়ি দিয়ে যত কিন মিলবে আরও ফাও ॥
তেলী পাড়া আছে আরো মিয়া পাড়া আছে।
কত পাড়ার কথা কমো গান বাড়ে পাছে ॥
বৈদ্য পাড়ার আছে কৌত্তির পাড়া।
এক পাড়ায় কথা কৈলে সব পাড়ায় সারা ॥

উত্তর দক্ষিণে লম্বা বাবুর পাড়া খানি।
সক্কল পণ্ডিত তার সক্কলি বিদ্যামণি॥
দেখিতে সুন্দর তারা আগুনের মত রং।
দেবতার মত মূর্তি তাদের মুণির মত ঢং॥
ভোরে স্নান সন্ধ্যা তর্পণ স্তর পূজাজপ।
সমস্ত দিন পড়া শুনা সমস্ত দিনতপ॥
সক্কলের আছে চৌপারী পড়ুয়া কত পড়ে।
পড়ুয়া চলিলে যেন গ্রাম খানি নড়ে॥
শ্রী পঞ্চমী পূজার সমে পড়ুয়ারা মেলে।
হর হর ধ্বনি করে গ্রাম যেন টলে॥
নবদ্বীপে সরস্বতী আগে এক প্রহর।
বসতি করেন ইহা জানে সর্ব্বস্তর॥
ইটাকুমারীতে থাকে আসি পহর বেলা।
মাইয়া লোকের সঙ্গে হয় সরস্বতীর খেলা॥ *
সেই ঠাকুর বংশের পদে করিয়া প্রণাম।
মদন কামের জাগ গায় দাস রতিরাম॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবী চৌধুরানী

রঙ্গপুরের স্থায়ী বাসিন্দা জনাব আবদুল গফুর সাহেব ‘দেবী চৌধুরানী কে’ এই শিরোনাম দিয়ে রংপুরের উন্নয়ন পত্রিকায় কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে বৈজ্ঞানিক যুক্তি, তথ্য ও নানা তত্ত্বের সাহায্যে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে আমাদের সকলকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইংরাজদের কথিত ‘দেবী চৌধুরানী’ কে ছিলেন। তার মত আরও অনেক অনুসন্ধিৎসু গবেষকের আমাদের দেশে প্রয়োজন রয়েছে। ইতিহাসের গবেষক আবদুল গফুর সাহেব, আমাদের একটি বিরাট ধাঁ ধাঁ হতে উদ্ধার করেছেন। ইংরাজ লেখকদের ধাঁ ধাঁয় ফেলা দেবী-চৌধুরানীকে উদ্ধার করে জনসমক্ষে পুনরায় নিয়ে আসা কম গৌরব ও কৃতিত্বের কথা নহে। এ জন্য গোটা দেশবাসী যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং ইতিহাসের গবেষক আবদুল গফুর সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকব বলে আমরা বিশ্বাস করি। আবদুল গফুর সাহেব ১৭৮৩ সালের প্রজা বিদ্রোহের নেত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী দত্ত দুই খানি দুষ্প্রাপ্য পাট্টা সংগ্রহ করে অবিসম্বাদিতভাবে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী কে প্রমাণ করেছেন। আমরা এখানে আবদুল গফুর সাহেবের প্রবন্ধের কিছুটা উদ্ধৃত করে দিব এবং পরে কিছুটা আলোচনাও করব।

> রংপুরের অতীত ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে, দেবী-চৌধুরানী কে ?—এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া চলে না। ১৭৬৫ খৃস্টঃ ইংরেজ কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করার পর, রংপুরের সত্যিকার ইতিহাস জানতে হলে, দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠক এবং মজনু শাহ্ বা নুবাব নুরউদ্দীন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা আবশ্যক। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা শুধু দেবী চৌধুরানী সম্বন্ধেই আলোচনা করব। ...
>
> হান্টার সাহেব কর্তৃক সংকলিত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত, বাংলার **Statistical Account**-এর মধ্যে রংপুর জেলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে কালেকটর গ্লেজিয়ার সাহেব বলেছেন ঃ

We catch or glipmse from the lieutenant's (Brenan) report of a female dakoit, by name Devi Chowdhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of Barkandazes in her hay and committed dakoity on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak. Her title of Chowdhurani would imply that she was Zamindar probably a petty one, also she need not have lived in boats for fear of capture.

লেফটেন্যাণ্টের (ব্রেনান) রিপোর্ট থেকে আমরা পাঠকের সহিত সংশ্লিষ্ট দেবী চৌধুরানী নামে এক মেয়ে ডাকাতের আভাষ পাই, তিনি নৌকায় বাস করতেন। এবং তাঁর মাইনে করা বরকন্দাজের একটি বিরাট দল ছিল; এবং পাঠকের লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ ছাড়াও তিনি (দেবী) নিজেও ডাকাতি করতেন। তার 'চৌধুরানী' উপাধি থেকে বুঝা যায় তিনি একজন জমিদার ছিলেন—সম্ভবত একজন ছেট জমিদার, তা না হ'লে তিনি ধরা পড়ার ভয়ে নৌকায় বাস করতেন না।'

উল্লেখিত রিপোর্টের মধ্যে We catch a glimpse অর্থাৎ "আমরা আভাষ পাই" কথা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় লেফটেন্যাণ্ট সাহেব তার রিপোর্টে দেবী চৌধুরানী নামক মেয়ে ডাকাত সম্বন্ধে খুব জোরালো সমর্থন দেন নাই, এবং গ্লেজিয়ার সাহেবও হয়ত সেই কারণে তাঁর রিপোর্টে নিজের কোন মতামত না দিয়ে এর সত্যাসত্য প্রমাণের দায়িত্ব লেফ্টেন্যাণ্ট সাহেবের উপর ন্যস্ত রেখে শুধু মাত্র তাঁর রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেছেন।

কারণ, বঙ্কিমবাবু ইংরেজদের অধীন দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল থাকাকালীন এ সম্বন্ধে বহু পুরাতন দলীলপত্র দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন—যা হয়ত অন্য লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং আর হয়ত বা তৎকালীন খুঁটিনাটি ঘটনা জেনে নেওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন যথেষ্ট। এই সব কারণে মনে হয় বঙ্কিমবাবু হয়ত বা তৎকালীন বহু তত্ত্ব জানা সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে পারেন নাই। তাঁর ইংরেজ প্রভু কর্তৃক আরোপিত কোন গোপন বিধি-নিষেধ ছিল বলে এবং সেই কারণে হয়ত তিনি বলেছেন—পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক 'আনন্দমঠ'-কে বা দেবী চৌধুরানীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করলে বড় বাধিত হইব।

এখন এই জমিদার দেবী চৌধুরানীকে জানতে হ'লে আগে জানা প্রয়োজন সেই সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সাথে মেয়ে জমিদার ছিলেন কি না। ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে অর্থাৎ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করার পর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়া পর্যন্ত; ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সন্ন্যাসী ও প্রজা বিদ্রোহ এবং মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ইত্যাদি বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনা। ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলির কোন একটির সাথে জড়িত ছিলেন বলেই দেবী চৌধুরানীর নাম ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

ইটাকুমারীর কবি রতিরাম দাসের জাগগান থেকে পাওয়া যায়, মন্থনার তৎকালীন জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। 'দেবী চৌধুরানী' যে তার আসল নাম নয়—উপাধি, সে কথা না বললেও চলে। উক্ত জাগগানে আছে জয়দুর্গার কথামত দেবীসিংহের কাছে ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্র প্রজার দুঃখের কথা জানতে চায়।

"ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী ও মজনু শাহ্ বা নবাব নুরউদ্দীন প্রভৃতি দস্যু দলপতি যে বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের নেতৃত্ব করেছিলেন এবং সেই কারণেই যে তাঁদের দস্যুদলপতি বলা হত, এখন তা' আর প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

উল্লিখিত দলপতিগণ শুধু প্রজা বিদ্রোহের সাথে জড়িত ছিলেন না— "সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মধ্যেও তাঁদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট।" 'বিশ্বকোষ'-এ উল্লেখ আছে "ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও দেবী রঙ্গপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন তাহা ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা ইতিহাসে ১৭৭৩ খৃঃ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাত, পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনু শাহ্।"

"ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এটা একটি সুসংবদ্ধ প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ বা বিপ্লব যা' দমন করতে ইংরেজকে কয়েক বৎসর ধরে বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার ক'রে বিব্রত থাকতে হয়েছিল।

এই বিদ্রোহীদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বলেই যে দেবী চৌধুরানীর নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ সে কথা এখন বিনা দ্বিধায় বলা চলে এবং পীরগাছার কর্ত্রী বা মন্থনার জমিদার জয়দুর্গা দেবীই যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেবী চৌধুরানী সে কথা এখন আর প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যারা

বঙ্কিম বাবুর 'প্রফুল্ল' কে এতদিন ধরে মনে প্রাণে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানী রূপে বিশ্বাস করে এসেছেন, তাঁদের পক্ষে জয়দুর্গা দেবীকে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানীর আসন ছেড়ে দেওয়া সহজ নয় ভেবেই এ সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

বঙ্কিম বাবুর 'ভবানী পাঠক' বলেন—"কাছারীর কর্মচারীরা বাকীদারের ঘরবাড়ী লুট করে লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়। না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণে বধ করে, সিংহাসন হতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে, যুবতীকে কাচারীতে লইয়া গিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়। পাঠক আরও বলেন—"এই দুরন্তদিগকে আমিই দণ্ড দেই অনাথ দুর্বলকে রক্ষা করি।

'দেবী চৌধুরানী' গ্রন্থের এক জায়গায় বলা হয়েছে—"রঙ্গরাজ সংবাদ দিলেন—সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রশুনপুর লুঠিয়াছিল। ভবানী পাঠক বলিলেন—চল আমরা ইজারদারের কাছারী লুঠিয়া গ্রামের লোকের ধন গ্রামে দিয়া আসি।"

উল্লেখিত কথাগুলি থেকে বেশ বোঝা যায়—ঐতিহাসিক ভবানী পাঠকের সাথে বঙ্কিম বাবুর ভবানী পাঠক -এর সম্বন্ধ আছে। ঐতিহাসিক প্রজা বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠককেই এখানে পাওয়া যায়। এই ভবানী পাঠকের সাথেই ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানীর সম্বন্ধ। বঙ্কিম বাবু বলেছেন,—"দেবী চৌধুরানী" গ্রন্থের একটু ঐতিহাসিক মূল আছে। "সে মূল দেবীসিংহের অত্যাচার জনিত প্রজাবিদ্রোহের সাথে জড়িত। জয়দুর্গা দেবীই যে দেবী চৌধুরানী, সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

জয়দুর্গা দেবী যে প্রজা বিদ্রোহের সময় মন্থনার জমিদার ছিলেন, তার প্রমাণ উল্লেখিত রতিরাম দাসের জাগগান থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় জমিদার ছিলেন কিনা, জাগগানে তার

উল্লেখ নাই। কাজেই, এ প্রশ্নের মীমাংসা জয়দুর্গা দেবী কর্তৃক প্রদত্ত পাট্টার সন তারিখ থেকেই করতে হবে। তাই দেবী কর্তৃক প্রদত্ত দুইখানা পাট্টার বা সনদের নকল নিচে দেওয়া হ'ল।

৪৬৪৫ নং সনদ।

"শ্রী সেখ মোহাম্মদ হুসেন কস্য সুচরিতেষু পীরপাল পত্র মিদং সন ১১৭৬ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যাঞ্চাগে তালুক কবিরবন পরগণে নওহাটি চাকলে ফতেপুর সরকার কোচবিহার মহলে খাসিয়া ও লরিকা তালুক মজকুরে গীঃ মেরু সাহা খামার সরোজ চাকল জমিন ১৩।॰ দোশ রসানে শ্রী শ্রী॰ পীরপাল দিলাম জমিন মজকুর সাহামন করিয়া প্রজা আদি বসায়া পঞ্চ অমলা রোপন করিয়া বাড়ী বাসায়া তাহাতে সে উপরস্ত হয় তাহা দিয়া তালুক হাড়িহার দরগায় খাদিমী ও ফতেয়া দরুদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ ইহার রাজস্ব সহিত তোমার কোন এলাকা নাহী এতদর্থে পীর পাল পত্র দিলাম।

ইতি—৫ মাঘ

স্বয়ং—শ্রী জয়দুর্গা দেব্যা

ইরাদী কান্দর্ শ্রী কালু রায়ন্ত সুচরিতেষু। মশুকেলী চুকানী পাট্টা পত্র মিদং সন ১১৯৭ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যাঁচে আগে তাং চণ্ডিপুর পরগণে মন্হনা চাকলে ফতেপুর সরকার তালুক মজকুরের শ্রীমনী রায়তের হস্য ভিটা তোমাকে মুশাকলী চুকালী পাট্টা দিলাম। জমি ।৶০ কালী সদর ১॥০ দেড় টাকা মবলগ ॥০ আধ টাকা এমতে ২৲ টাকা দিয়া পরম সুখে ভোগ করিয়া ইহার পর ইহাতে বাবু হবুরাম সবিবিদ্ধ ও মাথন ও সেলামী ও আসমানি গয়রহ সহিত কোন এলাকায় নাহী এতদর্থে মুশাকলী চুকানী পাট্টা দিলাম। ইতি—২৫ কার্ত্তিক

স্বাঃ শ্রী জয়দুর্গা দেব্যা

উল্লেখিত সনদ বা পাট্টার মধ্যে দেখা যায় জয়দুর্গা দেবী ১১৭৬ অর্থাৎ ১৭৭০ সাল থেকে ১১৯৭ অর্থাৎ ১৭৯১ সালতক নিঃসন্দেহে জমিদার ছিলেন। এর আগে কিম্বা পরেও হয়ত তিনি কয়েক বৎসর জমিদারী করিয়াছিলেন কিন্তু তার নির্ভরযোগ্য কোন দলীল আমাদের হাতে নেই।...

..."জেলার ত্রাণকর্ত্তা কালেক্টর গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব দেবীসিংহের

গুণমুগ্ধ, হেস্টিংস সাহেব তার চরম পৃষ্ঠপোষক। তাই দেবীসিংহের অত্যাচার অব্যাহত গতিতে চলতে লাগলো। বিরামহীন এই অত্যাচারের সাথে ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে আবার দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। শোকে, দুঃখে এবং যন্ত্রণায় কাতর মানুষ খুঁজতে লাগল মুক্তির পথ, তাই মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে দেরী হ'ল না, প্রজারা হ'ল বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন নবাব নূরউদ্দীন, ভবানী পাঠক ও জয়দুর্গা দেবী। উৎপীড়িত জনগণের মুক্তি আন্দোলনের নেতারা একে একে কেউ হলেন নিহত, কেউবা নির্বাসিত। সুচতুর ইংরেজ বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেককে কৌশলে অর্থ ও প্রলোভন দিয়ে হাত করে নিল এবং নিজেদের নীতিরও করল অনেকটা পরিবর্ত্তন। ফলে বিদ্রোহ থেমে গেল। নবাব নূরউদ্দীন ও ভবানী পাঠককে হারিয়ে দেবীও হলেন শান্ত। পূর্বে উল্লেখিত ইটাকুমারীর সভায় দেবী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। জনগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি ব্যতিরেকে এই প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর নয়। জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি পেতে হলে প্রয়োজন জনদরদী মন ও নিঃস্বার্থ সেবা। জয়দুর্গা দেবীর মধ্যে এ সব গুণ ছিল বলেই জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তারে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। ইটাকুমারীর সভায় দেবীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থেকে প্রমাণিত হয়—সহকর্মীগণ কর্ত্তৃক আয়োজিত জনসভায় তিনি তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার মাধ্যমে ইংরেজ শাসন ও তাদের অত্যাচারী অনুচরদের মধ্যে জনমন বিক্ষুব্ধ করে তুলতেন। এইভাবে হাজার হাজার অত্যাচারিত মানুষকেই বিপ্লবী ভাবাপন্ন করে তৎকালীন ইংরেজ কর্মচারী ও তাদের অনুচরদের বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে তার যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবীর পরিচয় লাভে ইংরেজ এবং তাদের নিয়োজিত অনুচরদের এই ব্যর্থতা দেবীর উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিপুল সমর্থনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দেবী-চৌধুরানীর কিম্বা তাঁর কাজকর্মের উপর মানুষের ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকলে, যা ডাকাতদের উপর থাকা স্বাভাবিক, ইংরেজ সে সুযোগ নিয়ে অনায়াসে তাঁকে ধরে ফেলতে পারতো এবং দেবীর সত্যিকার পরিচয়ও তাদের অজানা থাকতো না। বঙ্কিম বাবু

তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' গ্রন্থে বলেছেন, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ। লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা, সেই জন্য কেহ কখন তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজের নিকট বলিত না অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারীর সহায়তা করিত না।

উক্ত গ্রন্থের ভবানী পাঠক বলেন,—তুমি মার মত পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মত রূপবতী, তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত ?
দেবী চৌধুরানী যে ডাকাত ছিলেন না উল্লেখিত কথাগুলির মধ্যে তার স্পষ্ট আভাষ দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের মনের উপর দেবী চৌধুরানীর প্রভাব বিস্তার হয়েছিল। জনসেবার মাধ্যমে ভয়, ভীতি বা অত্যাচারের সহায়তায় নয়। তাই হয়ত বঙ্কিম বাবু প্রফুল্লকে দিয়ে বলিয়েছিলেন "আমরা পরহিত ব্রত নিয়েছি, যার দুঃখ যে দেখিবে তারই দুঃখ মোচন করিব।"

সুতরাং মন্হনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী যে ঐতিহাসিক দেবী চৌধুরানী সে সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন করে না।[১]

জনাব আবদুল গফুর সাহেবের সুচিন্তিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মতে একথা এখন সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, (সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের লিখিত) দেবী চৌধুরানী যে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী ছিলেন, এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না বা থাকছে না। আবদুল গফুর সাহেবের লিখিত উপরের উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করলে সুধীবৃন্দ তাহা ভালভাবে বুঝতে পারবেন বলে আমরা আশা করি। ১৭৮৩ সালের প্রজাবিদ্রোহের নেত্রী পীরগাছার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী।[২]

---

[১] "উন্নয়ন" রংপুর জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম বর্ষ।—৬ষ্ঠ—৭ম—৮ম সংখ্যা।—জুন জুলাই—আগস্ট—১৯৬৬। পৃষ্ঠা [৬ষ্ঠ—জুন—১-২-৩-৫। ৭ম—জুলাই ১-ক-৩-৪। ৮ম—আগস্ট—৪-৫-৬]

[২] রাতিরাম দাশের জাগগানের মধ্যে জমিদার শিবচন্দ্র রায়ের এবং জমিদার জয়দুর্গা দেবীর নাম প্রভৃতি পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রজা বিদ্রোহের নেতা নূরউদ্দীন বা রাজা দেওয়ান দয়াশীলের নাম উল্লেখ নাই। নীচের নাম দুটি জাগগানের আলোচনায় মধ্যে যাদবেশ্বর তর্করত্ন উল্লেখ করেছেন এটা উল্লেখ করা যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং সঠিক হয়েছে তার কারণ হ'ল, নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর নির্মীয়মাণ রাজধানীতে যে সব প্রধান দলপতির

এখন ইংরাজদের লিখিত ও এ দেশীয়দের যৎসামান্য ইতিহাস পাঠে জানা যাচ্ছে যে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহের (১৭৭৩ সালে) ভবানী পাঠকের সঙ্গে আমরা দেবী চৌধুরানীকে পাচ্ছি। তৎসহ মজনু শাহকে দেখা যাচ্ছে। আবার ইংরাজদের লেখায় ফকির বিদ্রোহের নেতা হিসাবে মজনু শাহ, মুসা শাহকে পাওয়া যাচ্ছে। ইংরাজদের লিখিত ইতিহাসে এও ছিটেফোটা-ভাবে পাওয়া যায় যে, ফকির বিদ্রোহী দলের সহিত সময় সময় সন্ন্যাসী দলও একসঙ্গে ডাকাতি ও লুটতরাজ করত। তাই আমরা বলব এইজন্য যে, জনসাধারণ, ইংরাজ কথিত এই ডাকাত দলের সমর্থন এবং সাহায্য করত। তা না হলে ডাকাতদের গতিবিধি চলা-ফেরার খবর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকদিগকে জনসাধারণ দিত না কেন?

ইংরাজ লিখিত বিবরণে দেখা যাচ্ছে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানী, মজনু শাহ। আবার ১৭৮১ সালে নবাব নুরউদ্দীন, রাজা দয়াশীল, জমিদার শিবচন্দ্র রায় এবং জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীকে পাওয়া যাচ্ছে অনুসন্ধানের মাধ্যমে। সুতরাং জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর পূর্বোক্ত প্রমাণগুলি হতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ইংরাজদের এই আন্দোলনগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হলেও আসলে এ'রা একই আন্দোলনের, একই উদ্দেশ্যের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠাকামী জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ ছিলেন। এ'দের সকলের মিলিত একটিমাত্র রাজধানী তাহা ফুলচৌকিতে ছিল। ইংরাজরা নবাব নুরউদ্দীন বাকের জঙ্গকে মজনু শাহ বা মজনু শাহ বলত, যাতে করে মোগল শাহযাদার আসল নামটি বেরিয়ে না পড়ে।

আন্দোলনগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়ার কারণ এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, হিন্দু মুসলমান যাতে করে পৃথক হয়, পৃথক থাকে এবং পৃথক ভাবে চিন্তা করে পরস্পরকে বিদ্বেষভাব নিয়ে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে দেখে তাদের বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। যাতে করে দেশের সর্ব ধর্মের মানুষ এক হয়ে কখনও ইংরাজদের বিরুদ্ধে এই ধরনের গণ-অভ্যুত্থান আর কখনও না করে, না ঘটায়। অথচ ইংরাজ তখন হতে শেষ অবধি -ভীষণ গোঁড়া রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী ছিল। তবে সুখের

কুঠি নির্মিত হয়েছিল. তাদের মধ্যে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর কুঠি এবং শিবচন্দ্র রায়-এর কুঠিও ছিল। উক্ত কুঠিবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও যেমন পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ উক্ত স্থানগুলির নাম জনসাধারণ এখনও 'জয়দুর্গার কুঠি 'শিবপুর' প্রভৃতি বলে থাকেন। কাগজ-পত্রেও তা রয়েছে''

বিষয়,—রঙ্গপুর ও ইহার আশেপাশের জেলাগুলির অশিক্ষিত জনসাধারণ এখনও পূর্বের মত করে পরস্পর পরস্পরকে দেখে আসছে। আত্মীয়কে আত্মীয় যেমন করে দেখে ও মানে। অবশ্য হিংসা, বিভেদ ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ইংরাজদের সাম্রাজ্যবাদী ফরমুলায় শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় মুসলমান ও হিন্দু অনেক সময় এই সব জাতীয়তাবাদী অশিক্ষিত লোকদের, সাম্প্রদায়িকতায় ফেলার চেষ্টা করে আসছেন নানাভাবে এবং তাঁরা সফলকামও হয়েছেন। তবে এতে করে দেশের অগ্রগতি কতখানি হয়েছে তাই ভাববার বিষয়।

দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয়

১৬/১২/৫৮ সনে আমি (লেখক) দিলালপুর নামক গ্রামে যাই। উক্ত গ্রাম হল রঙ্গপুর জেলাধীন বদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। দিলালপুর গ্রামে বাদশাহ শাহ আলমের সরকার নির্মিত একটি মন্দির আছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন, দ্বিতীয় বাদশাহ্ শাহ্ আলমের হুকুমে উক্ত মন্দির এবং মন্দির হতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ দিকে একটি নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। সে কথা আমরা পরে বলব। তবে আমরা এখানে এক অতি বৃদ্ধার মুখে দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় কোথায় ছিল তা শুনেছি এবং সে কথাই এখন বলব।

এই বৃদ্ধা ভদ্র মহিলার নাম বিনোদিনী চক্রবর্তী। বয়স একশ বছরের বেশী হবে। পিতা হলেন, কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীর নাম হারান চন্দ্র আচার্য্য। জন্মস্থান রঙ্গপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরে। ইহারা ঐ স্থানের আদিবাসিন্দা। বর্তমানে তাঁরা এখানে বাসস্থান নির্মাণ করেছেন। উক্ত বৃদ্ধা তাঁর পৌত্রের দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দিলালপুর মন্দিরে এসেছিলেন দুপুর বেলা ‘ভোগ’ খেতে। ‘ভোগ’ খাওয়ার পর মন্দিরের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষের নীচে বসে আমি বৃদ্ধার সঙ্গে পুরানো দিনের কথা নিয়ে আলাপ করছিলাম। আলাপে বুঝলাম এই মহীয়সী মাতা লেখাপড়া জানেন। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং জ্ঞানেও সচেতন। তবে বর্তমানে খুবই আর্থিক দুরবস্থায় রয়েছেন। তাঁর পুত্র-পৌত্রদের সংসারের নানা অভাব-অনটনের কথা নীরবে শুনলাম মাত্র, প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমার কোথায়। কথা প্রসঙ্গে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর কথা বললাম। দেখলাম, এই সম্মানীয়া

মহিলা চমৎকার খবর রাখেন। বললাম, দেবী চৌধুরানীর স্বামীর বাড়ী যাদেবেশ্বর তর্করত্নের অনুসন্ধানে জানতে পেরেছি। কিন্তু তাঁর পিত্রালয় কোথায় ছিল তা কি কখনও শুনেছেন? বৃদ্ধা বললেন, "হাঁ, আমার বাবা অনেকবার আমাকে দেবী চৌধুরানীর বাপের বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছেন।" কেমন করে দেখিয়ে দিয়েছেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—

> আমরা ছোট বেলায় বাবার সঙ্গে কুড়িগ্রাম হতে রঙ্গপুর আসতাম। ভূতছাড়া (মীরবাগ) রেল স্টেশনের কাছে গাড়ী আস্‌বার পূর্বক্ষণে গাড়ী থেকে বাবা হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ দিকের এক গ্রামের নাম 'কুর্কশাহ' (কুরশা) দেখিয়ে দিয়ে বলতেন, "ঐ যে দেবী চৌধুরানীর বাপের বাড়ী দেখা যায়।" যতবারেই আমরা যাওয়া-আসা করেছি ততবারেই বাবা ঐ ভাবে দেখিয়ে দিতেন।

দেবী চৌধুরানীর বাবার নাম কি ছিল তা বৃদ্ধা মাতা শোনেন নি। যা হোক উক্ত 'কুর্কশাহ' (কুরশা) গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণের বাস পূর্বেও ছিল, এখনও রয়েছে। হালের বিপ্লবী বারিন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকি প্রভৃতি ইংরাজ বিরোধী বিপ্লবী নায়কেরা, উক্ত 'কুর্কশাহ্' (কুরশা) গ্রামে, ইংরাজদের বিরুদ্ধে বন্দুক, পিস্তল ছুঁড়তে হাত পাকিয়েছেন এবং ঐ গ্রামে প্রথম বোমা তৈরীর হাতেখড়ি নিয়েছেন। সম্ভবত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সঙ্গে ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ এবং বারিন ঘোষের পিতা ঐ সময় রংপুর সদর হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডাক্তার ছিলেন। সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী ওরফে মনি, অরবিন্দ ঘোষের সহকারী হিসাবে পরবর্তী সময়ে পন্ডিচেরী আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী, বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে অকস্মাৎ বোমা ফেটে মারা যান। এ'রা রংপুর জেলাস্থ কাউনিয়া থানাধীন উক্ত 'কুর্কশাহ্' (কুরশা) নামক গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন! যা হোক, পূর্বের ঐতিহ্য উক্ত চক্রবর্তী ভ্রাতৃদ্বয় যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত পালন করে এসেছেন। উক্ত গ্রাম হতে ধুমের কুঠি ও সরাইখানার দূরত্ব মাত্র আড়াই মাইল-তিন মাইল হবে। নবাবের কুঠি ও সরাইখানার পূর্ব দিক দিয়ে দক্ষিণাভিমুখী হয়ে 'মানস' নদী প্রবাহিত হয়েছে। 'মানস' নদীর উক্ত কুঠির ঘাটকে এখনও লোকে 'সুবা ঘাট' বলে থাকে। উক্ত 'সুবা ঘাট' এখনও সুবে বাংলার সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ এর নাম স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাগজ পত্রে এখনও ঐ নামে অভিহিত হয়ে আসছে। ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর মসিমপুর নামক যুদ্ধে বাদশাহ শাহ্ আলম যেমন আরও কয়েকটি স্থান ক্রোক করেছিলেন তদ্রূপ ধুমের কুঠি ও সরাইখানার নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য উপরোক্ত 'কুর্কশাহ' (কুরশা) গ্রাম ক্রোক করেন। 'কুর্ক' শব্দে ক্রোক বুঝায়।

দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁ

'মোতাখখারিন' নামক ইতিহাসের মধ্যে 'মসিমপুর' (১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী) যুদ্ধের বিবরণ যা, উল্লিখিত রয়েছে, আমরা তার কিছুটা আলোচনা পূর্বে করেছি। এখানে শুধু মাত্র দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁর সমাধিস্থান এবং সমাধিস্থানের পার্শ্বে তিন দরজাওয়ালা নয় গম্বুজ বিশিষ্ট বিরাট আকারের একটি মসজিদ ও দীঘির বর্ণনা দিব। মসিমপুর যুদ্ধ (ব্যাটেল অব মসিমপুর) জয়ী, শহীদ সিপাহ্-সালার ভ্রাতৃদ্বয়ের কবর দু'টি পাশাপাশি এখনও পূর্বের মত বাঁধানো অবস্থায় রয়েছে। দুই ভাইয়ের মাথার কাছে বাতি দেওয়ার দু'টি পাকা থাম্বা আছে। থাম্বার উচ্চতা সোয়া দুই হাত। অবশ্য এখন মাযারে বাতি দেওয়া হয় না। মসজিদ ও মাযারের সম্মুখের স্থানে একটি ঐ সময়ের দীঘি রয়েছে। দীঘির দৈর্ঘ্য হল দুশ সাঁইত্রিশ হাত এবং প্রস্থ দুশ বাইশ হাত।

দিলালপুর

যুদ্ধ জয়ের পর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের আদেশে উক্ত মন্দিরটি এবং মসজিদ ও শহীদ সিপাহ্সালার ভ্রাতৃদ্বয়ের মাযার নির্মিত ও পুকুর খনিত হয়। তদবধি দিলীর খাঁর নামানুযায়ী এই স্থানটির নাম দিলালপুর হয়েছে।

আলমপুর

যুদ্ধজয়ের পরে শাহ আলম যে স্থানে অবস্থান করছিলেন ঐ স্থানটির নাম তদবধি আলমপুর হয়েছে। আলমপুর দিলালপুরের উত্তর পার্শ্বস্থ সংলগ্ন গ্রাম পূর্বের সময়কার নির্মিত একটি বিরাট আকারের দালান বাড়ী আলমপুরে ভাঙ্গা অবস্থায় ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে রয়েছে।

শ্যামগঞ্জের ডাঙ্গা

আলমপুরের সংলগ্ন স্থানকে লোকে এখন 'শ্যামগঞ্জের ডাঙ্গা' বলে। উক্ত শ্যামগঞ্জের অপর এক নাম বলা হয় 'কুর্কশাহ্' এর ডাঙ্গা। 'কুর্ক' এর অপভ্রংশ হল 'ক্রোক'! এ হতে পরিষ্কার বোঝা

যাচ্ছে, বাদশাহী হুকুমে অথবা তাঁর ফরমানে উক্ত স্থানগুলি দখল করা হয়েছিল এবং কোন্ বাদশাহের হুকুমে দখল করা হয়েছে, তাহা আলমপুর নাম হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সুতরাং শাহ্ আলমের হুকুমে স্থানগুলি দখল করা হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকছে না।

শ্যামগঞ্জের ফাঁসের ডাঙ্গা

১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধজয়ের পর যে স্থানটিতে যুদ্ধে হেরে যাওয়া লোকদিগকে ফাঁস দেওয়া হয় শ্যামগঞ্জের সেই স্থানটিকে এখনও লোকে ‘শ্যামগঞ্জের ফাঁসের ডাঙ্গা’ বলে থাকেন।

‘কুর্কশাহ’ এর ডাঙ্গায় এখনও ঐ আমলের দুইটি বৃহৎ দীঘি রয়েছে সেনাদের জলপান এবং গোসল করবার জন্য। উক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থ নিম্নোক্তভাবে পাশাপাশি রয়েছে। দিলালপুর (দিলীর খাঁর নামানুযায়ী), লালদীঘি, শ্যামগঞ্জ বা কুর্কশাহ্ এবং আলমপুর। ঢাকা হতে পাটনা যাওয়ার বিরাট প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে হল দিলালপুর। দিলালপুর ‘জোড় মঠের’[১] পূর্ব প্রান্ত ঘেঁষে হল চিকুলি নদী। যা হোক, দিলালপুর গ্রাম উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি অবস্থিত। দক্ষিণের যে অংশে শহীদ ভ্রাতৃদ্বয়ের পাকা কবর রয়েছে, ঐ স্থানটিকে মুখে ও কাগজ-পত্রে লেখা রয়েছে ‘আরাজি দিলালপুর’। যাঁরা রঙ্গপুর বা এই অঞ্চলের লোকদের কথিত ভাষা ও উচ্চারণের সঙ্গে সাক্ষাতভাবে পরিচিত তারাই জানে উচ্চারণের স্পষ্টতা অনেক সময় চ্যুত হয়ে অস্পষ্টতা দেখা দেয়। অবশ্য এটা পৃথিবীর সর্বস্থানে একইরূপভাবে চলে আসছে। যা হোক, আমরা মনে করি; দিলালপুরের উক্ত অংশটি ‘আরাজি দিলালপুর’ না হয়ে ‘অরাজি দিলালপুর’ হবে।

সম্ভবত ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয় নবাবের কর্মচারীরা দিলিরপুর বা দিলালপুর উক্ত স্থানের ‘নাম’ হতে আপত্তি জানিয়ে এসেছিল। যার ফলে এখনও লোকেরা আরাজি বা অরাজি দিলালপুর বলে থাকেন।

ইহা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ইংরাজের সমর্থিত নবাবকে এতদঞ্চলের জনসাধারণ জাফরপুর, জাফরগড়, জাফরগঞ্জ এসব নাম দিয়ে এসেছে।

---

[১] মঠ এবং মসজিদ বাদশাহ, শাহ আলমের নির্দেশে নির্মিত হয় বলে প্রকাশ।

অথচ এদের বিরোধীদের যার যা পদবী ছিল, সেই নামে অভিহিত করে এসেছেন। যেমন—উজীরপুর, নবাবগঞ্জ, মোগল কোট রাজবাড়ী। মসিমপুরের যুদ্ধ জয়ী শহীদ ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা, নাম, পদবী এতদঞ্চলের অনেক লোক পুরুষানুক্রমে এখনও জানেন ও বলে থাকেন এবং কবর দুইটিও দেখিয়ে দেন। সেই সব জানা লোকদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের নাম এখানে দেওয়া হল।

হাজী মওলানা মোহাম্মদ আলী (ইনি আটবার হজ করেছেন)। এতদঞ্চলে ইনি একজন সাধু লোক বলে সকলের শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। ৯০/৯৫ এর মত বয়স। মসজিদ এবং মাযার সংলগ্ন স্থানের পার্শ্বে এর জন্মভূমি স্থান। মসজিদে তারাবীর নামায পড়ার পূর্বাবস্থায় কখনও কখনও উক্ত বৃদ্ধ শহীদ সেনাপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের কথাসহ আমাদের বর্ণিত পূর্বোক্ত সময়ের কথাগুলি বলতেন এবং সেনাপতি দিলীর খাঁর নামানুযায়ী দিলালপুর নাম হয়েছে সেকথাও তিনি বলতেন। উক্ত মওলানা মোহাম্মদ আলী শুনেছেন তাঁর উস্তাদ মাওলানা খোদাদাদ খাঁর নিকট হতে। খোদাদাদ খার বাড়ী ছিল 'কুর্কশাহ' (শ্যামগঞ্জ) গ্রামে।[১] হাজী মোহাম্মদ আলী ব্যতীত আর যাঁরা শহীদ ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা জানেন বা শুনেছেন, তাঁরা হলেন :

কামালউদ্দীন (বয়স ৩০ বৎসর), হাসিমুদ্দীন পাইকাড় (৪০), কাসিমুদ্দীন পাইকাড় (৩২), খিজিরউদ্দীন সরদার (৪৫), আসিমুদ্দীন সরদার (৪০), আহম্মদ হোসেন মিঞা (২৮), আবুল হোসেন সরকার (৪২), মোজাম্মেল হক সরদার (৩২), কালু মিয়া সরকার (৫০), শ্রীযুক্ত বাবু নালটু বৈরাগী—এঁর বয়স ১৩২ বৎসর। রংপুর জেলা বা এতদঞ্চলের লোকেরা উক্ত প্রকারের নাম রাখেন। দাদী-নানীদের প্রভাবে, যাতে যমদূত তাদের সহসা মৃত্যু না ঘটায়—এই কুসংস্কারের প্রভাবে উক্তরূপ নামকরণ করা হয়ে থাকে। মসজিদের পার্শ্বে এখন একটি হাট বসেছে। দীঘির পানি লাল হওয়ায় স্থানীয় লোকেরা স্থানটিকে লালদীঘি বলে থাকেন।

---

[১] ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ফলকটিতে ফার্সি ভাষায় দিলীর খাঁ, আসালত খাঁ, এদের মৃত্যু ও কবরের কথা এবং মসজিদ নির্মাণ ও তার সন তারিখের কথা, প্রভৃতিসহ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের আদেশে নির্মিত হয়। এসব কথা মসজিদ গাত্রের শিলালিপিতে খোদিত ছিল। মাওলানা খোদাদাদ খাঁ এ সমস্ত কথা প্রায় সময় বলতেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উপরোক্ত নয় গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সামনের বাইরের দেয়ালের উপরিভাগে, পাথরে খোদিত একটি ফলক ছিল। ফলকের স্থানটি পূর্বের মতই রয়েছে, কিন্তু ফলকটি নাই। ফলকটি কি হয়েছে—প্রশ্ন করায় স্থানীয় প্রাচীনরা বলেন যে, "তিনজন সাহেব এবং তাদের সঙ্গে এদেশীয় অফিসার দুইজন ছিলেন। তাঁরা লোকদের কিছু না বলে ফলকটি নিজেরা খুলে সঙ্গে করে নিয়ে যান। শিলালিপিটি সরানো বা নিয়ে যাওয়া হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিদেশী শাসকরা তাদের পরাজয়ের কাহিনীকে এবং শহীদ জেনারেল ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম পরিচয় গোপন করবার মানসে, একবারে ঢেকে ফেলবার জন্য এই কাজ করেছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাওলানা এনায়েত আলী এবং মাওলানা বেলায়েত আলী

শ্রদ্ধেয়া তৃপ্তিরায় চৌধুরী (দৈনিক আজাদ পত্রিকায় ১৩ই আষাঢ়, রবিবার ১৩৬৬ সাল) 'ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি আমার নাম দিয়ে বলেন যে, মাসিক 'মোহাম্মদীতে' আমার লেখা হতে সন্ধান পেয়ে তিনি দিনাজপুরের জেলাধীন খলিলপুর নামক স্থানে যান। সেখানে তিনি মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী প্রমুখের পাকা বাঁধানো কবর, মসজিদ প্রভৃতি দেখতে পান এবং স্থানীয় লোকদের নিকট হতে ঐ সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারেন। এ সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা মরহুম জনাব আবদুল্লাহেল কাফী 'আল কোরায়শী'-কে উল্লেখ করে বলেন যে, তাঁর বাড়ী হতে মাত্র চার মাইল দূরে খলিলপুর গ্রামে স্বাধীনতার আন্দোলনকারী ব্যাঘ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের কবর রয়েছে অথচ মাওলানা সাহেব তা জানেন না। এর জবাবে মাওলানা সাহেব একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতা, মাতা, বাসস্থান, কর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল সুন্দর প্রবন্ধ লেখেন। "মাওলানা এনায়েত আলী ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে মুজাহিদ ছাউনীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।" ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে ইঁনি বিদ্রোহী দলে ছিলেন। কিন্তু এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু কোন স্থানে হয়েছে, সে কথার জবাব তিনি তাঁর প্রবন্ধে দেন নি। যা হোক, আমার স্মৃতি হতে এসব কথা বললাম। কারণ তৃপ্তিরায় চৌধুরী ও শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মরহুম আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবদের কারো প্রবন্ধ আমার কাছে নেই। অথচ তাঁদের বাকযুদ্ধে পড়ে আমি বিপদ গণলাম সব থেকে বেশী এইজন্য যে, এই বাকযুদ্ধের ধূম্রজালে আসল সত্য না তলিয়ে যায়। এর কারণও রয়েছে অনেক। মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনীষী হযরত মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকি সাহেবকে আমরা স্থানীয় লোকেরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এসেছি। এর কারণও বহুবিধ। এঁরা দুই ভাই আজীবন দেশ ও দশের হিতার্থে মিশনারী জীবন যাপন করে এসেছেন। এমন লোক কমই হয় এই হতভাগা দেশে। এই

ঘটনার কয়েক বছর আগে মাওলানা আবদুল্লাহেল বাকি সাহেবকে ফুলচৌকিতে আমরা ৫২ গরুর গাড়ীতে তুলে নিয়ে সভা করে, হাজার হাজার লোক মিলে আন্তরিকভাবে বিপুল সম্বর্ধনা জানাই। এ হতে বোঝা যায় তাঁদের প্রতি আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালবাসা রয়েছে। মাওলানা সাহেবের দৈনিক আজাদ পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাপা হওয়ার কয়েকদিন পর রংপুর হতে আমি মাওলানা সাহেবের ঢাকাস্থ বাসায় যাই এবং দেখা করি। আমি নিজে খলিলপুরের কবর সম্পর্কে মাওলানা সাহেবকে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরে বোঝালাম। ঐ সময়গুলিতে আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলা একাডেমীর লাইব্রেরিয়ান, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, জনাব শামসুল হক এম· এ· ও অধ্যাপক শাহ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবান। মাঝে মধ্যে কখনও আমি একা মাওলানা সাহেবের কাছে গিয়ে এই প্রসঙ্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনা করতাম। তিনি তখন শয্যাশায়ী ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে আমি মাওলানা সাহেবকে বললাম, "খলিলপুর ও এর আশেপাশের গ্রামগুলির লোকেরা সবাই বলে 'খল্‌ফ্যার ছাউনী' 'ফকিরের ড্যারা।' মাযার শরীফের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে 'মওলানা এনাত আলী, বেলাত আলী'। 'ফকিরের ড্যারা'ও তারা বলে। যা হোক, একদিন মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, "আমি বিদেশে লেখাপড়া করেছি, বিদেশে ঘুরেই জীবন কাটালাম। বাড়ীতে খুব তো বেশী একটা থাকি নাই। হয়তো হতেও পারে।" আমি বললাম, "হয়তো নয়, অবশ্যই সেখানে কবর রয়েছে। ওদের কারো না কারো।" তিনি বললেন, "কেমন করে তা হয় ? আমি সুস্থ হলে যাবো কিন্তু অপারেশন করাবো। এতে যদি ভাল না হই; মারা যাই তবে খলিলপুরে যাব কি করে ?"

আমি জোর দিয়ে বললাম—অবশ্যই আপনি ভাল হবেন, তখন আপনাকে নিয়ে যাব। তিনি বললেন, "হাঁ। তা যাব, কিন্তু আমার মনে হয় অপারেশন করার পর আমি হয়তো বেঁচে থাকব না।" আমাদের অদৃষ্টের কি দুর্ভাগ্য! তাঁর কথা সত্য হল। কিন্তু এই সচেতন মহাপুরুষ হাসপাতালে অপারেশন করবার পূর্বে দিনাজপুর জেলার রাজারামপুর গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার, দেশ সেবক, নুরুল হুদা চৌধুরী এম, পি, (পরে ইনি এম. এন. এ ছিলেন) সাহেবকে খলিলপুর পরিদর্শন করতে অনুরোধ করেন উক্ত আলোচ্য বিষয় সত্য এবং সঠিক কি না তাই জানতে। জনাব মাওলানা আবদুল্লাহেল

কাফী সাহেবের অনুরোধক্রমে জনাব চৌধুরী সাহেব ঢাকা হতে তাঁর দিনাজপুর জেলার গ্রামের বাড়ী রাজারামপুর হতে এসে খলিলপুর গ্রামে গিয়ে পেঁাছেন। ১১ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৫৯ সাল জুম্মার নামাযের পূর্বে খলিলপুর যাবার সময় সংবাদ দিয়ে চৌধুরী সাহেব আমাকে ও অধ্যাপক কবি মুফাখখারুল সাহেবকে ও চৌধুরী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি সংগে নিয়ে উক্ত স্থান পরিদর্শন করবার জন্য যান। চৌধুরী সাহেব খলিলপুর মসজিদে জুম্মার নামাযের পূর্বে এবং পরে মসজিদের মুসল্লীদের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। নামাযবাদ আরো স্থানীয় অনেক সম্ভ্রান্ত লোকসহ চৌধুরী সাহেব এই সব স্থানগুলি পরিদর্শন করেন এবং লোকদের নিকট নানা প্রশ্ন করে এসব বিষয় জানবার চেষ্টা পান। সব দেখে শুনে তিনি ঘটনা যে সত্য এই বিশ্বাস করে ৪টা কাগজে আলাদা ৪খানি মন্তব্য স্বহস্তে লেখেন। একখানি মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী 'আল্ কোরায়শী' সাহেবের, তাঁর ঢাকার নাজিরাবাজারস্থ বাসভবনে পাঠিয়ে দেন। আর একখানি অধ্যাপক কবি সাহেবকে দেন। আমাকে একখানি এবং আর একখানি নিজের কাছে রাখেন। যা হোক, পরিদর্শক জনাব নূরুল হুদা সাহেব যখন রিপোর্ট মাওলানা সাহেবের নিকট পাঠান তখন মওলানা সাহেব মরণাপন্ন অসুখে শয্যাশায়ী ছিলেন। এর অল্প কয়েকদিন পর মাওলানা সাহেব সকলকে শোক-সাগরে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। জনাব নূরুল হুদা চৌধুরী সাহেবের সম্পূর্ণ রিপোর্ট আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

> জনাব মাওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেব আমাকে খলিলপুরের মাযার সম্পর্কে প্রায় দুইমাস আগে তত্ত্ব সংগ্রহ করতে বলেন।
>
> ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ আমরা খলিলপুর গ্রামে আসিলাম। পথেই অধ্যাপক কবি মুফাখখারুল ইসলাম ও হায়দার আলী চৌধুরী সাহেবানের সহিত দেখা হইল। তারাও এই পথের যাত্রী। আমার সহিত মৌলবী আবদুল হামিদ সাহেব ছিলেন। আমরা মহিষের গাড়ীতে যাইতেছিলাম। লোককে পথেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, খলীফার ছাউনী কোন্ দিকে ? তাহারা বলিল—দক্ষিণে। কেউ কেউ বলিল, খলীফার ছাউনীও বলে, ফকিরের ডেরাও বলে। আমরা সেই স্থানে আসিলাম। পূর্বে করতোয়া নদী। উত্তর দিকে

একটি খাল 'নলশিশা' নাম লইয়া করতোয়া হইতে উঠিয়া প্রথমত আধ মাইল পশ্চিমে গিয়াছে। পরে আবার দক্ষিণ দিকে এক মাইল পরিমাণ গিয়া পূর্বমুখী হইয়া পুনরায় করতোয়ার সঙ্গে যোগ হইয়াছে। ইহার মাঝে খলীফার ছাউনী নামে একটি বিরাট সমতল ভূমি আছে। তাহাতে দক্ষিণ পাশে একটি দীঘি আছে। দীঘির নাম লালদীঘি। উত্তর-পশ্চিমের কোণের দীঘির নাম 'খয়ের পুকুর'। উত্তর-পূর্ব কোণের পুকুরের নাম 'সিদ্দীর পুকুর'; মাঝে একটি মসজিদ ২৯ হাত দীর্ঘ ১৪ হাত প্রস্থ। মসজিদ সম্মুখের আঙ্গিনাটি বেশ প্রশস্ত। আঙ্গিনার সম্মুখে একটি প্রাচীর বেষ্টিত 'মাযার'। মাযারের দৈর্ঘ্য ১০ হাত প্রস্থ ১০½ হাত (অর্থাৎ কবর দুইজনের দৈর্ঘ্য প্রত্যেকের জন্যই ১০ হাত, প্রস্থ ৫¼ হাত।) এই কবর দুইটি কাহার—প্রশ্ন করায় লোকেরা বলিল, "দুই ভাই—খলীফা এনাত আলী বেলাত আলীর।" তাহাদেরকে তাঁহাদের বংশের কে আছেন প্রশ্ন করায় লোকে বলিল, বেলাত আলীর কেউ ছিল না। এনাত আলীর ছেলে ছিল—ইয়াদ আলী। তাঁর কবর মাযারের সামনের ইটের ঢিবি। ইয়াদ আলী এক খাদেমকে পোষ্য গ্রহণ করেন। তাঁর নাম পিয়ার তুল্যা। পিয়ার তুল্যার দুই ছেলে—জিয়া তুল্যা ও ইউসুফ উদ্দীন ফকীর। লোকে ইউসুফ ফকীরকে তখন হাযির করিল। যে পাথরের উপর ফকিরেরা বসিয়া ওযু করিতেন সেই পাথরটি দেখা গেল। পৌনে দুই হাত লম্বা এক হাতের মত প্রস্থ। মসজিদের আঙ্গিনার উত্তর পাশে খলীফাদের 'খানকা শরীফ' ছিল। অনেকখানি উত্তরে তাহাদের বাসের বাড়ী ছিল—লোকে দেখাইয়াছিল। মসজিদের অনেকখানি নিকটে লইয়া আনা হইয়াছে একটি নালা—করতোয়া হইতে কাটিয়া, খলীফারা সেখানেই নৌকায় চড়িতেন। নালার নাম 'মাথাকাঁপী'। মসজিদ হইতে একটি পাকা রাস্তা পশ্চিম দিকে 'নলশিশা' খালে গিয়াছে। সেখানে এখনও বিছানো ইটের ঘাট ভগ্ন অবস্থায় আছে।

উপস্থিত লোকের মধ্যে ঐ গ্রামস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ঃ

১. সামাদ সরদার;

২. আবারউদ্দিন গছুয়া;

৩. মাহতাব গাছুয়া;

৪. অতিয়ার রহমান গাছুয়া;
৫. আকবর আলী মুন্সী;
৬. বাবু রাধিকারঞ্জন অধিকারী;
৭. জিয়ার তুল্যা ফকির;
৮. ইউসুফ আলী ফকির;
৯. মোছলেমউদ্দীন সরদার;
১০. মৌলবী নছিরউদ্দীন পণ্ডিত।

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, শুক্রবার নামাযের পূর্বে আমি খলিলপুর গ্রামে উপস্থিত হই এবং ঐ গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামায আদায় করি। গ্রামবাসীগণ হঠাৎ আমাকে তাঁহাদের গ্রামে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে এবং আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করে। তদুত্তরে আমি বলি, "এখানে যে মাযার রহিয়াছে তাহার ইতি বৃত্তান্ত আপনাদের নিকট সঠিকভাবে জানিতে পারিব বলিয়াই শুক্রবারে এই জুম্মায় হাযির হইয়াছি। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে জিয়ার তুল্যা ফকির ও ইউসুফ আলী ফকিরকে আমার সামনে হাযির করাইলেন এবং বলিলেন যে, ইঁহারাই মাযারের তত্ত্বাবধায়ক; ইহাদের নিকটেই সব কিছু জানিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী নামে দুই ভাই-ই 'খলীফা' নামে মশহুর আছেন। তাঁহারা আরও বলেন বেলায়েত আলী বড় ও এনায়েত আলী ছোট ছিলেন। বেলায়েত আলী বিবাহ করেন নাই, এনায়েত আলী বিবাহ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই একবাক্যে তাঁহাদের নামের কথা উল্লেখ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকটেও উক্ত খলীফা ভ্রাতৃদ্বয়-এর নাম ও মাযার ঐ স্থানে আছে বলিয়া শুনিয়াছেন।

ঐ মসজিদ সংলগ্ন গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণ অধিকাংশ লোকই মুহাম্মদী জামায়াতভুক্ত। ইমাম সাহেব ও তাঁহার জামায়াতের লোকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া খোৎবায় বলিয়াছিলেন—নূরুল হুদা চৌধুরী সাহেবের কাছে আপনারা মাযার সম্বন্ধে সব কথাই যথাযথরূপে বিবৃত

করিবেন। কিন্তু এর পরে এখানে মাযারে যেন কোন প্রকার শেরেকী না হয়, তৎপ্রতি আপনারা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। খলীফা এনায়েত আলী সাহেবের পুত্র ইয়াদ আলী সাহেবের পরবর্তী পোষ্য মৃত পিয়ার তুল্যার পুত্র জিয়ার তুল্যা ও ইউসুফ ফকির বলিলেন, আমাদের নিকট বাদশাহী আমলের তামার লিখিত পত্র ছিল। তাহাতে খীলফাদ্বয়ের নামে নিষ্কর ভূমির ও তৎসংলগ্ন মৌজাগুলির নিষ্কর ভূমির আমলনামা লিখিত ছিল। বহু পূর্বে বৃটিশ আমলে যাহারা কোর্ট অব ওয়ার্ড স্টেট হইতে কোর্টের ম্যানেজার ঐ তামার পত্রখানি আমাদের নিকট হইতে লইয়া যায়। দলিল-পত্রগুলিও বহু পূর্বে বৃটিশ আমলে আমাদের নিকট হইতে পার্বতীপুর থানার দারোগা লইয়া যায় কিন্তু তাহাও ফেরত দেয় নাই। চাঁদ চিহ্নিত একখানি বাদশাহী পাঞ্জা আমাদের নিকট ছিল, তাহা অল্পদিন হইল রঙ্গপুর জেলার ফুলচৌকি নিবাসী হায়দার আলী চৌধুরী সাহেব দেখিবার জন্য আমাদের নিকট হইতে লইয়া যান। তাহা এখনও তাঁহার নিকট গচ্ছিত আছে। দেখা হওয়ার পর হায়দার আলী চৌধুরী সাহেব স্বীকার করিয়াছেন "উহা আমার নিকট আছে।"

উপরের বিবৃতিতে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্বশেষে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ আমলের প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ সিংহ ঘায়েলকারী পুরুষ সিংহ খলীফা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলীর কর্মস্থল ও বসতবাটী এই স্থানেই ছিল।

তাঁহাদের মাযারের পাশেই বিরাট ময়দানের মধ্যে বারুদ ও লোহার কারখানা ছিল। তাহা ঐ গ্রামের অধিবাসীরা সকলেই আমাদের নিকট বলিল ও স্থান দুইটিও আমাদেরকে দেখাইল। বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র যেখানে তৈয়ারী হইত তাহার ধ্বংসাবশেষও আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। এই মহান খলীফা ভ্রাতৃদ্বয়ের মাযার ও মসজিদটি সংস্কারের অভাবে জীর্ণ ও অবহেলিত অবস্থায় রহিয়াছে দেখিলাম। মরহুম খলীফা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী ও জনাব মৌলানা কেরামত আলী সাহেবান মরহুম সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সাহেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহারা এতদঞ্চলে অবস্থান করিয়া ইংরেজের সঙ্গে জিহাদী যুদ্ধ দিয়া এবং ইসলাম প্রচার করিয়া যে এইখানে শায়িত আছেন, তাহাতে সন্দেহ করার

কিছুই নাই। যেহেতু মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের মাযার রঙ্গপুরের বুকে অবস্থিত। তাঁহার বংশধর জনসাধারণের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু মরহুম মৌলানা বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী সাহেবদ্বয়ের লুপ্ত স্মৃতিচিহ্ন কালের করাল গ্রাসে প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে গিয়াছিল, তাহার খোঁজ কেহই করেন নাই। যেহেতু ইঁহারা বৃটিশের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া গিয়াছেন সমস্ত জীবনব্যাপী আযাদী লাভের উদ্দেশ্যে। বৃটিশ চাহিয়াছিল তাহার বিরোধী জাতীয় নেতাদের নাম-নিশানা একেবারেই লুপ্ত হউক। দ্বিতীয়ত ইয়াদ আলী ফকির সাহেবের পরবর্তী আর কোন বংশধর নাই। কেবলমাত্র ইয়াদ আলী সাহেবের পোষ্যের বংশধর যাহারা আছেন, তাঁহারা একেবারে পথের ভিখারী ও নিঃস্ব। সুতরাং তাঁহাদের কীর্তিকলাপ, নাম-ধাম ও স্মৃতি যে অবলুপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার খোঁজও কেহ করেন নাই। আমি বর্তমানে ঐতিহাসিক গবেষকগণকে এই স্থান পরিদর্শন করার জন্য ও বিষয়টি বিশেষভাবে গবেষণা করার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি এবং আমাদের বর্তমান বিপ্লবী গভর্নমেন্ট ও দেশবাসীর শুভ দৃষ্টি এই উপেক্ষিত ও অবহেলিত খলীফাদ্বয়ের স্মৃতি পুনর্জাগরণ করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রসঙ্গত আমি ইহা জানিতে পারিলাম, প্রতি বৎসর এখানে যিয়ারত উদ্দেশ্যে বহুলোক রঙ্গপুর, নিলফামারী প্রভৃতি স্থানের ও স্থানীয় লোক চৈত্র মাসে আসিয়া থাকেন।

আমার মত হল এই যে, দুই ভাইয়ের কবর যদি নাও থাকে, তবে বেলায়েত আলীর কবর খলিলপুরে রয়েছে বলে বিশ্বাস করি। মাওলানা বেলায়েত আলী সাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৫২ সালে। মাওলানা এনায়েত সাহেবের মৃত্যু হয় ১৮৫৮ সালে।

যা হোক, জনাব নূরুল হুদা চৌধুরী সাহেবের সহিত এর পরে দেখা হলে তিনিও আমার উক্ত মত সমর্থন করেন। তবে সম্ভবত এও হতে পারে যে, মাওলানা এনায়েত আলী যেখানেই ইন্তেকাল করুন না কেন, তাঁর ভক্তবৃন্দের পক্ষে হয়ত বা গোপনে তাঁকেও নিয়ে এসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কবরের পার্শ্বে কবর দেওয়াটা অসম্ভব একটা কিছু নয়। যদিও সে সময়টি এদেশীয়দের পক্ষে একটি ঘোরতর দুর্দশার সময় ছিল।

তথাপি এঁদের অপর সহকর্মী ও ভক্ত শাগরিদগণের ইচ্ছায় হয়ত দুই ভাইকে একই স্থানে সমাহিত করতে পারেন। সেই হিসাবে দুই ভাইয়ের পাশাপাশি বাঁধান কবর দুটি এখনও স্থানীয় লোকেরা দেখিয়ে দেন। বাংলার দিনাজপুর, রঙ্গপুর, রাজশাহী, মালদহ প্রায় প্রতি জেলাতেই তাঁরা এসেছিলেন বিদ্রোহের বাণী নিয়ে। এসব কথা ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়।

সৈয়দ আহ্‌মদ বেরেলভী সাহেবের শহীদ হওয়ার পর এই ব্যাঘ্র ভ্রাতৃদ্বয় চুপ করে থাকেন নি। তাঁরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে লোকদের বিদ্রোহ করবার জন্য পূর্বের মত সব সময় সক্রিয় কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ভূমিকায় এঁদের এবং এদের সহকারীদের বিরাট অবদান ছিল—তা ইতিহাসের পাঠকমাত্র অবগত আছেন। উক্ত সময়কার বিদ্রোহ সম্পর্কে অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা সম্পন্ন এই নেতৃ যুগলের কর্ম সম্পর্কে শ্রী অশোক মেহতাজীর লিখিত ইংরাজী ইতিহাসের বাংলা তরজমা হতে এখানে আমরা কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

> রাজদ্রোহমূলক প্রচারকার্যে হিন্দুরা সাধারণত একটু নিষ্ক্রিয় ধরনের। তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া যা ঘটলো, তার অনেক বেশী ঘটলো মুসলমানদের মনে। তারা স্বভাবতই একটু দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। তারা গভীরভাবে বিচলিত হলো। সৈয়দ আহমদের আন্দোলন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়নি। তাঁর শিষ্য এনায়েত আলী ও বেলায়েত আলী তাঁর প্রারব্ধ কর্মকে চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৪৭ সালে তাদের গ্রেপ্তার করা হলো এবং হুকুম হলো, তারা পাঞ্জাবে থাকতে পারবে না। পাটনায় থাকতে হবে তাদের এবং ভালভাবে থাকবার প্রতিশ্রুতি হিসাবে জামিন দিতে হবে। ১৮৫০ সালে বাংলাদেশের রাজশাহীতে রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে এই জেলা থেকে দু'বার তাদের বহিষ্কৃত করা হয়। পরের বছরে দেখা গেল তারা আবার পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহের বিষ ছড়াচ্ছে। ১৮৫২ সালে পাটনার ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্ট দিলেন—শহরে বিদ্রোহী প্রকৃতির লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ, পাটনা ব্রিটিশ শাসনাধীন একটা প্রদেশের প্রধান শহর।
>
> পুলিশের সঙ্গে গোপনে গোপনে যোগ ছিল। বিদ্রোহীদের একজন নেতা মৌলবী আহমদ উল্লা তার বাড়ীতে ৭০০ অনুচর জড়ো করে রেখেছে এবং স্পষ্টই ঘোষণা করেছে - জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্পর্কে আর

কোনো তদন্তের চেষ্টা করলে তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দেবে। (ডব্লিউ. ডব্লিউ. হাণ্টারের 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস,' পৃঃ ২২-২৩)।" "আঠারশ' সাতান্নের বিদ্রোহ" পৃঃ ১৬—১৭)

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সন্ত্রস্তকারী ব্যাঘ্র ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা বেলায়েত আলী ও মাওলানা এনায়েত আলী সাহেবের এখানে আসা-যাওয়া ও ছাউনী ছিল—এতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। স্থানগুলি অনেকটা জীবন্ত অবস্থা নিয়ে পড়ে রয়েছে। মাঠে যেখানে যেখানে তাঁবু খাটানো হতো সে সব জায়গাগুলি মাঠের উপরিভাগ থেকে উঁচু এবং চতুর্দিকে সুন্দর ঢালু অবস্থায় এখনও রয়েছে। মাওলানা এনায়েত আলীর ছেলে ইয়াদ আলীর কবরও লোকে এখনও দেখিয়ে দেয়। এনায়েত আলী সাহেবের একজন স্ত্রী এখানে থাকতেন এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে উক্ত ছেলে হয়েছিল। এ সব কথাও স্থানীয় লোকেরা ও খাদেমের বংশধররা বলেন। খাদেমের বংশধর জিয়ার তুল্যা ফকির ও ইউসুফ আলী ফকির ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলীর নামীয় একটি পিতলের পাঞ্জা দেন, তা আমি ঢাকা যাদুঘরে দিয়েছি। জনাব নুরুল হুদা সাহেব উক্ত স্থানের মসজিদ ও কবরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত ঝাড়,-জঙ্গলাদি নিজ ব্যয়ে পরিষ্কার করিয়ে দেন। তাঁর চেষ্টায় উক্ত মসজিদে এখন নামায পড়া হয়। চৌধুরী সাহেব ঐ স্থানে একটি স্কুল ঘর দিয়েছেন, যাতে স্থানীয় ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা করতে পারে। স্থানীয় লোকেরা ঐ স্থানে একটি হাট বসিয়েছে। এখন লোকজনের মধ্যে বেশ সাড়া পড়েছে।

মওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী সাহেবানের কীর্তি সমন্বিত স্থানগুলি এভাবে গোপন করবার কারণ কি? এই সব অনুসন্ধান করতে গেলে এই বলা যায় যে, শাহযাদা সুবাদার নবাব নুরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর পুত্র-পৌত্রদের সাথে মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী, মাওলানা কেরামত আলী সাহেবানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ফুলচৌকির নগর হতে খলীফা ভ্রাতৃদ্বয়ের নামীয় খলিলপুরের 'ছাউনী'র দূরত্ব পশ্চিমে ১২ মাইল হবে। ইংরাজদের আর এক প্রধান শত্রু মুসা শাহ (শাহ কাদেরুল্লাহ)-এর নিবাস 'ঘিরলাই' নামক গ্রাম হতে খলিলপুরের দূরত্ব মাত্র ৩ মাইল হবে।[১]

---

[১] খলিলপুরের "ছাউনী" দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত এবং ইতিহাস খ্যাত বৃটিশ বিরোধী ফকির নেতা. মুসা শাহের গ্রাম রংপুর জেলায় অবস্থিত। কিন্তু কাছাকাছি।

সুতরাং সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা সবদিক সামাল দিবার জন্য এই হীন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষ এসব বিষয়াদি আলোচনা না করে এবং এ'দেরকে ভুলে যায়।

স্থানীয় লোকের মধ্যে এমনি ধর্মীয় মতবাদ সরবরাহ করা হয়েছে যে, তারা পাকা কবরের স্থান বলে ঐ প্রাচীনতর মসজিদে জুমার নামায আদায় করতে যায় না। গ্রামের ভিতর বাঁশের ঘরে নামায আদায় করে। বছর ১৫ যাবত অনেক চেষ্টায় আবার শুরু করেছে।

বর্তমান রংপুর শহরের ও রংমহলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—রংপুর শহররূপে মাত্র ৮০ বছর যাবত পরিচিত। এই অঞ্চল বৃটিশ আধিপত্যের পূর্বে রাধাবল্লভ মৌজা নামে পরিচিত ছিল। এখনও এই শহরের একটি বিরাট অংশ রাধাবল্লভ মৌজা বলে অভিহিত হয়ে আসছে। জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর স্বামী জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল আলোচ্য রাধাবল্লভ মৌজা। সুবাদার নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ এই এলাকায় 'রঙমহল' নির্মাণ করান। পরে তৎপুত্র কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ আরও সুন্দর করে নির্মাণ কার্যাদি সমাধা করান। রঙ্গমহলের চতুষ্পার্শ্ব ব্যাপী জলাশয় ছিল।

উত্তরে 'চিক্‌লি' হ্রদের অনুকরণে একটি কৃত্রিম হ্রদ তৈরী করা হয়। চিকলিকে এখন লোকে 'চিকলী বিল' বলে অভিহিত করে থাকে। চিক্‌লী হতে একটি গভীর নালা রঙমহলের পূর্বদিক থেকে দক্ষিণ দিকে কেটে নিয়ে যাওয়া হয়। দক্ষিণ দিক হতে পশ্চিম দিকে উক্ত নালা সংযোগ করা হয় এবং ঘাঘট নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

মাহিগঞ্জের পশ্চিমে উক্ত খাল পার হয়ে রঙ্গমহলে ঢোকার ঘাটকে এখনও 'জঙ্গঘাট' বলা হয়ে থাকে। নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ ও তৎবংশীয় 'জঙ্গ'রা খাস করে উক্ত ঘাট দিয়ে রঙমহলে যাওয়া-আসা করতেন।

দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রজা ও অন্যান্য দর্শন প্রার্থীরা রঙমহলে আসা-যাওয়া করত বলে উক্ত ঘাটটিকে 'দর্শনা' বলা হয়ে থাকে। এমনকি দর্শনার জলাশয়টিকে আজও 'দর্শনা বিল' বলা হয়। পশ্চিম দিক দিয়ে আসা-যাওয়া

করতেন সেনাপতি। উক্ত ঘাটকে এখন অবধি 'ফকির বকশীর ঘাট' বলা হয়ে থাকে। কাঁচ ও ইষ্টক সমন্বয়ে নির্মিত কয়েকটি প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদগুলির নাম 'বাকের কাশানা' বাহের কাশানা হয়ে পড়েছে। 'কামাল কাশানা' 'নওয়াব কাশানা' অধুনা নওয়া কাশানা হয়ে পড়েছে। কাশানায় অভ্যাগত মেহমানদের অভ্যর্থনা করা হত। নাচ-গান কাশানাগুলিতে হত। কাশানাগুলির নামানুযায়ী উক্ত জনপদগুলির নাম এখন অবধি অভিহিত হয়ে আসছে। কাশানা ব্যতীত এখানে নবাব এবং নবাব পুত্রদের পাইকারীভাবে মাল বিক্রির কারবার ছিল, যে জন্য এখনও নবাবগঞ্জ বলা হয়ে থাকে। রঙমহলের একটি অংশকে 'আলমনগর' বলা হয়। সম্রাট ২য় শাহ আলমের নামানুযায়ী উক্ত অঞ্চলকে 'আলমনগর' বলা হয়ে থাকে। আলমনগরের উত্তর পার্শ্বে হল 'নূরপুর'। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ-এর নামানুযায়ী এই অঞ্চলকে নূরপুর বলা হয়ে থাকে। মুন্সী পাড়াকে পূর্বে বলা হত 'জোলা পাড়া'। এখানে নবাব ও তৎবংশীয়দের নির্দেশে রেশম কাপড় তৈরী করা হত। সেনপাড়া ও গুপ্ত পাড়ার দক্ষিণ অঞ্চলকে তাঁতী পাড়া বলা হত। এখানে রেশমের নানারূপ বস্ত্র তৈরী হত। টেপার জমিদার বাড়ীর দক্ষিণের কিছু অংশ হতে উত্তরে মেঘরাজ দুলিচাঁদ ও জেঠমল, রাউথমল মাড়োয়ারীর দোকান পর্যন্ত একটি নানা জাতীয় বৃহৎ ফুলের বাগান ছিল। জেঠমল রাউথমল-এর দোকান সংলগ্ন স্থানগুলি জুড়ে ২টি দো মহলা বাড়ী ছিল। পশু চিকিৎসালয় সংলগ্ন স্থানে একটি দোমহলা দালান ছিল। উক্ত দালানে ময়মনসিংহ-নিবাসী শ্রীনাথ ডাক্তার বাস করতেন। অন্যান্য দালানগুলি তখন ভাঙ্গা-অর্ধভাঙ্গা এবং নানা গাছ-গাছড়ায় ঢাকা ছিল। ডাক বাংলোর সামনে রাস্তার উত্তর পার্শ্ব ঘেঁষে এক মাঠ বিশিষ্ট একটি মন্দির ছিল। উক্ত মন্দিরে নবাব পক্ষীয় হিন্দু ওমরাগণ পূজা-অর্চনা করতেন। উক্ত মন্দিরটিকে বলা হয় বামনী দেবীর মন্দির। এই বামনী হল আসলে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী।

কামাল কাশানায় যেখানে শাহযাদা কামালের কাঁচ নির্মিত দুই মহলা বিশিষ্ট দালান ছিল। তার ৪০ গজ উত্তর দিকে একটি মন্দির ছিল। উক্ত মন্দিরটিকে বলা হয় রাজা ভবানী পাঠকের মন্দির। বাকের কাশানা যেখানে ছিল, তার কিছুদূরে উত্তর পার্শ্বে আর একটি মন্দির ছিল। কাশানাগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল। রঙ্গমহলের কোন কোন স্থান ফুলের বাগান আবার

কোন কোন স্থান ফলের বাগানে শোভিত ছিল। নূরপুরের পশ্চিম-উত্তর দিক দিয়ে ঘোড়াশালা ছিল। মুচিপট্টির চতুষ্পার্শ্ব ব্যাপী হাতীশালা ছিল।

বামনী দেবীর মন্দিরের ৪০ গজ পূর্ব দিকে হল মসজিদ। মসজিদটির নাম তখন হতে দেওয়া হয়ে এসেছে ভাঙা মসজিদ। বৃটিশ আমলের একেবারে শেষের দিকে মসজিদটি যে শাহী আমলের তাহা হাইকোর্টের এক মামলায় নির্ধারিত হয়। সম্রাট ২য় শাহ আলমের রাজত্বের একেবারে প্রথম দিকে উক্ত মসজিদটি নির্মিত হয়। ভাঙা মসজিদ হতে ৩০ গজ উত্তর দিকে রাজা রামমোহন রায়ের উপাসনা মন্দির অবস্থিত ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, সন্ন্যাসীরা তাদের মন্দিরে কোন দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করতেন না। মুসলমানেরা তো করেই না। রাজা রামমোহন রায় তাঁর নূতন ধর্মমতে মূর্তি-বিরোধী একেশ্বরবাদী ছিলেন। ত্রিভুজ আকারের একটি স্থানের এলাকার একেবারে নিকটে তিনটি উপাসনালয় গড়ে উঠেছিল। কেন? রাজা রামমোহন রায় কি কারণে তাঁর অবস্থানকারী পূর্বের রংপুর ছেড়ে প্রায় ৩ মাইল দূরবর্তী স্থানে কেন রঙ্গমহলের কাছে ব্রাহ্ম মন্দির নির্মাণ করলেন? মুসলমানদের মসজিদ এবং সন্ন্যাসী মতের প্রভাবাধীন একেশ্বরবাদী মন্দিরের পার্শ্বে তার ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপন করলেন রাজা কেন, কিসের কারণে? প্রশ্ন এসে যায়, বাস করতেন ডিমলার জমিদার বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে দেওয়ানতলা নামক স্থানে। রাজা রামমোহন দেওয়ান ছিলেন বলে উক্ত স্থানের নাম তদবধি দেওয়ানতলা হয়ে এসেছে। দেওয়ানতলা হতে রঙমহলের মধ্যস্থিত রাজার দেওয়া ব্রাহ্ম মন্দিরের দূরত্ব হল তিন মাইল। ভাঙা মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে রাস্তা ঘেঁষে ঐ সময়কার এক বিশিষ্ট পীর ফকিরের কবর অদ্যাবধি রয়েছে। অধুনা কবরের উপরে একটি ঘর দেওয়া হয়েছে। এই কথা সহজে এসে পড়ে যে, রঙ্গপুরের সন্ন্যাসী ও ফকিরদের প্রভাবে মনে হয় রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদী ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন।

দেওয়ানতলার দক্ষিণে মীরগঞ্জের কিছু উত্তরে সন্ন্যাসীদের দুইটি মূর্তিহীন মন্দির আজও অক্ষত অবস্থায় অনাদরে পড়ে রয়েছে। দেওয়ানতলার কিছু উত্তর দিকে মাহিগঞ্জের প্রকাশ চৌধুরীর বাড়ীর সামনে পুকুরের পূর্বদিকে জলের উপরে দেবদেবীহীন মন্দির অযত্নে অবহেলায় ভেঙে ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে শেষে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর রংপুরস্থ বাড়ীর পিছন দিকে গুরুতর অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হত। মুলা টোল-এর পূর্বের নাম ছিল মোগলটুলি। ধাপ নামক স্থানের চতুষ্পাশ্বর্ স্থানব্যাপী ফলের বৃহৎ বাগিচা ছিল। সেনাপতির সহিত যে স্থানে সিপাহীগণ প্রথম অবস্থান করতেন, সেই স্থানকে অদ্যাবধি ধাপ বলা হয়ে থাকে। ঘাঘট নদীর ফকির বকশির ঘাট পার হয়ে ধাপে আসতে হয়। বক্‌শী যদিও সিপাহ্‌সালার আজম ছিলেন, তিনি সেনাবাহিনীর **Pay master general**-ও ছিলেন।

বর্তমান রংপুর যে পূর্বের রংপুর নয় বা ছিল না, তা ১৯৩৪-৩৫ সনের সেটেলমেন্টের মানচিত্র হতে কিছু নাম এখানে সন্নিবেশিত করা হল। মৌজা বড় রংপুর, সিট নং ২, পূর্ব মাহিগঞ্জ ও ছোট রংপুর। মৌজা খোদ্দর্ রংপুর। উক্ত রংপুর নামীয় স্থানগুলি মাহিগঞ্জের পূর্ব এবং দক্ষিণে অবস্থিত। জমিদারী পুরানা কাগজপত্রেও বর্তমান রংপুর শহরকে রংপুর বলা হয় নাই, রাধাবল্লভ মৌজা বলা হয়েছে। স্থানটি মন্হনা পরগনার অন্তর্গত। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর স্বামী নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল স্থানগুলি।

প্রাচীন লোকেরা বর্তমান রংপুর শহরের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাহা হল নিম্নরূপ ঃ

যখন কোর্ট কাছারী প্রথম হয় তখন খড়ের ঘরে আরম্ভ করা হয়। হাকিম সাহেবরা জড়ানো নলে তামাক খেতেন। এ সব যারা দেখেছেন তাদের কথা—ট্রেজারী ঘর প্রথম খড়ের ঘর হয়। পাবলিক লাইব্রেরী ঘর খড় নির্মিত প্রথম ঘর করা হয়। প্রাচীনদের আরও কথা হল যে বিচার যা কিছু পূর্বে মাহিগঞ্জের ঐ দিকে যে রংপুর ছিল সেখানে হত। হাসপাতাল পূর্বে এখানে ছিল না। মাহিগঞ্জ থেকে প্রথম হাসপাতাল নিয়ে আসা হয় ধাপস্হিত ডিমলার কাছারী বাড়ীতে। সেখানে ২ বেড হতে বাড়িয়ে ৪ বেড করা হয়। বর্তমানে সদর হাসপাতাল যেখানে অবস্হিত, সেখানে হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা নিয়ে আসা হয়। তার কয়েক বৎসর পর উক্ত হাসপাতাল ঘরটি প্রথম অবস্থায় খড়ের ছিল। পরে অন্যগুলির মত সব ঘর দালান করা হয়। এই সদর হাসপাতালের সামনে রঙমহলের আমলের কয়েকটি লিচু গাছ অদ্যাবধি রয়েছে। যে সময় রঙমহলে প্রথম বাজার বসে এবং রংপুর কোর্ট-কাছারী, হাসপাতাল প্রভৃতি করা হয়, ঐ

সময়কার রংপুরে যে প্রথম বাজার বসে, সেই সব দোকানদার ও তাদের কার কি দোকান ছিল তার নামের ফিরিস্তি নিম্নরূপ :

বাচ্চা মিয়া, আমান মিঞা, মতিবুল্লা—ইহারা মুদির দোকান করত। দরবারু পানওয়ালা, সোনাউল্যা পানওয়ালা, আবদুল পানওয়ালা, ইজাতুল্যা পানওয়ালা—ইহারা পান, কাঁচা গুয়া এবং মল্লা তামাকের দোকান করত। শ্রীনাথ ডাক্তার, রাধিকা সাহা, নিতাই সাহা, বৃন্দাবন সাহা—এরাও দোকানদার ছিল। উক্ত দোকানদারদের দোকানের নমুনা দেখে সহজে বুঝা যায়, বর্তমান রংপুর শহর একবারে নূতন ভাবে ইংরাজরা পত্তন করেছে। মাড়োয়ারীদের ও অন্যান্যদের বৃহৎ যে সব দোকান ছিল তা তখন অবধি মাহিগঞ্জে বা ঐ সব দিকেই ছিল। একটি কাপড়ের ছোট্ট দোকান পর্যন্ত ছিল না বর্তমান রংপুর শহরে। তা পূর্বের তালিকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আসল কথা হল, অনেক সত্যকে চাপা দেবার জন্য বর্তমান রংপুর শহরের পত্তন করা হয়েছিল। অত্যাচারী হররামের বংশীয় ডিমলার জমিদারদের সহযোগিতায় বর্তমান রংপুর শহরের পত্তন করা হয়। রংপুর সেন্ট্রাল রোডের উত্তর পার্শ্বে বর্তমান শ্মশানের পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে বাঁশঝাড়ের ভিতরে একটি স্থানকে এখনও 'গণ-শহীদ'[১] বলা হয়ে থাকে। বৃহৎ চৌকির মত উঁচু ও লম্বা শান বাধানো একটি স্থান ছিল। ঐ জায়গায় তুলে শত সহস্র দেশপ্রেমিকদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাই স্থানটিকে এখনও 'গণ-শহীদ' বলা হয়ে থাকে। গণ-শহীদের পাশে কূপ ছিল, সেখানে হ্যাংলা কুকুর ছিল। অনেক দোষী ব্যক্তিকে ইংরাজরা উক্ত কূপে নিক্ষেপ করত। কুকুরেরা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলত। যাহোক, ডিমলায় জমিদারদের চেষ্টা ও ইংরাজদের গরজকে মিলিয়ে রঙমহলটিকে শেষ পর্যন্ত রংপুর শহরে পত্তন করা হয়। শ্রীযুক্ত তারাপদ বর্মন, প্যারীমোহন মোহন্ত, সাদাতুল্যা হাজী, মনিরুদ্দীন মিয়া প্রভৃতি সুপ্রাচীন বৃদ্ধরা উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন।

> লালবাগ, (হিন্দী ও পারসী) ভারতীয় মুসলমান রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান। পদ্মরাগ মণির ন্যায় ইহা সর্বদাই উল্লাসে প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়া উহার নাম লালবাগ হইয়াছে। —বিশ্বকোষ

---

[১] গঞ্জ-ই-শহীদানের স্থানীয় ভাষারূপ। কারবালায় গঞ্জ-ই-শহীদান বলে হযরত হুসায়ন ও হযরত আব্বাস ব্যতীত সকল শহীদের জমায়েতী কবর—মাযার রয়েছে। সেই স্মৃতিতেও অন্যান্য স্থানের শহীদানের একত্র মাযারের ঐ নাম।

লালবাগের দক্ষিণ ও পূর্ব পাশ্বে মৃত্তিকা নির্মিত দুইটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। দুর্গের গড় খাই দুটি এখনও রয়েছে।

বাংলা বিশ্বকোষে রংপুর অধ্যায়ে লেখা রয়েছে যে ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ও তার শাখা রংপুর জেলার মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হয়েছে। শ্যামপুর ও রংপুরে যখন প্রথম রেল লাইন ও গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়, তখন শ্যামপুরের দিনা গিদাল (প্রধান গায়ক, তার গানের দোহারদের দেওয়া নাম শামদাস) রেললাইন ও গাড়ী চলাচল সম্পর্কে যে গান রচনা করেছিলেন, তার কিছুটা অংশ এইরূপ ঃ

বাহে চল্লোরে ইংরাজের গাড়ী গুড় গুড়া, গুড় গুড়।
বাহে চলাইছে উচা করিয়া বানাইছে সড়ক তাতে ফেলাইছে শীল,
তারে উপর লোহা দিয়া চলাইছে ইঞ্জিল।
আগে বইসে ড্রাইবার পাছে বইসে গার্ড।
শূন্য দিয়া চলেয়া দিছে টেলিগ্রাফের তার
হাত্তী পাগেলা হইছে সবে বাড়ীত পালেয়া যাও।
এ্যালের সড়কোত কাটা গেল আলা বকসের মাও। ...
বাহে চল্লোরে ইংরাজের গাড়ী গুড় গুড়া, গুড় গুড় বাহে চলাইছে।

স্থানীয় বৃদ্ধগণ বলেন যে, বাংলা ১২৮০ সালে রংপুরের এই সব অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং এই আকাল সম্পর্কে গানে রয়েছে ঃ

সেবার ১২৮০ সালে আকাল পৈল,
গলার সোনা তনু কাল হইল।
যদি ঢালো ঢালো চিড়া ভেসে গেল,
এতদিনে সোনার বন্ধু কোথায় রইল।

ঐ সময় লোকজন দলে দলে রেললাইন বাধার কাজে গিয়েছিল। এর কয়েক বৎসর পর রংপুর শহরের পত্তন ইংরাজরা করে। বর্তমান রংপুর শহর যে একেবারে নূতন তার আরও প্রমাণ হল এই যে, বিশ্বকোষের রংপুর সদর মহকুমায় যে থানাগুলির নাম দিয়েছে তাহা নিম্নরূপ—মাহিগঞ্জ, নিশবেতগঞ্জ, কুমারগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও পীরগঞ্জ (বিশ্বকোষ)। লেখার সময় পর্যন্ত যদি বর্তমান কোতওয়ালী থানা থাকত, তবে তাহা অবশ্যই লেখা হত। এখানে মাহিগঞ্জ ও নিশবেতগঞ্জ থানার উল্লেখ রয়েছে। মাঝখানে থাকলো রংপুর শহর। মাহিগঞ্জ হতে নিশবেতগঞ্জের দূরত্ব ৫/৬

মাইল হবে। যাহোক, বিশ্বকোষে 'রংপুর অধ্যায়' লেখার সময় পর্যন্ত রংপুর শহরের পত্তন হয়নি বলে মনে হয়। যদি হত তবে অবশ্যই সেখানে নগরের শান্তি রক্ষার জন্য থানা থাকত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমান রংপুরের পূর্বদিকে মাহিগঞ্জ থানা বলে একটি থানা রয়েছে। মধ্যখানে রংপুর শহরের থানা নেই। সুতরাং ঐ সময় নূতন শহরের পত্তন হয়নি। মাহিগঞ্জ পুরানা শহর। সেখানে থানা রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

নিশবেতগঞ্জ একটি পুরানা কারবারী বাণিজ্য স্থান ছিল। সুতরাং সেখানেও একটি থানা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশ্বকোষে রংপুর অধ্যায় লেখার সময় অবধি বর্তমান রংপুর শহর ছিল না। যে সময় নূতন রংপুর শহর পত্তন করা হয়, সম্ভবত ঐ সময় কোতওয়ালী রংপুর সদর থানার পত্তন করা হয়। এরপর মাহিগঞ্জ থানা ও নিশবেতগঞ্জ থানা দুটি তুলে দেওয়া হয়। কোতওয়ালী থানার জন্ম বছরে রঙমহলের উপরে নূতন শহর রংপুরের পত্তন করা হয় বলে মনে হয়। কোতওয়ালী থানার অন্তর্গত ঐ সময়ের দলীল দস্তাবেজ অনুসন্ধান করলে রংপুর—এই নূতন শহরের পত্তন কোন্ সালে হয়েছে, তার হদিস পাওয়া যেতে পারে। পাবলিক লাইব্রেরী ও সদর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার যে সাল লেখা রয়েছে, উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটির গায়ে তা পূর্বের মাহিগঞ্জের পূর্ব রংপুরের লাইব্রেরী ও হাসপাতাল পত্তন হওয়ার তারিখ বলে মনে হয়।

ছড়াগানে দেখতে পাওয়া যায় বাং ১৩০৪ সালে ভীষণ আকারের ভূমিকম্প রংপুর অঞ্চল ব্যাপিয়া হয়েছিল। মাহিগঞ্জে ভূমিকম্পে বিরাট বিরাট গহ্বর হয় এবং তা হতে ভীষণ বেগে নীচ হতে পানি উঠতে থাকে। লোকে কলাগাছের ভেলায় চড়ে এদিক-সেদিক যাওয়া-আসা করেন। বহু পুরানো অট্টালিকা ও নূতন দালান-কোঠা ভেঙে পড়ে যায়। রাজা গোলাম লাল রায়ের পিতা মহারাজ গোবিন্দ লাল রায় উক্ত ভূমিকম্পে ভীষণভাবে আহত হয়ে মারা যান। যাহোক, ভূমিকম্পের কয়েক বছর পূর্বে অথবা ভূমিকম্পের পরপরই রংপুর নূতন শহরের পত্তন ইংরাজরা করতে পারে। ছড়াগানে উক্ত ভূমিকম্প সম্পর্কে এটা জানা যায়, "সন ১৩০৪ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার ভাই, বেলা বৈকালে ভুঁই কম্প হইয়াছে।"

রংপুর সদর হাসপাতালের রাস্তার পার্শ্বে প্রায় বছর তিনেক হল একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আপনা হতে উপড়ে পড়ে যায়। গাছটি পড়ে যাওয়ার পর দেখা

গেল কপাটের ৫টি লোহার হাঁসুলি গাছের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। ইট সুরকির সঙ্গে আটকিয়ে রেখেছিল উক্ত পাঁচটি লোহার হাঁসুলি। প্রাচীনরা বলেন, গেটের উপরে উক্ত বটগাছটি জন্মায় এবং পরে দালান, গেট ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর গাছের সঙ্গে গেটের ঐ অংশ আটকিয়ে ছিল। গেটের উক্ত এক পার্শ্বের লোহার হাঁসুলি পাঁচটি শহরের শত শত লোক প্রত্যক্ষ করেছেন।

ইংরাজরা কীর্তি-সমন্বিত স্থানগুলিকে শালবনে আচ্ছাদিত করবার জন্য শালবনের পত্তন করেছিল। এখনও জমিদার বরোদা সুন্দরীর বাড়ীর পাশে শালবন নামক পাড়ায় কয়েকটি শালগাছ দেখতে পাওয়া যায়। এটা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের কুকীর্তির এক নিদর্শন মাত্র।

নবম পরিচ্ছেদ

আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ

১৮৫৭ সালের বিপ্লব-বহ্নি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ চরম নিষ্ঠুরতার সহিত নিবারণ করে; ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে তারা শক্তিশালী করে, ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার সহিত শাসন-তন্ত্র পরিচালনা করিতে থাকে। ইতিহাসের নিম্নোক্ত কথাগুলি হতে তা বোঝা যাচ্ছে ঃ

> কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে নিরাপদ করতে একমাত্র সেনাবিভাগের পুনর্গঠনই যথেষ্ট নয়। দেশীয় ভিত্তিটাও সঙ্গে সঙ্গে শক্ত করা চাই। ১৮৫৮ সালের মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা বাক্য বিন্যাস ছেঁটে কেটে আসল কথাটা দাঁড়ায় এই যে, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদকে শক্তিশালী করাই গভর্নমেন্টের নিরাপত্তা।—আঠারো শ' সাতান্নের বিদ্রোহ,
>
> শ্রী অশোক মেহতা প্রণীত, পৃঃ ৮৮

ইতিহাসে এও দেখা যায় যে, ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের প্রসার ঘটেছিল, তদ্রূপ দেশীয় রাজন্যবর্গ যদি বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকদের সহিত সহযোগিতা করত, তবে খড়কুটার মত ইংরাজ শাসককে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। এসব কথা শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক ইংরাজ লেখকের কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। ১৮৫৭-৫৯ সালে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ বা এর আশেপাশের স্থানগুলিতে উক্ত বিপ্লবের সময় যেসব ভূস্বামী ইংরাজদের বিরোধিতা করেছিল, তারাও ইংরেজদের কাছে নত হওয়ায় তাদের জমিদারী ফেরত তো দিলই, এমনকি পূর্বের শর্ত থেকেও অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হল। এসব অপরাধী জমিদারদের, সম্ভবত মুসলমান জমিদারদিগকে, ইংরাজরা এই সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল। কারণ হিন্দু-প্রধান এলাকায় মুসলমান জমিদার, মুসলমান প্রধান এলাকায় হিন্দু জমিদার ইংরাজরা পত্তন করেছিল। রাজা ও ভূস্বামীগণ বিদেশী সরকারের চৌকিদারের কার্য করত বললে অত্যুক্তি হয় না। এ সম্পর্কে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে কিছুটা উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল ঃ

> স্যার জন ষ্ট্রাচী তাঁর 'ইণ্ডিয়া' পুস্তকের ২৫০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বিদ্রোহের পরে ইংলেণ্ড ও ভারতে ব্রিটিশ অফিসারদের মধ্যে

> প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের প্রসার ঘটেছে দ্রুতবেগে।" দেশীয় রাজন্যবর্গ বিদ্রোহ দমনে প্রভূত সাহায্য করেছেন। ক্যানিং তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে লিখলেন, "দেশীয় রাজন্যবর্গ যদি বিদ্রোহের বন্যায় যোগ দিত, তবে ভারতে ইংরাজ শাসককে খড়কুটার মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত। দেশীয় রাজন্যদের জিইয়ে রাখা ভারতে বৃটিশ কর্তৃত্ব রক্ষার প্রথম উপকরণ।
>
> —পি. ই. রবার্টস লিখিত ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৮৮

শুধু দেশীয় রাজারা নয়, জমিদারেরাও ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় লাভ করলেন। ভারত গভর্নমেণ্ট বিলাতে ভারত সচিবকে লিখলেন (১৮৫৯):

> এদেশের ভূম্যাধিকারীর দল সৃষ্টি করার গুরুত্ব এত বেশী যে, তার জন্য আমাদের যদি আর্থিক কিছু ক্ষতিও ঘটে, তাও স্বীকার করা প্রয়োজন।
>
> এই নীতির অনুসরণে একদা লর্ড ক্যানিং যাদের "অত্যন্ত সাধারণ লোক, না আছে বংশ গৌরব, না আছে বিচক্ষণতা, না আছে জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ" বলে অবজ্ঞা করেছিলেন সেই তালুকদারদেরই অযোধ্যায় জমিদারীর বন্দোবস্ত দেওয়া হলো। এমন কি এদের মধ্যে অনেকে বিদ্রোহে অংশগ্রহণও করেছিল। তা সত্ত্বেও এদের ১৮৫৬ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক শর্তে জমিদারী দেওয়া হলো।

বাংলাদেশে ১৮৫৭ সালের পূর্বে এবং পরবর্তীকালে অনেকের সম্পত্তি বিশেষ করে মুসলমানদের সম্পত্তি, ইংরাজ শাসকগণ ব্যাপক হারে বাজেয়াপ্ত করেছিল। বাংলার মুসলমানদের পূর্ববর্তী সময়গুলিতে আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতা কিরূপ ছিল, তা নিম্নোক্ত লেখা হতে পরিষ্কার একটি ধারণায় আসা যাবে:

> এখন বাংলার কথায় আসা যাক। আকবরের সময় সুবে বাংলা বারো ভূঞার অধীন ছিল। দিল্লী সরকারের নির্দিষ্ট কর দিয়া তাঁহারা প্রায় স্বাধীন হইয়া দেশ শাসন করিতেন। বারো ভূঞাদের মধ্যে যাঁহারা দিল্লীর এই সীমিত অধীনতা অস্বীকার করেন (যেমন রাজা প্রতাপাদিত্য) তাঁহাদের বিশেষ নাজেহাল হইতে হয়। এই সকল ভূঞাদের মধ্যে হিন্দু থাকিলেও মুসলমানদের সংখ্যা ছিল স্বভাবতই বেশী, আর তাঁহারা জাতিতে ছিলেন পাঠান। 'মোগল-পাঠান' এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছে,

> 'মোগল পাঠান খেলা' শৈশবে পল্লী গ্রামেও দেখিয়াছি। উভয়েই যুদ্ধ ধুরন্ধর। কাজেই, একের পক্ষে অন্যকে একেবারে ঘায়েল করা কখনই সম্ভব হয় নাই। বুদ্ধিমান আকবর বাদশাহ তাই অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।
>
> গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার আয়োজন হইলে দেখা গেল, বাংলাদেশে ভূমির দুই-তৃতীয়াংশ এবং ইহার বৃহত্তর অংশের ভোগ দখলকার মুসলমান সমাজ।
>
> —বঙ্গের নবজাগৃতি ও মুসলমানঃ যোগেশচন্দ্র বাগল, ৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা; ভাদ্র ১৩৬৬ সাল 'বসুধারা, পৃঃ ৬১৯

অথচ ১৮৪৫ সালের পর হতে মুসলমানরা জমিদার ও নিষ্কর ভূমির মালিক না থেকে সরাসরি ইংরাজ-সৃষ্ট নূতন ভূস্বামীদের অধীন হয়ে পড়ে। বৃটিশ আমলের শেষের দিকে বাংলার মফস্বলগুলিতে মুসলমানদের মেলা-পার্বণে যেমন—মহররমের তাজিয়ার মেলা লক্ষ্য করলে এদের সীমা-হীন দারিদ্র্যের কথা আপনা হতে চোখে পড়তো।

সাবাস আন্দামান জয়ী আমির খাঁ। দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী শের খাঁ। সাম্রাজ্যবাদী বড়লাট লর্ড মেয়োর হত্যাকারী আমির খাঁ ওরফে শের খাঁ। লর্ড মেয়োকে আন্দামানে হত্যা করা যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হয়েছে, তা অত্যাচারের বর্ণনাগুলি হতে পরিষ্কার বোঝা যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ বার বৎসর পূর্বে প্রশমিত হইলেও নির্বাসনের জের এখনও সমানভাবে চলিতেছিল। বিশাল ভারতে সে সময় এমন কোন বন্দী-শালা ছিল না, যেখানে তিল ধারণেরও স্থান করা সম্ভবপর বিবেচিত হইত না। সুতরাং জেলে স্থান সংকুলানের জন্যই আন্দামানে আরও কয়েক সহস্র মুসলমান দেশপ্রেমিককে পাঠাইবার প্রশ্ন খুব বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। ন্যূনপক্ষে যাহাতে আরও বিশ সহস্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দেশপ্রেমি-ককে আন্দামানে পাঠান যায় এবং সংগে সংগে তাঁহাদের শায়েস্তা করিবার জন্য নিযুক্ত ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের নিরাপত্তার সুব্যবস্থাও করা হয়, বড়লাট সে জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন। নিকৃষ্ট জীব বলিয়া সরকার অভিহিত ইসলামের এই সুসন্তানগণের জন্য সরকারী তহবিল হইতে বৎসর বৎসর যাহাতে বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে না হয়, সে প্রশ্নও বড়লাটের মনে সদা-জাগ্রত ছিল। তিনি ইহাদিগকে তথায় স্বাবলম্বী করিয়া তোলার কথাও চিন্তা করিতেছিলেন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া লর্ড মেয়ো আন্দামান শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিলেন। ইহার ফলে বৎসরে সাড়ে চারি লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস পাইবে অনুমিত হয়। এই ব্যয়-হ্রাসের দরুন মৃত্যুর হার তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিনা জানা যায় না। নূতন ব্যবস্থা যথোচিতভাবে কার্যকরী হইয়াছে কিনা, স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্য লর্ড মেয়ো ১৮৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে বার্মার পথে আন্দামান যাত্রা করেন। বার্মা পরিদর্শনের পর ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে 'গ্লাস্‌গো' নামক রণতরীখানি তাঁহাকে লইয়া আন্দামানের 'হোপ টাউনে' নোঙ্গর করে। 'ঢাকা' নামক জাহাজখানিও উহার পার্শ্বে অবস্থান করিতে থাকে। লর্ড মেয়ো সারাদিন ভাইপার ও রসদ্বীপ পরিদর্শনে অতিবাহিত করেন। এই দুইটি দ্বীপে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আটক ছিলেন। পাছে এই নিরস্ত্র কয়েদীগণ হস্ত দ্বারা না হোক, মুখেও তাঁহার প্রতি কোন অসৌজন্য প্রকাশ করেন,এ জন্য ইহাদিগকে অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করিয়া এমন সব জঘন্য কার্যে এমনভাবে নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল, যাহা চিন্তা করিলে যে কোন সভ্য জাতির মাথা আপনা হইতে হেট হইয়া আসে। কয়েদীগণকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রাখিবার জন্য এই উপলক্ষে সৈন্য-সামন্ত ও পুলিশের যে বিরাট মহড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা পরিদর্শনে লর্ড মেয়ো মনে মনে লজ্জানুভব করিয়াছিলেন কিনা, তাহা তিনি ব্যক্ত করিবার অবসর পান নাই। হতভাগ্য দেশপ্রেমিক কয়েদীগণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্রগুলি পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি এবং সৈন্য-সামন্তের অহেতুক কড়াকড়ির জন্য লর্ড মেয়োর হাতে ব্যক্তিগতভাবে পেঁছাইতে না পারিয়া জেল কর্তৃপক্ষের হাতেই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ইহারা এমনই কপাল-পোড়া যে, অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হওয়া দূরের কথা, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর হইতে জীবনের অবশিষ্ট কাল ইহাদিগকে যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

পাঁচটার সময় লর্ড মেয়ো পূর্ব নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণের কার্য সমাপ্ত করেন। হোপ্ টাউন জেটি হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত সহস্র ফিটের অধিক উচ্চ মাউন্ট হেরিয়েট নামক পর্বতশৃঙ্গে কয়েদীগণের জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করা যায় কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে

জাগ্রত হয়। বন্দীশালায় সুপারিনটেণ্ডেন্টকে ডাকিয়া তিনি বলেন, "সন্ধ্যা হইতে এখনও একঘণ্টা বাকী। চলুন, আমরা মাউন্ট হেরিয়েটে আরোহণ করি।" জেল সুপার সঙ্গে সঙ্গে হোপ টাউন জেটিতে প্রচুর প্রহরী আমদানী করেন। লর্ড মেয়োর দলের অনেকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেও তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য সকলে জঙ্গলের ভিতর দিয়া আবার তাঁহার সঙ্গে মাউন্ট হেরিয়েটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ পূর্বক লর্ড মেয়ো তাহা উত্তম রূপে পরীক্ষা করিলেন, তারপর একটু উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই সকল দ্বীপে বিশ লক্ষ কয়েদীর স্থান সংকুলান হইতে পারে।"

পাহাড়ের চূড়ায় অন্ধকার নামিয়া আসিলে লর্ড মেয়ো সদলবলে হোপ টাউন রওয়ানা হন। অর্ধপথে মশালধারী প্রহরী ও সরকারী কর্মচারিগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। জেটির নিকটবর্তী হইলে 'গ্লাসগো' 'স্কসিয়া' ও 'ঢাকা' এই জাহাজ তিনখানির আলোকমালা তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অদূরে 'নেমেসিস্' নামক জাহাজে কয়লা বোঝাই হইতেছিল। উহাও আলোকমালায় সুশোভিত করা হইয়াছিল। জাহাজের ঘণ্টার শব্দে বুঝা যায়, তখন মাত্র সাতটা বাজিয়াছে। জেটি হইতে বড়লাটকে জাহাজে লইয়া যাইবার জন্য একখানি লঞ্চ তথায় অবস্থান করিতেছিল। জেটির শেষ প্রান্তে উহার নাবিকেরা তখন খোশগল্পে মশগুল। জেটির বাম পার্শ্বে বেশ খানিক দূর পর্যন্ত অনেকগুলি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড মাথা উঁচু করিয়া ইতস্ততভাবে অবস্থিত ছিল। বড়লাট সদলবলে জেটির উপর দিয়া উহার শেষ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার অতি নিকটে ছিলেন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী জেল সুপার, 'গ্লাসগো' রণতরীর ফ্ল্যাগ লেফ্‌টেন্যাণ্ট ও ইঞ্জিনিয়ারদের জনৈক কর্নেল। তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে সশস্ত্র পুলিশ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিল। জেটি হইতে লঞ্চে অবতরণের জন্য যে সিঁড়ি বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, লর্ড মেয়ো উহার সোপানে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত প্রস্তর খণ্ডগুলি অতিক্রম করিয়া একটি লোক তড়িৎ বেগে পশ্চাদ্দিক হইতে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। দলের একজন কি দুই জন টর্চের আলোকে শুধু একখানি হাত এবং একখানি ছোরা দেখিলেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী একটি ধপাস শব্দ শুনিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, একটি লোক বড়লাটের পৃষ্ঠদেশ শক্তভাবে আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। মুহূর্ত মধ্যে প্রায় পনরজন লোক

আততায়ীর উপর আপতিত হইল। জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী তাহাদিগকে ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাড়াহুড়ায় মশাল নিবিয়া গিয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল, বড়লাট হাঁটু পানিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছেন এবং স্বীয় ললাট হইতে চুল সরাইয়া লইতেছেন। তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী এ সময় তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে তীরে উঠিতে সাহায্য করিলেন। বড়লাট তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "কোন লোকে আমাকে আঘাত করিয়াছে।" পরক্ষণে সকলে শুনিতে পান এমনভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি ভালই আছি, আমার মনে হয় না যে, সাংঘাতিকভাবে কোন আঘাত পাইয়াছি।" 'জেটির পার্শ্বে একখানি গো-শকট ছিল। লর্ড সেখানে পা দুইটি ঝুলাইয়া রাখিয়া তাঁহাকে উহার উপর বসান হইল। পরমুহূর্তে তাঁহাকে উহার উপর শোয়ান হইলে সকলে দেখিতে পাইলেন, তাহার পরিহিত হল্‌কা কোটের পৃষ্ঠভাগে একটি কালো বর্ণের ছিদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। রক্ত তখনও নির্গত হইতেছিল। সকলে আপন আপন রুমালের সাহায্যে রক্ত বন্ধের চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। লর্ড মেয়ো অনুমান দুই মিনিটের জন্য গাড়ীর উপরে একেবারে সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর পিছন দিকে হেলিয়া পড়িয়া গেলেন। "আমার মাথাটা উঁচু করিয়া ধর"—অস্ফুট স্বরে এই কথা কয়টি বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তিনি জীবিতই আছেন—এই বিশ্বাসে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে সকলে লঞ্চে লইয়া গেলেন। জাহাজের পাটাতনের উপর শোয়াইয়া দলের লোকজন তাঁহার হাত-পা মর্দন করিতে লাগিলেন। ইহাদের কেহ কেহ তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেহে প্রাণ নাই, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার তাঁহারা সাহস পাইতেছিলেন না।

তিনজনে তাঁহার মাথাটি তখনও উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এ সময় জাহাজে আটটার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। লঞ্চখানি 'গ্লাসগো' রণতরীর নিকটবর্তী হইলে উহার আলোগুলি নির্বাপিত করিয়া দেওয়া হইল। অতি সন্তর্পণে তাঁহারা লর্ড মেয়োকে তাঁহার কেবিনে লইয়া গিয়া খাটের উপর শয়ন করাইলেন। তখন সকলের বিশ্বাস জন্মিল তিনি আর ইহজগতে নাই।"

'গ্লাসগোর' ডাক্তারগণ- বারংবার মৃতদেহ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু উহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিলেন না। পরীক্ষায় মাত্র এতটুকু দেখা গেল,

আততায়ীর একই ছোরার দুইটি আঘাত বড়লাটের স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া বক্ষ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি আঘাতেই যে কোন লোকের মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাঁহারা এই অভিমত প্রকাশ করেন।"

"ভোর বেলায় যখন 'গ্লাসগোর' পতাকা অর্দ্ধনমিত অবস্থায় তাঁহাদের নযরে পড়ে, তখন সর্বপ্রথম তাঁহারা বুঝিতে পারেন, লর্ড মেয়ো সত্যই নিহত হইয়াছেন।"

—সেকালের কাহিনী ঃ মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ্ প্রণীত,
পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময়কার লিখিত ইতিহাস ইংরাজদের অনেক লেখা রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় লোকদের লিখিত ইতিহাস খুব সামান্যই লিখিত হয়েছিল, যার জন্য দেশীয় লেখকদের ইতিহাস হতে প্রমাণ করবার জন্য একাধিক উদ্ধৃতি কোন কোন লেখকের আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে বাধ্য হয়েছি। এতে লেখার সৌষ্ঠব না বাড়লেও প্রমাণের সুবিধা হবে বলে তাহা আমরা অনেক সময় করেছি ও করব। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে অনেক স্থানে বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও বিপ্লব-অগ্নি জাতীয়তার রূপ নিয়েছিল, এ কথা নিম্নের উদ্ধৃতি হতে বোঝা যাবে ঃ

> দেশের কোন কোন অংশে বিদ্রোহ গণ-বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। জি. বি. ম্যালেসন তাঁর 'হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি' বইতে লিখেছেন, "আমাদের সাম্রাজ্যের চারটি প্রধান প্রদেশে অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড, সাগম ও নর্মদা অঞ্চলে জনসাধারণের বেশীর ভাগ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। পশ্চিম বিহার পাটনা বিভাগের অনেকগুলি জেলায় আগ্রা ও মিরাট বিভাগে গণ-বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ প্রায় একই সময় সংঘটিত হয়েছে।
>
> সমগ্র রোহিলাখণ্ডে বিদ্রোহ ঘটল একদিনে। বেরিলী, শাজাহানপুর, মোরদাবাদ, বুদাওন ও অন্যান্য জেলা শহরে পুলিশ, সৈন্যদল ও নাগরিকেরা একযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং প্রহরের মধ্যেই ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটালো। এর জন্য এক ফোঁটা রক্তপাত হয়নি। "রোহিলাখণ্ড পরাধীন" একথা না বলে সবাই বলল "রোহিলাখণ্ড স্বাধীন" এবং সবাই দেখল বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সত্যি সত্যিই স্বাধীন হল (ডি. ডি. সাভারকার লিখিত ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স)।

ভারতের অন্যত্র সবাই ভাবলো রোহিলাখণ্ডে যা সম্ভব, অন্য জায়গায়ও তা নিশ্চয়ই সম্ভব।

যমুনার পশ্চিম তীরে কয়েকজন প্রতিপত্তিশালী দেশীয় রাজা তাঁদের প্রজাদের বৃটিশ শাসনের প্রতি অনুগত রেখেছিল। কিন্তু দোয়াব গ্রামের লোকেরা এবং গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী জনসাধারণ অধীনতার বন্ধন ছিন্ন করেছিল। **J. K. Kaye** তাঁর ইণ্ডিয়ান মিউটিনি গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

শুধু গঙ্গার ওধারের জেলাগুলিতেই নয়, দুই নদীর মধ্যবর্তী সমুদয় গ্রামের লোকেরাও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সকল অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে এমন একটি প্রাণীও ছিল না, যে আমাদের বিপক্ষে রুখে না দাঁড়িয়েছে।

অযোধ্যার সিপাহীরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যে জেলায় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে সে জেলাই ইংরাজদের হাতছাড়া হয়েছে :

৪ঠা থেকে ১৪ই জুন—এই দশ দিনের মধ্যেই অযোধ্যা থেকে ব্রিটিশ শাসন স্বপ্নের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সেনাদল বিদ্রোহ করতেই জনসাধারণ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু কোন অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা করেনি তারা।—জি. ডব্লিউ ফরেস্ট লিখিত
'এ হিস্ট্রি অব দি ইণ্ডিয়ান মিউটিনি,' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭

স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে অযোধ্যার নর-নারী নূতন উন্মাদনা বোধ করল। দেখতে দেখতে এক লক্ষ লোক অস্ত্র ধারণ করল। সিপাহীরা তো ছিলই। প্রায় পনেরশ' দুর্গ ছিল এই অযোধ্যা প্রদেশে। বিদ্রোহীরা অনেক গ্রামকেও অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করল।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার ভূস্বামীরা ইংরাজ গভর্নমেণ্টের আনুকূল্যে কি পরিমাণ লাভবান হয়েছিল' ভূমি রাজস্বের হিসাব এবং জমিদারদের আয়ের অংক দেখলে তা সহজে বুঝতে পারা যাবে। বাংলার এই সব জমিদার ১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানের মহারাজার অধিনায়কত্বে বড়লাটকে যে পত্র লিখেছিলেন, সে সব বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমরা ভুলি নি। এখানে সেই পত্রের কিছুটা উল্লেখ করা হল।

১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানের মহারাজা মেহতাব চন্দ্রের অধিনায়কত্বে বাংলার জমিদাররা বড়লাটের কাছে লিখেছিলেন। পত্রে লেখা ছিল :

---

[১] আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ২৯-৩১, শ্রী অশোক মেহতা।

বাংলার যুবা, বৃদ্ধ, শিশু—সবাই ব্রিটিশ শাসকদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজকে এমনভাবে জড়িয়েছে যে, যে সকল এলাকায় উন্মাদগামী বিদ্রোহীরা সুবিধা পেয়েছে সে সকল স্থানেই তারা তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে।

এই কায়েমী স্বার্থীরা ব্রিটিশকে যে সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছে, তা প্রতিরোধ করবার একমাত্র উপায় ছিল দেশের কিষানদের জমিদার ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ানো। সেদিকে মোটেই চেষ্টা হয়নি। কারণ বিদ্রোহের নেতৃত্বই ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তারা বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে যে আবেদন জানিয়েছেন, তার মধ্যে কিষানদের কোন উল্লেখ ছিল না। ইস্তাহারে আর সব শ্রেণীর, লোকদেরই আহবান করা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদে কে কি সুবিধা লাভ করবে সব কিছুরই উল্লেখ ছিল। ছিল না শুধু চাষীদের কথা, যারা লাঙ্গল নিয়ে মাটির বুক চিরে ফলায় ফসল, যোগায় অন্ন, আনে সমৃদ্ধি। তারা ছিল সকলের অবজ্ঞাত। বরং বিদ্রোহ সফল হলেই তাদের বোধ হয় অধিকতর শোষিত ও উৎপীড়িত হওয়ার আশংকা ছিল। কিষানদের সহযোগিতা লাভ করতে না পারাটাই বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।[১]

১৮৫৭ সালের ডিসেম্বর অর্থাৎ বিদ্রোহের গোড়ার দিকে সম্ভবত কলকাতায় বর্ধমানের রাজা মেহতাব চন্দ্রের নেতৃত্বে বড়লাটকে সভা করে পত্র লিখে তাই নয়। এই সব সভা করে জমিদাররা তাদের শক্তিমত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের সমস্ত রকম শক্তি ও সাহায্য যোগান। এই সব জমিদার এবং এদের নায়েব গোমস্তা ইত্যাদি শুধু যে বিদেশী শক্তিকে সাহায্য করেছে তাহা নহে। এরা সাম্প্রদায়িকতা, বিশেষ করে মুসলমানদের অস্পৃশ্য অশুচি করে রেখেছিল, এ কথা কোন সংকোচ না করে বলা যায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দু ব্যতীত অন্যান্য হিন্দুদেরও এরা মুসলমানদের মত নিকৃষ্ট জীব বলে মনে করত এবং সেই ভাবে ব্যবহারও করত তাদের সঙ্গে। অবশ্য উদারপন্থী জমিদার নায়েব-গোমস্তা যে ছিল না এমন নয়। তাদের সংখ্যা বুদ্বুদের মত ছিল বলা যায়। অশোক মেহতাজী ঠিকই বলেছেন। কিষানদেরকে বা কৃষক সমাজকে সাতান্ন সালের বিদ্রোহে তাদের স্বার্থ উদ্ধার

---

[১] আঠারো শ' সাতান্নের বিদ্রোহ, পৃঃ ৭৪-৭৫, শ্রী অশোক মেহতা।

করবার জন্য ডাক দেওয়া হয়নি। বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য এই কারণটি যে বড় ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সামন্তবাদী বলে তাদের উপর দোষারোপ করা যায় না, এটি তাদের একটি ভুল ছিল সন্দেহ নেই। তবে তাদের ধারণা এও হতে পারে যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা-এ দেশ হতে চলে গেলে কৃষক ও অন্যান্য লোকদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা আবার করা হবে। এইরূপ ধারণাও হয়ত বিদ্রোহী নেতাদের অনেকের মধ্যে ছিল বলে ধারণা করা যেতে পারে। উপরন্তু ইংরাজ শাসক ও তাদের এতদ্দেশীয় চাকর গোয়েন্দাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অত্যন্ত গোপনে কার্যাদি করতে হয়েছে। হয়ত সে জন্য কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য করাটা সম্ভব নাও হতে পারে।

সিপাহী বিপ্লবের পরে মুসলমানদের সংস্কৃতি সভ্যতা একরূপ ধ্বংস হয়ে গেল এবং কলকাতা-কেন্দ্রিক হিন্দু সংস্কৃতি, সভ্যতা আরও বেশী জোরদার হয়ে উঠলো। যার ফলে হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ব্যবধান গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মাধ্যমে। এমন নির্লজ্জভাবে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কলকাতা ব্যতীত আর কোথাও এ ধরনের সভা করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সমর্থন করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইংরেজের রাগটা বেশীর ভাগ পড়ল মুসলমানদের উপরে। পরবর্তীকালে যিনি ফিল্ড মার্শাল লর্ড-রবার্টস হয়েছিলেন, সেই ক্যাপটেন রবার্টস লিখেছিলেন, 'বজ্জাত মুসলমানদের আচ্ছা করে দেখিয়ে দাও যে ভগবানের কৃপায় ইংরেজই এ দেশের হর্তা কর্তা বিধাতা।' দোষী-নির্দোষীর কোন বাছ-বিচার ছিল না। সৈয়দ আহমদের মত নির্জলা ব্রিটিশ ভক্তের পরিবারও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায়নি। (জি. এফ. আই. গ্রেহাম লিখিত 'সৈয়দ আহমদ খান,' পৃঃ ২৭—২৮)। কবি গালিবের একটি লেখাতে এই ভয়াবহ সন্ত্রস্ত আবহাওয়ার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়ঃ

> শহর হো গৈ সাহারা। শহর মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উর্দু বাজার গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। উর্দু ভাষা আর বলবে কে? দিল্লী আর সে মহানগরী নেই, তার দুর্গ, তার শহর, তার দোকানপাট, তার ফোয়ারা—সব কিছুই গিয়েছে। হিন্দু মহাজনেরা আছে, কিন্তু ধনী মুসলমান আর

> নেই বললেই হয়। চেনাজানাদের মধ্যে এত লোককে হত্যা করা হয়েছে যে আজ যদি আমার মৃত্যু ঘটে, শোকে চোখের জল ফেলবে এমন কেউ আর বড় নেই।

সে সময় দিল্লীতে সবার মনেই যে বিপদ ও অনিশ্চয়তার ভয় বর্তমান ছিল তার প্রমাণ মিলবে নিম্নোদ্ধৃত লেখাটিতে ঃ

> মুসলমানেরা শুধু যে বিদ্রোহের মধ্যেই বেশী অংশ গ্রহণ এবং তার ফলে ব্রিটিশের হাতে বেশী নির্যাতন সহ্য করেছে তাই নয়, তারা অনেকদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের প্রতি বিরুদ্ধতা বজায় রেখেছে। নানাভাবে তারা এই ব্রিটিশ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে, নানা স্থানে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। সিতানা ও পাটনায় এই ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি ছিল।

মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণেও বিরোধিতা করেছে। তার ফলে ক্রমশ তারা ইংরেজের সরকারী চাকুরী ও অর্থকরী বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। হিন্দুরা ধীরে ধীরে পশ্চিমের শিক্ষা-সভ্যতা ও ভাবধারাকে গ্রহণ করেছে; কিন্তু মুসলমানেরা নিজেদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রাচীন বিশ্বাসকে আঁকড়ে রয়েছে দীর্ঘ কাল। দিল্লীতে মুসলিম শাসনকালে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, বিদ্রোহের ফলে তা একেবারে মুছে গেল। ১৮৫৮ সালের ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার জানুয়ারী-জুন সংখ্যায় জনৈক প্রবন্ধ লেখক লিখেছেন ঃ

> পাঁচ বছর আগে আমি দিল্লীতে গিয়েছিলাম, সেখানে মুসলিম পত্রিকার সংখ্যাধিক্য দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। বিদ্রোহের পরে ব্রিটিশ যখন দিল্লী বিধ্বস্ত করল, তখন আর তার কিছুই অবশিষ্ট রইল না। সংস্কৃতির কুসুম শুকিয়ে ধুলায় ঝরে পড়ল। 'জাকাউল্ল্যা অব দিল্লী' গ্রন্থে সি. এফ. এণ্ডরুজ লিখেছেন, "বিদ্রোহের এক বছর পর পর্যন্ত দিল্লীর উপর দিয়ে যে মরণ-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব গিয়েছে তাতে সংস্কৃতির আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রইল না। সে আঘাতের জের মুসলিম শিক্ষা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।
>
> অন্যদিকে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থানের পীঠ ছিল কলকাতায়। সেখানে বিদ্রোহের ঝড় বয়নি, 'তার রুধিরাক্ত বন্যার প্লাবন থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, তার ধন-সম্পত্তি জনপ্রাণী রয়েছে অক্ষত, তার সংস্কৃতি রয়েছে অনাহত।
>
> এর ফলেই হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ব্যবধান

গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। ব্যবধান অপ্রীতির সন্দেহের এবং তিক্ততার। আজ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন যে সাম্প্রদায়িক কলহের দ্বারা কণ্টকিত তা সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী কালের উত্তরাধিকার। বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অবসান ঘটলো। অদৃষ্টের পরিহাস, ঠিক একই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গ-ভূমি থেকে তৈমুর লঙের বংশধরগণও অদৃশ্য হলেন চিরতরে।১

১৮৫৭ সালের বিপ্লবে মুসলমানরা সংখ্যায় অধিক যোগ দিয়েছিলেন বিদ্রোহে এবং অধিকাংশ নেতৃত্বও ছিল তাদের হাতে। এ কারণে এ কথা বলা যায় যে, ১৮৫৭ সাল এবং তার পূর্ববর্তী বিদ্রোহগুলির সময়কালে মুসলমানরা শিক্ষায়, অর্থে এবং সামরিক দিক দিয়ে সুস্থ-সবল ছিল। এই কারণে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত; ধন-দৌলত লুণ্ঠন অত্যাচার ও হত্যার বলি মুসলমানদিগের অধিক পরিমাণে সইতে হয়। দিল্লীর ভয়াবহ ধ্বংসকারী চিত্রের মধ্যে সেখানকার অসাম্প্রদায়িক শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস, এমনকি লুপ্ত হয়ে যায় বলা চলে। কলকাতাকে কেন্দ্র করে বর্ণ হিন্দুদের আগ্রহে শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশের হাতের আধুনিকতাকে সম্বল করে। তবে ইউরোপ তো দূরের কথা, খোদ ইংলণ্ডের ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করলেও ইংলণ্ডের মত অসাম্প্রদায়িক উদার শিক্ষা কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বলা যায় কি?

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা অপর দেশে যাই করুক, নিজেদের দেশে তারা উদার জাতীয়তাবাদের পত্তন করেছিল এবং তাকেই তারা নানা ধারায় নানাভাবে লালিত-পালিত ও বর্ধিত করে তুলেছিল। দুঃখের বিষয় হলেও এ কথা বলতে পারা যায় যে, কলকাতা-কেন্দ্রিক যে শিক্ষা তা সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষ করে মুসলমান বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে বর্ধিত হয়ে উঠছিল। এ কারণেই এই বিদ্বেষ ও বৈরিতা ছিল বলা যায়। সাহিত্যের নানা বিভাগ ও অন্যান্য বিষয় এবং পত্র-পত্রিকায় নানা ভাবে নানা কায়দায় চলে মুসলমান বিদ্বেষ। স্বদেশী মোগল সম্রাটদের তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখানো হয়। অথচ এরাই অকারণ ইংলণ্ডের রাজরানীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদের শিক্ষাও তার মধ্যে ছিল সামান্য। ইংরাজী শিক্ষার পেছনে যে শক্তি ছিল, যা বল যোগাত, তা হল দাসত্ব করবার প্রেরণা এবং বাসনা।

---

১. আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ : শ্রী অশোক মেহতা, পৃঃ ৮১-৮২-৮৩।

সাহিত্য এবং রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রথম কলকাতাতে জন্মলাভ করে এবং তাহা পরিব্যাপ্ত হতে হতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে কথা যে কোন মানুষকে ব্যথিত না করে পারে না। ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের পূর্বে সাম্প্রদায়িকতা কি বস্তু তা জনগণের জানা ছিল না। ঐ সময়গুলিতে সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট বিষয় নিয়ে দেশের কোথাও একফোটা রক্তও ঝরে না।

নিম্নোদ্ধৃত উদ্ধৃতির কথাগুলি কত সুন্দর হৃদয়গ্রাহীভাবে গভীর দেশপ্রেম নিয়ে মেহতাজী বলেছিলেন ঃ

> এদের সঙ্গে বিদ্রোহের অন্যান্য বহু বীর প্রাণদান করেছে যুদ্ধে। তাদের নাম জানা নেই কারো, নেই কোনো ইতিহাসে। কিন্তু জগত দাসত্বের পরিবর্তে যারা মৃত্যুকে বরণ করে এসেছে, সর্বদেশ ও সর্বকালে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রইল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত অজ্ঞাত ও অখ্যাত এই সহস্র বীর সন্তানেরা। তাদের সমাধিতে না আছে কোন স্মৃতিফলক, না আছে কোন গৌরব-চিহ্ন। সেখানে কেউ দেয় না ফুল, কেউ জ্বালে না আলো। শাসকেরা চেষ্টা করেছেন তাদের স্মৃতিকে চিত্রিত করতে কলঙ্কিত তুলিকায়। কিন্তু দেশের জনগণের হৃদয়ে তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল চিরকালের জন্য। সেখানে তাদের আসন পাতা আছে সম্মানের সম্বর্ধনার। কোন অপপ্রচার, কোন মিথ্যা রটনা সেখান থেকে তাদের বিচ্যুত করতে পারবে না কোনো দিন। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দেশের মুক্তিকামী নরনারী তাদের স্মরণ করবে অসীম শ্রদ্ধায় ও পরম বিস্ময়ে।[১]

জলপাইগুড়ি

> কিন্তু ত্রিপুরা-রাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এ সময়ে অনেক ভূস্বামী গভর্নমেন্টের যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গভর্নমেন্টের উপস্থিত সংকটকালে ইহাদের সাহায্যে অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহী হাবিলদার, রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরার দিকে ধাবিত হয় বিদ্রোহী সিপাহীগণ। কিন্তু ত্রিপুরার রাজা এবং অনেক জমিদার

---

১. আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ ঃ শ্রী অশোক মেহতা, পৃঃ ৫৭-৫৮।

বিদ্রোহী সেনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ করে তাদের বহু ক্ষতি করে। ঐ সময় ভূস্বামীগণ সৈন্যদের সহযোগে বিদ্রোহে যোগ দিলে পূর্ব বাংলায় ইংরাজদের প্রাধান্য একেবারে লোপ পেয়ে যেত। বরং সাহায্য না করে ইংরাজ পদসেবী এই পরগাছার দল ইংরাজদের যথোচিত সাহায্য করে ক্ষমতায় সুদৃঢ়ভাবে বসান। এ কথা নিচের লাইনে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে ঃ

এইরূপ সাহায্য না পাইলে গভর্নমেণ্টকে সাতিশয় বিপন্ন হইতে হইত।

ভূস্বামী বিশ্বাসঘাতকরা বিদেশী শাসকদের সব সময় এইভাবে সাহায্য করে এসেছে নিজ দেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেও। ত্রিপুরার রাজা ব্যতীত অন্য কোন সাহায্যকারী জমিদারদের এই বিশ্বাসঘাতকতা-যুক্ত বিবেকহীন কার্যের সাথে যেসব জমিদার জড়িত ছিল, তাদের নাম আমরা জানি না। তবে ঢাকার এক জমিদারের নাম আমরা জানি। যদিও এদের সম্পর্কে কোন পুস্তকে সেসব কথা লেখা নেই। লোকমুখে আজও সে বিষাদময় কথাগুলি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। এই জমিদারের নাম অনেকেই জানেন। ইনি ঢাকার গনি মিয়া নামে খ্যাত। বিশিষ্ট কবি ও খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতা কবি বেনজির আহমদ সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় উক্ত গনি মিয়ার বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ সম্পর্কে বলেন ঃ

> আমাদের পূর্বে (সিপাহী বিদ্রোহের সময়) আমাদের পূর্ব বসতবাটি ছিল ঢাকা শহরের মোগলটুলিতে। আমরা মোগল বংশীয় লোক। যে সময় ঢাকায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, ঐ সময় গনি মিয়া, বাঙ্গালী এক বিধবা জমিদার মহিলাকে বিবাহ করেন। পরে তার বিবাহিতা জমিদার পত্নী হঠাৎ মারা যায়। এই মারা যাওয়াটাও স্থানীয় লোকেরা সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন। গনি মিয়ারা কাশ্মিরী শাল বিক্রেতা লোক ছিলেন। পরে চামড়ার কারবার করেন। যাহা হোক, পত্নী মরে যাওয়ায় নিজে জমিদার হন। ঢাকায় বিদ্রোহ হওয়ার পূর্বে বিদ্রোহী দলের বেশ কিছু সংখ্যক দলপতি গনি মিয়ার নিকট এসে বলেন, "আমাদের আপনি সাহায্য করুন।" গনি মিয়া তাদের খুব উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করবেন বলে কথা দেন। এদিকে ইংরাজদেরকে সমস্ত কথা গোপনে খুলে বলেন। বিদ্রোহীদের বলেন, "আপনারা অমুক সময়ে আসবেন; পরামর্শ করা হবে।" বিদ্রোহী নায়করা যখন এসে বসেন তখন চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে তাদের ধরা হয়। পরের দিন সেই সব

বিদ্রোহী নেতাদের কাছারীর পূর্ব পার্শ্বে এবং ভিক্টোরিয়া (বর্তমান বাহাদুর শাহ্ পার্ক) পার্কের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে বড় বড় বটগাছের ডালে ডালে ফাঁসি দেওয়া হয়। উক্ত সময় ও পরবর্তী সময়গুলিতে উক্ত বৃহৎ বট বৃক্ষগুলি ছিল। এ সব গাছ আমি নিজেও দেখেছি। এর পরে গনি মিয়া সাহেবরা বংশানুক্রমে 'নবাব' খেতাব পেতে থাকেন। আর্থিক উন্নতিও নানা দিক দিয়ে তাদের বিপুল পরিমাণ হয়। এ সব কথা আমি বহু প্রাচীন লোকদের নিকট ছোটবেলা হতে শুনে এসেছি।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে জনাব আবুল হাশিমের একটি উৎকৃষ্ট বক্তব্যও আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতে ১৮৫৭ সালে সর্বশেষ ও সর্ব বৃহৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে এই অভ্যুত্থান 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। পাঞ্জাবী, বেলুচী এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় সিপাহীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিপ্লবের ব্যাপকতা এ সত্যই তুলে ধরে যে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শক্তি অধিকতর দক্ষ হলে এই বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হতে পারতো। সিপাহীরা বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে দিল্লী অধিকার করে বসে এবং শেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করে। অব্যাহত প্রচেষ্টা ও সমন্বয়ের অভাবে এই বিপ্লব ব্যর্থতা বরণ করে বাহাদুর শাহকে বন্দী করে বার্মায় নির্বাসন দেওয়া হয়। এই বিষাদময় সংগ্রামের সময় খান বাহাদুর খানের নেতৃত্বে রোহিলাখণ্ডের সেই এলাকা থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেয় এবং কিছু কালের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। বিহার ও বাংলা থেকে সৈয়দ আহমদ যে সব মুজাহিদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচেছিলেন তাঁরা বাহাদুর খানের সাথে যোগদান করেন এবং তাঁরা নিজেদেরকে গাজী বলে ঘোষণা করেন। খান বাহাদুর খান ও ব্রিটিশের মধ্যে যে সব সংঘর্ষ ঘটে তাতে এই গাজীরা আমৃত্যু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ব্রিটিশরা একজন গাজীকেও জীবন্ত বন্দী করতে পারেনি। ঢাকার মর্মান্তিক ঘটনা ব্রিটিশের নৃশংস অত্যাচার এবং বাংলার মুসলমানদের সাহসী সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের আর একটা নজির।

পূর্বাঞ্চলীয় সিপাহীরা ঢাকার লালবাগে জমায়েত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে। জনৈক চামড়ার ব্যবসায়ী গোপনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এই সংবাদ জানান। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ গোড়াতেই দমন করার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তারা গোপনে ঢাকায় এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। আকস্মিক হামলা চালিয়ে এই বাহিনী ঢাকায় যারা জমায়েত হয়েছিলেন তাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করে এবং এই হত্যাকাণ্ড থেকে যারা বেঁচে যায় তাদেরকে বন্দী করে। তাদের ষাটজনকে (যাদের সবাই ছিলেন মুসলমান) গাছের ডালে লটকিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তাঁদের মৃতদেহ শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়। যে জায়গায় এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং আজাদীর সংগ্রামে এই শহীদেরা চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করে, সে জায়গাটি ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে পরিচিত। বর্তমানে এটিকে শহীদ পার্ক বলা হয়। ১৮৭২ সালের অস্ত্র আইন বলে ভারতের মুসলমানদের সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হয় এবং এভাবেই মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতি ঘটে। এভাবেই বাংলার মুসলমানেরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ভাইদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত শতবর্ষেরও অধিককাল ধরে ব্রিটিশ বিরোধী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছেন।[1]

এ-সম্পর্কে শ্রী রজনীকান্ত গুপ্তের লেখাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সুদীর্ঘ বিবরণও এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

> কটকে যেরূপ শান্তি ভঙ্গ হইল না, জলপাইগুড়িতেও সেইরূপ কোন গোলযোগ ঘটিল না। এ স্থলে সেনানায়কদের উদারতা ও সমদর্শিতাই শান্তিরক্ষার প্রধান কারণ হইয়াছিল। জলপাইগুড়িতে ৭৩ জন গণিত সিপাহী দল ছিল। কর্নেল সিয়ারার এই দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আপনার অধীন দলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি কার্যতঃ সিপাহীদিগকে এই বিশ্বস্ত ভাব দেখাইতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে অমূলক আশংকায় অলীক সন্দেহে, সিপাহীগণ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের আশঙ্কা ও সন্দেহ অপসারিত হইল, গভর্নমেণ্টের বিপদ নিরাকৃত হইতে পারে। জুন মাসে কটকের ন্যায় জলপাইগুড়িতে প্রচারিত হইল যে,

---

[1] আজাদী আন্দোলনে মুসলিম বাংলার অবদান : আবুল হাশিম, পৃষ্ঠা ৬ ; ঢাকা : শনিবার, ২২শে শ্রাবণ ১৩৭৭ সন। দৈনিক পাকিস্তান পত্রিকা।

ইউরোপীয় সৈন্য ঐ স্থানের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য আসিতেছে। উক্ত সিপাহীগণ শীঘ্র ইউরোপীয় সৈন্যের আক্রমণে সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে—এইরূপ নানাবিধ আতঙ্কময় জনরব জলপাইগুড়ির সৈনিক নিবাসে প্রচারিত হইতে লাগিল। এ সময়ে সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণ যেন ইউরোপীয় রাজপুরুষদিগের মধ্যে একটি চিরাচরিত প্রথা বলিয়া পরিগণিত ছিল। যেখানে কোন বিষয়ে কোনরূপ আশঙ্কা জন্মিত, সেইখানে কর্তৃপক্ষ সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইতেন। আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহারা নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত আর কোন উপায়ই প্রশস্ততর মনে করিতেন না। সেনানায়ক সিয়ারারের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনিও এই প্রথা অনুসারে কার্য করিতে আদিষ্ট হইবেন। কিন্তু সেনানায়ক এই প্রথায় নিরতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি আপনার অধীন সিপাহীদিগকে বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ৭৩ গণিত দলের কতকগুলি সিপাহী ঢাকায় ছিল। ইহারা সেই স্থানে উত্তেজনার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। সেনানায়ক সিয়ারার নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, অনিয়মিত অশ্বারোহী দলের যে সকল সওয়ার জলপাইগুড়িতে ছিল, তাহারা এই সংবাদে অতিশয় বিরক্ত হইয়া ঐ উত্তেজিত সিপাহীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আপনাদের তরবারি ধারাল করিয়াছিল। এইরূপ বিশ্বাস প্রযুক্ত সেনানায়ক সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণে একান্ত অসম্মত ছিলেন। একদা তাঁহার সমক্ষে ডাকের কতকগুলি কাগজ-পত্র খোলা হইল। উহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের আদেশলিপি ছিল। সেনানায়ক ঐ আদেশলিপি হস্তে লইয়া, তাঁহার অব্যবহিত অধস্তন সহযোগীকে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, এই লিপিতে আমাদের লোকের নিরস্ত্রীকরণের আদেশ রহিয়াছে। আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, তথাপি কিছুতেই এই আদেশ পালনে সম্মত হইব না।" সেনানায়ক আপনার অধীন সৈনিক দলের সম্মান রক্ষায় এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ স্থিরতায় তদীয়-সহযোগীগণ সুস্থির হয়েন নাই। তাঁহারা সেনানায়ককে সমুদয় বন্দুক একত্র করিয়া, নৌকাযোগে কোন নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে কহেন। এই সকল নৌকা, উপস্থিত সময়ে তিস্তা নদীতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদের কেহ কেহ উত্তেজনায় অধীর হইয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার চেষ্টা

করিতে থাকে। এ সময়েও সেনানায়ক নিরস্ত্রীকরণে উদ্যত হইলেন না। এতদ্দেশীয় অফিসারগণের চেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারীগণ ধৃত হইল। সেনানায়ক ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমুচিত শাস্তি দিলেন এবং বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সিপাহীদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ অর্থ দ্বারা পরিতোষিত করিলেন। অপরাধীগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইল। যাহারা গুলী বন্দুক হস্তে লইয়া ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা আপনাদের আবাস গৃহে আপনারাই আক্রান্ত হইল। একজন গুলীর আঘাতে দেহত্যাগ করিল, আর একজন উদ্‌ভ্রান্তভাবে নদীতে গিয়া নিমজ্জিত হইল। কিন্তু সমগ্র সৈনিক দলের অদৃষ্টে এইরূপ দশা বিপর্য্যয় ঘটিল না। মাসের পর মাস অতিবাহিত হইল। সেনানায়ক সিয়ারারের সৌজন্যে জলপাইগুড়ির সিপাহীগণ পূর্ব্বের ন্যায় বিশ্বস্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুভক্ত রহিল। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য স্থানে অপরাপর সৈনিক দলের প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও সমদর্শিতা প্রদর্শিত হয় নাই। বাঙ্গালার উত্তর পশ্চিম প্রান্তভাগে যাহা ঘটিয়াছিল, দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্ত ভাগে তাহা ঘটে নাই। এক স্থানের বিপরীত ঘটনা অন্য স্থানে সংঘটিত হইয়া রাজপুরুষদিগকে গোলযোগে বিব্রত, ভয়ে বিচলিত ও নানারূপ আশংকায় অস্থির করিয়া তোলে। চট্টগ্রামে ৩৪ গণিত সিপাহী দল ছিল। ইহারা ১৮ই নভেম্বর রাত্রিকালে সহসা গভর্নমেন্টের বিরোধী হয়। ইহাদের অধিনায়ক ইহাদিগকে শান্তভাবে রাখিবার জন্য একজন সহযোগীর সহিত কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করেন। কিন্তু ইহারা শান্ত হয় নাই। ইহাদের কেহ কেহ অধিনায়ককে গুলী করিতে চাহে; কেহ কেহ ঐ কার্য্যে বাধা দিয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে যাইতে অনুরোধ করে। ঘটনার পরিবর্ত্তনে ইহাদের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তন হইলেও ইহারা অধিনায়কের শোনিতপাতে অগ্রসর হয় নাই। অধিনায়ক উপায়ান্তর না দেখিয়া ইউরোপীয়দিগের সংবাদ দিবার জন্য তাঁহাদের গৃহে গমন করেন। তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই কেহ কেহ সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর সিপাহী দলের কাপ্তেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ছদ্মবেশে জঙ্গলময় পথ দিয়া পলায়ন করেন। কালেক্টর সাহেবের বিশ্বস্ত বেহারাগণ তাঁহাদের পথ প্রদর্শক হয়।

এদিকে উত্তেজিত সিপাহীগণ ধনাগারের প্রায় তিন লক্ষ টাকা লুটিয়া

লইল, কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সৈনিক নিবাস ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিল। শেষে গভর্ণমেন্টের তিনটি হাতি ও দুই একটি অশ্বে আপনাদের বিলুণ্ঠিত দ্রব্য বোঝাই করিয়া ত্রিপুরার অভিমুখে ধাবিত হইল। রজব আলী খাঁ নামক একজন হাবিলদার তাহাদের পরিচালনার ভার গ্রহণ করিল। তাহারা চট্টগ্রামে কোন ইউরোপীয়কে আক্রমণ করে নাই। কোন ইউরোপীয় তাহাদের অস্ত্রাঘাতে নিহত হয় নাই। কেবল জেলখানার একজন বরকন্দাজ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এদিকে চট্টগ্রামের কমিশনার সাহেব ত্রিপুরার মহারাজাকে এই সকল উত্তেজিত সিপাহীর গতিরোধ বা ধ্বংস সাধন করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের দুইজন প্রধান জমিদারের নিকটেও এই উদ্দেশ্যে পত্র লিখা হইল। সিপাহীগণ সীতাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া ব্রিটিশ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনায় স্বাধীন ত্রিপুরার অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরা-রাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। এ সময় অনেক ভূস্বামী গভর্ণমেন্টের যথোচিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গভর্ণমেন্ট উপস্থিত সংকটকালে ইহাদের সাহায্য অনেক স্থলে ঘোরতর বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ সাহায্যে না পাইলে গভর্ণমেণ্টকে সাতিশয় বিপন্ন হইতে হইত। এই সকল হিতৈষী পুরুষের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরা অধিপতি এইরূপ হিতৈষিতা প্রদর্শনে বিমুখ হইলেন না। সিপাহীদিগের আগমন সংবাদ পাইয়াই বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী লোক তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা অবিলম্বে অগ্রসর হইয়া, ২রা ডিসেম্বর সিপাহীদিগের গতিরোধ করিল। সিপাহীগণ এ জন্য পুনর্ব্বার ব্রিটিশ রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কুমিল্লার অদূরবর্তী পর্ব্বতের দিকে যাইতে লাগল। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম সময়ে তাহাদের কষ্টের একশেষ হইল। তাহাদের তিনটি হস্তী অধিকারচ্যুত হইল। তাহাদের প্রায় ১০ হাজার টাকা হস্তভ্রষ্ট হইল। তাহারা যে সকল কয়েদীকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকে ধৃত হইল। ত্রিপুরা রাজ ও সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত করিতে লাগিল। সুতরাং তাহারা কোন উপায় না দেখিয়া মনিপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে তাহাদিগ কর্ত্তৃক একটি পুলিশ ষ্টেশন আক্রান্ত ও বিলুণ্ঠিত হইল।

এই সময়ে ঘটনাসূত্রে একটি কর্ম্মকুশল ব্রিটিশ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীহট্টের প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী এলেন সাহেব ভাবিলেন, উত্তেজিত সিপাহীদিগকে বাধা দিবার জন্য ইউরোপীয় সৈন্য অনেক বিলম্বে উপস্থিত হইবে। এইরূপ বিলম্ব করা অসঙ্গত মনে করিয়া তিনি ১৫ই ডিসেম্বর শ্রীহট্টের এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের অধিনায়ক মেজর বাইঙকে সিপাহীদিগের বিরুদ্ধে যাইতে কহিলেন। অধিনায়ক আপনার সৈনিক দল লইয়া, ঐদিন শ্রীহট্ট যাইতে যাত্রা করিলেন। তিনি শ্রীহট্টের ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রতাপগড় নামক স্থানে উপনীত হইয়া শুনিলেন যে, সিপাহীরা শীঘ্র লাতু নামক স্থানে উপনীত হইবে। লাতু প্রতাপগড়ের ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। ইংরেজ সেনানায়ক লাতু অতিক্রম করিয়া প্রতাপগড়ে গিয়াছিলেন। সিপাহীদিগের সংবাদ পাইয়া, পুনরায় লাতুতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পথ পল্বলময় ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সৈনিকগণ এক উদ্যমে ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। তথাপি তাহারা সন্তোষ সহকারে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইল। অধিনায়ক সৈনিক দল লইয়া লাতুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চট্টগ্রামের উত্তেজিত সিপাহীগণ শ্রীহট্টের সিপাহীগণকে আপনার পক্ষে আনিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। শ্রীহট্টের বিশ্বস্ত সৈনিক দল তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য সঙ্গীন উঠাইলেন। লাতু যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহট্টের পদাতিক দলের অধিনায়ক মেজর বাইঙের পতন হইল। কিন্তু ইহাতে ঐ সৈনিকদিগের উদ্যম ভঙ্গ হইল না। তাহারা প্রবল পরাক্রমে চট্টগ্রামের সিপাহীদিগকে আক্রমণ করিল। সিপাহীগণ এই আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া লাতু ও মনিপুরের মধ্যবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যে আত্মগোপন করিল।

চট্টগ্রামের সিপাহীগণ -গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। তাহারা কারাগার ভগ্ন করিয়াছে, কয়েদীদিগকে বিমুক্তি দিয়াছে, ধনাগারের অর্থরাশি লুটিয়া লইয়াছে। এই সংবাদ যখন চারিদিকে প্রচারিত হয়, তখন পূর্ব্বাংলার একটি প্রধান নগরে কিছু গোলযোগ ঘটে। ঢাকা বহুকাল হইতে বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এক সময়ে ইহা রাজধানীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

'উপস্থিত সময়ে ঢাকার ইংরেজ রাজপুরুষগণ প্রশান্তভাবে বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। ইউরোপীয় আর্ম্মানিগণ প্রসন্নভাবে বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। জলপাইগুড়িস্থিত ৭৩ গণিত সিপাহী দলের কিয়দংশ এবং এতদ্দেশীয় কতিপয় গোলন্দাজ সমুদয়ে প্রায় ২৫০ শত সিপাহী কোম্পানীর ধনাগার প্রভৃতি রক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

চারদিন পর চট্টগ্রামের সংবাদ ঢাকায় উপস্থিত হয়। সংবাদ পাইয়া কর্তৃপক্ষ ঢাকার সিপাহীদিগের নিরস্ত্রীকরণের আয়োজন করেন। ২০শে নভেম্বর প্রভাতকালে নৌ-সেনা বিভাগের লেফটেনেন্ট লিউইস কতকগুলি জাহাজী গোড়া এবং দুইটি কামান লইয়া এই কার্য সাধনে উদ্যত হয়েন। প্রথমে তিনি ধনাগারে গমন করেন। এই স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয়। ইহার পর কতিপয় গোরা যাইয়া প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্যালয় রক্ষক সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করে। লেফটেনেণ্ট লিউইস অতঃপর সৈনিক বিভাগের মাল গুদামের সিপাহীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে বিচ্যুত করেন। এইরূপে সিপাহীগণ বিনা গোলযোগে নিরস্ত্রীকৃত হয়। কিন্তু ইংরাজ সেনানায়কগণ যখন সিপাহীদিগের আবাস স্থান লালবাগে উপস্থিত হয়েন, তখন তত্রত্য সিপাহীগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে। জলপাইগুড়ির সৈন্যাধ্যক্ষ সিয়ারার উদারতার সহিত দৃঢ়তা ও কার্য্য তৎপরতা দেখাইয়া, তত্রত্য ৭৩ গণিত দলের সিপাহীদিগকে প্রশান্তভাবে রাখিয়াছিল। তাঁহার সমদর্শিতা গুণে ঐ স্থানের সিপাহীগণ নিরস্ত্রীকৃত হয় নাই। ঢাকার সিপাহী দলের অধিনায়ক অপরাপর ইংরেজ সেনানায়কের সহিত সম্মিলিত হইয়া লালবাগ অবরুদ্ধ করিলেন। সিপাহীগণ বাধা দিল। অবিলম্বে ইংরেজ পক্ষ হইতে গুলী বৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীগণ অস্ত্রাগার ও সৈনিক নিবাস হইতে গুলী চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। এই গোলযোগে তাহাদের ৪০ জন নিহত হইল। কেহ কেহ গুরুতর আঘাত পাইল, কেহ কেহ নদী পার হইবার সময় নিমজ্জিত হইল। ইংরেজ পক্ষের একজন নিহত, কয়েকজন গুরুতর আঘাতে অবসন্ন হইল। অর্ধ ঘণ্টারও অধিক কাল গুলী বৃষ্টি করিলে, অবশিষ্ট সিপাহীগণ ঢাকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের সদর স্থান জলপাইগুড়ির অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু গন্তব্য পথে বাধা পাইয়া কিয়ৎকালের জন্য ভুটানের পার্ব্বত্য ভাগে আশ্রয় লইল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার

সংবাদ পাইয়া কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষ ৫৪ গণিত রেজিমেন্টের তিন দল সৈনিক এক শত জাহাজী গোরা নদী পথে পাঠাইয়া দেন। গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সাহায্যকারী সৈনিক দল প্রথমে ঢাকা, পরে চট্টগ্রামে যাইয়া পলায়িত সিপাহীদিগের গতিরোধ করিবে। স্থানীয় রাজপুরুষের চেষ্টায় চট্টগ্রামের হতাবিশিষ্ট সিপাহীগণ তাড়িত হইয়া, পাব্বর্ত্য প্রদেশে আত্মগোপন করে। স্থানীয় রাজপুরুষদিগের যত্নে ঢাকার পলায়িত সিপাহীদিগের জলপাইগুড়িতে যাইবার চেষ্টা বিফল হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাসে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ উত্তেজিত সিপাহীদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য সাহস, উদ্যম ও কার্য পটুতা দেখাইতে বিমুখ হয়েন নাই। যাঁহারা দেওয়ানী বিভাগের কার্যে ব্যবহৃত থাকিয়া সৈনিক বিভাগ হইতে পৃথক হইয়াছেন, তাঁহারা এই সময় যুদ্ধ কুশল সৈনিকদিগের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের যুদ্ধ-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। সমর ক্ষেত্রে লোহিত পরিচ্ছদের পার্শ্বে কৃষ্ণ পরিচ্ছদেরও সমাবেশ দেখা গিয়াছে। উপস্থিত সময়ে দেওয়ানী ও সৈনিক বিভাগকে একসূত্রে সম্বন্ধ ও এক উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত না হইলে, বোধ হয়, গভর্ণমেন্টকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইত। শ্রীহট্টের দেওয়ানী কর্ম্মচারী, চট্টগ্রামের সিপাহীদিগের গতিরোধের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানী কর্ম্মচারীও গভর্ণমেন্টের প্রাধান্য রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এ বিষয়ে ভাগলপুরের কমিশনার ইউল সাহেবের অধিকতর কার্য্যপটুতা পরিস্ফুট হইল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, দানাপুরের ঘটনার পর হইতে ৫ গণিত অশ্বারোহীদল গভর্ণমেন্টের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাগলপুর হইতে প্রস্থান করে। এদিকে ঢাকার সিপাহীগণ জলপাইগুড়ি অভিমুখে অগ্রসর হয়। ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব কাল বিলম্ব না করিয়া জলপাইগুড়িতে যাত্রা করেন। এই সময় একদল ইউরোপীয় সৈন্য মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিল। কমিশনার সাহেব উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ২৯শে নভেম্বর ভাগলপুর পরিত্যাগ করেন। যখন তিনি জলপাইগুড়িতে যাইতে ছিলেন, তখন মাদারিগঞ্জের এবং জলপাইগুড়ির ১১ গণিত রেজিমেন্টের দুই দল সওয়ার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া দিনাজপুরের অভিমুখে যাত্রা করে (৪ ও ৫ই ডিসেম্বর)। রংপুরের কালেক্টর সাহেব এই সংবাদে গভর্ণমেন্টের টাকা নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেন। দিনাজপুরের

কালেক্টর সাহেবও ঐ স্থান রক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। এদিকে ভাগলপুরের কমিশনার সাহেব ইউরোপীয় সৈনিক লইয়া, সওয়ারদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন। সওয়ারগণ যখন জানিতে পারিল যে, তাহাদের পশ্চাতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে, তখন তাহারা দিনাজপুরে না যাইয়া পুর্ণিয়ায় যাইবার পথ অবলম্বন করিল। এই সংবাদ পাইয়া ইউল সাহেব অবিলম্বে পুর্ণিয়ার দিকে যাইতে লাগিলেন। তিনি যথাসময়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীগণ পুর্ণিয়া আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু ইউল সাহেব উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাড়িত হইল। যুদ্ধে তাহাদের কয়েক ব্যক্তি দেহত্যাগ করিল। অতঃপর তাহারা উত্তর দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু ইউল সাহেব ত্বরিৎ গতিতে নাগপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তাহারা ঐদিকে আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কমিশনার সাহেব যখন নাগপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ঢাকার সিপাহীদিগের সংবাদ পাইলেন। সুতরাং তাহাকে অবিলম্বে জলপাইগুড়িতে যাত্রা করিতে হইল। ঢাকার সিপাহীগণ তিস্তা পার হইতে না হইতেই ইউল সাহেব উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সিপাহীদিগের গতিরোধ হইল না। তাহারা অন্যদিক দিয়া নদী পার হইল। ইউল সাহেব অবিলম্বে ঐ দিকে অগ্রসর হইলেন। সিপাহীগণ বৃটিশ রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত হইয়া নেপাল গমন করিল। কিন্তু এই স্থানে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউল সাহেব নেপালের জঙ্গ বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জঙ্গ বাহাদুর রত্ন মনি সিংহ নামক একজন সেনানায়ককে ইংরেজদিগের সাহায্য করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই সাহায্যে ইউল সাহেবের মনোরথ সিদ্ধ হইল না। সিপাহীগণ নেপালের অরণ্যময় পার্ব্বত্য পথ দিয়া এইরূপ সুকৌশলে অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমাংশে পলায়ন করিল যে, ইংরেজ ও নেপালীগণ তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে ইংরেজ ও নেপালী সৈন্যের একীভূত উদ্যম সর্ব্বাংশে ব্যর্থ হইল।

একদিকে সিপাহীগণ উত্তেজনায় অধীর হইয়া ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হয়। অন্যদিকে আদিম নিবাসী কোলগণ উচ্ছৃংখল হইয়া

তাহাদের চিরাভ্যস্ত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করে। যে সকল রাজার অধিকারে এই আদিম অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল এবং যে সকল রাজা কোন রূপে তাহাদের অসন্তোষ জন্মাইয়াছিলেন, এই সময় তাহারা সেই সকল রাজাকে পদচ্যুত এবং তাহাদের স্থলে, আপনাদের মনোমত ব্যক্তিদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দলবদ্ধ হইল। এইরূপে সর্ব্বত্র অশান্তির আবির্ভাব হইল। ইংরেজ সৈনিকগণ গোলযোগ নিবারণের জন্য এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইতে লাগিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণ এক স্থানের পর আর এক স্থানে শান্তি স্থাপনের জন্য নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ভূভাগ নিবিড় জঙ্গলে পরিবৃত থাকাতে সকল স্থানে গমনাগমনে সুগম ছিল না। পর্ব্বতময় ভূখণ্ডে যেরূপ দুর্গম, গভীর অরণ্য সেইরূপ দুষ্প্রবেশ্য ছিল। সুতরাং উত্তেজিত লোকে সহজেই নানা স্থানের শান্তি নাশে কৃতকার্য্য হইল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জনপদ যেন অরাজক হইয়া উঠিল। একদা তিন/চারি হাজার কোল দলবদ্ধ হইয়া গভর্ণমেন্টের শিখ সৈনিকদিগকে পরিবেষ্টিত করে। শিখগণ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু ইহাদের নিক্ষিপ্ত তীর অকার্য্যকর হয় নাই। কয়েকজন শিখ আহত ও একজন নিহত হয়। ইংরেজ সেনানায়কদিগের দেহ তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। কর্তৃপক্ষ এই অরাজকতা নিবারণ জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। একদা তাহারা একটি মাত্র বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি ভিন্ন সৈনিকদল পাঠাইলেন। শেষে অনেক চেষ্টার পর অরাজকতা স্রোত অবরুদ্ধ হইল। ১৮৫৮ অব্দের প্রারম্ভে ছোট নাগপুরে শান্তির চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল।[১]

জনৈক সৈনিকের তুলনাহীন বীরত্ব

স্বাধীনতার জন্য কি ভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয়, তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতে বোঝা যায়। এই সব বীরের অনেকের নাম পর্যন্ত আমরা জানি না। সত্যই ঐতিহাসিক বলেছেন, "ইউরোপ হইলে এই সকল

---

[১] ঢাকা, ছোট নাগপুর. ভারতবাসীদিগের রাজভক্তি, পৃষ্ঠা ২৮১-২৯৩। চতুর্থ খণ্ড, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ; শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত।

বীর পুরুষদিগের বীরকীর্ত্তি ঘোষিত হইত।" এখানে আমরা উক্ত উদ্ধৃতি তুলে দিতে চাই ঃ

> একজন সিপাহীর অসাধারণ সাহসে ও তেজস্বিতায় সিপাহীদিগের বারুদের একখানি গাড়ী জ্বলিয়া উঠে। এ গাড়ীর বারুদ যে কামানে ভরা হইতেছিল, একজন ইংরাজ সেনানায়ক যখন একদল সৈন্য লইয়া সেই কামান অধিকার করেন, তখন ১১ গণিত দলের একজন সিপাহী গুরুতর যুদ্ধের মধ্যে একাগ্রতার সহিত উক্ত বারুদ বোঝাই গাড়ীতে বন্দুক ছুড়িতে থাকে। বন্দুকের আগুনে বারুদ গাড়ি সমেত জ্বলিয়া উঠে। সেই মুহূর্তেই সিপাহীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ইংরেজ সেনানায়কও কয়েকজন অনুচরের সহিত নিহত হন। আরও কতকগুলি আহত হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে নীত হয়। সিপাহী আপনার প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এইরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল এবং আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও বিপক্ষদিগের বল ক্ষয় করিতে এইরূপ কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের মধ্যে এইরূপ সাহস ও বীরত্ব সম্পন্ন যোদ্ধার অভাব ছিল না। ইহারা স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থলে ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয় জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে বীর পুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই সিপাহীদিগের বিবরণে বুঝা যায়। ইহাদের অনেকের বীরত্ব কীর্ত্তি উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থান উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকের কীর্ত্তি কাহিনী আবার ইতিহাসেও স্থান পরিগ্রহ করে নাই। বিদেশী ঐতিহাসিক অনেক স্থলে বিদেশীয়ের বিপক্ষের জ্বলন্ত কীর্ত্তির পরিচয় দিতেও বিমুখ হইয়াছেন। ইউরোপে হইলে এই সকল বীর পুরুষদিগের বীর কীর্ত্তি ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্য্যন্ত সাধারণের সমক্ষে যেন জীবন্তভাবে বিচরণ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অনন্ত কালের অভিঘাতে অতীত স্মৃতির সন্তাড়নে সমস্তই নিঃসন্দেহে নিম্মূর্ল হইয়া গিয়াছে।।[1]

---

১. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত। তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় অধ্যায়, দিল্লী অভিমুখে যাত্রা, পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫—৪৮।

সিপাহী বিপ্লবের জাতীয় বীরদের বীরত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যাহা বলেছেন, তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

> সেদিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি, কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশের মধ্যে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় অনেক বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—একথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। পৃথিবীর মহা মহাবীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের কি দুর্ভাগ্য, এমন বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আমরা সিপাহী যুদ্ধ সময়ের অনেক বীরের নাম উল্লেখ করিতে পারি। যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণ স্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন।

রবীন্দ্রনাথের কথা মত স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি কাজ স্বাধীন দেশ দুইটির করবার প্রয়োজন রয়েছে ব্যাপক ও প্রচুর ভাবে। এতদ্দেশের অগণিত জনসাধারণ বৈদেশিক যে কোন হামলাদারকে, বাধা দিবার প্রেরণা পাবে। তেমনি দেশের মীরজাফরদের খতম করবে। সাম্রাজ্যবাদ যে ভাবে, যে বেশেই আসুক, তা প্রতিহত করবার উক্ত উপায়গুলিকে উৎকৃষ্টতম পন্থা বলে আমরা মনে করি। দেশের বেতনভুক্ত প্রহরীদের চেয়ে অনেক বেশী সজাগ, সতর্ক ও কর্মক্ষম প্রহরী হল দেশের অগণিত জনসাধারণ। মাতা ও সেবাদাসীতে যেমন আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এক কথায় দেশকে একতাবদ্ধ, সুশৃংখলিত, উচ্চাভিলাসী, কর্মপটু ও অভ্যন্তরীণ আর বহিঃদেশীয় দিক দিয়ে সজাগ সতর্ক করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের উক্ত বক্তব্যকে আমাদের কার্যকরী করতে হবে।

শিখ সৈনিক

অনেকে সোজাসুজি বলে ফেলেন, শিখরা ইংরাজদের সহযোগিতা করে ইংরাজদের হস্তকে একদিকে যেমন শক্তিশালী করেছিল, অপরদিকে দেশের আযাদীকে পিছিয়ে দিয়েছিল—এই মিথ্যা ও কুৎসাপূর্ণ অপবাদ গোটা শিখ সম্প্রদায়ের উপর আসতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে যেমন অর্থ ও ক্ষমতা পিপাসু কতিপয় আমীর-ওমরাহ অথবা ঐ সময়ের অপেক্ষাকৃত শক্তিমান,

লোভী বিশ্বাসঘাতক প্রথম হতে ইংরাজদের সহযোগিতা করে এসেছে দেশের সমস্ত স্বার্থ সম্মানকে উপেক্ষা করে। তদ্রূপ শিখ ভ্রাতাদের মধ্যেও কতিপয় মীরজাফরের আবির্ভাব হয়েছিল ১৮৫৭-র পূর্ব হতে। ইতিহাসের নিম্নোক্ত বিষয়গুলি হতে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আমরা আশা করি।

শিখ বিজয়ী হার্ডিঞ্জ। জম্মুর শাসনকর্তা রণজিৎ সিংহের প্রিয় পাত্র, রাজা গুলাব সিংহ তখন লাহোর দরবারের প্রধান মন্ত্রী। কাশ্মীরের উপর তাঁর অনেক দিনের লোভ। সেই লোভ মেটাবার সুযোগ এল এতদিনে। প্রথম শিখ যুদ্ধে পাঞ্জাবের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেল। খালসা সেনাপতি সর্দার তেজসিংহ ও রাজা লালসিংহ গোপনে ইংরেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করলেন। কর্নেল লিকসনের বীরত্ব নয়, শিখ সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতাই শিখদের পরাজয়ের কারণ। পলাশী যুদ্ধের পুনরাভিনয় হলো প্রথম শিখ যুদ্ধে।

রাজা রণজিৎ সিংহের রাজত্ব মোগলদের তুলনায় যত ছোট এবং ভারতীয়দের দ্বারা সমর্থিত না হলেও শিখ সম্প্রদায়ের গৌরবের বস্তু হল রাজা রণজিৎ সিংহের রাজ্যটি নিয়ে। কিন্তু ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে— রণজিৎ সিংহের রাজ্যকে বলি দেওয়ার সহযোগিতা বিদেশী ইংরাজদের সঙ্গে থেকে যারা করে এসেছে, তারা গোটা শিখ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র কখনই ছিল না। হয়ত আজও নেই। পরোক্ষে, শিখ সম্প্রদায়ের মনোরাজ্যেও নেই। লাহোর রাজ্যের সহিত যুদ্ধের সময় যারা ইংরাজদের সহযোগিতা করে, শিখ সম্প্রদায়ের পরাজয়ের পথকে সুগম করে এসেছে. তারা গোটা শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হতে পারেন না। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে এই সব মীরজাফরেরা শিখ সম্প্রদায়ের নাম নিয়ে নেতৃত্ব করে এসেছে। ইতিহাসে তার সাক্ষী মিলবে।

নরেন্দ্র সিংহ পাতিয়ালার একজন রাজা। ১৮৪৫ খৃঃ ইঁহার পিতা কর্মন সিংহের মৃত্যু হইলে, ইনি পাতিয়ালার সিংহাসনে উপবেশন করেন।

লাহোর রাজ্যের সহিত যুদ্ধের সময় নরেন্দ্র সিংহ ইংরাজদিগের বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। সেই আনুকূল্যের উল্লেখ করিয়া তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ১৮৪৭ খৃঃ ইহাকে এক সনদ প্রদান করেন। ইংরাজ গভর্নর রাজাকে রক্ষা করিবার ও ইহার অধিকার স্থির রাখিবার অঙ্গীকার করেন।

> ১৮৫৭—৫৮ খৃস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাতিয়ালার এই মহারাজ অতি সরলান্তঃকরণে ও সাহসিকতার সহিত বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দিল্লীর রাজা ইহাকে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে পত্র দ্বারা নিষেধ করেন এবং তজ্জন্য পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।
>
> কিন্তু মহারাজ সেই পত্র ইংরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্দার প্রতাপ সিংহের অধীনে দিল্লী অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐ সৈন্যদল দিল্লী আক্রমণ এবং অবরোধ বিষয়ে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। ইনি ঐ সময় ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে ৫ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। এই সকল উপকারের জন্য উক্ত গভর্নমেণ্ট ইহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেন। —নরেন্দ্র সিংহ—বিশ্বকোষ

এখন অন্তত একথা বোঝা যাচ্ছে যে, শিখ সম্প্রদায়ের জাতীয় গৌরবকে যারা ইংরাজদের বুটের তলায় সাগ্রহে বলি দিয়েছিল, তারা আর যাই হোক, শিখদের জাতীয় নেতা হতে পারে না। সুচতুর ইংরাজদের কৌশলপূর্ণ জালে পড়ে ১৮৫৭-র বিপ্লবে যে সমস্ত শিখ-যুবক ইংরাজদের পক্ষাবলম্বন করে, স্বাধীনতার বিপক্ষাচরণ করে জিঘাংসার পরিচয় দিয়েছে, তারা ভারত জনসমুদ্রের কাছে ক্ষমার পাত্র। কিন্তু যারা পরিণত বয়সে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এইসব যুবকদের গোটা শিখ সম্প্রদায়ের এবং ধর্ম নেতাদের নামে ক্ষিপ্ত করে তুলে ইংরাজদের পাশাপাশি থেকে অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা এবং হত্যার পৈশাচিকতা প্রদর্শনে সহযোগিতা করেছিলেন, তারা ক্ষমার অযোগ্য। ইহা অনস্বীকার্য যে, মোগল রাজমুকুটই ছিল ভারত শক্তি, সম্মান ও সংস্কৃতির আধার স্বরূপ। কারণ বিপুল জনগণ সমর্থিত দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে। যারাই ইংরাজের সহিত মিত্রতা করে জনপদ বাড়িয়ে স্বাধীন হবার বাসনা পোষণ করে এসেছেন, তাঁদের সকলকেই একে একে ইংরাজ সাম্রাজ্যের বুটের তলায় শেষ পর্যন্ত আসতে হয়েছিল।

যাকে যে ভাবে ক্ষেপানো যায়, যাকে যে কথা বলে দলে ভিড়ানো সহজ হয় ইংরাজরা সেই সব অস্ত্রের প্রয়োগ করতে কখনই ইতস্তত, দ্বিধা ও ভুল করেন নি। ভারতীয় মোগলরা আফগানিস্তানকে তাদের অধীনে এনে শাসন করেছিল বলে আফগানদেরও সেই সব কথা বলে ফুসলিয়ে দলে ভিড়ানো হয়েছিল। ইতিহাসের উদ্ধৃতি হতে তা দেখতে পাওয়া যাবে আশা করি ঃ

স্যার জন লরেন্স প্রথমে শিখ ও আফগানদিগকে আপনাদের সৈনিকদলে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার এই কার্যে অনেকে সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে বিচলিত হন নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে. পাঞ্জাবের শিখেরা কখনও পুনরায় সিপাহীদিগের সহিত এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনে একত্র সম্মিলিত হইবে না।

এক সময়ে আফগানেরা শিখদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। সিপাহীগণ মোগলের যে চিরপ্রসিদ্ধ রাজধানীতে সমবেত হইয়া আপনাদের প্রাধান্য প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছে, শিখ সম্প্রদায় এক সময় সেই রাজধানীতে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিল। দিল্লীর খালাসীদিগের যেরূপ বিদ্বেষ বুদ্ধির উদ্দীপক ছিল, সেইরূপ উহা তাহাদের প্রলোভন সামগ্রীর মধ্যেও পরিগণিত হইয়াছিল। মোগলেরা এক সময়ে যাহাদের ক্ষমতা বিনাশে যত্নশীল হইয়াছিল, দয়ার বিসর্জন দিয়া, সমদর্শিতায় উপেক্ষা করিয়া, সৌজন্য ও সদাশয়তায় আস্থা না দেখাইয়া, দুর্দান্ত দানবের ন্যায় যাহাদের শোনিতপাত করিয়াছিল, তাহাদের রাজধানীতে অধিকার স্থাপন এবং তাহাদের সমক্ষে আত্মপ্রাধান্য খালাসীদের অনভিপ্রেত ছিল না। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহারা দিল্লীস্থিত সিপাহীদিগের ক্ষমতা নাশে বিমুখ হইত না। এদিকে দিল্লীর মোগলের সহিত আফগানদিগেরও তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। মোগলেরা এক সময়ে আফগানিস্তানের পার্বত্য প্রদেশবাসীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আফগানেরাও এক সময়ে মোগলের শোনিতপাতে অগ্রসর হইয়াছিল। সুতরাং পুনর্বার মোগলের রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইতে এবং মোগলদের প্রাধান্য নাশ জন্য সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আফগানেরা ঔদাস্য বা অসম্মতি প্রকাশ করিত না। স্যার জন লরেন্স স্বীয় তীক্ষ্ম বুদ্ধিবলে এই বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তিনি আত্মবল বৃদ্ধির নিমিত্ত আফগান ও শিখদের সাহায্য গ্রহণে উদ্যত হইলেন। গভর্নর জেনারেল এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।[১]

ভুল বুঝে অথবা যে কোন কারণে হোক ইংরাজদের শোনিতপাতে শিখ সৈনিকগণও দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহা নিম্ন উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় ঃ

বারানসীতে যাহা ঘটিয়াছিল. তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ যদি জৌনপুরের

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

ইউরোপীয় সেনাপতির নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সেনাপতি তত্রত্য শিখ সৈন্যদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে বিশিষ্ট সত্বরতা সহকারে এক সৈনিক নিবাস হইতে আর এক সৈনিক নিবাসে সংবাদ প্রেরিত হইত না। এদিকে বাজারে গুজব সকল যেন বাতাসের উপর-ভর করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। এক সেনানিবাসের সেনাপতি অপর সেনানিবাসের বিবরণ জানিয়া সাবধান হইতে না হইতেই তাঁহার অধীন সৈন্যগণ বাজার গুজব শুনিয়া অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিত। ৪ঠা জুন জৌনপুরে গুজব উঠিল যে, আজিমগড়ের সৈন্যগণ কোম্পানীর বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপরদিন বারানসীর ৩৭ গণিত সিপাহী সৈন্যদলের কথা জৌনপুরবাসীরা জানিতে পারিল। জৌনপুরের শিখ-সৈনিকেরা এ সংবাদে কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ করিল না। তাহারা সেই পলায়িত ও ইতস্তত ধাবিত সিপাহীদিগের আক্রমণ হইতে জৌনপুরের ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে সজ্জিত হইয়া রহিল।

ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীগণ উক্ত সিপাহীদিগের ভয়ে কাছারী গৃহে আশ্রয় লইল। শিখ-সৈনিকেরা অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখ-ভাগে সজ্জিত থাকিল। বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় সংবাদ আসিল যে ৩৭ গণিত সিপাহীরা নিকটবর্তী কুঠি লুঠ করিয়া লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। জৌনপুরের ইউরোপীয়গণ এই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ অন্তর্হিত হইল না; জৌনপুরের শিখ সৈন্য ৩৭ গণিত সিপাহীদিগের পলায়ন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদিগের স্বদেশীয় শিখদিগের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অবগত হইল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয়দিগের হস্তে বারানসীর শিখদিগের নিধনের সংবাদে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানী হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পুরুবিয়া, সকল সৈনিক পুরুষকেই সমূলে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এ বিশ্বাস ক্রমে গভীর হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গভীর ভয়-মনোবেদনার সঞ্চার করিল। তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া যে অস্ত্রে ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিবার সংকল্প করিয়াছিল, সেই অস্ত্রেই তাহাদের শোনিতপাতে উদ্যত হইল।

সেনানায়ক মরা যখন কাছারীর বারান্দায় দণ্ডায়মান ছিলেন তখন সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। বারান্দাস্থিত আর একজন ইউরোপীয়, এই শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, সেনানায়ক বারান্দায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে রুধির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, বন্দুকের গুলী তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিখ সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলীতেই যে সেনানায়ক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছেন, ইহা ইউরোপীয়েরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহারা শশব্যস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব সংহারক কালের বিকট ছায়া এখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইল। তাঁহারা এই ভয়ঙ্করী ছায়ায় হতবুদ্ধি হইয়া, প্রতিক্ষণেই আপনাদের প্রাণ নাশ হইল বলিয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন এবং কেহ কেহ অন্তিম সময়ে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এদিকে জৌনপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কারাগৃহে যাইবার পথে নিহত হইলেন। উত্তেজিত শিখ সৈন্য অতঃপর ধনাগার বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ধনাগারে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা ছিল। সিপাহীরা সমস্ত বিলুণ্ঠিত করিল। জৌনপুরে ইংরেজের ক্ষমতা বা প্রাধান্যের কোন চিহ্ন রহিল না। সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সমস্তই গোলযোগপূর্ণ ও সমস্তই অরাজকতার নিদর্শন জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। কাছারীগৃহের ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। সেনানায়ক মরা এ সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোন আশা ছিল না, গুলীর আঘাতজনিত ক্ষত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল।

পলায়নোদ্যত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহারা আসন্ন মৃত্যু সেনানায়ককে পথে ফেলিয়া কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে, কেহবা শকটারোহণে পালাইতে লাগিলেন; পথে হতভাগ্য মরার মৃত্যু হইল। তদীয় পত্নীও কিয়দ্দূর যাইয়া সন্ন্যাস রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।[১]

মোগল রাজ্য যেমন ভারতীয়দের জাতীয় রাজ্য এবং অসাম্প্রদায়িক ছিল, শিখ রাজ্য তদ্রূপ অসাম্প্রদায়িক ছিল বলে মনে হয়। জানা যায়, রাজা রণজিৎ সিংহের এক সময়ের প্রধান মন্ত্রীর নাম ফকীর নুরুদ্দীন। এ হতে

---

[১] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত, তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় অধ্যায়। জৌনপুর শিখ সৈন্য, পৃঃ ৭৭-৭৮-৭৯।

অনুমিত হয় শিখরাজ্য বলে যে বিপুল ভাবে প্রচার করা হয়েছে ইংরেজদের সময়টিতে তাদের পরিকল্পনায় সম্ভবত ইংরাজরা এই প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে তুমুল বেগে। কারণটা অতি সহজ। শিখ রাজ্যের নাম বললে, মুসলমান এবং হিন্দুদের তার মধ্যে কোন স্থান থাকে না। এর ফলে এই প্রচারণা চালান হয়েছিল। মোগলরা যদিও ভারতে জাতীয় শাসন কায়েম করেছিল, তথাপি ইংরাজরা একে মুসলমান শাসন বলে চালিয়ে এসেছে একই কৌশলে। মারাঠা শাসন বলতে হিন্দু শাসন বোঝান হয়েছে। কিন্তু মারাঠা রাজার অধীনে অনেক পদস্থ ব্যক্তি মুসলমান ছিল। এটা ইতিহাসের পাতায় এখনও অম্লানভাবে রয়েছে। কিন্তু সুচতুর ইংরাজদের প্রচারে দেখানো হয়েছে এটা হিন্দু রাজ্য। এই প্রচারের ব্যাপকতা ও মহিমার শক্তিতে ইংরাজরা প্রায় পৌনে দু'শত বছর আমাদের শোষণ, নিষ্পেষণ, হত্যা এবং পায়ের তলায় পিষ্ট করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। যতদিন মানব সভ্যতা থাকবে, ততদিন এই কলংক মুছবে না জানি। এ দেশীয় শিক্ষিত এবং ইংরাজ শাসনে লাভবান ব্যক্তিবর্গ এই সহজ সত্যগুলি ধরতে যে পারত না তা নয়। তবে তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্বার্থে এবং ক্ষমতার লোভে এরা পশুর মত নির্বোধ হয়ে রয়েছিল। পরিতাপের ও আফসোসের বিষয় হলেও শত শত মীরজাফরের প্রেতাত্মার আত্মঘাতী শনির প্রভাব হতে তখনকার মত আজও আমরা মুক্তি পাই নি।

আসল কথা হ'ল ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারতে কখনও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। এই সুপেয় মধু আমদানী করে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা এবং পরবর্তীকালে তাদের চেলা-চামুণ্ডারাই এই আত্মঘাতী বস্তুকে ব্যবহার করে আসছে নানা কায়দা ও কৌশলের মাধ্যমে। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের শাসন এবং মারাঠা শিবাজীর শাসনকে ভারতের অধিকাংশ জনগণ অন্তর দিয়ে স্বীকার করে আসেনি। রাজায় রাজায় বা শাসকে শাসকে লড়াই হয়েছিল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কখনই যুদ্ধ হয়নি। ভারতের ইতিহাস যদিও সঠিকভাবে নিরপেক্ষতা নিয়ে এখনও রচিত হয় নাই, তবু বিদেশীদের লিখিত এবং তাদের প্রভাবাধীনে থেকে যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার উপর নির্ভর করেও এ সব কথা বলা যায়। এক সময়ের সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা এবং পরবর্তীকালের সাধক প্রখ্যাত দার্শনিক শ্রী অরবিন্দ ঘোষের মন্তব্য এখানে কিছুটা দেওয়া হল ঃ

> মুসলমান বিজয়ের দ্বারা যে সমস্যাটি উঠিয়াছিল, সেটি বস্তুত বিদেশীর পরাধীনতা এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার সমস্যা ছিল না।
>
> মোগল সাম্রাজ্যটি ছিল এক মহান ও চমৎকার সৃষ্টি, তার গঠন ও সংরক্ষণে অপরিসীম রাজনীতিক প্রতিভা ও বুদ্ধি নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহা ছিল কীর্তি মণ্ডিত শক্তিশালী। জনহিত সাধন এবং আরও বলা যাইতে পারে যে, আওরঙ্গজেবের প্রবল গোঁড়ামী সত্ত্বেও সেটি ধর্মের ব্যাপারে মধ্যযুগের ও সমসাময়িক সকল ইউরোপীয় রাজ্য ও সাম্রাজ্যের তুলনায় যে কত বেশী উদার ও সহনশীল ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না এবং তাহার অধীনে ভারত সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক শক্তিতে আর্থিক ঐশ্বর্যে এবং আর্ট ও কৃষ্টির গৌরব অনেক উচ্চে উঠিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব সাম্রাজ্যের ন্যায় এটিও বরং আরও শোচনীয়ভাবেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং সেই একই প্রণালীতে; বহিঃশত্রুর আক্রমণে নহে, অন্তর্বিপ্লবের ফলে।[১]

অন্তর্বিপ্লবের ফল কি ? আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না। আমরা বলতে চাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কতিপয় ক্ষমতা লোভী এবং অর্থপিপাসু লোকের চক্রান্তে, জনসমুদ্রের অজান্তে অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে প্রদেশগুলি একটার পর একটা অধিকার করতে থাকে, অবশ্য এজন্য দায়ী আমরাই। দেশীয় লোকেরা ইংরাজের পক্ষে যোগ দেয়। কেহবা পদ লোভে, কেহবা অর্থ এবং চাকুরীর লোভে। নইলে ইংরাজ সাম্রাজ্য ভারতে কখনই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হত না। মোগল শাসন সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ যা বলেছেন, তা সকলের পক্ষে ভাববার কথা বলে আমরা মনে করি। বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ দিবস পালন করতে গিয়ে দিল্লীর এক জনসভায় পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু বলেছেন, "ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ভারতের দেহ এবং মোগল সভ্যতা ভারতের আত্মাস্বরূপ।

মোগল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের অপরাপর রাজগণ শাসনে, সভ্যতায় মোগলদের থেকে কোন কিছুতে উৎকর্ষতা দেখাতে পারেন নি বলে আমরা মনে করি। আর একটি কথা এখানে না বললে আমাদের বক্তব্য বিষয়গুলি পরিষ্কার হয়ে উঠে না। তা হল এই যে, যদিও কতিপয় লোকের মগজে

---

[১] ভারতের রাষ্ট্রনীতিক প্রতিভা : শ্রী অরবিন্দ ঘোষের—A Defence of Indian Culture হইতে অনূদিত। অনুবাদক—শ্রী অনিল বরণ রায়। ভারতীয় ঐক্য-সাধন সমস্যা। পৃঃ ১২৭-১২৮।

আজও একটি কথা ঘুরপাক খাচ্ছে, তাহা হল ইংরাজরা ভারত অধিকার করবার সময় ভারতীয়দের থেকে সভ্যভব্য বেশী ছিল। এ সব উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত প্রচার মার্কা কথা তাদের মগজেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে নি, থাকছে না, তারা লেখনীর মাধ্যমেও এ সব কথা এখনও নানা কায়দায় বলে আসবার চেষ্টা পাচ্ছে। যদি সত্য-তত্ত্বের উপর নির্ভর করে বলত তবে আপত্তির কিছুই ছিল না। এর যথাযথ উত্তর পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। তবে ইংরাজরা যুদ্ধগুলিতে এ ভাবে জিতল কেন ? এর জবাব মাত্র এইটুকুই বললে যথেষ্ট হবে যে, প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের রোমানদের পরাজয় কাদের কাছে ঘটেছিল ? যাদের কাছে ঘটেছিল, তারা এর দুই সুসভ্য জাতির তুলনায় অসভ্য ছিল কি ? আরও বলা যায়—বাগদাদের খলীফা পরাজিত হল অসভ্য মোগল বাহিনীর নিকট। ইংরাজদের জয়টাও ভারতীয়দের উপর এইরূপে হয়েছিল।

বাংলায় যেমন প্রথম ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তাচলগামী হয়, বাংগালী ভূস্বামী, ফকীর, সন্ন্যাসী, প্রজাসাধারণ সকলে মিলে সেই হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার মানসে যে গণবিদ্রোহ ঘটিয়েছিল, যদিও সে সব কথা ইংরাজরা সতর্কতার সহিত গোপন করে এসেছে। কিন্তু অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ভুলক্রমে ও তাঁর স্বার্থপরভাবে সম্রাটকে ঐ সময় পরিচালিত না করতেন, তবে অংকুরেই বাঙ্গালীরা হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করত বলে মনে হয়। আসল কথা সম্রাটকে সুজাউদ্দৌলা পণ্য হিসাবে বিক্রি করবার সুযোগ গ্রহণ করে এসেছে বারবার। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম সকল সম্প্রদায়ের লোক করে এসেছে। নেপালীরা বিশ্বাসঘাতক, তারা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিপক্ষতা করে এসেছে। এই অপবাদ গোটা নেপালী সম্প্রদায়ের উপর চাপানো যায় না। লক্ষ লক্ষ নেপালীর মধ্যে ক'জন নেপালী ইংরাজদের সহযোগিতা করেছিল ? যারা করেছিল তাদের সংখ্যা অতি সামান্য মাত্র। এই দিয়ে গোটা নেপালের উপর এত বড় অপবাদ চাপানো চলে না। রাজা জঙ্গ বাহাদুর এবং তার চেলা-চামুণ্ডারাই এ জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী। নেপাল যখন অধিকার করতে যায় ইংরাজরা, তখন অযোধ্যার নবাব প্রচুর ভাবে ইংরাজদের সাহায্য করে। অন্যের জন্য কবর খুঁড়তে গেলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কবরও যে খোড়া হয়, এই প্রবাদবাক্য অযোধ্যার নবাবদের পক্ষেও খাটে।

মৌলভী আহমদ শাহ

মৌলভী আহমদ শাহের মত মহাবীরকে বন্দুকের গুলীতে শহীদ করবার লোকের অভাব যে দেশে হয় না, সে দেশের ভাগ্যে শুধু বিড়ম্বনাই যে থাকবে, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ঐতিহাসিক মেহতাজীর ইতিহাসের খানিকটা এখানে দেওয়া হল ঃ

> আজিমুল্লা ছিলেন কূটনীতি বিশারদ। আর ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ শাহ্ ছিলেন সাধারণ সংগঠন শক্তির আধার। জ্বালাময়ী ভাষা ছিল তাঁর কণ্ঠে। তা দিয়ে জনগণকে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিতেন অনায়াসে। অযোধ্যায় বিদ্রোহের যে দ্রুত ব্যাপক সাফল্য ঘটেছিল তার কৃতিত্ব অনেকখানি এই আহমদ শাহের। ব্রিটিশেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। বিদ্রোহীরা কয়েদখানা ভেঙ্গে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে, উদ্ধার করে ফাঁসির মঞ্চ থেকে। মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসে তিনি আসন গ্রহণ করলেন জনতার উদ্বেলিত হৃদয়ে। যুদ্ধে ও সংগঠনে তিনি ভয়লেশহীন বিক্রমের পরিচয় দিয়েছেন।
>
> বিদ্রোহী সেনানায়কদের মধ্যে বীরত্বের অভাব ছিল না কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল সামান্যই। ব্রিটিশের বহু ঝানু ও অভিজ্ঞ সেনাপতির বিরুদ্ধে তাঁদের লড়তে হয়েছে। সুতরাং আশ্চর্য নয় যে সম্মুখযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতিদের কাছে তাঁরা পরাজিত হয়েছেন। তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে—বিদ্রোহী সেনাপতিরা আহমদ শাহ, কুমার সিংহ, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাই, সবাই অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের কৃতিত্ব সবচেয়ে প্রকাশ পেয়েছে গেরিলা যুদ্ধে। ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই দুই বছর তারা অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসাধারণ সাহস ও অভূতপূর্ব দক্ষতায় ব্রিটিশ শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে।
>
> —আঠারো শ' সাতান্নর বিদ্রোহ, পৃঃ ৫২-৫৩

জগদিশপুরের জমিদার কুমার সিংহ তাঁর দেশপ্রেম এবং সাহসীকতা সর্বোপরি গেরিলা যুদ্ধের অত্যদ্ভুত কৌশল এবং আক্রমণ করবার ক্ষমতা প্রভৃতির কথা মনে করলে, আমাদের বক্ষ আরও স্ফীত হয়ে উঠে। রাজা নানা সাহেবের বন্ধু ও সেনাপতি তাঁতিয়া টোপীর কথা স্মরণ করলে আমরা যেমন ব্যথিত হয়ে উঠি, তেমনি নবতেজে আবার যুদ্ধ করবার

জন্য মন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই বীরকে ইংরাজরা সাধারণ কয়েদীর মত রেখে হত্যা করেন। তিনি শহীদ হওয়ার পূর্বে যে বাণী দিয়েছেন, শ্রদ্ধার সাথে তা আমরা স্মরণ করি। তিনি বলেছিলেন ঃ "দেশের লোককে দেখাইও আমার খণ্ডিত শির। সংসারে এমন শির বেশী নেই।" ঝাঁসির রানী, অযোধ্যার বেগম—এ'রা সবাই আমাদের চোখের মণি হয়ে রয়েছেন। এমনি অগণিত বীর-বীরাঙ্গনাদের আমরা হৃদয়ে ভক্তিপ্লুত মনে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করতে থাকব যুগ-যুগান্তর ধরে।

> অশ্বারোহী সৈন্য বল সম্পন্ন ছিলেন আহমদ শাহ। তাঁহার পরাজয় সুসাধ্য হইল না। এদিকে নানা স্থান হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য আসিতে লাগিল। শাহাজাদা ফিরোজ শাহ তাঁহার সৈনিক দলের সহিত সম্মিলিত হইলেন। নানা সাহেবের সৈন্যে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বর্ধিত হইল। বেগম হজরত মহল তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। মৌলভী ১৫ই মে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সমস্ত দিন যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয়-পরাজয় স্থির হইল না। এই সংবাদ পাইয়া প্রধান প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে উপস্থিত হইলেন। পানহাট নামক স্থানের যুদ্ধে বিপক্ষেরা যথোচিত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া হটিয়া গেল মাত্র। ইংরেজ সৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসর হইল না। প্রধান সেনাপতি স্বপক্ষের আর একজন অধিনায়ককে তাঁহার অধীন সৈনিক দলের সহিত আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি ২৪শে মে সমগ্র সৈন্য লইয়া মৌলভীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মৌলভী মোহমদিতে ছিলেন। তাঁহার অশ্বারোহীগণ ইংরাজ সৈন্যকে বাধা দিতে লাগিল। ইহাতে ইংরাজ পক্ষের সৈনিকেরা কামান চালাইবার জন্য কিছুকাল বিলম্ব করিল। এই অবসরে মৌলভী যাবতীয় দুর্গ বিনষ্ট করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাচিয়ানীর অরণ্য পরিবেষ্টিত মৃন্ময় দুর্গ এক সময়ে পলাতক ইউরোপীয়দিগের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল, তাহাও বিধ্বস্ত হইল।
>
> মৌলভী অতঃপর বল সম্পন্ন হইবার জন্য আবার অভিনব উপায়ের উদ্ভাবনে উদ্যত হইলেন। ইংরেজের উপর তাঁহার সাতিশয় বিদ্বেষ ভাব ছিল। কথিত আছে, যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নানা শ্রেণীর লোককে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি এখন অযোধ্যার বেগমের অর্থে প্রবল এবং আপনার ক্ষমতা ও প্রাধান্যে অটল হইয়া, ৫ই জুন অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ডের প্রান্তভাগে

শাহজাহান পুরের তের মাইল উত্তর-পূর্বে পোয়াইন নামক নগরে যাত্রা করেন। এই স্থানের রাজা জগন্নাথ সিংহের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। মৌলভীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি রাজাকে স্বপক্ষে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি পোয়াইনে যাইবার পূর্বে রাজাকে আপনার সংকল্প জানাইয়াছিলেন। রাজাও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং মৌলভী আশ্বস্ত হৃদয়ে পোয়াইনে গমন করিলেন। তিনি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, নগরের দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীরের উপর রাজা, তাহার ভ্রাতা এবং সশস্ত্র অনুচরগণ অবস্থিতি করিতেছে। এই অচিন্ত্যপুর্ব্ব দৃশ্যে মৌলভী চমকিত হইলেন। তাহার উদ্বোধ হইল যে, যাবৎ তিনি স্বকীয় বক্তৃতার শক্তিতে রাজার হৃদয়ে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতে না পারিবেন, তাবৎ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তিনি যে হস্তীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হস্তী দ্বারা নগরের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। চালকের ইঙ্গিতে শক্তিশালী মাতঙ্গ অগ্রসর হইল এবং প্রকাণ্ড মস্তক দ্বারা দ্বারদেশ এমন বেগে ঠেলিতে লাগিল যে, কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উহা ভগ্নপ্রায় হইল। রাজার ভ্রাতা ইহা দেখিয়া মৌলভীর প্রতি গুলী ছুঁড়িলেন। নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতে মৌলভী দেহ ত্যাগ করিলেন। তাহার অনুচরেরা পলায়ন করিল। রাজা তাহার ভ্রাতা অতঃপর মৌলভীর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং ছিন্ন মস্তক কাপড়ে জড়াইয়া উহা সঙ্গে লইয়া শাহজাহানপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তাহারা উপস্থিত হয়েন তখন ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধুগণের সহিত ভোজন করিতেছিলেন। অবিলম্বে বাসনাকৃত মূল্যবান পদার্থ তাহাদের নিকটে স্থাপিত হইল। আবরণ উন্মোচনের পর তাহারা দেখিলেন, পরম শত্রু মৌলভীর রুধিরলিপ্ত ছিন্ন মস্তক তাহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। পরদিন সাধারণকে উৎসাহিত বা সন্ত্রাসিত করিবার জন্য উহা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত হইল। গভর্নমেণ্ট রাজাকে মৌলভীর ছিন্ন মস্তকের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পারিতোষিক দিলেন। একজন ঐতিহাসিক এইভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই রূপে ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ উল্লার মৃত্যু হইল। কেহ অন্যায়রূপে স্বাধীনতার বিধ্বংস দর্শনে সেই স্বাধীনতার পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করিলে যদি দেশ হিতৈষী বলিয়া গুণ্য হয়, তাহা হইলে মৌলভী

নিঃসন্দেহে প্রকৃত দেশ হিতৈষী। প্রকৃতপক্ষে গুপ্তভাবে কাহাকেও বধ করিয়া আপনার তরবারি কলঙ্কিত করেন নাই, তিনি নরহত্যাতেও লিপ্ত হয়েন নাই। যে বৈদেশিকগণ তাঁহার দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরুষোচিত পরাক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় জাতির সাহসী এবং হৃদয়বান লোকেরই বরণীয়।

এইরূপে ইংরাজ লেখক স্বজাতির পরম শত্রুর প্রশংসা করিয়া অপরিসীম মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুত উদ্ধৃত অংশ ইংরাজ জাতির অসামান্য মহানুভবতার পরিচয়স্থল। স্বদেশ প্রেমিক ইংরেজ—মৌলভীর কার্যে তদীয় স্বদেশ প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখিতে পারেন, বীরোচিত গুণে অলংকৃত ইংরাজের নিকটে মৌলভীর বীরত্ব প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু এই বীরের তিরোভাবে যে ইংরাজ এ সময়ে একটি পরাক্রান্ত শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মৌলভী প্রভৃত ক্ষমতাশালী, নির্ভীক, দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং ইংরেজের প্রতিপক্ষের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার দেহ দীর্ঘ ও সুগঠিত, তাঁহার চক্ষু বৃহৎ, তাঁহার ললাট বিস্তৃত এবং তাঁহার নাসিকা উন্নত ছিল। তাঁহার প্রতিপক্ষ বীর পুরুষেরা তদীয় সমর-চাতুরী এবং সৈন্য পরিচালনা কৌশলের প্রশংসা করিতে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দুইবার প্রধান সেনাপতি স্যার কোলিন ক্যাম্পবেলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্যার কোলিনের ন্যায় বীর পুরুষ-কেও তাঁহার সমর-চাতুরীর প্রশংসা করিতে হইয়াছিল।[১]

রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত বিজনোর জেলাতে গোলযোগ ঘটে। সেক্সপিয়র এই জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ছিলেন। আলীগড় নিবাসী সৈয়দ আহমদ সাবজজের কর্ম করিতেছিলেন। উপস্থিত বিপ্লবে ইহার যথোচিত রাজভক্তি ও কর্মক্ষমতা পরিস্ফুট হয়। ইঁহার সাহায্যে ইংরেজেরা অক্ষত শরীরে পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করেন। ইনি ইংরেজের অনুপস্থিতিকালে বিজনোরের শাসনকার্যে ব্যাপৃত হয়েন, শেষে বিজনোরের গোলযোগ অন্তর্হিত হইয়া যায়।[২]

---

১. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত। পঞ্চম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অধ্যায়, দিল্লী, পৃঃ ৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫।

২. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত। পঞ্চম ভাগ, ষষ্ঠ অধ্যায়, সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ, পৃষ্ঠা ৩৮১।

বিপ্লবের প্রারম্ভে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। এক স্থানের উত্তেজিত লোকে সর্ব্বপ্রথম যাহা করিয়াছে, স্থানান্তরের উত্তেজিত লোকে সর্বপ্রথম তাহারই সম্পাদনে আগ্রহ যুক্ত হইয়াছে। সকল স্থানের অনুষ্ঠিত ঘটনা যেন এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া এক উদ্দেশ্যের অবতারণা করিয়াছে। ধনাগার লুণ্ঠন, কারাগারের কয়েদীদিগের বিমুক্তি সাধন, ইউরোপীয়দিগের নিধন, উত্তেজিত লোকের প্রথম অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং যেখানে সিপাহীগণ উত্তেজিত ও গভর্নমেন্টের প্রাধান্য নাশের জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে, সেইখানে সর্বপ্রথম এই সকল ভয়ংকর দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে।[1]

শ্রীরামচন্দ্র বর্মণের সাক্ষাৎকার বিবরণী[2]

শ্রীরামচন্দ্র বর্মণ (বয়স অনুমান ১০৫ বছর) ওরফে চিকারাম, পিতা সুবোধচন্দ্র বর্মণ, সাং—খটখটিয়া, থানা—কোতওয়ালী. জেলা—রংপুর। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের সময় আমার বয়স অনুমান ৩৫/৩৬ বছর ছিল। পূর্বে বর্তমান রংপুর শহর ছিল না। এখানে ফুলচৌকীর মোগল রাজার বংশধররা সময় সময় বাস করতেন। তাদের রঙমহল এখানে ছিল। সেই আমলের দালান দুই মহলা কয়েকটি আমি দেখেছি। কামাল কাশানা, বাকের কাশানা, নবাব কাশানা, কাশানা এই সব দালানের গায়ে মানুষের চেয়ে লম্বায় ও প্রস্থে বড় বড় কাঁচ লাগানো ছিল। ঐ সমস্ত কাঁচ-ভাঙ্গা টুকরা অবস্থায় আমরা অনেক দেখেছি। বহু ফুল গাছ, লিচু গাছও দেখেছি। তবে লোকজন ছিল না। বিরান অবস্থায় এই সব জায়গা ছিল। বন্য শূকর, বাঘ এই সব আগাছা জঙ্গলে ছিল। আগে রংপুর শহর মাহিগঞ্জের পূর্ব দিকে ছিল। মাহিগঞ্জে বড় বড় ব্যবসায়ী, দোকান খামার ছিল। জমিদারদের বাড়ী সব মাহিগঞ্জে ছিল। কোর্ট, কাছারী, হাসপাতাল এ সব পরে হয়েছে। ১৩০৪ সালের পর সদর হাসপাতাল হয়। এর পূর্বে ধাপে ডিমলার কাছারীতে ডাক্তারখানা ও ৪ বেডের হাসপাতাল ছিল। এই সব স্থান পূর্বে আগাছা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। হাসপাতালের পার্শ্বে একটা দুই মহলা ভাঙা দালান, পশু ডাক্তারখানার পার্শ্বে আরও একটি

---

[1] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস: শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত। পঞ্চম ভাগ. উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পৃষ্ঠা ৭৩।

[2] সাক্ষাৎ-বিবরণী গ্রহণের তারিখ সন—১৩৫৬ সাল, ১ই আষাঢ়।

ভাঙা দুই মহলা দালান ছিল। বর্তমান রাউখমল মারোয়াড়ীর দোকান সংলগ্ন স্থানে আরও একটি বিরাট আকারের দুই মহলা দালান ছিল। এসব আমি নিজে বহুবার দেখেছি। আমি ছোটবেলা হতে দোকান করতাম। মাহিগঞ্জ থেকে সওদা কিনে বাড়ী নিয়ে যেতাম এবং সেখানে আমার সওদা বিক্রি করতাম। রঙমহলের কথা, ফুলচৌকীর মোগল রাজবংশীয়দের কথা লোকে খুব বেশী বলত না। ইংরাজ সরকারকে ভয় করে তাদের কথা প্রাচীনরা বলত না। আমি খটখটিয়া হতে এই পথে মাহিগঞ্জ যাওয়া-আসা করতাম। পূর্বের কামাল কাশানা শালবন নামক স্থানে শালের জঙ্গল পত্তন ইংরাজরা করেছিল। দেড় দু'শ শালগাছ হওয়া আমি নিজে দেখেছি।

রোহিনীচন্দ্র মিশ্রের সাক্ষাৎকার বিবরণী

রোহিনীচন্দ্র মিশ্র[১] বয়স ৭৬ বছর ও ভ্রাতা শরৎচন্দ্র মিশ্র বয়স ৭১ বছর। নিবাস পাংগা, জিলা রংপুর। উক্ত দুই ভ্রাতা তাদের সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেন, "শ্রী নগেন্দ্র নাথ পাঠকের পুত্রদ্বয় শ্রী জিতেন্দ্র নাথ পাঠক ও মুনিন্দ্রনাথ পাঠক—এ'রা ইংরাজ বিরোধী নেতা ও নবাবের সেনাপতি রাজা ভবানী পাঠকের বংশধর। এটা আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে বংশ-পরম্পরায় শুনে এসেছি। তাঁরা আরও বলেন যে, সুবার বাড়ী সুবার কোট-এর এক মাইল দূরবর্তী রামদাশ নামক গ্রামে আর একটি কোটের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। উক্ত কোটকে পোড়ার কোট বলা হয়। সম্ভবত যুদ্ধে হারার পর উক্ত দুর্গটি ইংরাজরা পুড়িয়ে দিয়েছিল। উক্ত পোড়া কোটের অধ্যক্ষ ছিলেন মজুমদার নামীয় এক ব্রাহ্মণ। তার নাম আমরা জানি না। তবে উক্ত মজুমদার সেনানায়কের এক পুত্র—তার নাম কালি বর্মা মজুমদার ছিল। ইনি পরবর্তীকালে পাঠক পাড়া গ্রামে রাজা ভবানী পাঠকের বংশধরদের আশ্রয়ে থেকে শেষে মারা যান। তারা আরও বলেন, উক্ত পোড়ার কোট বা গড়ে পাংগেশ্বরী দেবীমূর্তি ছিল। পরে পাংগার জমিদাররা ঐ মূর্তি নিয়ে যান। পাংগার জমিদার বংশ কুচবিহার মহারাজাদের আত্মীয়। 'শান্তুবংশ চরিত' ও 'হরিদাসের

---

[১] রোহিনীচন্দ্র মিশ্র ও ভ্রাতা শরৎচন্দ্র মিশ্র। ইহাদের বাড়ী রংপুর জিলাস্থ কুড়িগ্রাম মহকুমার রাজার হাট থানায় অবস্থিত। ভবানী পাঠক যে সন্ন্যাসী ছিলেন না, পাঠকের অধঃস্তন বর্তমান বংশধররা সত্য সত্যই পাঠকের আইনসংগত বংশধর—একথা উক্ত ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় ও আরও ব্রাহ্মণেরা আমাকে বলেছেন। সাক্ষাতকারের সময় ১৯৫১ ইং খৃষ্টাব্দের ১লা জুন।

গুপ্ত কথা' এই ছাপানো গ্রন্থ ২ খানির মধ্যে সুবাদার ও রাজা ভবানী পাঠকের কথা লিখিত ছিল। আমরা ছোটবেলায় খুব গোপনে পড়েছি। পরে ঐ বই আমাদের প্রাচীনরা পুড়িয়ে ফেলে। পূর্বের বাঙ্গালা টাইপ পূর্বের প্রচলিত ভাষায় গ্রন্থ ২ খানি লিখিত ও ছাপা হয়েছিল। পাংগা হতে রাজা ভবানী পাঠকের গ্রামের দূরত্ব ১২ মাইল হবে। নবাব নূর-উদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গের রাজধানী ফুলচৌকী নামক স্থানে ছিল। ইনি মোগল শাহী বংশের লোক ছিলেন। এঁরই সেনানায়ক রাজা ভবানী পাঠক ও কালী বর্মা মজুমদারের পিতা ছিলেন। ফুলচৌকীর পাশে কচুয়া, সাহেবগঞ্জ ঐখানে সন্ন্যাসী দলের নেতা মহারাজ হনুমানগিরি বাস করতেন। ইঁনিও পূর্বোক্তদের সহিত ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এমনি ধরনের বহু কথা উক্ত ইতিহাস ২ খানিতে লিপিবদ্ধ ছিল। এসব কথা পূর্বে একেবারে আলোচনা বা বলা হত না। মাঝে মধ্যে ২।৫।৭ বছর পর কোন কথা প্রসঙ্গে কথা উঠলে তবে বৃদ্ধরা বলতেন। তাও আবার খুব সংক্ষেপে। আমরাও ইংরাজ আমলে এ সব কথা বলাবলি করি নি। ইতিহাস লিখবার জন্য আমাদের নিকট এর পূর্বে কোন লোক আসে নি।

মোহাম্মদ আলী আবুল খয়ের চৌধুরীর সাক্ষাৎ বিবরণী

মোহাম্মদ আলী আবুল খয়ের চৌধুরী, জন্ম ১৩০৪ সাল, পিতা মোঃ আবদুল গফুর চৌধুরী, নিবাস ভাংনি, থানা মিঠাপুকুর, জিলা রংপুর।

উক্ত আলী আবুল খয়ের চৌধুরী তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেন ঃ ভাংনি নিবাসী খাওয়াজা খয়রুদ্দীন চৌধুরীর একমাত্র কন্যা ছিলেন বেগম খয়রতন নেসা। খাজা সাহেবের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। বেগম খয়রতন নেসার বিয়ে হয় দিল্লীর মোগল রাজবংশীয় ফুলচৌকী নিবাসী কামালউদ্দীন মোহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র গোউসউদ্দীন মোহাম্মদের সহিত।

প্রশ্নঃ ভাংনি স্টেটের প্রথম জমিদার খয়রুদ্দীন সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি ?

উঃ জিদু হাঁ, জানি। পূর্ব হতেই এর অবস্থা সচ্ছল ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। কিছু জোত-জমা ছিল।

প্রঃ বিরাট আকারের জমিদারী কিভাবে তিনি পেলেন। তৎসম্পর্কে কিছু জানেন কি ?

উঃ জ্বি হাঁ, জানি। বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের প্রধান মহিষী রেঙ্গুনে নির্বাসিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের আপন মাতা মহিষী লালবিবিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে গুপ্তচরগিরির কাজ করায় খাওয়াজা খয়রুদ্দীন বিপুল জমিদারীর মালিক হন।

প্রঃ কোথায় কি ভাবে মহামান্যা বেগম লালবিবি সাহেবাকে হত্যা করা হয়, তাহা জানেন কি ?

উঃ জ্বি, হাঁ, এসব সম্পর্কে আমি এবং আমার মত আরও অনেকে ছোটবেলা হতে শুনে এসেছি।

প্রঃ তার কিছুটা এখানে বলবেন কি ?

উঃ নিশ্চয়ই বলব। মীরজাফর আলী খাঁ কোন সময় সুবাদার ছিলেন, সেই সময় দিল্লীর রাজবংশের এক লোক বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। তাঁর নূতন নির্মীয়মান রাজধানী ফুলচৌকীতে ছিল। তাঁর নাম হল নবাব নূর-উদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ। তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের অধীনে ইঁনি সুবাদারী করতে বাংলায় আসেন। সুবাদার নবাব সাহেবের মাতুলালয় ছিল তঙ্কা। মিঞা সাহেবেরা এই হিসাবে সুবাদার নবাব সাহেবের পূর্ব হতে পরিচয় ও সম্বন্ধ সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন। সুবাদারের নানার বংশের লোকেরা সৈয়দ বংশীয় ছিলেন। তাঁরা এতদঞ্চলে খুবই জনপ্রিয় প্রভাবশালী ভূস্বামী ছিলেন। শুনেছি বাদশাহর দরবারে এঁরা অনেক বড় বড় পদে কাজ করে এসেছেন। সুবাদার খুবই মিশুক, খুবই যোগ্য রাজনীতিবিদ ছিলেন বলে এতদঞ্চলের প্রাচীন লোকেরা বলতেন। প্রভাবশালী জমিদার, ধনপতি সন্ন্যাসী, ফকীর, মাতব্বর গোছের প্রজা এবং সাধারণ প্রজা সকলে এই নবাবকে সমর্থন করে মীরজাফর আলী খাঁর বিরুদ্ধে অনেক বছর ধরে লড়াই করেছেন। উক্ত সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হলেন বেগম লালবিবি সাহেবা।

প্রঃ কিভাবে মহিষী লালবিবিকে কোথায় হত্যা করল এবং এই ষড়যন্ত্রে কারা গুপ্তচরগিরি করেছে, তাদের নাম জানেন কি ?

উঃ কত লোক ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল, এত কথা জানি না। তবে প্রধান

যারা ছিল তাদের মধ্যে টাটি চৌধুরী, খাওয়াজা খয়রুদ্দীন চৌধুরী, খয়রুদ্দীন চৌধুরীর ভাতিজা নাবাল্লক সাহেব এবং ভাংনির দু'মাইল পূর্ব-দিকে সন্ন্যাসীদের যে ঠাকুর বাড়ী ছিল, সেই ঠাকুর বাড়ীর পরবর্তী কালের ভূস্বামী রংপুর নবাবগঞ্জের গুরুবাবু লাহিড়ীদের পূর্বপুরুষ এই ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করেছেন বলে অনেক লোকের নিকট শুনেছি।

প্র ঃ কোথায় লালবিবিকে ইংরাজরা হত্যা করেছিল তা কি জানেন ?

উ ঃ অবশ্যই জানি। মীরগঞ্জ নামক স্থানে। এ সব কথা হাজার হাজার লোক জানেন। মীরগঞ্জে মহিষী লালবিবির কবর রয়েছে। কবরের উপরে পাকা ঘর আছে। চতুষ্পার্শ্বে পাকা প্রাচীরে স্থানটি ঘেরা।

প্রঃ উক্ত কবর সম্পর্কে কেউ লিখেছে 'জনৈক ইউরোপীয় মহিলার কবর' এ সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান ?

উঃ আরে, তওবা তওবা, বাবা! কোন শয়তান এমন কথা লিখেছে বইয়ে ? এ সব কথা পূর্বে বলেছি হাজার হাজার লোক জানেন। এখনও বলে থাকেন। ফিরিঙ্গী কোন খৃস্টান মহিলার কবর হলে, সে কবর কি উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়, না থাকে, বাবা ? খৃস্টানদের যত কবর আমাদের দেশে দেখেছি সব পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে আছে। এ সব মিথ্যা কথা শুনলে মেজাজ কার না খারাপ হয় ? দিন যতই যাবে আরও কত লোক যে কত ভাবে এই রকম মিথ্যা কথা লিখবে তা খোদা ছাড়া আর কে বলবে বাবা ? আমি জোরের সাথে বলছি, এই লালবিবি সুবাদারের কন্যা আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের আপন মাতা ছিলেন।

প্রঃ কি করে দিল্লী হতে এসে তিনি এই মীরগঞ্জে মারা গেলেন, তা কি জানেন ?

উঃ যা শুনেছি তা এইরূপ। সুবাদারের দুই কন্যা আর দুই পুত্র ছিলেন। পুত্র-কন্যাদের মধ্যে এই বেগম লালবিবি বড় ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কামালউদ্দীন মোহাম্মদ বড় ও তাঁর ছোট জামালউদ্দীন মোহাম্মদ। সর্বকনিষ্ঠা কন্যার নাম চাঁদবিবি। শাহজাদা সুবাদার বাকের জঙ্গ-এর ছোট ভাই শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদ-এর একমাত্র পুত্র ওয়ালীদাদ মোহাম্মদের সাথে চাঁদবিবির বিয়ে হয়। শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহজাদা জামালউদ্দীন মোহাম্মদ এ'দের মান সম্মানের কথা না বলে,

ধন-সম্পদের কথা ও আমিরানার কথা যা ছোট বেলায় শুনেছি বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের কাছে, তাতে অবাক হওয়া ছাড়া আর কিছু থাকে না। ফুলচৌকীকে কি ভাবে সাজিয়েছিল সে সব স্থান যারা নিজের চোখে দেখে নি, তারা বুঝবে না, বিশ্বাসও করতে চাইবে না। দিল্লী থেকে বেগম লালবিবি সাহেবা ফুলচৌকীতে সময় সময় আসতেন—গোপনে ভাইয়ের বাড়ীতে। কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ইংরাজদের সহিত আপোস করেছিলেন। কিন্তু ভাইয়ের আপোস জেষ্ঠা ভগ্নি মেনে নেন নি। ঐ সময়ে ইংরাজরা প্রবল থাকলেও অনেক ফকীর নেতা ও সন্ন্যাসী নেতারা ইংরাজদের স্বীকার করে নিতে পারেন নি রাজা হিসাবে। দিল্লীর সুবিচারের কথা, প্রজাদের সুখ-সুবিধার কথা মানুষ তখনও একবারে ভুলে যায় নি। লাল-বিবির অপরিচিত জায়গা এই সব অঞ্চল পূর্ব হতে ছিল না। একদিন পিতার বৃদ্ধ সেনাপতি ফুল খাঁ চাকলার জমিদার রাজা ভবানী পাঠককে সংগে নিয়ে মহামান্যা বেগম লালবিবি, ফুলচৌকীস্থ ভাইয়ের প্রাসাদ হতে সামান্য মাত্র কিছু বিশ্বস্ত লোক নিয়ে মীরগঞ্জের উত্তরে সন্ন্যাসী মঠ ও ফকীরদের আস্তানার সাত আট শ' গজ দূরে ইংরাজরা হঠাৎ আক্রমণ করে রাজমহিষীকে গুলী করে হত্যা করে। ঐ স্থানে ঐ সময় রাজা ভবানী পাঠককেও গুলী করে হত্যা করা হয়। আরও ৩০/৪০ জন লোককেও হত্যা করা হয়। তাঁদের নাম আমি শুনি নি। তবে ঐখানে আরও অনেক কাঁচা কবর রয়েছে। যে স্থানে মহামান্যা সুলতানাকে হত্যা করা হয় ঐ স্থানে যে দীঘিটি রয়েছে সেই দীঘিটিকে 'সমর-দীঘি' বলা হয়ে থাকে। যে স্থানে ফকীরদের হত্যা করা হয় সে স্থানের পুকুরটিকে 'জিহাদ পুকুর' এখনও বলা হয়ে থাকে। লালবিবির ভ্রাতা শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ভগ্নির কবর বেঁধে দেন। কবরের উপর ঘর দেন। প্রাচীর দিয়ে ঘেরেন এবং দু' জায়গায় দু'টি পুকুর কেটে দেন যিয়ারতের জন্য, যাতে লোকেরা অযু করতে পারে। খাদেমের থাকবার ঘরও উত্তর পাশে ছিল। খাদেম ছিল মাযারে বাতি ও ফুল দেওয়ার জন্য। এ সব আমরা হরহামেশা দেখে এসেছি।

প্রঃ কোন্ সালে লালবিবিকে হত্যা করা হয়, তা শুনেছেন কি ?

উঃ সনের কথা গল্পের সময় উঠত না। তবে খোর্দ মুরাদপুরের (পায়রাবন্দ) আবু আলী চৌধুরী সাহেব এইসব কথা ইংরাজী ১৮৩৩ সাল বলেছিলেন বলে মনে পড়ছে।

প্র ঃ আপনি কি ফুলচৌকী কখনও গিয়েছিলেন ?

উ ঃ জ্বি হাঁ, গিয়েছি।

প্র ঃ প্রাসাদগুলি সব কি দেখেছেন ?

উ ঃ না। সরোবরের দু'দিকে সাজানো প্রাসাদগুলি, বালাখানার প্রাসাদ এ সমস্ত তখন ভাঙ্গা এবং শালবন ও অন্যান্য জঙ্গলে আবৃত হয়ে ভীষণ জঙ্গলাকার হয়েছিল।

প্র ঃ তবে কি করে বুঝলেন যে, এগুলি পরীস্থান বা এক সময় বেহেশতের মত ছিল ?

উ ঃ আমি যখন প্রথম যাই, তখন মূল প্রাসাদ, যে প্রাসাদে শাহজাদারা থাকতেন, সেটা এবং তার চতুষ্পার্শ্ব অক্ষত অবস্থায় ছিল। মনে হচ্ছিল বেহেশত যেন জোর করে ধরে নিয়ে এসে বসানো হয়েছে এই খানে।

প্র ঃ কখন গিয়েছিলেন প্রথম ?

উ ঃ তখন আমার বয়স ১৩/১৪ বছর হবে। ঐ সময় পায়রাবন্দের জমিদার আবু আলী চৌধুরী, ফতে আলী চৌধুরী—এরা একরূপ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিলেন। বিশাল জমিদারী, লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি কিছুই তখন ছিল না। আবু আলী চৌধুরী আমার আত্মীয় হন। সম্বন্ধে তিনি আমার ফুফা ছিলেন। ফুলচৌকী মোগল রাজবংশীয়দের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ছিল। যদিও আবু আলী সাহেবদের সাথে এদের আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু আমাদের সাথে আত্মীয়তা আছে এই জন্য আবু আলী চৌধুরী ফুফাজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফুলচৌকী যাবার জন্য বললেন। আমি ঐ সময় খোর্দ মুরাদপুরের আবু আলী চৌধুরীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফুফাজী সাহেবের ঐ সময় তিনটি মাদী ঘোড়া ছিল। তন্মধ্যে দুটি লাল মাদী ঘোড়ার একটি আমাকে দিলেন চড়তে এবং আর একটিতে তিনি চড়লেন। আমরা ফুলচৌকী গেলাম। দূর থেকে প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম যে, এমন পুরী জীবনে বুঝি আর দেখা হবে না। হয়েছেও ঠিক তাই। এর ব্যাখ্যা করবার মত সাধ্য-শক্তি আমার নেই। আমরা প্রাসাদের কিছু দূরে নামলাম। ফুফাজী আবু আলী চৌধুরী বললেন আর ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যাবে না, এখানে নামতে হবে। বাদশাহ বংশীয়দের সম্মান দেখাতে হবে। তিনি আগে নামলেন, আমি পড়ে নামলাম ঘোড়া হতে। আমার কানে তার

কোন কথাই আসছিল না। আমি অবাক বিস্মিত হয়ে অতুলনীয় সৌন্দর্যশালী পুরীর দিকে তাকাতেছিলাম এবং এর চতুষ্পার্শ্বেও তাকাচ্ছিলাম। সৌন্দর্যের লীলাভূমি বুঝি এই ফুলচৌকী ছিল। আমার বাড়ীর ও খোর্দ মুরাদপুরের অনেকের নিকট ফুলচৌকী রাজবাড়ীর সৌন্দর্যের কথা অনেক শুনেছি। কিন্তু কথার চেয়ে চোখ দিয়ে দেখলে আরও সুন্দর মনে হয়। গেটের কাছাকাছি যখন এলাম তখন গেটের সৌন্দর্য দেখে অবাক হচ্ছিলাম বারে বারে। আমার ও ফুফাজীর পরিচয়ের কথা দারোয়ানকে বললাম। দারোয়ান ভিতরে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। এক মহলা, দু'মহলা, তিন মহলায় উঠলাম আমরা। এর কার্নিশ থাম সিঁড়ি কত বড় বেশী বা কত ছোট হলে অপরূপ সুন্দর দেখাবে তাই দেখছিলাম সব কিছু ভুলে অবাক হয়ে। শাহজাদা গোউসউদ্দীন মোহাম্মদের কন্যা নাদেরননেসার সঙ্গে ছিল আমার আত্মীয় সম্পর্ক। সম্বন্ধে তিনি আমার ফুফু হন। আমাদের আসার কথা তিনি পূর্বেই শুনেছেন। সে জন্য তিনি ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন ঘরের মধ্যে। খুব দামী মোড়ায় তিনি বসেছিলেন। গায়ে সাদা মসলিন কাপড়। যৌবন পেরিয়ে গেছে, বৃদ্ধাই বলতে হবে। খাঁটি স্বর্ণের মত গায়ের রং। বেশ মোটা সোটা চেহারা। পায়ের নীচে দামী মখমলের চাদর ঢাকা মেঝে। আমাদের দেখা মাত্র বসে থেকে নির্দেশ করার ভঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন বসবার আসন। মুখ দিয়ে কথা বলেন নি। চোখ এবং আঙ্গুলের ইশারা দিয়ে বসতে বললেন। দেখলাম শাহজাদী সাহেবার বড় বড় চোখ দুটি দিয়ে আমাদের দেখছেন। মনে হল যেন চোখ দুটি ঝলমল করে জ্বলছে। ফুফাজী মাথা একেবারে নীচু করে বসেছিলেন। তখন না বুঝলেও পরে বুঝতে পেরেছি সম্মান দেখাবার জন্য তিনি নীচু করে বসেছিলেন। ফুফাজীর দেখাদেখি আমিও খুব মাথা নীচু করে বসেছিলাম। শাহজাদী সাহেবা শান্ত স্পষ্ট গলায় ফুফাজীকে তার আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলেন। ফুফাজী তার আর্থিক দুঃখ-দুর্দশার কথা বললেন। আমার পরিচয়ের কথা ফুফাজীর কাছে জিজ্ঞেস করায় ফুফাজী আমার পরিচয় দিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন দাসী এসে খুব নম্রভাবে কি যেন বললেন। আমাদের বসতে বলে তিনি ধীর পদক্ষেপে বার হয়ে গেলেন। ঘণ্টা দুই পর এক দাসী এসে বিনীতভাবে করজোড়ে

বললেন, খাবার প্রস্তুত, আপনারা আসুন। দাসী এমন আদবের সঙ্গে বলে চলে গেল, যা এখনকার খুব বড় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারাও তেমন আদব জানবে না। দেখাতেও পারবে না। আমরা খুবই তৃপ্তির সাথে খেলাম। শাহজাদী নাদেরননেসা নিজে বসে বসে নির্দেশ দিচ্ছেন, পরিচারিকারা খাওয়াচ্ছিলেন। তাঁরা যে বাদশাহের বংশধর, তাঁর প্রতিটি কথাবার্তা চাল-চলন, মেজাজে তা আমার বারবার মনে পড়ছিল, এখনও মনে পড়ে। খাওয়ার পরে আবু আলী চৌধুরী গোপনে আমাকে বলেছিলেন, এমন সুস্বাদু ভাল খাওয়া আর কখনই খাইনি। ভয়ে ভয়ে নীচু গলায় আমি বললাম, "আম্মাজী আপনি আপনার নানার বাড়ী ভাংনীতে যাবেন না ?" আমার কথা শুনে হয়ত তিনি জ্বলে উঠেছিলেন কিন্তু তিনি বললেন, "না ভাংনিতে যাব না।" আমি চুপ করে থাকলাম। চৌধুরী সাহেব ফুফাজী বললেন, ওখানের সমস্ত সম্পত্তি তো আপনার। "আমার পিতা গেল, আত্মীয়রা সবাই গেল, স্বামী গেল, এতকিছু গেল। আর ঐ সামান্য দিয়ে আমি কি করব।" আমরা বিদায় নিলাম। তিনশত টাকার একটি তোড়া তিনি ফুফাজীকে দিলেন। আমাকে এক শ টাকা দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমার বাবা মারা গিয়েছে। তুমি এই টাকা নাও।" আবার পূর্বের মত আমরা মাথা নীচু করে ঘর হতে বার হয়ে এলাম। আর পিছন ফিরে ফিরে দেখি দালানের অপরূপ সৌন্দর্য শোভা। যেখানে ঘোড়া বাধা ছিল, ঘোড়া খুলে নিয়ে কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আমরা পায়রাবন্দে ফিরে এলাম ফুফাজীর বাড়ীতে।

প্রঃ ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সাথে ফুলচৌকীর মোগল রাজবংশীয়রা জড়িত ছিলেন; এ সম্পর্কে কোন কথা পূর্বের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকট শুনেছেন কি ?

উঃ হ্যাঁ, অনেক শুনেছি। যা শুনেছি তার সারমর্ম হল এই রূপ ঃ ফুলচৌকী নগরের রাজবংশীয়রা মহামান্যা মহিষী লালবিবিকে ইংরাজরা নৃশংসভাবে হত্যা করায় খুবই মর্মাহত হন। তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পত্তি নিয়োজিত করেন যাতে ইংরাজরা এ দেশে আর রাজত্ব করতে না পারেন তার জন্য। শুনেছি তখন তামাম হিন্দুস্তানে এঁদের মত ধনে ধনী আর কেহ ছিলেন না। বছরের পর বছর ধরে এঁরা আন্দোলন করতে থাকেন ইংরাজদের এই দেশ হতে তাড়িয়ে দিবার জন্য। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ, নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন

মোহাম্মদ, মুসা শাহ বকশি, পুত্র জামালউদ্দীন বকশি, তংকার বুড়া মিয়া তালিয়ার খাঁ সাহেব আরও বহু প্রধান প্রধান লোক এই বিদ্রোহ করবার প্রধান অগ্রণী ছিলেন। ফুলচৌকী নগরের সমস্ত শক্তি হিন্দুস্তানের বহু জায়গায় ছড়ানো ছিল। যেখানে ব্যবসার কুঠি, আরত ছিল, সেইসব স্থান হতে টাকা এবং গুপ্ত খবরা-খবরের লোক নিয়োজিত হয় বিদ্রোহ করবার জন্য। ইংরাজরা এসব খবর কোনভাবেই জানতে পারে নি। এরা নিজেরা যুদ্ধ-বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করে এবং বহু লোককে শিক্ষা দেয় খুব গোপনে।

প্র ঃ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন ?

উ ঃ নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ যুদ্ধের সময় প্রধান সেনাপতি বরকত খাঁর অব্যবহিত সহকারী সেনাপতি ছিলেন এবং সুবা বাংলার সুবাদার ছিলেন। গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ, ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ—এ঺রা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সুবাদার ছিলেন। পূর্ব পুরুষদের মত এরা বিপুল বিক্রমের সাথে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যুদ্ধে হেরে যাবার পর গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ ওয়ালীদাদ মোহাম্মদকে ফুলচৌকীতে ভীষণ নির্যাতন, অত্যাচার, মারপিট করে হাতীর পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আসার কালে রাস্তায় রঙমহলের নিকটস্থ স্থানে ফেলে দেয়। গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদের কবর রংপুর কারমাইকেল কলেজের উত্তর-পশ্চিমে বালাটারী গ্রামে রয়েছে। ওয়ালীদাদ-উদ্দীন মোহাম্মদের কবর রঙমহলের লিচু বাগানে রাস্তার ধারে ছালেক পেট্রোল পাম্পের নিকট রয়েছে। শাহজাদা খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদকে দিল্লীতে গুলী করে ইংরাজরা মারে। তংকার মিঞা ফজিল খাঁর ফাঁসি হয় হিন্দুস্তানে। ফুলচৌকী, তংকা এবং রংপুর, দিনাজপুর জেলার হাজার হাজার মানুষকে গাছের ডালে ডালে ফাঁসি দেয়, গুলী করে মারে এবং বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয় ইংরাজদের হুকুমে।

প্র ঃ এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আগের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলতেন কি ?

উ ঃ না বাবা খুব ভয় করে মাঝে মধ্যে এক বছর, দু' বছর, পাঁচ বছর পর বলতেন কোন কথা প্রসঙ্গে। তবে আবু আলী চৌধুরীর দ্বিতীয়া স্ত্রী আমার ফুফু সফিয়া সাবেরা খাতুন চৌধুরানী এসব কথা প্রায় সময়ই বলতেন। কারণ তিনি যা দেখেছেন তাতে তিনি বলতেন, বেগম লালবিবিকে অন্যায়-ভাবে হত্যা করে যে বিপুল সম্পত্তি তাঁর পিতামহ এবং তার স্বামীর পিতামহ পেয়েছিলেন ইংরাজদের নিকট হতে, খোদার কি শান! এত বড়

বিশাল জমিদারী মাত্র দুই পুরুষ ভোগ করতে পারল। তিন পুরুষের সময় তাদের অনেককে আজ ভিক্ষাবৃত্তি করে খেতে হয়। এই খেদ আফসোস্ নিয়ে তিনি এই সব কথা প্রায়ই উঠাতেন। এতে বাড়ীর আরও অনেকে যোগ দিত। পিতৃহীন ছিলাম বলে আমি উক্ত সফিয়া সাবেরা খাতুনের নিকট বেশী সময় থাকতাম। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট এইসব কথা কোন লোককে বলতে দিত না। লোকেও অপরিচিত লোকের সামনে অথবা যেসব লোক ইংরাজের লোককে খবর দিতে পারে কখনও এইসব লোকের সামনে সেসব কথা কেউ উঠাত না। আমি বহু লোকের কাছে এসব কথা শুনে এসেছি। তাদের মধ্যে সফিয়া সাবেরা খাতুন চৌধুরানী, মোঃ করিম বক্‌শ চৌধুরী, আবু আলী চৌধুরী সাহেব, কাবিলপুর নিবাসী মোহাম্মদ হেদায়েতুল্যা চৌধুরী, মোঃ সাখাওয়াত হোসেন চৌধুরী, নজির হুসেন চৌধুরী, আবুল হুসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ ফতেহ্ আলী চৌধুরী এবং আরও অনেকের নিকট শুনে এসেছি।

টাটি পাইল মাটি,
খয়রুদ্দীন পাইল লাট।
লাহিড়ী পাইল ঠাকুর বাড়ী
তার তামাশা দেখ।

সেখ টাটি চৌধুরীর পিতার নাম সেখ বাদল। টাটি চৌধুরীকে স্থানীয় লোকেরা টাটি বলদিয়া বলত।

এ সব গানের কলিগুলি বলে অনেকে ঠাট্টা করত এবং পূর্বের বর্ণিত কথাগুলি বলত। আমি উপরিউক্ত লোকদের নিকট শুনেছি যে, ভাংনির মসজিদ ইমারত, পায়রাবন্দের ইমারত মুর্শিদাবাদের মিস্ত্রীরা নির্মাণ করেছেন। উক্ত লোকেরা ফুলচৌকীর স্বর্গীয় প্রাসাদ দিল্লী ও বাগদাদের রাজমিস্ত্রীরা তৈরী করেছিলেন অনেক বৎসর ধরে; এ সব কথা বলতেন।[১]

মোহরউদ্দীন খাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণী

মোহরউদ্দীন খাঁ সাহেব (বয়স ১১০ বছর) গভর্নমেণ্ট অফিসের রেজিস্ট্রি বিভাগের হেড্ মোহরার ছিলেন। তিনি তাঁর সাক্ষাতকার বিবরণীতে বলেন। "নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর রংপুরের

---

[১] সাক্ষাৎকার বিবরণী গ্রহণের তারিখ সন ১৩৭০ সাল, ১৫ই ফাল্গুন।

বাজার প্রভৃতি যেখানে অবস্থিত—ঐ স্থানে তাঁর নির্মিত বাগান বাড়ী (ফুল ও ফলের) ছিল। তত্ত বাজার যেখানে অবস্থিত ঐ স্থানে একটি অর্ধ চন্দ্রাকারের মত বৃহৎ দীঘি ছিল। এখনকার রংপুর টাউনের সমস্ত অঞ্চলটিকে পূর্বে 'রাধাবল্লভ' বলা হত। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামাল উদ্দীন মোহাম্মদ। মেয়েদের নাম বেগম লালবিবি ও বেগম চাঁদবিবি। লালবিবির সহিত সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের বিয়ে হয়েছিল। বেগম লালবিবির মাযার মীরগঞ্জের দক্ষিণে আছে। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ বাংলার সুবাদার ছিলেন।

নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর পুত্র কামালউদ্দীনের পুত্র নবাব নাসিরউদ্দীন জঙ্গ বাহাদুর সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান সেনাপতি এবং ঐ সময়কার বাংলার সুবাদার ছিলেন। ইংরাজরা লালবিবি কাঁহা হ্যায়, লালবিবি কাঁহা হ্যায়, লালবিবি কাঁহা' বলে লালবিবিকে সবখানে পাগলের মত খুঁজে বেড়াত। এই লালবিবির কথা আমি আমার দাদীর নিকট শুনেছি। তখন রংপুরের বড় বিচার ফুলচৌকী রাজধানীতে হত। নবাব নূরউদ্দীন জঙ্গ বাহাদুরকে পাগল শাহজাদা বা মজনু শাহ বলত। কামাল কাশানায় কামালউদ্দীন মোহাম্মদ সময় সময় থাকতেন। রংপুরকে পূর্বে জঙ্গপুর বলত। সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ দিল্লীর মোগল রাজবংশের লোক ছিলেন। বাদশাহ আলমগীরের আপন ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। ফুলচৌকীতে সুবাদারের ও তাঁর অধঃস্তন বংশীয়দের কবর আছে। শহরের পশ্চিম দিকস্থ এই মুন্সীপাড়া জনপদকে পূর্বে জোলা পাড়া বলা হত। এখানে রেশম, গালিচা, সতরঞ্জি তৈরী হত। এরা কামালউদ্দীন মোহাম্মদের কুঠির কর্মচারী ছিল। এখনও স্থানটির নাম নবাবগঞ্জ বলা হয়। এটা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ-এর নাম অনুযায়ী হয়। বর্তমান রংপুরের নাম পূর্বে যেমন জঙ্গপুর ছিল, তদ্রূপ পূর্বে একে রঙমহলও বলা হত। রঙমহলের অনেক পুরানা দালান আমি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখেছি। যেখানে হাসপাতাল আছে ঐখানে একটা দু'মহলা বাড়ী ছিল। চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর দিয়ে বাড়ীটি ঘেরা ছিল। পাঁচ পীরের দরগার একটু পশ্চিম দিকে ডাক বাংলার সামনে রাস্তার উত্তর পাশে একটা মন্দির ছিল। মন্দিরটি দিয়েছিল সুবাদারের সেনাপতি

রাজা ভবানী পাঠক। বাকের কাশানা কামাল কাশানার উত্তরে ছিল। মেঘরাজ দুলিচাঁদ মাড়োয়ারীর যেখানে দোকান ঘর আছে ঐখান হতে জ্যাকমল, রাউথমল মাড়োয়ারীর দোকান বাড়ী শুদ্ধ বড় বড় দুটি দু' মহলা দালান ছিল। নতুন শহর হওয়ার পর এ সব ধ্বংস হয়ে গেছে। খান বাহাদুর শাহ আব্দুর রউফ মিঞার বাড়ীর দক্ষিণ দিক হতে চারপাশে আধ মাইল ধরে ফুলের বাগান ছিল, তার দক্ষিণে ছিল হাতীশালা, ঘোড়াশালা। হাসপাতালের পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকের ধাপ পর্যন্ত নানা জাতীয় ফলের বাগান ছিল। হাসপাতালের উত্তর পাশে যে কটি লিচু গাছ আছে, এ সব গাছ ঐ আমলের। যেখানে আদালত ফৌজদারী হয়েছে সেখানে বহু আমের গাছ আমি দেখেছি। এটা পূর্বে এই মোগল রাজবংশীয়দের রঙমহল ছিল। দক্ষিণে লালবাগে বিরাট বড় ফুলবাগান ছিল। তার পূর্বে এখানে সেনানিবাস ছিল। সেনানিবাসের মৃত্তিকা নির্মিত দেওয়াল এখন আর নেই। তবে এর চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা এখনো রয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এঁদের সবকিছু কোম্পানী সরকার বাজেয়াপ্ত করে। সুবাদার ও তৎবংশীয়দের কথা লোকে পূর্বে একবারে বলতে চাইত না। স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার পরও লোকে বলত না। মাঝে-মধ্যে কচিতে অতি পরিচিত ও আপন জনের মধ্যে কথা হত। সরকারের কড়াভাবে নিষেধ ছিল এসব কথা যাতে কেউ আলোচনা না করে। ফুলচৌকীর মূল রাজবাড়ীর মত সুন্দর বাড়ী আমি কোথাও দেখিনি।

রংপুর মাহিগঞ্জ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও প্রসিদ্ধ নেতা সমাজ হিতৈষী মোহাম্মদ নয়ামিয়া সরকারের সাক্ষাৎকার বিবরণী

মোহাম্মদ নয়ামিয়া সরকার (বয়স ৭৪ বছর) তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেনঃ "আমার দাদাজী হায়াত মোহাম্মদ সরকার (১২১ বছরে তাঁর মৃত্যু হয় ১৩০৭ সনে) আমি আমার দাদা এবং আরও বহু লোকের নিকট শুনেছি, সুবাদার বাকের জঙ্গ দিল্লীর মোগল রাজবংশের লোক ছিলেন। ইনি বাংলার নবাব হয়ে আসেন ইং ১৭৬০ সালের প্রথম দিকে। প্রাচীনরা তাঁকে নূরেউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ বলে বলতেন। ইংরাজরা তাঁকে মজনু শাহ বলত। মীরজাফর ইংরাজ পক্ষের যখন সুবাদার দিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তিনি বহু লড়াই করেছিলেন। অনেক জমিদার, সন্ন্যাসী ও ফকীর দল

তাঁকে সব সময় সাহায্য করে এসেছেন। প্রজারাও তাকে সত্যিকার নবাব হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। শুনেছি বাদশাহ আলমগীরের তিনি ভাতিজা এবং জামাতা ছিলেন। তাঁর মামার বাড়ী ছিল তংকা। তংকার মিয়ারা ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুনেছি তংকার আলদাদ খাঁ সুবাদারের মামা ছিলেন। সুবাদারের দুই পুত্র—কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ; দুই কন্যা লালবিবি ও চাঁদবিবি। পুত্র-কন্যাদের মধ্যে লালবিবি বড় ছিলেন। লালবিবির বিয়ে হয় বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের সঙ্গে। লালবিবিকে ইংরাজরা 'কাঁহা লালবিবি' 'কাঁহা লালবিবি' বলে শহরে ও বড় বড় লোকদের বাড়ীতে খোঁজ করত। পায়রা-বন্দের টাটি বলদিয়া[১] ভাংনির খয়রুদ্দীন ও নাবালক সাহেবরা এবং লাহিড়ী জমিদারেরা ফিরিঙ্গীদের গুপ্তচরবৃত্তি করে মহামান্যা লালবিবিকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করতে সাহায্য করেন। ঐ ভাবে তাদের সহায়তায় সন্ধান নিয়ে ইংরাজরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে বীর মাতাকে হত্যা করেন। লালবিবি সময় সময় ফুলচৌকীতে ভাইয়ের প্রাসাদে আসতেন এবং ইংরাজ বিরোধী সন্ন্যাসী, ফকীর, জমিদার প্রভৃতি নায়কদের সঙ্গে দেখা করে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাঁদের উত্তেজিত করতেন। মীরগঞ্জের দক্ষিণে লালবিবি যেখানে ইংরাজদের গুলীতে শহীদ হয়েছিলেন, সেখানে তাঁর পাক কবর বাঁধানো অবস্থায় আছে। কবরের চতুষ্পার্শ্ব স্থানটি পাকা প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের গেট পশ্চিম দিকে রাস্তার ধারে। গেটটি বেশী উঁচু নয়। প্রতিটি দর্শনপ্রার্থী যাতে মাথা নীচু করে কবরের দিকে ঢোকে, সেই ভাবে নীচু করে গেট তৈরী করা হয়েছিল। কবরের উত্তর-পূর্ব কোণ ঘেঁষে খাদেমের থাকবার একটি ঘর ছিল। খাদেম কবরে বাতি ও ফুল দিত। অন্যান্য লোকও ফুল কবরে দিত। কবরের পূর্ব পার্শ্বে একটি পুকুর রয়েছে। পুকুরটিকে এখনও বলা হয় সমর-পুকুর। ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ হওয়ার দরুন ঐ নাম তখন হতে চলে আসছে। শুনেছি বেগম লালবিবির সাথে ফুলচৌকী হতে রাজা ভবানী পাঠকও এসে উক্ত স্থানে ইংরেজদের গুলীতে শহীদ হন। তাঁর কবর সমর-পুকুরের উত্তর পাড়ে রয়েছে। ইঁনি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই উক্ত স্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। পূর্ব পাড়ে এবং অন্যান্য দিকে আরও অনেক শহীদের কবর রয়েছে; কিন্তু সে সব বাঁধানো

---

[১] **বলদিয়া :** বলদের পৃষ্ঠে মালামাল চাপিয়ে এক স্থান হতে আর-এক স্থানে নিয়ে গিয়ে ক্রয় বিক্রয় করত যারা, তাদেরকে বলদিয়া বলা হত।

নয়। বেগম লালবিবির কবরের কিছু উত্তর দিকে যেখানে শহীদ ফকীরদের কবর দেওয়া হয় সেই কবরের পাশে একটি পুকুর রয়েছে। পুকুরটিকে 'জেহাদ' পুকুর বলা হয়ে থাকে। জেহাদ পুকুরের সামান্য কিছু উত্তর দিকে ঐ আমলের সন্ন্যাসীদিগের দুটি মঠ পাশাপাশি রয়েছে। মঠের সন্ন্যাসীদিগকে ইংরাজরা হত্যা করে। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এই সব এলাকার দুই মাইলের মধ্যে আমার বাড়ী অবস্থিত। প্রাচীন বৃদ্ধরা আরও যা বলেছে তা এই, বর্তমানে যেখানে রংপুর শহর রয়েছে সেখানে পূর্বে শহর ছিল না। মাহিগঞ্জ ও মাহিগঞ্জের পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বে রংপুর শহর ছিল। তার অনেক কিছু চিহ্ন দালান-কোঠার ধ্বংসাবশেষ আমি দেখেছি। এখন যেখানে রংপুর শহর অবস্থিত, পূর্বের শিক্ষিত লোকেরা ঐ স্থানটিকে জঙ্গপুর বলত। অশিক্ষিত লোকেরা জমপুর বলত। এটা ভুল নয়। আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় আমরা ঐ ভাবে কথা বলি। এ সব কথা বুঝতে আমাদের এতটুকুও কষ্ট হয় না। সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ ও তৎপুত্র কামালউদ্দীনের উক্ত স্থানে রঙমহল ছিল। সুবাদারকে মোগল কুঠির নিকটে অতর্কিত আক্রমণ করে ইংরাজরা আহত করেন। বর্তমান মোগলহাট স্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মোগল কুঠি অবস্থিত ছিল। আহত সুবাদারের পাহারাদারেরা তাঁকে ফুলচৌকী রাজধানী নগরে নিয়ে আসেন। শুনেছি সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। নবাবের মৃত্যুর পর নবাব পুত্র কামালউদ্দীন মোহাম্মদ লর্ড কর্নওয়ালিশের সহিত আপোস করেন এবং বহু জমিদারী পত্তন লন। ঐ সময় থেকে তাঁরা নামের শেষে চৌধুরী লেখেন। হয়ত চৌধুরী লিখতে হবে এই শর্তটি আপোসের মধ্যে ছিল। এসব আমি আমার দাদাজী ও অন্যান্য প্রাচীনদের নিকট শুনেছি। এঁরা মোগল রাজবংশের মধ্যে সব থেকে ধনী ছিলেন। এঁদের কুঠি, কারবার ও জাঁকজমকের কথা শুনলে আমরা (যুবকেরা) তখন অবাক হয়ে যেতাম। সিপাহী যুদ্ধের যত কারণই থাকুক তার মধ্যে বড় কারণ যা শুনেছি তা হল বেগম লালবিবিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা। এরই প্রতিশোধের জন্য ১৮৫৭ সালে কামালউদ্দীন মোহাম্মদ, তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও পুত্রগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। ১৮০৩/৩৪ সনে সম্ভবত লালবিবিকে হত্যা করা হয়। সিপাহী যুদ্ধের বিপুল ব্যয় কামালউদ্দীন মোহাম্মদ বহন করেন বলে প্রাচীনদের নিকট শুনেছি। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র

নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গোউসউদ্দীন মোহাম্মদ কামালউদ্দীন মোহাম্মদের চাচাত ভাই এবং ভগ্নিপতি ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ ও কামালউদ্দীনের ভাতিজা খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদরা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বাংলার সুবাদার ছিলেন। যুদ্ধের সময় ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ ও গোউসউদ্দীন মোহাম্মদ হিন্দুস্থানে বিভিন্ন জায়গায় সুবাদার ছিলেন।[১]

সহিমউদ্দীন সরকারের সাক্ষাৎকার বিবরণী

সহিমউদ্দীন সরকার (বয়স ৭২ বছর), পিতা মৃত সহরউল্যা সরকার ৯৬ বয়সে মারা যান।

আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলে এবং আমাদের গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অনেক লোক ফুলচৌকী মোগল রাজবাড়ীর কোন না কোন কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। রাজবাড়ীর বাইরের কাজ, ভিতরের কাজ, জমিদারীর কাজ, শত রকম ব্যবসার যে কোন চাকুরী আমাদের পূর্বপুরুষগণ করে এসেছেন। এই বংশের প্রথম পুরুষ, যিনি সর্বপ্রথম ফুলচৌকীতে আসেন, তাঁর নাম শাহজাদা নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ। ইনি বাংলার সুবাদার নবাব ছিলেন। বাদশাহ্‌ শাহ্‌ আলমের চাচাতো ভাই এবং ভগ্নিপতি ছিলেন। তাঁর বেগমের নাম ছিল মহামান্যা বেগম কিসমৎ বানু। তৎকার মিঞারা নবাবের মামা ছিলেন। নবাবের বড় কন্যার নাম আম্মা লালবিবি এবং সর্বকনিষ্ঠার নাম আম্মা চাঁদবিবি। পুত্রদ্বয়ের নাম কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ। আম্মা লালবিবিকে ইংরাজরা মীরগঞ্জের নিকট হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করে। নবাবকে মোগল কুঠির কাছে হঠাৎ আক্রমণ করে আহত করে। নবাবের দেহরক্ষীরা নবাবকে নিয়ে ফুলচৌকীতে আসেন। কয়েকদিন পর নবাবের মৃত্যু হয়। লালবিবির কবর মীরগঞ্জে রয়েছে। নবাবের কবর ফুলচৌকীতে মসজিদের সামনে হয়েছে। নবাবের কবরের পাশে তাঁর বেগমের কবর রয়েছে। নবাবের দুই পুত্রের কবরও ঐখানে রয়েছে। কবরগুলি ভেঙে ফেলে কবরের উপর চুন-সুরকি দিয়ে পাকা করে সমান জমিনের মত করে দেওয়া হয়েছে। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গোউসউদ্দীন মোহাম্মদ, চাচা ও ফুফা ওয়ালীদাদ

---

[১] সাক্ষাৎ বিবরণী গ্রহণ করা হয় ১৯৩৯, ১লা মার্চ।

মোহাম্মদ, খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদরা, শেষ গাযী যুদ্ধের সময় দিল্লী ও হিন্দুস্তানের নানা জায়গা থেকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করেছেন। ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ, গোউসউদ্দীন মোহাম্মদ হিন্দুস্তানের যুদ্ধের সময় সুবাদার হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ বিদ্রোহী দলের প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। তিনি ঐ সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন। আহসানুউল্যা দেওয়ানজী দিল্লীতে বাদশাহের নিকট ছিলেন। তিনি নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের কথা সম্রাটের নিকট বয়ে নিয়ে যেতেন এবং সম্রাটের কথা নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের নিকট নিয়ে আসতেন। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর কিয়ামত যেমন নাযিল হয়, সেই রকম অবস্থা হয়েছিল। ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ এবং গোউসউদ্দীন মোহাম্মদকে বহু অত্যাচার ও নির্যাতন করে হাতীর পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাবার কালে হাতীর পায়ে বাঁধা থাকা অবস্থায় তাঁদের মৃত্যু হয়। রংপুরের রঙমহলের নিকট এঁদের ফেলে দেয়। মহীপুরের ফকীর সাহেবরা এঁদের কবরস্থ করেন। এঁদের পাকা কবর রয়েছে বালাটাড়ী গ্রামে এবং শহরের মধ্যে রাস্তার ধারে লিচু বাগানের পাশে। খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদকে দিল্লীতে ইংরাজরা গুলী করে মারে। মুসা শাহ বকশির পুত্র জালালউদ্দীন বকশী তার খিরলাই গ্রামে নিজেদের কবর স্থানে একটি পাকা কবর বেঁধে নেন। তারপর তিনি কবরের উপর শুয়ে পড়েন। ঐ অবস্থায় তিনি হুকুম দেন কবরের উপরটা পাকা করার। এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। ইংরেজদের হাতে ও এদেশীয় শত্রুপক্ষের হাতে অপমানিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে ঐভাবে তিনি মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করে নেন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ মাওলানা কেরামত আলী পীর সাহেবের চেষ্টায় তাঁর বেগম ও ছেলেরা সহ জীবনে বেঁচে যান। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ কখনও ইংরাজদের কাছে জীবন ভিক্ষা চান নি। যে কোন ইংরাজ, তিনি যত বড়ই পদস্থ অফিসার হন, তাঁর সঙ্গে বাড়ীর বার হয়ে তিনি কখনই কথা বলতেন না। তিনি যে সামান্য কয়েক বছর বেঁচেছিলেন, তিনি কোন ফিরিঙ্গীর সাথে দেখা ও কথা বলেন নি। মাহিগঞ্জে ঘোড় দৌড় হয়েছিল। বহু ঘোড়ার মধ্যেও নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের ঘোড়া জয়ী হয়েছিল। ঘোড়াটির নাম ছিল 'দাড়কা'। রেসে ঘোড়াটি জয় লাভ করার পর কালেক্টর বাহাদুর ৫ হাজার টাকা মূল্যে ঘোড়াটি কিনবার জন্য ফুলচৌকীতে লোক পাঠিয়েছিল। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ

সেই লোককে বলেন, "তোমার প্রভু কালেকটরকে বলো, নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের ঘোড়ায় চড়বার মত তার যোগ্যতা হয় নি।" পরে উক্ত 'দাড়কা' ঘোড়াটিকে তিনি হিন্দুস্তানের এক ফকীরকে দান করেন।

নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ এবং সবাই যুদ্ধের সময় খাকির শার্ট খাকির প্যান্ট এবং মাথায় ইংরাজদের মত টুপী পরতেন। পৃষ্ঠদেশে বন্দুক, কোমরে কোষবদ্ধ তলোয়ার ঝুলানো থাকত। কোমরে একটি অশ্ববাহিটী পিস্তলও ঝুলানো থাকত। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ ইংরাজদের পোশাক পরলে অবিকল ইংরাজদের মত দেখা যেত বলে অনেকের নিকট শুনেছি। এদের মত প্রজা বৎসল আর কারও নাম আমরা এ যাবত শুনি নি। ফুলচৌকীর রাজবাড়ীর মত সুন্দর বাড়ী কখনও দেখি নি। রাজা ধুন্দুপন্থা নানা সাহেব ও তাঁর মন্ত্রী আজিমউল্যা খাঁ এবং আরও কয়েকজন রাজপুত রাজার ছেলে প্রাসাদে থেকে মারা গেছেন। মন্ত্রী আজিমউল্যা খাঁ ছদ্মবেশ নিয়ে ছদ্মনামে ফুলচৌকীর বাইরেও কোন কোন জায়গায় যাওয়া-আসা করতেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল আজ্‌গার আলী মুন্সী। সাধারণ বাইরের লোকে তাঁকে একজন আলেম ও দরবেশ বলে জানত। এসব কথা যাদের মুখে শুনেছি, তাদের মধ্যে আমার পিতা সহরউল্যা সরকার, হাজী ধনে মামুদ, হাজী শরিয়তুল্যা, খড়িয়া বরকন্দাজ, শরিয়তুল্যা সরদার, চয়ন উদ্দীন প্রামাণিক, নবান্ন ফকীর, নজর মামুদ ফকীর, নূর মামুদ ফকীর, আইনুল্যা সরদার, বকর খাসী, কিনু সিংহ, মনাসিংহ প্রভৃতি এদের অধিকাংশ লোকেই ফুলচৌকীর রাজবাড়ীতে কোন-না-কোন চাকুরী করতেন। যারা চাকুরী করেন নি, তারাও যাওয়া-আসা করতেন কোন-না-কোন কাজের জন্য। ফুলচৌকী রাজবাড়ীকে এখনও ঐ বংশীয় লোকদের বাড়ীর সকলে সরকারী বাড়ী বলে থাকেন।

ডাক্তার ইদ্রিস আলী চৌধুরীর সাক্ষাৎকার বিবরণী

ডাক্তার ইদ্রিস আলী চৌধুরী (বয়স ৫৮ বছর), পিতা বশিরউদ্দীন চৌধুরী, গ্রাম ভাংনি, থানা মিঠাপুকুর, জিলা রংপুর। ইদ্রিস আলী তার সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেন: ফুলচৌকী নগরের নির্মাণের সূচনা করেন মীরজাফর ও ইংরাজ বিরোধী সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ বাহাদুর। ইনি দিল্লীর মোগল বংশীয় শাহজাদা ছিলেন।

বাদশাহ আলমগীরের আপন ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। ইনি নবাব হয়ে এসে মীরজাফর ও তৎপুত্রদের সাথে এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেছেন বলে শুনেছি। নবাবের সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তঙ্কার মিঞারা প্রধান ছিলেন। তঙ্কার মিঞা আলদাদ খাঁর ভাগিনা ছিলেন নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ। রাজা ভবানী পাঠক, রাজা দয়াশীল, রাজা শিবচন্দ্র রায়, শাহ কাদেরুল্ল্যা ফকীর ওরফে মুসা শাহ প্রমুখ ইংরেজ বিরোধীদের প্রধান ছিলেন বলে শুনেছি। হিন্দু মুসলমান, সন্ন্যাসী ফকীর এবং বহু পশ্চিমা এদেশীয় সেনা তাঁহার বিপুল বাহিনীতে থাকত। শাহজাদা সুবাদারের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও শাহজাদা জামালউদ্দীন মোহাম্মদ দুই পুত্র। দুই কন্যা—শাহজাদী লালবিবি ও শাহজাদী চাঁদবিবি। সুবাদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদ। শুনেছি ইনি ভাই-এর সঙ্গে ছায়ার মত সব সময় থাকতেন। শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ দিল্লীতে বিয়ে করেন নিজেদের জ্ঞাতিদের মধ্যে। সুবাদারের পুত্র কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা ছিলেন বেগম লালবিবি। বেগম লালবিবির বিয়ে হয় বাদশাহ শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাদশাহ আকবরের সাথে। সুবাদারের কনিষ্ঠা কন্যার বিয়ে হয় শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র শাহাজাদা ওয়ালীদাদ মোহাম্মদের সাথে। শুনেছি মোগল বংশীয়দের মধ্যে সুবাদার নূরউদ্দীর বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ এবং তৎপুত্রদের মত ধনী ঐ সময় আর কেউ ছিলেন না। ফুলচৌকীর রাজপ্রাসাদ, সরোবর, ফোয়ারা, বাগ-বাগিচা এ-সব মিলিয়ে ফুলচৌকীকে পূর্বের বৃদ্ধেরা 'স্বর্গ' বলতেন। ইংরাজদের সাথে সুবাদারের পুত্রদ্বয়ের আপোস হয়েছিল বলে শুনেছি, কিন্তু শাহজাদী লালবিবিকে ইংরাজরা মীরগঞ্জ নামক স্থানে গুলী করে হত্যা করেন। যার ফলে আবার ইংরাজ বিরোধী কাজে এবং ইংরাজদের দেশছাড়া করবার জন্য ফুলচৌকীর মোগল রাজবংশীয়রা ভীষণভাবে চেষ্টা চালাতে থাকেন খুব গোপনভাবে। যার ফলে ইংরাজী ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ হয়েছিল। সাতান্ন সালের পরবর্তী সময়ে ফুলচৌকীর প্রাসাদগুলি দু'বার লুণ্ঠিত হয় এবং বহু লোককে হত্যা করা হয়। মহামান্যা বেগম লালবিবি ইংরাজদের ভারত অধিকার করা কোন সময় মেনে নেন নি বলে তিনি ইংরাজদের বিরুদ্ধে সব সময় সম্ভ্রান্ত প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতেন।

প্রঃ লালবিবিকে ইংরাজরা কিভাবে হত্যা করল ?

উঃ বাবা যা জানি, যা কিছু শুনেছি তার সব কথাই এখানে সংক্ষেপে বলব। কোন কথাই গোপন করব না। ইতিহাস ইতিহাসই যেন থাকে খোর্দ মুরাদপুরের টাটি বলদিয়া এবং এই ভাংনির খয়রুদ্দীন ও রংপুর শহরের গুরুবাবু লাহিড়ীদের পূর্বপুরুষরা এইসব নিন্দিত পাপাচার কাজে ইংরাজদের পক্ষে গুপ্তচরগিরি করেছিল। রাজমহিষী গোপনে দিল্লী হতে সময় সময় ফুলচৌকী নগরে আসতেন ভ্রাতাদের বাড়ীতে এবং বাংলা, বিহার, আসামের সম্ভ্রান্ত প্রজার সাথে তিনি পরামর্শ করতেন ইংরাজদের উচ্ছেদ করবার জন্য। বহু টাকা ও সম্পত্তির লোভে উক্ত ব্যক্তিরা এইসব সংবাদ ইংরাজদের নিকট পৌঁছাতো। 'কাঁহা লালবিবি' কাঁহা লালবিবি' বলে ইংরাজরা অনেক সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে খানাতল্লাসী করত। কোন লোকই লালবিবির যাতায়াত, গতিবিধির কথা বলতেন না। বিশাল জমিদারী ও অনেক টাকার লোভে টাটি বলদিয়া, খয়রুদ্দীন ও আরও কতিপয় লোক লালবিবির আসার কথা ইংরাজদের গোচরীভূত করে। ইংরাজরা গোপনে বিভিন্ন রাস্তা পাহারা দিচ্ছিল। প্রাসাদ হতে বার হয়ে গোপনে মীরগঞ্জে ফকীর সন্ন্যাসীদের নিকট পরামর্শের জন্য যাওয়ার সময় ইংরাজদের অতর্কিত আক্রমণে বন্দুকের গুলীতে লালবিবি শহীদ হন, মীরগঞ্জের অল্পদূরে। লালবিবির সঙ্গে অল্প মাত্র প্রহরী ছিল। রাজা ভবানী পাঠকও লালবিবির সাথে ছিলেন। তিনিও বন্দুকের গুলীতে শহীদ হন। দলের সমস্ত লোকদের ইংরাজরা শহীদ করেন। লালবিবির কবর লালবিবির ভাইয়েরা বেঁধে দেন। কবরের উপরে পাকা ঘর, চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর দিয়ে দেন। কবরের পাশে খাদেমের ঘর তৈরী করে দেন কবরে বাতি এবং ফুল দেওয়ার জন্য। গোপনে যাতে লোক না দেখে এইভাবে অনেক পথিক কবরে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেত। আমিও ঐভাবে মাহিগঞ্জ যাওয়া-আসাকালে অনেক সময়ে গোপনে ফুল দিয়ে এসেছি। সুবাদার নবাব বাকের জঙ্গ, মহামান্যা বেগম লালবিবি বা ঐ সময়কার কোন বিদ্রোহী দলের নাম নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা সরকারের পক্ষ থেকে নিষেধ ছিল। তাই এই সব বিষয়ে লোকে বড় বেশী একটা আলোচনা করত না। মাঝে মধ্যে কারও বাড়ীর ভিতরে কথা প্রসঙ্গে কথা উঠত। কোন আগন্তুক আসতে দেখলে তাঁরা আলোচনা বন্ধ করে দিতেন।

কামালউদ্দীন মোহাম্মদকে ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের সময় রংপুর রঙমহলে কামাল কাশানায় ইংরাজরা শরবতের সাথে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর শহর বিদ্রোহীরা আক্রমণ করে এবং বহু শাসককে হত্যা করে। কেউ কেউ শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। সাতান্ন সালের যুদ্ধের পর রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার হাজার হাজার লোককে গাছের ডালে লটকিয়ে হত্যা করে, অনেককে গুলী করে মারে, অনেকের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়, মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হয়। ৮/১০ বছর ধরে অত্যাচার চলে। বর্তমান সেন্ট্রাল রোডের শ্মশানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি জায়গায় হাজার হাজার লোককে কয়েক বছর ধরে ফাঁসি দেওয়া হয়। স্থানটির নাম 'গণ-শহীদ'।[১] গ্রামের পর গ্রামের লোক ধরে ইংরাজরা এখানে জড়ো করে প্যারেড্ করাত। যে সমস্ত লোক প্যারেড্ করতে পারত তাদের ধরে এনে গণ-শহীদের ফাঁসিতে লটকাত। প্যারেড্ করতে পারলে ইংরাজরা বুঝত যে, এসব লোক বিদ্রোহী দলে ছিল। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের দুই পুত্র—নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ, ভাতিজা খাজেরউদ্দীন মোহাম্মদ, চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ এবং আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক হিন্দুস্থানে গিয়ে ইংরাজদের সাথে লড়াই করেন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ যুদ্ধের সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন বলে শুনেছি। ফুলচৌকীর মোগল রাজবংশীয়রা দিল্লীর বাদশাহ ও অন্যান্য বংশীয়দের তাঁদের খরচপত্রের জন্য হরহামেশা অর্থ সাহায্য করতেন বলে শুনেছি।

প্র ঃ ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের পূর্বে শহর কোথায় ছিল ?

উ ঃ মাহিগঞ্জকে নিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে 'রংপুর' শহর ছিল। এখনও সে সব নাম কাগজপত্রে রয়েছে। বর্তমান রংপুরে পূর্বে ফুলচৌকীর শাহজাদাদের রঙমহল ছিল। এর বহু স্মৃতিচিহ্ন যেমন আমি দেখেছি, তেমন বহু লোক দেখেছেন। জঙ্গপুরকে পূর্বে অশিক্ষিত লোকেরা জমপুর বলতেন। পূর্বের স্মৃতিগুলিকে লুপ্ত করে দিবার জন্য ১৩০৪ সালের কিছু পূর্বে বা ঐ সময় রংপুর শহর ইংরাজরা নূতন ভাবে পত্তন করেন। মাহিগঞ্জে হাসপাতাল ছিল কিনা জানি না। তবে প্রথম হাসপাতাল 'ধাপে' ডিমলার কাছারীতে করা হয়।

---

[১] কারবালায় হযরত হুসায়নের শহীদ সঙ্গীদের জমায়েতী কবর 'গঞ্জ-ই-শহীদান' থেকে এই গঞ্জ শহীদ বা গণ-শহীদ নাম হয়।

প্র ঃ প্রাসাদ কি রকম দেখলেন ?

উ ঃ অন্য সমস্ত প্রাসাদগুলি শালবন আর বিরাট জঙ্গলে ঢাকা, বাঘ সাপের ভয়ে সেদিকে যাইনি। মূল প্রাসাদটি তখনও একরূপ অক্ষতই দেখলাম। প্রাসাদে কোন লোকজন নেই। প্রাসাদের পশ্চিম দিকে গরীব শাহজাদারা ঘর করে রয়েছে দেখলাম। শুধু দেখলাম মাত্র কিন্তু কোন কথা বললাম না। প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে এবং গাত্রে অনেক গাছ-গাছড়া জন্মেছে। বট, পাইকড় ও নানারূপ আগাছা, শ্যাওলা ধরেছে দালানের গায়। তবে সামান্য মাত্র বাড়িয়েও বলব না বাবা। এমন সুন্দর পুরী জীবনে আর কখনও দেখিনি। বাংলার কোন স্থানে দেখিনি। আমি সামান্য মাত্র লোক, এর ব্যাখ্যা করবার ভাষা আমার নেই। প্রাসাদের ভিতরের মসজিদে একাই নামায পড়লাম যোহরের। চতুর্দিকে কোন লোকজন নেই। শ্মশান হয়ে পড়ে রয়েছে সবকিছু। একাই দাঁড়িয়ে রয়েছি মহাসৌন্দর্যশালী প্রাসাদের দিকে মুখ করে। পিছনে দুজন লোকের কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তারা এই গ্রামের লোক। আমাকে দেখে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—সুবাদার শাহজাদার কবর কোথায় রয়েছে। তারা আঙ্গুলের সাহায্যে দেখিয়ে দিল মসজিদের সামনে। আমি আরও অনেক জায়গা ঘুরলাম। শেষে ফুলচৌকীর পার্শ্ববর্তী 'শেকুরপাড়া' গ্রামের শহরউল্যা সরকারের বাড়ীতে এলাম। তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। সরকার সাহেবের পিতা, পিতামহরা মোগল রাজবাড়ীতে পদস্থ পদে চাকুরী করতেন। শহরউল্ল্যা সরকার সাহেব নিজে রাজবাড়ীতে থেকে পড়েছেন। সরকার সাহেব এ সব ঘটনা, এ সব কথা এত বেশী জানতেন যে, তিনি নিজে একখানি জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। সরকার সাহেবকে আমি ইতিহাস লিখতে অনুরোধ করলে তিনিও ইংরাজদের ভয়ে এ সব কথা লিখতে রাযী হন নি। তবে গভীরভাবে এই রাজপুরুষদের বংশধরদের ভালবাসতেন। অনেকবার অনেক ব্যাপারের মাধ্যমে তা জানতে পেরেছি। যত দিন, মাস, বছর যেতে থাকল তত সব কিছু ধ্বংস হ'তে লাগল। খাও-রাজা এনায়েত করিম চৌধুরী, মোসাম্মৎ হোসনে আরা খাতুন চৌধুরানী, শহরউল্ল্যা সরকার, আমানউল্যা মুন্সী, মোজাফফর হুসেন খান চৌধুরী এবং আরও অনেক লোকের নিকট এসব কথা আমি শুনেছি।

প্র ঃ আপনার নিকট অনেক কথা শুনলাম। কিন্তু টাটি শেখ বা টাটি

বলদিয়া এবং খয়রুদ্দীন চৌধুরী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে যে সব সম্পত্তি পান সে সম্পর্কে একটা মোটামুটি হিসাব দিলে ভাল হত বলে আমরা মনে করি।

উঃ মহামান্যা লালবিবিকে হত্যা করবার চরবৃত্তি করায় খয়রুদ্দীন এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র নাবালক সাহেব (এনায়েত উল্যা চৌধুরী) ও টাটি শেখকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মহাখুশী হয়ে বিপুল জমিদারী, লাখেরাজ, জলকর, বনকর, ফলকর দান করেন। লাহিড়ী বাবু কিছু জমিদারী, দেবোত্তর ও কিছু নিষ্কর ভূমি পায়। তবে এদের তুলনায় তা নগণ্যই বলতে হবে। যা হোক, এখানে আমি টাটি শেখ চৌধুরী ও খয়রুদ্দীন চৌধুরীরা জমিদারী আদি যা পায় তার মোটামুটি একটা তালিকা দিলাম ঃ

খোর্দ মুরাদপুর (পায়রাবন্দের) টাটি শেখের ওয়ারীশানদের ১৮৪১—১৮৪৪ সনে উইল করানো দলীল হতে কিছু সম্পত্তির বর্ণনা এখানে দিব। দলীলের নং ৩৬৯। রোবকারী কাছারী, জেলা রংপুর শ্রীযুক্ত মেস্তাব আলেকজাণ্ডার তামসচিক সাহেব উক্ত দলীল টাটি শেখের পুত্র জমিরউদ্দীন প্রভৃতি ওয়ারীশগণের সম্পত্তির মোটামুটি কিছুটা বর্ণনা এখানে উল্লেখ করছি।

পরগনে গররাহ মোতালক, পরগনে রোকনপুর, লাট কৃষ্ণপুর, পরগনে বড় বিলা, পরগনে মুক্তিপুর ও লাট বাদল খাঁ, পরগনে আজমপুর, পরগনে পলাশবাড়ী, পরগনে ডাঙ্গি ঘাট, পরগনে পায়রাবন্দ (পায়রাবন্দ পরগনাটি সম্পূর্ণ নিষ্কর) মাথপীরপাতন কলদী মৌজা, খোর্দ মুরাদপুর, ইসলামপুর, পানবাড়ী, কিসামত হারানন্দপুর ও কাসিমনগর, হুজ্জননগর, পদুম শহর, সিরাজগঞ্জ কাছারী (পাবনা), করটিয়া (পূর্বে বগুড়ার মধ্যে ছিল), দেলদুয়ার (ময়মনসিংহ), ধনবাড়ী (ময়মনসিংহ), ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) বাখরগঞ্জ বন্দর জলকর ও জমিদারী ইত্যাদি।

মছিহুজ্জামান আবুল ওছামা ছাবের-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী[১]

আমার নাম মছিহুজ্জামান আবুল ওছামা ছাবের, পিতা মরহুম জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী ছাবের চৌধুরী, পিতামহ জমিরউদ্দীন চৌধুরী, প্রপিতামহ টাটি চৌধুরী। আমরা ৯ ভাই। তন্মধ্যে ২ ভাই অপ্রাপ্ত

---

[১] গ্রাম খোর্দ মুরাদপুর, পরগনা পায়রাবন্দ, থানা মিঠাপুকুর জিলা রংপুর। সাক্ষাৎ বিবরণী গ্রহণের তারিখ ১৯৫৮ সালের ৮ই নভেম্বর।

বয়সে মারা যায়। ১। এব্রাহিম ছাবের ২। খলিলুর রহমান। ৩। আবুল বাকের ছাবের ৪। আবুল ফাজল ছাবের ৫। আববাছ ছাবের, ৬।মজলুম ছাবের। আমার ভগ্নি ৬ জন। তন্মধ্যে ২জন অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যায়। ১। করিমন নেছার ময়মনসিংহের দেলদুয়ারে বিয়ে হয়। আবদুল করিম ও আবদুল হালিম গজনবীর মা ছিলেন ইনি। ২। রোকেয়া বেগম—ভাগলপুরের ডিপুটি ছাখাওয়াৎ হোসেন-এর সাথে বিয়ে হয়। ৩। বাদশাহু খাতুন। ৪। হুমেরা খাতুন—এঁনারা জীবিত আছেন। বাবাজান ও অন্যান্য লোকের মুখে শুনেছি ফুলচৌকীতে পূর্বে বিচার হইত। জমিদার বরোদা সুন্দরী দেবী ও সানজুয়া প্রামাণিকের সাথে কাঁঠাল গাছ ভাঙ্গানো নিয়ে মামলা হয়। বিচারক কামালউদ্দীন চৌধুরী বলেন, "যে কাঁঠাল গাছ আবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে সেই গাছটি পাবে।" এতে বরোদা সুন্দরী মামলায় হেরে যান। সানজুয়া প্রামাণিক গাছটি পায় এবং সানজুয়া প্রামাণিক ঐ কাঁঠাল গাছটি চিরে তক্তা করে একটি মাইপোষ তৈরী করে। সেই মাইপোষটি আমার শ্যালক আবদুল ওয়াহেদের নিকট এখন আছে। আমার বাড়ীর নিকটে ওয়াহেদ মিঞার বাড়ী।

আমার বাবাজান আমাকে ও আমার মামাতো ভাই মুহাম্মদ আলী আবুল খয়েরকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে শেষ জীবনে ভিক্ষা করতেন। আমার বিমাতা ছফিয়া ছাবেরার নিকট শুনেছি।

টাটী পাইল ঘাটি, খয়রউদ্দিন পাইল লাট,
নাড়ী পাইল ঠাকুর বাড়ী তার তামাশা দেখ।

এই সব কথা বলে তিনি গালি-গালাজ করতেন তার এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের।[১]

ইয়াকুব আলীর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার বিবরণী

আমার চাচামিয়া উপরে যা বলেছেন, তা আমি অনেক প্রাচীন লোকের নিকট শুনেছি। আমার নাম ইয়াকুব আবুল ছরওয়ার চৌধুরী, আমার পিতা মরহুম মোহাম্মদ জর্জিছ আবুল বাকের ছাবের চৌধুরী। আমার দাদার নাম জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী ছাবের চৌধুরী।[২]

---

১. ১৯৫৮ সালের ৮ই নভেম্বর মহিহজ্জামান আবুল ওছামা ছাবের এই সাক্ষাৎ বিবরণী দেন।

২. একই তারিখে ইয়াকুব আলী এই সাক্ষাৎকার বিবরণী দেন।

তছিরউদ্দীন মুন্সীর সাক্ষাৎকার বিবরণী

তছিরউদ্দীন মুন্সী, বয়স ৭৭ বছর, গ্রাম ফুলচৌকী সংলগ্ন শেখুর পাড়া, জেলা রংপুর। তছিরউদ্দীন মুন্সী বলেন, "আমাদের একটি মাছ ধরা জাল আছে। আমি ছোট বেলায় ঐ জালে হেংগার কাছে বসে থাকতাম। আমাদের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেক বৃদ্ধ আমার কাছে আসত মাছের জন্য। তারা মাছধরা জালে বসে বসে এ গল্প সে গল্পের মধ্য দিয়ে ফুলচৌকীর মোগল বাদশাহদের কথা অনেক সময় উঠাত। আমি ঐ সব কথা শুনতে ভালবাসতাম। কথাগুলি রূপকথার মত আমার নিকট ভাল লাগত। বৃদ্ধরা আমাকে মাছের আশায় ঐ সব কথা বলত। ফুলচৌকীর রাজবাড়ীর প্রধান পুরুষদের কথা তারা বলত। সুবাদার নবাব বাকের জঙ্গ মোগল রাজবংশের লোক ছিলেন। তাঁকে ইংরাজরা মজনু শাহ্ বলত এবং লোককে বলবার জন্য আদেশ দিত। সুবাদার নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ ইংরাজদের সহিত অনেক যুদ্ধ করেছেন। ফুলচৌকীতে তাঁর রাজধানী ছিল। মোগলহাটের নিকট মোগলকুঠীর সামনে আহত হয়ে ফুলচৌকীতে এসে তিনি মারা যান। সুবাদার ও তাঁর সঙ্গীরা ঘোড়া, হাতী, উট, লোক লস্কর সহ বিভিন্ন জায়গায় ইংরাজ ও মীরজাফরের লোকদের সঙ্গে লড়াই করতেন্। সুবাদারের পুত্র কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ এর কন্যা লালবিবি ও চাঁদবিবি। ফুলচৌকীর চতুর্দিকে সরোবর, বালাখানা, সুন্দর সুন্দর পাকা দালান বাড়ী যা কিছু ছিল এবং এখনও রয়েছে ভাঙ্গা টুকরা, এর সব কিছুই সুবাদার এবং তাঁর পুত্রগণ নির্মাণ করেন। সুবাদারের সাথে এক রাজা ছিল। তাঁর নাম দয়াচন্দ্রশীল। সেই রাজা যুদ্ধে মারা যায়। সুবাদার আহত হয়ে ফুলচৌকীতে মারা যান। সন্ন্যাসী হিন্দু মুসলমান হাজার হাজার প্রজা সুবাদারের সঙ্গে থেকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। বহু লোক মারা গেছে সেই সব যুদ্ধে। সুবাদারের বড় মেয়ের বিয়ে হয় দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ্‌র সঙ্গে। সেই বাদশাহ বাহাদুর শাহের মাতা হল সুবাদারের কন্যা বেগম লালবিবি সাহেবা। ইংরাজরা বেগম লালবিবি সাহেবাকে মীরগঞ্জে গুলী করে মারে। টাটি চৌধুরী, খয়রুদ্দীন চৌধুরী, নাবালক সাহেব—এরা লালবিবির গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য ইংরাজদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করেন। এরা ইংরাজদের সংবাদ দিলে লালবিবিকে ইংরাজরা হঠাৎ আক্রমণ করে গুলী করে মারেন। নবাব নূরউদ্দীন্ বাকের জঙ্গ-এর মামা ছিলেন্ তঙ্কার মিঞারা। নবাব ও

তাঁর লোকেরা যেখানে যেতেন তাঁবু ফেলে সেখানে থাকতেন। ফুলচৌকীতে তিনি তাঁবুর ভিতরে থাকতেন। নবাবের বড় ছেলে কামালউদ্দীন ও ছোট ছেলে জামালউদ্দীন মোহাম্মদ ফুলচৌকীকে স্বর্গের মত করে সাজান। এরা খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। বাংলা, হিন্দুস্থান, আসাম—এসব এলাকায় এঁদের ব্যবসার কুঠি ছিল। শেষ গাজী যুদ্ধে কামালউদ্দীন মোহাম্মদকে ইংরাজরা রঙমহলে শরবতের সঙ্গে বিষ দিয়ে মারেন। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ শেষ গাজী যুদ্ধ (১৮৫৭ সালে) সময়ে বাংলার সুবাদার এবং যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর ছোট ভাই গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ চাচা ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ তংকার মিঞা 'ফজিল খাঁ' তাঁরা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গার সুবাদার ছিলেন। তংকার মিঞাদের সাথে এঁদের পুরুষানুক্রমে আত্মীয়তা ছিল। খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদ দিল্লীতে যুদ্ধের সময় মারা যান। বাদশাহ-এর বংশে তিনি বিবাহ করেছিলেন। গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ ও ওয়ালীদাদ মোহাম্মদকে ফিরিঙ্গীরা বহু অত্যাচার করে হত্যা করেন। গা দিয়ে লবণ মাখায়। কাঁটার ডাল দিয়ে মারে। হাতীর পায়ে বেঁধে রংপুর নিয়ে যাবার সময় রংপুরের নিকট মৃত অবস্থায় ফেলে দেয়। বালাটাড়ী গ্রামে গৌউসউদ্দীন মুহাম্মদের পাকা কবর বাঁধানো রয়েছে। রঙমহলের দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তার ধারে ওয়ালীদাদ মোহাম্মদের কবর বাঁধানো অবস্থায় রয়েছে। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ—এরা মরণপণ ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই করেন। দুই ভাই তোপ চালাতে খুবই বড় ওস্তাদ ছিলেন। তংকের মিঞা ফজিল খাঁর হিন্দুস্থানে ফাঁসি হয়। যুদ্ধের পরে ফুলচৌকীর রাজবাড়ী ইংরাজরা দুবার আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করে। এতে শত শত লোককে হত্যা ও ফাঁসি দেওয়া হয়। ফুলচৌকী তংকা হতে রংপুর তক—রাস্তার দুধারে হাজার হাজার লোককে ফাঁসি দিয়ে রাস্তার গাছে ঝুলিয়ে অথবা গুলী করে মারে। অনেক লোকের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়।

প্রঃ নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদকে ইংরাজরা মেরে ফেলল না কেন, সে কথা কিছু জানেন কি ?

উঃ হাঁ, অনেকবার অনেক লোকের নিকট শুনেছি, মওলানা কেরামত আলী সাহেবের চেষ্টায় ইনি বেঁচে যান। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ ও তাঁর বেগম আমিরন নেসা এবং তিন পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইনি

নানা জায়গায় গোপনে থাকেন। দেওয়ান আহসানউল্যা ও শাহ জামালউদ্দীন বক্সী—আরও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে ছিল। মওলানা কেরামত আলী পীর সাহেব অনেক চেষ্টা তদবির করে তাঁদের সকলকে বাঁচান। জীবন রক্ষা পেলেও সমস্ত সম্পত্তি ধনমাল লুঠ এবং বাজেয়াপ্ত হয়।

প্রঃ লুটের সময় এদেশীয় জমিদাররা কি ইংরাজদের সঙ্গে ছিল ?

উঃ খোর্দ মুরাদপুর পায়রাবন্দের জমিদার, ডিমলার জমিদার, কাকিনার জমিদার, মুর্শিদাবাদের জমিদার, কলকাতার জমিদার—এই রকম অনেক জমিদার তাদের বরকন্দাজ লাঠিয়াল বাহিনীসহ ফুলচৌকীর নগর আক্রমণ এবং হত্যা লুঠতরাজ করে। রাত্রে আক্রমণ হয়। আক্রমণের সময় ভূমিকম্পে যেমন মাটি কাঁপে তেমনি মাটি কাঁপছিল।

প্রঃ গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদের একমাত্র জামাতা উমরউদ্দীন চৌধুরীর হত্যা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন কি ?

উঃ হাঁ বহু লোকের মুখে এ সব কথা শুনেছি।

প্রঃ কেন তাকে হত্যা করল ?

উঃ এর অনেক কারণ আছে। লোকটি ছিল অত্যাচারী। আর খুব লোভী। বিরোধটা প্রথম বাধল আহসানউল্যা দেওয়ানজীর সঙ্গে। রাজা নানাজী আর তাঁর মন্ত্রী আজিমউল্যাহ খাঁ ফুলচৌকীর রাজবাড়ীতে গোপনে থেকে মারা যান। এই সংবাদ তিনি রংপুরে ইংরেজ গভর্নমেন্টকে জানায়। এতে রাজবংশীয়দের উপর নূতন ভাবে ইংরাজদের অত্যাচার আরম্ভ হয়। স্থানীয় এবং দূর-দূরান্তরের হিন্দু-মুসলমান বড় বড় লোকেরা উমরউদ্দীন চৌধুরীকে এইজন্য দায়ী করেন। সাহেবগঞ্জের সন্ন্যাসী হনুমানগিরি, ভৈরবগিরি—এদেরও চৌধুরী সাহেব অপমান করেন এই সব কথা নিয়ে। দাওয়ার সরকারকে মারপিট করেন।[১] আহসানউল্যা দেওয়ানজী, লালবাড়ীর ছফাতুল্যা চৌধুরী—এই রকম অনেক লোককে অপমান করেন। নিজামউদ্দীন মোহাম্মদ সাহেব যেদিন মারা যান তার কয়েক মাস পরে উমরউদ্দীন চৌধুরীকে হত্যা করা হয়। উমরউদ্দীন চৌধুরী সেদিন মারা না গেলে মোগল রাজবংশের নাবালক এতিমদের সবকিছু মালামাল উমরউদ্দীন

---

[১] উমরউদ্দীন চৌধুরী। আহসানউল্যা দেওয়ানজী মারা যাওয়ার পর তার পৌত্র দাওয়ার মামুদ বক্শ ফুলচৌকীর নাবালকদের দেখা শোনার নায়েব হিসাবে চাকুরী করতেন।

চৌধুরী তার কুমেদপুরের বাড়ীতে নিয়ে যেত। এই সমস্ত কারণে তাকে হত্যা করা হয়।

প্রঃ রাজা ধুন্ধুপন্থ নানাজী এবং তাঁর মন্ত্রী আজিমউল্যাহ্ খাঁ এই দুইজন সত্যই কি রাজবাড়ীতে থেকে মারা গেছেন ?

উঃ হাঁ, রাজবাড়ীতে থেকে মারা গেছেন—একথা সম্পূর্ণ সত্য। আমার গ্রাম শেখুর পাড়া এবং পার্শ্ববর্তী দুর্গাপুর গ্রামের অন্তত ৫০ জন লোক তখন রাজবাড়ীর ভিতরে থালা-বাসন মাজা এবং গৃহ সাজানো কাজ করত। এদের অনেকের নিকট আমি এসব কথা শুনেছি। এসব চাকর অনেকে ইংরাজের চাবুকের আঘাত এবং অত্যাচারে মারা গিয়েছিল তবু মনিবের ক্ষতি হবে মনে করে সত্য কথাও বলেন নি। রাজা ধুন্ধুপন্থ নানাজী বছর দেড়েক বেঁচেছিলেন। আজিমউল্যা খাঁ পাঁচ বছরের মত বেঁচে ছিলেন। আজিমউল্যা খাঁর ছদ্মনাম ছিল আজগর আলী মুন্সী। নানাজী কখনও প্রাসাদ হ'তে বার হন নি। প্রাসাদে ঢুকেছেন, প্রাসাদে থেকেই মারা গেছেন। আরও শুনেছি যুদ্ধে জয়লাভ হলে ফুলচৌকীতে দিল্লীর রাজধানী আনা হ'ত। রাত-দিন বললেও এসব কথা শেষ হবে না। ফুলচৌকীর এই সব কথা কোন লোকই বেশী একটা বলতে চাইত না। ইংরাজদের সবাই ভয় করত বলে বলত না। আরও অনেক বিপ্লবী লোক ফুলচৌকীর রাজবাড়ীতে ছিল।

এই বাড়ীর মত সুন্দর বাড়ী আমার জীবনে আর আমি দেখি নি। যাদের নিকট শুনেছি তাদের কয়েকজনের নাম এখানে দেওয়া হল ঃ

ফইমুল্যা সরদার—ইনি সোনা-রূপার থালা-বাসন মাজার তদারক করতেন। জিয়ারউল্যা মালী—ইনি ফুলশয্যা সাজাবার মালীদের প্রধান ছিলেন। তকের মামুদ কাসার থালা-বাসন মাজতেন। খড়িয়া বরকন্দাজ, নবানু ফকীর, শুকারু মন্ডল, ধন মামুদ গাছুয়া, শরিতুল্যা ফকির, আফানউল্যা মুন্সী, জেনাতুল্যা, ভেলম পাহারাদার প্রভৃতি লোকের নিকট শুনেছি। এরা সকলেই শেষ গাজী যুদ্ধের পূর্ব হতে রাজবাড়ীর ভিতরে চাকুরী করতেন।[১]

---

[১] ১৩৫০ সালের ১২ ই মাঘ এই সাক্ষাৎকার বিবরণী গ্রহণ করা হয়।

মোহাম্মদ হোসেন ও বয়েজউদ্দীন মোল্লার সাক্ষাৎকার বিবরণী

(মোহাম্মদ হোসেন মোল্লার পিতার নাম মফিল মোল্লা)

মোহাম্মদ হোসেন

প্রঃ আপনার নাম কি ?

উঃ মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা।

প্রঃ আপনার পিতার নাম কি ?

উঃ মফিলউদ্দীন মোল্লা।

প্রঃ আপনার বয়স কত ?

উঃ ৪২ বছর।

প্রঃ আপনার গ্রামের নাম কি ?

উঃ ফুলচৌকী।

প্রঃ আপনারা কি স্থানীয় লোক ?

উঃ না, স্থানীয় লোক নই।

প্রঃ কত পুরুষ পূর্বে কোথা হতে এসেছেন, আপনাদের পূর্ব পুরুষ, এবং তাঁর নাম কি ?

উঃ হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লা, তৎপুত্র আইনুদ্দীন মোল্লা, তৎপুত্র আলীমুল্লা মোল্লা, তৎপুত্র খলিলউদ্দীন মোল্লা, তৎপুত্র মফিজউদ্দীন মোল্লা, তৎপুত্র আমি মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা।

প্রঃ আপনার পূর্বপুরুষ হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লার পূর্ব নিবাস কোথায় ছিল ?

উঃ দিল্লীতে ছিল—এই শুনেছি।

প্রঃ দিল্লী হতে বাংলার রংপুরে কখন এসেছিল ?

উঃ বাংলার সুবাদারের সঙ্গে এসেছিলেন। কত সালে এসেছিলেন তা আমার জানা নেই।

প্রঃ বাংলার সে সুবাদারের নাম কি ?

উঃ নবাব নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ।

প্রঃ নবাবের বংশ-পরিচয় কি জানেন ?

উঃ হাঁ, জানি। দিল্লীর মোগল রাজবংশ।

প্রঃ ইনি বাহাদুর শাহের কে ছিলেন ?

উঃ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের ভগ্নিপতি এবং আপন চাচাতো ভাই।

প্রঃ এই নবাবের সাথে আপনার পূর্বপুরুষরা এসে কোথায় ছিল ?

উঃ নবাব তাঁবুতে ছিল; পরে যখন ফুলচৌকীতে রাজধানী করা সাব্যস্ত হয়, তখন নবাব ও তৎপুত্রদের প্রাসাদের পার্শ্বে মোল্লাদের বাড়ী করা হয়।

প্রঃ সেই অবধি আপনারা কি ফুলচৌকীতে বাস করছেন ?

উঃ জী, হাঁ।

প্রঃ নবাব নুরউদ্দীন বাকের জঙ্গকে, ইংরাজরা কি ঐ নামে বলতো না অন্য নামে বলতো; তা শুনেছেন কি ?

উঃ মজনু শাহ বলতো।

প্রঃ কেন মজনু শাহ বলতো, তা কি জানেন ?

উঃ হাঁ, জানি। যা শুনেছি-তা হল এই—আমাদের পূর্বপুরুষ হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লার সাথে দিল্লী হতে তাঁর এক ভাতিজা আসেন। তাঁর নাম হল মজনু মোল্লা।

প্রঃ এই মজনু মোল্লার আসল নাম কি জানেন ?

উঃ মজনু মোল্লার আসল নাম রহমতুল্লা মোল্লা।

প্রঃ আপনাদের পূর্বপুরুষদের কথা কখনও আলোচনা হত কি না ?

উঃ খুব বড় একটা আলোচনা হত না। তবে মজনু মোল্লা হাজী মোল্লার ভাতিজা ছিলেন—এ সব কথা কোন কোন সময় উঠত।

প্রঃ আপনি তো মোল্লা মানুষ; মোল্লা (আরবী) এর ধাতুগত মানে অত্যন্ত বেশী, খুব বড়, ভাবগত মানে এই করা যায়; বিদ্যাবিশারদ, মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত এবং মজনু শব্দের অর্থ কি ? তা নিশ্চয়ই জানেন ?

উঃ জানি, 'পাগল'।

প্রঃ এই 'পাগল' নাম কি এত বড় সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের নাম হতে পারে ?

উঃ না, তা কখনই নয়। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মজনু মোল্লা।

প্রঃ আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র মজনু মোল্লার অপর কোন নাম রাখেন নি কি ?

উঃ হাঁ, অবশ্যই রেখেছি। মোহেব্বুর রহমান মোল্লা।

প্রঃ এইভাবে কি বলতে চান যে, মজনু মোল্লার আসল নাম অন্য কিছু একটা ছিল ?

উঃ হাঁ, তা অবশ্যই ছিল, পূর্বে বলেছি।

প্রঃ আপনাদের বাড়ীতে অথবা গভর্ণমেন্টের অফিস আদালতে মজনু মোল্লা অথবা তার পুত্রদের কোন কাগজপত্র ছিল কিম্বা পাওয়া যেতে পারে ?

উঃ মজনু মোল্লা এবং তাঁর চাচা হাজী আজিমুদ্দীন মোল্লা—এঁরা নবাবের সাথে যেখানে যেতেন, তাঁবুতে বাস করতেন। সুতরাং তাদের কোন পুরানো কাগজ-পত্র অফিস আদালতে আছে কিনা তা আমার জানা নেই। আমাদের বাড়ীতে ঐ সময়ের কোন পুরানো কাগজ-পত্র নেই। অবস্থা ক্রমশঃ হীন হয়ে আসায় কাগজপত্র যেমন নেই, তেমনি নানা চিন্তা ভাবনায় ওসব কথা আমরা খেয়ালও করি নি। তবে ঐ সময়কার হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লা সাহেবের পাঠকৃত একখানি সুন্দর হস্তলিখিত কুরআন শরীফ আমার নিকটে রয়েছে।

প্রঃ আপনাদের বাড়ীর সামনে এই যে এক মহলা বিশিষ্ট দালান দেখা যায়, তা কোন্ সময়ের ?

উঃ এটা ঐ পূর্ব সময়ের।

প্রঃ এখানে কি করা হত ?

উঃ এটা তাঁদের হুজরাখানা ছিল।

প্রঃ হুজরাখানার উত্তর দিকে কয়েকজন পয়গাম্বর ও আউলিয়ার নাম লেখা রয়েছে, দালানের গায়ে ঐটি কি ছিল ?

উঃ ঐ দালানের সামনে বসে মোল্লারা দোয়া-দরুদ পড়তেন। ঐ দালানের উত্তর পার্শ্বে রাস্তার ধারে কতগুলি পাঁকা ইট বাঁধানো উনোন ছিল। লোকেরা ঐ খানে জিনিসপত্র নিয়ে আসত। পাক করে লোকদিগকে বিতরণ করা হত। অথবা কেউ কেউ যে কোন জিনিস, মিঠাই মণ্ডা নিয়ে এসে পড়ে নিয়ে যেত।

প্রঃ আপনাদের বাড়ীর কিছু পশ্চিম দিকের পাকা মসজিদটিতে কি নামায পড়া হত।

উঃ হাঁ, ঐ মসজিদে নামায পড়া হ'ত।

প্রঃ কিছু পূর্বে বলেছেন, নবাব নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ এবং আপনার পূর্ব পুরুষরা কোথাও স্থায়ী থাকতেন না, তাঁবুতে থাকতেন। তবে কখন হতে ফুলচৌকীতে স্থায়ী বাড়ী ঘর করা হল ?

উঃ নবাবের পুত্র—শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ এর সময় হতে।

হাজী মোল্লার পুত্র আইনুদ্দীন মোল্লা এঁদের সময় হতে স্থায়ী বাড়ী ঘর করা হয়।

প্রঃ হাজী মওলানা আজিমউদ্দীন মোল্লার কবর কোথায় রয়েছে, তা কি জানেন ?

উঃ ফুলচৌকীতে হুজরাখানার দক্ষিণ পার্শ্বে ঘেঁষে, হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লার পাকা বাঁধানো কবর রয়েছে।

প্রঃ নবাবের কবর কোথায় রয়েছে তা কি শুনেছেন কারো কাছে ?

উঃ হাঁ, তাঁর নির্মীয়মাণ মসজিদের সামনে ফুলচৌকীতে। প্রাসাদের ভিতরে যে মসজিদ, তারই একবারে সামনে। পূর্বে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল। পরে ইংরাজরা ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

প্রঃ প্রাসাদের নিকটে, না দূরে আপনাদের বাড়ী ছিল ?

উঃ প্রাসাদের দক্ষিণ পার্শ্বে দীঘি এবং দীঘির দক্ষিণে সামান্য কিছু দূরে আমাদের বাড়ী ছিল এবং রয়েছে। হুজরাখানার উত্তর দিকে দীঘি ও পাকা ইঁদারা ছিল।

প্রঃ নবাব পুত্র কামাল মোহাম্মদের বংশধরদের সঙ্গে সেই থেকে এখন পর্যন্ত কি, একই রকমভাবে, তাদের কাজকর্ম করে যেমন ধরুন শুভ পুন্যাহের কাজ এসব কি পুরুষানুক্রমে আপনারা করে আসছেন ?

উঃ হাঁ, আমি করছি, আমার বাবা করেছেন, আমার দাদা করেছেন, তাঁর বাবা করে এসেছেন এইভাবে নবাব ও হাজী মোল্লাতক আমি জানি।

প্রঃ হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লা এবং মজনু মোল্লারা চাচা ও ভাতিজা ছিলেন এই বলেছেন তাই নয় কি ?

উঃ হাঁ।

প্রঃ মোল্লা আপনাদের উপাধি, কেমন ? এই মোল্লা উপাধি আপনাদের পূর্বপুরুষেরা কি নিজেরা গ্রহণ করেছেন ?

উঃ না, শুনেছি বাদশাহের দেওয়া অথবা তারও পূর্বের হতে পারে।

প্রঃ মীরগঞ্জে যে লালবিবির কবর রয়েছে এই লালবিবির কোন্ পরিচয় কি জানেন ?

উঃ হাঁ, জানি। ইনি সুবাদার বাকের জঙ্গ-এর বড় মেয়ে এবং কামাল-উদ্দীন মোহাম্মদ, জামালউদ্দীন মোহাম্মদ-এর সহোদরা ভগ্নি। তিনি

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আকবরের প্রধান মহিষী ছিলেন এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ-এর আপন মাতা।

প্রঃ মওলানা কেরামত আলী-জৌনপুর নিবাসী যে ফুলচৌকীতে আসতেন, তা জানেন কি ?

উঃ হাঁ, ইনি বহুবার এসেছেন বলে প্রাচীন লোকদের নিকট শুনেছি। রাজবাড়ীর মধ্যে যে মসজিদ রয়েছে, সেই মসজিদের প্রধান গেট তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন।

প্রঃ কেন তিনি গেট বন্ধ করে দিয়েছেন ?

উঃ গেটের সামনে পশ্চিম দিকে কবর রয়েছে বলে।

প্রঃ মসজিদের সামনে সিমেণ্ট করা মাটির নীচে রাজপুরুষ বা রাজ-মহিলাদের কবর রয়েছে। কোন্ সময়ে এটা সিমেণ্ট করে দেওয়া হয় ?

উঃ শুনেছি সিপাহী যুদ্ধের সময় কবরগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। পরে 'রিসিভার রাধাকান্ত লাহিড়ীর' সময়ে মসজিদ মেরামত করে। ঐ সময়ে কবরের উপরে চুন, সুরকি, বালু দিয়ে কবরগুলি জমিনের সাথে মিশিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

প্রঃ নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার পর, কার কবর কোথায় রয়েছে এ সব কি প্রাচীনরা দেখিয়ে দিত ?

উঃ হাঁ, অনেক সময় কথা প্রসঙ্গে অনেকে দেখিয়ে দিতেন।

প্রঃ মুসা শাহের নাম কি শুনেছেন ?

উঃ জি, হাঁ শুনেছি।

প্রঃ তাঁর আসল নাম কি জানেন ?

উঃ তাঁর আসল নাম শাহ কাদেরউল্যা।

প্রঃ এই মুসা শাহ এবং নবাব নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গের ইংরাজ কথিত মজনু শাহ-এর সাথে কোন সম্পর্ক ছিল, তা জানেন কি ?

উঃ হাঁ, জানি। কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না।

প্রঃ বৈবাহিক সূত্রেও কি কোন সম্পর্ক ছিল না ?

উঃ না, কোন সম্পর্ক ছিল না।

প্রঃ তবে কি সম্পর্ক ছিল ?

উঃ মনিব এবং চাকরের যে সম্পর্ক তাই ছিল।

প্রঃ নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর অধীনে মুসা শাহ্ কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা শুনেছেন কি ?

উঃ জি হাঁ। বক্শী ছিলেন এবং মুসা শাহ্‌র পুত্র কবি জামালউদ্দীন, শাহজাদা কামালউদ্দীনের বক্শী ছিলেন।

প্রঃ মোল্লাদের সাথে নবাব নূরউদ্দীনের আত্মীয়তা বা ঐরূপ কিছু একটা ছিল কি ?

উঃ না, রক্ত অথবা আত্মীয়তা সম্বন্ধ সম্পর্ক ছিল না। মনিব ও শিক্ষাগুরু সম্পর্ক ছিল।

প্রঃ তা হ'লে নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর সঙ্গে মুসা শাহ্ ও তৎবংশীয়দের সাথে কোন আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল না—এই কি বলতে চান ?

উঃ জি, হাঁ। কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিল না কোন সময়।

প্রঃ আর একটি কথা। তা হল এই যে, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুমোদিত গভর্নমেণ্টের রাইটার্স বিল্ডিং-এর ছাপা খানা হ'তে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' নামক পুস্তকে বলা হয়েছে, 'মজনু শাহ-এর ভাই অথবা আত্মীয় মুসা শাহ ছিল।' এ কি সত্য কথা নয় ?

উঃ না, সত্য নয়। জঘন্য মিথ্যা।

প্রঃ মজনু মোল্লার বংশধররা কি এখানে উপস্থিত আছেন ?

উঃ হাঁ, আছেন।

বয়েজউদ্দীন মোল্লা

প্রঃ আপনার নাম কি ?

উঃ বয়েজউদ্দীন মোল্লা।

প্রঃ পিতার নাম কি ?

উঃ রজবউদ্দীন মোল্লা।

প্রঃ বাড়ী কোথায় ?

উঃ ফুলচৌকী।

প্রঃ আপনার বয়স কত ?

উঃ ৭০ বছর।

প্রঃ আপনারা কি এখানকার লোক ?

উঃ এখন এখানে বাস করছি। তবে পূর্বপুরুষরা দিল্লী হ'তে এসেছিলেন।

প্রঃ দিল্লী থেকে কখন এসেছিলেন ?

উঃ সুবাদার নবাবের সঙ্গে এসেছিলেন।

প্রঃ আপনারা কি মজনু মোল্লার সাক্ষাৎ বংশ ?

উঃ জি, হাঁ।

প্রঃ মজনু মোল্লার আসল নাম কি ছিল, তা কি জানেন ?

উঃ না। জানি না।

প্রঃ কেউ কি কোনদিন আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ?

উঃ না, কোনদিন কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই।

প্রঃ মজনু মোল্লার পিতার নাম কি ছিল ?

উঃ তা আমি জানি না।

প্রঃ মজনু মোল্লা হ'তে আপনারা কয় পুরুষ তা কি বলতে পারেন ?

উঃ হাঁ, পারি। মজনু মোল্লা, তৎপুত্র মেহারউদ্দীন মোল্লা, তৎপুত্র ময়েজউদ্দীন মোল্লা, তৎপুত্র রজবউদ্দীন মোল্লা।

প্রঃ মজনু মোল্লা কোথায় মারা গিয়েছেন ?

উঃ ফুলচৌকীতে। তাঁর পাকা বাঁধানো কবর এখনও আমাদের পুরানো বাড়ীর পশ্চিম পাশে রয়েছে।

প্রঃ মেওয়াট জেলার অন্তর্গত ধুলির দক্ষিণে মজনু শাহ বা ফকীরকে কবর দেওয়ার কথা রংপুরের ইংরাজ কালেক্টর উল্লেখ করেছেন। সুতরাং মজনু শাহের কবর ঐ খানে রয়েছে। কথাটি সত্য কিনা ?

উঃ উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানানো এবং ঐ মজনু শাহকে আমরা জানি না।

প্রঃ তা হলে বলতে চান, আপনার পুরানো বাড়ীর পশ্চিম পাশে মজনু মোল্লার পাকা কবর এখনও রয়েছে ?

উঃ জি, হাঁ। সেখানে এখনও রয়েছে। কবরের মস্তকের দিকে একটি চাপা ফুলের গাছ রয়েছে।

প্রঃ আপনাদের কি কখনও কোন সময়ে শাহ বলা হয় বা হ'ত ?

উঃ না, আগে থেকেই মোল্লা বলা হয়, এই আমরা জানি। শাহ কখনও কোন সময় বলা হয় নি এবং তা আমরা জানিও না।

প্রঃ শাহজাদা নবাব ও তাঁর পুত্রদের সহিত বংশ পরম্পরায় আপনারা কি তাঁদের যাবতীয় শুভ কাজ করে এসেছেন ?

উঃ হাঁ। বংশপরম্পরায় আমরা তাঁদের কাজ করে এসেছি।

প্রঃ মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা আপনার কে হয় ?

উঃ চাচা হন।

প্রঃ পৌরহিত্য বা যে কোন শুভকাজ ফাতিহা পাঠ—এ সব আপনারা না আপনার চাচাজীরা করেন ?

উঃ চাচাজীরাই করে এসেছেন। আমরা তাঁদের সহকারী হিসাবে ছিলাম বংশপরম্পরায়।

প্রঃ তা হলে হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লা কি নবাবের ফাতিহা পাঠ প্রভৃতি শুভ কাজ করে এসেছেন, না মজনু মোল্লা ?

উঃ হাজী মওলানা আজিমুদ্দীন মোল্লাই করে এসেছেন। মজনু মোল্লা নহে। তিনি আজিমুদ্দীন মোল্লা সাহবের সঙ্গে ছিলেন মাত্র।

প্রঃ সেই হতে আপনার চাচা মোহাম্মদ হোসেন মোল্লা অবধি যাবতীয় ধর্মীয় এবং শুভ সন্নাহের কাজ করে আসছেন কি ?

উঃ হাঁ, আমরা পূর্ব হতে তাঁদের সহকারী হিসাবে আছি। তাঁরাই ছিলেন, এখনও রয়েছেন।

প্রঃ ফকীর নেতা মজনু শাহ কি আপনাদের বংশের কেউ ছিলেন ?

উঃ না, ফকীর বা ফকীর নেতা কেউ ছিলেন না। শাহ আমাদের মধ্যে কেউ নেই, পূর্বেও ছিলেন না। তবে মজনু মোল্লা ছিলেন।

প্রঃ মজনু শাহ বা ফকীর নেতা মজনু শাহ সম্পর্কে কিছু কি জানেন ?

উঃ প্রাচীন লোকদের কাছে শুনেছি, ইংরাজরা শাহজাদা নবাবকে মজনু শাহ বলতো। লোকদের বলবার জন্য জোর তাগিদ দিত।

প্রঃ এই শাহজাদা নবাবের বংশ-পরিচয় ও নাম জানেন কি ?

উঃ হাঁ, জানি। ইনি দিল্লীর রাজবংশের লোক ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের আপন চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন। এঁর নাম হল নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ।

প্রঃ যাদের কাছে শুনেছেন, তাদের কারো কারো নাম স্মরণ আছে কি ?

উঃ হাঁ, আছে। আমির মিয়া, নবানু ফকীর, নজর মামুন ফকীর, রকিবউল্লাহ বরকন্দাজ, কলম বরকন্দাজ, জালাদ মোল্লা, কাশেমউদ্দীন

মোল্লা, খেতাবউদ্দীন মোল্লা, আদীলউদ্দীন আকন্দ, কিনা মুন্সী, হমিরউদ্দীন সরকার, রহিমউল্যাহ পাশারী, হজরতউল্যাহ হাজী, জেমতউল্যাহ্ আকন্দ, নুরউদ্দীন ফকীর, আফতাবউদ্দীন ফকীর, মুন্সী নছিরউদ্দীন আকন্দ, শহরউল্যাহ সরকার, সরি সরদার, খড়িয়া বরকন্দাজ, আজিমুল্যাহ্ পরামানিক, দারিকা মুন্সী, জেমতউল্যাহ সরকার আরও অনেক লোকের কাছে শুনেছি।

প্রঃ এই সব সাক্ষী কি স্থানীয় ?

উঃ জি হাঁ। ফুলচৌকীর এবং এর আশেপাশের গ্রামগুলির দু'চার জন রয়েছে।

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রকুমার সিংহের সাক্ষাৎকার বিবরণী

[পিতা—ছুরান সিংহ। পিতামহ—গুরু প্রসাদ সিংহ। নানা শিবু সিংহ]

শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রকুমার সিংহের বিবৃতি (বয়স ৬৯ বছর) পিতা ছুরান সিংহ, দাদা গুরু প্রসাদ সিংহ, নানা শিবু সিংহ—এঁরা আড়াই শত ঘর রাজপুত ও একঘর ভুঁইহার ব্রাহ্মণ নিয়ে বাতাসন পরগনার প্রধান কাছারী কুতুবপুর মৌজায় আসেন। নূতন পত্তনি জমিদার লছমিপৎ সিংহ দুগড়, ধনপৎসিংহ দুগড় উক্ত আড়াই শত ঘর রাজপুত লাঠিয়াল এবং তাদের পুরোহিত হিসাবে একজন ভূঁইহার ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। অনুমান ইংরাজী ১৮৬০ সালের মধ্যে আমার পূর্ব পুরুষেরা ঐ সব রাজপুতদের সঙ্গে কুতুবপুরে আসেন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বক্সার হতে। ভূঁইহার ব্রাহ্মণদের বাড়ী গঙ্গার ওপার 'উজিয়ারে' ছিল। সেখান হতে তাঁরা কুতুবপুর কাছারীতে আসেন এখন হতে ৯০ বছরের কিছু পূর্বে। এইসব অঞ্চলের বাতাসন পরগনা, সরহট্টা পরগনা, রোকনপুর পরগনার প্রজারা নূতন জমিদার ধনপৎ সিংহ দুগড় লছমিপৎ সিংহ দুগড়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কারণ তৎকার মিঞারা এ সব এলাকায় আগে থেকে জমিদার ছিলেন। নূতন জমিদারকে প্রজারা জমিদার হিসাবে স্বীকার করে নিতে চান নি। বাংলা ১২৭১ সালে জমি জরিপ নিয়ে প্রজারা জমিদারদের জমি মাপার শিকল কেড়ে নেওয়ার কথা আমি শুনেছি অনেক প্রাচীনের কাছে। বিশ্বেশ্বর সিংহ, উমাচরণ সিংহ রায় প্রভৃতির নিকট আরও শুনেছি যে, যেখানে পূর্বের মত দালান-কুঠি প্রাসাদ ছিল, এর সব খানে নূতন জমিদার লছমিপৎ সিংহ দুগড়,

ধনপৎ সিংহ দুগড় ঐ সব কুঠি দালান প্রাসাদের চতুর্দিকে শালগাছের বীজ এবং বেতবাঁশ লাগিয়েছিলেন। কেন লাগিয়েছিলেন তা আমি জানি না।

প্রঃ আপনি কি উক্ত লছমিপৎ সিংহ দুগড়ের অধীনে চাকুরী করেছেন ?

উঃ হাঁ। আমি, আমার বাবা, দাদা এবং সবাই চাকুরী করে এসেছেন পুরুষানুক্রমে।

প্রঃ উমাচরণ সিংহ রায় বিশ্বেশ্বর সিংহরা দুগড় জমিদারদের অধীনে চাকুরী করেছেন বলে জানেন কি ?

উঃ আজ্ঞে হাঁ, তাঁরাও চাকুরী করে এসেছেন।[১]

শাহ মফিজউদ্দীনের সাক্ষাৎকার বিবরণী

[পিতা শাহ আইনউদ্দীন]

প্রঃ মুসা শাহের নাম কি, শুনেছেন ?

উঃ জি, হাঁ শুনেছি।

প্রঃ তাঁর আসল নাম কি জানেন ?

উঃ তাঁর আসল নাম শাহ কাদেরউল্ল্যাহ।

প্রঃ এই মুসা শাহ এবং নবাব নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ, ইংরাজদের কথিত মজনু শাহ-এর মধ্যে কি কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল ?

উঃ না, কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না।

প্রঃ তবে কি সম্পর্ক ছিল ?

উঃ মনিব ও কর্মচারীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাই ছিল।

প্রঃ নবাব নুরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর অধীনে মুসা শাহ কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তা শুনেছেন কি ?

উঃ জি, হাঁ। বকশি ছিলেন। মুসা শাহ্‌র পুত্র কবি জামালউদ্দীন ও শাহজাদা কামালউদ্দীনের বকশি ছিলেন।

প্রঃ মোল্লাদের সাথে নবাব নুরউদ্দীনের আত্মীয়তা বা ঐরূপ কিছু একটা ছিল কি ?

উঃ না, রক্ত অথবা আত্মীয়তা সম্বন্ধ সম্পর্ক একেবারেই ছিল না। মনিব ও শিক্ষাগুরু সম্পর্ক ছিল।

---

[১] সাক্ষাৎকার বিবরণী গ্রহণের তারিখ বাংলা ১৩৫২ সালের ৪ঠা পৌষ।

প্রঃ তাহলে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর সঙ্গে মূসা শাহ-এর সাথে কোন আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিল না, এই কি বলতে চান?

উঃ জি হাঁ। কোন সময়ে কোন আত্মীয় সম্পর্ক ছিল না।

প্রঃ আর একটি কথা। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুমোদিত গভর্নমেণ্টের রাইটার্স বিল্ডিং-এর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'সন্ন্যাসী এণ্ড ফকীর রেইডার্স ইন বেঙ্গল' নামক পুস্তকে বলা হয়েছে, "মজনু শাহ্-এর ভাই অথবা আত্মীয় মূসা শাহ ছিল।" এ কথা কি সত্য নয়?

উঃ না। সত্য নয়, জঘন্য মিথ্যা।

রমজান আলীর সাক্ষাৎকার বিবরণী

[রমজান আলী মিঞা (বয়স ৬২ বছর) গ্রাম আলমনগর, থানা কোতওয়ালী, জেলা রংপুর [

আমার পিতামহ হাজী মোহাম্মদ জলীল মাসুদ মিঞা ১০২ বছর বয়সে মারা গেছেন ১৩৫৮ সালে। আমি ছোটবেলা থেকে আমার দাদাজীর নিকট বহুবার শুনেছি, সুবাদার নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ বাহাদুর বাংলার সুবাদার ছিলেন। তিনি ফুলচৌকীতে রাজধানী গড়েছিলেন। তাঁকে ইংরাজরা মজনু শাহ বলত এবং লোকদের তাই বলার জন্য ইংরাজ আমলারা গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিত। তিনি বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের ভাতিজা ও জামাতা ছিলেন। তাঁর কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ নামে দুই পুত্র এবং লালবিবি, চাঁদবিবি নামে দুই কন্যা ছিল। মোগলহাট রেল স্টেশনের দক্ষিণে নবাবের মোগল কুঠির অনতিদূরে ইংরাজরা নবাবকে অতর্কিতে আক্রমণ করে আহত করে। নবাবের লোকজনেরা নবাবকে ফুলচৌকীতে নিয়ে আসে। নূতন রাজধানীতে নবাবের মৃত্যু হয়। নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম লালবিবির স্বামীর নাম বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর। কনিষ্ঠা কন্যা বেগম চাঁদবিবির স্বামীর নাম ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ। সুবাদারের ভাতিজা হলেন ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ। লালবিবিকে ইংরাজরা মীরগঞ্জের নিকট হত্যা করেন। ভাংনির জমিদার খয়রুদ্দীন নাবালক সাহেব ও পায়রাবন্দের টাটি বলদিয়া ইংরাজ পক্ষের গুপ্তচর ছিলেন। ইংরাজরা তাঁদের সহায়তায় মীরগঞ্জে মহামান্যা বেগম লালবিবিকে বন্দুকের গুলীতে

শহীদ করেন। লালবিবির সঙ্গে রাজা ভবানী পাঠকও ছিলেন। তাঁকেও ইংরাজরা শহীদ করেন উক্ত স্থানে। মীরগঞ্জে লালবিবির পাকা কবর রয়েছে। যেখানে লালবিবিকে শহীদ করা হয়, ঐ স্থানের দীঘিটিকে 'সমর-পুকুর' বলা হয়। সমর-পুকুরের কিছু উত্তরে ফকীরদের ডেরা এবং সন্ন্যাসীদের মঠ রয়েছে। ফকীরদের সেই স্থানের পুকুরটিকে 'জেহাদ পুকুর' বলা হয়। টাটি বলদিয়া, খয়রুদ্দীন প্রমুখ ইংরাজ গভর্নমেন্টের নিকট হতে বহু টাকা মূল্যের জমিদারী লাখেরাজ পায়। বর্তমান রংপুর শহরে পূর্বে উক্ত মোগল রাজবংশীয়দের রঙমহল ছিল। যে জন্য এই রংপুর জেলার প্রাচীন লোকেরা দলিলপত্রে 'রংপুর' লিখতেন না, 'রঙ্গপুর' লিখতেন। রংপুর ছিল মাহিগঞ্জের পূর্ব-দক্ষিণ দিক দিয়ে। এটি রঙ্গপুর বা রঙ্গ-তামাশার স্থান। মোগল রাজবংশীয়রা এই স্থানে নাচগান, রং-তামাশা করতেন বলে প্রাচীনরা 'রঙ্গপুর' বলেন। ইংরাজদের অনুকরণে রংপুর বলেন না। সাহিত্য পরিষদ-এর সুচিন্তিত সুপতিরা 'রঙ্গপুর' নামটি যথার্থভাবে গ্রহণ করেছেন। এটাকে সঠিক নাম বলে আমরা বিশ্বাস করি। কামাল কাশানা, বাকের কাশানা, নওয়ার কাশানা, কাশানা, আলমনগর, নুরপুর, নুরুদ্দীগঞ্জ—এসব নাম মোগল রাজবংশীয়দের নাম ও নামের স্মৃতির সাথে জড়িত হয়ে রয়েছে। ফুলচৌকীর এই মোগল রাজবংশীয়রা ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে একরূপ ধ্বংস হয়ে গেছেন। আমার পূর্বপুরুষরা এঁদের সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে হেরে যাবার পর বহু পলাতক লোকের সাথে আমাদের বংশীয় অনেক লোক আসামের জঙ্গলে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। সিপাহী যুদ্ধের প্রধান পরিচালক ও উদ্যোক্তা ফুলচৌকীর এই মোগল রাজবংশীয়রা ছিলেন। যদি যুদ্ধে জয়লাভ হত, তা হলে ফুলচৌকীতে ভারতের রাজধানী হত। এ সব কথাও আমি আমার দাদার কাছে শুনেছি।

দেওয়ান শামসুল হকের সাক্ষাৎকার বিবরণী

দেওয়ান শামসুল হক (বয়স ৭৪ বছর) সাং আলমনগর। এর পিতা বাচ্চা মিঞা ১১৩ বছর বয়সে ১৩৪০ সালে মারা যান।

আমি আমার পিতার নিকট ও আরও অনেকের নিকট শুনেছি যে সুবাদার নুরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ, বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাঁকে

ফিরিঙ্গিরা মজনু শাহ বলত। ইঁনি মীরজাফর ও তৎবংশীয়দের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছেন। সেনাপতি ভবানী পাঠক, প্রধান সেনাপতি কাদের উল্যাহ শাহ ওরফে মুসা শাহ বক্‌শি ছিলেন। কোম্পানীর সাথে যুদ্ধ করে ইনি অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজা দয়াশীল, রাজা শিবচন্দ্র, মির্জা দানেশ খাঁ প্রমুখ উজির ছিলেন। ফুলচোকী নামক স্থানে নওয়াব ও তাঁর সঙ্গীরা রাজধানী করেছিলেন। কামালউদ্দীন মোহাম্মদ, জামালউদ্দীন মোহাম্মদ,—সুবাদারের দুই পুত্র, লালবিবি ও চাঁদবিবি—সুবাদারের দুই কন্যা ছিল। বর্তমান রংপুরকে 'জঙ্গপুর' বলা হত। এ সব কথা আমি নিজেও শুনেছি। পূর্বে মাহিগঞ্জ ও তৎসংলগ্ন স্থানগুলিকে রংপুর বলা হত। কাগজপত্রে এখনও ঐ সব এলাকাকে রংপুর বলা হয়। এরা ইংরাজদের নিকট কখনও বশ্যতা স্বীকার করে নি। এই বংশের লোকেরা নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ, ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ. খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদ। এঁরা ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্ব করেছিলেন। সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ মোগল রাজবংশীয় ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের চাচাত ভাই ছিলেন। সুবাদারের ও তৎবংশীয়দের কথা লোকে সহসা আলোচনা করতে চাইত না। ইংরাজ সরকারের নিষেধ ছিল। কোন কথা প্রসঙ্গে কোন কথা উঠলে এ সব কথা প্রাচীনরা বলতেন। খুব ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে কথাগুলি তাঁরা বলতেন।

সমতুল্যাহ শেখ-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী

[সমতুল্লাহ শেখ, বয়স ৯৩ বছর। পিতা জেনাতুল্ল্যাহ শেখ ১০৫ বছর বয়সে মারা যান। দাদা ছানা উল্যাহ শেখ ১০২ বছর বয়সে মারা যান। গ্রাম—মিস্ত্রীপাড়া। থানা—কোতওয়ালী, পোঃ ও জিলা রংপুর।]

আমি ছোটবেলা হতে আমার পিতা, দাদা ও আরও অনেক লোকের নিকট শুনেছি যে দিল্লী হতে এক মোগল রাজবংশের লোক বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। তিনি ইংরাজ ও মুর্শিদাবাদের মীরজাফর-এর সহিত অনেক লড়াই করেছেন। তাঁর নাম নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ বাহাদুর। ইনি দিল্লীর বাদশাহের খানদানের লোক ছিলেন। সুবাদারের রাজধানী ফুলচোকী নামক স্থানে ছিল। সুবাদারের দুই পুত্র কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ। সুবাদারের এক ভাই

ছিলেন। তাঁর নাম শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদ। ফিরিঙ্গীরা শাহজাদাকে মজনু শাহ বলত এবং লোকদিগকে বলার জন্য জোর তাগিদ দিত। বর্তমানে ধাপ কাছারী, নওয়াবগঞ্জ, আলমনগর, নূরপুর, কামাল কাশানা, বাকের কাশানা, এই সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে সুবাদার নূরউদ্দীন তৎবংশীয়দের রঙমহল ছিল। আমরা এই স্থানের আদি বাসিন্দা। সেই হেতু আমরা জানি বর্তমান রংপুর শহর এখানে ছিল না। মাহিগঞ্জের ঐ দিকে ছিল। রঙমহলের বড় বড় দালানের ভগ্নাবশেষ, ধ্বংসাবশেষ আমি দেখেছি। কামাল কাশানা, কাশানা, নওয়ার কাশানার দালান আর দালানের গায়ে মানুষের সমান উঁচা বড় বড় কাঁচ লাগানো অবস্থায় আমি নিজে দেখেছি। যেখানে এখন তও বাজার আছে, ঐ খানে একটি বৃহৎ দীর্ঘ দালান ছিল। জেঠমল, রাউথমল, মেঘরাজ মাড়োয়ারীদের দালান যেখানে রয়েছে, ঐ খানে দু'টি দুই মহলা বিরাট বিরাট দালান অর্ধভগ্ন অবস্থায় আমি দেখেছি। যেখানে গরুর ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল আছে, ঐ সব এলাকায় দুটা বড় বড় দুই মহলা দালান ছিল। চতুর্দিক প্রাচীরে ঘেরা ছিল। একটা দালান ভাঙ্গা ছিল, সেটাতে লোকজন ছিল না। যে দালানটা ভাল ছিল, ঐ দালানটায় রাধিকা বাবু ডাক্তার ছিল। রাধিকা বাবু ময়মনসিংহের লোক ছিলেন। ডাক বাংলার উত্তর পার্শ্বে রাস্তার উত্তর ধারে একটা মঠ ছিল। ঐ খানে ইংরাজ বিরোধী নবাব পক্ষীয় হিন্দু রাজারা পূজা দিত। শত শত আম-কাঁঠাল, লিচু গাছ আমি দেখেছি। মেঘরাজ মাড়োয়ারীর দালানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে ফুলের বাগান ছিল। আমি, আমার বাবা, কোন দিন আমার দাদা মাহিগঞ্জে হরহামেশা সওদা খরচ করতে রঙমহলের ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করতাম। কোন কোন সময় অন্য লোকের সঙ্গেও মাহিগঞ্জে যেতাম। দালান বা কোন জিনিস দেখলে বৃদ্ধারা আফসোস করত ও আমাকে দেখিয়ে দিত। মুচিপট্টির ঐদিকে ছিল হাতীশালা, ঘোড়াশালা। সুরেন্দ্র বাবু জমিদারের বাড়ীর পশ্চিম দিকে ছিল অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়ার জায়গা। কোর্ট, কাছারী, লাইব্রেরী, হাসপাতাল, কালেকটরীর ঘর—এ সব হওয়া আমি নিজে দেখেছি।

প্রঃ কোর্ট-কাছারী কত সালের মধ্যে হয়েছে ?

উঃ ঠিক মনে হচ্ছে না। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের ২।৪ বছর পূর্বে অথবা ২।১ বছর পরে বর্তমান রংপুর শহরের কোর্ট-কাছারী করা আরম্ভ

করে ইংরাজ গভর্নমেণ্ট। হাসপাতালের সামনে রাস্তার ধারে যে লিচু গাছগুলি রয়েছে তা পূর্বের রঙমহলের সময়কার লিচু গাছ।

প্রঃ নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর কোন কন্যা সন্তান ছিল কি ?

উঃ দুইজন কন্যার নাম শুনেছি। বেগম লালবিবি ও বেগম চাঁদবিবি। লালবিবির বিয়ে হয় বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের সাথে। ইনি শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের আপন মাতা ছিলেন। যেখানে ইংরাজরা বেগম লালবিবিকে গুলী করে মারেন, সেই স্থানে তাঁর কবর রয়েছে। ভাংনির জমিদার খয়রুদ্দীন ও খোর্দ মুরাদপুরের টাটি বলদিয়া প্রমুখ ইংরাজদের গুপ্তচর ছিল। এঁদের সহায়তায় লালবিবিকে ইংরাজরা মারে। 'কাঁহা লালবিবি', 'কাঁহা লালবিবি' এই ভাবে ইংরাজরা লালবিবিকে খুঁজে বেড়াত। লালবিবিকে মারার পর খয়রুদ্দীন ও টাটি বলদিয়া বিরাট জমিদার হয়।

প্রঃ ফুলচৌকীতে আপনি কোন সময় গিয়েছেন কি ?

উঃ ফুলচৌকী নগরে আমি অনেকবার গিয়েছি। ফুলচৌকী নগরের মূল প্রাসাদের মত সুন্দর প্রাসাদ আমার জীবনে কোথাও দেখিনি।

প্রঃ ফুলচৌকীতে কি কারণে গিয়েছিলেন ?

উঃ অন্য কারণ থাকলেও ফুলচৌকীর আম কিনতে গিয়েছিলাম।

প্রঃ কি ভাবে ফুলচৌকীর এই মোগল রাজপরিবার ধ্বংস হয়ে গেল, এর কিছু জানেন কি ?

উঃ পুরানো লোকদের কাছে যা শুনেছি তার সারমর্ম হল এই—এঁরা ইংরাজদের বশ্যতা মনে-প্রাণে কখনও স্বীকার করেন নি। লালবিবিকে হত্যা, প্রজা পীড়ন, শোষণ, নানারূপ জুলুম-অত্যাচার করেছে ইংরাজরা। এদেশীয় লোকের উপর ইংরাজদের দয়ামায়া কোন ভাবেও ছিল না। বছর বছর আকাল, জিনিসপত্রের দাম উঠা, দেশীয় জিনিস ধ্বংস হওয়া, বিলাতী জিনিসের আমদানী—এসব কারণে প্রজা জমিদার আমির-ওমরাহ মোগল বংশীয়রা একই ইংরাজদের সুনযরে দেখতে পারছিলেন না। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ, তাঁর বক্‌শী জামালউদ্দীন শাহ্—এঁরা সকলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যান। বেগম লালবিবিকে অন্যায়ভাবে মেরে ফেলাতে লোকের মন ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে। দিল্লী হতে বাংলা—সব দিকে লোক আর টাকা দিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে এঁরা ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ফিরিঙ্গীরা তা কোন

ভাবে টের পায়নি। এর পরে হয় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহে এ'রা সর্বস্বান্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়। এ'দের মত ধনী মোগলদের মধ্যে আর কেউ ছিল না।

প্রঃ এই মোগল রাজবংশের লোকদের কথা প্রাচীনরা কি সহজভাবে বলত ?

প্রঃ না, খুবই ভয় করতো। অবিশ্বাসী লোকদের তো বলতোই না।

আমানুল্যাহ সরকারের সাক্ষাৎকার বিবরণী

[আমানুল্যাহ্ সরকার (বয়স ৯০ বছর) গ্রাম দুর্গাপুর, পোঃ ভবানীপুর, থানা পার্বতীপুর, জেলা দিনাজপুর।]

আমি ছোটবেলা হতে অনেক লোকের নিকট শুনে এসেছি এবং নিজে যা কিছু দেখেছি, তার কিছুটা আমি এখানে বলব। পলাশীর যুদ্ধের পর বাদশাহ শাহ আলমের চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি শাহজাদা নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ সুবা বাংলার সুবাদার হয়ে দিল্লী হতে বাংলায় আসেন। ইংরাজ কোম্পানী (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী) তাঁকে মজনু শাহ বলত। তিনি খুবই জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন। সর্বশ্রেণীর প্রজারা তাঁকে দেবতুল্য মনে করতেন। তিনি মুর্শিদাবাদ ও ঢাকায় না গিয়ে রংপুর জেলার ফুলচৌকীতে রাজধানী গড়াবার চেষ্টা করেন। বাংলার, বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানের, হিন্দু-মুসলমান, সন্ন্যাসী-ফকীর, জমিদার-প্রজা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুবে বাংলার নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর ঝাণ্ডার নীচে এসে মীরজাফর তৎপুত্রদের এবং ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে সম্মুখ ও গেরিলা যুদ্ধ করেন। এ'র দলে অনেক নাগা সন্ন্যাসী, ভুটিয়া, অসমীয়া, হিন্দুস্থানের রাজপুত এবং হিন্দু, মুসলমান অনেকে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। ইনি ২ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে ইংরাজদের আক্রমণে আহত হয়ে ফুলচৌকীতে দেহত্যাগ করেন। সেখানে এই অসাধারণ জনপ্রিয় নবাবের কবর একরূপ নিশ্চিহ্ন অবস্থায় রয়েছে। এ'র পুত্র-কন্যাদের নাম কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ, বেগম লালবিবি ও বেগম চাঁদবিবি। বেগম লালবিবি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বড় ছিলেন। চাঁদবিবি সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা। নওয়াব-নাজিমের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদ-এর পুত্র ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ-এর সহিত বেগম চাঁদবিবির বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহ হয় শাহ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর শাহ-এর সাথে। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ বিয়ে করেন তাঁর আপন চাচা দ্বিতীয় আলমগীরের কন্যা কিসমৎ বানুকে। ইনি স্বামীর সাথে থেকে ফুলচৌকীতে ইহলীলা সংবরণ করেন। পুত্র কামালউদ্দীন মোহাম্মদ-এর বিয়ে হয় তৎকার মিঞা বাড়ীতে। ২য় পুত্র জামালউদ্দীন মোহাম্মদ-এর বিয়ে হয় দিল্লীর মোগল রাজবংশে। কামালউদ্দীন মোহাম্মদ লর্ড কর্নওয়ালিসের সাথে একটা আপোস করেন। এর পর তিনি বাড়ী-ঘর করায় মনোনিবেশ করেন। ফুলচৌকীতে এক অতুলনীয় সৌন্দর্যশালী প্রাসাদ নির্মাণ করান। চতুষ্পার্শ্বে হাজার হাজার ঝর্ণা-ফোয়ারা ফুল-ফলের বাগ-বাগিচা। সরোবর, দীঘি, পুকুর, চৌবাচ্চা—এক কথায় ইন্দ্রপুরী জয় করে এনে ফুলচৌকীতে বসানো হয়েছে এমনি মনে হত। অবশ্য কামালউদ্দীন মোহাম্মদের পিতা তাঁর সঙ্গী মন্ত্রী, সেনাপতিদের থাকবার জন্য সরোবরের দুই পাশে সুন্দর সুন্দর কুঠি নির্মাণ করান। সেখানে তাঁরা থাকতেন। নবাব থাকতেন তাঁবুতে। নবাব বিলাসিতা ও আড়ম্বর পছন্দ করতেন না—তা তাঁর কাজ কর্মগুলি দেখলে সহজে বোঝা যায়। নবাবের ভাই থাকতেন বালাখানায়। তার পাশেই বাস করতেন মন্ত্রী শিবচন্দ্র রায়। নবাব পুত্র-কন্যারা ও প্রজাবর্গ ইংরাজদের কখনও মনে মনে সমর্থন করতেন না। নবাব-কন্যা লালবিবি ইংরাজদের এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য তাঁর সাধ্যপক্ষে চেষ্টা করে এসেছেন। রাজা রামমোহন রায়কে বিলাত পাঠান হয় কামালউদ্দীন মোহাম্মদের অর্থানুকূল্যে ও চেষ্টায়। রাজা রামমোহন রায় স্বাধীনতার একান্ত ভক্ত ও পিয়াসী ছিলেন। নেটাল বন্দরে ফরাসী দেশের স্বাধীন পতাকা দেখবার আকুল আগ্রহে পড়ে তিনি এক পা মচকে ফেলেন। আমি যা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোকদের নিকট শুনেছি, তাতে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, রাজা মনে মনে এই মোঘল রাজপরিবার এবং রঙ্গপুরের সন্ন্যাসী, ফকীর, জমিদার এদের প্রভাবে স্বাধীনতার দিকে ঝুঁকে যান। রাজার মৃত্যু সংবাদে ইংরাজদের উপর এ দেশীয় অনেক লোকের সন্দেহ এসেছিল। বেগম লালবিবি দিল্লী হতে ফুলচৌকী নগরে আসতেন গোপনে এবং প্রধান প্রজাদের নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। ইংরাজরা রাস্তায় এবং বিভিন্ন গ্রামের

প্রধান প্রধান ব্যক্তির বাড়ীতে, গঞ্জে, বন্দরে সন্ন্যাসীদের আস্তানায়, ফকীরদের ডেরায় 'কাঁহা লালবিবি' 'কাঁহা লালবিবি' বলে খুঁজে বেড়াত। ফুলচৌকী প্রাসাদ হতে মীরগঞ্জ যাওয়ার কালে মীরগঞ্জের নিকটে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করে লালবিবিকে ইংরাজেরা হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে ইংরাজদের পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করে পায়রাবন্দের টাটি বলদিয়া, খয়রুদ্দীন, নাবালক সাহেব এবং গুরুবাবু লাহিড়ীর এক পূর্ব পুরুষ। এতে তারা বিপুল জমিদারী ও নিষ্কর ভূমি ইংরাজদের নিকট হতে পুরস্কার স্বরূপ পায়। এর পর আসে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। ফুলচৌকীর রাজবংশের লোকেরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ইংরাজদের এ দেশ হতে তাড়িয়ে দেবার। কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টা বিফল হয়। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর এই বংশ এবং আরও হাজার হাজার মানুষের উপর নেমে আসে অকথ্য অত্যাচার আর বাজেয়াপ্তি। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহজ্বালা ১২/১৪ বছর ধরে চলে এসেছে। কামালউদ্দীন মোহাম্মদকে রঙমহলে শরবতের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্রদ্বয় এবং অন্যান্য আত্মীয় অসাধারণ দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ সিপাহী যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বাংলার যুদ্ধকালীন সুবাদারও ছিলেন। গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ, ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ, তংকের মিয়া ফজিল খাঁ প্রমুখ হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জায়গায় সুবাদার ছিলেন। গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ এবং ওয়ালীদাদ মোহাম্মদকে বহু নির্যাতন করে হাতীর পায়ের সঙ্গে বেঁধে রংপুর নিয়ে যাবার কালে তাঁরা পথেই মারা যান। এঁদের রঙমহলের কাছে ফেলে দেওয়া হয়। মহিপুরের ফকীর সাহেবরা এঁদের কবরস্থ করেন। রঙমহলের দক্ষিণ পার্শ্বে বালাটাড়ি গ্রামে এবং রংপুর শহরের রাস্তার ধারে এই দুই মোগল বীরপুরুষের কবর রয়েছে। ফুলচৌকী রাজবাড়ী দু'বার লুণ্ঠিত হয়। সেই সংগে এই জেলার হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ও ফাঁসি দেওয়া হয়। আমার পিতা ও দুই বড় চাচাকেও অপরাধী করে ফাঁসি দেওয়া হয়। এঁদের মত ধনে ধনী নিঃস্বার্থপর প্রজারঞ্জক শাসক খুব কমই দেখা গেছে। যুদ্ধে জয়লাভ হলে বাদশাহ সকলে ফুলচৌকীতে আসতেন এবং ফুলচৌকীতেই ভারতের রাজধানী হত। রাজা ধুন্ধুপন্হ নানাজী, মন্ত্রী আজিমুল্যা খাঁ ফুলচৌকী প্রাসাদে

থেকে মারা গেছেন। প্রাসাদের ভিতরে এবং বাহিরে এ'দের গুণমুগ্ধ লোকেরা এ'দের চরম দুর্দশার দিনেও ইংরাজদের কোন লোভের বশবর্তী না হয়ে গোপন কথা গোপনেই রেখেছিল। গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদের জামাতা উমরউদ্দীন চৌধুরীকে গুপ্তচর বৃত্তির সন্দেহে স্থানীয় প্রধানরা হত্যা করেন। এই বংশের লোক যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকের সাথে আমি পরিচিত ছিলাম। ফুলচৌকীতে আমি অনেকবার গিয়েছি। নতুন যারা ছেলে পেলে আছেন তাদেরকে চিনি না। যাদের নিকট এ সব কথা শুনেছি তাদের মধ্যে চামার গাছুয়া, সাদাতুল্যাহ সরকার, পিয়ার মামুদ সরকার, মজরুল্যাহ সরকার, পিয়ারোতুল্যাহ সরকার, এলাহী বকশ সরকার, আইন উল্যাহ্ সরকার, খয়রুল্যাহ গাছুয়া, প্রমুখ সকলেই ফুলচৌকী রাজ-স্টেটের কোন-না-কোন কর্ম করতেন।

রহিমউদ্দীন মিঞার সাক্ষাৎকার বিবরণী

[মোঃ রহিমউদ্দীন মিঞা (বয়স ১০২ বছর), গ্রাম তবকপুর, পোঃ ও থানা উলিপুর, জেলা রংপুর।]

আমি ছোটবেলায় আমার গ্রামের সর্বজনমান্য সুপ্রাচীন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য শিরোমণির নিকট এবং আরও অনেকের নিকট নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর কথা শুনেছি। ইনি সুবা বাংলার নাজিম নবাব ছিলেন। এর রাজধানী ছিল ফুলচৌকীতে। ইনি দিল্লীর বাদশাহদের বংশীয় এবং বাদশাহর জামাতা ছিলেন। ইনি বহু ধন রত্নে খুবই বড় ধনী ছিলেন। উক্ত শিরোমণি মহাশয় অনেকবার বলেছেন—তৎকালীন ভারতে তাঁর মত তেজস্বী, সুবিজ্ঞ লোক বিরল ছিলেন। সকলকে এক করে যুদ্ধ করবার কৌশল তাঁর মত আর কেউ দেখাতে পারেন নি। বহু চেষ্টা করেও ইংরাজরা তাঁকে কয়েদ করতে পারে নি। ক্লাইভ, হেস্টিংস প্রমুখেরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে যুদ্ধে হেরে তাড়িত হয়েছিল। ছল করে মোগল কুঠি হতে বাইরে এনে অতর্কিত অকলন্ড (?) সাহেবের আক্রমণে ইনি আহত হয়ে পড়েন। তখন তাঁর নিকট মাত্র ৪০/৪৫ জন দেহরক্ষী ছিল। ফুলচৌকীতে নীত হওয়ার কয়েকদিন পর এই গণনেতা দেহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসী, প্রজা, জমিদার, পীর, মৌলভী—সকলকে তাঁর যাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় এক করতে পেরেছিলেন। নবাবের দুই পুত্র, দুই কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম কামালউদ্দীন মোহাম্মদ, জামালউদ্দীন মোহাম্মদ। কন্যাদ্বয়ের নাম বেগম

লালবিবি ও বেগম চাঁদবিবি। বেগম লালবিবির বিয়ে হয় দিল্লীতে—বাদশাহ আকবর শাহের সাথে। নির্বাসিত সম্রাট বাহাদুর শাহের আপন মাতা ছিলেন বেগম লালবিবি। মাহিগঞ্জের দক্ষিণে মীরগঞ্জের নিকট ইংরাজরা হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে হত্যা করে। চাঁদবিবির বিয়ে হয় নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র ওয়ালীদাদ মোহাম্মদের সঙ্গে। কামালউদ্দীন মোহাম্মদ, জামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও নবাবের রঙমহল ছিল বর্তমান রংপুর শহরে। কামালউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্রদ্বয় এবং বংশীয়রা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ সিপাহী বিপ্লবের প্রধান সেনানায়ক ও সুবা বাংলার যুদ্ধকালীন নবাব ছিলেন। এরা সকলে পূর্বপুরুষদের মত তেজ ও বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করে শেষে এ দেশীয় অনেকের বিশ্বাসঘাতকতায় হেরে যান। যুদ্ধের পর এই বংশের সমস্ত ধন লুট এবং সম্পত্তি ও ব্যবসা বাজেয়াপ্ত হয়। এদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই সংগে এই জেলার এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা এবং ফাঁসি দেওয়া হয়।

ভুগর্ভে হীরক ও স্বর্ণপ্রাপ্তি

নানা সাহেব যেমন কূপে স্বর্ণরৌপ্য পাত্র নিক্ষেপ করেছিলেন, ফুলচৌকীতে ঐরূপ কোন কিছু করা হয়েছিল কিনা বলে জানা যায় না। এখানে আমরা ইংরাজদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের কিছু নমুনা দিলাম ঃ

> জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদ ধ্বংসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন এই বিধ্বংস ব্যাপার শেষ হয়। প্রধান সেনাপতির আদেশে হোপ্‌গ্রান্ট ১২ই ডিসেম্বর বিঠুরে গিয়া তোপে মন্দির উড়াইয়া দেন, প্রাসাদ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। বিশ্বাসঘাতক আজিমউল্যাহ যে গৃহে অবস্থিতি করিত, সেই গৃহে কতিপয় পত্র পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বিচিত্র দ্রব্য অধিকৃত হয়। নানা সাহেব ত্রিশ লক্ষ টাকা, বারুদ ও গোলাগুলী বাক্সে বন্ধ করিয়া একটি বৃহৎ কূপে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া ইংরেজ সৈন্য ১৫ হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাত্রিদিন ঐ বহুমূল্য দ্রব্যের উদ্ধারের চেষ্টা করে।

মুদ্রা ও বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু সৈনিকগণ এই গুরুতর পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই।[১]

নানা সাহেব যেমন কূপের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্র কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, ফুলচৌকীতে তেমন ব্যবস্থা হয় নাই বলে মনে হয়। তবে দুইবার ফুলচৌকী প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়। পাকিস্তান হওয়ার সাত বছর পর প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কুলিরা মাটি খুঁড়ে চলে যাবার পর গর্তের একটি জায়গায় বর্ষার জলে ধুয়ে যায়। ধুয়ে যাওয়ার পর মাটির মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় কতকগুলি জিনিস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রধান হল অর্ধভরি ওজনের একটি হীরক (মানিক)। হীরকটি দেখতে একটি কবুতরের ডিমের মত। হীরকের দুই দিকে কাটা। মধ্য দিয়ে একটি স্বর্ণতার যাওয়ার মত একটি ছিদ্র ছিল। দুইটি স্বর্ণ নির্মিত আঙ্গুটি। আঙ্গুটির উপরিভাগে অনেক হীরকদানা বসানো ছিল। সম্ভবত কোন লোক ওসব মাটির মধ্যে প্রোথিত করে রেখেছিল। পরে সুযোগ বুঝে তিনিও সব তুলে আনবেন এই আশায়। কিন্তু ঘাতকদের হাতে হয়ত মারা যাওয়ায় তাঁর প্রোথিত জিনিসগুলি ঐভাবে ছিল। শোনা যায়, লুণ্ঠনের সময় বড় সতরঞ্জিতে করে ১৫/২০ জন ধরে লুণ্ঠিত জিনিসগুলি নিয়ে যায়। যা হোক, প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব কোণে পুকুরের পাড়ের নীচের যমীনে (এখন ধান ক্ষেত করা হয়) এক কৃষক জমিতে হাল চাষ করে ১০/১১ টার দিকে জমি থেকে চলে যায়। মোগল বংশীয় অল্প বয়স্ক এক কিশোর ঐ দিকে অন্যমনস্কভাবে চলতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পান যে, একটা সূর্য যেন হালচাষ করা যমীনের এক জায়গায় চমকাচ্ছে আর লুটোপুটি খাচ্ছে। কিশোর শাহজাদা ঐ স্থানে ধীরপদে অগ্রসর হয়ে দেখে যে, বসরা গোলাপী রঙের একটি ছোট পাথর পড়ে রয়েছে। শাহজাদা হাতে তুলে নিলে পাথরটিতে দীপ্তি সূর্যের মত আর ঝকমক করল না। শাহজাদা তখন পাথরটি মাঠের মধ্যে রেখে ১০/১২ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন পূর্বের মত আবার সূর্য ঝলমল হয়ে উঠল। আকাশে চাঁদ উঠলে শাহজাদা পাথরটি রেখে কিছু দূরে সরে গেলে চাঁদের মত জ্বলে উঠল। সম্ভবত কোন বেগম সাহেবার কণ্ঠে এই মহামূল্য রত্ন শোভা পেত। কণ্ঠে যখন থাকত, তখন অন্য

---

১. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত, পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, 'তাতিয়া টোপি' পৃ. ৩৩৮-৩৩৯।

লোকেরা চন্দ্র-সূর্যের লুটোপুটি খাওয়া খেলা দেখতে পেত। যে সময় দ্রব্যগুলি লুণ্ঠিত হয়, তখন হয়ত সেটা নিয়ে যাবার সময় পড়ে গিয়েছিল। অথবা কেউ গোপনে প্রোথিত করে রেখেছিল। কিন্তু তাঁর জীবন হয়ত রক্ষা পায়নি। আর এই মহামূল্যবান রত্নটি নিয়ে যেতে পারেন নি। সেখানে মাটির নীচে পড়েছিল। জীবনে অনেক রত্নের কথা শুনেছি। বই-কাগজ-পত্রেও পড়েছি। কিন্তু এই ধরনের রত্নের কথা এ যাবত শুনি নি। তবে কি পৃথিবীতে এই ধরনের এই একটি রত্নই ছিল ? শোনা যায়—কামালউদ্দীন মোহাম্মদ যখন মূল প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তখন এক সময় সমস্ত ওস্তাগার লোকদের তিনদিনের জন্য বিদায় দেওয়া হয়। শুধু সর্বপ্রধান মিস্ত্রী মালিকের সহিত ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, ঐ সময় কামালউদ্দীন মোহাম্মদ বহু ধনরত্ন প্রাসাদের ভিতরে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখেন। এই হল স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস।

যা হোক, আমাদের বর্ণিত রত্নগুলি হারিয়ে গেছে—এই বলা ছাড়া উপায় নেই। অবস্থা খারাপ হলে মূল্যবান জিনিস হাতে এলেও তা যে কোন ভাবেই হোক চলে যায়। কামালউদ্দীন মোহাম্মদ বকশি, শাহ জামালউদ্দীন বকশি এবং তৎপিতা মুসা শাহ বকশির নামানুযায়ী তাঁদের পৈত্রিক বাড়ীর নিকট একটি বন্দর ছিল। বন্দরের ধ্বংসাবশেষটিকে এখন বলা হয় 'বকশিগঞ্জ'। উক্ত বকশিগঞ্জ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর লুণ্ঠিত এবং বিধ্বস্ত করে দেওয়া হয়। বকশিগঞ্জের অনেক লোক অনেক সময় সোনা রূপা পেয়েছে মাটি খুঁড়তে গিয়ে। কবর খুঁড়তে গিয়ে যাঁরা স্বর্ণ পেয়েছিলেন, তাঁরা নিজেরা যা আমাকে বলেছিলেন, তাঁদের একজনের কথা অবিকল এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল ঃ

> কবর খোঁড়ার সময় বকশিগঞ্জ (বাগবার) এ কতকগুলো সোনার বল-(খেলার মারবেল পাথরের ন্যায়) অনুমান তিন ভরি ছয় আনা ও সাড়ে তিন ভরি ওজনের কয়েকটি সোনার পাত, দৈর্ঘ্য দেড় ইঞ্চি, প্রস্থ ১ ইঞ্চি পাওয়া গিয়েছিল। বাংলা ১৩৫৪ সালে উক্ত জিনিসগুলো পাওয়া গিয়েছিল। উক্ত জিনিসের কতক আজও কানবালা ও গলার মালারূপে যথাক্রমে মোছাম্মৎ রোকেয়া বেগম ও লুৎফর রহমানের স্ত্রীর নিকট বিদ্যমান আছে। উক্ত সোনা যা বিক্রি হয়েছে, তার মূল্য ৬৮০০৲ টাকা। নিম্নলিখিত লোকগণ উক্ত গুপ্তধন পাইয়াছিল ঃ

১. মুন্সী বাছেরউদ্দীন ছাহেব ভায়া ;
২. লুতফর রহমান — শালা ;
৩. রোকেয়া বেগম — স্ত্রী ;
৪. টগতেলী (বাগবার বাসিন্দা)।

হাফেজ মোহাম্মদ সাইদ-এর সাক্ষাৎকার বিবরণী

হাফেজ মোহাম্মদ সাইদ (বয়স ৯০ বছর) সাং নবাবগঞ্জ, জেলা রংপুর—তিনি তাঁর জবানবন্দীর সাক্ষ্যে বলেন, আমি বাংলা ১৩০৭ সাল ইংরেজী ১৯০০ সালে দ্বার-ভাঙ্গা জেলা হতে এসে এখানে বসবাস করছি। আসার সাত বছর পর এখানে আমি মনোহারির দোকান করি। মাহিগঞ্জ থেকে মাল নিয়ে আসতাম। মাড়োয়ারীরা তখনও মাহিগঞ্জ থেকে এসে অস্থায়ী দোকান করতে করতে পরে দালান-কোঠা উঠায়। ভুমন মিয়া তাঁতিওয়ালা তালের পাতা দিয়ে একটি ঘর তৈরী করে থাকত। শাহী মসজিদ থেকে পূর্বদিকে আর কোন বাড়ীঘর ছিল না বা কোন দোকান ছিল না। শুধু পূর্বের তিনটা দুই মহলা ভাঙ্গা দালান ছিল। দালানগুলি ফুলচৌকীর মোগল বংশীয়দের ছিল। শুনেছি এইখানে তাদের রঙমহল ছিল। আমি যখন আসি, তখন কাচারি আদালত সব নতুনভাবে বসেছে। আমি অনেক বছর থেকে এই শাহী মসজিদে শেষ ইমামতি করে আসছি। শাহী মসজিদের পতন ও জমি গ্রহীতা বিজলী কড়ক শাহ ফকীর, দাতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, মৌজা রাধাবল্লভ. পরগনা মন্হনা, বাংলা ১১০৭ সাল। এরাজিয়াত তায়েদাদ লাখেরাজ রেজিস্ট্রীভুক্ত ১২০৭ সাল ৩৪ নং কালেকটরি বহি। জমি রাধাবল্লভ মৌজা ৩২ বিঘা ও মৌজা ভগি ৩২ বিঘা; অন্যান্য ভাগী, দায়মুল্যাহ শাহ, কায়মুল্লাহ্ শাহ ফয়মুল্যাহ্ শাহ ও রমজান্ আলী শাহ—ইহাদের পিতা মোহাম্মদ খোদাদীন শাহ।

বিদ্যাধরীর স্মৃতিস্তম্ভ

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীগণ তাদের স্বদেশীয়দের প্রেরণা দিবার মানসে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সময়ে রাজা নানা ধুন্ধুপন্থের দলের লোকেরা কতগুলি ইংরাজ নারী, পুরুষ, শিশুদিগকে হত্যা করে যে কূপে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে। সেই প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

> এই উদ্যানে একটি কূপ ছিল। এক্ষণে সেই কূপের উপর একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে একটি স্বর্গ বিদ্যাধরীর মূর্তি আছে। স্তম্ভ-গাত্রে ইংরাজীতে খোদিত আছে যে, 'বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুন্ধু-পন্থের দল ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকট অনেক ইউরোপীয় বিশেষত য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে অন্যায়-রূপে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।' এই উদ্যান রক্ষার জন্য গভর্নমেন্টের বার্ষিক ৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়।
>
> —বিশ্বকোষ, কানপুর পৃঃ ৪৬১

উক্ত ব্যবস্থায় যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রেরণা পেত, সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় লোকদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ ও পদদলিত, মথিত করবার পশু প্রবৃত্তিগুলি জেগে উঠত এবং সেইভাবে এদেশীয়দের নির্যাতন করত। ইংরাজরা এদেশের মানুষের উপরে যে অত্যাচার নির্যাতন এবং হত্যার তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে, বিশ্ব ইতিহাসে এর পূর্বে এমন অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরল বলে মনে হয়। অথচ দেশটা যাদের, তাদের উপরে বলপূর্বক ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের স্বাধীনতা হরণ করবার জন্য যে কোন অমানবিক কাজ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা গর্বের সহিত করে এসেছে। যদি ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে ইংরাজদের মত করে রাখত, ইংরাজরা ভারতীয়দের মত স্বীয় দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ বা সংগ্রাম করত, এতে ইংরাজগণ যে কোন ভারতীয়দের হত্যা নির্যাতন প্রভৃতি করত কি না ? আমরা ইংরাজদের এদেশীয়দের উপর অমানবিক নির্যাতন দেখে বিশ্বাস করি, স্বদেশে হলে একটি সাম্রাজ্যবাদী ভারতীয়ের নারী, পুরুষ, শিশু, সামরিক, বেসামরিক কোন মানুষকে ইংরাজরা জীবন্ত রাখত না। তাদের এদেশের উপর মনুষ্যত্বহীন আচরণ দেখে এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যায়। তাদের মতলববাজ প্রচারের মায়াকান্না দেখে মনে হয়, ইংরাজরা তাদের দেশ দখলকারী হলে এদেশীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গী বেসামরিক লোক, নারী, পুরুষ, শিশু—এদের ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করত। অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণকারীকে ও তাঁদের সহকারী সহযোগীদের এবং পোষ্যগণকে হত্যা করাটা ঐ সময় কোন অন্যায় কাজ হয় নাই। বরং যারা ইংরাজদের যে কোন ভাবে বাঁচাতে গিয়েছে, তাদের জীবন রক্ষা করেছে, তাদের আজও আমরা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক বলে জানি। দেশের মানুষের চোখে আজও তারা কুইসলিং হ'য়ে রয়েছে এবং চিরদিন তাই থাকবে।

যা হোক, আমাদের কথা হলো—এই উপমহাদেশের যেখানে যেখানে ইংরাজরা চরম অত্যাচার ও হত্যার তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে, সেসব স্থানগুলিতে স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা উচিত, আর যাতে কোন বিদেশী এই দেশে কোন ভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। এই দুঃখজনক স্মৃতি লক্ষ লক্ষ মানবের কল্পনার স্মৃতিতে ভাসতে থাকুক। এর প্রতিটি লোকই হবে এদেশের সতর্ক প্রহরী রক্ষক।

দেওয়ান হাকিম আহসান উল্যাহ্ খান

এখানে আমরা ইতিহাস হতে উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের কথাগুলি বলবার প্রয়াস পাব।

> ২রা জুলাই রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহের নায়ক বখৎ খান প্রচুর সিপাহী ও লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ নিয়ে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আগমনে রাজধানীতে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হলো। এই প্রসঙ্গে মেটকাফ্ নামক জনৈক ইংরেজ তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন ঃ 'রোহিলাখণ্ডের বিদ্রোহী সিপাহীদের আগমন উপলক্ষে যমুনার সেতুটি মেরামত করা হইল। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বাদশাহ রোহিলাখণ্ডের সিপাহীদের দেখিতে লাগিলেন। তাহারা তখনও কিছু দূরে ছিল। ২রা জুলাই রাজধানীর বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে লইয়া নবাব আহমদ কুলি খান রোহিলাখণ্ডের সিপাহীদের অভ্যর্থনা করিলেন। হাকিম আহসান উল্যাহ খান, জেনারেল সামাদ খান, ইব্রাহিম আলী খান প্রমুখ দিল্লীর বিদ্রোহী নেতৃস্থানীয়েরা সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।
>
> —সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, মানবাগচি, পৃষ্ঠা ২৬১

উদ্ধৃতির মধ্যে হাকিম আহসান উল্যাহ্ সাহেব সম্পর্কে এখানে আমরা যা জেনেছি তাই আলোচনা করব। ইতিহাসের পাঠক জানেন যে, হাকিম আহসান উল্যাহ খান একজন ঔষধ ব্যবসায়ী হাকিম বা হেকিম ছিলেন। ইনি সম্রাটের অমাত্যগণের মধ্যে একজন ছিলেন অথবা সম্রাটের নিকট যুদ্ধের সময় যাওয়া-আসা করতেন। বিদ্রোহীদের পক্ষে মনে-প্রাণে কাজে-কর্মে সরলভাবে ইনি ছিলেন তাঁদের একান্ত ঘনিষ্ঠ একজন হয়ে। সে যা হোক ইনি কে, আর কোথাকারই বা অধিবাসী ছিলেন, এ সম্পর্কে আমরা এখানে যা জানতে পেরেছি তা বলবার চেষ্টা করব।

আপনারা আশ্চর্য হলেও আমরা বলতে চাই যে, উক্ত হাকিম আহসান উল্যাহ খান্ বাংলার রংপুর জেলার ফুলচৌকীর ১ মাইল পূর্বেবর্তী কাসিমপুর গ্রামের এক সম্মানীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বের লোক আরবী ফার্সী জানা অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ ফার্সী রাজভাষার প্রভাব ঐ সময়েও মুসলমানেরা কাটিয়ে উঠতে পারেন্ নি। মাদ্রাসায় উচ্চক্লাসে পড়লে ছাত্রগণ শিক্ষকদের নিকট হতে হেকিমি বিদ্যাটিও আয়ত্ত পূর্বেও করতে পারতেন, এখনও পারেন। এ হিসাবে হেকিম হওয়া বা দিল্লীতে হেকিমী ব্যবসা করাটা কোন অসম্ভব নয়—ইংরাজদের ফাঁকি দিবার জন্য। যুদ্ধ সময়কালে দিল্লীর সম্রাট এবং দিল্লী শহরে হাকিম আহসান উল্যাহ সাহেবের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। এ সব কথা ছিটে-ফোটাভাবে হলেও বিভিন্ন ইতিহাস পড়ে জানা যায়। সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য এই লোকটি ছিলেন্ জনপ্রিয়।

১৮৫৭ সালের যুদ্ধ আরম্ভকালে নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের পিতা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ জীবিত ছিলেন। কিন্তু নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ ঐ সময়ে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত লোক বেছে নিলেন দিল্লীতে থেকে নাসিরউদ্দীনের দূত হিসাবে সম্রাটের নিকট সব সময় যাওয়া-আসা করবার জন্য। সে কাজ তিনি বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সহিত পালন করে এসেছেন। কারণ যে কাজ এ'রা বেছে নিয়েছেন তা খেলার বস্তু নয়। সুতরাং সম্রাটের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সম্রাট যাতে বিপক্ষীয়দের হাতে গিয়ে না পড়ে বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ-আলমের মত, সম্রাটের প্রতিটি কাজ কর্ম লক্ষ্য করা এবং নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদকে উক্ত সব বিষয়ে অবহিত করা—এই ছিল হাকিম আহসান উল্যাহর কাজ।

যা হোক, ফুলচৌকী ও রংপুরের লোকেরা এখনও এই লোকটি সম্পর্কে কোন কথা উঠলে খুবই সম্মান দিয়ে বলে থাকেন, 'দেওয়ানজী'। দেওয়ান অর্থে জমিদারের প্রধান কর্মচারী বলা যায় অথবা রাজস্ব মন্ত্রীকেও দেওয়ান্ বলা হয়ে থাকে। 'হেকিম' এবং 'খান' এই দুই নামে ইনি এতদঞ্চলে পরিচিত নন। কারণ এখানে জন্মভূমিতে ইনি হেকিমী ব্যবসা করেন নি। খান্ এই সম্মানীয় পদবী হয়ত দিল্লীতে থাকবার সময় সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। আজও বিদ্রোহীদের এই এলাকাগুলিতে দেওয়ানজী আহসান্ উল্যাহ নাম প্রবাদবাক্যের মত অসাধারণ্

জনপ্রিয়তার সহিত প্রতি ঘরে ঘরে উচ্চারিত হয়ে আসছে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত। এখনও এঁর নাম এবং কোন কথা উঠলে লোকেরা সম্ভ্রমের সাথে বলেন দেওয়ানজী। দেওয়ানজী বললে বুঝতে হবে আহসান উল্যার কথাই এখানে বলা হচ্ছে। এমন সাদামাটা সরল মনের মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়। এই হল স্থানীয় লোকদের কথা। তাঁরা আরও বলেন, এর দেশপ্রেম, প্রভুপ্রেম অসাধারণ ছিল। যুদ্ধ পরবর্তীকালে নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের বংশীয়দেরকে নানা রূপ ধ্বংসের হাত হতে উদ্ধার করতে গিয়ে ইনি শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে সর্বস্বান্ত হয়ে রংপুর, দিনাজপুরের বড় লোকদের বাড়ীতে ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন ধারণ করে গিয়েছেন। কিন্তু নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্রদের কোন দিন ত্যাগ করেন নাই। এই হল স্থানীয় লোকদের কথা। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গোউসউদ্দীন মোহাম্মদের একমাত্র কন্যার বিবাহ হয় রংপুর জেলাস্থ পীরগঞ্জ থানার কুমেদপুর গ্রাম নিবাসী উমরউদ্দীন চৌধুরীর সহিত। বিবাহের বছরখানেক পর উমরউদ্দীন মোহাম্মদ শ্বশুর বাড়ীতে এসে বাস করতে থাকেন। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের দুই জন প্রধান নেতা রাজা ধুন্ধুপন্থ নানাজী এবং তাঁর মন্ত্রী আজিমউল্যাহ খান প্রাসাদে আত্মগোপন করে থেকে মারা যান। নানাজী মারা যান নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের জীবিতকালে। আজিম উল্যাহ খাঁ নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ইহলোক ত্যাগ করেন। নানাজীর মৃতদেহকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ দ্বারা পোড়ানো হয়, বর্তমানে 'হাসিয়া' নামক গ্রামের অনতিদূরে বুড়া তিস্তার পাড়ে, গভীর রাতে, খুব গোপনে। আজিম উল্যাহ খাঁকে মোগল বংশীয়দের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। জহুর ফকীর ও তৎবংশীয়ের ছড়াগানে নানাজীর কথা শুধু পাওয়া যায়। আজিম উল্যাহ খানের কথা উল্লেখ নাই।

যা হোক, এসব অত্যন্ত গোপনীয় সংবাদ জানতে পারেন উমরউদ্দীন এবং এ খবর তিনি ইংরাজ শাসকদের গোচরীভূত করেন খুব গোপনে। যার ফলে আবার নেমে এল নানাভাবে নির্যাতন ও বাজেয়াপ্তির পালা। এই বংশের যাঁরা হিতৈষী এবং অন্য সকলে এসব কথা শাসকদের নিকট একেবারে অস্বীকার করে বসলেন। অনেকে এই জামাই বাবুর উপরে সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন। জামাই বাবুর লোভ-লালসার সীমা যখন ছাড়িয়ে

যেতে লাগল, সবকিছু আত্মসাৎ করবার চক্রান্ত তিনি করতে লাগলেন, তা দেখে প্রধান প্রধান লোকরা তার উপরে আরও বেশী করে সন্দেহ পোষণ করতে থাকল। ঐ সময় মূল প্রাসাদটি হতেও উক্ত অপরাধের জন্য নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের মহীয়সী বেগম আমিরননেসাকে বার করে দেওয়া হল কর্তৃপক্ষীয়দের হুকুমে। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন মারা গিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র এসব উপদ্রব সত্ত্বেও ভগ্নিপতিকে কিছুই বলেন নি। উত্তেজিত প্রধানদেরকেও তাঁরা নানাভাবে থামিয়ে আসছিলেন। এর মধ্যে আবার নাসিরউদ্দীনের তৃতীয় পুত্র মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র নিজামউদ্দীন মোহাম্মদ বাংলা ১৩০৫ সালে মারা যান। ইনি মারা যাবার একদিন পর জামাতা উমরউদ্দীন চৌধুরী কয়েকশত গো-গাড়ী ঠিক করেন। উক্ত গো-গাড়ীতে করে প্যালেসের মধ্যে তখনও অবশিষ্ট যা কিছু ছিল সে সব জিনিস-পত্র তার স্বগ্রাম কুমেদপুরে নিয়ে যাবার আয়োজন করেন। নিয়ে যাওয়ার রাত্রিতে তাকে স্থানীয় প্রধানরা মিলে ছুরি মেরে হত্যা করেন। শোনা যায় তাকে হত্যার পূর্বে এত বেশী মারা হয়েছিল যে, তার গায়ের একখানি হাঁড়ও অভাঙ্গা অবস্থায় ছিল না। ইনি যে বছর শ্বশুর বাড়ীতে ছিলেন, সে বছর ধরে বহু লোকে নানাভাবে নির্যাতন করে এসেছেন। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের হিন্দু-মুসলমান বন্ধু এবং তাঁদের অনুগত কর্মচারীরা এই হত্যার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকীর এবং দেওয়ানজী আহসান উল্যাহ খাঁ দাওয়ার মামুদ সরকার এ সব পদস্থ ও সম্মানীয় লোকদের কথা স্থানীয় লোকেরা যা বলে থাকেন, তা ব্যতীত জহুর ফকীরের ছড়াগানেও এসব কথা পাওয়া যায়। এখানে ছড়াগানের এতদসংক্রান্ত কিছুটা দেওয়া হ'ল ঃ

রাজা ধুন্ধু পন্হ নানাজী হায়াৎ জঙ্গ খাঁ।
মইল থাকিয়া রাজপুরীতে কেউতো জানল না।।
মায়ে যেমন ছাও রাখে ভাই বক্ষে করি ধরি।
ঐ মত রাখিয়াছিল নওয়াব নসির তাহাকে হে ঘেরি।।
কানা ঘুষা করে সব লোকে ভয়ে বলে আল্লা হরি।
এই খবর পাইয়া ফিরিঙ্গী রাজ গোস্বায় যায় ভরি।।
কমরের ছুরি পেট কাটে ভাই জানেনই সববাই।
উমরউদ্দীন আছিল এক কর্ত্তার জামাই।।

উমর বেহুদা খবর দিল ফিরিঙ্গী আসিল তরিৎ।
প্রজা পাইট সকলে বলে এবাত নহে নহে ঠিক।।
যাহা আছিল শেষ্ সম্বল লইলরে হরি।
রাজপুরীটাও লিখিয়া লইল নানা ছুতা করি।।

শেষে উমরের পাপ-পাপে বিনাশ হইল সর্ব লোকে কয়।
ভাই হে পাপি উমরকে মারিল দেওয়ানজী আহসানউল্যাহ্ মহাশয়।।
মারিতে কত লোক আছিল দাওয়ার, খড়কু, খট্টু কেবা করেকার নাম।
প্রজা, পাইট, ধনপতি, গাজী-ফকীর, গোসাঁইজী সন্ন্যাসী দিগের কাম।।

হাকিম আহসান উল্যাহ দেওয়ানজীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এ'র প্রভু নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার সময়কালে। নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের চেষ্টায় যে সময় ইংরাজদের হাত থেকে মুক্তি পান তাঁর পরিবারটি সহ, ঐ সময় ইনিও মুক্তি পান, মওলানা সাহেবের চেষ্টায় নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও হিতৈষী হিসাবে। আহসান উল্যাহ খাঁ দেওয়ানজী এ দেশীয় কোন লোককে কখনও কোন অসামরিক ইংরাজকে হত্যা, নারী শিশুকে হত্যা অথবা অযথা হত্যার প্ররোচনা দেন নি। এসব কারণে তাঁর জীবন রক্ষা হয়। উমরউদ্দীন চৌধুরীকে হত্যা করবার প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে ইনি ছিলেন না বলে এখনও লোকেরা বলে থাকেন। তবে উত্তেজিত সম্ভ্রান্ত লোকের ইনি ঠেকিয়ে রাখতেও পারেন নি। উমরউদ্দীন চৌধুরীর হত্যার পর এনাকে ফুলচৌকী এবং স্বগ্রাম কাসিমপুরে থাকতে দেওয়া হয়নি। যার ফলে এই বৃদ্ধ নায়ক 'জায়গীর' নামক স্থানে গিয়ে ইহলীলা সংবরণ করেন। এর বংশধর 'জায়গীর' অঞ্চলে আছে বলে শুনতে পাওয়া যায়।

কেশবলাল বসু ও সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী

আমরা উপরে রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সিপাহী যুদ্ধের যে ইতিহাস উদ্ধৃত করলাম, তাতে রংপুর বিদ্রোহের কোন কিছু পাওয়া যায় না। জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, ঢাকা—এসব জায়গায় ছোট খাট রকম দেশীয় সেনাদের

কিছুটা তৎপরতা মাত্র পাওয়া যায়। শুধু ঢাকার এ দেশীয় সিপাহীগণ তিস্তা পার হ'তে না হ'তেই উইল সাহেব উপস্থিত হয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। সিপাহীগণ নেপালে গমন করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, রংপুরে বিদ্রোহ হয় নি। বিদ্রোহী যারা এই পথে দিল্লী যেতেন তাদেরকেও রংপুরের মাটিতে থাকতে দেন নি তবে হয়ত এসব কথা ইংরাজদের লিখিত ইতিহাস থেকে দেওয়া হয়েছে। রংপুরে যে সামান্য দেশীয় সৈন্য ছিল তাঁরা হয়ত বিদ্রোহ করে নি এবং বিদ্রোহ করেছিল কিনা এ কথাও আজ ঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে পূর্বের শাসক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা সব সময় মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এ না করে তাদের উপায়ও ছিল না। আমরা যা সামান্য কিছু আমাদের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টায় সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা দিয়ে অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে, রংপুর হতে বিদ্রোহীদল পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিল ঐ বিদ্রোহ সময়গুলির যে কোন সময়কাল মধ্যে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, রংপুরে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ ঘটায় নি। কারণ সামান্য কালেকটরের সঙ্গে লড়াইয়ে কি লাভ? তাই তারা বিদ্রোহী মূল বাহিনীর সহিত লড়াই করেছেন।

যা হোক, রংপুর জেলা সদরের "কুন্ডি পরগনার প্রখ্যাত জমিদার বংশীয়দের" একখানি ইতিহাস হতে এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করব। অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে কথাটি তাঁরা তাঁদের বংশীয় ছাপানো ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন মাত্র। লেখার উপরের এবং নীচের বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যায় যে, ইংরাজ শাসকদের সুবিধা এবং প্রীতির চোখে থাকবার জন্য কালেক্টরের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ দিয়েও আমাদের কথা বলবার যে অনেক সুবিধা হয়েছে, তা না বললেও চলে। ইতিহাসখানির নাম 'কুন্ডির জমিদার বংশ' (পৃষ্ঠা—২৫)। তাতে যা লেখা রয়েছে, তা হল এই ঃ

> গত ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তদানীন্তন রংপুর জিলার কালেক্টর সাহেব শহর পরিত্যাগ করিয়া সদ্য পুষ্করিণী আইলেন। তাঁহাকে নিরাপদে রাখিবার ভার স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় গ্রহণ করেন এবং নিজবাড়ী সদর দেউড়ির উপর দ্বিতল কক্ষে উক্ত কালেক্টর সাহেবকে কয়েকদিন রাখিয়া তাঁহার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা ও অতিথির সর্ব বিষয়ের সুখ-সচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উপরের উদ্ধৃতিতে 'গ্রহণ করেন" এই কথায় পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে,

ইংরাজ কালেক্টর বাহাদুর গা-ঢাকা দিয়ে দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ীতে আসেন গোপনে নিরাপদে থাকবাব জন্য। শুধু তাই নয়, নীচের কোন কামরায় না রেখে দেউড়ির উপর দ্বিতল কক্ষে কালেক্টরকে জায়গা দেন। এসব যে গোপন ব্যাপার এবং তাকে যে গোপনে করে রাখা হয়েছিল, লেখার ধরন দেখে তা বেশ বোঝা যায়। জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী কালেক্টর এভাবে পালিয়ে দৌড়ে গিয়ে আত্মগোপন করবার কারণটা কি ছিল? যেখানে কালেক্টর দুর্গাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ীতে আত্মগোপন করেছিল সেই গ্রামের নাম সদ্যঃপুষ্করিণী। রংপুর শহর হতে সদ্যঃপুষ্করিণীর দূরত্ব দশ মাইল। এই দশ মাইল দূরত্ব জায়গায় কেউ ছোট-খাট ব্যাপারের জন্য পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে কি? তাও আবার আর কেউ নন; একেবারে জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক কালেক্টর বাহাদুর সাহেব। যেখান থেকে পালিয়ে গেছে সে স্থানের অবস্থা যে ভয়াবহ ছিল, এতে কোন কিছু সংশয় আছে কি? সেখানে অন্যদের অবস্থা কি হয়েছিল তা আজ জানা না গেলেও সহজে তা উপলব্ধি করা যায়। কালেক্টরের অধঃস্তন কোন কর্মচারীই হয়ত ঐ সময়টিতে শহরে ছিল না। ইংরাজ পক্ষীয় মিলিটারীদেরও থাকবার কথা নয় এবং যদি তারা থেকেও থাকে, তবে বিদ্রোহীদের শক্তি ছিল তাদের থেকে অনেক বেশী। তা না হলে জেলা কালেক্টর শহর ছেড়ে দশ মাইল দূরে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে কয়েকদিন ধরে অন্যের বাড়ীতে থাকে কেন?

অবশ্য কতদিন বা কতমাস কালেক্টর বাহাদুর আত্মগোপন করে সেখানে ছিল তা জানা যায় না।

যদিও রংপুর সম্পর্কে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সময়কালের ইতিহাস নামক গ্রন্থগুলিতে কিছুই লেখা নেই, তবে লন্ডনে বসে যুগস্রষ্টা মনীষী কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ-১৮৫৭—১৮৫৯ নাম দিয়ে লিখেছেন, তারই ১১৮ পৃঃ (বাংলা অনুবাদ) যা লেখা রয়েছে তা হ'ল এই:

> ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে, অভ্যুত্থান ছড়াচ্ছে কলকাতার উত্তর-পূর্বে, মধ্য ভারত হয়ে উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত; আর আসাম সীমান্তে পূর্বীয়াদের দু'টি শক্তিশালী রেজিমেন্ট প্রকাশ্যে ভূতপূর্ব রাজা পুরন্দর সিংহকে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করে বিদ্রোহ করেছে, দানাপুর ও রংপুরের

> বিদ্রোহীরা কানোয়ার সিংহের নেতৃত্বে বান্দা ও নাগোদ হয়ে জব্বলপুরের দিকে যাচ্ছে এবং স্বীয় সৈন্যের জোরে রেওয়ার রাজাকে বাধ্য করেছে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। খাস জব্বলপুরেই ৫২ নং বেঙ্গল দেশীয় রেজিমেন্ট সৈন্যনিবাস ছেড়ে গেছে, পেছনে রেখে আসা সাথীদের জন্য জামীন হিসাবে সঙ্গে নিয়ে গেছে একজন বৃটিশ অফিসারকে।

যুদ্ধ সময়কালে হোক অথবা তার পরে হোক, শুধু রঙ্গপুরের কথা ভারত হতে ইংলণ্ডে বসে কার্ল মার্কস্ লিখতে পারেন না। বিদ্রোহ স্থানের প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলি তিনি রচনা করেছেন। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস এই দুর্ভাগা দেশের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার উৎসাহ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা আমাদের প্রতি কি অমানুষিক অত্যাচার করেছে তা তাঁদের প্রবন্ধে বলিষ্ঠভাবে দেখিয়েছেন। অত দূরে থেকেও যাঁরা আমাদের এই মুক্ত জাতীয় যুদ্ধকে মুক্তির জাতীয় যুদ্ধ বলে স্বীকার করে নানা ভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে আছি। উক্ত উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, "অভ্যুত্থান ছড়াচ্ছে কলকাতার 'উত্তর পূর্বে', 'আসাম সীমান্তে', 'দানাপুর' ও 'রঙ্গপুরের' বিদ্রোহীরা কানোয়ার সিংহের নেতৃত্বে জব্বলপুরের দিকে যাচ্ছে।"

কলকাতার উত্তর-পূর্বে এবং আসাম সীমান্তে রংপুর অবস্থিত, সুতরাং কার্ল মার্কস-এর বর্ণিত রংপুর যে আমাদের রংপুরই হবে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উপরন্তু কুণ্ডির জমিদার বংশীয়দের ইতিহাসে যা উদ্ধৃত করে দেখান হল, তা থেকেও স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, রংপুরে বিদ্রোহ না হলেও একটি বা একাধিক শক্তিশালী বিদ্রোহী দল যে রংপুর হতে দানাপুর হয়ে পশ্চিম দিকে গিয়েছে, এতে কোন সন্দেহ ও সংশয় আর থাকে না। কালেক্টরের দুরবস্থা এবং উক্ত উদ্ধৃতির মাধ্যমে তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ইংরাজরা রংপুরকে বা রংপুরের ঘটনাগুলিকে চাপা দিয়ে রাখবার কারণ হল, ইংরাজ বিরোধী নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর অভিনব সাংগঠনিক প্রতিভা এবং তাঁর সহকর্মীদের ইংরাজরা কোনভাবেই প্রকাশ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই এভাবে সত্যকে গোপন করা হয়েছে। ১৯০৫ সালে 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা হল 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'। এই গবেষণাগারে ঐ সময় অনেক উচ্চদরের গবেষক সাহিত্য পরিষদের নানা

শাখায় গবেষণা কার্য চালিয়ে আসছিলেন। একথা না বললেও চলে যে, ঐ সময়ের গবেষকরা এতদূর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন যে, তার পরবর্তী বর্তমান সময়ে রংপুরে তাঁদের মত যোগ্য গবেষক এখন আর নেই। এই গবেষকদের মধ্যে রংপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক কুণ্ডির জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, রংপুর কৈলাশরঞ্জন হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রী কেশবলাল বসু। এ'রা রংপুরের ইতিহাস লিখতে ধরেন এবং সে কাজ অনেক দূর অগ্রসর করেও শেষে আর তাঁরা রংপুরের ইতিহাস লিখলেন না, নাকি লিখতে পারলেন না—এর কোন্‌টা ঠিক; পরে আমাদের হাতে যে সামান্য প্রমাণ রয়েছে। তা দিয়ে আমরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব যে, এদেরকে রংপুরের ইতিহাস লিখতে দেওয়া হয় নি। যদিও সামান্য বলেছি। কিন্তু এখন আমরা যা জানতে পেরেছি তাতে আর সামান্য বলা যায় না। কারণ আগে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। উক্ত দুইজন ইতিহাসের গবেষকের কথা আমরা পরে বলবো।

কেশবলাল বসু

এখন আমরা কেশবলাল বসু মহাশয়ের কথা বলবার প্রয়াস পাব। কেশবলাল বসু মহাশয়ের রংপুর সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় মাঝে মধ্যে প্রকাশ করাও হয়েছিল। রংপুর জেলা বোর্ড হতে কিছু টাকা তাঁকে সাহায্য করা হয়েছিল রংপুরের ইতিহাস লেখার জন্য। এসব কথা জেলা বোর্ড ও সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার মারফত জানা যায়। কেশব লাল বসু মহাশয়ের ছাত্র আনছার উদ্দীন আহমদ রংপুর শহরের ওছমানীয়া লাইব্রেরীর মালিক। তিনি তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণীতে বলেন, "যে সময় কেশবলাল বসু মহাশয় রংপুরের ইতিহাস রচনায় নিয়োজিত ছিলেন, ঐ সময় আমি কৈলাশরঞ্জন হাইস্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ি। প্রতি দিন মাস্টার মহাশয় একখানি বই হাতে নিয়ে ক্লাসে এসে বসতেন। বইখানি বাংলায় লেখা একখানি ইতিহাস। বইয়ের উপরিভাগে মলাট ছিল না। তাই ইতিহাসখানির নাম কি তা আমি জানতে পারিনি। তবে নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ, রাজা ভবানী পাঠক এবং অনেক সন্ন্যাসীর ফুলচৌকীতে রাজধানী ছিল—এমনি ধরনের অনেক কথা লেখা ছিল। পুরানো ধরনের টাইপে বইখানি ছাপা হয়েছিল। মাঝে মধ্যে ইতিহাসখানি নিয়ে ২/৪ মিনিট কোন দিন ৫/১০ মিনিট পড়ে দেখেছি। পরে আর মাস্টার

মহাশয়ের হাতে উক্ত ইতিহাসখানি দেখিনি। শেষে তাঁর ইতিহাস লেখারও আর কোন ঝোক দেখিনি। কেন যে তিনি ইতিহাসখানি লিখলেন না, তারও কিছু আমি জানি না। তবে কি 'অজ্ঞাত ইতিহাস' নামক গ্রন্থখানি কেশব লাল বসু মহাশয়ের নিকট ছিল ?

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

এখন আমরা রংপুর জেলার প্রসিদ্ধ 'কুন্ডির জমিদার বংশের' জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সম্পর্কে কিছুটা বলবার প্রয়াস পাব। কারণ ইনি রংপুর জেলার একজন বিদ্বান এবং সর্বজনমান্য, জনপ্রিয় সমাজকর্মী ছিলেন। শুধু তাই নয়, ইনি এই জেলার শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল সাহিত্যিক এবং গবেষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ১৯০৫ সালে সুরেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র শাখা হিসাবে 'রংপুরের সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, অর্থে এবং স্বদেশকে ভালবাসার দিক দিয়ে সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় মহাশয় পুরোধা ছিলেন। যা হোক, রংপুর জেলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়নে ইনি রত ছিলেন। এখানে আমরা সুরেন বাবু সম্পর্কে 'বাংলার জমিদার বংশের ইতিহাসের' কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিব। আমাদের উদ্ধৃতি বাংলায় ছাপানো ইতিহাসখানির উপরের পাতা না থাকায় সম্পূর্ণ নাম পাওয়া যাচ্ছে না বলে 'বংশ-পরিচয়' এইমাত্র নাম পাওয়া যাচ্ছে।

—পৃষ্ঠা ২৬৮, সূচীপত্রের নং ২২, কুন্ডির জমিদার বংশ

> মধুসূদন রায় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রচন্দ্র বঙ্গ সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ' এবং 'উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' সুরেন্দ্র চন্দ্রের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে সুরেন্দ্রচন্দ্র রংপুরের সাহিত্য পরিষদের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে তাহারই প্রযত্নে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গ সাহিত্যের একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া সুরেন্দ্রচন্দ্রের প্রসিদ্ধি আছে। বাংলা মাসিক পত্র পাঠকের নিকট তাহার নাম অজ্ঞাত নহে। কবিত্ব শক্তিতেও সুরেন্দ্রচন্দ্র নিতান্ত কম নহেন। রংপুর জেলার অতি গবেষণাপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর একখানি ইতিহাস প্রণয়নে তিনি ব্রতী

> আছেন। কামরূপ তত্ত্বাদি সংকলন করিয়া সুরেন্দ্রচন্দ্র ঐতিহাসিক সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। রংপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টর জে. ব্যাস আই. সি. এস. সাহেব বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্‌ট গেজেট (District Gazettier) রচনা করিবার সময় তাহার উপাদান সংগ্রহার্থে সুরেন্দ্রচন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কি সাহিত্য, কি জনহিতকর কার্য্যে সুরেন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় অধ্যবসায়ী ব্যক্তি রংপুর জেলায় আর কেহ আছে কিনা সন্দেহ। স্বগ্রাম ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।
>
> মহাজনের সুদে যাহাতে দরিদ্র প্রজাবর্গ জর্জরিত না হয়, তজ্জন্য তিনি 'রংপুর জমিদারী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ব্যাংক হইতে প্রজাগণ জমিদারদিগের মারফতে কম সুদে টাকা ধার করতে পারে। সুরেন্দ্র বাবু 'উত্তর বঙ্গ জমিদার সভা' নামক বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। রংপুরের অধিবাসীগণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সুরেন্দ্র বাবুকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখে।
>
> মিঃ জে. এন. গুপ্ত যখন রংপুরের কালেক্টর ছিলেন, তৎকালে সুরেন্দ্রচন্দ্র বাবু রংপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। তাহার ফলে তথায় 'কারমাইকেল' কলেজও[১] প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি উক্ত কলেজের প্রথম অন্যতম সম্পাদক এবং একজন প্রধান সহকর্মী। এই কলেজের গৃহ নির্মাণের জন্য ইহারা উভয় ভ্রাতা নিজ জমিদারী হইতে ৪১৯ বিঘা উৎকৃষ্ট ভূমি দান করেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর বিদ্যা, জ্ঞান পাণ্ডিত্য, বিপুল অর্থ, কার্য করবার অদম্য উৎসাহ—এ সবে তিনি পূর্ণ ছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রভাবশালী পুরানো জমিদার বংশীয় লোক হওয়ায় নিজ জেলা এবং অপর জেলাগুলিতে দলীল-দস্তাবেজ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করবার তাঁর সুবিধা অন্য কোন লেখকের থেকে বেশী ছিল। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রভাবশালী কার্যকরী সভ্য ছিলেন। আরও সুবিধার কথা হল,

---

[১] রংপুর কারমাইকেল কলেজের চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিগুলি যাহার পরিমাণ সাড়ে নয়শত বিঘারও অধিক হইবে 'কুণ্ডির জমিদারদের দান। তন্মধ্যে সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং তাঁর ভ্রাতা মনিন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ৪১৯ বিঘা উৎকৃষ্ট জমি কলেজকে দান করেন।

রংপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুরেন বাবুই ছিলেন। লোক হিসাবে সরল, উদার ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। আমরা স্থানীয় লোক হিসাবে যা জানি তাতে এই বলা যায় যে, সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন তিনি। সুরেন্দ্র বাবুর সদ্যপুষ্করিণী গ্রাম হতে ফুলচৌকীর দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল হবে।

সুরেন্দ্র রায় চৌধুরীর স্বগ্রাম হতে মাত্র দেড় মাইল দক্ষিণ দিকে চৌদ্দ ভুবন বিল। বিলের পশ্চিম পাড়ে হল তৎকালীন বিদ্রোহীদের বাজার 'বাহান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলী' বলে রাজধানীর সর্বউত্তর প্রান্তে এই বৃহৎ বাজারটি নবাব ও তার বন্ধুরা পত্তন করেছিলেন। এঁরা এই স্থানে সম্রাট আকবরের সময় হতে পুরুষানুক্রমে জমিদার ছিলেন। সুতরাং এ সব কথা সুরেন্দ্র বাবুদের পুরুষানুক্রমে খুব ভাল ভাবে জানা থাকার কথা। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময় রংপুরের কালেক্টর পালিয়ে এসে এঁদের এক শরীকের আশ্রয় নিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিলেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে এই অনুসন্ধিৎসু গবেষক নিজেই একখানি ইতিহাস ছিলেন বলে আমাদের বিশ্বাস। অর্থ, সামর্থ্য এবং কার্য করবার উদ্যম উৎসাহ থাকা সত্ত্বেও সুরেন্দ্র বাবু রংপুর জেলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কেন সে ইতিহাস লিখলেন না, এটা চিন্তা করবার ও ভাববার বিষয়ও বটে। বাংলার জমিদারদের 'বংশ পরিচয়' ইতিহাসখানিতে তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে—"রংপুর জেলার অতি গবেষণাপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর একখানি ইতিহাস প্রণয়নে তিনি (সুরেন্দ্র বাবু) ব্রতী আছেন।" অথচ সে ইতিহাস কেন ছাপান হল না আমরা জানি না। সুরেন্দ্র বাবু এখন আমাদের মাঝে নেই। কারণ মৃত্যুর পরপারে তিনি চলে গেছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ইংরাজী ২১/১২/১৯৪৫ সালে, ৭২ বছর বয়সে।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস যাতে ঐতিহাসিক রজনী কান্ত গুপ্ত মহাশয় আর না লেখেন, সে জন্য তাঁর বন্ধুগণ এবং পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ ইতিহাস প্রণয়নে নিষেধ করেছিলেন। তদ্রূপ সুরেন্দ্র বাবুকেও নিষেধ করা হয়েছিল। মনে হয় রজনী বাবুকে যে ভাবে নিষেধ করা হয়েছিল, তার থেকে বহু বেশী কঠোরভাবে হয়ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীকে নিষেধ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্র বাবুর ছোট বেলার বন্ধু ও কর্মচারী আবদুল আজিজ সরকার তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর বয়স ৭৯ বছর। পিতা আজিবুল্যাহ্ মণ্ডল, বয়স ১২৪ বছর, মারা গেছেন ৫২ বছর পূর্বে। উক্ত

আবদুল আজিজ সরকার এবং তাঁর পিতা, পিতামহ, তার পিতা—ইহারা সবাই পুরুষানুক্রমে উক্ত জমিদার বাড়ীতে কাজ করে এসেছেন। আমি সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর রংপুরস্থ শহরের বাড়ীতে যাই, সাহিত্য পরিষদের কোন একটি জিনিস দেখবার জন্য, তখন সুরেন্দ্র বাবুর বড় ছেলে সৌরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী বাড়ীতেই ছিলেন। উক্ত বৃদ্ধ আবদুল আজিজ সরকারকে সঙ্গে নিয়ে সাহিত্য পরিষদে আমরা যাই। তখন হতে আবদুল আজিজ সরকারের সহিত আমার পরিচয় হয়। এরপর হতে উক্ত বৃদ্ধের নিকট অনেকবার আমি যাওয়া-আসা করেছি। তখন জমিদারী নেই। সব চাকর বিদায় হয়ে গেছে কিন্তু সুরেন্দ্র রায় চৌধুরীর পুত্রদ্বয়, সৌরেন্দ্র কুমার ও শীতলকুমার রায় চৌধুরী পিতার এই বৃদ্ধ কর্মচারীকে বিদায় না দিয়ে বাড়ীতেই রেখেছিলেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে বললাম, সুরেন্দ্র বাবু কি আপনার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন? আজিজ মিঞা বললেন, আমি চার-পাঁচ বছরের বড় ছিলাম।

আজিজ মিঞার সাক্ষাৎকার বিবরণী

প্রঃ আপনার বাড়ী কি সদ্য পুষ্করিণীতে ছিল?

উঃ না, অর্ধমাইল তফাৎ পালিচড়া গ্রামে। তবে ছোটবেলা হতে আমি জমিদার বাড়ীতে থাকতাম।

সুরেন্দ্র বাবু তাকে কি রকম স্নেহ করতেন তাই বলতে গিয়ে বললেন, একটা পেয়ারা যদি হয় তারও অর্ধেকটা কেটে দিয়ে বলতেন, "নে আজিজ, ধর খা"। এ সব ছোটবেলার কথা।

আমি বললাম ফুলচৌকীর কথা, সুবাদার নুরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর কথা, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কথা, এসব সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন, শুনেছিলেন কিছু কি পূর্বের বৃদ্ধদের নিকট হতে?

আজিজ মিঞা বললেন, হাঁ জানি।

এর অনেক কথা আমি শুনেছি ছোটবেলা হতে বৃদ্ধদের নিকট। তাদের মধ্যে ছিলেন আমার বাবা আজিবুল্যাহ, সিন্ধু মোহাম্মদ (১৩২ বছর বয়সে মারা যান), বশরতুল্যাহ্ সরকার (বয়স এক শ'র উপরে হবে) ইনি ফিরিঙ্গীদের লাঠিয়াল-এর সরদার ছিলেন। তাদের মধ্যে উমরউদ্দীন সরদার (পালিচড়ার মিঞাটাড়ী), নালটু মিয়া, মহসেন উদ্দীন মিয়া, মোজাফ্ফর

হোসেন চৌধুরী, কাঁটাবাড়ীর ফছিহউদ্দীন সরদার, গোপালপুরের শশী গাঙ্গুলী, নরেন চক্রবর্তী—এ সব কথা নানা প্রসঙ্গে উঠত, বিশেষ করে ফুলচৌকীতে কিম্বা ফুলচৌকীর রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়া-আসার পর এসব কথা উঠত এবং সকলে আফসোসে হায় হায় করত। কি ছিল, এখন কি হয়েছে। অনেকে উত্তেজিত হয়ে ইংরাজের চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করত। উক্ত বৃদ্ধদের এবং আরও অনেক মুসলমান, হিন্দু বৃদ্ধদের নিকট শুনেছি। ৫/১০ বছর পর কোন কথা প্রসঙ্গে এ সব কথা উঠত। বিশ্বাসী লোক হলে নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। অপর লোক এলে সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ করতেন। ফুলচৌকীতে নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদের রাজধানী ছিল।

প্রঃ ইনি কি স্থানীয় লোক ছিলেন ?

উঃ না। সবাই বলেছেন দিল্লীর মোঘল রাজবংকের লোক ছিলেন। তিনি বাদশাহ শাহ আলমের চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন। ইনি ইংরাজদেরকে বহুবার যুদ্ধে ঘায়েল করেছেন। ফুলচৌকীতে তাঁর রাজধানী ছিল। তাঁর দুই পুত্র কামালউদ্দীন মোহাম্মদ ও জামালউদ্দীন মোহাম্মদ। দুই কন্যা—লালবিবি ও চাঁদবিবি। কামালউদ্দীন মোহাম্মদ তংকার মিঞাদের বাড়ীতে বিবাহ করেছিলেন। সুবাদারের নানার বাড়ী তংক ছিল। জামালউদ্দীন মোহাম্মদ দিল্লীতে নিজেদের বংশীয়দের মধ্যে বিবাহ করেন। লালবিবির বিবাহ হয় বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের সহিত। চাঁদবিবির বিবাহ হয় সুবাদারের ছোট ভাই শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র ওয়ালীদাদ মোহাম্মদের সহিত।

প্রঃ সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ-এর কি ভাবে মৃত্যু হয় ?

উঃ চরের সাহায্যে ধূর্ত ইংরাজরা মিথ্যা সংবাদ দিয়ে নবাবকে মোঘল কুঠি হতে বাইরে নিয়ে আসেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করে ফিরিঙ্গিরা নবাবকে আহত করেন। নবাবের লোকেরা মোঘলকুঠি হতে ফুলচৌকী রাজধানীতে নিয়ে যায়। সেখানে কয়েকদিনের মধ্যে নবাবের মৃত্যু হয়। ফুলচৌকীতে নবাবের কবর রয়েছে। ইং ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে কামালউদ্দীন মোহাম্মদ, তৎপুত্র নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ এবং নবাবের ছোট ভাই শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদের পুত্র ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ। এঁরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে দিল্লী এবং ঐ সব পশ্চিম অঞ্চলে তুমুল বেগে যুদ্ধ

করেছেন। ওয়ালীদাদ গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদকে ইংরাজরা বহু নির্যাতনের মধ্য দিয়ে মেরে ফেলেন। জামালউদ্দীন মোহাম্মদ-এর একমাত্র পুত্র খেজেরউদ্দীন মোহাম্মদকেও ইংরাজরা দিল্লীতে গুলী করে মারে। ঐ স্থানে তার শ্বশুর বাড়ী ছিল। শুনেছি নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

প্রঃ এ'রা তো ইংরাজদের অধীনতামূলক মিত্র হয়ে পড়েছিলেন। তবে বিবাদটা বাঁধলো কি নিয়ে ?

উঃ বাদশাহ বাহাদুর শাহের মাতা হলেন মহামান্যা বেগম লালবিবি সাহেবা। এনাকে মীরগঞ্জের ইংরাজরা গুলী করে মারায় তাঁর ছোট ভাই কামালউদ্দীন মোহাম্মদ এবং ভাতিজারা সকলে ক্ষেপে যান ফিরিঙ্গিদের উপরে। এর পরেই হয় বিদ্রোহের সূচনা। সিপাহী বিদ্রোহের যা কিছু ক্ষয়-খরচা তার শতকরা ৭৫/৮০ ভাগ এ'রা বহন করেছিলেন। শুনেছি এ'দের মত ধনী মোঘল বংশীয়দের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। প্রজাদের মধ্যেও ছিল না। এখনকার মত পূর্বে অস্ত্র আইনের কড়াকড়ি ছিল না। তাই এ'রা নিজে যুদ্ধ শিখেন ও অপর লোকদিগকেও যুদ্ধ শিখান। তারপর সমস্ত দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এদের সবকিছু ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করে নেয়। লালবিবিকে মারার ষড়যন্ত্রে চরগিরি করেছিল পায়রাবন্দের টাটি শেখ, ভাংনির খয়রুদ্দীন ও নাবালক সাহেব।

প্রঃ নাবালক সাহেব কে ছিলেন ?

উঃ খয়রুদ্দীনের ভাতিজা, ইংরাজ গুপ্তচরের কাছে টাটি শেখ ও নাবালক সাহেব যেতেন। টাটি শেখ বলতেন "হুজুর! এ নাবালক সাহেব, এ কিছু বলতে পারবে না। আমি বলব।" সেই হতে সবাই খয়রুদ্দীনের ভাতিজাকে ঠাট্টা করে নাবালক সাহেব বলতো। গুরুবাবু লাহিড়ীর বংশের পূর্বপুরুষও চরগিরি করেছিলেন। লালবিবিকে মারার ষড়যন্ত্রে চরগিরি করে পায়রাবন্দ, ভাংনি ও লাহিড়ী বাবুরা বিপুল জমিদারী ও নিষ্কর সম্পত্তি ইংরাজদের নিকট হতে পায়।

প্রঃ আপনি কখনও কলকাতা গিয়েছেন ?

উঃ হাঁ, অনেক বার গিয়েছি।

প্রঃ বাংলার বিভিন্ন জমিদারদের বাড়ী গিয়েছিলেন কি ?

উঃ হাঁ, কোন কোন জমিদারের বাড়ীতে গিয়েছি।

প্রঃ ফুলচোকীর মূল প্রাসাদটি দেখেছেন কি ?

উঃ হাঁ, বহুবার দেখেছি।

প্রঃ এর মধ্যে কোন্‌টি সুন্দর প্রাসাদ আপনি মনে করেন ?

উঃ ফুলচোকী প্রাসাদের সঙ্গে কোন রাজবাড়ীর তুলনাই হয় না। হতে পারে না।

কথায় বলে ঃ

কিসে আর কিসে
ধনে আর তুষে !

ফুলচোকীর মোঘল রাজবংশীয়দের প্রাসাদ দুইবার লুণ্ঠিত হয়, ডিমলা জমিদার, পায়রাবন্দের জমিদার, ভাংনির জমিদার, মুর্শিদাবাদের জমিদার, আজিমগঞ্জের জমিদার, ধনপৎসিংহ দুগড়, লছমিপৎ সিংহ দুগড়—এরা ইংরাজদের সহিত লুটে নিজেদের লোকলস্কর সহ ছিলেন। বহু মূল্যবান আসবাবপত্র, গহনা, সোনা-রূপার থালা-বাসন এবং নানা ধরনের মণি-মুক্তা খচিত কাপড় লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজরা মূল্যবান জিনিসগুলি নেয় এবং ইহাদের সংগীরা কম মূল্যের জিনিসপত্র সব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। কলিকাতা ও মুর্শিদাবাদের আরও অনেক লোক লুণ্ঠনের সাথে ছিল।

প্রঃ সুরেন্দ্রবাবু রংপুরের ইতিহাস যে লিখেছিলেন সে কথা আপনি জানেন কি ?

উঃ হাঁ, জানি।

প্রঃ কি পর্যন্ত লিখেছিলেন ?

উঃ একেবারে শেষ করেছিলাম।

প্রঃ ছাপলেন না কেন ?

উঃ গভর্নমেন্ট কড়াকড়িভাবে নিষেধ করেছিলেন।

প্রঃ কেন নিষেধ করেছিলেন ?

উঃ সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে সরকারের আপত্তি ছিল না। তবে নূর-উদ্দীন মোহাম্মদ বাকের জঙ্গ হতে সিপাহী যুদ্ধ পর্যন্ত বিষয়গুলি লিখতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, লাট বাহাদুর আরও কেউ কেউ কড়াভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তাই বাবু ঐ বই ছাপাতে পারেন নি।

প্রঃ তা হলে পাণ্ডুলিপিখানি আছে ?

উঃ না, তাও নেই, সব শেষ করে দিয়েছেন বাবু মনের দুঃখে।

প্রঃ পাণ্ডুলিপিখানি গোপনে রাখলে তো পারতেন ?

উঃ না, তা পারতেন না।

প্রঃ কেন পারতেন না ?

উঃ জ্ঞাতি বিরোধ, শরিকী বিরোধ, বিশেষ করে বড় লোকদের বিরোধ —এ বড় ভয়ংকর। শরিকদের সাথে বাবুর কোন কোন বিষয়ে মনোমালিন্য ছিল। বাবুকে তারা হিংসা করতো ভীষণভাবে। তাই তাঁকে যে কোন সময় অপদস্থ করত যদি তারা কোন রকমে জানতে পারতো। তাই বাবু বইখানি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করেছেন।

প্রঃ কিভাবে নষ্ট করেছেন, তা কি জানেন ?

উঃ একদিন বাবু বললেন, "শুনেছ আজিজ! ফুলচৌকীর ঘটনা ইতিহাসে লেখা যাবে না। যদি তাই হয়, তবে ইতিহাস লিখে কি হবে ?" বাবুর মুখ এ সময় খুবই মলিন ছিল। এ সময় বাবু আর আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এর পর হতে আর আমি কোন দিন বাবুর মুখে এ সব কথা শুনিনি।

এ থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী কি কারণে ইতিহাসখানি লিখেও প্রকাশ করতে পারলেন না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'-এর পঞ্চম খণ্ডের মুখবন্ধে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী শীর্ষক আলোচনায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখেছেন ঃ

> তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্তৃক ও তাঁহার পরিচিত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ কর্তৃক তাঁহার মনের আবেগ সংযত করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। দরিদ্র বাঙালী গ্রন্থজীবী গৃহস্থের পক্ষে ইহা সামান্য কথা নহে।

রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের সিপাহী যুদ্ধের পঞ্চম খণ্ডের 'বিজ্ঞাপন' (১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ সাল)-এ তিনি নিজে কি বলেছেন তাই দেখুন ঃ

> বিপত্তিময়, পিচ্ছিল পথে আমাকে অনেক স্থলে স্খলিত পদ হইতে হইয়াছে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়; তিনি শুধু যে একজন অসাধারণ লেখক এবং চিন্তাশীলই ছিলেন তাহা নহে। তিনি জাতীয়তাবাদের আধার স্বরূপ ছিলেন। ইংরাজদের মত জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি

আমাদের জন্য মহা ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন। নিজের জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তিনি নিজে যা বলেছেন তা অনুধাবন করার মত ঃ

> ইংরাজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহিত উপাদানের প্রয়োগ কালে, আমিও সেইরূপ আমাদের জাতীয় ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি।

যদি রজনীকান্ত মহাশয়কে উপদেশের ছলে নিষেধ করা হয়ে থাকতে পারে, তবে সুরেন্দ্র বাবুকে নিষেধ করবেন এবং সে নিষেধ যে আরও কঠোর হবে এতে আর আশ্চর্যের কি থাকতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যক ও গবেষক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এককালীন সম্পাদক শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলেছেন যে, "তিনি (রজনী বাবু) দেশের লোকের কোন সাহায্য পান নাই।" ইহা যেমন সত্য তদ্রূপ এও সত্য যে, কোন কোন সাহিত্যিক ঝাড় জঙ্গলের ধুলায় ঢেকে পড়ে থাকা জাতির জাতীয় পতাকাকে আবার উর্ধ্বে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে ব্যক্তিগত চেষ্টা সফলতা লাভ করতে পারে নাই স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির মুকাবিলায়। তাই দেশের রাজনৈতিক দলের ভূমিকাই এখানে সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল।

এদিক দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা একবারে নিষ্ক্রিয় ছিল। হয়ত তাঁদের চিন্তার দৈন্য ও ক্লিষ্টতা (অস্পষ্টতা), আর না হয়তো বিদেশী শাসকদের মুখের দিকে চেয়ে কথা বলা, এই তাঁরা করে এসেছেন। জাতীয় ক্ষতির দিকটা বিরাট শূন্যতা নিয়ে মরুভূমি সৃষ্টি করে রয়েছে। ১৯২১-২৩ সালের দিকে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছাপা 'সন্ন্যাসী এন্ড ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল' নামক পুস্তকখানি ছাপানোর রহস্য এখানেই ধরা পড়েছে।

সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং কেশবলাল বসু বিকৃত ইতিহাস প্রকাশ না করে সুচিন্তিত কাজই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিকৃত 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস (জাতির জাতীয়তাকে কিভাবে পদে পদে বাধা দিয়ে আসছে তাহা না বললেও চলে) জাতির ক্ষতির আকর যে হয়ে রয়েছে, তা না বললেও চলে।

দশম পরিচ্ছেদ

দলীল

[বাংলা সন ১২৬৪-১২৬৬-১২৬৭ সাল]

ইংরাজের লেখা ইতিহাসে দেখা যায় যে, রংপুরে ১৮৫৭-৫৯-এর মধ্যে কোন বিদ্রোহ হয় নি। পূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে, রংপুরের কালেকটর বাহাদুর রংপুর হতে পালিয়ে এসে কুণ্ডির জমিদারদের এক শরিকের বাড়ীতে লুকিয়েছিল। রংপুরে বিরোধী পক্ষীয় যে তৎকালীন ক্ষমতাসীন গভর্নমেন্ট থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল, জেলার প্রধান শাসক জেলা কালেকটর বাহাদুরের শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় তা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা মনে করি যে, কামালউদ্দীন মোহাম্মদকে রঙমহলে হত্যা করার পর রংপুরে নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, গৌউসউদ্দীন মোহাম্মদ প্রমুখ কোন বিপ্লবী নায়ক সাময়িকভাবে রংপুর জেলা সদর আক্রমণ এবং হস্তগত করেছিলেন বলে কালেকটর বাহাদুর পালিয়ে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচান। এখানে আরও একটি ধারাল প্রমাণ আমরা দেবার চেষ্টা করব। বাংলা সন ১২৬৪ সাল হতে ১২৬৭ সাল অবধি যুদ্ধকালীন রংপুরের সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঘোড়াঘাট নামক স্থানে। রংপুর হতে ঘোড়াঘাটের দূরত্ব অনুমান ৪০/৪৫ মাইলের কম হবে না। পূর্বে মোগল আমলে ঘোড়াঘাট জেলা শাসনের প্রধান দপ্তর ছিল। তখন বলা হত 'সরকার ঘোড়াঘাট'। এসব কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। রংপুরের অনেক প্রাচীন লোক বলেছিলেন যে, যুদ্ধের সময় রংপুর হতে সদর দপ্তর ঘোড়াঘাটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুপ্রাচীন বৃদ্ধদের কথা সম্পূর্ণ সত্য মনে করলেও আমরা ভেবেছিলাম পূর্বের রংপুর সরিয়ে নিয়ে আসে ইংরাজ সরকার রঙমহলে অথচ পূর্বের রংপুর নামটি অক্ষত রাখা হয়। তদ্রূপ ভাবা হয়েছিল যে, ঘোড়াঘাটে রংপুর সদর দপ্তর সরিয়ে নিয়ে গেলেও রেজিস্ট্রি দলীল-পত্রে রংপুরই হয়ত লেখা হয়েছে। কিন্তু আনরেজিস্ট্রি দলীল-পত্র যে হতে পারে এবং ঐ সময়ে এর আধিক্যই সম্ভবত বেশী ছিল কারণ ঐ সময়ে মানুষ এতটা ছল-চাতুরী করা এবং মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত ছিল না। যা হোক, পরে আমরা সামান্য মাত্র অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত দলীলগুলি পেয়েছি। এই প্রবন্ধ লিখবার একেবারে

শেষের দিকে রংপুর জেলাস্থ বদরগঞ্জ থানাধীন হাজীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী রায়ের বাড়ী হতে তিনখানি দলীল আমরা পাই। উহা বিনোদ বাবুর পূর্ব পুরুষদের দলীল। দলীলগুলি রেজিস্ট্রি করা নয়। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সিলমোহরাঙ্কিত দলীল তিনখানি।' বাংলা সন ১২৬৪ সাল, সন ১২৬৬ সাল, সন ১২৬৭ সাল। উক্ত সনের দলীলগুলিতে লেখা রয়েছে 'সরকার ঘোড়াঘাট'। দলীলগুলির অবিকল নকল এখানে দেওয়া হল ঃ

৺শ্রী শ্রী এলাহী

মহামহিম 'শ্রীযুক্ত পতিরাম তাতি বরাবরেষু—

শ্রী নেওয়াজ সরকার
শ্রী সেদো সরকার
সাং হাজীপুর

লিখিতং শ্রী নেওাজ মামুদ সরকার ও শ্রী সেদা সরকার জমীজমা বন্ধক পত্রমিদং সন ১২৬৪ সাল লিখনং কায্যাঞ্চা আগে (কার্যাঞ্চাগে) মৌজা দঃ হাজপুর (দক্ষিণ হাজীপুর) পরগনে লালবাড়ী জাএগীর তরফ খাগরাবন্ধ হিস্যা ।।০ আট আনা সরকার ঘোড়াঘাট মৌজেহ মজকুরের আমার জোত মধ্যে ধানী রোপা ১ দাগ ঠগরাতেলীর জমি ......[১] মোত্তাজী ১ এক ... ... কাত জমা কমপানী ১৲ এক টাকা জমা তোমার নিকট বন্ধক রাখিয়া মবলগে কোম্পানী সিকা ১১৲ এগার টাকা জমা বন্ধক রাখিয়া করজ লইলাম। ইহার মেএদই (মেয়াদ ইস্তক) সন ১২৬৪ সাল না ঃ (নাগাইত) সন ১২৬৭ সাল মেদীতে ৩ তিন সনা মেএদ বন্ধক রাখিলাম উপরে লিখিত তপশীলমত সন ২ আমার নামে খাজানা দীয়া রশীদ...লইয়া জমী আবাদ ভোগ করিতে

---

১. ডট দেওয়া স্থানে আমাদের পক্ষে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই।

থাকিবা। মেএদ আখিরিতে ওপরোক্ত (উপরোক্ত টাকা) দীয়া আপন জমি খালাষ লইব। মেএদ অন্তে উক্ত টাকা দিতে না পারি তবে এহি…… জমিদার সরকারে দঃ দে (দাখিল) করি আপন নামে পাট্টা করিআ (করিয়া) লইবেন। যা উক্ত টাকা পোন্ বাহাতে ক্ষমিয়া পাইব। তোমার টাকা সুদ মুনাফা নাই, আমার জমীর

এতদার্থে জমীজমা বন্ধক পত্র … … … … …
… … … … ইতি তারিখ ২২শে পোষ

ইসাদি শ্রী কালা প্রামাণিক শ্রীবাবু রাম প্রামাণিক
শ্রী……প্রামাণিক সাং তথা
সাং হাজিপুর সাং তথা
শ্রী বাহারুল্যা শ্রী কান্তনাগ
সাং তথা সাং হাজীপুর

/৭ শ্রী শ্রী এলাহী

মহা মহিম শ্রীযুক্ত পালানু তাতী স্থানে।

লিখিতং শ্রী পতুমিদ্ধ ও শ্রী বাহার উল্ল্যা মণ্ডল জমিজমা বন্ধক পত্র মিদং সন ১২৬৬ সাল লিখনং কাজ্যান আগে মৌজে দক্ষিণ হাজিপুর পরগনে লালবাড়ী জাএগীর হিস্যা ।।৹ আট আনা তরপ খাগড়াবন্ধ সরকার ঘোড়াঘাট মৌজা মজকুরের আমার জোত মধ্যে ১ দাগে শ্রী নেহাল প্রামাণিকের জমি পেপচীম (পশ্চিম) উঃ টগরা তেলীর জমিনের × শ্রী খোলা মণ্ডল জমির পার্শ্বে শ্রী কালা প্রামাণিকের জমির × জমিতে × ১।০ মোত্তাজী পচীষ কাঠা জমী কাত জমা কমপনী ১্ এক টাকা জমা তোমার নিকট বন্ধক রাখিয়া যে মবলগে কুমপনী ১৪্ চন্দ টাকা বন্ধক রাখলাম ইহার মেএদ-ই (ইস্তক) সন ১২৬৬ সাল নাঃ নাগাইত সন ১২৬৮ সাল মন্দত তেমনা মেয়াদে বন্ধক রাকলাম। তুমি সন সন আমার নামে জমীদার সরকারের সাল গুজারী দিয়া জমি ভোগ করতো মেয়দ্ আখেরীতে তোমার ওক্ত (উক্ত) টাকা ওপোষ

(ওয়াপোষ) দীয়া আপন জমি ওপোষ (ওয়াপোষ) লইব। মেয়াদ আখিতে (আখেরিতে) তোমার টাকা দিতে না পারি এহি তমিক (তমসুক) জমিদারের নিকট দরষে করিয়া আপন নামে পাট্টা করিয়া লইবেন। আমার এই টাকা পোন বাহাতে ক্ষমিয়া পাইব। তোমার টাকা সুদ নাই (শোধ) আমার জমির × কাগজাদী জমির সরহদ্দ সীমানা বহাল রাখিয়া এতোদয় (এতদার্থে) এই জমিজমা বন্ধক পত্র (লেখিয়া) দিলাম ··· ··· ২৮ কার্ত্তিক—

ইসাদি
শ্রী পতিরাম গতি
সাং হাজীপুর
শ্রী বাবু প্রামাণিক
সাং তথা

শ্রী কালা প্রামাণিক
সাং তথা

শ্রী আফতাব মন্ডল
সাং তথা

অপর পৃষ্ঠায় ছিল

১৫ নং ৶০
সন ১৮৬০ সাল ইং তাং ৭ই মার্চ মোঃ সন ১২৬৬ সন
তাং—২১ ফাল্গুন
খঃ (খরিদ্দার) শ্রীধন মোহাম্মদ সাং দঃ হাজীপুর পরগনা লালবাড়ী
সীমানা ×
শ্রীজরিদ মোহাম্মদ ×

এই দলিলের টাকা উক্ত জমা পোনবাহা অষুষে (আপুষে) ক্ষমিয়া পাও (পাওয়া) গেল। সন ১২৬৯ সাল তাং ২৬ চৈত্র।

/৭ শ্রী শ্রী ×

মহামহিম শ্রীযুক্ত পতিরাম তাতি বরাবরেষু ঃ

লিখিতং শ্রী শিশুদাস

দত্তাদী
শ্রী শিশু দাস
সাং দঃ হাজিপুর
পং লাল বাড়ী

লিখিতং শ্রী শিশুদাস

জমিজমার খোষ বিক্রী পত্র মিদং সন ১২৬৭ সাল লিখন কার্য্যাঞ্চাগে মৌজা দঃ হাজীপুর পরগনে লালবাড়ী সরকার ঘোড়াঘাট মৌজে মজকুরের মধ্যে আমার নিজ জমা আছে তাহার মধ্যে ১ দাগে রোপা ক্ষাপরক্ষিতের ডাঙ্গার তখত তিন কটুর কাত (যটুর কাত) ।৪ কাঠা ২ দাগে গন্দল পাইকের জমীর (৩ম্ব) মাগা নাপীতের জমীর তদ এলাকা এক যটুর কাত জমি।. একুনে মত্তাজী ॥৪ চৌদ্দ কাঠা জমির কাত জমা কম্পানী ৸৵ চৌদ্দ আনা জমির ঙোত আপন (শই স্তাত্রে) আপনার নিকট গবলগে কোম্পানী ২০৲ কুড়ী টাকা নগদ লইয়া বিক্রী করিলাম, আপনে আপনি জমিদারী সেরাস্তাএ (সেরেস্তায়) সন ১২৬৮ সাল হইতে আমার নাম খারিজ করিয়া লইবা আপন নামে পাট্টা করিয়া লইয়া জমিজমা ভোগ করিতে থাকিবা ঐ জোত জমা × আসে কীমবা (কিম্বা) আমার ওরিশান (ওয়ারীশান) কেহ কোন কালে মওাহক (মুস্তাহক) পএদী হএ (হয়) তাহা না মঞ্জুর এতদর্থে জমী জমার খোস কবালা বিক্রী পত্র দীলাম তাং ২১ ফাল্‌গুন—

ইসাদি

শ্রী গরিবুল্যা মণ্ডল
সাং পুঃ হাজীপুর
পং লালবাড়ী

শ্রী সাহা প্রামাণিক
সাং দঃ হাজীপুর
প. লালবাড়ী

শ্রী প্রসী দোকন
সাং কিঃ হাজিপুর

তৎকালীন বৃটিশ-শাসন বিরোধী বিপ্লবী শক্তি ক্ষমতাশালী না হয়ে রংপুর হতে সদর দপ্তর ঘোড়াঘাটে সরিয়ে নেওয়ার কারণ কি? আমরা কিন্তু মিথ্যা প্রচারণাপূর্ণ বিদেশী সরকারের বিদেশী লেখক দ্বারা লিখিত ইতিহাসের উপর আর কণামাত্র বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। অবশ্য আমরা পূর্বেও আমাদের আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ইংরাজ লেখকদের লেখা ইতিহাসগুলি পড়ে, তাহা বিশেষ বিশ্বাস করতে পারি নি। কেন পারি নি, তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এখন অবগত হতে পারছেন বলে মনে করি। রংপুরে কখনই উচ্চ শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির অভাব হয়নি। অথচ অনেক উৎসাহী অবস্থাপন্ন গবেষক শুধু চেষ্টা করে নয়, ইতিহাস লিখেও তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে পারেন নি। কেন, কি কারণে পারেন নি—তা এখন আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি বলে আশা করি। ইংরাজদের লেখার মধ্যে যে মিথ্যা রয়েছে এবং জ্ঞাতসারে ইংরাজ লেখকরা যে সব বানানো মিথ্যার অবতারণা করেছে তা রংপুরের ইতিহাস বের হলে তা সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়বে। এতে ইংরাজ গভর্নমেন্টের মান-সম্মান কিছুই থাকবে না। ইংরাজরা বহু চেষ্টা করে যে বিষয়গুলি গোপন করে গেছে, তাও আবার প্রকাশ হয়ে পড়বে। এর জন্য শত চেষ্টা এবং একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রংপুরবাসীর পক্ষে রংপুরের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গড়ত্রয়

সত্য আজও যে মানুষের মুখে মুখে আছে এবং লুকিয়ে আছে, নানা গড় কুঠি, মাজার মকবেরা মসজিদ, মন্দির, ঝাড় জঙ্গলে ঢাকা স্মৃতির সমাধিতে তা গবেষক ইন্দ্রজিতের লেখা হতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দূরদর্শিনী নাটোরের মহারানী ভবানীর বংশধর ইন্দ্রজিত ছদ্মনাম দিয়ে ভারত সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশে তার কিছু তথ্য উদঘাটন করেছেন। ইন্দ্রজিত তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

> অনেক ইতিহাসই আজও লৌকিক সত্যের আবরণে লুকিয়ে আছে। বাংলার স্বাধীনতা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গুলীর ভয়ে সেই যে অনেক সত্য আত্মগোপন করেছে, সেগুলোকে সংগ্রহ করা দরকার। এ তথ্য আজও আছে মানুষের মুখে মুখে, আছে সংস্কারের আবরণে আবৃত (পূর্ব্বাশা আষাঢ় ১৩৬০)

ইন্দ্রজিৎ ইংরাজদের চাতুর্য ধরতে পেরেছেন। কারণ রানী ভবানীর বংশধর ইন্দ্রজিৎ।

রানী ভবানী সম্বন্ধে এবং তার বৃহৎ জমিদারী ইংরাজের কৌশলে হস্তগত করা সম্বন্ধে যে সত্য ইংরাজরা ইতিহাসে উল্লেখ করতে চায়নি, ইন্দ্রজিত তার কিছু প্রকাশ করেছেন।

> প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য, মানুষের মুখে মুখে ও ছড়ায় এবং গানে বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো আছে, বনবাদাড়ের মধ্যে বা তা অনন্তকালের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যারা এসব নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরাই তা স্বীকার করবেন।

বামনগড়, রানীগড়, সাতগড়

এখন আমরা 'বামনগড়' (ব্রাহ্মণগড়)-এর আশেপাশের কতকগুলি গ্রামের নাম দিব। উক্ত বামনগড়-এর প্রধান হলেন ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা ভবানী পাঠক। ইনি সম্রাট পক্ষীয় নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর একজন বিশিষ্ট বন্ধু ও সেনাপতি ছিলেন। বামনগড়ের মধ্যে ঘন

বসতিপূর্ণ গ্রাম বসানো হয়েছে। গড়ের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য সুচতুর ইংরাজ-রাজ এই ব্যবস্থা নিয়েছে। গড় এখন না থাকলেও উক্ত স্থানের নাম স্থানীয় ও চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা অদ্যাবধি 'বামনগড়ই' বলে আসছেন। বামনগড় হতে দেড় মাইল দক্ষিণে ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে রাজবাড়ী। এখানে রাজা ভবানী পাঠকের প্রাসাদ ছিল। প্রজাদের সকল চিহ্ন উৎখাত করে ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে সাওতাল বস্তি বসানো হয়েছে। এটাও সুচতুর ইংরাজের আর একটি গর্হিত কাজের লক্ষণ। তবে রাজবাড়ীর কোন চিহ্ন নেই। রাজবাড়ী নামক স্থানটির নাম লোকের মুখে মুখে এখনও 'রাজবাড়ীই' রয়েছে; বললে ঐ উচ্ছন্ন স্থানটি দেখিয়ে দেয়। রাজবাড়ীর উত্তর দিকে ভবানীপুর। স্থানটি ইংরাজ বিরোধী নায়ক ভবানী পাঠকের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। ভবানীপুরের পূর্ব দিকে 'কাজল নদী।' যে স্থানে নবাব ঘাট পার হতেন সেই ঘাটকে লোকে এখনও 'ডাংশাহুর ঘাট' (জঙ্গ শাহুর ঘাট) বলে থাকে। উক্ত ঘাটের ভাটির ঘাটকে বলে 'ধোপ ঘাট' (ধোপার ঘাট)। এসব নাম এখনও প্রচলিত রয়েছে। 'এখানে নবাবগঞ্জ' নামক স্থানে নবাবের হুকুমে একটি গঞ্জ হয়েছিল বলে উক্ত নামকরণ হয়েছে। নবাবগঞ্জে ইংরাজরা একটি থানা বসিয়েছে। নবাবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম 'ব্যাপারীটোলা'। এখানে পূর্বে সওদাগররা তাদের দোকান খুলে বসতেন। রাজবাড়ীর পাশের জঙ্গলের একটি অংশকে বলা হয় 'আমলার কাটাল'। এই জঙ্গল লাগাতে গিয়ে ইংরাজরা কতকগুলি 'আমলা' বা কর্মচারী পাঠিয়েছিল। তারা যেখানে তাঁবু খাটিয়েছিল এই স্থানটির নাম 'আমলার কাটাল' বলে এখনও প্রচলিত রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে রাজবাড়ী হতে কিছু তফাতে একটি স্থানের নাম লোকেরা বলে 'জহনপুর'—আসলে জঙ্গপুর হবে। অবশ্য এখন নামটি আরও পাল্টিয়ে 'জামালপুর' হয়েছে। তবে কাগজপত্রে জহনপুর নামই রয়েছে। রাজবাড়ী হতে জহনপুরের দূরত্ব হল পূর্ব দিকে ১ মাইলের কম। বামনগড় বা ব্রাহ্মণগড়ে ইংরাজরা শুধু তাদের অনুসরণকারী জমিদারদের উপর আস্থা করে না থেকে নিজেদের আমলা বসিয়ে জায়গাগুলিকে নিশ্চিহ্ন এবং চক্ষুর বাইরে রাখবার জন্য ভীষণ জঙ্গলের পত্তন করেছিল। জঙ্গলটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মিলে ৬ ক্রোশ হবে। এই ভীষণ জঙ্গলে বাস করত—নানা জাতীয় ব্যাঘ্র, হরিণ, ময়ূর, মহিষ, বন গাই, অজগর ও অন্যান্য ধরনের বিষাক্ত সাপ, বুনো শূকর প্রভৃতি জীব জন্তু। জঙ্গল এত বেশী হয়ে উঠেছিল যে, সূর্যের

আলোও দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করত না। নানা গাছ, কাঁটাযুক্ত ঝাড় গাছ এবং শাল গাছে একেবারে বাগান লাগানো হয়েছিল। জঙ্গলের পূর্ব উত্তর ও পশ্চিম দিকের পার্শ্ববর্তী লোকবসতিপূর্ণ কয়েকটি গ্রামের নাম। —শাহবাজপুর, ভালকা জয়পুর[1] ইংরাজদের এতদঞ্চলের লোকেরা 'ভল্লুক বলত। জয়পুর, নারায়ণপুর, মির্জাপুর, শাহ আলমপুর—এখানে বাদশাহ শাহ আলমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফকির পাড়া, নয়াপাড়া. খোশলামপুর, তেপুকুরিয়া, এখানে একই সঙ্গে পুরানো তিনটি পুকুর রয়েছে। তেলির ডাঙ্গা, এখানে দালানের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রাম রয়েছে। বামনগড়-এর আশেপাশের গ্রামের নাম এরূপ—রামভদ্রপুর, নারায়ণপুর, নীল কণ্ঠপুর, কামার পাড়া, তপন ঘাট, দাউদপুর প্রভৃতি।

রানীগড়

এখানে আমরা রানী ভবানীর গড়ের কথা বলব। ভবানী পাঠক-এর গড় হতে, উক্ত 'রানী গড়ের' দূরত্ব ৫/৬ ক্রোশ দক্ষিণে হবে।

গড়পাড়া, শ্রীচন্দ্রপুর, শ্রীহরিপুর, শ্রীরামপুর, বিন্নাগাড়ী নারায়ণপুর রানীগড়, রানীগঞ্জ,—এখানে গড়ের সৈন্য-সামন্ত এবং লোকজনে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কিনবার জন্য বাজার বসেছিল। ঋষির ঘাট—করতোয়া নদীর পাশে। জয়পুর, শেরপুর, জামালপুর, চেরাগপুর, হাতীবান্ধা—এখানে যুদ্ধের হাতীগুলি বাঁধা থাকার জন্য উক্ত নামকরণ হয়েছে। রানীগঞ্জ গড়ের পশ্চিমদিকের কতকগুলি গ্রামের নাম এরূপ—কুলানন্দপুর, শ্রীরামপুর, বিন্নাগাড়ী এবং নারায়ণপুর—এ সমস্ত এলাকা রানীগড়ের পশ্চিম উত্তর দিকে অবস্থিত। কড়াইবাড়ী—এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। শ্রীকৃষ্ণপুর, জাফরপুর—এখানে ইংরাজ পক্ষীয় তাঁবেদার নবাব মীরজাফরের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যেখানে জাফর বলেই বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সাধারণ লোকেরা ইংরাজ সমর্থিত নবাবকে কখনও নবাব

---

[1] স্থানীয় লোকেরা ভল্লুক-কে ভালকা বলে থাকে। যেমন কার বা কোন লোকের কম্পন দিয়ে জ্বর আসে এবং পরে পরে সেরে যায়। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় হোরবাহে ভালুকা জ্বর হইছে এই আসে এই সারি যায়। স্ত্রী জাতীয় ভল্লুককে ভালকী বলা হয়। যেমন মেয়েদের গীত রয়েছে ভাল নাচে ভালুকী আচ্ছা নাচে ভালুকী। ভালুক তুই শালুক তুলিয়া দে খাঁও ইত্যাদি।

বলে স্বীকার করে নেয় নি। যা হোক, রানীগড়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ করে রাখা হয়েছিল। জঙ্গলের এখানে সেখানে রঙ-বেরঙের নানা জাতীয় ফুলগাছ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

সাতগড়

এখন আমরা ফুলচৌকী নগরের অর্থাৎ নবাবের রাজধানীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, তিস্তা নদীর পূর্ব পাড়ের উপরের 'সাতগড়' এবং এর আশেপাশের কতকগুলি স্থানের নাম উল্লেখ করব এজন্য যে, নামগুলি লক্ষ্য করলে ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মসিমপুর যুদ্ধ হতে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়কার ইংরাজ বিরোধী সংগ্রাম এবং ১৭৮৩ সালে প্রজা বিদ্রোহ নামক ইংরাজ-কথিত বিদ্রোহের অনেক রহস্য উদঘাটিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ অনেক সময় লোকের নামের সাথে ইতিহাস জড়িত থাকে না, কিন্তু স্থানের নামের সাথে ইতিহাস জড়িত থাকে। এখন আমরা স্থানগুলির নাম এবং তৎসহ কিছুটা পরিচয় দিব—রাজধানীর সর্বদক্ষিণ পূর্বপ্রান্তে হল 'মোঘল কোট' (সেনানিবাস) এবং দানেশ নগর। এখানে কয়েকটি পুকুর এবং পুরানো দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দানেশ নগরের পাশে 'মসিমপুর' গ্রাম অবস্থিত। 'জানপুর' আসলে জঙ্গপুর হবে। 'জানকিপুর' ও জঙ্গ-কা-পুর হবে। 'তরফসাদি' আসলে হবে, 'তরফশাহদিগড়।' বাদশাহ পক্ষীদের তরফ। 'ভগবানপুর' বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে' উল্লেখিত মহেন্দ্র সিংহ এর পিতা ভগবান সিংহ শাহজির (শেঠ) নাম থেকে এই ইংরাজ-বিরোধী নায়কের নামানুযায়ী উক্ত স্থানের নামকরণ হয়েছে। এখানে ঐ আমলের পরিখাযুক্ত মৃত্তিকা নির্মিত একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দুর্গটিকে স্থানীয় লোকেরা 'বুড়ামস্তক' বলে। বুড়াতিস্তা নদীর সহিত উক্ত দুর্গের সংযোগ রয়েছে। 'ছাতীনা'—সম্রাট ও নবাবের মস্ত কোপরে বৃহৎ যে ছাতি ধরা হত, সেই ছাতি যেখানে রাখা হত, সে স্থানের নাম 'ছাতিনা' হয়েছে। 'কাশানা'—যেখানে মোঘল রাজবংশীয়রা থাকতেন এবং সময় সময় আমোদ প্রমোদ করতেন সেই প্রাসাদকে 'কাশানা' বলা হয়। 'দুর্গাপুর,' ইংরাজ-বিরোধী নেতৃ জয়দুর্গাদেবীর নামানুযায়ী দুর্গাপুর হয়েছে। হরিনাথপুর, জয়ানন্দপুর, সম্ভবত যুদ্ধ জয়ের পর এখানে আনন্দ উৎসব করা হয়েছিল। মোনাইল, গোপিনাথ পুর, রামকানোপুর, লক্ষ্মিপুর, খালাসপীর—ইংরাজ-বিরোধী কোন পীরের কেরামতিতে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। এমনি ধরনের

বিশ্বাসের ফলে উক্ত নাম হয়। খালাসপীরে একটি মোঘল আমলীয় মসজিদ রয়েছে। কাজীপাড়া, আন্দার কোটা,—এখানে কাজীর বিচারে দোষী ব্যক্তিদের অন্ধকার ঘরে রাখা হত। জাফর পাড়া,—এখানে মীর্জাফর পক্ষীয়রা 'সাতগড়ের' অনতিদূরে ছাউনী ফেলেছিল। গাজী খাঁ,—ন্যায় যুদ্ধে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'গাজী' বলা হয়। 'খাঁ' অর্থে নেতা বোঝা যায়। রাজারামপুর, জয়পুর, ফতেপুর,—ফতেপুর চাকলা এবং পরগনার জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায়ের তাঁবু ফেলা হয়েছিল জন্য উক্ত নামকরণ হয়েছে। উজীরপুর—ফতেপুর পরগনার জমিদার নবাবের উজীর ছিলেন। শীবপুর —উক্ত ফতেপুরের উজীরের নাম শীবচন্দ্র রায় জন্য 'শিবপুর' হয়েছে। উক্ত স্থানগুলি পাশাপাশিভাবে রয়েছে। বাহাদুরপুর—কোন যুদ্ধজয়ী বাহাদুর সেনাজীর নামানুযায়ী উক্ত স্থানের নাম হয়েছে। পাটগ্রাম, লোহা-রাজার বাড়ী, ধর্ম্মদাশপুর, বড় আলমপুর—এখানে শাহ আলমের নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতারপুর, মোঘলরা 'তাতারের' অধিবাসী জন্য তাঁদের আর এক নাম 'তাতার' তাই উক্ত নামকরণ হয়েছে। বড় আলমপুর, তাতারপুর পাশাপাশি গ্রাম। ঘাসিপুর—এ স্থানে ঘোড়ার ঘাসিদের বাসস্থান ছিল। মহিতের দহ,—আসলে হবে 'মাহুতের দহ'। হাতী এবং মাহুতরা উক্ত স্থানের নদী ঘাটে হাতীগুলিকে গোসল করাতো বলে তার ঐ নামকরণ হয়েছে। সাতগড়,—এখানে পর পর সাতটি 'গড়' বা সেনানিবাস রয়েছে। স্থানীয় নাম 'সাতগড়া' হয়েছে। সাতগড়ার অনতিদূরে অজ্ঞাত পীরের 'গঞ্জ।' স্থানটির নাম 'পীরগঞ্জ।' এখানে সৈন্য অন্যান্য লোকজনদের খরচপত্রের জন্য-'গঞ্জ' বা 'বাজার' করা হয়েছিল। ইংরাজরা এখানে একটি থানা বসিয়েছে। এই থানা বসবার আসল উদ্দেশ্য কি হতে পারে, তা সহজে বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। স্থানগুলি রংপুর জেলাধীন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মসিমপুরের ষাঁড়াশী যুদ্ধ

এখন আমরা ১৭৫৭ সালের জুন মাসের পলাশী যুদ্ধের তিন বছর পর; ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের, মসিমপুর (ব্যাটেল অব মসিমপুর) যুদ্ধ স্থানগুলির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করব।

এই যুদ্ধে মীরজাফর এবং তার ইংরাজ সাহায্যকারীরা চূড়ান্তভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল। অবশ্য ইংরাজ পক্ষীয় নবাব এবং ইংরাজদের এই শোচনীয় পরাজয়কে ঢাকবার জন্য, তারা নানা ভাবে চেষ্টা করে এসেছে। কেননা লোকের মনোবল যাতে ফিরে আসতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কারণ ইংরাজরা সব সময় এ দেশের জনসাধারণকে এই দম্ভপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে বলে এসেছে ঃ

> আমরা পরাজয় কাকে বলে জানি না। সব সময় আমরা জয়ী হয়ে এসেছি। তোমরা কখনও আমাদের বিরুদ্ধে জোট বন্দী হয়ে আসনা, আসলে ধ্বংসই বরণ করে নিতে হবে।

তবে ইংরাজরা যাই বলুক, ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মসিমপুর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়েছিল। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তদানীন্তন বাংলার এই রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়ার জনসাধারণ এবং এর চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্যান্য জেলাগুলির লোকেরা বিপুল সমর্থন এবং যুদ্ধ কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণই এই জয়লাভের মূল কারণ নিহিত ছিল। নিয়মিত সৈন্য ও জনসাধারণ সবাই যুদ্ধে নানারূপভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেনাপতি ও সৈনিকরা একা লড়াই করে এই যুদ্ধে জয় লাভ করতে পারেন নি। রাজধানী এবং এর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলির কিছুটা বর্ণনা ইতিপূর্বে আমরা দিয়েছি। এখন ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধ স্থানগুলির চিহ্নিত নাম এবং যা জেনেছি তার কিছুটা বর্ণনা দিব।

ইংরাজদের ও নবাব মীরজাফর পক্ষীয়দের এই যুদ্ধ ছিল 'ষাঁড়াশী অভিযান।' ষাঁড়াশী অভিযানের কথা এতদিন শুনেছি মাত্র, কিন্তু স্থানগুলি ঘুরে যা দেখলাম তা দেখে এখন বাস্তবরূপে বোঝা গেছে ষাঁড়াশী অভিযান কি

ধরনের হয় বা হতে পারে। শত্রু পক্ষীয়দের ইচ্ছা ছিল সম্রাট এবং সম্রাট পক্ষীয় সুবাদারের নূতন রাজধানী সম্পূর্ণরূপে দখল করা—তাই রাজধানীর উত্তর-পূর্ব কোণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হয়ে একই সঙ্গে দুদিক থেকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করে রাজধানী অধিকার করে নেওয়া। অর্থাৎ ষাঁড়াশীর দুই মাথা চাপা দিলে যে রকম এক হয়ে আসে, ঠিক তদ্রূপ কৌশল করা হয়েছিল। এই ছিল ইংরাজ ও ইংরাজ পক্ষীয় নবাবের সেনানায়কদের ইচ্ছা এবং ঐরূপভাবে মীরজাফর পক্ষীয়রা সৈন্য সমাবেশ করে দুইদিক থেকে অগ্রসর হয়ে শেষে চূড়ান্তরূপে পরাজয় বরণকরে নেয়। 'মোতাখ্‌খারিন' নামক ইতিহাসের রচয়িতা গোলাম হোসেন মীরজাফর পক্ষে ছিলেন। এ সব কথা তিনি তাঁর ইতিহাসেই উল্লেখ করেছেন। তবু তাঁর ইতিহাসে সামান্য মাত্র যা পাওয়া গেছে, তাই আমাদের মূল সম্বল হিসাবে আমরা ধরে নিয়ে, আমাদের অনুসন্ধানের কাজ চালাতে হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এ লড়াই এক গ্রাম ও আর এক গ্রামের দাঙ্গা নয়।

অথবা এক ক্ষুদ্র রাজার সঙ্গে আর এক ক্ষুদ্র রাজার লড়াই নয়। এ হল, একদিকে বৃহৎ এক রাজশক্তি আর একদিকে আর এক বৃহৎ রাজশক্তির লড়াই। সুতরাং লড়াইর ময়দান তেমনি ব্যাপক ও বিরাট স্থান জুড়ে হবে। হয়েছিলও তাই। মোতাখ্‌খারিনকার তাঁর ইতিহাসে উল্লেখ করছেন। 'দেহবা নদী তীরে'। স্থানীয় নাম হল 'দেওডোবা নদী'। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে নদীটি মজে যায়। তবে 'দেওডোবা' নামটি এখনও অক্ষত রয়েছে। মোতাখ্‌খারিনকার লিখেছেন, উক্ত দেওডোবা নদীর তীরে এই সময় রংপুরের ফৌজদার মীর কাসিম দামোদর তীরে সম্রাট সৈন্যের মুকাবিলার জন্য ছাউনি ফেলতে হাযির হলেন। দেওডোবার পার্শ্বে অদ্যাবধি দামোদরপুর গ্রাম রয়েছে। কিন্তু পূর্বে এখানে নদী ছিল কিনা সে খোঁজ আমরা করতে পারি নি। দামোদরপুরের কিছু পশ্চিমে হল বৈকুণ্ঠপুর। যা হোক, জাফরগড় এবং দেওডোবা নদী—এ সবের অনেক চিহ্ন এখনও পরিষ্কার ভাবে রয়েছে। পাটনার ডিপুটি নবাব রামনারায়ণ যুদ্ধের জন্য ছাউনি ফেল্লেন। যে স্থানে ছাউনি ফেলা হয়, ঐ স্থানটির নাম 'জাফরগড়' বা 'জাফরগঞ্জ'। ইংরাজ তাঁবেদার নবাব মীরজাফরের নামানুযায়ী উক্ত জায়গাটির নামকরণ হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, পূর্ব হতে এখন পর্যন্ত উক্ত স্থানটিকে লোকেরা শুধু মাত্র জাফরগঞ্জ বলে আসছেন। তাদের নিজ লস্করের সওদাপাতি করবার জন্য গঞ্জ বা জাফরগঞ্জে বাজার বসানো হয়েছিল, তাই উক্ত নাম

হয়েছে। জাফরগঞ্জের পূর্বদিকের গড়টি উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি ভাবে রয়েছে। জাফরগঞ্জের পূর্ব দিকের গড়টি উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে রয়েছে। যেখানে গড়ের পূর্ব প্রান্ত অবস্থিত ঐ গ্রামটির নাম হল 'কোটমণ্হনা'। এখানে কোট অর্থে সেনানিবাস। হিন্দী মূলক শব্দ হবে। পশ্চিম প্রান্তের যে গড়টি উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি হয়ে রয়েছে, ঐ স্থানের নাম 'দেবীপুর' বলে এখনও পরিচয় বহন করছে। যুদ্ধের সময় দেবী চৌধুরানী বিরোধীদের পক্ষে ঐ স্থানে ছাউনি ফেলেছিলেন। স্থানীয় প্রাচীনরা বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়েও পূর্বে গড় ছিল। কিন্তু লোক বসতি ঘন হওয়ায় ও আবাদযোগ্য জমি করবার তাগিদে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের গড় দুটির চিহ্ন এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ঘাঘট নদীর পশ্চিম পাড়ের কিছু পশ্চিম দিকে হল উত্তর জাফর গড়ের পূর্ব প্রান্ত সীমা। জাফর গড়ের দক্ষিণে 'কোদাল ধোওয়া বিল', আসলে দীঘি হবে।

গড় নির্মাণের সময় কোদাল ধোওয়া হয়েছিল বলে উক্ত নাম এখন অবধি চলে আসছে। কুরশাহ বিলও (কুর্কশাহ্) পূর্বে দীঘি জাতীয় কোন কিছু ছিল। রুইহা বাইশা বিল, চেতরা বিল, ভাংনি বিল—ইত্যাদি নানা প্রকার জলাশয় বিপক্ষীয়দের বাধা দেওয়ার জন্য করা হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ মীরজাফরের বিপক্ষীয়দের দ্বারা দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ করবার সম্ভাবনা বেশী থাকায় উক্ত ব্যবস্থা করা হয়। জাফরগঞ্জ গড় হতে সোজা ২০ মাইল দূরে দক্ষিণে বিদ্রোহীদিগের রাজধানী নগর ফুলচৌকী। কুরশাহ্ বিল নাম থেকে বোঝা যায় সম্রাট পক্ষীয়রা ঐ স্থানগুলি ক্রোক করেছিলেন যুদ্ধ কালে। কোট মণ্হনা বা জাফরগড়ের কয়েক মাইল পশ্চিমে হল 'চুলিয়া' গ্রাম। চুলিয়ার সঙ্গে আর একটি গ্রামের নাম হল 'কুরশা'। আসলে এটিও কুর্কশাহ হবে। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের হুকুমে ঢোল পিটিয়ে ঐ স্থানগুলি ক্রোক করা হয়। তাই উক্ত নামকরণ হয়েছে। চুলিয়া ও কুরশার পার্শ্ববর্তী আর একটি স্থানের নাম 'তারাগঞ্জ'। এখানে একটি মসজিদ ও কতগুলি কবর রয়েছে। মনে হয়, ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী যুদ্ধ সময়ে উক্ত মসজিদ ও কবরগুলির পত্তন হয়েছিল। মীরজাফর পক্ষীয় পাটনার ডিপুটি নবাব রাজা রামনারায়ণ পাটনা হতে সোজা নবনির্মিত কোট মণ্হনা 'জাফরগঞ্জ' এসেছিল বলে মনে হয়। স্থানটি বর্তমান রংপুর শহর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে হবে। জাফরগঞ্জ গড় থেকে ৫/৬ মাইল দক্ষিণে 'সাতগড়'। সাতগড়ের চিহ্নও নেই। এসব মৃত্তিকা

নির্মিত গড় কেটে আবাদযোগ্য জমি করা হয়েছে। এখন স্থানটির অপভ্রংশ নাম হয়েছে 'সাতগাড়া।'

এসব স্থানে রাম নারায়ণ তাঁর সৈন্য নিয়ে অবস্থান করেন দেহবা নদী তীরে (দেওডোবা)। ১৭৬০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর সময়কালে মীরজাফর পক্ষীয় ফৌজদার, মীরজাফরেরই জামাতা মীর কাসিম রংপুরের ফৌজদার ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ফুলচৌকী নগরের উপকণ্ঠে যে স্থানে ছাউনি ফেলেন ঐ স্থানটির নাম হয়েছে কাসিমপুর। এখন অবধি উক্ত নামই রয়েছে। এখানে সৈন্যদের পানি পানের জন্য বিরাট একটা দীঘি খনন করা হয়। দীঘিটিও এখন অবধি রয়েছে। স্থানটি ফুলচৌকী নগরের উত্তর-পূর্ব কোণের এক মাইল দূরে অবস্থিত। মীর কাসিম যে স্থান দিয়ে রাজধানীর উপকণ্ঠে শিবির সন্নিবেশ করেছিল, রাজধানীর কাছে যাওয়ার ঐ পথটিই সব থেকে সহজ ও নিরাপদ ছিল। মীর কাসিমের বিপক্ষে যিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তিনি জয়দুর্গাদেবী চৌধুরানী। তিনি যে স্থানে ছাউনি ফেলে মীর কাসিমের সাথে যুদ্ধ করেন, মীর কাসিমকে তার বাহিনী সহ সামনে দিয়ে রাজা রাম নারায়ণ পেছন দিয়ে মীর কাসিমকে সাহায্য করছিলেন, অমিততেজা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী মীর কাসিমকে লড়াইয়ে পরাস্ত করে পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে যান, এর পরে মীর কাসিম ও রাম নারায়ণের বাহিনীর বিপর্যয় শেষে তাদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। মোগলি-গড়, বামনগড়, রানীগড়ের মুকাবিলা করে ইংরাজরা। রাজা ভবানী পাঠকও অন্যান্যদের যুদ্ধ কৌশলে ইংরাজরা এখানেও পরাস্ত হয়। যে স্থানটিতে পরাস্ত হয় ঐ স্থানটিকে এখন অবধি বলা হয় 'জয়পুর'। যেখানে ইংরাজরা যুদ্ধ শিবির করেছিল, সেই স্থানটিকে বলা হয় 'ভালকা জয়পুর।' আঞ্চলিক ভাষায় ভল্লুককে ভালুক বলা হয়। ভালুকের বিশেষণ ভালকা। তাই ভালুক হতে ভালকা বলা হয়েছে। বিশ্বকোষে নিম্নোক্ত কথাগুলি 'রাম নারায়ণ' লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে, "যুদ্ধের শেষাবস্থায় রাজার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া কাপ্তেন কক্রেন প্রভৃতি কয়েকজন সেনানী নিহত হন।" তাহলে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধে যেমন ইংরাজরা অংশ গ্রহণ করেছিল, তেমনি যুদ্ধে তারা পরাজিত ও তৎসহ ক্যাপটেন কক্রেন সহ কয়েকজন সেনানী নিহত হয়। মনে হয় এই যুদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক ইংরাজ মারা যায়। উত্তর বাংলার লোকরা যেমন ইংরাজদের 'ভালুক' (ভল্লুক) বলতেন, তদ্রূপ পশ্চিম বাংলার

লোকেরা ইংরাজদের 'নীল বাঁদর' বলতেন। গানের নিম্নোক্ত কলিগুলি হতে তা বেশ বোঝা যায়।

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা করলে এবার
ছারে খার।
অসময়ে হরিশ ম'ল লংয়ের হল
কারাগার।
প্রজার এবার প্রাণ বাঁচান ভার।

ছাউনি যেখানে ফেলেছিলেন ঐখানে তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের পানি পান করার জন্য একটি দীঘি খনন করা হয়। দীঘিটি এখন অবধি রয়েছে। রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিম হল 'মোগলিগড়'। মোগলিগড়ের দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হল—রাজা ভবানী পাঠকের গড়, যাকে 'বামনগড়' বলা হয়।

এখন আমরা রানীগড়ের নির্মাতা রানী ভবানী গড়ের কথা কিছুটা বলব। কারণ ইতিপূর্বে উক্ত গড়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। বামনগড়ের ৫/৬ ক্রোশ দক্ষিণে হল 'রানীগড়' 'রানীগঞ্জ'। গড়ওয়ালা রানী আর কেউ নন; সম্রাট ও সম্রাট পক্ষীয় নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর পক্ষীয় মহা-মাননীয়া রানী ভবানী। এসব গড় ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে এখনও কিছুটা অক্ষত অবস্থায় পথিকদের চোখের বাইরে রয়েছে। রানীর বিপুল জমিদারী চলে যাওয়া ও রানীর সর্বনাশকারী দুশমন ইংরাজদের অতিসামান্য মাত্র ভাতায় জীবন চালাবার রহস্য হয়তো ভীষণ জঙ্গলপূর্ণ রানীগড়ের মধ্য ঢাকা পড়ে রয়েছে। এ সব এলাকা পূর্বের তিস্তার পশ্চিম পাড়ের বাঁ দিকে রয়েছে। রানীগড় দিনাজপুর জেলার বর্তমান 'ঘোড়াঘাট' থানার উত্তর সীমানায় অবস্থিত। উক্ত ৯ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধে ইংরাজরা কমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মনে হয়। ইংরাজরা বামনগড়ের পার্শ্বে ছাউনি স্থাপন করেছিল। কারণ তারা মনে করেছিল নবাবের রাজধানীর দক্ষিণ-পশ্চিমের এই গড়ই হল সব থেকে দুর্বল। তাই তারা রানীগড় এবং সাতগড় পাশ কেটে এসে বামনগড়ের পাশে ছাউনি ফেলেছিল।

কিন্তু গড়ের প্রধান রাজা ভবানী পাঠক ও অন্যান্য সেনানায়ক, সৈনিক,—স্বেচ্ছা সৈনিকদের তুমুল বিক্রমশীল যুদ্ধে ইংরাজরা সহজেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তবে মীর কাসিম, রাম নারায়ণ এদের সঙ্গে যুদ্ধটা খুব বড় রকমের হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। মোতাখ্খারিন-এও তাই দেখা

যায়। তবে সম্রাটের সাহায্যকারী সেনাপতি ভ্রাতৃত্রয় কামগড় খাঁ, দিলীর খাঁ, আসালত খাঁর বিক্রম ও সাহস-ও কম ছিল না। যুদ্ধকে জয়ের পথে নিয়ে যেতে সেনাপতি দিলীর খাঁ, সেনাপতি আসালত খাঁ মৃত্যুকে বরণ করে নিয়ে শহীদ হওয়ার গৌরব নিয়েছেন। তাঁদেরকে দেশের শিক্ষিত জনরা ভুলে গেলেও অশিক্ষিত মানুষরা আজ অবধি ভুলে যান নি। সৎচরিত্র মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ শিউভট্ ও বাবুজান—এদেরও অবদান হয়তঃ কম ছিল না। এমনি অজানা বাঙালী-অবাঙালী ত্যাগী বীরদের শৌর্যে ও আত্মত্যাগে এই জয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। বিশ্বকোষে 'রামরায়ণ' প্রসঙ্গ নিয়ে বলা হয়েছে ঃ

> জমিদার পালোয়ান সিংহ বাদশাহ পক্ষে যোগ দেন। রহিম খাঁ ও মুরলীধর কামগড় খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বন্দী হন। যুদ্ধজয়ের পর বাদশাহ হত ব্যক্তিগণের কবর দিবার আদেশ দেন।

যে স্থানে সেনাপতি দিলীর খাঁ ও আসালত খাঁর কবর হয়েছে, ঐ স্থানটিকে ‘আরাজি (অরাজি) ‘দিলালপুর’ বলা হয়। যা হোক, উক্ত শহীদ সেনাপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের কবরের পশ্চিম পাশে বর্তমান শালবনের ভিতরে, আরও অনেক কবর অবাঁধানো অবস্থায় রয়েছে। সে সবের কথা স্থানীয় লোকেরা বলেন এবং কিছু সংখ্যক কবর আমাদের দেখিয়ে দেন। বহু বিস্তৃত এলাকা জুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল, সুতরাং একই জায়গায় সকল নিহত লোকের কবর হয়েছে একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।

মোতাখ্‌খারিনকার লিখেছেন, নয়া সম্রাট আজিমাবাদে প্রবেশ করলেই মুর্শিদাবাদ তাঁর দখলে আস্‌ত। আমরাও একথা সর্বাংশে বিশ্বাস করি। উত্তর বাংলার এই গণবাহিনীর মুকাবিলা তখন করা মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফর ও ইংরাজদের সাধ্য ছিল না। ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন কামগড় খাঁর বাহিনীর শক্তিটাকে বড় মনে করেছিলেন। তিনি তা মনে করতে পারেন, কিন্তু মূল শক্তি হল, জনসাধারণ ও স্বেচ্ছা সৈনিকরা। এসব অঞ্চলের লোক সম্রাট পক্ষে যে সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে উল্লাসের সহিত বিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তা চিরদিন অমলিন হয়ে থাকবে। কামগড় খাঁ সম্রাটকে নিয়ে বিহারের দিকে যদি চলে না যেতেন এবং সম্রাট যদি নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ তাঁর বন্ধু সহকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলার এই সব অঞ্চলে থাকতেন, তবে হয়ত ইংরাজ এবং ইংরাজদের

চালিত নবাবকে পরাস্ত করে সর্বভারতের আযাদী, ইযযত-সম্মান ও ধন-রত্ন রক্ষা হয়ত ঐ সময় সম্ভব হত। সম্রাট পাটনা আক্রমণ করতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে পরাজিত হলেন। তার পর কখনও শুজাউদ্দৌলার হাতে, কখনও ইংরাজদের হাতে আবার কখনও মারাঠার হাতে পড়তে থাকলেন। অবশ্য ইংরাজরা ও তাদের তাবেদারেরা ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখেছেন—তারা 'মারাঠাদের হাত থেকে সম্রাটকে উদ্ধার করলেন।' এ এক আজব কথা। ছাগলকে যেমন বাঘ নিয়ে গিয়ে উদরস্থ করে যদি বলে যে, ছাগলকে রক্ষা করলাম এ-ও ঠিক তেমনি। নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ একা তাঁর বন্ধুদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক গণবাহিনীর সহায়তায় ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ইংরাজ ও তার তাবেদার নবাবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। কখনও সম্মুখ যুদ্ধ, কখনও গেরিলা যুদ্ধ করে। এ কম কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা নয়। বাঙ্গালীরা যে যুদ্ধ জানে, যুদ্ধবিদ্যায় যে তারা পশ্চাদপদ নয়, এ কথা ইংরাজরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির কূট কৌশলের জন্য এ সব কথা তারা ঢেকে রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজধানীর বিবরণ

এখানে সম্রাট কর্তৃক নির্বাচিত ও জনসাধারণ কর্তৃক বরণীয়, সুবা বাংলার 'নবাব' নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর 'রাজধানীর কিছুটা বর্ণনা দিবার প্রয়াস পাব, কিন্তু তৎপূর্বে রাজধানীর চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলির কিছুটা বর্ণনা দিবারও চেষ্টা পাব। অসমাপ্ত নতুন রাজধানীর প্রায় আট দশ মাইল উত্তর দিকে, পূর্ব-পশ্চিম লম্বা। 'ভীমের গড়'[১] বলে খ্যাত একটি গড় আছে। সে যা হোক, বিদ্রোহীরা রাজধানীকে রক্ষা করতে এই গড়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। অবশ্য এই গড়কে কেউ কেউ যেমন বলেন, কৈবত রাজা দিব্বকের ভাতিজা ও সেনাপতি ভীম কর্তৃক নির্মিত তেমনি আবার কুণ্ডির জমিদার বংশীয়দের ইতিহাসে বলা হয়েছে ('ইতিহাস খানির নাম' কুণ্ডি জমিদার বংশ), বাংলার সুলতান ও কুচবিহার রাজ্যের সীমানা ছিল উক্ত গড়। বলা বাহুল্য, উক্ত গড়ের বর্তমান 'ধাপের হাটের' সংলগ্ন স্থানে মৃত্তিকা নির্মিত একটি বৃহৎ উঁচু বুরুজ বা মাটির ঢিবি রয়েছে। শোনা যায়, কুচবিহার এবং মীরজাফর ও এদের মিত্রদের গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য উক্ত রাজ্যের উপরে চড়ে বিদ্রোহীরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। উক্ত রাজ্য হতে আরও কয়েক মাইল পশ্চিমে "পদাগঞ্জ; (বঙ্কিমের পদচিহ্ন) গ্রাম। ঐ গ্রাম সংলগ্ন স্থানগুলিতে বিদ্রোহীদের অস্ত্রের কারখানা ছিল। পদাগঞ্জ বঙ্গাতী পাড়া, লোহাকুচি প্রভৃতি স্থান জুড়ে। মোগল কোটের পার্শ্ববর্তী এলাকাকে এখনও 'লোহাকুচি' বলা হয়ে থাকে। এখানে লোহার ভারী অস্ত্র তৈরী হত। গলিত লোহার বড় বড় স্তূপ এখনও এসব স্থানে এদিকে সেদিকে ছড়ানো রয়েছে।

পদাগঞ্জ হতে পূর্বদিকে চৌদ্দ ভুবন নামক বিল। পূর্বে এটা বিল ছিল বলে আমাদের মনে হয় না এবং প্রাচীনদেরও তাই মত। চৌদ্দ

---

[১] …"এই স্থানটি কোচবিহার রাজ্য ও বাংলা রাজ্যের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত। বাংলা ও কোচ রাজ্য সীমান্তে একটি সুবৃহৎ গড় বিদ্যমান আছে। উক্ত গড় এই সদ্য পুষ্করিণী গ্রামের সীমান্তে অবস্থিত। বর্তমানে ঐ গড় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক Preserved Monument Act অনুসারে সংরক্ষিত হইতেছে।" [কুণ্ডির জমিদার বংশ, পৃঃ ২২।

ভুবন বিলের অনেক জায়গায় এখনও পানির ফোয়ারা রয়েছে। তবে জায়গাটি পূর্ব হতে নীচু ছিল, বিশেষ করে পূর্ব-দক্ষিণ দিক। যা হোক এটা বিশালকায় দীঘি ছিল বলে আমরা বিশ্বাস করি। চৌদ্দ ভুবন দীঘির পশ্চিম পাড় ঘেঁষে বিরাট উঁচু ডাঙ্গা সমতলভূমি। এর একটি বৃহৎ অংশে বিদ্রোহ সময়কালে মালামাল বেচা-কেনার জন্য সুবৃহৎ বাজার গড়া হয়েছিল। এখনও গলিগুলির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এতবড় ছিল যে, লোকে এখনও 'বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলি' বলে থাকেন। এর পশ্চিম-উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে 'নওদা পাড়া' নামে একটি জায়গাকে বলা হয়ে থাকে। চৌদ্দ ভুবন বিল হতে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে একটি খনিত খাল পীরগঞ্জ থানার এলাকাধীন বড়বিল নামক বিলে গিয়ে পড়েছে। যাতে পানি নিষ্কাশন ও নৌকায় করে মালামাল নিয়ে আসা যায়, তারই জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলির স্থানগুলি নানা জাতীয় কাঁটাবনে পূর্ণ হওয়াতে মানুষ ঢুকবার অসাধ্য হয়ে পড়েছিল বলে লোকে ঐ স্থানগুলিকে এখন 'কাঁটাবাড়ী' বলে থাকে। কাঁটাবাড়ীর কিছু দক্ষিণে 'সিরাজ টাকানি' (টাকা আনি)। ঐ স্থান থেকে বিদ্রোহী লোকদের টাকা দেওয়া হত বলে উক্ত নামকরণ হয়েছে। পদাগঞ্জ বা বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' পদচিহ্নের পশ্চিমে 'নন্দিয়ার দীঘি' থেকে একটি খাল খনন করে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে পূর্বের তিস্তা বর্তমান 'যমুনেশ্বরী' নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই খালটির নাম হল 'কাঠগড়া' কাঠগড়া বেড়া, অর্থাৎ সমারোহ কার্যে লোকসমূহের শ্রেণীবিভাগ জন্য স্থানে স্থানে যেরূপে বেড়া দেওয়া হয়। সমারোহ অর্থে এখানে আড়ম্বর, জাঁকজমক, অত্যুন্নতি সম্মত হওয়া, আরোহণ। আমাদের বর্ণিত কাঠগড়ার পার্শ্বে অভিধানিক এই অর্থের মত নবাব, রাজা, উজির আমিরদের পদ গৌরব, পদোন্নতি এবং পদমর্যাদা অনুযায়ী প্রত্যেকের বাসস্থান ও কুঠিবাড়ীগুলি পর পর সাজানো হয়েছিল। এর উত্তর-পূর্ব দিকে 'রাঙ্গাতিপাড়া'। এখানে পূর্বের অস্ত্র নির্মাণকারী বংশীয়রা এখনও রয়েছে। এর উত্তর-পূর্ব দিকে 'লোহারবন্দ'। পদাগঞ্জ (বা পদচিহ্ন) হতে এর দূরত্ব দক্ষিণে ২ মাইল হবে। এখানে যুদ্ধের ভারী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা হত। গলিত লৌহের বিরাট স্তূপ স্থানে স্থানে এখনও পড়ে রয়েছে।

উক্ত লোহার বন্দের কিছু পূর্ব দিকে 'কদমতলা' হাটের চতুর্দিক

ঘিরে শিল রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। কারণ উক্ত স্থানটি ঘনবসতিপূর্ণ ও পূর্বের ইংরাজ গভর্নমেন্ট এবং বর্তমান সরকার এলাকাগুলিকে সংরক্ষিত না করার দরুন প্রাসাদাদির বহু চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছে বলা চলে। তবু দালান ও প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখনও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 'চৌদ্দ সখির পোকর' (পুকুর) শিলরানী তার অন্য তেরজন সখিসহ এই পুকুরে স্নান করতে যেতেন। তাই উক্ত নামকরণ হয়েছে। 'নাউয়ার পুকুর (নাপিতের পুকুর) 'শিল রাজার বাড়ী' লোকেরা এখনও বলে থাকে। কাঠগড়ার উপরে বৃহদাকারে নির্মিত পাকা পুল রয়েছে মূল রাজধানীতে ঢুকবার জন্য। পুলটির নাম 'গোসাইর পুল'। উক্ত গোসাই হল, আমাদের পরিচিত ফুল খাঁ চাকলার জমিদার পাঠক পাড়া গ্রামের রাজা ভবানী পাঠক। কাঠ গোড়ার উক্ত পুলের ২৫/৩০ গজ উত্তর-পূর্ব কোণে হল বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের 'মঠ'। মঠের দক্ষিণ পূর্ব দিকে পুকুর ও পুকুরের পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে নির্মিত প্রাসাদ। এখন প্রাসাদ নেই, মঠটিও নেই কিন্তু এর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। পুকুরটি অক্ষতই আছে। তবে শান বাঁধানো ঘাট এখন ভেঙ্গে গেছে। উক্ত মঠ ও পুকুরের কয়েকশত গজ পূর্বদিকে শিল রাজা দয়াশীলের কুঠি ছিল। কুঠির স্থানগুলি এখন আবাদযোগ্য জমি করা হয়েছে, যার ফলে প্রাসাদাদির চিহ্নমাত্র নেই। তবে স্থানটিকে 'শিল রাজার কুঠি' লোকেরা এখনও বলে থাকে। উক্ত স্থানের ৪/৫ শত গজ পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হয়ে, 'বালাখানা' (উপরের ঘর) অর্থাৎ বালাখানার সুপ্রসিদ্ধ ঝিল রয়েছে। উক্ত ঝিলের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে নবাব বাকের মোহাম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদের কুঠি। শাকেরউদ্দীন মোহাম্মদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ওয়ালীদাদ মোহাম্মদ উক্ত কুঠিতে বাস করতেন। শাহজাদাদের উক্ত কুঠির ৫ শভ গজ মাত্র দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'ইটাকুমারীর' জমিদার এবং নবাবের মন্ত্রী রাজা শিবচন্দ্র রায়ের কুঠি। বালাখানার উক্ত স্থানটিকে এখনও লোকে 'শিবপুর' বলে থাকে। বলা বাহুল্য শিবপুর নামক জনহীন প্রান্তরটির এখনও যেমন লোকের মুখে মুখে রয়েছে, তদ্রূপ কাগজপত্রেও শিবপুর নাম দেখা যায়। নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার কুঠির পার্শ্বে রাজা শিবচন্দ্র রায়ের কুঠি নির্মাণ করান, কাঠগড়ার পাশে। এইজন্য যে নবাব

ইহাকে কনিষ্ঠ ভাই এর মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাই নবাবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কুঠির-এর পাশে প্রিয় মন্ত্রী শিবচন্দ্র রায়ের কুঠিবাড়ীটি ছিল। আমাদের বর্ণিত মঠ এবং কুঠি বা প্রাসাদ ছিল। ঐ স্থানটিকে স্থানীয় লোকেরা কৃষ্ণগর বলে থাকে। বালাখানার ঝিলের পূর্বপাড়ে নবাবের বকশী বা প্রধান সেনাপতি শাহ কাদেরুল্যা ওরফে মুসা শাহর কুঠি ছিল। তাহার এখন কিছুই চিহ্ন নেই। তবে এদের নাম সমন্বিত কুঠির কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। নামগুলি পূর্বের মতই লোকের মুখে মুখে রয়েছে। উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হল, তা রাজধানীর পশ্চিম দিকের।

আর একটি কুঠি আছে সুপ্রসিদ্ধ সরোবরের পশ্চিম পাড়ে। উক্ত দিকের কুঠির নাম হল 'বড় কুঠি'। এখানে নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা কামালউদ্দীন বাস করতেন। উক্ত কুঠির দক্ষিণে 'বামনের কুঠি' অবস্থিত। নবাবের সেনাপতি রাজা ভবানী পাঠক এখানে বাস করতেন। স্থানগুলি 'বড় কুঠি' এবং 'বামনের কুঠি' নামে এখন অবধি অভিহিত হয়ে আসছে। বামনের কুঠির দক্ষিণে 'সন্ন্যাসীর কুঠি'। সন্ন্যাসীদের প্রধান নেতা মহারাজ হনুমান গিরি উক্ত কুঠিতে সময় সময় বাস করতেন। 'মসিমপুর' গ্রামের উত্তর-প্রান্ত ঘেঁষে সরোবরের সর্ব দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে 'পীরগাছা' গ্রামের জমিদার বীরাঙ্গনা 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর কুঠি'। উক্ত কুঠি বাড়ীর স্থানটিকে এখনও স্থানীয় লোকেরা 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর কুঠি' বলে অভিহিত করে থাকেন। উক্ত সরোবরের একেবারে উত্তর পূর্ব পাড়ে ছোট কুঠি। উক্ত ছোট কুঠিতে নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর কনিষ্ঠ পুত্র জামালউদ্দীন মোহাম্মদ বাস করতেন। এখানে পূর্বের দু'টি চৌবাচ্চা এবং অনেক বৃহদাকারের ঝর্ণার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তিলক পাড়া নামীয় গ্রামের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে পূর্বের খনিত একটি নালা এসে আর্টিফিসিয়াল লেকে পড়েছে। আর একটি নালা সন্তোষ পুর গ্রামের মধ্য দিয়ে-উক্ত সরোবরে এসে মিলেছে। পূর্ব-উত্তর পাড়ের কুঠিগুলিকে এখনও লোকেরা 'তালিয়ার খাঁর কুঠি তালিমগঞ্জের কুঠি' বলে থাকেন। কাগজ-পত্রেও তাই দেখা যায়। এখানে একটি ঐ আমলের দীঘি রয়েছে। উক্ত তালিয়ার খাঁ কুঠির দক্ষিণ পার্শ্বে আন্দার কোঠা (কয়েদখানা)। এখন অবধি উক্ত আন্দার কোঠা নাম চালু রয়েছে, এবং উক্ত আন্দার কোঠার দক্ষিণে 'মোগল কোট' সেনানিবাস। এখানে সরোবরের মাঝামাঝি পূর্ব পাড়ে ২।৩ টি দ্বীপ রয়েছে। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী

কুঠির পূর্ব দিকে সরোবরের মাঝামাঝি স্থানে আর একটি দ্বীপ রয়েছে। দ্বীপগুলিতে নানা জাতীয় ফুলের টব সাজানো অবস্থায় ছিল। লোকমুখে শোনা যায় টবগুলি সোনা-রুপা পিতল ও পাথর দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। উক্ত দুই স্থানের কোন কোন জায়গায় লোকবসতি হয়েছে, কিন্তু 'মোগল কোট' ও 'আন্দার কোট' এখনও ঐ স্থানগুলির নাম রয়েছে। আমাদের বর্ণিত কুঠিগুলির চতুষ্পার্শ্ব ও সরোবরের দুই পাড়ে এবং উত্তর দিকে হাজার হাজার ঝর্না ও পানির ফোয়ারা পূর্বে ছিল। ঝর্ণা-ফোয়ারাগুলি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় ছিল। মুহূর্তে পানিতে সব স্থানে ভাসিয়ে দেওয়া যেত। আবার ইচ্ছা করলে পানির মুখগুলি বন্ধ করে চড়া জঙ্গা জমি হয়ে পড়ে থাকত। গরমের সময় ঝর্ণা ফোয়ারার সব মুখ খোলা থাকত। শীতের সময় বন্ধ থাকত। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে সময়েও কিছু কিছু খোলা থাকত।

সর্বশুদ্ধ ৫০।৬০ ফোয়ারার কম হবে না। এখনও অনেক ঝর্ণা ফোয়ারার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ঝর্ণা ফোয়ারাগুলির মুখ হতে এখনও পানি গড়িয়ে পড়ছে। তবে অধিকাংশ স্থানে ধান ক্ষেত ও অন্যান্য চাষাবাদের জমি হয়েছে। উক্ত সুন্দর সরোবরের দক্ষিণ পূর্ব পাড় থেকে কিছু দূরেই 'দানেশনগর' এখানেও অনেক দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ এবং পুকুর দীঘি রয়েছে।

দানেশ কে ছিলেন, তার পরিচয়ই বা কি তা আমরা জানতে পারি নি। সরোবরটির কয়েকটি দ্বার রয়েছে। এটা পূর্বের 'বুড়া' তিস্তা' বর্তমান নাম 'যমুনেশ্বরী' নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। অবশ্য ঠেকেছে অনেক কৌশলে মাটির নীচ দিয়ে। স্থানটির সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বলা সম্ভব নয়। সরোবরের পশ্চিম পাড়ের সীমাকে বলা হয় 'হাশিয়া'। এখানে এখন একটি গ্রাম বসেছে। একটি ইট বিছানো চওড়া পাকা রাস্তা হাশিয়ার পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। অবশ্য রাস্তার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে মাত্র। সরোবরের অর্ধমাইল উত্তর পশ্চিম দিকে নবাবের নির্মীয়মান মসজিদ যে স্থানে ছিল, ঐ স্থানে নবাব তাঁবুতে বাস করতেন। আজিমুদ্দীন মোল্লা ও মজনু মোল্লার তাঁবু, নবাবের অর্ধসমাপ্ত মসজিদ ও তাঁবুর ৮ শত গজ দক্ষিণে ছিল। ঐ স্থানে তাঁদের বংশধররা ঘর দুয়ার করে এখন অবধি বাস করে আসছেন। তবে নবাব আহত হয়ে শহীদ হওয়ার পর নবাব পুত্র শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ পিতার অসমাপ্ত মসজিদের নির্মাণ শেষ করেন এবং মসজিদের উত্তর পাশ ঘেঁষে অপরূপ সৌন্দর্যশালী প্রাসাদ নির্মাণ করেন। বাগদাদ ও দিল্লী থেকে শিল্পী

এনে প্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়। প্রাসাদটির তুলনায় মসজিদটির সৌন্দর্য সামান্য মাত্রও নয়। মসজিদটি এখনও রয়েছে। প্রধান শিল্পীর অধস্তন বংশধররা ফুলচৌকীর পার্শ্ববর্তী ময়েনপুর গ্রামে এখনও বসবাস করছেন। উক্ত বাড়ী নির্মাণ করতে ৩২ বছর সময় লেগেছিল বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। রাজধানীর সমস্ত স্থানটি মিলিয়ে বলা চলে স্বর্গ যেন এখানেই স্থাপিত করা হয়েছিল। বলা যায়, এখন কিছুই নেই। তবুও স্থানগুলি ঘুরে দেখলে অনুভব করতে কষ্ট হয় না, যে এটা সত্যই স্বর্গ ভূমিই এককালে ছিল।

আমি আমার ১১।১৩ বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় বেড়াতে যাই। কলকাতার বিশালতা দেখে আমি অবাক হয়েছি। কিন্তু কলকাতায় কোন বাড়ী দেখে সামান্য মাত্রও দৃকপাত করি নি। ফুলচৌকীর মূল প্রাসাদের যে সৌন্দর্য আমি দেখেছি সামান্য মাত্র, তা আমার মত একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে ব্যাখ্যা করবার সাধ্য নেই। মূল প্রাসাদও চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাগুলির ছবি ও নক্‌শা ১৮৫৭ সালের পূর্বে এবং কয়েক বছর পরেও ইংরেজরা এঁকে নিয়ে যায়। তবে তাঁর ২৫।৩০ বছর পর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু ভাঙ্গা ইটের বড় বড় ঢিবি মাত্র। সরোবরের দুই পাড়ের কুঠি হর্ম্যরাজিগুলির চতুষ্পার্শ্ব ব্যাপিয়া কণ্টক যুক্ত সরু লম্বা হাজার হাজার বেড় বাঁশ। ইংরাজ পক্ষীয় নতুন জমিদার মুর্শিদাবাদস্থ আজিমগঞ্জ নিবাসী ধনপৎসিংহ দুগড় ও লছমিপৎ সিংহ দুগড় লাগিয়েছিল ইংরাজদের পরামর্শে, যাতে করে লোকজন উক্ত স্থানে ঢুকতে না পারে এবং স্মৃতিগুলি ধীরে ধীরে ভুলে যায়। তারই জন্য এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পরে স্থানটির নামই হয়ে পড়ে 'বেড়ুয়ার কাঁটাল' বা জঙ্গল। তৎসহ শালগাছের বীজ ও কাঁটার বীজ লাগানো হয়েছিল, যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে স্থানগুলি ভীষণ এক জঙ্গলে পরিণত হয়। দিনের বেলায়ও সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারত না। জঙ্গলে মনের আনন্দে বাস করত ব্যাঘ্র হরিণ, ময়ূর, বন্য মহিষ বন্য গাই, ছোট বড় নানা জাতীয় বিষধর সর্প প্রভৃতি জীবজন্তু। জমিদারী উচ্ছেদ হওয়ার পর জঙ্গলগুলি এখন একরূপ ধ্বংসমুখী হয়ে পড়েছে। অথচ সরোবরটির গৌরবের সময়কার রূপ দেখে অজ্ঞাত কোন এক পল্লী কবি গেয়েছেন :

ভালোয়া নদীর ধারে ধারে নানান বা জাতী ফুল।
ছাড়িয়া দেরে চ্যাংড়া বন্ধু ঝাড়িয়া বান্ধো চুল।।

সে ফুল আর সৌন্দর্যের কণামাত্র আজ অবশিষ্ট নাই। মূল প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সাজানো স্থানগুলি দেখে প্রেমরত্নের কবি বলেছেন ঃ

কুসুম্ব ভুবন ঠাম ততুল্য কি ইন্দ্র ধাম,
সুর পুর জিনিয়া সুবেশ।
কুসুম্ব কানন বন নানাপুষ্পে সুশোভন,
ভূতলে সাজিছে স্বর্গদেশ।।'
'যত পুষ্প গন্ধধারি চারি পাশে সারি সারি
মনোহর কুসুম্ব কানন।।

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে, 'সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল শিল্প চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

কথাটা সত্য সন্দেহ নেই। তবে মোগল রাজ্য ধ্বংসমুখী হলেও, স্থাপত্য শিল্পীদের নীরব সাধনায় সৌন্দর্যের কমনীয়তাময় চাকচিক্যের আভাস তাঁদের কল্পনায় হয়ত বাঁধা রয়েছিল। মোগলদের শেষ আমলে তারই চরমতম বিকাশ ঘটেছিল ফুলচৌকীতে। ইট, চুন, খয়ের, মোতি বোয়াল মাছ, কুরশা মাছ, লং, এলাচ, নালিগুড়, বালু প্রভৃতি সহযোগে দালানগুলি নির্মিত হয়েছিল। এর সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা করবার সাধ্য বা ক্ষমতা আমার নেই। এর চতুষ্পার্শ্বস্থ বালাখানা, সরোবর, দীঘি, পুকুর, চৌবাচ্চা, নানা ধরনের, নানা রকমের মাঠ, নানা ধরনের ফুলবাগান, ফলের বাগান, ঝর্ণা, ফোয়ারা আতশখানা প্রভৃতি জিনিসের সমন্বয়ে যা গড়ে উঠেছিল, তাকে বাস্তবিকই শুধু স্বর্গের সাথে তুলনা করা যায়।

যা হোক, মূল প্রাসাদের পূর্ব দিকে নীচু মাঠ। এ সবগুলিতে হাজার হাজার ফোয়ারা ছিল। এখন সেগুলি ধানক্ষেতে পরিণত হয়েছে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারও তাই বলেছেন তাঁর 'ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে। পক্ষপাতী সুচতুর হান্টার ফুলচৌকীর নাম উল্লেখ করেন নি, শুধু নগর মাত্র বলেছেন। অবশ্য হান্টার স্থানটির মালিকের নাম উল্লেখ না করলেও তার লেখার বিবরণ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এ ফুলচৌকীস্থ নগরের এবং তার মালিকের বিষয়ে বলা হচ্ছে। হান্টার ১৮৫৭ সালের পূর্বে এবং তার পরবর্তী সময়ে এখানটায় (ফুলচৌকী নগরে) এসেছিলেন। সে সব কথা এখানকার প্রাচীনরা অনেকবার বলেছেন। সে কথা যাক। এর মাঝ দিয়ে চিকন আর একটি নালা কেটে নিয়ে সরোবরে ফেলা হয়েছিল। নালাটি এখনও ক্ষীণ অবস্থায় রয়েছে।

সরোবর ও মূল প্রাসাদের মাঝামাঝি পূর্ব দক্ষিণ কোণে একটি বেশ উঁচু মাঠ। এই মাঠে ঐ সময় একটি বাজার বসানো হয়েছিল। বাজারটির নাম 'কুকিলা জঙ্গি।' এখানে আমির ওমরাহ, শাহজাদা, শাহজাদী ও বেগমরা শুধু সওদা করতেন। সাধারণের জন্য এ বাজারটি খোলা ছিল না। উক্ত কুকিলা জঙ্গি বাজারটির পূর্বদিকে আবার বিস্তৃত উঁচু মাঠ। মাঠের জায়গায় জায়গায় সাজানো অবস্থায় ঝর্ণা ও ফোয়ারাগুলি এবং এর পূর্বদিক দিয়ে বিস্তৃত মাঠে ফুলের বাগান শোভিত ছিল। তার পূর্বদিকে নীচু জমিনে অসংখ্য ফোয়ারা ছিল। এরও পূর্বদিকে আবার বিস্তৃত মাঠ। এ সবস্থানে কয়েক মাইল ব্যাপিয়া ফলের বাগান। এর আরও পূর্বদিকে 'ধোপাকোল' ও 'কচুয়া' নামীয় 'কাটাবিল' রয়েছে। এখানে ধোপারা কাপড় ধৌত করত। তাই 'ধোপাকোল' নাম রয়েছে। এর এক মাইল উত্তর দিকে তৎকার মিঞাদের বাড়ী। এখন বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ মাত্র রয়েছে। দুই এক বছরের মধ্যে হয়তো তাও থাকবে না। লোকে সবকিছু খুড়ে ফেলে দিয়ে আবাদযোগ্য জমি করছে দেখলাম। মূল প্রাসাদের পশ্চিম দিক ঘেঁষে মাঠ এবং অতি চিকন নালা। নালাটি ও এর একটি স্থানকে এখনও অশিক্ষিত লোকেরা বিকৃতভাবে বলে 'ডাংশাহরজান'। আসলে হবে 'জঙ্গশাহ'। উক্ত নালা গিয়ে পড়েছে বালাখানাস্থ নীচের ঝিলে। ঝিল হতে একটি দ্বার দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে পড়েছে কাঠগড়া খালে। কাঠগড়া খাল মিশেছে 'বুড়া তিস্তায়'। এখানেও ঝর্ণার ফোয়ারা ও ফুলবনের সমাবেশ ছিল। মূল প্রাসাদগুলি দুই মহলা তিন মহলা বিশিষ্ট আমি দেখেছি। প্রাসাদের পাকা আঙ্গিনায় স্বর্ণসূত্র নির্মিত জরির কাজ করা চাঁদোয়া দিয়ে আঙ্গিনার উপরিভাগ ঢাকা ছিল। চাঁদোয়া ঐ ভাবে আমি দেখি নি। তবে চাঁদোয়া বাঁধার কড়াগুলি দালানের গাত্রে আমি দেখেছি। মূল প্রাসাদের উত্তর দিকে ছিল 'হাম্মামখানা'। এর পুকুর আমি দেখেছি, নিচটা শান বাঁধানো ছিল। চতুর্দিকে উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। পুকুরের উপরের দিকে বহুমূল্য চাঁদোয়া দিয়ে পুকুরটি ঘেরা ছিল। এ স্থানে বেগম শাহজাদীরা গোসল করতেন এবং সাঁতার কাটতেন। কাঠগড়ার পশ্চিম-দক্ষিণ দিক দিয়ে বুড়া তিস্তা নদী, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নদীর পশ্চিম তীরেই ইংরাজ-বিরোধী সন্ন্যাসী নেতা, মহারাজ হনুমানগিরির প্রাসাদ ও মঠ। উক্ত মঠ ও প্রাসাদের সামান্য কিছু দূরেই ইংরাজ-বিরোধী জননেতা এবং ধনকুবের

ভগবান সিংহ শাহজী ও তৎপুত্র মহেন্দ্র সিংহ শাহ্‌জীর প্রাসাদ ছিল। শাহ্‌জীর অপভ্রংশ হল শেঠ। এরা পিতা পুত্র নবাব নূরউদ্দীন্ বাকের জঙ্গ-এর অর্থমন্ত্রী ছিলেন বলে প্রকাশ। মহেন্দ্র সিংহ শাহ্‌জীর পুত্র গোপাল সিংহ শাহ্‌জীর বিষয় বিভব, ব্যবসা সমস্ত কিছু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে পরাজিত হওয়ার পর বাজেয়াপ্ত হয়। সেই সঙ্গে প্রাসাদ লুণ্ঠিত ও বহুজনকে হত্যা, ফাঁস দেওয়ার পর প্রাসাদটি সম্পূর্ণভাবে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। স্থানটির নাম 'সাহেবগঞ্জ।' উক্ত সাহেবগঞ্জের দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে তৎকার ফৌজদার মিঞাদের 'কোট'। কাছারী (বিচারালয়) ছিল (লোহানী পাড়ায়)। এখানে পূর্বে বৌদ্ধ বিহার ছিল বলে মনে হয়। [১]কোট-কাছারী স্থানীয় লোকেরা খনন করে ইট পাটকেল নিয়ে যেতে প্রস্তর নির্মিত দুইটি বৌদ্ধ মূর্তি উরু হতে নীচের দিকের অংশ পাওয়া যায়। পরে বৌদ্ধ বিহারের একখানি প্রস্তর ফলক ইট খুড়ে নিয়ে যেতে স্থানীয় লোকেরা পায়। ফলকটি বাংলা ভাষায় লিখিত। কিন্তু আমি এবং আর যারা ফলকটি দেখেছেন তাঁরা পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। শিলালিপিটি লোহানী পাড়ার মণ্ডল সাহেবদের বাড়ী ফারুক মিঞার নিকট রয়েছে। বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্নাবশেষ দুটি চমৎকার, তখনকার দিনের শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য দেয়। উহা ঢাকা যাদুঘরে রয়েছে।

এসব কথা কিছুটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কোট-কাছারীর আয়তন, দৈর্ঘ্যে এক মাইলের অধিক, প্রস্থে সিকি মাইল হবে। লোহানীপাড়া হাটের কিছু পশ্চিম দিকে 'লেংটি হারার বিল' নামে যে বিলটি পরিচিত রয়েছে, উহা আসলে কিন্তু দীঘি। ওর নীচে সম্পূর্ণ শান বাধান অবস্থায় এখনও রয়েছে। সম্ভবত এখানে পূর্বের আমীর-ওমরাহ্‌দের বেগম ও বাঁদীরা গোসল করতেন। উক্ত হাটের দক্ষিণ দিকেও বহু ইমারত ও পাকা বাসার ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এর আরও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 'ঘিরলাই'। এই ঘিরলাই নদী হ'তে একটি গভীর নালা কেটে লোহানী পাড়া কোটের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যাক তৎকার মিঞাদের 'কোট' এ নামটি এখনও রয়েছে। এখানে একটি উত্তর-দক্ষিণে বৃহৎ লম্বা দীঘি রয়েছে। দীঘির পূর্ব পারে 'লেক' রয়েছে। দীঘিটির বর্তমান নাম হয়েছে 'চাপড়ার বিল' 'চাপড়ার কোট'। কাছারীর সোজা পশ্চিম দিকে ৮/১০ মাইল ব্যাপিয়া যে জনপদ রয়েছে, তার অধিকাংশ লোকই হল আরব বংশোদ্ভূত। ইহাদের স্বগোত্রীয়

---

[১] সম্ভবত বৌদ্ধ বিহারের পার্শ্বে কোট-কাছারী পরে নির্মিত হয়েছিল।

প্রিয়,দলপতি স্বদেশ প্রেমিক, শাহ কাদেরুল্যাহ ওরফে মুসা শাহ। এই দুর্ধর্ষ আরব গোত্রীয় লোকেরা বিদেশীয় শাসক ইংরাজদের কখনও শাসক বলে স্বীকার করে নেয় নি। মুসা শাহ-এর গ্রাম 'ঘিরলাই' হতে করতোয়া নদীর দূরত্ব পশ্চিম দিকে এক মাইল। ইংরাজ কর্মচারী মেজর র‍্যানেল-এর অংকিত মানচিত্রে দেখা যায় যে, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকেও করতোয়া খুবই বড় ছিল। ফুলচৌকী নগরের সর্ব দক্ষিণ গ্রামটিকে বলা হয় 'মসিমপুর'। মসিমপুরের পশ্চিমে বুড়ো তিস্তা নদী। তিস্তা নদীর দেড় মাইল পশ্চিমে হল 'মোগলিগড়'। উক্ত গড় হতে 'বামনের গড়ের দূরত্ব ৫।৬ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে হবে।

বামনগড়ের আরও একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে এরপর আমরা রানীগড়ের বা রানীগঞ্জের কথা বলব ঃ

বামনগড় যে স্থানে অবস্থিত ছিল, গড়গুলি কেটে সমান করে সুচতুর ইংরাজরা কিছুটা অংশে জনবসতি বা গ্রাম স্থাপন করেছে। গড় না থাকলেও এখনও লোকেরা স্থানটিকে বামনগড় বলে থাকেন। বামনগড়ের দক্ষিণ পাশে হল 'রাজবাড়ী'। এখানেই রাজা ভবানী পাঠকের অস্থায়ী প্রাসাদ ছিল। তাই স্থানটিকে এখনও রাজবাড়ী বলা হয়ে থাকে। রাজবাড়ীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। রাজবাড়ী হতে ১ মাইল পূর্বদিকে 'জানপুর' বা জঙ্গপুর নামে একটি স্থান রয়েছে। এখানে সাওতালদের বসতি স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। এই স্থানগুলি ভীষণ জঙ্গলে পরিণত করা হয়েছিল পরিকল্পনা মাফিক। বামনগড়ের পাশে শাহ্‌বাজপুর, নারায়ণপুর, জয়পুর, ভালকা জয়পুর ইংরাজদের ভল্লুক বলা হত বলে ভালকা নামকরণ হয়েছে। মীর্জাপুর, ভবানীপুর কাজলা নদীর একটি ঘাটকে এখন পর্যন্ত জঙ্গশাহ (জঙ্গশাহ) ঘাট বলা হয়ে থাকে। উক্ত ঘাটের ভাটির ঘাটকে 'ধোপঘাট' বা ধোপার ঘাট বলা হয়।

এখানে 'নওয়াবগঞ্জ' নামে একটি বাজার তৎকালে বসানো হয়েছিল। উক্ত নাম নবাব নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর স্মৃতি মনে জাগিয়ে দেয়। ইংরাজরা পরে এখানে একটি থানা বসিয়েছিল। থানাটির নাম হল নওয়াবগঞ্জ। এলাকাটি দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। ঘোরতর জঙ্গলের কোন কোন স্থানের নাম 'আমলার কাঁটাল'। ইংরাজদের নিয়োজিত আমলারা এই স্থানে তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গল লাগানোর ব্যবস্থা করে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী

বিরাট ভয়াবহ জঙ্গল গড়ে তোলা হয়েছিল। জঙ্গলের পরিধি হল, লম্বালম্বি প্রায় ৬ ক্রোশ।" নেন্দার পাড়া কইবর চান্দি জঙ্গল। এই ভীষণ জঙ্গলে দিনের বেলা ও সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না। শাল ও বহু প্রকার কণ্টক যুক্ত গাছ লাগানো হয়েছিল। এই ভীষণ জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করত নানা জাতের ব্যাঘ্র, হরিণ, শূকর, ময়ূর, বন্য মহিষ, বন্য গাই, অজগর সাপ ও অন্যান্য বিষধর সর্প। পর পর গড় রাজধানী হতে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পূর্ব-দক্ষিণ দিকে নির্মাণ করার কারণ হল মুর্শিদাবাদের শক্তিকে প্রতিহত করা। এইভাবে রাজধানীটি চতুর্দিক দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।

ফুলচৌকীস্থ মুল প্রাসাদের মসজিদগাত্রের শিলালিপিতে ফরাসী ভাষায় লিখিত রয়েছে তার অবিকল বঙ্গানুবাদ। তা নিম্নে দেওয়া হল। অনুবাদকারী মওলানা শাহ ছাইদ আহম্মদ। বাদশাহ ২য় শাহ আলমের নামাঙ্কিত একটি প্রস্তরফলক রয়েছে। উক্ত ফলকটিতে কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াত আছে। নীচে বাদশাহ শাহ আলম সানি লেখা রয়েছে। উক্ত প্রস্তরফলক দুটি ঢাকা যাদুঘরে বর্তমানে রয়েছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রাসুলুল্লাহ

বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহিম। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইছা রুহুল্লাহু

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুছা ওয়াদাহী আলায় হেচ্ছালাম।

খাদেম বাকের মোহাম্মদ কামাল মোহাম্মদ কর্তৃক ১২২৯ বাংলা ২৫ ভাদ্র নির্মিত হইয়াছে।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ

বিদেশীয় শাসক গোষ্ঠি একক ভাবে বলে এসেছে উপমহাদেশের তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। তাদের ধারণা তাদের বদৌলতে উপমহাদেশ সভ্যতার আলো দেখেছে। তাদের এই প্রচার দ্বারা মনে হবে এ দেশের মানুষ পূর্বে কোন দিন সভ্যতার মুখ দেখে নি। বিদেশী শাসকদের আগমনে এদেশের উন্নতি হয়েছে, না চরম অবনতি ঘটেছে সে সম্পর্কে প্রখ্যাত মনীষীর তথ্য সমৃদ্ধ রচনা থেকে তার কিছু নিদর্শন উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও চিন্তাবিদ জনাব মওলানা হোসাইন আহমদ আলী সাহেবের 'নক্শে হায়াত' নামক তাঁর আত্মজীবনী থেকে ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও তাঁর কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে কিছুটা অংশ দিচ্ছি। মাসিক মোহাম্মদীর সৌজন্যে চিন্তাবিদ লেখক জনাব নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেবের অনুবাদ আমরা যা পেয়েছি, তা আমাদের যুক্তিগুলির পরিপূরক হিসাবে এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

> ভারতবর্ষ প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী ও খুব শস্তার দেশ ছিল—ইংরেজদের আগমনে উহা দুর্মূল্যের দেশ ও আকালের কেন্দ্র হইয়া পড়ে—উৎপাদন হ্রাস পায়। খাদ্যাভাবে দেশবাসী মৃত্যুবরণ করিতে থাকে।

---

১. "ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষ": নূর মোহাম্মদ আজমী, ২৮ শে বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৬৩ সাল। পৃষ্ঠা ১৩৫—১৪১ পর্যন্ত। (মাসিক মোহাম্মদী।

জনাব মাওলানা হোসাইন আহম্মদ মদনী "নকশে হায়াত" নামক তাঁর আত্মজীবনীতে ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষের (বর্তমান পাক-ভারতের) যে নকশা অঁাকিয়াছেন বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি তার একটি অধ্যায়ের অনুবাদ মাত্র। মাওলানা ১৯৪৩ সালে নৈনিতাল জেলে বসিয়া উহা রচনা করেন। অনুবাদক—নূর মোহাম্মদ আজমী।

প্রকৃতি ভারতবর্ষকে একটি স্বর্ণপ্রসূ দেশ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এবং শস্যের চাষ ও উৎপাদনের পক্ষে আবশ্যক যাবতীয় উপায়-উপাদান দ্বারা উহাকে সুশোভিত করিয়া দিয়াছে। এ কারণে স্মরণাতীত কাল হইতে এখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইতে থাকে। এদেশের লোকেরা সর্বদা সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল, ভাবনা-চিন্তা ইহাদের কখনও স্পর্শ করিতে পারিত না। দুর্ভিক্ষ আকালের নাম তাহারা কখনও শুনে নাই। এদেশে উৎপাদন এত অধিক হইত যে, তখনকার শস্তার কথা শুনিলে এ যুগে শুধু যে বিস্ময় সৃষ্টি হয় তাহা নহে, বরং মানুষ অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণকে অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া মনে করে। মিঃ থারেন্টন বলেন, 'এখানের জমি স্বর্ণপ্রসূ ছিল। যাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত।' এইভাবে মিঃ থমস মোনরোও ভারতীয় চাষাবাদের পদ্ধতি এবং কৃষকদের উচ্চ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লর্ড মেকলে বলেন, 'মুসলমানদের জুলুম ও মারাঠাদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলা একটা স্বর্ণ উদ্যান ও নেহাত সমৃদ্ধ দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। এ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা সর্বদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিত, তবু শস্যের প্রাচুর্যের দরুন এ দেশ কর্তৃক দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ প্রতিপালিত হইত। লণ্ডন ও প্যারিসের উচ্চ পরিবারের মহিলারা এখানের চরকায় কাটা সুক্ষ্ম সুতিবস্ত্র দ্বারা নিজেদের শোভাবর্ধন করিতেন।'

মোটকথা, ইংরাজ আধিপত্যের আগে ভারতবর্ষে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত এবং যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য নেহাত শস্তা দরে পাওয়া যাইত।

এ কারণে এদেশবাসী অতি আরাম আয়েশের সহিত কাল যাপন করিত। খাদ্যের চিন্তা তাহাদের কখনও করিতে হইত না। স্যার ইলিয়ট এন্ডারসন (এন্ডাওসন) ভারত ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে সম্রাট আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ের (১২৯৬—১৩১৬) দ্রব্যমূল্যের ফিরিস্তি নিম্নরূপ দিয়াছেন ঃ

১। টাকা প্রতি

গম—২ মণ ৩৯ সের।
চাউল—৪ মণ ১৯ সের।

চনা—৪ মণ ১৯ সের।
মাস কলাই—৪ মণ ১৯ সের।
যব—৫ মণ ২৪ সের।
সাদা চিনি—১৫ সের।
লাল চিনি—২৪ সের।
ঘি—৩৩ সের।
সরিষার তেল—১ মণ ২৭ সের।

সম্রাট মোহাম্মদ তোগলকের জামানায় (১৩২৫—১৩৫১) এরূপ ছিল।

২। প্রতি মণ

গম প্রতিমণ	।।/০ আনা
শালী ধান প্রতি মণ	।৵৩ পাই
চনা প্রতি মণ	৶০ আনা
চাউল প্রতি মণ	।। /০ আনা
সাদা চিনি প্রতি মণ	৩৲ টাকা
মিশ্রি প্রতি মণ	৩৸০ আনা
গরু (মোটা) প্রতিটি	২৲ টাকা
বক্রি (তাজা) প্রতিটি	১৲ টাকা
মহিষ (মোটা) প্রতিটি	২৲ টাকা
মোরগ প্রতিটি	৻১০
সাটারণ বকরির গোশত প্রতি সের	৻১০ পয়সা

(দৈনিক খেলাফৎ'—২রা নভেম্বর, ১৯৪১ সাল)

মোহাম্মদ তোগলকের এই সময়ই প্রসিদ্ধ মুর পর্যটক ইবনে বতুতা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বাংলা পর্যটনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় টাকায় তিন মণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইত। এবং শান্তির সময় এক টাকায় ১৬ মণ করিয়া চাউল পাওয়া যাইত। সুতীবস্ত্র টাকায় ত্রিশ গজ হিসাবে ছিল।

সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলকের সময় (১৩৫১—১৩৮৮) দ্রব্যমূল্য নিম্নরূপ ছিল ঃ

৩। প্রতি মণ

গম—প্রতি মণ ।/১৫ গণ্ডা (পৌনে ছয় আনা)

যব—প্রতি মণ	৶০ আনা
ঘি–প্রতি সের	১২ ৷৷ গণ্ডা
চিনি—প্রতি সের	১৭ ৷৷ গণ্ডা

—খেলাফৎ পত্রিকা, ২রা নভেম্বর ১৯২৩

সম্রাট ইব্রাহিম লোদীর জমানায় (১৫১৭—১৫২৬) এরূপ ছিল ঃ

৪। প্রতি টাকায়

খাদ্যশস্য—১০/ মণ
ঘি— /৫ সের
কাপড়— ১০ গজ

মোটকথা, একটি পরিবার মাসিক ৫ টাকায় সম্মানের সহিত কালযাপন করিতে পারিত। এক টাকায় একজন অশ্বারোহী তার ঘোড়া, সহিস ও সৈন্যগণ সহ আগ্রা হইতে দিল্লী পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দে সফর করিতে পারিত।

—খেলাফৎ পত্রিকা, ২রা নভেম্বর, ১৯২৩ সাল

সম্রাট আকবরের যুগের মূল্য

৫। প্রতি মণ

গম প্রতি মণ	৷৷০ আনা
যব প্রতি মণ	৷/০ আনা
শালী ধান প্রতি মণ	৸/০ ৩ আনা
চনা প্রতি মণ	৷/০ আনা
মুগ প্রতি মণ	৷৷৶ আনা
মাষকালাই প্রতি মণ	৷৷৵০ আনা
মটকা প্রতি মণ	৷৵৩ আনা
সাদা চিনি প্রতি মণ	৩৸০ আনা
লাল চিনি প্রতি মণ	১৸০ আনা
ঘি প্রতি মণ	৩ টাকা
তেল প্রতি মণ	২ ৷৷৶০ আনা
নিমক প্রতি মণ	৷৵০
সুগন্ধি চাউল প্রতি মণ	২৲ টাকা

জোয়ার প্রতি মণ	।৵০ আনা
বাজরা প্রতি মণ	।/০ আনা
ডাল প্রতি মণ	।৵০ আনা
ময়দা প্রতি মণ	৸/০ আনা
দুধ প্রতি মণ	৸৶০ আনা
গুড় প্রতি মণ	১।৵০ আনা
তাজা বকরী প্রতিটি	১॥০ আনা

—খেলাফৎ পত্রিকা, ২রা নভেম্বর, ১৯২৩

আকবরের যুগের অপর সময়ের একটি মূল্য তালিকা—

প্রতি টাকায়—

গম প্রতি টাকায়	৪/মণ
মুগ প্রতি টাকায়	৭ মণ ৩০ সের
তেল প্রতি টাকায়	১ মণ ২৪ সের
লবণ প্রতি টাকায়	১০ মণ ৩০ সের
মিশ্রী প্রতি টাকায়	১৮ সের
বাজরা প্রতি টাকায়	৩ মণ
ঘি প্রতি টাকায়	১৫ সের

—এন্তেখাবে লা জাওয়াব, লাহোর ২১ শে আগস্ট। ১৯২৮ ইং

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় (১৬০৫—১৬২৭)

৬। টমাস কুবেরাইট, যিনি ১৬১২ খৃঃ ভারতে আসিয়াছিলেন, লিখেছেন "দৈনিক এক আনায় এক ব্যক্তি নেহাৎ আরামের সহিত চলিতে পারে।"

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে (১৬৫৮—১৭০৭)

৭। (ক) ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন তাঁর 'ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তে' বলেন ঃ

"ঢাকায় এক টাকায় ৫৮০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭ মণ ১০ সের চাউল পাওয়া যায়।" —২য় খণ্ড, ২৫ পৃষ্ঠা

(খ) তিনি আরও বলেনঃ 'ঢাকায় সমস্ত মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য এত শস্তায় পাওয়া যায় যাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দেশটি অত্যন্ত আবাদী। —১ম খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা

(গ) করমণ্ডল উপকূলে তিন আনায় ২০ পাউণ্ড (১০ সের) মাছ পাওয়া যায়। —১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা

(ঘ) কটকে এক আনায় অর্দ্ধসের মাখন পাওয়া যায়; নয় আনায় একশত এতবড় মাছ পাওয়া যায় যাহার দুইটি মাছই একজনার পক্ষে যথেষ্ট। —১ম খণ্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা

(ঙ) নমক এক ক্রাউনে (২৷৷. টাকায়) একটন (২৮ মণ) মিলে। —১ম খণ্ড, ৪৫৫ পৃষ্ঠা

(চ) তিন ফাদিং (কয়েক কড়ি) মূল্যে আধাসের গোশত পাওয়া যায়। —১ম খণ্ড, ৮৬১ পৃষ্ঠা

অধ্যাপক ইলিয়াস বার্ন বলেনঃ "আইনে আকবরীতে দ্রব্যমূল্যের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ১৬ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া রাজধানীর আশেপাশে ১৯১০—১৯১২ সালের মূল্যের অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য কমপক্ষে সাত আট গুণ শস্তা ছিল। তৈল জাতীয় দ্রব্য কমপক্ষে ১০/১২ এবং কাপড় ৫/৬ গুণ শস্তা ছিল। অবশ্য ধাতব দ্রব্য এত শস্তা ছিল না। বিলাতি দ্রব্য যাহা আজকাল আমাদের বাজারকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার মূল্যও কিছু বেশী ছিল। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সাধারণ মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, ১৬ শতাব্দীর টাকার মূল্য ১৯১২ সালের টাকার মূল্যের তুলনায় ৬/৭ গুণ অধিক ছিল এবং ১৯২০ সালের মূল্যের তুলনায় ১০/১২ গুণ বেশী ছিল।

মোটকথা আকবরের সময়ের মাসিক ৫৲ আয়কারী পরিবার এত সুখী ছিল যে, একালের (বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে) ৫০৲ টাকা আয় ওয়ালা পরিবারের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তখন যে ব্যক্তি ১০৲ বেতনের চাকুরী করিত সে একালের (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে) একশত টাকা ওয়ালা অপেক্ষা কিছুতেই কম ছিল না এবং যে ব্যক্তি ১০০৲ টাকা পাইত সে আজকালের হাজার টাকা আমদানীওয়ালা অপেক্ষা অধিক

সুখী ছিল। অথচ টাকার রকম ও আকৃতি ব্যতীত কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। তখন রূপার যে টাকা ছিল আজও তাহাই আছে। কিন্তু মূল্যে আকাশ পাতালের তফাৎ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই পার্থক্যও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর যখন ইংরেজদের নিয়মিত শাসন প্রবর্তিত হয় তখন হইতে অধিক বাড়িয়া যায়। ইহার পূর্বেও পার্থক্য ছিল, তবে এত অধিক ছিল না।

মাইশাতুল হিন্দ বা ভারতের অর্থনীতি, ৩১৫ পৃষ্ঠা

দ্রব্যমূল্যের উপরোক্ত পার্থক্য অধ্যাপক ইলিয়াস বার্নি ১৯২০ সালের তুলনায় দেখাইয়াছেন। যখন আজকার (১৯৪০—১৯৪৭) তুলনায় প্রত্যেক দ্রব্যই অন্তত ৪ গুণ বা ততোধিক শস্তা ছিল। যদি আজকালের মূল্যের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চিন্তভাবে বলা যাইতে পারে যে, আকবরের সময়ের ৫৲ টাকা আয়ের এক ব্যক্তি আজকালের ২০০৲ টাকা আয় হইতে, ১০৲ টাকা আয় ৪০০৲ টাকা আয় হইত এবং ১০০৲ টাকা আয়ে ৪০০০৲ টাকা হইতে অধিক সুখভোগ করিতে পারিত। সোনা-রূপায় পারস্পরিক মূল্যের পার্থক্যও অনেক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আকবরের সময় ১০২ তোলা ওজনের সোনার মোহরে শাহীর মূল্য ছিল ১০০০৲ টাকা অর্থাৎ সোনার তোলা তখন ১০৲ টাকা ছিল আজ উহা ১০০৲ টাকাতেও পাওয়া যায় না। মোটকথা, ইংরাজদের আগমন ও শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতবর্ষ একটা শস্তার দেশ ছিল। যাবতীয় শস্য ও মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা দ্রব্য বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্য বিস্তর শস্তা ছিল। এখানকার লোকেরা নেহাৎ আরাম আয়েশে কাল যাপন করিত।

কিন্তু ইংরেজদের অভিশপ্ত শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থা বিলকুল পাল্টাইয়া গেল। প্রাচুর্যের পরিবর্তে দেখা দিল স্বল্পতা, শস্তার পরিবর্তে দেখা দিল মহার্ঘতা এবং শান্তির স্থান দখল করিল দুঃখ ও দৈন্য। ইংরেজ আমলের পূর্বে এদেশে শস্য মণের হিসাবে বিক্রয় হইত। আর ইংরেজ আমলে উহা সের ও ছটাকে আসিয়া পেঁছায়। দেশের সাধারণ অধিবাসী অভাব ও দুর্ভিক্ষের দরুন লাখে লাখে বরং কোটি কোটি হিসাবে মৃত্যুবরণ করিতে থাকে। ইংরেজ শাসনের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায়ই দ্রব্যমূল্য এইরূপ ভাবে বাড়িতে থাকে ঃ

টাকা প্রতি

১৭৩৮ সাল = চাউল—২ মণ ৩০ সের, গম—২ মণ ২০ সের
তেল—১২ সের।
১৭৫০ সাল = চাউল—২ মণ ১০ সের, গম ২ মণ ১০ সের
তেল—১০ সের।
১৭৫৮ সাল = চাউল—১মণ ৩ সের, গম ১ মণ ৩৫ সের
তেল—৮ ॥॰ সের।
১৭৮২ সাল = চাউল—১মণ ৫ সের, গম ১মণ ৫ সের
তেল—৭ সের
১৮২৫ সাল = চাউল—× ৩০ সের, গম—× ৩২ সের,
তেল—৬ সের।
১৮৫৮ সাল = চাউল—× ১৫ সের, গম—× ১৮ সের,
তেল—৫ সের।
১৮৮০ সাল = চাউল—× ১২ সের, গম—× ১১ সের,
তেল—৪ ॥॰ সের।

—বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর
অপ্রকাশিত রেকর্ড হইতে

যেভাবে কলিকাতায় দ্রব্যমূল্য বাড়িতেছিল, সেভাবে যেখানে যেখানে ইংরেজদের পা পড়িতেছিল সেখানে সেখানেই ক্রমে জিনিস অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ

কোম্পানীর শেষ আমল

১৮৫৭ = টাকা প্রতি গম—৩৬ সের, চাউল—১৮ ॥॰ সের
চিনা—১ মণ ১১ ॥॰ সের, ঘি—৪ সের।

—ইস্তেখাবে লা জাওয়াব, লাহোর, ২০শে আগস্ট ১৯২৮

ভিক্টোরিয়া আমল

১৮৯০ সাল = গম—২৫ সের, চাউল ১২ সের, চনা ২৮ সের, ঘি—২ সের, দুধ—৯ সের।

পঞ্চম জর্জের আমল

টাকা প্রতি গম—৮ সের, চাউল—৪ সের, ঘি—৮ ছটাক চনা—৯ সের, ডাল—৪ সের, দুধ—৪ সের।

পঞ্চম জর্জের পরবর্তী যুগ ইহা হইতেও অন্ধকার হইয়া পড়ে। ১৯৪০ সাল হইতে এ যাবত টাকায় ৪ সের করিয়াও গম পাওয়া যায় না বরং টাকায় পাকা দুই সের পাওয়াও মুশকিল। যুক্ত প্রদেশে গমের মণ—২৬৲ টাকা, চাউলের মণ ৪০ টাকা এবং বাংলায় চাউল ৬০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। চোরা বাজারি ও বেআইনি কাজ-কারবারে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। কন্ট্রোল দরেও টাকায় ৪ সের গম পাওয়া যায় না। এইভাবে মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এত দুর্মূল্য হইয়া গিয়াছে, যার নজীর অতীত ভারতে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। সাবেক জামানায় দুর্ভিক্ষের সময়ও জিনিস এত দুর্মূল্য হইত না যাহা আজ স্বাভাবিক সময় হইয়া থাকে। ইংরেজ যুগের এই দুর্মূল্যের কারণ বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে প্রধানগুলির উল্লেখ নিম্নে করা গেল ঃ

দুর্মূল্যের কারণ

(ক) ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে যে সকল সোনা-রূপা লুণ্ঠন করিয়া ইংলন্ডে লইয়া গিয়াছিল সেই সকল দ্বারা সেখানে বড় বড় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল, মিশন ও মিল কারখানা করা হইয়াছিল। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার ও উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। অপর পক্ষে এখান হইতে সেগুলির জন্য কাঁচামাল টানিয়া তথায় পেঁৗছান হইতেছিল।

(খ) যতদিন পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প জীবিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া ইংলন্ডে ভারতীয় পণ্যের উপর অত্যধিক বাণিজ্য শুল্ক ধার্য এবং আইনগত নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া ইংলন্ড হইতে ভারতীয় পণ্যকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(গ) ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়—যার পূর্ণ বিবরণ সম্মুখে আসিতেছে (অবশ্য এই অধ্যায়ে নহে)

(ঘ) ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য মৃতপ্রায় হইলে স্বাধীন বাণিজ্য নীতি

ঘোষণা করা হয় এবং প্রত্যেক ইউরোপীয় দ্রব্যকে অতি স্বল্প মাশুলে ভারতে আমদানী করিয়া ভারতকে ইউরোপ বিশেষ করিয়া ইংলন্ডের বাজারে পরিণত করা হয়। প্রত্যেক শহরে ও বন্দরে বিলাতি মাল চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং মূল্যের অধিকাংশ দ্বারা কাঁচামাল খরিদ করিয়া ইংলন্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে চালান দেওয়া হয়। এক কথায়, যে পরিমাণ বিদেশী মাল এ দেশে প্রবেশ করিতে থাকে সে পরিমাণ খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল এ দেশ হইতে বাহির হইতে থাকে। ফলে এ দেশে দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ জন্য কলিকাতার নিম্নলিখিত হিসাব-নিকাশটি দ্রষ্টব্য ঃ

১৮০০ সাল—যখন এদেশে বিলাতি মাল মোটেই আসিয়াছিল না, তখন কলিকাতায় টাকা প্রতি।

চাউল ১ মণ ৫ সের, আটা ১ মণ ৫ সের, তেল ৭।। সের পাওয়া যাইত।

১৮১৪ সাল—৮ লক্ষ গজ বিলাতি কাপড় এ দেশে আসে এবং খাদ্য দ্রব্যের মূল্য এইরূপ হয়।

টাকা প্রতি—

চাউল—৩৭ সের, আটা ৩৭ সের,
তেল—৫।। সের।

১৮২১—দুই কোটি গজ বিলাতী কাপড় এদেশে আসে আর খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য এইরূপ হয় ঃ

টাকা প্রতি—

চাউল ৩০ সের, আটা ৩৩ সের, তেল—৫ সের।

১৮৩৫—বিলাতী কাপড় ৫ কোটি গজ এদেশে আসে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিম্ন হারে বৃদ্ধি পায় ঃ

টাকা প্রতি—

চাউল ২৪ সের, আটা ২২ সের, তেল ৪।। সের

১৮৭৫—৬১ কোটি গজ বিলাতী কাপড় এখানে আসে আর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিম্নরূপ হয়।

চাউল—১৭ সের, আটা ১৪ সের, তেল ১ সের।

১৯২৫ সাল—ভারতে বিলাতী কাপড় আমদানী করা হয় ১৫৬ কোটি গজ আর দ্রব্যমূল্য এইরূপ হয় ঃ

টাকা প্রতি—

চাউল—৪॥ সের, আটা ৪॥ সের, তেল ১ ০ সের

(ঙ) ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক বৎসর বিস্তর খাদ্যশস্য বহুসংখ্যক জাহাজ বোঝাই করিয়া ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে প্রেরিত হয়। দিল্লীর 'মিল্লাত' পত্রিকায় (১৬ই জুলাই ১৯৩২) উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রয়েল এগরিকালচার সোসাইটির ১৮৮৩ সালের রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ

১৮৮৩ সালে ভারত হইতে ১১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭ শত ১০ মণ গম বাহিরে চালান দেওয়া হয় অর্থাৎ প্রতি মিনিটে গড়ে ২২৯ মণ গম বাহিরে চলিয়া যায়। সরকারী হিসাব-নিকাশের চতুর্থ প্রকাশনিতে বলা হয় যে, ভারত হইতে গড়ে প্রতি মিনিটে নিম্নলিখিত হারে খাদ্যশস্য রফতানী করা করা হয়—

চাউল—১১৮ মণ. গম ৬৫ মণ, অড়হর ৫০ মণ, মসুর—৫ মণ, মুগ ৫৫ মণ। সব মিলে মোট ৩৪৩ মণ।

১৯১৩ সালে খাদ্যশস্য প্রভৃতি রফ্‌তানীর পরিমাণ এইরূপ ছিল ঃ

চাউল—৬ কোটি ৭৫ লক্ষ মণ, গম ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মণ, তুলা প্রায়-১॥০ কোটি মণ; পাট ২।০ কোটি মণ, চা ৩৪ লক্ষ মণেরও অধিক

—মাইশাতুল হিন্দ, ৯৫ পৃষ্ঠা

পণ্ডিত দয়াশংকর তার 'মজলুম কৃষাণ' নামক গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় ভারত হইতে গম রফ্‌তানীর তালিকা নিম্নরূপ দিয়াছেন ঃ

১৯১৫	সাল—২৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন।
১৯১৬—১৭	সাল—২৯ লক্ষ ১০ হাজার টন।
১৯১৭—১৮	সাল—৪৫ লক্ষ ১০ হাজার টন।

এবং চাউল রফতানীর পরিমাণ কেবল ১৯১৮—১৯ সালে ৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ মণ ছিল। বলা বাহুল্য যে, এই সমস্ত হিসাব-নিকাশ সরকারী তথ্য পরিবেশক বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। অথচ ইহাও একটি সত্য কথা সমালোচকদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য এইরূপ ব্যাপারে সাধারণত প্রকৃত তথ্য গোপন করারই চেষ্টা করা হইত। তবে সরকারের পরিবেশিত সংখ্যাও কি কম? এই পরিমাণ খাদ্যসশ্য

যদি দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইয়া থাকে (ফাঁকে ফোকড়ে ইহা হইতেও অনেক বেশী) তাহা হইলে দেশের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা, ইহার ফলে ভারবর্ষ দুনিয়ার সমস্ত দেশ অপেক্ষা দরিদ্র দেশ হইয়া পড়ে। ভারতীয়দের আয় দুনিয়ার সমস্ত দেশের আয় হইতে অসম্ভব রকমে কমিয়া যায়। ইহাদের জীবন দুনিয়ার সমস্ত দরিদ্র অন্নক্লিষ্টদের জীবনের তুলনায় নিকৃষ্টতর হইয়া পড়ে। অথচ ইতিপূর্বে এই ভারতবর্ষ ছিল দুনিয়ার সমস্ত দেশ হইতে সমৃদ্ধিশালী এবং ভারতের লোকেরাই ছিল সমস্ত দুনিয়ার লোকদের অপেক্ষা অধিক ধনবান ও সুখী।

(চ) 'আইনে আকবরী' ও অন্যান্য পুরাতন ইতিহাস হইতে ইহাও জানা যায় যে, ইংরাজদের আগমনের পূর্বে ভারতের উৎপাদন যে কোন উর্বর দেশ হইতেই কম ছিল না। বরং দুনিয়ার কোন দেশই খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতের সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু ইংরাজ আমলে উৎপাদন অসম্ভব রকমে হ্রাস পায়। ইহার মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথম বা অভ্যন্তরীণ কারণ হইল শাসক গোষ্ঠীর বদনিয়ত ও স্বার্থপরতা। প্রজাদের কল্যাণ ইহাদের মোটেই লক্ষ্য ছিল না, বরং প্রত্যেক ব্যাপারে ইহাদের লক্ষ্য ছিল ভারতবাসীদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া স্বজাতিদের পালন করা।

আধ্যাত্মিক গুরুগণ বলিয়াছেনঃ রাজার নেকনিয়ত ও বদনিয়ত বা সৎ ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রজাদের সুখ-দুঃখের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। রাজার উদ্দেশ্য ভাল হইলে প্রজাদের ভাল হয় আর রাজার উদ্দেশ্য মন্দ হইলে প্রজাদেরও মন্দ হয়। দ্বিতীয় বা বাহ্যিক কারণ হইল কৃষিকার্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়-উপাদানের অভাব। কৃষক ও জমিওয়ালাদের উপর বিভিন্ন রকমের করের এত দুর্বিষহ ভার চাপানো হইয়াছিল যে, সার, কৃষিযন্ত্র, কৃষি পশু ও পশু খাদ্য সংগ্রহ করা এবং কৃষি না করিয়া মধ্যে মধ্যে জমিকে কিছু অবকাশ দেওয়া, অধিকতর কৃষি মজুর খাটানো, জমি সেচ বা পানি নিষ্কাশন এবং এইরূপ অন্যান্য সুযোগ গ্রহণ তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বিশেষ করিয়া কৃষি পশুর চরম দুর্মূল্যতা এবং পশুখাদ্যের অভাব ও মহার্ঘতা কৃষকদের পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে। যে গরু ফিরোজ শাহ

তুগলকের আমলে মাত্র ২৲ টাকায় পাওয়া যাইত, উহা আজ দুইশত টাকায়ও পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত হিসাব-নিকাশ হইতে জানা যাইবে যে, যে দেশ একদিন কৃষি ব্যাপারেও দুনিয়ার সেরা ছিল ইংরেজদের আমলে উহা কত নীচে নামিয়া যায়।

১৯০৭ সালে বিভিন্ন দেশে প্রতি একর জমিনে গম উৎপাদনের তুলনামূলক হার এইরূপ ছিল—যুক্তরাজ্য—২৮ মণের মত, জার্মানী—২৪ মণের কিছু কম। ফ্রান্স—১৬ মণের মত, যুক্তরাষ্ট্র—১১ মণের কিছু কম। ভারতবর্ষ—৯ মণের কিছু অধিক। —মাইশাতুল হিন্দ ৯৭ পৃষ্ঠা,
ধান উৎপাদনের হার নিম্নরূপ ঃ

স্পেন—৬২·৯ মণ, ইটালী—৫৩ মণ, ভারত—১৪·৯ মণ।

যখন দুনিয়ার সমস্ত দেশই নিজ নিজ সরকারের নিকট হইতে কৃষি উন্নতির জন্য প্রচুর সাহায্য লাভ করিতেছিল তখন ভারতবর্ষ অন্যান্য শৈল্পিক ও গঠনমূলক ব্যাপারের ন্যায় কৃষি ব্যাপারেও নেহাৎ অসহায় অবস্থায় ছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া লীগের সভাপতি স্যার উইলিয়ম ডগবী বলিয়াছেন যে, ভারত সরকার কৃষি উন্নতির জন্য দেশের আয়ের মাত্র শতকরা ১ ভাগ ব্যয় করিয়া থাকে। —মদিনা বিজনোর' ২৫শে মার্চ ১৯৩০

এমতাবস্থায় ভারতে কৃষি উন্নতি কিভাবে সম্ভবপর ছিল ? অপরদিকে অবনতির অসংখ্য কারণ তার চারিদিক বেষ্টন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছিল, সকলের মধ্যে ভারতবাসীদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যরও ক্রমবর্ধমান করভার দেখা দিয়াছিল। মোটকথা এই সকল কারণে ইংলণ্ডে যেখানে ইংরেজদের ভারত দখলের পূর্বে সর্বদা দুর্ভিক্ষ ও মহার্ঘতা লাগিয়াই থাকিত তাহা অভাবমুক্ত হইয়া রক্ষা পাইল।

কারণ ভারত হইতে অসংখ্য সম্পদ ও অজস্র খাদ্যশস্য সেখানে পেঁৗছিতেছিল; অপরদিকে ভারতবর্ষ যাহা খাদ্যশস্যের গোলা ছিল এখন তাহা দুর্ভিক্ষ ও আকালের কেন্দ্র হইয়া পড়িল। একাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাত শত বছরে উভয় দেশে যে আকাল পড়িয়াছিল তার তুলনা করিলেই ইহার সত্যতা প্রকাশ পাইবে। স্যার উইলিয়াম ডগবী তার 'সমৃদ্ধিশালী ভারত'—(**Prospectious India**)

নামক গ্রন্থে এ সকল দুর্ভিক্ষের শতাব্দী অনুযায়ী সংখ্যা এইরূপ দিয়াছেন ঃ

১১ শতাব্দী —	ইংলণ্ড	২০,	ভারত-	২	অথচ স্থানীয়
১২ শতাব্দী —	"	১৫	"	১	দিল্লীর আশেপাশে
১৩ শতাব্দী —	"	১৯	"	৩	স্থানীয়
১৪ শতাব্দী —	"	১৬	"	৩	"
১৫ শতাব্দী —	"	৯	"	২	"
১৬ শতাব্দী —	"	১৫	"	৩	"
১৭ শতাব্দী —	"	৬	"	৩	" অনির্দিষ্ট

মোটকথা, একাদশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সাত শত বসৎরে ইংলণ্ডে একশতটি দুর্ভিক্ষ হয়, পক্ষান্তরে ভারতে হয় মাত্র সতেরটি। কিন্তু ইংজেরদের ভারত দখলের পর অর্থাৎ ভারতীয় খাদ্যশস্য ও অর্থ ইংলণ্ডে রপ্তানী হওয়ার পর উভয় দেশের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন লক্ষিত হয়, অবস্থা একেবারে বিপরীত হইয়া যায়। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে ইহা বুঝা যাইবে ঃ

১৮ শতাব্দী — ইংলণ্ড ৭, ভারতবর্ষ—১১ (অবশ্য উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ সমূহ, দিল্লী ও সিন্ধুতে)।

১৯ শতাব্দী—ইংলণ্ড—১, ভারতবর্ষ—৩১, (ব্যাপক)।

স্যার উইলিয়ম ওগবী প্রতি এক চতুর্থ শতাব্দীর হিসাব এ ভাবে আলাদা করিয়া দিয়াছেন ঃ

১৮০০—১৮২৫ পর্য্যন্ত ৫ বার। ইহাতে ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়।
১৮২৬—১৮৫০ পর্য্যন্ত দুবার। ইহাতে ১০ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে।
১৮৫১—১৮৭৫ পর্য্যন্ত ৬ বার। ইহাতে ৫০ লক্ষ লোক মারা যায়।
অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে ১ কোটি।

১৮৭৬—১৯০০ পর্যন্ত ১৮ বার। ইহাতে ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক মারা যায়। মোটকথা, ইংরাজদের আগমনের পূর্বে ভারতে মন্বন্তর একদিকে যেমন কম হইত, অপরদিকে তথায় অধিকাংশ স্থানেই হইত। ব্যাপক ও ঘন ঘন মন্বন্তর প্রায়ই হইত না। আমরা দেখিয়াছি যে এগার শতক হইতে সতেরো শতক পর্যন্ত এই সাতশত বৎসরে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে মাত্র ১৭ বার। কিন্তু ইংরাজ আমলে ইহা খুব ঘন ঘন ও ব্যাপক

আকারে হইতে থাকে। কেবল ১৮০১ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত এই এক শতাব্দীতে ভারতে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ হয়। ইহাতে দেশ উজাড় হইয়া যায় এবং ইউরোপের অনেক দেশের সর্বমোট লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক অনাহারে মারা যায়। ইংলন্ডের লেবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ক্যোরি হার্ডি স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৮৬০ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত মাত্র ৫০ বৎসর সময়ে ভারতে অন্নাভাবে তিন কোটি লোক মারা যায়। স্যার উইলিয়াম ডগ্‌বী লিখিয়াছেন যুদ্ধের দরুন সমগ্র দুনিয়াতে ১৭৯৬ হইতে ১৯০০ পর্যন্ত একশত সাত বৎসরে মোট ৫০ লক্ষ লোক ক্ষয় হয়। আর ভারতবর্ষে ১৭৯৯ খৃঃ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত এই একশত নয় বৎসরে শুধু অনাহারেই এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়।

এক কথায় প্রথম যুগে দুর্ভিক্ষ যেমন ঘন ঘন হইত না, অপর পক্ষে লোকের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল বিধায় খাদ্যদ্রব্য যত দুর্মূল্যই হউক না কেন উহা লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ভিতরে ছিল। এ জন্য দুর্ভিক্ষ তখন কোন প্রাণহানি করিতে পারিত না। কিন্তু ইংরেজদের আমলে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। ভারতের সমস্ত অর্থ বিদেশে তথা ইংলন্ডে চলিয়া যায়, দেশবাসী দরিদ্র হইয়া পড়ে; তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। ফলে তাহারা মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হয়। স্যার ডগ্‌বী বলেনঃ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ নৈসর্গিক কারণ অর্থাৎ পানির অভাবে যে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের এই যুক্তি দুর্বল, কেননা পানির অভাব খাদ্যশস্যের স্বল্পতার কারণ হইতে পারে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর কারণ হইতে পারে না। মৃত্যুর আসল কারণ হইল দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের দরুনই লোক সামান্য বোঝা বহনের ক্ষমতাও হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আশেপাশের উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। (যেভাবে এই বৎসর ১৯৫৬ পূর্বপাকিস্তানীদের অবস্থা হইয়াছে—অনুবাদক)।

বাস্তব পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে (১৮০১--১৯০০) পানির অভাব মোটেই হইয়াছিল না। স্যার উইলিয়াম ওগ্‌বী দুর্ভিক্ষ বৎসরসমূহের হিসাব-নিকাশ এবং ইংরেজ বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য-আদি দ্বারা প্রমাণ করিয়া

দেখাইয়াছেন যে, ঐ সময় স্বল্পতা এইরূপ মোটেই ছিল না, যদ্দরুন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে যথাসময়ে ২১ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইলেই সেচ ব্যতীত কৃষিকার্য্য করা যাইতে পারে। অথচ দুর্ভিক্ষের বৎসরসমূহে বৃষ্টির গড় সব জায়গায় ২০ ইঞ্চির উপরে ছিল। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়। অথচ সেখানে ৬৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল সেই বছর বোম্বাইয়েও দুর্ভিক্ষ হয়, অথচ সেখানে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। ১৮৭৭ সালে মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, আর সেখানে বৃষ্টিপাতের গড় ছিল ৬৬ ইঞ্চি। স্যার ওগ্‌বী ইহাও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, বাজারে খাদ্যশস্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু লোকের অত্যধিক দারিদ্র্য ও ক্রয়ক্ষমতার অভাবেই এরূপ ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে অনুকূল মৌসুমে সমস্ত বছরের খরচ বাদ ও ভারতে ১৪ কোটি টন খাদ্য মওজুত থাকিত। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধিকেই এ সকল দুর্ভিক্ষের কারণ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ভারতে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে বসতি ইউরোপের অনেক দেশের তুলনায় কমই ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহার জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৃষি জমিনের তুলনায় অধিক ছিল না। নিম্নে একটি তুলনামূলক ফিরিস্তি দেওয়া গেল।

১৯২১ সাল—প্রতি বর্গমাইলের বসতি ঃ

বেলজিয়াম—৫৮৯, হল্যান্ড—৪৫৪, ইংলন্ড ও ওয়েলস্—৪০৫, জাপান—৩১৭, ইটালী—২৯৩, জার্মানী—২৯০, চীন—২৬৬, অস্ট্রিয়া—২৬৬, ভারত—২২১।

এক কথায় ভারতে কোন কোন অংশের বসতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক হইলেও যথা (পূর্ব পাকিস্তানের বসতির গড় ৮৫০) কিন্তু সমগ্র ভারতের বসতির গড় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম—২২১ জন মাত্র। কিন্তু দুর্ভিক্ষের দিক দিয়া তুলনা করিলে ভারতই সমগ্র দুনিয়ায় অধিক দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশ। অথচ ইহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কৃষি-জমি বৃদ্ধির হারের তুলনায় অধিক নহে। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি—শতাব্দীতে শতকরা ৭ জন, আর কৃষি-জমি বৃদ্ধির হার ৮ বা ইহারও অধিক। সুতরাং বসতি বৃদ্ধি এখানে দুর্ভিক্ষের

কারণ হইতে পারে না। বসতি বৃদ্ধিই দুর্ভিক্ষের কারণ হইলে উপরোক্ত ইউরোপীয় দেশগুলিতেই অধিক দুর্ভিক্ষ হইত।

উপরোক্ত তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, ইংরেজদের প্রচারনার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন যে, ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ভারতে কোথাও শান্তি বিরাজ করিত না। সর্বদা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ লাগিয়াই থাকিত এবং অসংখ্য প্রাণহানি হইত। ইংরেজ শাসনে দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা ইতিপূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের এই দাবী মোটেই সত্য নহে। ১৭৫৭—১৮৫৭ পর্যন্ত এই একশত বৎসরে ভারতবর্ষে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় ও এত লোকক্ষয় হয়, যাহা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। পলাশী যুদ্ধ, মীর কাসিমের যুদ্ধ, অযোধ্যার নবাবের সহিত যুদ্ধ, পাটনার যুদ্ধ, বকসারের যুদ্ধ, রোহিলার সহিত দীর্ঘ যুদ্ধ, কর্ণাটের যুদ্ধসমূহ দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধাবলী, টিপুর সহিত যুদ্ধ, মারাঠাদের সহিত একাধিক যুদ্ধ, নেপাল ও ভুটানের যুদ্ধ, পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও সিন্ধুর, যুদ্ধসমূহ এই এক শতাব্দীতেই সংঘটিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৫৭ সালের ব্যাপক বিপ্লব যাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষ ধ্বংস হইয়া যায়। এই আশু যুদ্ধ ক্ষ্যান্ত হইতে না হইতেই বহির্যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চারিবার আফগানিস্তানের উপর আক্রমণ করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ হারায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের আযাদ কবিলা—সোয়াত বণির, চিত্রল, বনুল, কাহজুওয়া, আফ্রিদি, মসউদি, মেহমদি ও উযীর এই সকলের সহিত পর পর বহু যুদ্ধ হয় এবং ইহাতেও লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এতদ্ব্যতীত বেলুচিস্তান, বার্মা ও তিব্বত প্রভৃতির যুদ্ধ—এই সকল যুদ্ধেও ভারতের লোকক্ষয় ও অর্থ ব্যয় কম হয় নাই। এ ছাড়া চীন, সোমালিল্যাণ্ড, সুদান, পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসর প্রভৃতি যুদ্ধেও ভারতীয়দের শরীক করা হয়। অবশেষে ১৯১৪ সালে, প্রথম মহাসমর, ইহাতে বিনা আবশ্যক ভারতকে জড়াইয়া দেওয়া হয়। ইরাক, এডেন, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, চনাক দুর্গ, স্মার্না, এশিয়া মাইনর, বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য ভারতবাসীকে টানিয়া নামানো হয়। ইহাতে ভারতে কোটি কোটি টাকা ও কোটি কোটি মণ রসদ ব্যতীত লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণও বিনষ্ট হয়।

এই সকল ব্যাপার ভারতকে ধ্বংস করার পথে কম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি? অথচ এই সকল যুদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা ও বৃটিশ বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল। অতঃপর এই দ্বিতীয় মহাসমরের কথা যাহা ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্যন্ত চলিয়াছিল, ইহাতেও বৃটিশ স্বার্থরক্ষার খাতিরে ভারতের বিপুল অর্থ ও অসংখ্য লোক বিনাশ হয়। মোটকথা, বৃটিশ আমলের এই দুইশত বৎসরে ভারতের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, ইতিপূর্বে এক হাজার বৎসরের যুদ্ধেও সে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল না। যুদ্ধের ক্ষতির কথা বাদ দিয়া যদি কেবল দুর্ভিক্ষের ক্ষতির হিসাবই ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এই দুইশত বৎসরে ভারতের এত প্রাণহানি হইয়াছে যাহা সমগ্র দুনিয়ার এক হাজার বৎসরের যুদ্ধেও হয় নাই।

শিল্প-বিদ্যায় ইংরাজের হস্তক্ষেপ

একদিকে যেমন ভারতের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে ভারতকে ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি আবার শিল্পের কারিগরী বিদ্যা দেশের লোক যাহা জানতো এই শিল্প বিদ্যা ইংরাজদের থেকে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট এবং নিপুণতাপূর্ণ ছিল বলেই তাহাও আবার সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা ধ্বংস করেছিল। করেছিল ইংলণ্ডে শিল্পজাত দ্রব্যগুলির সুবিধার্থে। ধন-সম্পদ ঐ সময়গুলিতে প্রচুর ছিল এবং তা দেশে থাকলে যে-কোন বিদ্যা আয়ত্ত করতে বেশী বেগ পেতে হত না। এখন দারিদ্র্য এমন একটা ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যে, এর সর্বদিকটাই বিষময়, ক্ষতিকর। ইংরাজ আগমনে বিরাট ক্ষতিই হয়েছে, কৃষি এবং শিল্প সামগ্রীর দেশের কৃষক, মজুরদের। দারিদ্র্যের এই মহাব্যাধি হতে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে মুক্ত করা দরকার বলে আমরা বিশ্বাস করি। নইলে এ স্বাধীনতা অর্থহীন হ'য়ে যাবে।

এ ব্যাপারে আমরা সখারাম গণেশ প্রণীত 'দেশের কথা' থেকে তথ্যভিত্তিক উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাবো যে এ-দেশবাসীর শিক্ষার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের প্রথম দিকে কী ধরনের অনীহা ছিল ঃ

> কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষীয় সমাজে এ সকলের আবির্ভাব কামনা করেন নাই; তাঁহারা চাহিয়াছেন, ভারতে শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায়ের বাহুল্য;

কাজেই ভারতের শতকরা ৮৫ জন আজ কৃষিজীবী—তাঁহারও অর্দ্ধাংশ চিরকাল অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট। কারণ—

"যাদৃশী ভাবনাথস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব কালেকটর ডবলিউ চ্যাপলিন সাহেব ১৮৩১ খৃস্টাব্দে বলিয়াছিলেন ঃ

I am afraid the nature of our Government is not calculated for much improvement ... It is, in fact, adverse to improvement.

আমাদিগের (ইংরাজদিগের) শাসনের প্রকৃতি বিশেষ উন্নতির অনুকুল নহে; বরং উহা উন্নতির প্রতিকূল।

মিঃ চ্যাপলিনের এই উক্তি এদেশের সংকীর্ণ চিত্ত রাজপুরুষগণের যত্নে কি বহু পরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতেছে না? তাঁহারা উন্নতির অবকাশ দান করিলে, কি এ দেশের অনেক সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাজকার্য্যের উচ্চতর বিভাগে আপনাদিগের স্বাভাবিক প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাশ দেখাইতে সমর্থ হইতেন না ?

ফলতঃ গভর্নমেন্ট উদারতা প্রকাশ করিলে এদেশে রাজকার্য্য পরিচালনক্ষম যোগ্য ব্যক্তির অভাব সহজেই দূর হইতে পারে। কিন্তু অনেক রাজপুরুষই যে এ দেশীয় ব্যক্তিদিগকে উন্নতির অবকাশ দান করিতে অনিচ্ছুক,রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই কলেজ দেশীয়দিগের অর্থে স্থাপিত হইলেও ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের প্রবেশের পথ রাজপুরুষেরা প্রথম অবধি যথাসাধ্য কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন। এখন ঐ কলেজে বাঙ্গালী ও মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষার্থীদিগের প্রবেশ সম্পূর্ণ রূপেই নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু ইহার পূর্বেও যখন সকল শ্রেণীর দেশীয় যুবকের ঐ কলেজে শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল, তখনও গভর্নমেন্ট তাহাদিগের প্রতি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই—তাহাদিগকে অবাধে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই।

প্রথমতঃ দেশীয় পরীক্ষায় যথারীতি পাশ করা হইত না। তাহার পর যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককেও চাকুরী দেওয়া হইত না। শ্রীযুক্ত নৌরজী মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে সময়ের মধ্যে ৯৬ জন শ্বেতাঙ্গ যুবক পাশ হইয়াছে ও তাহাদিগের ৮৬ জন বড় চাকরী পাইয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে দেশীয় যুবকদিগের ১৬

জনের ভাগ্যে পরীক্ষায় সাফল্য ও কেবল ৭ জনের ভাগ্যে চাকরী লাভ (তাহাও নিম্নশ্রেণীতে) ঘটিয়াছে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় ছাত্রদীগের বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে রবার্ট রিকার্ডেসের মন্তব্য কতদূর প্রযোজ্য, সে বিষয় যদি কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ কলেজেরই তদানীন্তন অধ্যক্ষ ল্যাঙ সাহেবের ১৮৭০-৭১ সালের রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন ঃ

That the Natives of this country, under favourable conditions one capable of excellence both as architects and builders, the beauty and solidity of many of the historical monuments of the country fully testify and that they could compete with the European skill in the choice and composition of building materials, may be proved by comparing an old terrace roof at Delhi or Lahore with an Allahabad gunshed or many a recent barrack.

ভাবার্থ—যথোচিত আনুকূল্য বা উৎসাহ পাইলে এ দেশীয় ছাত্রেরা যে ভাস্কর ও স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা এ দেশের ঐতিহাসিক স্মৃতি-স্তম্ভ ও মন্দিরাদির শিল্প-সুষমা ও দৃঢ়তা অবলোকন করিলে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়। তাহারা যে হর্ম্ম্যাদির উপকরণ-নির্বাচন ও তৎসমুদয়ের রাসায়নিক সংযোগ বিষয়েও ইউ-রোপীয়দিগের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ, তাহা দিল্লী বা লাহোরের যে কোনও পুরাতন সৌধ-শিখরের সহিত এলাহাবাদের অস্ত্রাগারের বা অধুনাতন কালে নির্ম্মিত অধিকাংশ সেনানিবাসের তুলনা করিলেই সপ্রমাণ হইবে।

সহৃদয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই মন্তব্য কর্তৃপক্ষের যে আনুকূল্যে এ দেশীয় ছাত্রদিগের বিশেষ উন্নতি ঘটিতে পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সে আনুকূল্য লাভ এ পর্যন্ত এদেশবাসীর ভাগ্যে ঘটিল না। আনুকূল্য লাভ দূরে থাকুক, এক্ষণে বোম্বাই ও বঙ্গদেশীয় যুবকদিগের রুড়কি কলেজে প্রবেশের পথও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মিঃ থ্যাকারের (৩৯পৃঃ) ও লর্ড লিটনের উক্তি (১০ পৃঃ) ভারতবাসীর স্মৃতিপথে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়া বিচিত্র নহে।

উচ্চপদে ভারতবাসী।

বৃটিশ ভারতীয় প্রজা কার্য্য-দক্ষতা প্রকাশের কত অল্প অবকাশ প্রাপ্ত হয়, নিম্নলিখিত তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১৯০৩ সাল

বিভাগ	বেতন	ইংরাজ-ফিরিঙ্গী		হিন্দু-মুসলমান	
শাসন বিভাগ	৫০০৲ ও তদধিক	১৯৭	২৪	২৫	২
কৃষি	৫০০৲ ও তদধিক	৩	—	—	—
আর্কিউলজি	৫০০৲ ও তদধিক	৬	—	১	—
ট্যাক্স	৫০০৲ ও তদধিক	১	—	১	—
পশু চিকিৎসা	৫০০৲ ও তদধিক	১২	—	—	—
বাণিজ্য শুল্ক	৫০০৲ ও তদধিক	৩১	৫	১	১
ইকনমিক প্রোডাক্ট	৫০০৲ ও তদধিক	২	—	—	—
শিক্ষা বিভাগ	৫০০৲ ও তদধিক	১১৪	৪	২৩	১
শিক্ষা বিভাগ	৫০০৲ সহস্রাধিক মুদ্রা	৪৮	—	১	—
আবগারী	সহস্রাধিক মুদ্রা	৫	—	২	—
পররাষ্ট্র বিভাগ	সহস্রাধিক মুদ্রা	৮	১	—	১
বন বিভাগ	৫০০৲ তদধিক	১৩৬	—	১	—
জিওলজিক্যাল সার্ভে	৫০০৲ তদধিক	৯	—	২	—
ইম্পিরিয়াল সার্ভিস					
সৈন্য	৫০০৲ তদধিক	১৫	—	—	—
যাদুঘর	৫০০৲ তদধিক	৩	—	—	—
জেলখানা	৫০০৲ তদধিক	৪১	—	৪	—
বিচার বিভাগ	৫০০৲ তদধিক	২৩৬	১৩	১৭৩	৩৪
ভূমি রাজস্ব	৫০০৲ তদধিক	৬৫৩	১৫	১৮০	৫১
চিকিৎসা (সিভিল)	৫০০৲ তদধিক	১৮২	১	১০	—
আবহাওয়া	৫০০৲ তদধিক	৪	—	—	—
সামরিক হিসাব	৫০০৲ তদধিক	৯	৫	—	—
সামরিক শাসন	৫০০৲ তদধিক	৩			

বিভাগ	বেতন	ইংরাজ-ফিরিঙ্গী	হিন্দু-মুসলমান		
খনি	৫০০ তদধিক	১০	—	—	—
টাকশাল	৫০০ তদধিক	৫	—	—	—
বিবিধ	৫০০ তদধিক		—	—	—
রাজনীতিক	৫০০ তদধিক	১৩৪	১	২	২
পোর্টব্লেয়ার	৫০০ তদধিক	৫	১	—	১
ডাক বিভাগ	৫০০ তদধিক	২৭	—	২	—
পূর্ত বিভাগ	৫০০ তদধিক	৩৩২	২৩	৫৭	২
পূর্ত বিভাগ	১২ শতাধিক মুদ্রা	৬১	—	—	—
অহিফেন	৫০০ তদধিক				
তোপখানা	৫০০ তদধিক	৪১	১	১	১
পাইলট	৫০০ তদধিক	১৬	—	—	—
পুলিশ	৫০০ তদধিক	২১	—	—	—
রেজিষ্ট্রী	৫০০ তদধিক	৩২১	২	৩	২
মেরিন্	৫০০ তদধিক	১	—	২	—
লবণ	৫০০ তদধিক	১৪	—	—	—
বৈজ্ঞানিক	৫০০ তদধিক	৩৫	২	১	—
ষ্ট্যাম্প	৫০০ তদধিক	২	—	৩	—
ষ্টেট রেলওয়ে	৫০০ তদধিক	২২১	২৪	৯	—
ষ্টেট রেলওয়ে	১২ শতাধিক মুদ্রা	৩২	২	—	—
ছাপাখানা	৫০০ তদধিক	৭	১	—	—
সাপ্লাই					
ট্রান্সপোর্ট	৫০০ তদধিক	২	—	—	—
সার্ভে	৫০০ তদধিক	২৯	১৩	—	—
	একুনে	২৮৮৮	১৩৯	৫০৪	৯৮

The Indian Textile পত্রিকার মতামতগুলি এখানে আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম। উদ্ধৃত বিষয়গুলি পড়লে ভাবান্তর না এসে পারে না। ইংরাজদের শাসন ও প্রচার শুনে আমরা নাবালগ ও কাঁচ খোকা হয়ে পড়েছিলাম। ইংরাজদের প্রচারের ভাবখানা ছিল এই, তোমরা অসভ্য

---

১. দেশের কথা, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১৫ সন, শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত, পৃঃ ৪৩—৪৬।

তোমরা কিছু জান না, তোমরা কিছু করতেও পারবে না। যা কিছু করার তা আমরাই করব। অথচ ইংরাজ ভারতবর্ষ দখল করার পূর্ব অবধি মোগল শাসনের ভারত শুধু ইংলন্ড নহে, ইউরোপের যে কোন শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির চেয়ে শিল্পে বাণিজ্যে সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় ছিল। এই সত্য ইতিহাসের পাতা খুললে স্পষ্ট ধরা পড়ে। অথচ একটা মহান সভ্য জাতিকে সব কিছু সভ্যতার পোষাক খুলে একবারে নাঙ্গা উলঙ্গ দিন হতে দিন দরিদ্র করে রাখা হয়েছিল। আমাদের প্রতিটি শিল্প ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এখানে নেট শিল্পের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। বাঙ্গালা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজও তৈরী করা হত। গুণগত দিক দিয়ে ইংলন্ডের তৈরী জাহাজ বার বৎসরের বেশী সমুদ্রে চলতে পারত না। কিন্তু ভারতবর্ষের তৈরী জাহাজ ৫০/৫২ বৎসর পর্যন্ত সমুদ্রে চলতে পারত। এ সব কথা ইংরাজদের লেখাতেই দেখতে পাওয়া যায়। ইংলন্ডের লোকেরা ওক গাছের তক্তা দিয়ে জাহাজ তৈরী করত। ভারতীয়রা তৈরী করত সেগুন গাছ দিয়ে। বাঙ্গালা ভারত অধিকার করার পর ওক গাছের পরিবর্তে সেগুন গাছ দিয়ে ইংরাজরাও পরে জাহাজ তৈরী করে। ভারতের জাহাজ গুণগত দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট হলেও ইংলন্ডের ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য বিগত ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসের The Indian Textile Journal পত্রে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেল কোম্পানীর জামালপুর স্থিত এঞ্জিনের কারখানার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

The finished locomotive, as we see it in the paint shop in its new decorations ready to take its place upon. The railway, is the best epitome of the capability of the native Indian craftsman. If he can build an E L R cos locomotive under European supervision from start to finish he can build any thing... The proverbial laziness of the Indian worker is not to be discerned in the busy shops of Jamalpur and the best evidence of Indian capacity for work when properly deserted and instructed is to be found in the "Lady Curzon" the new E. I. Railway express locomotive.

যদি জামালপুরের কর্মশালায় ভারতীয় শিল্পী রেল এঞ্জিন নির্ম্মাণের কার্য্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে নেট শিল্পের উন্নতি সাধনে তাহারা যে অসমর্থ হইবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু এ সকল উন্নতি সাধনে রাজশক্তির অনুকূলতা আবশ্যক। রাজশক্তির আনুকূল্য লাভ না করিলে, শ্যাম, জাপান ও জার্ম্মেনী শিল্প বাণিজ্যে ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় রাজশক্তি দেশীয় শিল্পোন্নতির প্রতিকূল। তাই ভারতের বহু শিল্পের বিলোপ ঘটিতেছে, প্রজাকুল অন্নের কাঙ্গাল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় শিল্প কুশল বিজ্ঞানবিদ সভ্যজাতির সংশ্রবে ভারতবর্ষের শিল্প কলা-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিবে, না, তাহার সমূল উচ্ছেদ ঘটিতেছে।[১]

আসামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার কটন সাহেব তাঁহার 'নব ভারত' (New India) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

The resources of India will vie with those of America itself. The dimensions of Indian trade are already enormous and yet no country is more poor than this.

ভারতের নৈসর্গিক সম্পদ (খনি, অরণ্য ও কৃষিজাত ধন) আমেরিকার অপেক্ষাও অধিক। এখানকার বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত; তথাপি ভারতের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই।

কেন এরূপ হইয়াছে ? ভারতভূমি রত্নগর্ভা হইলেও কেন তাহার সন্তানগণ ঘোর দারিদ্র্য ভোগ করিতেছে ? ইহার কারণ নির্দেশ স্থলে মিঃ ডিগ্‌বী বলিয়াছেন ঃ

Because among other things we have destroyed native industries, and besides, have taken from India since 1834-5 (according to a calculation made by that same and moderate Journal, the Economist, in 1898.)

More than ten-thousand millions of Rupees. India on the other hand, has entirely lost her much more than ten thousand millions; this, with interest, and its circulated in the ordinary

---

১. দেশের কথা, পঞ্চম সংস্করণ, কালকাতা, অগ্রহায়ণ—১৩১৫ সাল, পৃষ্ঠা ১৫৪।

way among her people, at 5 P. C. interest value only, would, by this time, have been of the value at least of fifty thousand millions of Rupees.

ভারতবাসীর দারিদ্র্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন শোষণ। আমরা (ইংরাজেরা) ভারতবর্ষীয় শিল্পের বিনাশ সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪/৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্যন্ত (ইকনমিস্ট পত্র সম্পাদকের গণনানুসারে) এক সহস্র কোটি মুদ্রা ভারতবাসীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছি। এই সহস্র কোটি মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত ও শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা সুদে ভারতবাসী কৃষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা যাইত, তাহা হইলে এতদিনে উহার পরিমাণ সুদসহ ন্যূনকল্পে পঞ্চসহস্র কোটি মুদ্রা হইত।

এতদ্ভিন্ন এ দেশে বিলাতী মহাজনদিগের বহু শত কোটি টাকা খাটিতেছে। উহার সুদ ও লভ্যাংশ-স্বরূপ এতদিনে কত টাকা বিদেশে গিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারিণ করা সহজসাধ্য নহে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৮৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহস্র কোটি মুদ্রা প্রেরিত হইয়াছে। আজকাল এ দেশ হইতে যে টাকা বিদেশে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। এই বিষয়ের তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রাজস্বে ও বিলাতী মহাজনের লাভে এ দেশ হইতে বৎসরে পঞ্চশত কোটি মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যে দেশ হইতে প্রতি বৎসর এরূপ অজস্র ধারায় বিদেশের অভিমুখে অর্থস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সে দেশে দশ কোটি লোক অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইবে, ইহা বিচিত্র নহে! দুর্ভিক্ষই বা সেই দেশবাসীর নিত্য-সহচর না হইবে কেন?[1]

আসামের ভূতপূর্ব কমিশনার, মিঃ কটন সাহেবের খোলামেলা সুচিন্তিত স্পষ্ট সত্য কথাগুলি ও তার দেওয়া টাকার হিসাবগুলি এবং ইংরাজেরা এদেশের শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে নূতন শিল্প গড়বার কোন চেষ্টা করেছে এসবই উপরিউক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু শোষণ আর শোষণ এই করা হয়েছে। পেষণ নির্যাতন এ সব কথা না হয় নাই বলা হল। আসল কথা হল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী ইংরাজরা সোনার থালা-বাটিতে দুধ, মধু খাওয়াবার জন্য আসে নি। যত প্রকারে পারে শোষণ

---

[1] দেশের কথা, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩১৫ সাল, পৃঃ ৩৩—৩৪।

করবার জন্য এসেছিল এবং তারা করেছিলও তাই। এসব সত্য কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সময়গুলিতেও ভারতবর্ষের দশ কোটি লোক ইংরাজ শাসনের মহিমার গুণে অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত ছিল। ইহা যতই পীড়াদায়ক হউক কিন্তু কথাটা সত্য। এ সম্পর্কে 'দেশের কথার' সুচিন্তিত লেখক মহাপণ্ডিত দেউস্কর মহাশয়ের প্রতিটি মতামতই প্রণিধানযোগ্য।

সহৃদয় পাঠকবর্গ, ইংরাজরা এদেশীয়দের কাজকর্ম শিক্ষা দিতে কি রকম ভাবে অনিচ্ছা পোষণ করে এসেছে তা উক্ত উদ্ধৃতির কথাগুলিতে প্রমাণিত হচ্ছে। যেখানে ইংরাজরা রাজশক্তি সেখানে তাদের উদ্যোগী হয়ে নব নব জ্ঞানের পথে এদেশবাসীদের আগ্রহী হয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল না কি ? এবং উপরের তালিকা (১৯০৩ সালের) দেখলে বুঝতে পারা যায় ইংরাজদের শেখাবার মনোবৃত্তি কি রকম ছিল। অবশ্য রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষের কথাগুলি হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ইংরাজরা আমাদের কোন কিছু শেখাতে ইচ্ছুক ছিল না। শুধু তাদের কেরানীগিরি চাকুরী করবার জন্য যতটুকু শিক্ষা দেওয়ার দরকার তাই তারা শেখাতে ইচ্ছুক ছিল। এদেশীয়দের উন্নতি হোক এটা—বিদেশী ইংরাজ গভর্নমেন্টের ছিল না। মোগল আমলে মুসলমান হিন্দু সকলেই উচ্চ হতে উচ্চতর রাজপদে বড় বড় পদগুলি পেয়ে এসেছেন। নিজেদের দেশ নিজেরা শাসন করেছেন এবং শুধু ইংলণ্ড নয়, ইউরোপের যে কোন দেশের থেকে সর্বদিক দিয়ে উন্নত ছিল তখনকার ভারতবর্ষ।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক এবং সুলেখক শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্করের নাম না জানা লোক দেশে অল্পই রয়েছে। মারাঠি হয়েও তাঁর বাংলা লেখা কত যে সুন্দর তা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সখারাম গণেশ দেউস্করের সুপ্রসিদ্ধ লেখার বহু তত্ত্বে সমৃদ্ধশালী লেখা হতে আমরা এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিয়ে ইংরাজ ও মোসাহেবদের মিথ্যা প্রচারনাকে অসার বলে প্রমাণ করতে চাই। আমরা এ সম্পর্কে অধিক কিছু না বলে, শ্রদ্ধেয় দেউস্করের লেখা কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলাম। উদ্ধৃতাংশটি শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'দেশের কথা' নামক গ্রন্থ (পঞ্চম সংস্করণঃ অগ্রহায়ণ ১৩১৫) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

দেশের অবস্থা

কহিতে বুক চায় দু'ভাগ হ'তে।
নয়নে উথলে জল-স্রোত শতে॥

ইংরাজ ত্রিবিধ সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয় করিয়া নির্বিঘ্নে শাসনদন্ডের পরিচালনা করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের সংগ্রামকে আমরা 'বাহুযুদ্ধ' নামে অভিহিত করিতে পারি। রাজনীতিক কূট কৌশলে ও অভিনব অস্ত্রশস্ত্রের বলে, ইংরাজ এ দেশে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রকারের সংগ্রামের ফল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইংরাজের আগমন কাল পর্যন্ত এ দেশে এইরূপ সংগ্রামই রাজ্যলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দেশবাসীর বাহুবল বিনষ্ট বা বিনত হইলেই এতদিন বিজেতারা সন্তুষ্ট হইতেন। এই কারণে এই প্রকার যুদ্ধকে 'বাহুযুদ্ধ' নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহাকে 'শারীর যুদ্ধ' নামেও আখ্যাত করিতে পারা যায়।

ইংরাজের এ দেশে পদার্পণের পর হইতে ভারতবাসী এক অভিনব সংগ্রামের পরিচয় প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে আহূত হইয়া তাহারা আপনাদিগের ধনবল হারাইল। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা 'বাণিজ্য সংগ্রামের' কথা বলিতেছি। বণিক রাজ ইংরাজের সহিত বাণিজ্য যুদ্ধে আমরা কতদূর বিপন্ন হইয়াছি, তাহা অনেকেরই সুবিদিত আছে। একশত বৎসর পূর্বে যে ভারতবর্ষ অশেষ শিল্প পণ্যের প্রধান উৎপত্তি স্থান ছিল, এশিয়া ও ইউরোপের বিপণী-শ্রেণী যাহার শিল্প সামগ্রীতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিয়া বৈদেশিকদিগের বিস্ময় ও অসূয়া উৎপাদন করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসীরা এখন সামান্য সূচীসূত্র ক্রীড়নক হইতে যন্ত্র-যানাদির উপকরণ পর্য্যন্ত—জীবন-যাত্রা ও সমাজযাত্রা নির্বাহোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের জন্য নিতান্ত দীনের মত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশে এক্ষণে ইংরাজের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ভারতবাসীর বাহুবল ও অস্ত্র-বল হ্রাসের সহিত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইংরাজের 'বাহু যুদ্ধ' ইদানীং স্থগিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদিগের বাণিজ্য সংগ্রামের অদ্যাপি বিরাম হয় নাই; কখনও হইবে কিনা, ভবিতব্য তাই বলিতে পারেন। বাষ্পীয় শকট, তাড়িত বার্ত্তাবহ, পণ্যবাহী অর্ণব পোত ও অবাধ বাণিজ্য নীতি—এই সময়ের

প্রধান অস্ত্র। প্রবল রাজশক্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শ্বেতাঙ্গ বণিক সমাজ এই সময়ের যুযুৎসু। দুর্বল ভারতবাসীর ধন হরণ ও ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যাদির বিনাশ ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই সংগ্রামে দিন দিন আমাদিগের ধনবল হ্রাস পাইতেছে। দুর্ভিক্ষ আমাদিগের নিত্যসহচর হইয়াছে। দেশ বৎসল কবি যথার্থই বলিয়াছেন ঃ

নিজ অন্ন পরে কর পণ্যে দিলে।
পরিবর্ত্তে ধনে দুরভিক্ষ নিলে।।

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, দুর্ভিক্ষের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক প্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, ইংরাজী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শত বৎসরের মধ্যে ভারতে চারিবারের অধিক দুর্ভিক্ষপাত হয় নাই। দুর্ভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই আবদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ দেশে ইংরাজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস ও আপনার আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর প্রথম পদে বা ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ কাল পর্যন্ত সমগ্র বৃটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষজনিত অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, উহার দ্বিতীয় পাদে পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এ দেশে সিপাহী বিদ্রোহে সংগঠন ও পরিণামে সমগ্র ভারতে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে দুর্ভিক্ষও আপনার শাসন এদেশে সুদৃঢ় করিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ খৃষ্টীয় ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৫৭ অব্দের মধ্যে বৃটিশ ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয়। তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী কঠোর যন্ত্রণায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের দুর্ভিক্ষ কাহিনী অধিকতর শোকাবহ। এই পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুর্ভিক্ষের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মহাপ্রাণী ভস্মীভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শুদ্ধ বিগত দশ বৎসরই এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারত সন্তান 'হা-অন্ন! হা-অন্ন!' করিয়া বিষম যন্ত্রণায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে,

'দুর্ভিক্ষ নিহত' হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মহামতি উইলিয়ম ডিগ, বি সি, আই. ই. মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছিলেন ঃ

You have died, you have died useless by
তোমরা মরিয়াছ, তোমরা অনর্থক মরিয়াছ।

সাধারণের বিশ্বাস যুদ্ধে যেরূপ লোক ক্ষয় হইয়া থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই ধারণার ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন হইবে। ডিগ্‌ভী মহাশয় দেখাইয়াছেন বিগত ১৭৯৩ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একশত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিগ্রহে সর্বসমেত ৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে ভারতে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে। তৃণাভাবে গো-মেষ মহিষাদি-যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ফলতঃ ভারতের দুর্ভিক্ষ-সর্ব-লোকের ভয়প্রদ মহাসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ংকর। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চিম ভারতে মাদ্রাজ অঞ্চলে ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষপাত হইয়াছে। ১৯০৬ সালের ২০ শে জুলাই মিঃ ওগ্রাডি নামক জনৈক সদস্য পার্লামেন্ট সভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বশুদ্ধ আটবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, ১৩১৩ সালে বঙ্গদেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার বিষময় ফল আমরা অদ্যাপি ভোগ করিতেছি।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "ভারতীয় দুর্ভিক্ষের সহিত ইংরাজের বাণিজ্য সংগ্রামের সম্বন্ধ কি? দেবতা বৃষ্টি না দিলে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে পুড়িয়া যায়। দেবতা বিরূপ হইলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে।" যাহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের সম্যক তত্ত্ব অবগত নহেন। এই বিশাল ভারতভূমির সর্বত্র কখনও এক কালে অনাবৃষ্টি হয় না—অন্ততঃ বিগত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে এরূপ অভাবনীয় ঘটনা কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ভারতের এক অংশে অনাবৃষ্টি হইলেও অন্য অংশে সুবৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। সুবৃষ্টি হইলেও ভারতবর্ষের এক-চতুর্থাংশ ভূমিতে এত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদিগের অনশন-মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্বত্র

রেলপথের বিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশের অন্ন অল্প সময়ের মধ্যে অন্য প্রদেশে প্রেরণ করাও এখন কষ্টসাধ্য নহে। রাজপুরুষেরা বলেন, দুর্ভিক্ষকালে অন্ন বহনের সৌকর্য্য বিধানের উদ্দেশ্যেই বহু ব্যয় ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া এ-দেশের সর্ব্বত্র রেলপথ নির্মাণ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইহা সত্ত্বেও ভারতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আসল কথা এই যে, শস্যাভাব ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। পৃথিবীতে এরূপ অনেক দেশ আছে যে, সেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে শস্যোৎপাদন যোগ্যভূমির পরিমাণ অতি সামান্য। বিলাতেই কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব অত্যন্ত অধিক। তথায় যে শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহাতে সমগ্র ইংলণ্ডবাসীর ৯১ দিনের অর্দ্ধেক উদর পূর্ত্তি হওয়া অসম্ভব। তথাপি বৎসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলণ্ডবাসীর অনশনে যাপন করিতে হয় না। জার্ম্মানীর অবস্থাও অধিকাংশে এইরূপ। তত্রত্য লোকদিগকে যদি স্বদেশোৎপন্ন শস্যের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে ১০২ দিন তাহাদিগের অন্নাভাব ঘটে। হল্যাণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া কৃষিকার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তথাপি সে সকল দেশে কখনও দুর্ভিক্ষপাত হইয়াছে, এইরূপ কথা শুনা যায় না।

সুতরাং দেশে শস্যাভাব ঘটিলেই যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এমন কথা বলা অসঙ্গত। প্রকৃতির নিষ্ঠুরতায় বা দৈবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে সভ্য জাতিমাত্রেই দূরদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর—১৬।।০ কোটি টাকার গোধূম ও তণ্ডুলাদি সমুদ্র পথে ঐ সকল দেশে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। ইউরোপীয় দেশসমূহের লোকেরা সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী দেশ হইতে শস্য সংগ্রহপূর্ব্বক সুখ ও স্বচ্ছন্দতা সহকারে কাল যাপন করে, আর ভারত সন্তান গৃহপার্শ্বে বিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে দলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করে।

ভারতবাসীর ধনবলের অভাবই এ দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটনার প্রধান কারণ। ভারতে অন্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব সমধিক প্রবল। ইংরাজের

বাণিজ্য সংগ্রামে জর্জ্জরিত হইয়া আমরা এইরূপ কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছি যে, এক বছর দৈব-দুর্বিপাকে ক্ষেত্রের শস্যক্ষেত্রে মরিয়া গেলে আমাদের আর আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। দেশের শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় কৃষিই এখন শতকরা ৮৫ জনের একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনাবৃষ্টি হেতু কৃষি নিষ্ফল হইলে লোকে এখন একেবারে সম্বলশূন্য হইয়া পড়ে। অন্য স্থান হইতে শস্য ক্রয় করিবার জন্য যেরূপ অর্থবলের প্রয়োজন, সেরূপ অর্থবল অনেকেরই নাই। দেশবাসীর নিকট যদি শস্য ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত তাহা হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মন গোধূম তণ্ডুলাদি বিদেশে রপ্তানি হইত কেন? লোকের তন্ডুল কিনিবার শক্তি থাকিলে দুর্ভিক্ষকালে কখনই রাজানুগ্রহজীবীর (পুওর হাউস বা সরকারী অন্নসত্রে ও রিলিফে আশ্রয় গ্রহণকারীর) সংখ্যা এত অধিক হইত না। পূর্বে দেশে শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু লোকের অর্থোপার্জ্জনের বহু পথ উন্মুক্ত ছিল। অর্থ-সঙ্গতি অধিক ছিল। তখন কৃষকের সংখ্যা অল্প ও কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় কৃষিকার্য্যেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। এই সকল কারণে সেকালে দেশে দুর্ভিক্ষপাত হইলেও তাহার পরিণাম এখনকার মত ভয়াবহ হইত না। বিগত আদমশুমারির রিপোর্টে দেখা যায়, ১৮৯১ সালে এ দেশে যত লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে তদপেক্ষা দুই কোটি অধিক লোক কৃষিকার্য্য করিতেছে অর্থাৎ ১০ বৎসর পূর্বে এই সকল লোক ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল, এক্ষণে সে সকল ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা নিরুপায় হইয়া কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আদম শুমারির রিপোর্ট অনুসারে ঐ দশ বৎসরে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ ১৯ হাজারের অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত কৃষিজীবীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, এমন কথা বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে একদিকে যেমন গত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ বাড়িয়াছে, তেমনই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের পরিচালিত অনেক কল-কারখানাও এ দেশে বাড়িয়াছে। এই সকল কারখানায় ঐ বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার অধিকাংশ মজুরী করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। সুতরাং ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যা যে দুই কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সহিত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির

সম্বন্ধ অতি অল্প। আদম শুমারির রিপোর্টেই প্রকাশ যে, ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালের মধ্যে ১৪ লক্ষ জন চটের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে। স্বর্ণকার, কাংস্যকার ও জহুরীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬১৯ কমিয়াছে। কার্পাস বস্ত্র বয়নকারী তন্তুবায়ের সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা ১১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৫০ কম হইয়াছে। মাংস, তৈল, গুড় ও শর্করা ব্যবসায়ীরও সংখ্যা হ্রাস ঘটিয়াছে। এই সকল লোক পূর্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদিগের অনেকেই যে কৃষি কার্য্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে পৈতৃক ব্যবসায় ছাড়িয়া কৃষিকর্ম গ্রহণে বাধ্য হওয়ায় কৃষকদিগের সংখ্যা দশ বৎসরে দুই কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কৃষিযোগ্য উৎকৃষ্ট ভূমির পরিমাণ সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় নাই। অন্যদিকে ইংরাজের সহিত বাণিজ্য সংঘর্ষ বিপন্ন হওয়ায় লোকের ধনবল দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। ফলে, দেশে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অর্থের দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হইলেই অন্নের দুর্ভিক্ষও বিরল হইবে।

১৮৮০ খৃস্টাব্দে আল-ক্রোমার মহোদয় গভর্নমেন্টের আদেশে ভারতবাসীর আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতিজনে ২৭ টাকা মাত্র; সেই সময় পার্শী-প্রবর শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজী মহাশয় প্রতিপন্ন করেন যে, বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদিগের বার্ষিক আয় গড়ে জনপ্রতি ২০ টাকার অধিক নহে। ইহার পর লর্ড ডাফ্‌রীনের আদেশক্রমে এ দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা সত্ত্বেও সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এ দেশের কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল, মিঃ ডিগ্‌বী মহোদয়ের চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল অংশে এ দেশের লোকের দুরবস্থার যে শোচনীয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, গত ১৯০১ সালের মার্চ্চ মাসে লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশ বৎসরের দুর্ভিক্ষাদি

জনিত অসীম ক্ষতি সত্ত্বেও ইদানিং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বার্ষিক আয় গড়ে জনপ্রতি অন্যূন ৩০ টাকা হইয়াছে। কিন্তু ডিগ্‌বী মহোদয় অশেষ শ্রম সহকারে তাঁহার মতের বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সরকারী গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। মিঃ ডিগ্‌বীর গণনা মতে এক্ষণে বৃটিশ শাসনাধীন ভারত সন্তানের বার্ষিক আয় গড়ে প্রতিজনে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় আঠার টাকা নয় আনা মাত্র।

এই আয়ের অধিকাংশই কৃষি লব্ধ। ইহার প্রায় এক-সপ্তমাংশ বা ২।৶০ রাজকর প্রদানে ব্যয়িত হয়। আয়ের অনুপাতে ইংলণ্ডবাসীকে প্রতি পাউণ্ডে ১ শিলিং ৮ পেন্স বা ১।০ টাকা ও ভারতবাসীকে (বার্ষিক আয় গড়ে ৩০৲ টাকা বলিয়া স্বীকার করিলে) দুই শিলিং ৪ পেন্স বা ১৸০ টাকা করিয়া ট্যাক্‌স দিতে হয়। সে যাহাই হউক, মিঃ ডিগ্‌বীর হিসাবে এ দেশের ধনী, দরিদ্র, বালক সকলের বার্ষিক আয় (ট্যাক্‌স বাদে গড়ে প্রতিজনে ১৫/১৬ টাকার অধিক নহে। সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর সঞ্চিত ধনের পরিমাণ নগদ ও অলংকারাদিতে গড়ে জনপ্রতি ১৪ টাকা মাত্র।

ইহার সহিত একবার শিল্প-বাণিজ্য প্রধান পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসীবৃন্দের আয়ের তুলনা করুন ঃ

দেশ	বার্ষিক আয়			দেশ	বার্ষিক আয়		
রাশিয়া	প্রতিজনে	১১	পাউণ্ড	জার্মানী	প্রতিজনে	২২	পাউণ্ড
ইটালি	,,	১২	,,	কানাডা	,,	২৬	,,
অষ্ট্রিয়া	,,	১৫	,,	ফ্রান্স	,,	২৭	,,
স্পেন	,,	১৬	,,	বেলজিয়াম	,,	২৮	,,
সুইজারল্যান্ড	,,	১৯	,,	যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন)		৩৯	,,
নরওয়ে	,,	২০	,,	অস্ট্রেলিয়া	,,	৪০	,,
হল্যান্ড	,,	২২	,,	স্কট্‌ল্যান্ড	,,	৪৫	,,

ইংলন্ডবাসীর বার্ষিক আয় ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি যথাক্রমে ৪২ ও ৩০০ পাউন্ড! (১৫ টাকায় এক পাউন্ড হয়)

উল্লিখিত আয়ের সহিত তুলনা করিলে লর্ড কার্জন বাহাদুরের নির্দ্দিষ্ট ভারতবাসী শিল্পজীবীদিগের (বার্ষিক ত্রিশ টাকা) আয়ও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে জীবিকা নির্বাহ

ভারতবর্ষের ন্যায় স্বল্প ব্যয়সাধ্য নহে—এ কথা স্বীকার করি। তথাপি ভারতবাসীর বর্তমান আয় যে স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকা নির্বাহের উপযোগী নহে—এ কথাও অস্বীকার করিতে পারা যায় না। লর্ড কার্জনের মতে ভারতীয় কৃষকের আয় গড়ে বার্ষিক ২০ টাকা। এই আয়ে তাহাকে চাষের খরচ ও খাজনা দিয়া সং বৎসরের অন্ন সংস্থান করিতে হয়। সরকারী কয়েদীদিগের কেবল খোরাকীর জন্য সরকার বাহাদুর বৎসরে প্রতিজনে গড়ে ২৪ টাকা করিয়া খরচ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভারতবর্ষে যাহারা জাল জুয়াচুরি, চুরি-ডাকাতি করিয়া জেলে যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা অন্ন-বস্ত্র বিষয়ে কৃষকদিগের অবস্থা অধিকতর হীন।[১]

ইংরাজ শাসন এদেশে প্রবর্ত্তিত না হইলে ভারতের অবস্থা বর্তমান সময়ে কিরূপ হইত, তৎসম্বন্ধে মেকলে ও হান্টার সাহেবের আনুমানিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ ইতঃপূর্বে করিয়াছি। পাদরী সন্ডারল্যান্ডের উক্তিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ বিষয়ে বরোদার সুশিক্ষিত মহারাজ শ্রী সয়াজী রাও মহোদয়ের মত কিরূপ, তাহাও উল্লেখযোগ্য। পূর্বোক্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশনের বক্তৃতা প্রসঙ্গেই তিনি বলেন:

> The subject requires delicate handling from me, because the least mistake may be misunderstood ... .I think if the British and French Government had not come on the scene, it would have been an interesting problem which it is now useless to discuss. what would become of Inida—wheather many of the states would have vanished, wheather some of them would have established a supremacy over other or wheather they would have been formed into United States, some thing like those of America.

ইংরাজ ও ফরাসী ভারতের রণ-ক্ষেত্রে আবির্ভূত না হইলে হয় এদেশের খণ্ডরাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটি অবশিষ্টগুলির উপর প্রভুত্ব স্থাপন

---

[১] সখারাম দেউস্করের গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ ১৩১৫ অর্থাৎ ১৯০৮ সনে প্রকাশিত। অতএব উদ্ধৃতাংশে বিভিন্ন দেশের মাথাপিছু যে তুলনামূলক আয়ের তালিকা দেওয়া হইয়াছে তা আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর পূর্বের সময়ের—লেখক।

করিত, না হয় অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়া কয়েকটি বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত, অথবা সমস্ত খণ্ডরাজ্যের সমবায়ে কিয়দংশে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ন্যায় এদেশেও একটি বিশাল যুক্তরাজ্য গঠিত হইত—ইহাই মহারাজ শ্রী সয়াজি রাওয়ের অনুমানিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংসের আশংকা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যমূর্তি ধারণ করিল। সে যাহা হউক, বঙ্গের যে সকল মনীষী সিরাজদ্দৌলার ঔদ্ধত্য দর্শনে বিচলিত হইয়া তাঁহার পদচ্যুতির জন্য অসাধারণ কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইংরাজ বণিকের হস্তে লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয়ের অমানুষিক দুর্দ্দশা দর্শন করিয়াও বিচলিত হন নাই। কোম্পানীর ভৃত্যেরা অত্যাচার প্রিয়তায় সিরাজকে পরাজিত করিয়াও কিরূপে বঙ্গের প্রধান ব্যক্তিগণের বিরাগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য।

কিন্তু বঙ্গবাসী শিল্পী সমাজের দুর্দৈব ঘুচিল না। কারণ কোম্পানীর ডিরেকটারেরা ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে ১৭ই মার্চের আদেশপত্রে এখানকার কর্মচারীদিগের প্রতি অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহারা বলিলেন, 'বঙ্গের সমস্ত রেশম শিল্পীদিগকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। অতঃপর কেহ যাহাতে স্বগৃহে স্বাধীনভাবে পট্টবস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে না পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কোম্পানীর শিল্পশালায় (ফ্যাকটরীতে) গিয়া কার্য করিতে শিল্পীদিগকে বাধ্য করিতে হইবে। যাহারা স্বাধীনভাবে রেশম শিল্পের ব্যবসা করিবে, তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। এই অত্যাচারমূলক আদেশ প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে বঙ্গীয় রেশম শিল্পের ধ্বংস সাধন ও ইংলন্ডের ইংরাজ শিল্পীদিগের উন্নতির পথ প্রসার, এ কথা দশম বর্ষীয় বালকেও বুঝিতে পারে।

দীর্ঘকাল ব্যাপী এইরূপ অকথ্য অত্যাচারের ফলে এ দেশের শিল্প বাণিজ্যের এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরাজ বণিকেরা বৈধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এই প্রকার পাশব বলের সাহায্যে ভারতবর্ষীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন, এ দেশবাসীর অপরিমেয় ধন-সম্পত্তি অন্যায়পূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া ইংলন্ডীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন

করিয়াছেন। ইউরোপের অধিকাংশ সভ্যতাভিমানী জাতি এইরূপে পরস্বাপহরণ করিয়াই বর্তমানে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।[১]

দেশীয় শিল্পের ধ্বংস

The cotton and silk goods of India up to the period (1813 A.D.) could be sold for a profit in the British market at price from 50 to 60 percent. lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 and 80 percent. on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills Paisly and Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion. "even by power of steam." They were created by the sacrifice of the Indian manufactures. Had India been independent She would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self defence was not permitted her; She was at the mercy of the stranger.

---

[১] Much of modern European national prosperity is based upon the plunder of nations representing ancient civilisations. Spain robbed South America; England from Elezabeth to cromwell seized as many of the Lusitanian treasure ships on their way to Spain as she could and apropriated what they carried.

England's indurstrial supremacy owes its origin to the vast hoards of Bengal and the cornatic treasure being made available for her use. Before Plassy was fought and own. and before the stream of treasure began to flow to England the industries of our country was at a very low ebb. Lancashire spinning and weaving were on a pan with the corresponding industry in India so far as machinary was concerned, but the skill which made Indian cotton or marvel of manufacture was wholly wanting in any of the western nations. As with cotton so with iron, industry was in Britanian at a very low ebb, alike in mining and in manufacture. Modern England has been made great by Indian wealth, wealth never profferred by its possessor but always taken by the might or skill of the stranger.

Prosperious British India

British goods were forced upoon her without paying any duty and the foreign manufacturer employed "the arm of political injustice" to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended or equal terms. —Mill's History of British India : Wils

অর্থাৎ ভারতীয় কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্রাদি ১৮১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিলাতের বাজারে, বিলাতী শিল্পীদিগের নির্মিত পণ্য অপেক্ষা শতকরা ৫০/৬০ টাকা কম মূল্যে বিক্রীত হইত। এই কারণে বিলাতী শিল্প পণ্যের রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় পণ্যের উপর শতকরা ৭০/৮০ টাকা শুল্ক স্থাপন করা বা উহাদের বিক্রয় নিষিদ্ধ করা ইংরাজদিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। ইংরাজরা যদি এইবার ভারতীয় পণ্যের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন ও উহার আমদানী রহিত করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তাহা হইলে পায়েস্‌লি ও ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত—এমনকি, বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে কলগুলি চালাইলেও উহা লাভজনক হইত কিনা সন্দেহ। ঐ কলগুলি চালাইবার জন্য ভারতীয় শিল্পের ক্ষতিসাধন করিতে হইয়াছিল। ভারতবাসীর যদি স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর স্বেচ্ছামত গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া আপনাদিগের লাভজনক শিল্প ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিত।

কিন্তু এই আত্মরক্ষার অধিকার হইতেও ইংরাজ ভারতবাসীকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে এ বিষয়ে বৈদেশিকদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। বিলাতী পণ্য সামগ্রীসমূহ বিনা শুল্কে ভারতে আনিয়া ইংরাজেরা ভারতবাসীকে উহা ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ভারতীয় শিল্পীদিগের সহিত সরলভাবে প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া বিলাতী শিল্প ব্যবসায়ীরা রাজনীতিক কূটাস্ত্রের সাহায্যে প্রথমে তাহাদিগের দমন ও পরিশেষে শ্বাসরোধপূর্বক বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

—অধ্যাপক উইলসন সম্পাদিত মিল সাহেবের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস

যাঁহারা মনে করেন, বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে নির্মিত পণ্য সামগ্রীর

সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই আমাদিগের স্বদেশী শিল্পীগণের হস্ত কৌশলে নির্ম্মিত পণ্য ক্রমশঃ পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ঐতিহাসিক উইলসনের উপরি উদ্ধৃত উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে, আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ইতঃপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে শ্বেতাঙ্গ বণিকদিগের ভীষণ অত্যাচারে বঙ্গের শিল্পী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিতান্ত জর্জ্জর হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর কর্ত্তারা সে সকল জুলুম বন্ধ করিয়া অভিনব অত্যাচারের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদিগের আদেশে বঙ্গ দেশের অধিকাংশ শিল্পী স্বাধীনভাবে বস্ত্রাদি বয়ন করিবার অধিকারে বঞ্চিত হয়।

এই সকল অত্যাচারে বঙ্গীয় শিল্প বাণিজ্যের বহু পরিমাণে অবনতি হইলেও সম্পূর্ণ বিনাশ হয় নাই। দীর্ঘকাল অত্যাচার সহ্য করিয়াও বঙ্গীয় শিল্পীগণ যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেন, তাহা সেখানকার বাজারে বিলাতী শিল্পীদিগের নির্ম্মিত পণ্য অপেক্ষা শতকরা ৫০্—৬০্ টাকা কম মূল্যে বিক্রয় করিলেও যথেষ্ট লাভ থাকিত। ইংরাজ বণিকরা ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা একদিকে ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া ও অপরদিকে বিলাতী মাল বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে বিলাতী মালের কাট্‌তি বাড়িতে পারে, তাহাই তাঁহাদিগের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্সের আদেশে গঠিত একটি কমিশনে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস, স্যার টমাস মনরো, স্যার জন্ ম্যালকম, জন ষ্ট্রাচী-প্রভৃতির ন্যায় ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতে লাগিল ঃ

From your knoweldge of the Indian character and habits are you able to speak to the probability of a demand for European Commodities by the population of India, for their own use.

অর্থাৎ ভারতবাসীর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আপনাদিগের যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনারা কি বলিতে পারেন যে,

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের পক্ষে তাহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য ইউরোপীয় পণ্য সামগ্রীর ক্রয় করিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না ?

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষীদিগের সকলেই বলিলেন, ভারতবর্ষজাত দ্রব্যেই ভারতবাসীর সকল অভাব দূরীভূত হইয়া থাকে। তাহারা আদৌ বিলাসপ্রিয় নহে। ভারতীয় শ্রমজীবীরা মাসে তিন চারি টাকার অধিক আয় করিতে পারে না। ফলকথা, ভারতবাসীর নিকট বিলাতী দ্রব্যের আদর হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।' টমাস মনরো মহোদয় সেই সময়ে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছিলেন, 'ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিলাতী পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। একখানি ভারতীয় শাল আমি সাত বৎসর কাল ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবহারেও উহার বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি ইউরোপীয় শাল বিনামূল্যে উপঢৌকন স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যবহার করিতে চাহি না।

এইরূপ নৈরাশ্যজনক উত্তর পাইয়াও বিলাতী বণিক সমাজ নিরস্ত হইলেন না। তাঁহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া রাজশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া উহার শক্তি নাশ করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। ইতঃপূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে বস্ত্র বয়নাদি কার্য নানাস্থানে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর বিলাতে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ টাকা কর বসান হইল। এদিকে ভারতে আমদানী বিলাতী কাপড় বিনা শুল্কে-দেশের সর্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। এইরূপ গর্হিত আচরণে লজ্জিত না হইয়া ইংরাজ বণিকেরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেন, 'ইহা কোনও ক্রমেই দূষ্য নহে। আমরা ইহাকে আমাদিগের স্বদেশীয় পণ্যের শ্রীবৃদ্ধি-নামক 'রক্ষাশুল্ক' বলিয়া মনে করি ঃ

(We) look upon it as a protecting duty to encourage our own manufactures.

মালাবার অঞ্চলের ক্যালিকো নামক ছিটের কাপড় পূর্বে বিলাতে বহু পরিমাণে রপ্তানী হইত। ১৬৭৬ সালে বিলাতে প্রথম এই কাপড় প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃস্টাব্দে এই শিশুশিল্পের সহায়তাকল্পে তন্তুবায়দিগের আবেদনে ভারতবর্ষীয় ক্যালিকো ছিটের

ও রেশমী কাপড়ের আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া পার্লামেণ্ট মহাসভা এক আইন পাস করিলেন :

The parliament passed two acts—called by Sir George Bird Wood 'the scandalousl aw of 1700'—which both obtained the Royal assent on the 11th of April, by which it was enacted 'that from and after the 29th day of September, 1701, all wrought silks and stuffs mixed with silk or herba, of the manufacture of China Persia, of the East India, and all calicoes painted or stained there, which are or shall be imported into this kingdom, shall not be worn or otherwise used in Great Britain; and all goods imported after that day shall be ware housed or exported again. —W. W. Hunter

ইহার ভাবার্থ এই যে, খৃষ্টীয় ১৭০০ সালে পার্লামেন্ট দুইটি বিধান বিধিবদ্ধ করেন। এই বিধান দুইটিকে স্যার জর্জ বার্ডউড '১৭০০ সালের কলঙ্ককর আইন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বর এই উভয় আইনেই ঐ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে অনুমোদন করেন। এই আইন অনুসারে ১৭০১ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গদেশ ও চীন দেশে প্রস্তুত সর্ব প্রকার রেশম পণ্যের ভারতীয় ক্যালিকো বস্ত্রের ও সর্ববিধ ছিটের বিলাতে আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ মাল আমদানী হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ভারতে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, ইহাও এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

অতঃপর ভারতীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গগজে তিন পেন্স বা দেড় আনা করিয়া শুল্ক স্থাপিত হইল। সেই সঙ্গে সাদা ক্যালিকোর উপরও আমদানী শুল্ক বসান হইল। দুই বৎসর পরে বিলাতী তন্তুবায়দিগের অনুরোধে পার্লামেন্ট ক্যালিকো ছিটের শুল্ক দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতিগজে তিন আনা করিলেন। ১৭২০ সালে আইন হইল, ভারতীয় ক্যালিকো বিলাতে যাহারা বিক্রি করিবে, তাহাদিগকে ২০ পাউণ্ড বা দুইশত টাকা ও উহার ব্যবহারকারীকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করা হইবে।[১]

অন্যান্য পণ্যের উপর কিরূপ শুল্ক গৃহীত হইত : দেখুন—

ঘৃতকুমারী শতকরা ৭০৲ হইতে ২৮০৲

---

[১] Useful Arts Manufactures of Great Britain pp. 363

হিঙ্গু	”	২৩৩৲	”	৬২২৲
এলাচি	”	১৫০৲	”	২৬৬৲
কাফি	”	১০৫৲	”	৩৭৩৲
মরিচ	”	২৬৬৲	”	৪০০৲
চিনি	”	৯৪৲	”	৩৯৩৲
চা	”	৬৲	”	১০০৲
ছাগ লোম জাত পণ্য		৮৪৷৷৵		
মাদুর ” ”		৮৪৷৷৵		
মসলিন ” ”		৩২৷৷		
ক্যালিকো শতকরা		৮১৲		
কার্পাস প্রতি মণে প্রায়		১৫৲		
কার্পাস বস্ত্র শতকরা		৮১৲		
লাক্ষা		৮১৲		
রেশম		২৸০, তদভিন্ন প্রতিসের ৪৲		

একে কোম্পানীর কুঠিতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল পূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করায় দেশীয় কারখানাগুলির লোকসান হইতেছিল, তাহার উপর দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিখিত প্রকারে উচ্চহারে শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় এখানকার শিল্প বাণিজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। এইরূপ গর্হিত উপায়ে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ সংসাধন করিয়া এদেশে বিলাতী মালের প্রচলন করা হইল। ফলে ১৭৯৪ খৃস্টাব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের অধিক বিলাতী কার্পাসজাত বস্ত্রের আমদানী হয় নাই, ১৮০৯ খৃস্টাব্দে সে ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের শুদ্ধ বিলাতী কাপড়ের আমদানী হইল। এই প্রকারে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বিলাতী মালের খরস্রোত প্লাবিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। দেশীয় শিল্প জাতের অবনতির বেগ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানীর হিসাব ঃ

তুলা

১৮১৮ খৃঃ	১,২৭,১২৪ গাঁইট
১৮২৮ খৃঃ	৪,১০৫ গাঁইট

কাপড়

১৮০২ খৃঃ	১৪,৮১৭	গাঁইট
১৮২৯ খৃঃ	৪৩৩	গাঁইট

লাক্ষা

১৮২৪ খৃঃ	১৭,৬০৭	মণ
১৮২৯ খৃঃ	৮,২৫১	মণ

কিন্তু নীলের ও কাঁচা রেশমের রপ্তানী বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে গুরুতর শুল্কের জন্য ভারতবর্ষের রেশমী কাপড়ের প্রতিপত্তি বিলাতে হ্রাস পাইতে লাগিল।

এই সময়েও আবেদন নিবেদনের ত্রুটি হয় নাই। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ঐ অবৈধ কর লাঘব করিবার জন্য অনেকবার পার্লামেন্টে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ রাম গোপাল ঘোষ দেশীয় শর্করাদির শুল্ক হ্রাস করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কতিপয় ইংরাজ বণিকও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ' নীতির অনুসরণ করিলেন।

১৮১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত একমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই ভারতে মাল আমদানী-রপ্তানী করিতেন। ঐ অব্দ হইতে ইংলণ্ডের সকল বণিকেরাই ভারতে ব্যবসায় করিবার অধিকার লাভ করিলেন। সুতরাং বিলাতী মালে ভারতবর্ষের হাট বাজার ক্রমেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৮২৯ খৃস্টাব্দে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬৫ ॥. লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে ছয় কোটি টাকার বিলাতী মাল ভারতে আমদানী হইল।

ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য নাশের জন্য কোম্পানী বাহাদুর পূর্ব্ব কথিত গর্হিত উপায়াবলীর অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ভারতের দেশীয় শিল্পের উপর গুরু করভার স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান হয়, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা ২ ॥. টাকা কর দিয়া বিক্রয় হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৭ ॥. টাকা কর দিতে বাধ্য হইতেন। দেশীয় চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহাদের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা শুল্ক আদায় করিতেন। দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেক্ষা

শতকরা ৫৲ টাকা অধিক কর আদায় করা হইত। এইরূপে ভারতের প্রায় ২০৫ প্রকার বিভিন্ন পণ্যের উপর অতি গর্হিত অন্তর্ব্বাণিজ্য কর (Inland duties) সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত এই প্রকার উচ্চহারে করদান করিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ী দল অবনতির নিম্নস্তরে পতিত হইলেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এই সকল অত্যাচারে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী কমিতে লাগিল। আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পর্তুগাল, মরিচ দ্বীপ ও এশিয়া খণ্ডের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পীর সম্বন্ধ হ্রাস পাইতে লাগিল। ১৮০১ খৃস্টাব্দে এদেশ হইতে আমেরিকায় ১৩,৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খৃস্টাব্দে উহার পরিমাণ কমিয়া ২৫৮ গাঁইটে পরিণত হইল। ১৮০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ডেনমার্কে ন্যূনাধিক ১,৪৫০ গাঁইট কাপড় রপ্তানী হইত; কিন্তু ১৮২০ সালের পর ঐ দেশে ১৫০ গাঁইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানী হয় নাই। ১৭৯৯ খৃঃ ভারতের শিল্প ব্যবসায়িগণ ৯,৭১৪ গাঁইট কাপড় পর্তুগালে পাঠাইয়াছিলেন; ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের পর আর তাহারা ১০০০ গাঁইটের অধিক কাপড় পাঠাইতে পারেন নাই। ১৮২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরব ও পারস্য সাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশে ৪ হাজার হইতে ৭ হাজার গাঁইট কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইত; কিন্তু ১৮২৫ খৃস্টাব্দের পর ঐ সকল অঞ্চলে ২ হাজার গাঁইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেরিত হয় নাই। মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে বঙ্গদেশীয় তন্তুবায়গণ ছয় কোটি স্বদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বৎসর ১৫ কোটি টাকার বস্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ইদানীং তাঁহারা বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রপ্তানী করিতে পারেন না। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ে বাধাদান করিয়া ইংরাজ এদেশের শিল্প বাণিজ্যের কিরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, এই সকল অংক হইতে তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলাতে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে অর্থনীতিবিদগণের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল বটে, কিন্তু ভারতের শিল্প ব্যবসায় যতদিন সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইল, ততদিন বৃটিশ বণিক সমাজ অবাধ বাণিজ্য নীতির অবলম্বনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ১৮০৬

খৃষ্টাব্দে ভারতে অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক তিরোহিত হয়। কিন্তু তখন দেশীয় বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের শরীর শোণিত শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যদিকে রেলপথ বিস্তারে দেশের নৌ-জীবী ও যান ব্যবসায়ীদিগের সর্বনাশ সাধিত হইল, সুদূর পল্লিগ্রামেও বিলাতী মাল অপ্রতিহত বেগে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

ডাঃ বুকানন কোম্পানীর আদেশে উত্তর ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার তদন্তে প্রকাশ পায় যে, পাটনা জেলায় ধানের দর টাকায় ১৮. মণ ছিল, ২৪০০ বিঘা ভূমিতে তুলার ও ১৮০০ বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ হইত। ৩,৩০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক কেবল সূত্র কর্ত্তন ব্যবসায়ে জীবিকা নির্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘটিকা মাত্র কার্য করিয়া তাহারা সংবৎসরে ১০.৮১,০০৫ টাকা লাভ করিত। ইংরাজের অত্যাচারে সূক্ষ্ম সূত্রের রপ্তানী হ্রাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ের অবনতি ও জীবনযাত্রা কণ্টকর হইতে লাগিল। তন্তুবায়েরা বস্ত্র বয়ন করিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৭॥. লক্ষ টাকা রোজগার করিত। ফতুহা, গয়া, নওয়াদা প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ রমণী বৎসরে ১২॥ লক্ষ টাকার সূতা কাটিত। ঐ জেলায় ৭,৯৫০টি তাঁতে বৎসরে ১৬,০০,০০০ টাকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন কাগজ, গন্ধ দ্রব্য, তৈল, লবণ ও মদ্যাদির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল।

ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ৮৭॥-সের ছিল। ঐ জেলায় ১২,০০০ বিঘা জমিতে কার্পাসের কৃষি হইত। তসর বুনিবার ৩,২৭৫ তাঁত ও কাপড় বুনিবার ৭,২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫,৬০০ স্ত্রীলোক চরকা কাটিয়া দিনপাত করিত; তথায় ৬,১১৪ তাঁত চলিত এবং ২০০ হইতে ৪০০ পর্যন্ত নৌকা প্রতি বৎসর নির্ম্মিত হইত। তদ্ভিন্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯,০০০ বিঘা পাট, ২৪,০০০ বিঘা তুলা, ২৪,০০০ বিঘা ইক্ষু, ১৫,০০০ বিঘা নীল ও ১,৫০৭ বিঘা তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাভী ও বলদ ছিল। উচ্চ বর্ণের বিধবা ও কৃষক রমণীগণ সূতা

কাটিয়া বার্ষিক (ব্যয় বাদে) ৯,১৫,০০০ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। পাঁচ শত ঘর রেশম ব্যবসায়ী বৎসরে ১,২০,০০০ টাকা লাভ করিত। তন্তুবায়েরা বার্ষিক ১৬,৭৪,০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে সূচী শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। সুতায় ও কাপড়ে নানা রকমের রং করিয়াও বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। পূর্ণিয়া জেলার রমণীগণ প্রতি বৎসর গড়ে আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে সুতা প্রস্তুত করিতেন তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্তুবায়দিগের ৩,৫০০ তাঁতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১॥০ লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতভিন্ন ১০,০০০ তাঁতে মোটা কাপড় বুনিয়া তাহারা ৩,২৪,০০০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্জি, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। এ স্থলে স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সে কালের টাকার মূল্য (ক্রয়শক্তি) এখনকার অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

এই সকল জেলার অবস্থা হইতেই সেকালে সমগ্র দেশে শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার কিরূপ ছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।১

---

১. বৃদ্ধদিগের মুখে শোনা যায় যে, এদেশে বিলাতী সুতা চালাইবার জন্য কোম্পানীর লোকে সূত্র ব্যবসায়জীবিনী রমণীদিগের 'চরকা' ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। স্থান বিশেষে চরকার উপর গুরুতর কর স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রামে কোম্পানীর লোক আসিতেছে শুনিলে, রমণীরা পুষ্করিণীর জলে চরকা ডুবাইয়া লুকাইয়া রাখিতেন বলিয়াও শুনা যায়। ঐ সকল প্রবাদ যতদুর সত্য হউক, চরকার উপর গুরুতর কর স্থাপন মূলক কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্লভ নহে ; যথা :

"Francis—Carnac Brown had beeo born of English parents in India and like his father had considerable experience of the Cotton Industry in India. He produced an Indian Charka or spinning wheel before the select committee and explained that there was an oppressive Motarfa tax which was levied on every Charka, on every house, and upon every implement used by artisans. The tax prevented the introduction of saw-grins in India"

—India in the Victorian Age. p. 135

সেকালের বিলাতী তন্তুবায়েরা কাপড়ের পাড় বুনিতে জানিত না। সে বিদ্যা তাহারা ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় তাতিদিগের নিকট হইতেই শিখিয়া যায়। প্রথম প্রথম যে সকল বিলাতী কাপড় এদেশে আমদানী হইয়াছিল, তাহার পাড় এরূপ কদর্য হইত যে, এখানকার লোকে তাহা কখনই ব্যবহার যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না।

ইংরাজ বণিকের স্বার্থপরতায় দেশের এই বিশাল বাণিজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে, তাই এখন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকে 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।

এই ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ 'হিতবাদী' সংবাদপত্রে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এ স্থলে উদ্ধারের যোগ্য, "কোম্পানীর অত্যাচারে ক্রমে যখন বিলাতী কাপড় উৎকর্ষে দেশীয় বস্ত্রের তুল্য হইতে লাগিল, তখন এ দেশের অনেক লোক বিস্ময় সহকারে বলিয়াছিলেন 'এ কাপড় ত বিলাতী বলিয়া চিনিবার যো নাই। এ যে ঠিক দেশীয়ের মত হইয়াছে।" আজ আমরা ভাল দেশী কাপড় দেখিলে বলি 'ইহা ঠিক বিলাতীর মত হইয়াছে'। হায়! শত বৎসরে এ দেশীয় ও বিলাতী বস্ত্রশিল্পের কিরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়াছে।

এইরূপে বঙ্গের বস্ত্রশিল্প নষ্ট হইল। একদিকে তন্তুবায়, অন্যদিকে বঙ্গীয় বিধবা সমাজে ক্রন্দনের রোল উঠিল। সূত্র নির্মাণ ব্যবসায় হারাইয়া বঙ্গীয় বিধবাগণ সত্য সত্যই নিরাশ্রয়া ও আত্মীয়গণের একান্ত গলগ্রহ হইয়া পড়িলেন। আমরা ইংরাজী শিক্ষায় মতিভ্রান্ত হইয়া বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্তন পূর্বক তাঁহাদের দুঃখ মোচনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যগ্র হইলাম। ক্রমে ইংরাজের অনুকরণে ও বিলাতী বিলাস দ্রব্যে আমাদিগের লোভ বাড়িতে লাগিল। দেশের শিল্পীদিগের অবস্থা কি হইবে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া আমরা সর্বপ্রকারে বিদেশীয়ের প্রতি অনুরক্ত হইতে লাগিলাম। আমরা ভাবিতে লাগিলাম, আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে সভ্য হইয়া উঠিতেছি। আমাদের মোহান্ধকার দূর হইতেছে, কিন্তু জগতের প্রকৃত সভ্য জাতি-সমূহ বুঝিলেন যে বাঙ্গালী ক্রমেই ঘোরতর অসভ্য হইতেছে। কারণ তাঁহাদিগের মতে যে জাতি যে পরিমাণে আপনার অভাব আপনি মোচন করিতে পারে সে জাতি সেই পরিমাণে সভ্য আর যে যতটা পরের উপর নির্ভর করে সে ততটা অসভ্য। ইংরাজী শিক্ষার মোহে পড়িয়া আমরা এই সার সত্যটুকু প্রথমে বুঝিতে পারি নাই।

ঐতিহাসিক উইলসন যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতীয় পণ্যের বিলোপ সাধনের জন্য এইরূপ গর্হিত উপায়াবলী অবলম্বিত না হইলে, ম্যাঞ্চেস্টার ও পায়েসলের কাপড়ের কলগুলি অংকুরেই বিনষ্ট হইত; এমন কি,

সেই কলগুলিকে বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যেও পুনরায় পরিচালিত করা সহজসাধ্য হইত না। ফলতঃ ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের বিনাশ সংসাধন করিয়াই বিলাতী কলগুলিকে সজীব রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত তাহা হইলে সে এই বাণিজ্য সংঘর্ষে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপন করিয়া স্বদেশীয় লাভজনক শিল্পসমূহের রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ন্যায্য অধিকার ইংরাজ ভারতবর্ষকে প্রদান করেন নাই—ভারতবাসীকে বৈদেশিক বণিক সম্প্রদায়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

ইংরাজ যদি রাজশক্তির সাহায্যে এদেশবাসীর শিল্প-বুদ্ধি বিকাশের পথ রুদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে বহুদিন পূর্বেই ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদির সাহায্যে বিবিধ শিল্পজাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতবাসী সর্বপ্রথমে বিজ্ঞানসম্মত অভিনব যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ না হইলেও যে অন্যান্য পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় উহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। ভারতবাসী অনুকরণ ক্ষমতায় পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। তথাপি ভারতীয় আর্য সন্তানেরা যন্ত্র বিজ্ঞানে সকলের পশ্চাদ্বর্তী। ইহার একমাত্র কারণ—ভারতের রাজশক্তি এ বিষয়ে ভারতবাসীর একান্ত প্রতিকূল। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করণার্থ এ স্থলে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করা হইতেছে।

অনেকে অবগত আছেন, ইংরাজ সর্বপ্রথম দীপ শলাকার (দিয়াশলাই) উদ্ভাবন করেন; এক সময়ে পৃথিবীতে ব্যবহৃত দীপ শলাকার দশ ভাগের নয় ভাগ এক ইংলণ্ডেই প্রস্তুত হইত। কিন্তু আজ ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন ও জাপানের দিয়াশলাই ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিয়াছে। এখন এক ফ্রান্স দেশ হইতে ইংলণ্ডেই ৩৬,০০,০০,০০০ বাক্স দিয়াশলাই আমদানী হইয়া থাকে। ইংলণ্ড 'টাইপ রাইটার' উদ্ভাবন করিলেও জগতে আজ মার্কিন দেশীয় 'টাইপ রাইটারই' সর্বত্র সমাদৃত। তাহার পর লেড (বা উড) পেন্সিল, পিয়ানো ও ঘড়ির ব্যবসায়ের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন, এক্ষেত্রেও ইংরাজ উদ্ভাবনু কর্তা; কিন্তু মার্কিন, জার্মান ও সুইস

জাতিই এ শিল্পের বাণিজ্যে এক্ষণে একাধিপত্য করিতেছেন। এখন ইংলণ্ডেই বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে পিয়ানো, ঘড়ি ও পেন্সিল আমদানী হইয়া থাকে। সীবন যন্ত্র বা সেলাইয়ের কল সম্বন্ধেও সেই কথা—এক জাতি উহার উদ্ভাবন করিয়াছে, কিন্তু অন্য জাতি উহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বয়ং ইংরাজরাই ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সমর-পোত-নির্মাণ বিদ্যায় ফরাসীদিগের অপেক্ষা হীনতর ছিলেন। পরে ফরাসী জাতির নিকট হইতে সেই বিদ্যা অপহরণ করিবার জন্য একজন ইংরাজ শিল্পী দরিদ্র পান্থের বেশে ফ্রান্সে প্রেরিত হইল। সেই শিল্পী ফ্রান্সে গিয়া ফরাসীদিগের রণপোত-নির্মাণ প্রণালীর প্রতি গোপনে লক্ষ্য স্থাপন করিল। কিছুদিনের গুপ্ত পর্যবেক্ষণের ফলে সে ঐ বিদ্যায় পরিচয় লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তদবধি ইংরাজ সমর-পোতসমূহ নব মূর্তি ধারণ করে। তখন ফরাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয়। ফরাসী গভর্নমেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের নৌ নির্মাণ বিদ্যা গোপন করিবার জন্য কঠোর বিধানাদির প্রণয়ন করেন। আবার প্রতিভাবান ফরাসী শিল্পীরা রণপোত নির্মাণের উৎকৃষ্টতর প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন। আবার ইংরাজ গুপ্তচরের সাহায্যে সে বিদ্যার গুহ্য-তত্ত্বসমূহ-সংগ্রহ করিলেন। নির্ধূম বারুদও ফরাসীর নিকট হইতেই বহু চেষ্টার পর ইংরাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমেরিকার অস্ত্র শিল্পীদিগের নিকট হইতে ইংরাজ ম্যাক্সিমগণ প্রভৃতি বহু প্রকার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কৌশলে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

ফলতঃ সকল জাতিই এইরূপে পরের উদ্ভাবিত শিল্প কৌশলের অনুকরণ ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানও পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষীণালোক প্রাপ্তি মাত্র সেই পথের অনুসরণ করিয়া আপনার জাতীয় ধন বৃদ্ধি করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবাসী দেড়শত বৎসর কাল সুসভ্য যন্ত্রশাস্ত্রবিৎ ইংরাজের সহবাস লাভ করিয়াও শিল্প বাণিজ্যে কোনও প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারিল না। রাজশক্তির প্রতিকূলতায় বদ্ধচক্ষু বলীবর্দের ন্যায় এই দেড়শত বৎসর কাল কেবল ঘানি টানিতেছে; ইচ্ছা ও বুদ্ধি সত্ত্বেও ভারতবাসী এ বিষয়ে উপায়হীন।

ভারতবর্ষের ধনবল বিনষ্ট না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায়

ভারতবাসীও যন্ত্রজাত শিল্প বাণিজ্যে সম্যক উন্নতি লাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। ধনবল থাকিলে বিদ্যা ও বুদ্ধিবলের অভাব হয় না। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের শিল্পোন্নতির ইতিহাসই দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। মিঃ ব্রুকস এডামস ‘সভ্যতা ও বিনাশের নিয়ম’ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

'The influx of the Indian treasure, by adding considerably to the nation's cash capital, not only increased its stock of energy, but added much to its inflexibility and the rapidity of its movement.

Very soon after Plassy, the Bengal plunder began to arrive in London, and the effect appears to have been instantaneous; for all authorities agree that the "Industrial revolution" the event which divided the 19th century from all antecedent time, began with the year 1760. Prior to 1760 according to Baines, the machinary used for spinning cotton in Lancashire almost as simple as in India, while about 1750 the English iron industry was in full decline..At that time four fifths of the iron used in the kingdom came from Sweden.

Plassy was fought in 1757, and probably nothing has ever equalled the rapidity of the change which followed .. In themselves inventions are passive, many of the most mportant having laid dormant for centuries waiting for a sufficient store of force to have accumulated to set them working. The store must always take the shape of money, and money not hoarded, but in motion.

From 1694 to Plassy, the growth (of bands) had been relatively show ...writing in 1790 Burke mentioned that when he came to England in 1750 there were not 'twelve bankers shops in the provinces, though then, he said, they were in every market town. Thus the arrival of the Bengal silver not only everused the mass of money, but stimulated its movements.
—Law of Civilisation and Decay" By Broks Adams, pp. 259/64

ভারতীয় ধনরাশির বিলাতে আমদানী হওয়ায় শুধু যে ইংলণ্ডের জাতীয় ধনভাণ্ডারের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; উহাতে জাতীয় উদ্যমশীলতার বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নতির বেগ দ্রুততর হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বঙ্গের লুণ্ঠিত ধন বিলাতে আনয়নের সূত্রপাত হয়; তাহার সুফলও সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃস্টাব্দের পূর্বে বিলাতের ল্যাংকাশায়ারে সূতা প্রস্তুত করিবার কলকারখানা ও লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের অবস্থা অতলহীন ছিল; তখন বিলাতে সুইডেন হইতে অধিকাংশ লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদির আমদানী হইত; কিন্তু ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বিদ্যুদ্বেগে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

উদ্ভাবনী শক্তি জাতীয় জীবনে সুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। উদ্দীপনা না পাইলে উহার স্ফূর্তি হয় না। যন্ত্রাদির উদ্ভাবনাও সকল সময়ে বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে পারে না। অনেক বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইবার পর, তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার শক্তির অভাবে, দীর্ঘকাল অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, অর্থবল সংগৃহীত হওয়ায় সেগুলি কার্য্যোপযোগী হইল। প্রচুর অর্থশক্তির সাহায্যেই সকল দেশে যন্ত্রাদি যথারীতি পরিচালিত হইয়া থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডে ব্যাংকের অবস্থাও অতি শোচনীয় ছিল। কিন্তু পলাশীর পরে বঙ্গীয় রজতের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। দেশে টাকা জমা হওয়ায় টাকা খাটাইবার দিকে লোকের প্রবৃত্তি ধাবিত হইল।

যে অর্থবলে ইংলণ্ডীয় শিল্পী সমাজে নবযুগের আবির্ভাব হইল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদিগের দৌরাত্ম্যে আমরা সেই অর্থবলে বঞ্চিত হইলাম। পরন্তু, নানা কঠোর বিধান প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের দেশীয় শিল্পের পথও রুদ্ধ করা হইল। জাপান, জার্ম্মেনি, মার্কিন, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডের লোকে যে সকল সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন, রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ভারতবাসী সে সকল সুবিধা অদ্যাপি লাভ করিতে পারিল না। কোম্পানীর আমলে আমাদের শিল্পোন্নতির পথে কেবল যথাসাধ্য কণ্টকই আরোপিত হয় নাই, উহার মস্তকে কঠোর বজ্রও নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক উইলসন একথা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন।[১]

---

[১] দেশের কথা, শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত: পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ—১৩১০, পৃষ্ঠা—১৮ হইতে ২৬, ১৭৪ হইতে ১৮৬ ও ১৮৮ হইতে ১৯১।

দেশবিখ্যাত চিন্তাবিদ ধর্মীয় নেতা এবং রাজনীতিবিদ মওলানা হোছাইন আহমদ মদনী 'ইংরাজ আমলে দুর্ভিক্ষ ও তার কারণ' এবং শ্রী সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' নামক উক্ত সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থদ্বয়ের কিছুটা অংশ যা আমরা উদ্ধৃত করে দিয়েছি, তাতে রোমাঞ্চকর তত্ত্ববহুল তথ্য রয়েছে। সুতরাং একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশের বহুবিধ দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ, অনৈক্য এবং পশ্চাদ্‌পদতার কারণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের দ্বারাই ঘটেছিল। এ সব সম্পর্কে তথ্যই যথাযথভাবে কথা বলবে, প্রমাণ দেবে—এই বিশ্বাস আমরা করি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শেষকথা

আমাদের এই দীর্ঘ আলোচিত ইতিহাসের প্রধান বক্তব্য হল এই যে ইংরাজ এ-দেশ দখল করলেও তাকে প্রথম থেকেই প্রতিরোধ আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ-দেশবাসী ইংরাজ শাসনকে নিশ্চুপ ভাবে মেনে নেয় নি। মোগলদের উত্তরপুরুষ বংশধররা ত বটেই। এ দেশের কোন কোন জমিদার ও উচ্চবংশীয়রা ছাড়াও সাধারণ মানুষ ও দেশীয় সৈনিকেরাও এই বৈপ্লবিক প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করে।

এই বৃহৎ দীর্ঘ বৈপ্লবিক প্রতিরোধ আন্দোলনে যে-সব বৃটিশ বিদ্রোহী নর-নারী দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেন বৃটিশ এবং তার এ-দেশীয় তাঁবেদার ঐতিহাসিকেরা তার সঠিক ইতিহাস কখনও আমাদের জানতে দেয় নি। সেই সব বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস বৃটিশ ও তাদের দেশীয় মোগলদের চাতুর্য ও বিশ্বাসঘাতকতায় আজ অন্ধকারে বিলুপ্ত হতে চলেছে। তারা প্রকৃত ইতিহাস চাপা দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল তা যে অনেকখানি বানানো তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের সত্যিকার ইতিহাস দেশপ্রেমিক সৈনিকের বীরত্ব, সাহস ও ইংরাজদের অসাধারণ নিপীড়নের ইতিহাস। এ-উপমহাদেশ আজ যে দারিদ্র্য নেমে এসেছে, নেমে এসেছে আর্থনীতিক দুর্দশা, তার মূলে ছিল ইংরাজদের নির্মম শোষণ।

ইংরাজরা আজ যে সভ্যতার উজ্জ্বল শিখা গড়ে তুলে জগতে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা প্রকাশ করছে সে যে শোষিত এই উপমহাদেশেরই রক্তে গড়ে উঠেছে তাকে কে মিথ্যা বলতে পারে।

আমাদের বর্তমান বংশীয়েরা তার অতীতকে জানে না বলে তারা হীনমন্যতায় ভোগে—তারা জানে না যে একদিন তারাই পৃথিবীর সুসভ্যতম জাতি ছিল। অভাব, দারিদ্র্য নিপীড়ন এবং দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষায় বঞ্চিত হয়ে আজ সে অপহরণকারীর সভ্যতার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তাই আত্মপরিচয়ের জন্য তার প্রকৃত ইতিহাস তার জানা দরকার যে ইতিহাস তার পূর্বপুরুষের বীরত্ব মহিমা ও গৌরবের ইতিহাস।

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজ একদিনেই উপমহাদেশে তাঁর রাজত্ব কায়েম করতে পারেনি। সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর লোভীদের বিশ্বাসঘাতকতার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে তারা বীর-বিপ্লবীদের ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করে তাদের বিশাল রাজ্য কায়েম করেছিল। এই মহাসংগ্রামের প্রথম প্রতিরোধ আন্দোলনে যিনি মহানায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি মজনু শাহ ফকীর বলে পরিচিত। অথচ তাঁর প্রকৃত নাম শাহজাদা সুবাদার নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ।

আমার এই ইতিহাস যে সেই মহাপুরুষের সঠিক পরিচয় তুলে ধরবে এই আশা করে আমার এই দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত করছি।

পরিশিষ্ট

বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক গবেষক মনীষী স্যার জন সিলির কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিতে চাই। কারণ আধুনিক ভারত উপমহাদেশটিতে ইতিহাস বর্জিত অবস্থায় রাজনীতি রাষ্ট্রনীতি চলে আসছে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পূর্ণ আমলটাতেই এবং পরবর্তীতেও। তাই বলতে চাই ইতিহাসের গুরুত্ব কতখানি অমোঘ এবং সত্য, তাই স্যার জন সিলির কথায় প্রতীয়মান হচ্ছে, ইতিহাস হলো রাষ্ট্রনীতির মূল এবং রাষ্ট্রনীতি হলো ইতিহাসের পরিণতি।

Politics without history has no root.
History without politics has no fruit.

ইতিহাস ছাড়া রাজনীতির কোন শিকড় নাই।
রাজনীতি ছাড়া ইতিহাসের কোন ফল নাই।

একটু প্রণিধানপূর্বক দেখিলেই এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে। ইতিহাসে আলোচিত হয় মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও মানব সভ্যতার বহুমুখী কাহিনী। রাষ্ট্র মানব সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান। ইহা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের কাহিনী জানিতে পারি। মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় ইতিহাস হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসের নিকট বহুলাংশে ঋণী, ইতিহাসে মানব সমাজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদিগকে ভবিষ্যতের আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে। সুতরাং ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত রাজনৈতিক জীবন কল্যাণময় হইতে পারে না।”

ইংরাজ যে আমাদের কত মিথ্যা ও ভুল শিখিয়েছে তা নিম্নোক্ত ইতিহাস হতে বোঝা যায় ঃ

১. আজ তোমাদের কাছে অতীত ভারতের এক বিচিত্র গৌরব কাহিনী বলব। প্রায় দুই হাজার সাড়ে তিন শো বৎসর আগের কথা! কিন্তু রূপকথা

নয়, সত্য কথা। তোমরা সবাই জানো, প্রাচীন হিন্দু ভারতবর্ষে কেউ ইতিহাস লিখত না, তাই আমাদের অধিকাংশ কীর্ত্তিকলাপ চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেছে।…… রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা হিন্দু ভারতবর্ষকে দেখতে পাই, কিন্তু তাদের মধ্যে আছে কতখানি ইতিহাস আর কতখানি কবি-কল্পনা, সে সত্য আর কিছুতেই বুঝবার উপায় নেই।

আজ যে সত্য গল্পটি বলব, সেটিও আমরা বলতে পারতুম না, গ্রীক ঐতিহাসিকরা যদি তা লিখে না রাখতেন। এজন্য গ্রীক ঐতিহাসিকদের কাছে আমাদের চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে।

যখনকার কথা বলছি, তখন গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার এসেছেন ভারত জয় করতে। তখন তিনি ভারতের যে প্রান্তে অবস্থান করছিলেন, আজ সে স্থানকে আমরা আফগানিস্তান বলে ডাকি।

পৃথিবীতে তখন একজনও মুসলমান ছিল না, কারণ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদই জন্মেছিলেন আরো নয় শতাব্দী পরে।

ভারত সীমান্তে তখন মাসাগা নামে একটি প্রকান্ড নগর ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। মাসাগা নামটি হচ্ছে গ্রীক। তার এদেশী নাম কি ছিল, জানা যায় না। আলেকজান্ডারের সঙ্গে ছিল লক্ষাধিক সৈন্য। কেউ বলেন, দেড় লক্ষ; কেউ বলেন, আরো বেশী, তারা মাসাগা দুর্গকে চারিধার থেকে ঘিরে ফেলল। দুর্গ বেষ্টন ক'রে ছিল ইট, পাথর ও কাঠে গড়া উঁচু এক প্রাচীর। তারই আড়ালে ব'সে মাসাগার সৈন্যরা দুর্গ রক্ষা করতে লাগল দিনের পর দিন।"

আলেকজাণ্ডারের পলায়ন

২. ভারতের শাসনদন্ড হস্তগত ক'রে ইংরেজ আমাদের কি শিক্ষা দিতে চেয়েছিল ?

শৌর্য্যে-বীর্য্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সর্বদিক দিয়েই শ্বেতাঙ্গরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণাঙ্গরা হচ্ছে নিকৃষ্ট।' কালি-কলমে ভারতের আধুনিক ইতিহাস আরম্ভ হয় গ্রীক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই এবং তখন থেকেই ইংরেজী ইতিহাস আমাদের সগর্ভে জানিয়ে দিতে চেয়েছে আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ জয় করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন সগৌরবে। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাস কি বলে ?

আলেকজান্ডার ভারতে প্রবেশ করলেন এক লক্ষ বিশ হাজার পদাতিক ও পনেরো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে (গ্রীক লেখক প্লুটার্কের মতে)। তারপর একে একে কয়েকজন ছোট ছোট নগণ্য রাজাকে হারাতে হারাতে এগিয়ে চললেন। প্রায় প্রত্যেক পরাজিত রাজাই তাঁকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে বাধ্য হলেন—ফলে গ্রীক সৈন্যরা দলে রীতিমত ভারি হয়ে উঠল। তারপর এই বিপুল বাহিনী নিয়ে আলেকজান্ডার আক্রমণ করলেন রাজা পুরুকে। তিনিও একজন স্থানীয় রাজা মাত্র—তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট পঞ্চাশ হাজার। কাজেই পুরুও গ্রীক শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না।

এই যুদ্ধ ‘ঝিলামের যুদ্ধ’ নামে বিখ্যাত এবং এইটিই হচ্ছে ভারতের ভিতরে আলেকজাণ্ডারের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। বিদেশী ঐতিহাসিকদের অত্যুক্তির ফলে ঝিলামের যুদ্ধ ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু ঝিলামের যুদ্ধ যে বিশেষভাবে স্মরণীয় নয়, আজ এই সত্য উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। দুর্বল পুরু এবং প্রবল আলেকজান্ডার! এ তো কাঁসার বাসনের সঙ্গে মাটির বাসনের ঠোকাঠুকি! পুরুতো আলেকজান্ডারের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না! ঝিলামের যুদ্ধ ও ওয়াটারলু, অষ্টারলিট্‌জ পানিপথ বা পলাশীর যুদ্ধের মত চরম যুদ্ধ নয়। তার ফলে আসল ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের পতন হয়নি। ঝিলামের যুদ্ধের ফলে আলেকজান্ডারের হস্তগত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক অংশ মাত্রী।

পুটক বলেছিলেন, “মদধ সাম্রাজ্যই হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আর শক্তিশালী। ভারতবর্ষ জয় করতে হ’লে আগে আপনাকে পরাজিত করতে হবে নন্দ রাজাকে।”

আলেকজান্ডার তখন মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সে প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত বলে স্থির করেছিলেন, এমন অনুমানের কারণ আছে,… তারপর যখন পুরুর পতন হ’ল আলেকজান্ডার তখন বুঝলেন যে, ঝিলামের যুদ্ধ বিশেষ বড় যুদ্ধ না হ’লেও এর ফলে তাঁর পিছনে আর কোন শত্রুর মত শত্রু রইল না, এই বার নির্বিঘ্ন হ’ল তাঁর মগধ যাত্রার বা ভারত বিজয়ের পথ।

বর্তমান গুরুদাসপুর ও কাংগ্রা জেলার মাঝখানে যেখান দিয়ে বয়ে

যাচ্ছে 'রিযাস' বা বিপাশা নদী, আলেকজান্ডার অগ্রসর হয়ে তারই তীরে শিবির স্থাপন করলেন।

গ্রীক দিগ্বিজয়ীর চোখের সামনে নাচতে লাগলো পারস্য সাম্রাজ্যের পর ভারত সাম্রাজ্যের সম্রাট উপাধি।

পুরুকে আমরা স্বদেশ প্রেমিক বীর ব'লে অতুলনীয় সম্মান দিয়েছি, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এই দুর্বলতার দিকে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়নি। যবনের কাছে নতি স্বীকার ক'রে পুরু যথেষ্ট লাভবানও হয়েছিলেন। পুরু ছিলেন ছোট রাজা, কিন্তু আলেকজান্ডার তাঁর হাতে সমর্পণ ক'রে যান সমগ্র পাঞ্জাব প্রদেশ, তবে তাঁর এ সৌভাগ্য স্থায়ী হয়নি। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর কিছু পরেই ইউডেমস্ নামে এক দুরাত্মা গ্রীক সেনানী পুরুকে হত্যা করে ভারত ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আলেকজান্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে আর অগ্রসর হলেন না কেন?

ভাগেলা নামে এক স্থানীয় রাজা সংবাদ দিলেন, "মগধের অধীশ্বরের অধীনে আছে বিশ হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার রথারোহী, তিন চার হাজার গজারোহী ও দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য।" ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন আসলে মগধ-পতির সৈন্য বলছিল এই রকম: ছয় লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী, ছত্রিশ হাজার গজারোহী ও চব্বিশ হাজার রথারোহী অর্থাৎ মোট ছয় লক্ষ নব্বই হাজার সৈন্য।)

কিন্তু টনক নড়ল অন্যান্য গ্রীক সেনানী ও সৈন্যগণের। পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের অধিকারী রাজা পুরুকে বশ করতে তাদের দস্তুরমত হিমসিম খেতে হয়েছিল, তার আগে ও পরে নানা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের লোকক্ষয়ও হয়েছে যথেষ্ট। এখন এই রণক্লান্ত স্বল্প সংখ্যক লোক নিয়ে এই সুদূর বিদেশে প্রায় সাত লক্ষ তাজা ও শিক্ষিত সৈন্যের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে হবে? না, অসম্ভব! দারুণ আতঙ্কে তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। না, না, তারা আর অগ্রসর হতে পারবে না!

আলেকজান্ডারও ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদের সংকুচিত বীরত্বকে আবার উৎসাহিত ক'রে তুলতে চাইলেন। বললেন, "এগিয়ে চল আমার সংগে, সারা এশিয়ার ঐশ্বর্য্য আমি তোমাদের পায়ের তলায় বিছিয়ে দেব।" কিন্তু কে বা শোনে কার কথা! সৈন্যরা পাথরের মত নীরব ও নিশ্চল!

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর এগিয়ে এলেন সেনাপতি কয়নস, ঝিলামের যুদ্ধে তিনিই পুরুর বিরুদ্ধে অশ্বারোহীদের চালনা করেছিলেন। তিনি বললেন, "মহারাজ, অতি জিনিসটা ভালো নয়, সমস্তরই সীমা আছে। ভেবে দেখুন মহারাজ, আমাদের কত সৈন্য রোগে বা যুদ্ধে মৃত আর কত লোক আহত হয়ে অকর্মণ্য। যারা এখনো সঙ্গে আছে তাদেরও স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে, তাদের পোশাক ছিন্ন-ভিন্ন, অস্ত্রশস্ত্রও উন্নত নয়। এদের নিয়ে আবার অগ্রসর হ'লে নিয়তি আমাদের উপরে কখনোই প্রসন্ন হবে না।"

কয়নসের উক্তি শুনে সৈন্যদলের প্রত্যেকেই উচ্চকণ্ঠে তাঁকে অভিনন্দিত করলো। সৈন্যদের এমন বিরোধিতা কল্পনাতীত; আলেকজান্ডার একেবারে স্তম্ভিত! বুঝলেন এর পরেও গোঁ না ছাড়লে নিশ্চয়ই ওরা বিদ্রোহ প্রকাশ করবে। আর কয়নস্ও তো যুক্তিহীন কথা বলছেন না, তার যুক্তি উড়িয়ে দেওয়াও চলে না।

ভারতবর্ষ জয় করবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। —তিনি আর একটি মাত্র বাক্য উচ্চারণ না ক'রে ধীরে ধীরে নিজের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।……

…আলেকজান্ডার নিরাশ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ, আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাঁবু তোলো, ফিরে চল!"

তারপর আলেকজান্ডার করলেন স্বদেশের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন। কিন্তু আমরা যদি এই প্রত্যাবর্ত্তনের নাম দেই পলায়ন, তাহ'লে অন্যায় হবে কি? আরব্ধ কার্য্য শেষ না ক'রে প্রত্যাবর্ত্তনের নামান্তরই হচ্ছে পলায়ন। নেপোলিয়নের মস্কো থেকে প্রত্যাবর্ত্তনও কি পলায়ন নয়?

একজন নিরপেক্ষ গ্রীক ঐতিহাসিক স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: "মগধাধিপতির ভয়ে আলেকজান্ডার ভারত জয় না ক'রেই পলায়ন করেছিলেন।"

এইটেই হচ্ছে সত্যকথা। আলেকজান্ডার পাঞ্জাব-বিজেতা মাত্র এবং তাঁর পক্ষে তাও সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ, একতাবদ্ধ পঞ্চনদে তখন যদি চন্দ্রগুপ্তের মত কোন বড় রাজা থাকতেন।

…হিন্দুস্তানে কোনদিনই দেশভক্তের অভাব হয়নি। আবার এখানে দেশদ্রোহীর সংখ্যাও গুণে ওঠা যায় না। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম যে দেশদ্রোহী যবন গ্রীকদের সাহায্য করেছিল, তার নাম হচ্ছে

শশীগুপ্ত। তারপর স্বদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে কত যে বিশ্বাসঘাতক, এখানে সকলকার নাম করবার জায়গা হবে না।

—আলো দিয়ে গেল যারা ঃ শ্রী হেমচন্দ্র কুমার রায়,
কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪—২১

···আরেকজন ইতিহাসের গবেষক কি বলেন দেখুন······

সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ বিমুখতাজনিত দেশদ্রোহিতার ফলে। এদের বংশলোপ ঘটা দূরের কথা, ততোধিক তাদের বংশ বৃদ্ধিই ঘটেছিল জ্যামিতিক হারে। তারপর সবার ওপরে রয়েছে বিরাট সৈন্যবাহিনীঃ এদের মধ্যে আবার দেশীয় সৈন্যদল ছিল, যারা বৃটিশ প্রশংসাপত্র পেয়ে নয়া সামরিক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এদের প্রতাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোরা সৈন্যকেও হার মানাতো। 'সূর্যের তাপ সহ্য হলেও বালির উত্তাপ অসহনীয় বলে যে একটা গেঁয়ো প্রবচন প্রচলিত, দেশীয় সৈন্যদের স্বরূপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

—টেকনাফ থেকে খাইবার ঃ বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১৪১

দেবী চৌধুরানীর সত্য পরিচয়

দেবী চৌধুরানীর ঐতিহাসিকতা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ কলিকাতায় প্রকাশ করেন দৈনিক স্বরাজ পত্রিকার আসরে—১৩৫৭ সন ১৮ই চৈত্র রবিবার এই প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। কেশব বাবু এই লেখাটি সংক্ষিপ্ত আকারে পুনঃ মুদ্রণ করেন রংপুর সম্মিলনী। সম্মেলন স্মারক সংখ্যা ১৯৮৪। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ডাঃ বিমল সেনগুপ্ত। সম্মিলনীর অফিস ৩৩।৮এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, শান্তি পল্লী, কলিকাতা ৩২।

দেবী চৌধুরানীর ঐতিহাসিকতা শীর্ষক প্রবন্ধটি পেয়েছেন কেশবলাল বসু বামনডাঙ্গা জমিদার বাড়ীতে। ছোট তরফের ম্যানেজার দীননাথ বাগচী বি. এল. লিখিত পাণ্ডুলিপিটি। উক্ত পাণ্ডুলিপিটি ম্যানেজার রমেশ চন্দ্র চৌধুরী কেশব বাবুকে দেন।

"বরেন্দ্রভূমে "ভূতনাথ" বলিয়া কোন গ্রামের পরিচয় আমরা পাই না বটে, তবে রংপুরের অদূরবর্তী "ভূতছাড়া" বলিয়া একখানা গ্রামের

পরিচয় প্রাপ্ত হই। … …এই ভুতছাড়া গ্রাম ও ভুতছাড়া ষ্টেশন পারাপারের পাশ্ববর্তী। ভুতছাড়ার পরবর্তী ষ্টেশন কাউনিয়া হইতে সান্তাহারগামী রেলপথে ষ্টেশনের চৌধুরানী নাম্নী একটি দীঘিকা বিদ্যমান। চৌধুরানীর পরবর্তী নাম বামনডাঙ্গা, ইহারই সন্নিকটে রংপুরের অন্যতম প্রতাপশালী বামনডাঙ্গার ভূম্যাধিকারীগণের বংশ-তালিকা 'দেবী চৌধুরানী' গ্রন্থে উল্লেখিত বিশিষ্ট চরিত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।"

"ভুতছাড়াকে দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় ও বামনডাঙ্গাকে শ্বশুরালয় ধরিয়া লইলে আমরা রংপুরের মানচিত্র হইতে এই উভয় স্থানের দূরত্ব-১২ মাইল বা ৬ ক্রোশের অধিক দেখতে পাইব না যৎকালে 'দেবী চৌধুরানী' লিখিত হয়, তখন এতদঞ্চলে রেলপথের প্রবর্তন হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। … … যাই হউক না কেন, বঙ্কিম চন্দ্র প্রফুল্লের শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ের দূরত্ব যে ১২ মাইল নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

"লেফটেন্যান্ট ব্রেনান দেবী চৌধুরানীকে "a female Dacoit" বা মেয়ে ডাকাত আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন আর এই মেয়ে ডাকাতটির পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "দেবী চৌধুরানী সংজ্ঞা হইতে বুঝতে পারা যাইতেছে এই মহিলাটি সম্ভবতঃ একটি নগণ্য জমিদার ভুক্তা হইবেন; প্রাণের ভয়ে নিরন্তর নৌকা বাস হইতেই ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের এই তথাকথিত নৌকাবাসিনী চৌধুরানী আখ্যাধারিণী খুদে মেয়ে জমিদারটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন বরেন্দ্রভূমে ভুতনাথ নামে গ্রাম…

অনেকে হয়ত ইংরাজ দেবতাকে পুরাদস্তুর একটা মিথ্যুক বলা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। কেননা এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রী আখ্যাধারী কতিপয় লোকের আশ্চর্য্য ঠেকবে বৈকি? তবে ইতিহাস সত্য কথাই বলতে সব সময় অকুতোভয় এবং নির্ভীক। ইংরাজদের কথিত দেবী চৌধুরানী ক্ষুদ্র জমিদার তো ছিলই না বরং দুইটি বৃহৎ পরগনার জমিদার ছিলেন, মন্থনা ও বামনডাঙ্গা পরগনার।

বামনডাঙ্গার ম্যানেজার দীননাথ বাগচী বি. এল. এবং রংপুরের কৈলাশ রঞ্জন হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক কেশবলাল বসু বি. এ. এই

দুইজন চমৎকার ভাষায় অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে দেবী চৌধুরানী সম্পর্কে যে আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন, তার প্রায় অধিকাংশগুলিই মিথ্যা। এর ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা আগেও দিয়েছি এবং এখনও দেবার চেষ্টা করব।

দীননাথ বাগচী বি. এল. এবং কেশবলাল বসু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাস যৎকালে লিখিত হয়, তৎকালের পূর্ববর্তী সময়ে রঙ্গপুরে রেললাইন গোটা জেলাব্যাপী স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য দীননাথ বাগচী ও কেশব বসু রঙ্গপুরে কখন রেললাইন হয়েছে তা না জানার ভান করেছেন মাত্র। যারা এত কিছু জানেন, তারা এ খবরটি জানেন না যে, কখন, কোন্ সালে রঙ্গপুরে রেললাইন স্থাপিত হয়েছে।

'Annals of Rural Bengal' নামক আর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে রংপুরের 'সুপারভাইজার' নাম দিয়া এই মন্বন্তরের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল ঃ

"Forty Thousand distressed people came daily for helps, the Company granted them at first five rupees worth of rice. The amount was raised to rupees ten afterward)। বলা বাহুল্য 'Annals of rural Bengal'সম্পাদক—"৪০ হাজার বুভুক্ষু নরনারীর জন্য ১০ টাকার অন্নের ব্যবস্থা ! কি সর্বনাশ।"

এখন কেশব বাবু কিভাবে সাফাই গাচ্ছেন দেখুন। যেখানে ইংরাজ লেখক বিস্ময় প্রকাশ করছেন সেখানে কেশব বাবু কি বলছেন, "বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেও, ইহা মনে রাখা কর্তব্য, "কোম্পানীর প্রতি ইহার জন্য দোষারোপ করিবার হেতু নাই। তৎকালীন ১ এক টাকার কার্য্যে ১ জন সারাদিনেও বহন করিতে পারিত না।"

রংপুর সম্মিলনী
স্মারক সংখ্যা—১৯৮৪
'দেবী চৌধুরানীর ঐতিহাসিকতা,' পৃঃ ১৬

কিভাবের দেশদ্রোহী নির্লজ্জ হলে, এইভাবে ইংরাজদের সাফাই গাওয়া যায় সেইজন্য উপরে আমরা খোদ ইংরাজদের দুর্ভিক্ষ সময়কালের লেখা উদ্ধৃত করে দিলাম।

যাহা হউক, শ্রদ্ধেয় বিশ্বকোষের সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত ও প্রকাশিত বিশ্বকোষের মধ্যে 'রঙ্গপুর' অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে— "১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নর্দার্ন বেঙ্গল এষ্টেট রেলওয়ে ও তাহার রেখা রঙ্গপুর জেলার মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে।"

—পৃঃ ১৫৩—১৫৪, ষোড়শ ভাগ, বিশ্বকোষ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে লিখেছেন—প্রফুল্লমুখী বা দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় হতে শ্বশুরালয় ছয় ক্রোশ বলেছেন। কথাটি বঙ্কিম বাবু সত্যই বলেছেন, তবে পিত্রালয়কে শ্বশুরালয় বলেছেন। অবশ্য দীননাথ বাগচী বি. এল. এবং কেশব বাবু এরাও বঙ্কিমের ভুতনাথ (ভুতছাড়া) কে দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় বলে স্বীকার করেছেন। জেলা বোর্ডের মাইল দিয়েও জানা যাচ্ছে ভুতছাড়া হতে পীরগাছা বার মাইল, আবার রেলওয়ে টিকেটে দেখা যাচ্ছে ভুতছাড়া হতে পীরগাছা ১৪ মাইল। এবং রেলওয়ে টিকেটে দেখা যাচ্ছে ভুতছাড়া হতে বামনডাঙ্গা ২৩ মাইল।

যাহা হউক, এ রকম মিথ্যা, জাল, ধোঁকাপূর্ণ উক্তি করেছেন দীননাথ বাগচী ও কেশব বাবু। এইসব স্বার্থান্বেষী উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রীওয়ালা নামধারী দেশদ্রোহী লোকেরা ইংরাজদের সর্বপ্রকারের সহায়তা করেছেন বিবেকহীনভাবে। ইহা সত্য যে, লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের প্রখর দৃষ্টি ছিল রঙ্গপুর তথা উত্তর বঙ্গ, গোটা বাংলাদেশ পর্যন্ত।

ভারত উপমহাদেশে সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহামনীষী দার্শনিক এবং দেশ প্রেমিক আমাদের বিশ্বকবি সিপাহী যুদ্ধের (১৮৫৭ সালে) একটি গ্রন্থে একটি অমর বাণী দিতে গিয়ে লিখেছেন, "সিপাহী যুদ্ধের সময় অনেক বীর তাহাদের বীর্য্য অযথা পক্ষে নিয়োগ করিয়াছিলেন একথা স্বীকার করিলেও তাহারা যথার্থ বীর ছিলেন। পৃথিবীর সেরা বীরের নামের পার্শ্বে তাহাদের নাম লেখা উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের কি দুর্ভাগ্য এমন বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতি—ইতিহাসের পৃষ্ঠা হতে সংগ্রহ করিতে হয়।"

এই মহাসত্য কথায় আমাদের আর কিছু কি বলবার আছে ?

বামনডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে তিনটি মঠ-মন্দির রয়েছে পূর্ব হতে এখন অবধি। একটি মন্দিরের গাত্রে লেখা রয়েছে—সন ১২৫৯ সাল,

দ্বিতীয় মন্দিরটির গাত্রে লেখা রয়েছে—সন ১২৭৩ সাল, তৃতীয় মন্দিরটির গাত্রে কিছুই লেখা নাই।

ইহা হতে সুধীগণ স্পষ্ট জানতে ও বুঝতে পারছেন যে, বামনডাঙ্গার জমিদার বংশ খুব একটা প্রাচীন নয়। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর সময়কালে তো নয়ই। ইংরাজদের বর্ণিত ডাকাত দেবী চৌধুরানীর পিতৃবংশ ও স্বামীর বংশ মোগল আমল হতে জমিদার ছিলেন। ইংরাজ বিরোধী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর চন্ডীজঙ্গ-এর পীরগাছা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আলাইকুড়ি নদী। বামনডাঙ্গার জমিদার উক্ত নদীতে একটি পুল নির্মাণ করেন। সেই পুলটির পশ্চিম পার্শ্বের গাত্রে লেখা রয়েছে এখন অবধি—"শ্রীশ্রী মতি—মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ চিরস্মরণীয় করণার্থ রংপুরস্থ বামনডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার মহোদয়ের বদান্যতায় এই সেতু নির্মিত হইল। সন ১২৮৮ সাল, আলাইকুড়ি নদী।"

আলাইকুড়ি নদীর পুল দেওয়ার উদ্দেশ্য হল—লড়াইয়ের ঐতিহাসিক মাঠের কবরগুলি সমান করে আবাদ করার জন্য এবং ঐতিহাসিক জিনিসগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। তবে কবরময় স্থানগুলি লোকজনেরা তখনও আবাদ করেন নাই। যদিও নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী লোকজনের উপর অনেক অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছিলেন। ১৯৪৭ সনের পরেও লোকজনেরা আবাদ করেন নাই। বগুড়া ও ময়মনসিংহ হতে কিছু লোক এসে এখন আবাদ করেছে বটে, কিন্তু গোরস্থানের উপর বাড়ীঘর নির্মাণ করে এখন অবধি বসবাস করছেন না। দীঘির পাড় ও নবাবের কুটির শানবাঁধা স্থানগুলি উঠিয়ে দিয়ে সেই স্থানগুলিতে বাড়ীঘর করে বসবাস করছেন।

আমরা এখানে কেশবলাল বসুর কিছু লেখা উদ্ধৃত করে দিতে চাই ঃ

"বামনডাঙ্গার জমিদার বংশের বংশ-পরিচয় রামেশ্বর মুস্তফী তার ১ম পুত্র কাশীশ্বর রায় এবং দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী। কাশীশ্বরের পুত্র হরবল্লভ রায় (পত্নী—চন্ডী ভবানী ও অন্নপূর্ণা) বর্তমান বংশ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্তমান ভূম্যাধিকারী মনিন্দ্ররায় চৌধুরী এবং জগতচন্দ্র রায় চৌধুরী একাদশ পুরুষ।"

“রামেশ্বর মুস্তফী তার ১ম পুত্র কাশীশ্বর রায়, কাশীশ্বরের পুত্র হরবল্লভ রায় তস্য পুত্র ব্রজেশ্বর রায় পত্নী (চন্ডী, ভবানী ও অন্নপূর্ণা)।

কিন্তু ইংরাজ লেখকগণ এবং রঙ্গপুর জেলাবাসী সহ সমগ্র ভারত উপমহাদেশবাসী জানেন যে, দেবী চৌধুরানী একজন। অথচ দেখা যাচ্ছে তিনজনের নাম। এই তিনজনের মধ্যে কোন মেয়েছেলেটি দেবী চৌধুরানী তা নির্দ্দিষ্ট করে নাম বলা হচ্ছে না কেন ? এখানেই লেখকদ্বয়ের অর্থাৎ দীননাথ বাগচী বি. এল. ও কেশবলাল বসুর চালাকীটা প্রকটভাবে দেখা যাচ্ছে। আমাদের কথা হল কাশীশ্বর হরবল্লভ. ব্রজেশ্বর, চন্ডী, ভবানী ও অন্নপূর্ণা—এ সব নাম পুরাপুরি কাল্পনিক—এর মধ্যে কোন সত্য নাই।

রামেশ্বর নিজ সম্পত্তির ।১০ সাড়ে চারি আনা অংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীশ্বর রায়কে প্রদান করেন। এই ।১০ (সাড়ে চারি আনা) অংশেই পরগনে বামনডাঙ্গা এ সব কথা দীননাথ বাগচী বি. এল. ও কেশব বাবুর মনগড়া মিথ্যা কথা মাত্র। ঐ সময়গুলিতে বামনডাঙ্গা পরগনার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীকে দেখা যাচ্ছে ইংরাজদের খাজনা আদায় করা রেকর্ড পত্রে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হতে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুতরাং এ সব কথাও কুৎসিতভাবে মিথ্যা ও মনগড়া।

আমরা মনে করি যে, কেশবলাল বসু দৈনিক স্বরাজ পত্রিকায় দেবী চৌধুরানীর ঐতিহাসিকতা, দীননাথ বাগচীর বিষয়গুলি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া, এ সব বিষয় যদি কেশবলাল বসু জানতেন তাহলে হয়ত ১৩৫৭ সালে প্রবন্ধটি প্রকাশ করতেন না। অবশ্য এটা আমার ধারণা মাত্র। কেশবলাল বসু আরও বলেছেন, “রামেশ্বর সমস্ত বিত্ত একাকী ভোগ না করিয়া অধীন প্রধান প্রধান কর্মচারীগণকেও অংশ বিশেষ প্রদান করেন। বর্ত্তমান ঘড়িয়ালডাঙ্গা জমিদারগণের আদি পুরুষকে ৬২ খানা মৌজা পৃথক করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি নিজের জন্য রাখেন। বাকী ॥ আনার মধ্যে ৵০ আনা বর্ত্তমান পীরগাছার আদি পুরুষকে এবং ।৵ আনা ফতেপুরের পূর্ব পুরুষ রাজারাম চৌধুরীকে প্রদান করেন। রামেশ্বর মুস্তফী সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ভৃত্য ও কর্মচারীগণের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন তাহার অন্যতম নিদর্শন। রামেশ্বর নিজ সম্পত্তির ।১০ সাড়ে চারি আনা অংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীশ্বর রায়কে এবং ৶১০ সাড়ে তিন আনা অংশ কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরীকে প্রদান করেন। এই ।১০ সাড়ে চারি আনা অংশই পরগনে বামনডাঙ্গা

এবং ৶১০ সাড়ে তিন আনা অংশ পরগনে ভদেব ঘাট নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।”

কেশববাবু লিখেছেন রামেশ্বর নিজ সম্পত্তির সাড়ে চার আনা অংশ কাশীশ্বর রায়কে, ।১০ আনা অংশই পরগনা বামনডাঙ্গা বলছেন, আমরা বামনডাঙ্গা পরগনা করে নিলাম। কিন্তু কোন দলীল-দস্তাবেজ, প্রমাণাদি কিছুই দেন নাই। পরগনে ভদেবঘাট বলেছেন, এই সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধোঁকাপূর্ণ। বামনডাঙ্গা পরগনার জমিদার ছিলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী। ইহার বহু প্রমাণ গ্রন্থে দেওয়া আছে। ঘড়িয়ালডাঙ্গার জমিদারগণ প্রতিবাদ করে বলেছেন রামেশ্বরের দেওয়া সম্পত্তি তাদের ছিল না। পীরগাছার আদি পুরুষকে ও ফতেপুরের পূর্বপুরুষগণকে রামেশ্বরের সম্পত্তি দান করা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুঁয়া। আমাদের লিখিত ইতিহাসের মধ্যে এর যথাযথ তথ্য, যুক্তিযুক্ত প্রমাণাদি রয়েছে। কেশবলাল বসু কলিকাতার দৈনিক স্বরাজ পত্রিকায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন, ১৩৫৭ সনে সেই মূল প্রবন্ধটির মধ্যে দেবী চৌধুরানীর শ্বশুর বংশ-তালিকা দেওয়া ছিল। রংপুর সম্মিলনীর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক ডাঃ বিমল সেনগুপ্ত-৩০/৩/৮৪ তারিখে কলিকাতা হতে অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। তাহা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

অথচ এই সব লেখক এত বড় হুবহু মিথ্যাজাল কথাগুলি পত্রিকায় লিখলেন কিভাবে—এটাই আশ্চর্য নয় কি ? আবার এও দেখা যাচ্ছে যে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানীর অনেক নাম ও কথা দেওয়া হয়েছে পত্রিকায়।

আরবী অভিধানে দেখা যায় ‘মুস্তফী’ শব্দের অর্থ—ইন্তিখাব কেয়া হুয়া বর্গুজিদা, পছন্দিদা, মকবুল। বাংলা অর্থ বাছাইকৃত, পরীক্ষাকৃত পছন্দনীয়, জনপ্রিয়। পবিত্রার সুপারিশে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস রামেশ্বরকে মুস্তফী খেতাব দেন। এসব কথা স্থানীয় প্রাচীন লোকেরা এখনও বলে থাকেন।

ডাঃ বিমল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রেরিত দেবী চৌধুরানীর শ্বশুর বংশের মিথ্যা বংশ-তালিকা, যাহা কেশবলাল বসু দিয়েছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

রামেশ্বর মুস্তফী

↓ ↓

কাশীশ্বর রায় বিশ্বেশ্বর রায়

↓

হরবল্লভ রায়

ব্রজেশ্বর রায়

↓

রঘুদেব চৌধুরী

↓

ভৈরবচন্দ্র

↓

দত্তক কীর্ত্তিচন্দ্র—(পত্নী—২য় পত্নী ৩য় পত্নী

↓ ১ম পুত্র

নবীনচন্দ্র বিজয়া

ইত্যাদি—

এখন মাননীয় সুধীগণ লক্ষ্য করবেন নবীনচন্দ্রের পিতা যে কীর্ত্তিচন্দ্র নয় বা ছিল না কখনও। রংপুর রেজিষ্ট্রীর মহাফেজখানা হতে আমরা সম্প্রতি ৫ খানা রেজিষ্ট্রী দলীলের কপি সংগ্রহ করেছি। তার চারখানার মধ্যে নাম রয়েছে নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী, পিতা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও অপর একটি মহিমচন্দ্র। এই সব দলীলের নকল আমরা প্রমাণস্বরূপ ও পাঠক-পাঠিকাদের সুবিধার্থে ও অবগতির জন্য যথাস্থানে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হল। নবীনচন্দ্রের ভ্রাতা শ্রী মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী, পিতা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী।

রেজিষ্ট্রি নং—২৬
বুক নং—৪
ভলিউম নং—৬
পেজ নং—২৯০-২৯১

গ্রহীতা ঃ—শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী, পিতার নাম ঈশ্বরপ্রাপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমিদারী, নিবাস রামভদ্র সহবাত বামনডাঙ্গা, ষ্টেষন সুন্দরগঞ্জ, মোতালেক জেলা রংপুর।

দাতা ঃ—শ্রী শেখ খালাত মামুদ সরকার ওলদে মৃত খোশদিল প্রামাণিক, জাতি মুসলমান, পেশা গৃহস্থি, সাকিন ইসমাইল বড় বাড়ী হাট সাকিন বিদিতর পরগনে বামনডাঙ্গা ষ্টেষন জলঢাকা, মহকুমা বাকডোকরা সাব ডিষ্ট্রিকট—আলাম বিদিতর ও জেলা রঙ্গপুর। ৫ই শ্রাবণ, ১২৮০ সাল।

বাকী খাজনা—১৯২৲ একশত বিরানব্বই টাকা।

শ্রী ফেরাজুল্লাহ মহরার
২৩।৭।৮০

রেজিষ্ট্রি নং—২৫
বুক নং—৪
ভলিউম নং—১
পেজ নং—২৮৮-২৮৯

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী পিতার নাম ঈশ্বরপ্রাপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমিদারী, নিবাস রামভদ্র সহবাতে বামনডাঙ্গা, স্টেশন সুন্দরগঞ্জ, জেলা রংপুর মহাশয়ের বরারবেষু।

লিখিতং শ্রী খোশদিল মোহাম্মদ সরকার ওলদে মৃত্যু নেছর৹ মোহাম্মদ প্রামাণিক, জাতি মুসলমান, পেশা গৃহস্থি, সাকিন বিদিতর, জেলা রঙ্গপুর কিস্তিপত্র মিদং বারোকা ৮৭ সনে অব্দে লিখনং কার্য্যাংচাগে মহাশয়ের জমিদারী জেলা রংপুরের কালেকটরির তৌজিয় ভুক্ত ১নং মহাল পরগনে বামনডাঙ্গা অন্তপাতি তালুক বিদিতর মধ্যে আমার জেলা রঙ্গপুর মধ্যে আমার বিনামীতে যে সকল সরাসরি জোত আছে তাহার বাকী খাজনা ১৫৪ ৸৶৬ একশত চুয়ান্ন টাকা তের আনা ছয় পাই। আমার সেই দেনা তাহা একযোগে আদায় করিতে আসক্ত হইয়া এই কিস্তবন্দি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্নের তপশীলের লিখিত কিস্তানুসারে কিস্তি আদায় করিব ও যখন যে টাকা দেই তৎক্ষণাৎ এই কিস্তিবন্দীর পৃষ্ঠায় ওয়াশীল লিখিয়া দিব যে সেই ওয়াশীল ভিন্ন অন্য কোন রকমে ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না, যদি করি তাহা অগ্রাহ্য হইবেক।

নিজ কিস্ত খেলাপ করিলে খেলাপী সুদ শতকরা ৩৶ আনা হিসাবে দিব। অপর কিস্তর প্রতীক্ষা না করিয়া আদালত অবলম্বনে যত সুদ (অস্পষ্ট) বিলকুল টাকা এক জোত আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও জোত হইতে আদায় করিয়া লইবেন।

আর এই কিস্তবন্দির সমস্ত টাকা আদায় না হইতে ঈশ্বর না করেন আমার অভাব হয় তবে এই কিস্তবন্দির যাবতীয় সর্ত্ত আমার ওয়ারীশান

স্থলাভিষিক্ত জনগণের প্রতি। আর এই কিস্তবন্দির সমুদয় টাকা পরিশোধ না হওয়া কালতক আমার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবে না। যদি করে অগ্রাহ্য হইবেক। এতদর্থে কিস্তবন্দি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সাল সদর তাং ৫ই শ্রাবণ।

মোকাবিলা করিলাম
শ্রী ফেরাজ উল্লা সরকার
২০।৭।৮৭ বাং

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, রাজেন্দ্রনাথ বসু উকিল এম ও বি এল পিতা দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু সাং গুপ্তপাড়া রংপুর। মধুসূদন সেন শিক্ষক গুপ্তপাড়া রংপুর। কালী চক্রবর্তী উকিল এম. এ. বি. এল—উক্ত তিনজন রঙ্গপুরের শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় ব্যক্তি বলেছেন মোঘল শাহযাদা নওয়াব মির্জা বাকের জঙ্গকে হঠাৎ আক্রমণ করে গুরুতর আহত করার পিছনে ছিল দুই মহিলা। এরা ইংরাজ সরকারের গুপ্তচর ছিল। এদের একজনের নাম পবিত্রা, অপর জনের নাম অলকা। পবিত্রা বামনডাঙ্গা পরগনার প্রথম জমিদার হন। অলকা কাকিনা জমিদারের বিধবা বধু ছিল। গুপ্তচরগিরি করার জন্য ইংরাজ সরকার তাকে বিপুল সম্পত্তি দেয়।

রেজিষ্ট্রি নং—২৯
বুক নং–৪
ভলিউম নং—১৬
পেজ নং ২৯৬–২৯৭

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী পিতার নাম ঈশ্বর-প্রাপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমিদারী নিবাস রামভদ্র সহবাত বামনডাঙ্গা ষ্টেশন সুন্দরগঞ্জ, মোতালকে জেলা রঙ্গপুর মহাশয়ের বরাবরেষু

লিখিতঃ শ্রী গৌরমণি দাস ওলদে মৃত মংশুরামদাস ববাক সরদার—জওজে মৃত গৌরঙ্গ বৈরাগী জাতি পেশা গৃহস্থ আদিবাসী সাকিন বিদিতর পরগনে বামনডাঙ্গা ষ্টেষন জলঢাকা মহকুমা বাকতোকরা (অস্পষ্ট) বিদিতর জেলা রঙ্গপুর কিস্তবন্দি পত্র মিদং ১২৮৭ সাল অব্দে লিখক কার্যংচাগে বরাবরেষু মহাশয়ের জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টরির তৌজির ১নং মহাল পরগনে বামনডাঙ্গার অন্তপাতি তালুক বিদিতর মধ্যে আমার স্বনামী ও বেনামী যে সকল সরাসরি জোত আছে, তাহার

বাকী খাজনা ১৬৭৲ একশত সাতষট্টি টাকা। আমার সেই দেনা তাহা এবযোগে আদায় করিবার অসমর্থ হইয়া এই কিস্তবন্দি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, নিম্নের তপশীলের লিখিত কিস্তানুসারে কিস্ত আদায় করিব। ও জমা যে টাকা সেই তৎক্ষণাৎ এই কিস্তবন্দির পৃষ্ঠে ওয়াশীল ভিন্ন অন্য কোন রকমে আপত্তি করিতে পারিবে না। ও যদি করি তাহা অগ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু খেলাপ করিলে কিস্ত খেলাপী সুদ মাসিক শতকরা ৩৶ তিন টাকা দুই আনা হিসাবে দিব।

ক্রমে তিন কিস্ত খেলাপ করিলে আমার কিস্তর প্রতীক্ষা না করিয়া আদালত অবলম্বনে যা সুদ বিলকুল টাকা আমার অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি ও জোত হইতে আদায় করিয়া লইবেন। আর এই কিস্তবন্দির সমুদয় টাকা আদায় না হইতে ইশ্বর না করেন অভাবে হয় তবে এই কিস্তবন্দির যাবতীয় সর্ত্ত আমার ওয়ারীশান ও আমার স্থলাভিষিক্ত জনগণের প্রতি আসিবেক, হইবেক আর এই কিস্তবন্দির সমুদয় লিখিত টাকা পরিশোধ হওয়া কালতক আমার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিব না। যদি করি অগ্রাহ্য হইবেক। এতদর্থে কিস্তবন্দির পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ১২৮৭ সাল ৫ই শ্রাবণ।

রেজিষ্ট্রি নং— ২৪
বুক নং — ৪
ভলিউম নং — ১
পেজ নং— ২৮৬-২৮৭

গ্রহীতা ঃ—শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র রায় চৌধুরী পিতার নাম ঈশ্বরপ্রাপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জাতি ব্রাহ্মণ পেশা জমিদারী নিবাস রামভদ্র সহবাত বামনডাঙ্গা, ষ্টেষন সুন্দরগঞ্জ, মোতালেক জেলা রঙ্গপুর।

দাতা ঃ— শ্রী নতি নস্য ওলদে শ্রী আলী নস্য জাতী মুসলমান পেশা গৃহস্থি-সাকেন ইসমাইল বড় বাড়ী। পরগনে টেপা ষ্টেষন জলঢাকা মহকুমা বাকতোকরা সাব রেজিষ্ট্রী। জেলা রঙ্গপুর ৫ই শ্রাবণ ১২৮০ সাল।
বাকী খাজনা ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চিরস্মরণীয়া বীরাঙ্গনা নেত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী ইংরাজদের কথিত ডাকাত দেবী চৌধুরানী, স্বামী জমিদার

নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী তার মন্থনা পরগনাধীন মৌজা রাধাবল্লভ ও মৌজা ভগি, এক পীর ফকিরকে লাখেরাজ সম্পত্তি দান করার দলীলের নকল নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

গ্রহীতা—শাহ বিজলী কড়ক ফকির।

দাতা—নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, নিবাস কাছারী পীরগাছা, মৌজা রাধাবল্লভ পরগনা মন্থনা ১১৫৯ সাল ৭ই মাঘ বাঙ্গালা। এরাদিয়াত লাখেরাজ। রেজিষ্ট্রীভুক্ত ১২০৭ সাল। ৩৪ নং কালেকট্রি বহি। জমি রাধাবল্লভ মৌজা ৩২ বিঘা ও মৌজা ভাগ ৩২ বিঘা। অন্যান্য ভাগী দায়-মূল্যা শাহ ফকির রমজান আলী শাহ ফকির ইহাদের পিতা খোদাদীন শাহ ফকির।

উপরোক্ত দলীলের বাংলা সন ১১৫৯ সাল হলে ইংরাজী সন হয় ১৭৫২ সাল। রেজিষ্ট্রীভুক্ত ১২০৭ সাল হই'লে ইং সন হয় ১৮০০ সাল।

ইহা উল্লেখ যোগ্য যে উক্তগ্রহীতা শাহ বিজলী কড়ক ফকিরের কবর শান বাধা অবস্থায় রয়েছে—কুকরুল বিলের দক্ষিণ পার্শ্বে লাগালাগি অবস্থায়। ইহাদের কোন শাখার বংশধর শহরের জুমনা পাড়ায় রয়েছেন।

বামনডাঙ্গার স্থানীয় সর্বশ্রেণীর ও অন্যান্য স্থানের প্রাচীন বৃদ্ধগণ বলেন যে বামনডাঙ্গার ১ম জমিদার হয় জয় দুর্গাদেবী চৌধুরানীর চাকরাণী। পরে দাসীর মর্যাদা পায় বামনডাঙ্গা গ্রামের পবিত্রা এবং এই পবিত্রারই পোষ্যপুত্রের পুত্র নবীনচন্দ্র জমিদার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে 'বামনকন্যা বামনী'। এখানে স্থানীয় লোকেরা বলেন যে পবিত্রার বিবাহ হয় নাই। দেখতে খুব কদাকার ছিল। রামেশ্বর মুস্তফীর সঙ্গে খুব যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিন্তু পবিত্রার জমিদারী কে পাবে এই নিয়ে রামেশ্বর মুস্তফী, পবিত্রার পোষ্যপুত্র ও সৎ ভাইয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রর মধ্যে টানাটানি হয়। শেষে পবিত্রা ঈশ্বরচন্দ্রকেই বামনডাঙ্গার জমিদারী দেয়।

রঙ্গপুর শহরের গুপ্তপাড়া নিবাসী (১) রাজেন্দ্রনাথ বসু, উকিল (M. A. B. L), পিতা দিজেন্দ্রনাথ বসু, গুপ্তপাড়া, রংপুর। (২) মধুসূদন সেন, গুপ্তপাড়া, রংপুর, (শিক্ষক) (৩) কালী চক্রবর্তী উকিল (M. A. B. L) গুপ্তপাড়া, রংপুর। এনারা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের

আজীবন স্বনামখ্যাত সম্পাদক সুরেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সুরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরীর বাসায় এরা প্রায়ই যাওয়া আসা করতেন। রাজেন্দ্র বাবুর বাসা ইতিহাস সংগ্রহের জন্য যাওয়ায় ওনাদের তিনজনের সাথে আমার (লেখক) কথা হয় এবং এরাই প্রথম অত্র এলাকার বিদ্রোহ এবং জমিদারগণের সত্য পরিচয় সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন এবং আমিও পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের ফলে জানতে পারি যে, তাদের কথিত ইতিহাসের কথাই সত্য ও সঠিক।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা ইংরাজ বিরোধী কোন কোন লোককে ঘুষ দিয়ে হাত করে কার্য্য উদ্ধার করেছে তা লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে হান্টার সাহেব যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাহা হল এই :

“as there is no reward offered from the dependence of the Dakaits upon them, they can not be detected writhout bribery”

Lt. Brenan’s Observation
Hunter’s Statistical Account of Bengal
Vol. VII, Page—159

বঙ্গানুবাদ—“তাহাদের বিদ্রোহী ডাকাতদের ধরার জন্য—কোন পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ডাকাতদের অধীনস্থ লোকদের ঘুষ দেওয়া ছাড়া তাহাদের (বিদ্রোহীদের) ধরিয়া দেওয়ার কোন উপায় ছিল না।” অধীনস্থ লোকদের ঘুষ দেওয়া হইয়াছিল।

জবানবন্দী

আমার নাম পূর্ণচন্দ্র সরকার। আমার জন্মভূমি ও গ্রাম বামনডাঙ্গা। এখন আমার ৮২ বৎসর বয়স। আমি ১৬ বৎসর বয়সের সময় বামনডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে (ছোটতরফে) জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরি গ্রহণ করি। বামনডাঙ্গার জমিদার বংশের ১ম জমিদার হন পবিত্রা রানী। ৭৬ এর মন্বন্তর সময়কালে পীরগাছার জমিদারনী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী দয়াপরবশ হইয়া পবিত্রা রানীকে নিজের কাছে আশ্রয় দেন। শুনতে পাওয়া গেছে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে পবিত্রা রানীর কাজকর্মে খুশী হইয়া দাসী বা সখী করিয়া লন। কাকিনার জমিদারের বউ অলকা দেবী, তিনিও জয়দুর্গা

দেবী চৌধুরানীর সহিত এক তাঁবুতে সখী হিসাবে কখনও কখনও থাকিতেন। আরও ২০/২৫ জন মেয়ে লোকও থাকিতেন। লোক-লস্কর সন্নাসী ফকির জমিদার প্রজা শত শত মানুষ থাকিতেন। পবিত্রা রানীর বিবাহ হয় নাই। তিনি দেখিতে নাকি মোটেই ভাল ছিলেন না। রামেশ্বর মুস্তফীর সঙ্গে পবিত্রা রানীর খুব ভাব ভালবাসা আসা-যাওয়া ছিল। পবিত্রা রানীর বৃদ্ধ বয়সের সময় রামেশ্বর মুস্তফী তার নামে জমিদারী লিখিয়া চান। পবিত্রা রানীর সৎ ভাই-এর ছেলেও জমিদারী লিখিয়া চান পিসিমা পবিত্রা রানীর কাছে। অনেক বাদানুবাদের পর পবিত্রা রানী ভাতিজাকে পোষ্য করিয়া বামনডাঙ্গার পরগনার জমিদারী লিখিয়া দেন। পুষ্যের পুত্রই নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী। পুষ্যের নাম আমার স্মরণ নাই। এসব কথা আমি ছোট বেলা হইতে বুড়াবুড়ীদের মুখে শুনিয়াছি। এখন আর পূর্বের সব কথা স্মরণ নাই। দুই চক্ষু অন্ধ এবং শরীরও আমার দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

Bengal District Records
Rungpore
vol. 1, Page 28-29

Collector Moore writes, by all that he could learn of the character and disposition of the Zeminders···In 1781 the Zeminder of Kakina thus took her flight...to the effect that he found Ram Ruda of Kakina the adopted son of this lady...Ram Ruda must have aged very early in life for it was only in 1784 that this adoptive mother introduced him to Mr. Moore to take up the Settlement of the estate if he was then 20 he could have been more 45 in 1809. Buchanan spoke of the Kakina Zeminder neighbour Tooshvanda, ...''

আমি সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এ সব তত্ত্ব ও তথ্যের-কথা বলছি না। ইতিহাসের গবেষক ও বিচারকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কথাগুলি বলছি। শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন যে মহান দেশপ্রেমিক ও অসাধারণ পন্ডিত মনীষী অরবিন্দ ঘোষের ও তার সশস্ত্র দলীয়দের গুতোর চোটে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বেসামাল হয়ে উঠেছিল। তারা ভয় করছে আবার বাংলা হয়ত বিগত ১৭৬০ খৃঃ হতে-১৭৮৩ মধ্যে

সর্বসাধারণ লোকজন ইংরাজদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে আবার বুঝি সেই ধরনের ইংরাজ বিতাড়নী কাজে প্রবৃত্ত হয়। ইংরাজরা আরও আশংকা করেছিল যে ১৭৫৭ সালের সময়কালীন বিদ্রোহ বিপ্লব গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী হতে পারে জন্য ১৯১৪ সালে "Bengal District Records-Rungpore" এই গালভরা নাম দিয়ে পুস্তকটি প্রকাশ করা হয়, সত্যগুলিকে বিকৃত করে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য। কাকিনার জমিদারীর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে কিন্তু This Lady-র নামটি একবারও বলা হচ্ছে না কেন? কি কারণে? স্থানীয় বয়স্ক শিক্ষিত অশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় সর্বশ্রেণীর লোকরা বংশ পরম্পরায় জেনে আসছেন কাকিনার জমিদারনী অলকা কলিকাতায় গিয়ে ইংরাজ সাহেবদের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে এসে ইংরাজদের গুপ্তচর হয়ে ইংরাজ বিরোধী নেতৃ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর তাঁবুতে সখীর ছদ্মবেশে থাকে। দুভিক্ষ সময়কালে (১১৭৬ বাংলা) বামনডাঙ্গার এক অনাথিনী মেয়ে, নাম পবিত্রা। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী দয়াপরবশ হয়ে তাকে চাকরাণী রূপে গ্রহণ করেন। তার কাজকর্মের উপর খুশী হয়ে তাকে পরে দাসীর মর্যাদা দেন। (দাসী অর্থে সখী) বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের মধ্যে দিবা ও নিশিকে প্রফুল্লময়ীর (দেবী চৌধুরানীর) সখি বলেছেন। যার ফলে দেবী চৌধুরানীর মত দাসী পবিত্রাও নবাবের সমস্ত গতিবিধি আসা যাওয়া ইত্যাকার সব গোপন খবরই জানতে পারতো এবং নবাবের গোপনীয় খবরগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অলকার কাছে বলতো জমিদারী পাওয়ার লোভে। পরে অলকা এ সব গোপনীয় খবর চতুরতার সহিত-ইংরাজদের নিকট পাঠাতো—গুপ্তচর মারফত। কিন্তু জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী-এর ঘুণাক্ষরেও জানতে ও বুঝতে পারেন নাই কখনও।

নবাব অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী লোকজন লইয়া কবে, কোথায়, কখন যাবেন, অলকা সেই খবরটা জানতে চায় এবং পবিত্রা তাকে সঠিক খবরটি জানায়। যার ফলে নবাব আদতমারী (আর্দতমারা, নবাবকে মারে) নামক স্থানে ম্যাকডোনাল্ডের অতর্কিত আক্রমণে গুরুতর আহত হন এবং তার দেহরক্ষীরা নবাবকে লইয়া ফুলচৌকি নগরে যান। সেখানেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কাকিনার-এবং রঙ্গপুরের বিভিন্ন জায়গার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলেন কাকিনার জমিদার বংশ কোচবিহারের রাজাদের আত্মীয় ছিল এবং কাকিনা পরগনার জমিদারী কোচবিহারের রাজাদের দেওয়া। ইহা সত্য যে ১৭৭৩ খৃঃ এর

৫ই এপ্রিল ইংরাজদের সহিত রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের সহিত এক সন্ধি হয়। তাহাতে ইংরাজ বাহাদুর বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা লইয়া কোচ রাজের সাহায্য করিতে সম্মত হন।"

বিশ্বকোষ ঃ ৪র্থ খণ্ড, নগেন্দ্রনাথ বসু
সংকলিত ও প্রকাশিত
৫২৫ পৃষ্ঠা

স্থানীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আরও বলেন যে, নবাব মারা যাওয়ার পর অলকা কাকিনার জমিদারী ছাড়াও ইংরাজদের নিকট হতে আরও বিপুল সম্পত্তি পায় এবং পবিত্রা বামনডাঙ্গার পরগনার জমিদারী পায়। প্রাচীন বৃদ্ধ বৃদ্ধারা এখনও বলে থাকেন যে মহাপাপের ফলে অলকা ও পবিত্রা আজীবন নিঃসন্তান ছিলেন।

৩. নাটোরের রানী ভবানীর ইংরাজ বিরোধিতা

এখন আমরা মহান দেশপ্রেমিক মানব প্রেমিক প্রতিস্মরণীয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সহিত সশস্ত্রভাবে সংগ্রামকারিণী রানী ভবানীর কথা কিছু বলব। রানী ভবানী যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সাথে লড়াই করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা পুনঃ আনয়নের জন্য এসব কথা আমরা বা আমাদের দেশবাসী পূর্বে সম্ভবত কখনও জানতে পারেন নাই। অল্প বয়সের সময় একটা চটি বইয়ে পড়েছিলাম নাটোরের রাজবংশের এক লোকের কথা উদ্ধৃত করে অবধূত নাম দিয়ে লিখেছিলেন যে, ইংরাজেরা এদেশ থেকে চলে গেলে তখন এদেশের সত্যিকার ইতিহাস লেখা যাবে। চটি বইটির নাম এখন আমার স্মরণ নাই। তবে নাটোরের রাজবংশের লোকও লেখক ছিলেন। অবধূত এই ছদ্মনামটি কার ছিল এটা জেনে অনুসন্ধান করলে হয়ত আরও অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

আমরা এখনাবধি যা কিছু সংগ্রহ করেছি তার চেয়ে আরো অনেক বেশী তথ্য ও তত্ত্ব গোটা বাংলায় ছড়িয়ে আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। মাত্র গুটিয়ে কয়েক সংগ্রামী নায়ক-নায়িকার নাম পরিচয় এবং নিবাস আমরা জানতে পেরেছি, কিন্তু আরো বহু সংগ্রামী নায়ক-নায়িকার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে আমরা মনে করি। কারণ এমনি এমনি কি আর ইংরেজগণ বাঙ্গালীদের পল্টনে নিত না? এবং ভীতু বাঙ্গালী বলে এই যে রটিয়ে দিয়েছিল অথবা মিথ্যা দুর্নাম এটাও ইংরাজরা চাতুর্যের সহিত রটিয়েছিল। যেমন

অনেক মিথ্যা কথা এই ভাবে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা ইতিহাসের পাঠকগণ অবগত আছেন। যদি আমরা মহান দেশপ্রেমিক এবং ইংরাজদের চেয়েও অধিক চালাক-চতুর এবং কুশলী আমাদের অগ্রনায়ক সিপাহ্সালার প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদিত বিশ্বকোষের ইতিহাসগুলি আগাগোড়া অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে খুটিয়ে খাটিয়ে পড়তাম ও বুঝবার চেষ্টা করতাম এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের স্থানগুলি ঘুরে ফিরে দেখতাম এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত স্থানীয় লোকদের সহিত এসব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতাম তাহলে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যেত যার ফলে দেশ বিভাগ ও অচিন্তনীয় ক্ষয়ক্ষতি হতো না এবং হাজারো সমস্যা এসে দেখা দিত না। নাটোর রাজবংশ সম্বন্ধে খুব বেশী একটা লিখব না কারণ এসব কথা তো লিপিবদ্ধ হয়েই আছে পুস্তকাকারে। তবুও সামান্য কিছু বলে আমরা আমাদের কথায় আসব।

“রানী ভবানী ১৮শ শতাব্দী নাটোরের জমিদার রামকান্তের পত্নী, জন্ম বগুড়া জেলার ছাতিম গ্রামে। পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। ১১৫৩ বঙ্গাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হইলে বার্ষিক দেড় কোটি টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক হন, সাধারণ হিন্দু বিধবার জীবন যাপন করতেন এবং দানে ও মন্দির প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক ব্যয় করেন। তাহার একমাত্র সন্তান তারা বাল্য বিধবা হইয়া তাহার নিকটেই বাস করেন এবং দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণ রাম তাহার জীবদ্দশায়ই মারা যায়, সংসারের প্রতি রামকৃষ্ণ রায়ের ঔদাসীন্যের ফলে তাহার বহু সম্পত্তি নিলাম হইয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসও তাহার একটি জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে দান করেন। ৭৯ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদের বড় নগরে রানী ভবানীর মৃত্যু হয়। তিনি অনেক সময় তথায় বাস করিতেন।”

ঢাকা হতে প্রকাশিত বাঙ্গালা বিশ্বকোষ পৃষ্ঠা ৫৫৩
প্রধান সম্পাদক খান বাহাদুর আব্দুল হাকিম

ইতিহাসে দেখা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোরের উপর অত্যাধিক রাজস্ব ধার্য করা হইয়াছিল। কেন? কি কারণে?

রানী ভবানীর সময়ই ৭৬ এর মন্বন্তর হয়, এ সময় নাটোরের অন্নপূর্ণা রানী ভবানী আপনার বিপুল রাজকোষ শূন্য করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার

অন্নকষ্ট নিবারণে মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন, সেই মন্বন্তরের হাহাকারে দয়াময়ী দেব প্রতিমা রানী ভবানীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্ব্যবহার দেশের শিল্প বাণিজ্যের অবনতি নিজ প্রভুত্বের খর্বতা… …।”

বিশ্বকোষ ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, ৩৮৭-৮৮ পৃঃ

দেব দুর্লভ কাজ কর্ম, দানে ধ্যানে মায়া-মমতায় যিনি ছিলেন পূর্ণতার উপর ওয়ারেন হেস্টিংসের দুর্ব্যবহারের কারণটা কি ছিল? এবং ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে “নিজ প্রভুত্বের খর্বতা” কেনই বা হল, কি কারণে এবং রঙ্গপুরের বাহারবন্ধ পরগনার জমিদারিটি হেস্টিংস কান্ত মুদিকে দান করিলেনই বা কেন? কি কারণ? এসব কথা অবশ্যই আমাদের ক্ষতিয়ে দেখতে হবে, নয় কি?

ইংরাজ আমলের ইতিহাসে ফলাও করে জোরে সোরে লেখা রয়েছে প্রথিতযথা রানী ভবানীর পালক পুত্র রামকৃষ্ণ রায়, তার জপতপে হৃদয়ে বিষয় বৈরাগ্য উপস্থিত হইল।”

“লর্ড কর্নওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবস্থা মতে যখন নাটোরের অধীনস্থ তালুকদারগণ সাক্ষাত সম্বন্ধে ইংরাজ রাজকে কর দিতে উদ্দিষ্ট হইলেন, তখন তিনি (রামকৃষ্ণ রায়) আপনার ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেন।”

—বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রামকৃষ্ণের বিষয়-সম্পত্তির প্রতি উদাসীনতা বা বৈরাগ্য এটা সম্পূর্ণ বানানো ও মিথ্যা কথা, ইতিহাসে এও দেখা যাচ্ছে যে রানী ভবানীর জীবদ্দশাতেই দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়।

তালুকদারগণ ইংরেজদের কাছে গিয়ে কর দিলেন এবং নিজেরাই জমিদার হয়ে বসলেন এবং রামকৃষ্ণ বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করেম, তাহলে বুঝা যায় রামকৃষ্ণ জপতপ করতেন সত্য কিন্তু তাহার বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে তিনি কখনও উদাসীন ছিলেন না। এইত আমরা মনে করছি।

ইতিহাসের গবেষক লেখক অধ্যাপক কবি মুফাখখারুল ইসলামের প্রবন্ধ হতে উদ্ধৃত ঃ

……পুথুরিয়া ময়মনসিংহ জইনশাহীর মালিক রানী ভবানীর সেদিকে কেন মনোবৃত্তি ছিল তাহা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সন্ন্যাসী

ফকীরের সেই নাটোরের রানী ভবানীর এলাকায় বিশেষ কোন উৎপাত ঘটায় নাই বরং রানী ভবানীর সহানুভূতিতেই মনে হয় তাহারা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণের সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলেন। সেই অপরাধেই জীবনের শেষভাগে রানীর উপর ইংরেজ কোম্পানীর কোপদৃষ্টি পড়িয়াছিল।

—মুফাখ্খারুল ইসলাম ঃ প্রত্নময় উত্তর টাঙ্গাইল ঃ
১১ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-চৈত্র ১৩৮৪, ইতিহাস

বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েও রানী ভবানী সাধারণ বিধবার বেশে থাকতেন। সেই রানী ভবানীই তাঁর শেষ জীবনে ইংরেজদের বৃত্তি নিয়ে কাটিয়েছেন। প্রথমে মাসিক ১০ হাজার টাকা, পরে কমতে কমতে ১ হাজার টাকায় এসে ঠেকেছিল। অথচ এই রানী ভবানী যে কত প্রকাণ্ড জমিদারীর মালিক ছিলেন, তা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি এবং নীচেও কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া হইল ঃ

রানী ভবানীর অধিকারভুক্ত বিপুল জমিদারীই "রাজশাহী নামে খ্যাত হয়।"

তাহার সময় হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত পর্যন্ত রাজশাহী জেলার পশ্চিম সীমা ভাগলপুর ও পূর্বসীমা ঢাকা নির্দিষ্ট ছিল।"

"হলওয়েলের উদ্ধৃত বিবরণী হইতে জানা যাইতেছে যে, ৩৫ দিনের পথ ব্যাপিয়া রানী ভবানীর রাজ্য ছিল। ইহার দেয় রাজস্ব ৭০ লক্ষ টাকা।"

—বিশ্বকোষ, ৩৮৭, ৩৮৮ পৃঃ
রাজশাহী

শ্রদ্ধেয় ইতিহাসের গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া এনার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়, একটু দিতে চাই। জাকারিয়া সাহেব দিনাজপুর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে যে সব গড় কুঠি কেল্লা বিষয় উদ্ধৃত করা হয়েছে তা তিনি সুন্দরভাবে পরিবেশন করেছেন।

এখন আমরা যা জানি বা সন্ধান করতে পেরেছি উক্ত গড় কোট কেল্লাগুলির সম্পর্কে তার সামান্য কিছুমাত্র উল্লেখ করতে চাই। রঙ্গপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ বড়বীলা পরগনা এটি রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রঙ্গপুরের অনেক জমিদারীর পরগনাগুলি যেমন নূতন জমিদারগণকে দেওয়া হয়েছে। বড়বিলা পরগনার জমিদার প্রসনকুমার ঠাকুরের একটি রেজিস্ট্রিকৃত দলীল সন ১২৮৪ সাল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের দেখা যায়। উক্ত পরগনার সম্ভ্রান্ত বহু লোকজন বলেন ঠাকুর এস্টেটের পূর্ব রানীভবানীর এই জমিদারী ছিল।

পীরগঞ্জ থানা থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে যে জেলা বোর্ডের রাস্তাটি গেছে এবং থানার পূর্ব দিক দিয়ে জেলা বোর্ডের যে রাস্তাটি গিয়েছে, উভয়দিকে গড় ছিল। এইসব গড় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য ইংরাজগণ নদীয়া জেলা হতে এক লোক নিয়ে এসে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান বানিয়ে দেন। চেয়ারম্যানের নাম শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী। শরৎচন্দ্রের সহোদর ভ্রাতার নাম অতুল চ্যাটার্জী, ইনি ইংলণ্ডে ভারতের প্রথম হাই-কমিশনার ছিলেন। শরৎ চ্যাটার্জী একাদিক্রমে ২২ বৎসর ধরে রংপুরের চেয়ারম্যান ছিলেন। এই রকম বহু ঐতিহাসিক স্থান রাস্তা করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জী।

ইতিহাসের গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রদ্ধেয় জাকারিয়া সাহেব দিনাজপুর জেলার ও রঙ্গপুরের পীরগঞ্জ থানার পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলের যেসব গড় কেল্লার কথা নিজের কোন মন্তব্য ছাড়াই উল্লেখ করেছেন, এজন্য তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দেশে না জানিয়েও আমরা অনেক সময় ফতোয়া দিয়ে থাকি।

উনি যে সময় দিনাজপুর এলাকার ইতিহাসগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন, তার পূর্বে আমি ঐসব এলাকার অনেক স্থলে গিয়েছি কিন্তু নানারকম অসুবিধার জন্য ইতিহাসের গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারি নাই। শ্রদ্ধেয় জাকারিয়া সাহেব বিভিন্ন গড় কোটের বর্ণনা দিয়েছেন তা সার্বিক সুন্দর হয়েছে। ঐতিহাসিক মহোদয়গণ জানেন যে ১৭৬০ সালে মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে এদেশীয়দের একটি যুদ্ধ হয়েছিল। মসিমপুর যুদ্ধের (Battle of Mosimpur) বিস্তারিত বর্ণনা আমাদের যতটুক জানা আছে তা দেওয়া হয়েছে। মসিমপুরের যুদ্ধটি বিরাট এলাকা নিয়ে হয়েছিল। ঘোড়াঘাট থানা, অধুনা চরকাই থানার কিছু অংশ, দিনাজপুর নবাবগঞ্জ থানার কিছু অংশ, ফুলবাড়ী থানার কিছু অংশ, রানী শংকাইল থানার কিছু অংশ, রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার কিছু অংশ, মিঠাপুকুর থানার কিছু অংশ, বদরগঞ্জ থানার কিছু অংশ, রংপুর কোতওয়ালী থানার কিছু অংশ নিয়ে এই বিরাট এলাকা জুড়ে যুদ্ধটি হয়েছিল, যাতে শত্রু পক্ষ মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা হতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে না পারে, সেজন্য রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গড় কেল্লাগুলি খুবই শক্ত করে গড়ে তোলা হয়েছিল। বামনগড় নামে যে গড়টির নাম রয়েছে অদ্যাবধি পর্যন্ত এই

বামনই হলেন রাজা ভবানী পাঠক। রানীগঞ্জ বাজারের ২ মাইল উত্তরে যে গড়পাড়া নাম রয়েছে ওটা রানী ভবানীর গড় ছিল। এখন অবধি রানীগড় বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য গড় বা দুর্গগুলি ঐ সময় কালের নির্মিত। তত্ত্বাবধায়ক প্রধান ছিলেন রাজা ভবানী পাঠক এবং নবাব নুরুদ্দীন বাকের জঙ্গ। রাজা ভবানী পাঠক নবাবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সভাসদ ছিলেন, এ সব কথা প্রাচীন লোকদের মুখে আমি শুনেছি। তারা বংশ পরম্পরায় এসব কথা শুনে আসছেন. ইংরাজ সেনানীদের বুকে ত্রাস সঞ্চারকারী সুদক্ষ সেনানায়ক ও দেশপ্রেমিক রাজা ভবানী পাঠকের কুড়িগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত পাঠক পাড়া গ্রামেই প্রাসাদটি শুধু ধুলিসাতই করা হয় নাই, মৃত্তিকার নীচে যে সব ইট ছিল সে সমস্তও উঠিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সমস্ত চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার জন্য। রাজবাড়ি বলে বামনের গড়ের অনতিদূরে রাজার বাড়ি নামে একটি ইটের ধ্বংসস্তূপ রয়েছে।

ফুলখাঁর চাকলা
রাজার হাট, রংপুর
২৫/৪/৮৩ ইং

প্রিয় বরেষু,
হায়দার আলী চৌধুরী সাহেব,

আদাব রইল। আশা করি ভালই আছেন। আপনার প্রেরিত চিঠিখানা বিলম্বে পৌঁছেছে হেতু আমারও উত্তরদানে কিছুটা বিলম্ব হল; তজ্জন্য মনে কিছু নিবেন না। আপনার কথামত বিস্তারিত বিবরণ লিখে জানাচ্ছি।

রাজা ভবানী পাঠকের প্রাসাদ ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়েছে বলা যেতে পারে। ভবানী পাঠকের দীঘি–ও প্রাসাদ ইত্যাদি ছিল রঙ্গপুর জেলার উলিপুর থানার সদ্য ঘোষিত-রাজার হাট থানা। ২ নং চাকীর পাশের ইউনিয়নের রতিরাম কোমল ওঝা মৌজায় অবস্থিত। উল্লিখিত পুকুরটির পূর্বদিকে-কুটিবাড়ী-ছিল'। যাহার নাম অদ্যাবধিও বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বে ঘোরতর জঙ্গলাকার অবস্থায় ছিল। পুকুরটির দক্ষিণ দিকে-একটি সরোবর আজও আছে। সরোবরটিকে এখন লোকেরা নাওথোয়ার বিল নামে বলিয়া থাকে। পুকুরটির পূর্ব পাড়ে কালীমন্দির (এখন টিনের ঘর)। উক্ত কালীমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন আমার জানাশুনা অবস্থায় পূর্ণচন্দ্র উপাধ্যায় পিতামৃত ভুবনচন্দ্র-উপাধ্যায় ও আমার পিতা মৃত রামচন্দ্র

ঝাঁ। উক্ত দীঘিটির অল্প পশ্চিমে আর একটি পুকুর আছে, যাহা আজও ভবানী পাঠকের পাছ দীঘি (পশ্চিম) নামে পরিচিত। কালীমন্দির সংলগ্ন-দীঘিটি জনৈক মুসলমানের নিকট আর পাছ দীঘিটি অর্থাৎ পশ্চিম পুকুরটি জনৈক হিন্দুর অধিকারে রয়েছে। আমিও পূর্বে কালী বাড়ীতে সেবাইত ছিলাম। কিন্তু এখন শরীরও চলে না, আর্থিক দিকও ভাল নাই। রাজা ভবানী পাঠকের গ্রাম হইতে-আমার গ্রাম ১½—২ মাইল পূর্বদিকে।

আমার বাড়ীর একবারে সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বে একটি বিরাট আকারের প্রাসাদ বা কাছারী বাড়ী ছিল দুই মহলা দালান। অনেক পরে কুচবিহারের রাজা তার এখানকার নিজস্ব জমিদারীর কাছারী বাড়ী করিয়াছিল। এখনও বাড়ীটির অনেক কিছু আছে। স্থানীয় লোকজন ও অন্যান্য ধনীরা অনেক ইট-দালান ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। এখানে অনেক জাতীয় সম্পদ রহিয়াছে। রাজার হাট—এটিও ভবানী পাঠক রাজাদের বংশীয় পরিচয় দেয়। রাজার হাটের সংলগ্ন-দক্ষিণ-পশ্চিমে—সৈন্যদের গুলী ছুড়ার জন্য স্থানটিকে এখন অবধি লোকজন চাঁদমারী বলিয়া থাকে। চাঁদমারীর লাগা দক্ষিণে এখন একটি কলেজ বসেছে। কলেজের কিছু দক্ষিণ দিকে রাজা পাঠকের বিরাট আকারে একটি পরিখা রহিয়াছে। পরিখার চতুষ্পার্শ্বে বার মাসই এখন অবধি জল থাকে, কোথাও ৩০ হাত, কোথাও ২৫ হাত, কোথাও ১২ হাত জল। রাজার কোট, বৈকুণ্ঠ এ সব নাম স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে। রাজার হাট-রেলষ্টেশন হইতে রাজার প্রাসাদ, কালীমন্দির, দীঘি ইত্যাদির দূরত্ব ২½ মাইল। কালীমন্দির হইতে একটি রাস্তা পূর্ব-দক্ষিণে গিয়াছে। রাস্তাটির নাম রাজার মাল্লি। নাও-থোয়ার বিলের পার্শ্বে যে কুঠিটি রহিয়াছিল সেখানে নবাব, সুবাদার-আসিয়া সময় সময় বাস করতেন। সরোবরটিতে হাওয়া খাওয়ার জন্য নৌকা বিহার করতেন। এই সব অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বব্যাপী আমাদের মত সকল ব্রাহ্মণ শ্রেণী ও নানা জাতীর হিন্দু মুসলমান সবাই পূর্ব হতে এখন অবধি সাক্ষ্য দিবে যে রাজা ভবানী পাঠকের ঊর্ধ্বতন বংশীয়গণ এই স্থানে বসবাস করিতেন। ইহারা বিরাট বড় জমিদার ও প্রজারঞ্জক ছিলেন।

আপনার পত্র অনুযায়ী লিখিতেছি ভবানী পাঠকের অধস্তন পুরুষ বিশ্বনাথ পাঠক পাঠকপাড়া গ্রাম ছেড়ে আমাদের ফুলখাঁ চাকমা গ্রামে এসেছিলেন।

প্রিয়নাথ পাঠকের সহিত আমাদের আত্মীয়তা প্রথম গড়ে উঠে আমার পিসীমা (বাবার বোন) কে প্রিয়নাথ পাঠক বিয়ে করেন। আমি উল্লিখিত কালীমন্দিরে ২ বৎসর পুরোহিত ছিলাম। উক্ত কালীমন্দির এখন শিমুলতলা স্থানে রহিয়াছে। আপনার কথামত এই পত্র লিখে জানাইলাম। আর বিশেষ কি ? আমার নাম গোপাল লাল ঝাঁ। আদাবান্তে—

আপনার
গোপাল লাল ঝাঁ,
ফুল খাঁ চাকলা
পোঃ রাজার হাট
রঙ্গপুর
২৫।৪।৮৩

শ্রদ্ধেয় সুধীগণ,

আমরা চিরস্মরণীয়া রানী ভবানীর মাতাপিতার নাম, পরিচয় ও নিবাস জানতে চেয়ে যে পত্র লিখেছিলাম শেখ ময়েনউদ্দিন সাহেবের নিকট সেই পত্রের জবাবে যা লিখেছেন তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

শ্রদ্ধেয় হায়দার আলী সাহেব,

আপনি যে প্রশ্ন করে পত্র লিখেছেন তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে জবাব দিচ্ছি। রানী ভবানীর পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী, মাতার নাম শ্রীতমা দেবী চৌধুরানী ছাতিন গ্রাম নিবাস। পরগনে বগুড়া, জেলা বগুড়া।

ভবদীয়
শেখ ময়েনউদ্দীন
নিবাস ছাতিন গ্রাম
প্রকাশ্য সান্তাহার
পোঃ সান্তাহার
জেলা বগুড়া
তাং ৯।৫।৮৬ ইং

The District of Rungpore
Page 27

Sorooppore formed part of the Nattore Zemindary under Rajshahye. and lay as an Alsatila on the road between Rungpore and Dinagepore, a convenient refuge for evil-doers. It was sold at Calcutta for arrears and Purchased by Dorpa Narain Thakur, ... 1787... ”

“রাজশাহীর মধ্যে স্বরূপপুর -নাটোর জমিদারীর অংশ ছিল। রংপুর এবং দিনাজপুরের মধ্যবর্ত্তী রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল আলসেটিলা নামে পরিচিত। এ জায়গাটি দুষ্কৃতিকারী লোকজনের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। এই জমিদারী-কলিকাতার বকেয়া বাকী জন্য বিক্রি হয় এবং দর্পনারায়ণ ঠাকুর ইহা--ক্রয় করেন ... ... ১৭৮৭ ... ...”

রঙ্গপুরের স্বরূপপুর পরগনা নাটোরের রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। আসল সত্য কথা হল উক্ত স্বরূপপুর পরগনায় দিলালপুর নামক স্থানে ইংরাজ বিরোধী লোকদের একটি শক্ত ঘাটি বা দুর্গ ছিল। ইংরাজ বিরোধী লোকদিগকেই দুষ্কৃতিকারী এখানে বলা হচ্ছে। আল সেটিলা এই শব্দ বা নাম এটা ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের একটা সাংকেতিক নাম হবে বলে আমরা মনে করি। কেননা গোটা স্বরূপপুর পরগনায় ঐ ধরনের কোন স্থান বা জায়গার নাম আমরা খুঁজে পাই নাই। যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট রেকর্ড-এ ৯৫ পৃষ্ঠা-১১৯ নং এ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর কথা বলতে গিয়ে বলছেন—ব্যাটোরিয়ায় ১ বৎসর ধরে আছেন এই ধরনের কথা বলছেন কিন্তু ব্যাটোরিয়া নামক জায়গাটি কোথায় অবস্থিত তা খুঁজে পাওয়া যায় নাই। ইংরাজী বাংলা অভিধানেও ব্যাটোরিয়া শব্দ নাই। এটাও সাম্রাজ্যবাদীদের সাংকেতিক নাম হবে বলে আমরা মনে করি। উক্ত স্বরূপপুর পরগনায় দিলালপুর নামক গ্রামে দিলার খাঁ ও আসালত খাঁ—দুই জেনারেল সহোদর ভ্রাতার কবর বাধানো অবস্থায় এখন অবধি রয়েছে। লাগা পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে ৯ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ, যা রঙ্গপুর দিনাজপুর জিলার আর কোথাও নাই। ১৯২৬-২৭ সাল (১৩৩৩-৩৪ বাংলা সাল)

এর মধ্যে একজন ইংরাজ এবং কয়েকজন দারোগা পুলিশ সহ এসে মসজিদের লাগানো শিলালিপিটি খুলে নিয়ে যান। এসব কথা স্থানীয় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখনও বলে থাকেন। আলসেটিলা এবং ব্যাটোরিয়া অর্থ ইংরাজরাই জানতেন এবং সেইমত কাজ করেছেন বলে আমরা মনে করি। উক্ত মসজিদের অনুমান ½ অর্ধ মাইল দূরে পাশাপাশি ২ দুটি মন্দির রয়েছে। বাদশাহ শাহ আলমের যুদ্ধজয়ের পর মন্দির, মসজিদ ও কবর, দুইটি বাঁধানো হয়েছে।

রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট রেকার্ডের কথা

The District of Rungpore
Page 26

··· Dinagepore was put under general charge of the Rungpore Collector during the two years of Devi Singh's from -1781-1783, and the collector was directed to reside occasionally at Denagepore to be a check upon the farmer''

··· ··· ১৭৮১-৮৩ সালে দুই বৎসরের জন্য দিনাজপুর দেবী সিংহের খামার বাড়ী রংপুরের কালেকটরের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয় এবং রংপুরের কালেকটরকে সময় সময় খামার বাড়ী দেখা-শুনা করার জন্য দিনাজপুরে অবস্থান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।''

১৭৮১-৮৩ সালে দেবীসিংহ কেন; খোদ ইংরেজদের কোন পাত্তাই ছিল না। এই সব এলাকায় দেবীসিংহের খামার বাড়ী ছিল না। খামার বাড়ী ছিল কামালউদ্দীন মোহাম্মদ জঙ্গ-এর। তার অন্যান্য খামারগুলির মত এবং এই সব বিস্তৃত এলাকায় কামাল-এর জমিদারী ছিল বলে লোকমুখে শোনা যায়। বিষয়গুলিকে চাপা দেওয়ার জন্যই The Bengal District Records -Rangpore ১৯১৪ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল।

The Rungpore District
Page 26

"Idrakpure and Dinagepore, known respectively as nine annas and seven annas Ghoraghat were the remains of the large hemindary of that name and the Sicca Mahala, five Jaghir estates held a fixed rates thus denominated, were separated talooks of the same zemindary, which at the time, of which we wrote, comprised in its two shares the greater part of the Dinagepore district, or portion of Rungpore to the south and near the whole of the present district of Maldah and Bogra…"

"ইদরাকপুর এবং দিনাজপুর ঘোড়াঘাটের ৯ আনা ও সাত আনা অংশ হিসাবে পরিচিত এবং ঐ নামীয় (ঘোড়াঘাট) জমিদারীর অংশ remains) বিশেষ শিককা মহল পাঁচটি জায়গীর জমিদারীর নির্ধারিত খাজনা ছিল। উক্ত জমিদারী ঐ নামীয় জমিদারীর (ঘোড়াঘাট) পৃথক অংশ বিশেষ। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময় উপরোক্ত জমিদারী দুইটি অংশ গঠিত ছিল। এই জমিদারী দিনাজপুর জেলার বৃহত্তর অংশ ও রংপুরের দক্ষিণ অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ বর্তমান মালদহ ও বগুড়া জেলার নিকটবর্তী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অংশের বেশ কয়েকটি পরগনা চিরস্মরণীয়া বীরাঙ্গনা রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ সব জায়গার বিস্তৃত অংশে ইংরাজ মীরজাফর বিরোধী গড় কোটি দুর্গাদি নির্মাণ করা হয়েছিল জন্যে ১৯১৪ সালের লিখিত Bengal District Records Rungpore-এ সচেতনভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু প্রাচ্য বিদ্যামহার্নব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় তার বিশ্বকোষে উল্লেখ করেছেন দিনাজপুর জিলায়ও রানী ভবানীর জমিদারী ছিল।

The District of Rungpore
Page 14

"In 1785—Cazeerhat was then divided among five sharers one. the only Mahommedan Zeminder among the lot, held 4½ annas of the Chakla ; and another, who held the two annas share, the Tooshvanda Zemindary was discovered (by adoption) from one Murari Bhattacharjya, who had migrated into Cooch Behar."

"১৭৮৫—কাজীর হাট পরগনা (চাকমা) তখনকার দিনে পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন জমিদারই মুসলমান। উক্ত চাকলার মধ্যে তাঁহার ৪½ আনা অংশ ছিল। উক্ত চাকলার দুই আনা

অংশ অন্য একজন জমিদারের অধীন। তাহা তুষভান্ডার জমিদারী বলে পরিচিত, যিনি মুরারী ভট্যাচার্য্যের পোষ্যগত বংশধর।····"

কাজীর হাট চাকলা জমিদারীটির কথা সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ লেখক বলছেন, ৫জন জমিদার। ইহাদের মধ্যে তুষভান্ডার (তুষভাণ্ডার) জমিদার আর একজনের নাম বলা হচ্ছে মুরারী ভট্টাচার্য। বাকী ৩ জনের মধ্যে ১ জনকে বলা হচ্ছে মুসলমান ৪½ আনা অংশ চাকলা। অপর দুইজনকে আমরা মনে করি ইংরাজ বিরোধী হিন্দু। যেজন্য তাদেরও নাম উল্লেখ করা হয় নাই। নাম না বলা মুসলমান জমিদারটি কি কামাল ? লোকেরাও তাই বলেন। অপর দুইজন শিবচন্দ্র রায় জমিদার ও তাহার ভ্রাতা বলে লোকেরা এখন অবধি বলে থাকেন।

আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া সাহেবের বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ গ্রন্থ হইতে নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করা হল ঃ

(দিনাজপুর জেলার) "ফুলবাড়ী থেকে পূর্ব উত্তর দিকে জেলা পরিষদের রাস্তা ধরে আফতাবগঞ্জ হাটের দূরত্ব প্রায় ৫ মাইল। সেখান থেকে আরও প্রায় পূর্ব উত্তরে একটি জঙ্গল ঘেরা স্থান পাওয়া যায়। প্রাচীন করতোয়া নদীর একটি মৃতপ্রায় খাত, এ স্থানের পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত জঙ্গলের পাশে প্রায় ২ বিঘা জমির উপরে আছে একটি উঁচু ঢিবি। ঢিবিটি প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ। এ ঢিবি থেকে ২০০ গজ দূরে অনুরূপ আকার ও আয়তনের আরও একটি ঢিবি আছে। ঢিবিগুলির উচ্চতা বর্তমানে ২০ ফুটের বেশী না। স্থানীয় লোকদের মতে এখানে আরও অনেক ঢিবি ও একটি দুর্গ ছিল। সেগুলি নাকি নষ্ট হয়ে গেছে। লোকে বলে যে বর্তমান ঢিবিগুলিতে নাকি সোনারূপার মুদ্রা পাওয়া যায়। ঢিবিগুলিতে প্রাচীন আমলের কাপড়ও পাওয়া গেছে বলে স্থানীয় লোকেরা বলে। জনপ্রবাদ মতে এ স্থানের নাম বামনগড়।

বামনগড় ৭৪ পৃষ্ঠা পুস্তক। এককালে নাকি এক ব্রাহ্মণ রাজার রাজধানী ছিল এখানে। ফুলবাড়ীর রাজা গোবিন্দ (ফুলবাড়ী দুর্গ দ্রষ্টব্য) নাকি তাকে অপমান করেছিলেন এবং তার অভিশাপে নাকি ফুলবাড়ীর রাজা কানা হয়ে যান এবং পরে রাজ্য ও প্রাণ হারান "৭৫ পৃষ্ঠা। আফতাবগঞ্জ হাট থেকে শালবনের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটি নওয়াবগঞ্জ চলে

গেছে তার মাঝামাঝি স্থানে রাস্তার পাশেই একটি উঁচু ঢিবি আছে। প্রায় দুই বিঘা জমির উপর অবস্থিত। এই ঢিবির উচ্চতা প্রায় কুড়ি ফুট। ঢিবির ভিতর প্রচুর প্রাচীন ইট আছে, এটাকেও বামনগড় বলা হয়ে থাকে এবং"

১১০ পৃষ্ঠা ঘোড়াঘাট দুর্গ; বর্ত্তমান ঘোড়াঘাট শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে প্রায় অর্দ্ধমাইল দক্ষিণে এ বিরাট দুর্গ অবস্থিত। "গড়ের ভিতরে মোগল আমলের অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।"

১২৩ পৃষ্ঠা "গড় ভবানীপুর খোর্দ ও ভাতুরিয়া "গড় ভবানীপুর খোর্দ অর্থাৎ ছোট ভবানীপুর দুর্গ। রানী কাঙ্কল আনার দক্ষিণ প্রান্তে ভারতের সীমানার কাছে অবস্থিত উত্তর দক্ষিণে লম্বা এ মাটির দুর্গের আয়তন ৫০০০ × ২৫০০ ফুট। এর পূর্ব দিকে ঘেঁষে প্রবাহিত ছিল গণ্ডরা বিল নামে পরিচিত, কুলিক নদীর একটি শাখা। দক্ষিণ দিক দিয়েও এ নদী প্রবাহিত। পশ্চিম দিকও সুরক্ষিত ছিল আর একটি জলধারার সাহায্যে। উত্তর দিকের কথা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে মনে হয় চারদিক দিয়ে স্বাভাবিক জলধারা দিয়ে দুর্গটি পরিবেষ্টিত ছিল। বর্ত্তমান কালে (১৯৬৮ খৃঃ) বিল বা নদীর কোন অস্তিত্ব নাই। চারিদিকেই আছে এখন কৃষি ভূমি।

গড়ের মাটীর দেওয়াল এখনও অটুট আছে। দেওয়ালগুলির উচ্চতা এখন ৭।৮ ফুটের বেশী নয়। দেওয়ালের বাইরে ছিল মোটামুটি প্রশস্ত পরিখা. এখন সেগুলি মজে গেছে। (গড়ের দক্ষিণে যে গ্রামটি আছে তার নাম ভাতুরিয়া)"

১৫০ পৃষ্ঠা সাতগড়া ঃ

বড়বীলা পরগনা রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত পীরগঞ্জ, (থানা) রংপুর থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে-দক্ষিণ দিকে কিছুদূরে গেলেই লাল মাটির অঞ্চল দেখা যায়। আরও বেশ কিছুদূর গেলে পাটগ্রাম বাহাদুরপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি চোখে পড়ে। সেই এলাকায় পর পর ৭টি গড় বা দুর্গ আছে।

এক দুর্গের গায়ে লাগানো অন্য দুর্গ এবং সব কটা দুর্গই আলাদা ভাবে নির্মিত এবং এগুলি কোন একক দুর্গের ভিতর ও বাইরের প্রাচীর নয়। প্রায় ৩ বর্গমাইল স্থান জুড়ে এই ৭টি দুর্গ অবস্থিত। লাল মাটির প্রাচীর অনেক স্থানে ভেঙ্গে গেছে, কোন কোন প্রাচীর

একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—ফলে দুর্গগুলির প্রকৃত স্বরূপ কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা খুব সহজ নয়। সাতটি গড়ের অস্তিত্ব আছে বলে নাম সাতগড়া।

এই সাতটি গড়ের শেষ অর্থাৎ সর্ব পশ্চিম দিকের গড়টি একটু বিচিত্র ধরনের। সাতগড়া এলাকার সর্বশেষ অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই দুর্গটি আকারে সবচেয়ে বড়। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ দুর্গের আয়তন প্রায় ৪৫০০×৬০০ ফুট। প্রশস্ত মাটির প্রাচীরগুলি এখনও ৭ ফুট উঁচু, কিন্তু প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় সমগ্র এলাকা জুড়ে আছে একটি বিল। নাম চাপনদহ বা চাপাদহ বিল। একটি বিলের চারিদিকে বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে -বিলটিকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল এমন ধারণা খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।”

“সাতগড়ার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।”

৭০ পৃষ্ঠা দিনাজপুর জেলা ঃ

“বেলাইলোই চণ্ডী থানা পার্বতীপুর। ৭০ পৃষ্ঠা

“পার্বতীপুর রেলজংশন থেকে উত্তর দিকে বেলাই চণ্ডী”

রেল-ষ্টেষন এর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, বেলাইচণ্ডী গ্রামের চারিদিকে আছে অসংখ্য প্রাচীন জলাশয়। এগুলির কোন কোনটির আয়তন প্রায় ১০০ বিঘা। ষ্টেষনের পশ্চিম দিকেই আছে কয়েকটি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ।

এগুলির মধ্যে একটিকে বলা হয় বিরাট রাজার দুর্গ। প্রায় বর্গাকারে নির্মিত। দুর্গটির প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ৬০০ ফুট লম্বা। দুর্গের ভিতর কয়েকটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ছিল। ইট হরণকারীদের দৌরাত্ম্যে-দুর্গ ও সেই সব এখন নিশ্চিত হয়ে গেছে।”

৮২ পৃষ্ঠা ঃ “চণ্ডীপুর গড় পিঙলাই।”

বিরামপুর (চরকাই রেল ষ্টেষন) থেকে জেলা পরিষদের রাস্তা ধরে ফুলবাড়ী যাওয়ার পথে যমুনা নদীর একাট প্রাচীন খাতের উপর যে ছোট পাকা ব্রীজটি পড়ে, তা পার হয়ে রাস্তা করে উত্তর দিকে যেতে রাস্তার পশ্চিম দিকে পড়ে যমুনা নদীর প্রাচীন ধারার উপর একটি বড় বিল। রাস্তার পূর্ব পার্শ্বের অধিকাংশ স্থান জুড়ে শালবনে ঢাকা। মাঝে মাঝে সাওতাল ও কিছু বহিরাগত মুসলমানের বসতি।

বিরামপুরের উত্তরে প্রায় ৫ মাইল দীর্ঘ এ প্রাচীন স্থান চণ্ডিপুর গড় পিঙলাই নামে পরিচিত। এ স্থানের দক্ষিণ ভাগে পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন খুব বেশী নেই যে তা নয়, তবে সংখ্যায় কম। তদুপরি বসতির চাপে ও শালবনে অনেক কীর্ত্তিই বোধ হয় চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু তার পরেই অসংখ্য প্রত্নকীর্তির চিহ্ন দেখা যায়।

পশ্চিম বিলের পাড় থেকে শুরু করে পূর্বদিকে রেললাইন এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩ মাইল দীর্ঘস্থান জুড়ে কত প্রাচীন কীর্ত্তির যে ধ্বংসাবশেষ যে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে এ অঞ্চলে প্রাচীন ইটে পরিপূর্ণ ১৫১ টি ঢিবি ছিল। ক্রমবর্ধমান জনবসতির চাপে ১৯৬৭-৬৯ খৃষ্টাব্দের দিকে ঢিবির সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ টি। বর্ত্তমানে আরও কমে গেছে। এখন সেখানে ২৫টি ঢিবিও অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে কিনা সন্দেহ। শুধু ঢিবি নয়, ঢিবির পাশাপাশি অবস্থিত সমতল ভূমিতেও অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ছিল। এক কথায় ৬ বর্গমাইল স্থান জুড়ে একটি অতি সমৃদ্ধশালী জনপদের অস্তিত্ব।"

"চণ্ডীপুরে একটি রাজবাড়ী বা প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা যায়।"

—বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ ঃ আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া,
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী থানা হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে রানী নগর অবস্থিত। রানী নগর মাদলা হাট হইতে পাঁচ ছয় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখানে বেশ কিছু উঁচু ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়। এখানে রানী ভবানী গড় বা দুর্গ ছিল। সৈন্যরা যেখানে সওদাপাতি করতেন, সেই স্থানটির নাম এখন অবধি রয়েছে রানী নগর। এখানে পুকুর নালা দেখতে পাওয়া যায়। শালবন ও অন্যান্য জঙ্গলাকীর্ণ গাছ-গাছালি দিয়ে স্থানগুলি ঢাকা ছিল। দৌলতপুরের কাছাকাছি হতে দীঘি পুকুর ইত্যাদি চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে রয়েছে।

এম. আর. আখতার মুকুল, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা ঢাকা শুক্রবার ৩১ শে শ্রাবণ ১৩৯২ সাল। উক্ত পত্রিকায় ঐতিহাসিক আখতার সাহেব যা

ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টারের লেখা হতে উদ্ধৃত করেছেন, তা হতে আমরা এখানে কিছুটা হুবহু উদ্ধৃত করে দিয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব ঃ

"১৭৯৩ সালেই বাকী খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়ীতেই বন্দী করা হয়।"

"১৮০০ সালের মধ্যে দিনাজপুর রাজবংশের প্রায় সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়।"

"১৯৭৫ সালের ২৭ শে মার্চ গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের নিকট দাখিলকৃত সিলেকট কমিটির এক রিপোর্টে বলা হয় ঃ

"বাংলাদেশের বাকী রাজস্বের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই দুজনের কাছে বাকী ঃ

বীরভূম ও রাজশাহীর জমিদার।"

১৭৯৬—১৭৯৮ সালের মধ্যে ৫৫ লাখ ২১ হাজার ২৫২৲ টাকার রাজস্ব-ওয়ালা জমিদারী নিলামের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই টাকা মোট জমির প্রাপ্য খাজনার এক পঞ্চমাংশের মত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পরবর্তী ২২ বছরের মধ্যে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্দ্ধেক পরিমাণ জমিদারী নিলামে বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়। অর্থাৎ বনেদী জমিদারদের হাত থেকে নব্য ধনীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দিনাজপুর রাজবংশের সব সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়।"

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বেঙ্গল এম, এস রেকর্ড, চার
ভলিউম, লন্ডন ১৮৯৪ ঃ ১ নং ভলিউম (ভূমিকার)

হান্টার সাহেবের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে জানা যাচ্ছে যে ১৭৯৩ সালেই বাকী খাজনার দায়ে নাটোরের রাজাকে রাজবাড়ীতেই বন্দী করা হয়। ১৭৯৩ সালে কোন পুরুষ রাজা ছিল না। রানী ভবানীই বেঁচেছিলেন এবং তাকেই গৃহবন্দী করে রাখা হয়। সত্য কথাটি হান্টার সাহেব পুরা-পুরি বলেন নাই। অন্তত ঃ উচ্চ বর্ণ হিন্দুরা যাতে চটে না যায়—এই তার কারণ। আসলে রানী ভবানী যেমন ১৭৯৩ সালে বেঁচেছিলেন তা ইতিহাস হতেই খুব পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তা হল এই—১১৫৩ সালে ৩২ বৎসর বয়সে রানীর স্বামী মারা যান।৭৯ বৎসরে রানীর মৃত্যু হয়, ইহা হইতে জানা যাচ্ছে যে ১৭৯৩ সালেও রানী বেঁচেছিলেন।

আমরা মনে করি এই ইংরাজ বিরোধী স্বাধীনচেতা, নির্ভীক রানী ভবানী উত্তরবঙ্গে—বিশেষ করে রংপুর দিনাজপুরে যে সব গড়, দুর্গ, কোট ও কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন তার সিংহভাগ রানীর পরগনাতেই হয়েছিল এবং এখনও তার অনেক ধ্বংসাবশেষ চিহ্নাদি পাওয়া যায়—তা আমাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের ইতিহাস গোপনের অপচেষ্টা

ডব্লিউ, ডব্লিউ হাণ্টার সাহেব ১৮৭১ খৃঃ "The Indian Musalmans" গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন। অবশ্য অনেক রকম ধুম্রজালের কৌশল বিস্তার করে-গ্রন্থটি লেখা হয়, যাতে এ দেশীয় পাঠকরা-আসল বিষয়গুলি অর্থাৎ এ দেশীয় লোকদের উপকারে-আসে বা আসতে পারে-সে জিনিস গুলি অত্যন্ত চাতুর্যের সহিত সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় বলা হয়েছে, যাতে লিখিত চাপা দেওয়া ঘটনাগুলি ও স্থানগুলির দিশা পাঠকরা বুঝতে ও ধরতে না পারেন। ইহা সংকোচহীন স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে ইংরাজ আমলের সমস্ত খুঁটিনাটি ছোট বড় ঘটনাগুলি বিষয়ে ইংরাজরা বিলক্ষণ জানতেন, কিন্তু আমরা কিছুই জানতাম না, ইংরাজ আমলের সত্যিকারের ইতিহাস না লেখার জন্য।

গর্বের জন্যই হউক বা সাম্রাজ্যবাদী বড় উপরওয়ালাদের খুশী করবার জন্যই হউক, অথবা অসাবধনতার জন্যই হউক হাণ্টার সাহেব যা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"The English obtained Bengal simply as the chief Revenue officer of the Delhi Emperor. Instead of buying the appointment by a fat bribe, won it by the sword. But our legal title was simply that of the Emperor's Diwan or chief Revenue officer."

The Indian Musalmans
June, 1975, Page 144

অর্থ ঃ বাংলায় ইংরাজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়--দিল্লীর বাদশাহর প্রধান রাজস্ব অফিসারের দায়িত্ব লাভের ঘটনার মাধ্যমে। মোটা অংকের উৎকোচ দেওয়ার পরিবর্তে তলোয়ারের জোরেই এই নিয়োগ আমরা ক্রয় করেছি। কিন্তু আমাদের পদের নাম ছিল বাদশাহর দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব অফিসার।"

আমাদের কথা হল ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশী প্রান্তরে যে পরাজয় আমাদের হল তা কি প্রধান সেনাপতি, অন্যান্য সেনানায়ক এবং রাজকার্যে নিযুক্ত অন্যান্য পদস্থ এবং আরও কতিপয়—আমীর ওমরাহদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজয় বরণ করতে হয় নাই কি ? আসলে যুদ্ধটাই কি হয়েছিল না যুদ্ধের অভিনয় হয়েছিল মাত্র ? তলোয়ারের জোরে ইংরাজরা জয়লাভ করতে পারে নাই। ১৭৬০ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে ব্যাটেল অব মসিমপুর যুদ্ধে মীরজাফর ও ইংরাজ পক্ষ হেরে গিয়েছিল—এটা তো ইংরাজদেরই স্বীকৃত কথা। তার পরে বাংলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে ইংরাজরা ১৭৬০ হতে—১৭৮৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহ তক যা জানা যায়, উত্তর বাঙ্গলায় তারা ফৌজ নিয়ে ঢুকতে পারেন নাই।

এর যথাযথ প্রমাণ আমরা সামান্য যা সংগ্রহ করতে পেরেছি উহাতেই স্পষ্টভাবে জানা যাবে।

১৭৮৩ খৃস্টাব্দে নবাব মীর্জা নূরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গকে এ দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে অতর্কিত আক্রমণ করে মারা হয় নাই কি ? যতটুকু জানা যায় গুপ্তহত্যা, চাকুরী, সম্পত্তি ও জমিদারী ঘুষ দিয়ে এদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তলোয়ারের জোরে নয়।

এখানে ইতিহাসের গবেষক ও সচেতন পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে ১৭৬০ খৃস্টাব্দের পর বিশেষ করে ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট বাদশাহর নিকট হতে ফরমান লওয়ার সময়কালে বা তার কিছু পূর্ব পর্যন্ত ইংরাজরা কিভাবে, কেমন করে সম্রাট ২য় শাহ আলমকে বন্দী করে এই ফরমান নিয়েছিল কিনা ?

ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে জেনারেল স্মিথ নামক এক ইংরাজ বাদশাহ ২য় শাহ্ আলমের রক্ষক স্বরূপ ছিল। চমৎকার গালভরা কথা বটে ! একেত সাম্রাজ্যবাদী এক ইংরেজ, তার উপর জেনারেল পদবীটাও দেখা যাচ্ছে। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ইংরাজরা সম্রাটকে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং সেই বন্দী অবস্থায় বাংলা সুবার তহশীলদারী কি নেয়া হয়েছিল ? রোহিলা সর্দার গোলাম কাদির খাঁ সম্রাটের দুই চক্ষু উৎপাটন করে এবং মারাঠা সৈনিকরা গোলাম কাদিরকে উপযুক্ত শাস্তি দান করেন, অতঃপর সিন্ধিয়া রাজ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে

প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে হিন্দু মুসলমান ঐক্যই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা শাহ্ আলম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণবের বিশ্বকোষ হতে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"শাহ্ আলম (১৭২৮-১৮০৬)-দিল্লীর সম্রাট ২য় আলমগীরের পুত্র। আলী গৌহার তাহার পূর্ব্ব নাম। ১৭৫৯ সালে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। "জেনারেল স্মিথ তাহার রক্ষক স্বরূপ ছিলেন। তিনি দিল্লীতে পলায়ন করিলে ১৭৮৮-এ রোহিলা সর্দার গোলাম কাদির খাঁ তাহাকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাহার দুই চক্ষু উৎপাটন করেন। অতঃপর সিন্ধিয়া রাজ তাহাকে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।"

বিশ্বকোষ ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু
সংকলিত ও প্রকাশিত

কবি রতিরাম দাশের প্রসিদ্ধ জাগেরগানে বলা হচ্ছে। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী)

'.করিতে হইবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলো করিবে সব হইবে না নীচু।"

এই যে ভাগলপুর হতে ঢাকা পর্যন্ত রানী ভবানীর পূর্বপশ্চিমে বিশাল জমিদারী এবং উত্তর দক্ষিণ বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, যশোর, ফরিদপুর, পাবনা, সাঁওতাল পরগনা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও সমগ্র রাজশাহী (৩টি পরগনা বাদে) জেলায় বিস্তৃত জমিদারী ছিল এই আপন মাতার মত দয়াশীলা রানী ভবানীর। প্রজাগণ রানীর মত ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন নাই কি ? এসব বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রকৃত ইতিহাস আমাদের কি লেখা উচিত নয় নব চেতনা নব জাগরণ আনয়নের জন্য ?

শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণ ইংরাজ বিরোধী নেতৃ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী এবং ইংরাজ বিরোধী নেতা শিবচন্দ্র রায় চৌধুরীর খাজনা বাকীর কথা লিখিত Bengal District Records Rungpore-এ উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু তারা যে খাজনা দেন নাই বা ইংরাজরা ঐ সময়গুলিতে উত্তর বাংলায় প্রকাশ্যভাবে ঢুকতে পারেন নাই, সে কথা-কোনক্রমেই বলছেন না। ঠিক তদ্রূপই বীরভূমের রাজা এবং রাজশাহীর জমিদার রানী ভবানী এবং অন্যান্য বনেদী জমিদার ইংরাজদেরকে খাজনাও দেন নাই, সহযোগিতাও করেন নাই এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও করেছেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। যার ফ

বনেদী জমিদারদের হাত নব্য নব্য ধনীদের নিকট জমিদারী হস্তান্তরিত হয়। ভারতের জনসাধারণ ঐ সময়গুলিতেও বাদশাহ শাহ আলম ২য় কে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং সম্রাট বলে মানতেন তা দেশ বিখ্যাত ঐতিহাসিক বিচারক ও ইতিহাসের গবেষক মহাশয় কি বলেন তা দেখুন ঃ

“বাদশাহ-শাহ আলম-সম্পত্তিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু জনসাধারণের সম্মান হইতে-খলিত হন নাই।”

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ শ্রী রজনী কান্ত গুপ্ত
দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়,
(দিল্লী) তৃতীয় সংস্করণ
১৩১৭ সাল, ১৪৫ পৃষ্ঠা

শাহজাদা কামাল ও রানী ভবানী প্রসঙ্গে

রঙ্গপুর জেলার পূর্বের কুড়িগ্রাম মহকুমার বাহারবন্দ পরগনাধীন (বর্তমানে জেলা) রেলস্টেশন হতে সোজা দক্ষিণে ৬/৭ মাইলে পাচপীর রেলস্টেশন। রেল স্টেশনটি দুর্গাপুর নামক গ্রামে। এই নাম ইংরাজ বিরোধী নেত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। (ইংরাজদের কথিত ডাকাত দেবী চৌধুরানী) পাচপীর বা ফকীর নেতাগণ যে স্থানে তাবু ফেলে অবস্থান করেছিলেন ঐ স্থানটিকে পাচপীর বলা হয়। এই ফকীর নেতাগণ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর সহিত ছিলেন, রেলস্টেশন সংলগ্ন রেল লাইনের পূর্বধারে লাগোলাগি একটি দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টিত পরিখা দেখতে পাওয়া যায়। পরিখার পূর্বদিকে চৈত্র মাসেও দেখা গেছে ৩০ হাত গভীর জল রয়েছে। কিন্তু রেল লাইনের পার্শ্বে কোথাও শুকনা কোথাও কিছু কিছু জল রয়েছে। পরিখাটিকে স্থানীয় লোকেরা বলে থাকে গমীরের ছড়া। কিন্তু গমীরের কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই। ইহা যে সুচতুর ইংরাজদের দেওয়া নাম তা বেশ বোঝা যায়। আমরা এখন যে সব কথা বললাম এবং পরে আরও যা বলব তা বাহারবন্দ পরগনার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলির কথাই বলব। রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে বাজার রয়েছে। বাজার হতে দেড় দুই মাইল পশ্চিমে নবাবের কুঠি অবস্থিত ছিল। এই নবাব হলো মীর্জা নুরুদ্দীন বাকের জঙ্গ। নবাবের কুঠির পাশ দিয়ে একটি পুরোনো নালা রয়েছে। এখানে নবাব নৌকায় চড়ে

নৌবিহার করতেন। স্থানীয় লোকেরা উঁচু স্থানটিকে কুটির পাড় বলে থাকে। দুর্গাপুর গ্রামও কুটির পাড় হতে দেড় দুই মাইল দক্ষিণে হলো চণ্ডীজঙ্গ গ্রাম, সময় সময় এই স্থানে ইংরাজ বিরোধী নেত্রী জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী তাঁবু গেড়ে বাস করতেন, এখানে একটি পুরানো কালের মন্দির আছে, স্থানীয় গরীব গরবারা পূজা অর্চনা করেন দেখেছি। দুর্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্বে-কামাল খামার নামক গ্রাম রয়েছে। এই কামাল হলো নবাব বাকের জঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উক্ত কামাল খামার সংলগ্ন গ্রামের নাম জঙ্গজাগীর।

এখন প্রশ্ন হলো রানী ভবানীর জীবদ্দশাতেই কোন মুসলমানকে বাহারবন্দ পরগনা জাগীর দেওয়া হয়েছিল এবং কেনই বা দেওয়া হয়েছিল ? কি কারণে। এবং কোন স্বার্থে, কিসের জন্য ? ঐ সময়কার মাসে ১৭৬০ খৃস্টাব্দ হতে ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত এতদঞ্চলীয় নারী পুরুষ সবাই মিলে সংগ্রাম করেছে ইংরাজ মীরজাফরের সঙ্গে। সেই সময়কালে রাজশাহী বা নাটোরের রানী ভবানী কেনই বা এত বড় বিরাট পরগনা জায়গীর[১] দিলেন এক মুসলমানকে the District of Rungpur Records ১৯১৪ সালের গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার কারণই হলো এই যে এদেশীয় ইংরাজ বিতাড়নকারী যুবকরা ইংরাজদের যেখানে সেখানে গুলী করা, বোমা মারা শুরু করেছিল। ১৯০০ সাল বা তার কাছাকাছি সময়গুলি হতে দেশের স্বাধীনতা পিপাসু নরনারীরা ইংরাজ বিরোধী তুমুল আন্দোলন করেছিলেন। সেই সময়গুলি লক্ষ্য করে পূর্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের ও লড়াই সংগ্রামের বিষয়গুলিকে চাপা দেওয়ার জন্য উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছিল বলে মনে করি।

এখানে আমরা

Bengal District Records, Rungpur,
Vol. 1, 1770—1779 Calcutta 1414
Bengal Secretariate

---

[১] জায়গা (পারসী) : স্থান, ভূমি।

জায়গীর (পারসী) : রাজার দত্ত পুরস্কার স্বরূপ। নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি।

জায়গীরদার (পারসী) : যাহার জায়গীর আছে, মুসলমান রাজাগণ কাহারও প্রতি কোন কাজে সন্তুষ্ট হইলে, তাহাকে নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করিতেন, যাহারা এই নিষ্কর ভূমি পাইতেন তাহারা জায়গীরদার নামে অভিহিত হইতেন। বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত—

উক্ত রেকর্ডের ২৪ পৃষ্ঠায় যা লেখা রয়েছে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হল ঃ

"Through nominally entered in the name of the Natore Zaminder was from time to time held as a Jaghir by Mohmmadans and in 1872 Bissen Charan Nandy, Probably a benami for Cantoo Babu. Hastings bananian, obtained a few years from of it. His successor token out Nandy Cantoo Babu s son, from whom the present owner, Ranee Surnomonce of Cassim Bazar, Murshedabad is descended, is spoken of as the Zaminder, thus ousting the old nominal possessors. It does not appears whether any purchase money was paid for the property."

সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা যা উপরে বললেন যে কান্তবাবুকে হেষ্টিংস পরগনা বাহারবন্দ যে ইজারা দিলেন ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এত গড়, কোট দুর্গ থাকেই বা কি করে যদি ঐ সময়গুলিতে ইংরাজ রাজত্বই বা থাকে কি করে? নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কামালই হল ঐ সময়গুলিতে বাহারবন্দ পরগনার জাগীরদার। কান্ত বাবুকে হেষ্টিংস জমিদারী দিয়েছিলন শুধু কাগজে কলমে। এই সব স্থানে ইংরাজরা কখনো প্রবেশ করতে পারেন নাই।

দুঃখ ও অনুশোচনার বিষয় যে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে অসাম্প্রদায়িক সাম্প্রদায়িক দলগুলির নেতৃবৃন্দ দেশের ইতিহাসের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। অন্ততপক্ষে ইংরাজ রাজত্বের সময়কালে আমরা বাহারবন্দ পরগনায় আরো যা মাল-মসলা পেয়েছি, সে সব প্রমাণ সহ তথ্য সুধীগণকে জানাতে চাই।

উলিপুর থানার পশ্চিমদিকে মাটির তৈরী উঁচু একটি বুরুজ দেখা যায়। এখন ওর উচ্চতা ৩০ হাত, পূর্বে ওর উচ্চতা ছিল ৮০ হাতের উপরে, শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য উক্ত বুরুজ নির্মিত হয়েছিল বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন।

নরেন রায়ের বাড়ী তবকপুর গ্রামের পার্শ্বে একটি বিরাট আকারের পরিখা এখন অবধি রয়েছে। পরিখাটি বেশ গভীর। ২৫। ৩০ হাত, কোথাও ১৫। ১৬ হাত জল সব সময় থাকে। পরিখার মধ্যস্থলটিকে বলা হয় কোট।

মাদারের কুড়া এটিও একটি পূর্বের দীঘি ছিল, ইংরাজ বিরোধী ফকীররা এখানে সব সময় অবস্থান করতেন। বহু পূর্বে এক পীরের নাম ছিল মাদার

বা মাদারী খানদান। পান্ডার দীঘি, দীঘিটিতে এখনও শান বাঁধা ঘাট রয়েছে। স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় সন্ন্যাসী নেতাগণকে পান্ডা বলে হয়ে থাকে।

সন্ন্যাসীরা তাদের দলবল নিয়ে সব সময় এখানে অবস্থান করতেন। দীঘিটি দলদামে ভরে গিয়েছিল, ওপরে গরু মহিষ চড়ে বেড়াত। এক সময় ভূমিকম্পে দীঘিটি আবার সাবেক রূপ পায়। চৈত্র মাসেও এই দীঘির পানি ৩০ হাত গভীর দেখতে পাওয়া গেছে। বাহারবন্দ পরগনাটি কুড়িগ্রাম থানা, উলিপুর থানা ও চিলমারী থানার অন্তর্ভুক্ত।

“থানা কামাল” ইংরাজ বিরোধী নবাব বাকের জঙ্গ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র কামালের নামে থানা কামাল পূর্বে ছিল। থানা কামাল হতে ইংরাজরা থানার হেড্ কোয়ার্টার চিলমারী নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন কামালের নামটি মুছে ফেলার জন্য। কিন্তু বিধির কি লিখন ব্রহ্মপুত্র নদের তরঙ্গাঘাতে চিলমারী থানা সহ স্থানটি নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় আবার সেই পূর্বের যে স্থানটিতে থানা কামাল অবস্থিত ছিল, সেই স্থানটিতে নতুন করে চিলমারী থানা হয়েছে ১৯৮০ সালে। থানা কামাল স্থানটি হতে এক মাইল উত্তর দিকে একটি পুরানো মসজিদ রয়েছে। মসজিদের কিছু দূরে দরগা শরীফ। এখানে মহরমের মেলা বসে। স্থানীয় লোকেরা বলেন কামাল জঙ্গ এই মসজিদ ও দরগাহ নির্মাণ করেছিলেন।

রানীগঞ্জ বাজার, নাটোরের রানী ভবানী উক্ত বাজারের অনতিদূরে একটি পাকা দালান নির্মিত বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এখানে রানী ভবানী সময় সময় এসে ইংরাজ বিরোধী নবাব ও লোকদের সঙ্গে মিলিত হতেন বলে স্থানীয় লোকেরা বলেন। এখানে একটি পুরানা মন্দির রয়েছে, এখনও পূজা হয়।

বামনের হাটঃ হাটটি বহু পুরানো। এখানে একটি কালী বাড়ী মন্দির ও দালানের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। না বললেও আপনারা বুঝতে পারছেন যে, রাজা ভবানী পাঠক নবাবের বন্ধু। ঐ কালীবাড়ীতে পূজো দিতেন এবং সময় সময় এসে এখানে বসবাস করতেন। এখানে পুরানো একটি দীঘি রয়েছে। দীঘিটির নাম হলো শানবাঁধানো দীঘি।

বামনের ছড়া—বিদ্রোহী আমলে এই ছড়াটি নির্মিত হয়েছিল। বামনের হাট হতে ৩ মাইল পশ্চিমে পূর্ব বজরা ও খামার বজরা ২/৩ মাইল তফাত

হবে। বামনের ছড়া হতে কামাল থানার দূরত্ব ৪ মাইল। থানা কামাল হতে খাসবাগ বজরা ৭/৮ মাইল তফাৎ হবে। থানা কামাল—এই স্থানটিতে হাট বসে বলে একে হানাহাটও বলা হয়ে থাকে।

উলিপুর থানাধীন যে স্থানটি বহু এলাকা জুড়ে বজরা বা প্রমোদ তরী দিয়ে নৌকা বিহার করতেন ইংরাজ বিরোধী বড় বড় জমিদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কিন্তু লম্বালম্বি সরোবর বা আর্টিফিশিয়াল লেকের খুব একটা চিহ্ন এখন চোখে পড়ে না, তবে একেবারে যে চিহ্ন নেই তা নয়। একটা একটা লেক বা সরোবরের পাশাপাশি দূরত্ব ৩ মাইল, ৪ মাইল ও ৫ মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। যদিও এই দেশীয় উচ্চশিক্ষিতরা এসব অমূল্য সম্পদের ঘুণাক্ষরেও খোঁজ খবর করেন নাই এবং সে চিন্তাও কখনও আনেন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য হলেও সত্য যে রঙ্গপুর-দিনাজপুরের অশিক্ষিত লোকেরা এমনভাবে ঐতিহাসিক স্থানগুলির নামকরণ করেছেন, ইতিহাসের দৃষ্টিতে যাদেরকে পাকা সীলমোহর বলা যায়, যা শতবার ধৌত করলেও উঠবার নয়। অভিধানে বজরার অর্থ করা হয়েছে 'প্রমোদতরী' বলে। বজরা শব্দের আরও অর্থ করা হয়েছে—রাজ্যের উৎসবাদিতে ব্যবহৃত বিরাট তরী বলে।

১. বজরা;
২. খামার বজরা;
৩. কালোপানি বজরা;
৪. সাদুয়ার খামার হাট বজরা;
৫. খাসবাগ বজরা;
৬. বামনছড়া বজরা;
৭. চর বজরা;
৮. সাত লস্কর বজরা;
৯. পূর্ব বজরা;
১০. চান্দনী বজরা;
১১. আমিনপাড়া বজরা;
১২. বজরা হাট।

উপরোক্ত নামগুলি বর্তমানে অধিকাংশই গ্রামে পরিণত হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে ২/১টি মন্দির মসজিদ ব্যতীত কোন দালান-কোঠা অবশিষ্ট দেখা যায় না, সব কিছুই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ সরকার—স্থানীয় জমিদারগণ সব কিছুই লুপ্ত করে দিয়েছে।

ইংরাজ কথিত ভীরু বাঙ্গালী প্রসঙ্গ ঃ

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ ১৩২২–১৫ ভাগ প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা
১১৪ পৃষ্ঠা বিবিধ প্রসঙ্গ,

"আমি এলাহাবাদে বহু বৎসর ··· ··· নানা ভাষাভাষী ছাত্র পড়াইয়াছি। ··· ··· কবে কখন কোন ইংরেজ ভীরু বলিয়া বাঙ্গালীকে অবজ্ঞা করিয়াছিল বাঙ্গালী এখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।" ইহা সমস্ত বাঙ্গালীরই মনের কথা, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'ভীরু বাঙ্গালী' এই কথা কোন ইংরেজ বলেছিলেন এবং কেন বলেছিলেন সে কথার জবাব ঐতিহাসিকভাবে আমরা মাননীয় পাঠক পাঠিকাদের কাছে দিব আশা রাখি। তবে যতদূর জানা যাচ্ছে তাতে গোটা বাঙ্গালী জাতিটিকে একদিকে চরম অপমান করা হয়েছে, আর একদিকে ভারত সাম্রাজ্য সামাল দেওয়ার জন্য ভীতু বাঙ্গালী বলা হয়েছে। ভীতু বাঙ্গালী যিনি বলেছিলেন সেই জাঁদরেল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক ও ঐতিহাসিক সিভিলিয়ান 'মেকলে' একদিকে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীকে হুশিয়ার করেছেন যে বাঙ্গালীদেরকে কখনই পল্টনে নেওয়া চলবে না। নিলে সাম্রাজ্য ছেড়ে দেশে ফিরে যেতে হবে লাঞ্ছনার বোঝা মাথায় নিয়ে। আর একদিকে ভীতু বাঙ্গালী বলে বাঙ্গালীদের মনের বলকে সম্পূর্ণরূপে ম্যাজিশিয়ানদের মতো লোপ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কথাটি যেমন বৃটিশ ভারতে ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তেমনি সারা বিশ্বে হয়ত এই কুৎসিৎ মিথ্যা কথাটি রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মেকলে সাহেব একজন জাঁদরেল লর্ড হোন অথবা বড় আমলাই-হোন, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিবার খুব একটা দরকার নাই। তবে আমরা এই মনে করি যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ যে শুধু বাঙ্গালীকে ভীরু কাপুরুষ বলেছেন তা কিন্তু নয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকার নিজেদের সাম্রাজ্য সামাল দেওয়ার জন্যই এই জঘন্য মিথ্যা কথাটি মেকলের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন এবং পরে বাঙ্গালীদের কোন ভাবেই আর পল্টনে নেওয়া হয় নাই। কেন, কি জন্য নেওয়া হয় নাই সে সব কথার প্রমাণ আমরা ঐতিহাসিকভাবে দিবার চেষ্টা করেছি আমাদের লেখাগুলিতে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাসভায় ভারতীয় কংগ্রেস বাঙ্গালীর কথা বলতে গিয়ে তিনি মেকলের কথাটি বলেছিলেন; তার আগে কয়েকটি

কথা বলতে চাই। তা হলো এই দেশবন্ধু সি. আর দাশের মতো যোগ্যতম সর্বদিক দিয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃ পুরুষ আধুনিক ব্রিটিশ ভারতে আর একটি ছিল বলে আমাদের জানা নাই, তার প্রতিটি কথাই আমাদের রাজনীতিবিদদের এবং সমস্ত শিক্ষিত জনেরই জানা ও চিন্তা করা উচিত বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যা বলেছেন, তার কিঞ্চিত আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিব 'মেকলে'-এর নামটি সহ।

"আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে অহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আজ এই মিলন মন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকার বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার তাহা আমার নাই··· ··· ...

"এই যে আপনার কাম আপনি করিবার অধিকার তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই একটি বড় বড় কথার আলোচনা আবশ্যক। আমরা যে শুধু আমাদের ঘর কন্নার কাম করিতে চাই তাহা নহে। সমস্ত দেশরক্ষার যে ভার, তাহারও অংশ লইতে চাহি। বোম্বাই কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ আমাদের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিবার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা আমাদের দেশের সকলের মর্ম্মের কথা। আমাদের চোখ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তোমরাই ফুটাইবার সাহায্য করিয়াছ। এখন জগতের যে দিকে চাই, সকল দেশেই দেশবাসীরা অস্ত্রধারণ করিয়া দেশরক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্র ধারণ করিবার যে অধিকার নাই, ইহাতে কি আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা অনুভব করি না? অস্ত্র ধারণ করিবার অধিকার আমাদের না দিলে এই যে নব জাগ্রত দেশবাৎসল্য, ইহার কি অপমান করা হয় না? এই অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করার কি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? সকল দেশেই অস্ত্র ধারণ করিবার অধিকার আছে। আমাদের থাকিবে না কেন? অস্ত্র ধারণ সম্বন্ধে আইন রাখিতে হয় রাখ সেই আইন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে চালাইয়া দিও। তাহা না হইলে আমরা নিজেদেরকে অপমানিত মনে করিব। 'মেকলে' যে

আমাদিগকে অপমান করিয়া গিয়াছে, সে কথায় যে একদিন আমরাও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। তোমরা যে একদিন ঐ কথা বলিতে দিয়াছিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বাঙ্গালী যে কাপুরুষ সে ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের নাই, তোমাদেরও নাই, অ্যাম্বুলেন্স-কোর সম্বন্ধে বাঙ্গালী যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইও না, সেদিন যে বাঙ্গালীর ডবল কোম্পানীর সৃষ্টি করিবার মনস্থ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলে, ভাবিয়া দেখিও সেদিন বাঙ্গালীকে কি কঠিন পরীক্ষার ভিতর ফেলিয়াছিলে। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে যাহাদিগকে কোন দিন অস্ত্র ধারণ করিতে দেও নাই, যাহাদিগকে কোন প্রকারে সমর শিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনা কর নাই, যাহাদের সৈনিকের কার্য করিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া সকল সামরিক চেষ্টা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছিলে এবং যাহাদের মধ্যে এই অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ একই কথা বলিয়া যে একটা ভূতের বিশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছিলে, একদিন হঠাৎ সেই বাঙ্গালীকেই সমর ক্ষেত্রে আহ্বান করিলে! যদি আমরা সেই আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিতে না পারিতাম, তবে কি চিরকাল তোমরা বলিতে না যে বাঙ্গালী অনুপযুক্ত? তাহাদের অস্ত্র ধারণের কোন অধিকার নাই, তাহাদের জন্য সৈনিক বিভাগে কোন স্থানই হইতে পারে না? আমরা ত তাহাই বুঝিলাম। অশেষ কষ্ট করিয়া অশেষ যত্ন করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিলাম।

বাঙ্গলার কথা : সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ,
৫৩৩ পৃষ্ঠা, নবায়ন, মাসিক পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ,
দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল

একখানি ঐতিহাসিক চিঠি

শ্রদ্ধেয় হায়দার আলী চৌধুরী সাহেব,

যেসব এলাকার কথা বলেছেন পত্রে সেসব এলাকায় আপনি তো কয়েক বারই গিয়েছেন জানতে পারলাম স্থানীয় লোকদের নিকট। তবু যখন এলাকাগুলি ঘুরে ফিরে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমাকে বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করলাম।

ঘোড়াঘাট থানার রানীগঞ্জ হতে উত্তরে দেড় দুই মাইল দূরে রানীর গড় অবস্থিত। এই রানী গড় হলো নাটোরের রানী ভবানীর গড়। গড়

গুলিকে স্থানীয় লোকেরা রানীর গড় যেমন বলে থাকেন আবার গড়পাড়াও বলে থাকেন। নবাবগঞ্জ থানার গোপালগঞ্জ ইউনিয়নে বামনগড় হতে খাপুর ইউনিয়ন সহ ঘোড়াঘাট পরগনার অন্তর্ভুক্ত। ফুলবাড়ি থানার মাদলা হাট, কাঠরাহাট, রানী নগর, পুকুরিয়া, কদবীর, আট পুকুরিয়া এখানে আটটি পুকুর এখনও রয়েছে। চড়া নিমডাঙ্গা, খোজাপুর, আমবাড়ি, রামভদ্রপুর পর্যন্ত বিলাহবাড়ি পরগনার অন্তর্ভুক্ত। নবাবগঞ্জ থানার ৯নং কুচদহ ইউনিয়ন ১নং জয়পুর ইউনিয়ন ও পার্বতীপুর থানার ভবানীপুর রেল স্টেশনের বিস্তৃত এলাকাগুলি পর্যন্ত বেলেঘাটা পরগনার অন্তর্ভুক্ত। বেলেঘাটা পরগনার লাট ভবানীপুর। উক্ত তিনটি পরগনার জমিদার ছিলেন রানী ভব্যনী। পরবর্তীকালে লাট ভবানীপুরের জমিদার ছিল জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এনার বাড়ি হুগলী জেলায় অবস্থিত। এইসব এলাকায় শালবনের ঘোরতর জঙ্গল ছিল ইংরাজ আমলে।

ভবদীয়, হাফিজুর রহমান
নিবাস—মাদাই খামার
হাল সাকিন—আফতাবগঞ্জ হাট
জেলা দিনাজপুর
তাং ২-৬-৮৬ ইং

ইংরাজ ঠেকান কয়েকটি গড় ও কেল্লার কথা

ইহা উল্লেখ না করলেও শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণ জানেন যে, রঙ্গপুর দিাজপুরের দক্ষিণে হল মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতা। শত্রুদের আক্রমণটা দক্ষিণ দিক থেকেই আসতে পারে এই চিন্তা করেই দক্ষিণ দিক এত গড়, কোট কেল্লা ও পরিখা নির্মাণ করা হয়েছিল প্রতিটি জায়গায় দুটি করে। যার ফলে ইংরাজরা কখনও এসব অঞ্চল দিয়ে প্রবেশ করতে পারেন নাই। ১৭৬০ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে যে বিরাট আকারের যুদ্ধটি হয়েছিল ঐ সময়গুলিতে শত্রুপক্ষ দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে এসে যুদ্ধ করেন বলে মনে করা যায়। পরে ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে ইংরাজদের সহিত কুচবিহারের রাজা লিখিতভাবে একটি সন্ধি করেন, যা বিশ্বকোষে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ণনার বাইরে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে আরও অনেক কিছু রয়েছে। এর সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালালে ভারত উপমহাদেশের মহাকল্যাণ হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পূর্বের পাশাপাশি গড় দুইটির আরও উত্তর দিকে জেলা রংপুরস্থ মিঠাপুকুর থানা সংলগ্ন কিছুটা উত্তর পার্শ্বে আরও একটি গড় পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি দেখা যায়। এই স্থানগুলি তনখার মিঞা আলদাদ খাঁ, তালিয়ার খাঁ এর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণের প্রথম গড়টির সংলগ্ন দুই মহলা বিশিষ্ট একটি বাড়ী ছিল। বাড়ীটি এখন নাই। কিন্তু মসজিদটি অক্ষত রয়েছে। মসজিদের শিলালিপিতে লেখা রয়েছে এই মসজিদ ১২২৬ হিজরী মোতাবেক বাংলা ১২১৭ সাল।

সয়খ মোহাম্মদ আছের, পিতা সয়খ মোহাম্মদ ছাবের. সয়খ মোয়াইমের পুত্র। এই পরিবারের লোকরাও ইংরাজ বিরোধী যুদ্ধে সামিল ছিলেন। উক্ত পরিবারের এক কন্যার বিবাহ হয়েছিল ফুলচৌকি নগরের শাহজাদা নেজামউদ্দিন মোহাম্মদ-এর সহিত। এনার নাম ছিল খোদেজা বিবি। খোদেজা বিবির পিতৃবংশে এখন আর কেহ নাই। শুধু খোদেজা বিবির গর্ভজাত অধস্তন বংশধরগণ ফুলচৌকি নগরে রয়েছেন এখন অবধি।

এখন গড় দুটির কথা বলে শেষ করছি। দক্ষিণের পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা গড়টির পশ্চিম দিকে ইংরাজ আমলেই রাস্তা করা হয়েছে। পূর্ব দিকের গড়ের উপর লোকজনের বসতি স্থাপন হয়েছে। এই গড়ের ৫/৬ মাইল উত্তর দিকে আর একটি গড় রয়েছে; গড়টি বহু পূর্বকালের। ভীমের গড় বলে পরিচিত। ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়কালগুলিতে এই গড়টিও কাজে লাগান হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রানীসংকৈল থানা ও রানীসংকইল গড়টি এখনও বিদ্যমান বিহারী অশিক্ষিত কৃষকরা গেল কথাটিকে গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় গৈল বলে। এই স্থানগুলিতে বিহারী কৃষকরা হয়ত বাস করত। তাই রানী গেল কথাটি রানী-সংকৈল নামে এখন পরিচিত হয়েছে। এখানেও রানী ভবানীর জমিদারী ও দুর্গ ছিল।

রংপুর জেলা পীরগঞ্জ থানাধীন রানী ভবানীর বড় বিলা পরগনা রায়পুরের জমিদার সূর্য্য সিংহ রায় ও বীরেন্দ্র সিংহ রায়ের বাড়ী সংলগ্ন হাটের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দীর্ঘ গড় রয়েছে। গড়টি পশ্চিম দিকে বাহাদুরপুর গ্রাম-লাঠিয়াল পাড়া হয়ে পশ্চিম দিকে যমুনেশ্বরী নদীতে গিয়ে ঠেকেছে। অপর পাড়ে—কৃষ্ণরামপুর মৌজা। লোকেরা এখন অবধি

বলে থাকেন স্থানটিকে রানীগড় গড়পাড়া, রানীগড় ফুলবাড়ী গড় পর্যন্ত গিয়েছে। এই গড়ের রানীই হলেন রানী ভবানী। অপর আর একটি গড় পীরগঞ্জ থানা সদরের পূর্বদিকে এবং পশ্চিম দিক হয়ে বাহাদুরপুর, জাফরপাড়া, খালাসপীর, জয়ন্তীপুর, ঈশ্বরপুর, দাউদপুর হয়ে-চরকাই বিরামপুরে গিয়েছে; এই গড়ের উপর দিয়ে জেলাবোর্ডের রাস্তা হয়েছে। গড়গুলি নিশ্চিহ্ন করার জন্য রঙ্গপুরে যেমন বড়বীলা পরগনা স্বরূপপুর বাহারবন্দ প্রভৃতি পরগনা রানী ভবানীর ছিল, তদ্রূপ দিনাজপুর অঞ্চলের ঘোড়াঘাট পরগনা, বেলেঘাটা পরগনা, গিলাহ বাড়ী পরগনা—এই সমস্ত পরগনার রানী ভবানীর গড় নির্মিত ছিল। এখন অবধি সেই সব গড় দেখতে পাওয়া যায়। দিনাজপুর জেলার এই সব এলাকায় ভীষণ বড় আকারের শালবন ইংরাজরা পত্তন করেছিলেন এবং এই বিরাট জঙ্গল দিয়ে ঐতিহাসিক স্থানগুলো ঢেকে রাখা হয়েছিল, যেখানে দিনের বেলায়ও সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না। এই সব এলাকার কথা প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক-জাকারিয়া সাহেবের গ্রন্থ হতে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবাবগঞ্জ নামটি মীর্জা নূরউদ্দীন বাকের জঙ্গ-এর-নাম স্মরণ করিয়ে দেয়। বামনগড় ও অন্যান্য গড়ের প্রধান অধ্যক্ষ-ছিলেন রাজা ভবানী পাঠক। বামনগড়ের কিছুদূরে রাজবাড়ী। রাজবাড়ীর অনেক চিহ্ন এখন অবধি রয়েছে। পাশে রয়েছে গাজীপুর—এই ধরনের অনেক নাম পুকুর দীঘি রয়েছে। আমাদের বারবার একটি কথাই বলতে হচ্ছে—ইংরাজ আমলের প্রথম এক শতাব্দীর ইতিহাসই যদি আমরা উদ্ধার করতে পারতাম বৃটিশ আমলে তাহলে দেশ বিভাগ ও দেশের মানুষের এই চরম দুর্দশা হত না এবং দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের দল আর নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।

ইংরাজদের ধোঁকাপূর্ণ ভগদত্তের রঙমহলের কথা

মহাপণ্ডিত মহামনীষী শ্রী অরবিন্দু ঘোষ-এর এবং তার দলের ও অন্যান্য দলের গুতোর চোটে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা দিশেহারা হয়ে নানারূপ মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল। এ ছাড়া স্বদেশী আন্দোলনের তুমুল ঢেউ-আছড়িয়ে পড়েছিল ভারত উপমহাদেশে, বিশেষ করে বাঙ্গলায়। নানারূপ মিথ্যা কায়দা ও কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ। অরবিন্দু ঘোষের সংগ্রামী দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের

আন্দোলনে যতই বিচলিত ও দিশেহারা হয়ে পড়ুক, কিন্তু সংগ্রাম ও আন্দোলনে পর্বত প্রমাণ ভুল ছিল। যাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ১৯৪৭ সালে বিজয়ীর বেশে গর্ব নিয়ে প্রস্থান করে এ দেশ থেকে। যদি এ দেশীয় সশস্ত্র সংগ্রামী দলগুলি এবং অন্যান্য আন্দোলনকারী দল ইংরাজ আমলের ইতিহাস উদ্ধারে যত্নবান হতেন তবে কি দেশ বিভাগ সহ দেশের এই হাজার প্রকার ক্ষয় ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দশা হত? আরও নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এর প্রতিকার প্রতিবিধান কি?

যেমন মোগল সুবাদার বাকের জঙ্গ ও তৎপুত্র কামালজঙ্গের রঙ্গপুর শহরস্থ রঙমহলটিকে উৎখাত করে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ সময়কালের রাজা ভগদত্তের-রঙমহল এই রঙ্গপুরে ছিল; কিন্তু সে কথা সরাসরি না বলে কি বলছেন তাই দেখুন। কিন্তু তার আগে মহামনীষী ও ইতিহাসের একনিষ্ঠ গবেষক মহান দেশপ্রেমিক প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু রঙ্গপুরে রাজা ভগদত্তের কথা ইত্যাদি একবারে উড়িয়ে দিয়েছেন।

রঙ্গপুরের কথা বলতে গিয়ে বিশ্বকোষ বলছেন, "মহাভারতীয় ভদদত্তের উপাখ্যান পরিত্যাগ করিলেও আমরা স্থানীয় অন্যান্য প্রবাদ হইতে জানিতে পারি যে" ইত্যাদি কথা পরে বলেছেন বিশ্বকোষ। বিশ্বকোষ চতুরতার সহিত স্থানটিকে রংপুর না বলে রঙ্গপুর বলেছেন অর্থাৎ রঙ্গালয় হতে রঙ্গপুর। ভগদত্তের রঙমহল বর্ত্তমান রঙ্গপুরে অথবা ঘাঘট নদীর তীরে ছিল—এর কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ তো নাই, তদুপরি কোন ছড়াগানে বা একাধিক লোকের কথা কাহিনীতে কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না। এখন Bengal District Records—Rangpur-এ কিভাবে মিথ্যার বেশাতি করে মোগলদের রঙমহলকে ঢেকে ফেলবার কি কুৎসিৎ ধরনের চেষ্টা করেছেন তা দেখুন ঃ

"The Raja Bhagadatta, in the war of the Mahabharat, espoused the side of Dharjyudhan, and was killed by Arjun. Besides Rungpore, Kamrup included Assam, Manipore, Jayntia Cachar and Parts of Mymensingh and Sylhet.

The derivation of the name Rungpore is said to be রঙ্গপুর (Rangapur) the place of pleasure or abode of bliss–Bhagadatta having here a Country residence on the Ghaghat. There is another Rungpore in Assam, west of Gowhatty, the Kamrup capital.''

Bengal District-Records-Rangpore
Vol. 1. 1770—1779 Page 7
The Bengal Secretariate Record Room 1914

সুচতুর উচ্চশিক্ষিত বাস্তববাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের গোপন করা বিষয়গুলি উদ্ধার করা কত যে কঠিন ও দুরুহ কাজ তা ভুক্তভুগীরাই জানেন। আমরা অতি সামান্য মাত্রই উদ্ধার করতে পেরেছি এবং এ সব উদ্ধারে দেশবাসীদের একান্তভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। ছোট বেলায় ১৪/১৫ বৎসর বয়সের সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পুস্তিকা পেয়েছিলাম। সব কথা মনে নাই, ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক মঁশিয়েরেনোর উদ্ধৃতি পড়েছিলাম—তাতে লেখা ছিল একটা জাতির কিভাবে জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠে এবং শক্তিশালী হয়। দুইটি কথা আমার এখনও মনে আছে এবং তা সারাজীবন হয়ত মনে থাকবে। মঁশিয়েরেনো বলছেন, "একই ভূখন্ড এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন বহিরাগত দেশ দখলকারী শত্রুদের বাধা দিতে গিয়ে যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠে সেই ঐক্যই জাতীয় ঐক্য।"

আসল রঙমহল ও কাশানার কথা

বর্তমান রংপুর শহরটি পূর্বে রঙমহল বা রঙ্গপুর ছিল। সুচতুর ইংরাজরা পূর্বের জেলাসহ বড় রংপুর—ছোট রংপুর, খোর্দ রংপুর মাহীগঞ্জ এলাকা হতে বর্তমান রংপুরে জেলা শহর পত্তন করেন ১৮৬৯ সালে। আমরা পূর্বে রঙমহলের বিষয়াদি কিছু দিয়েছি। আরও কিছুটা দিবার প্রয়োজন অনুভব করছি। রঙমহলের উত্তরে অধুনা চিকলি বিল অবস্থিত। চিকলি হ্রদের অনুকরণে এটি নির্মিত। 'কুকরুল বিল' নামকরণ হয়েছে শাহজাদা কামাল জঙ্গের স্ত্রীর ডাকনাম কোকিলা থেকে। কোকিলা অপভ্রংশ হয়ে কুকরুলে রূপান্তরিত হয়েছে।

এটিও একটি মাছ ধরা ও পাখী শিকার করার মনোরম ঝিল ছিল। এখন অবধি এ সব স্থানে গেলে ভাবুক মনে পুলক শিহরণ জেগে উঠে। পূর্বদিকে ছিল জঙ্গঘাট। এ নাম এখন অবধি চলে আসছে। এ ঘাট দিয়ে রাজবংশীয়রা রঙমহলে যাওয়া-আসা করতেন। পশ্চিম দিকে

ফকীর বকসীর ঘাট। ঘাটের আরও পূর্ব দিকে ধাপ, আভিধানিক অর্থ সিঁড়ি। এদিক দিয়ে মোগল শাহজাদা নবাব নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ-এর প্রধান সেনানায়ক মূসা শাহ ফকীর সেনা নিয়ে যাওয়া-আসা করতেন। দক্ষিণ দিকে দর্শনা। দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রজাগণ দর্শনপ্রার্থী হয়ে নৌকাযোগে রঙমহলে প্রার্থিত মানুষের কাছে আসতেন। এরই পাশে অবস্থিত লালবাগ। লালবাগ পার্শী শব্দ, এখানে বাগানে সব সময় পদ্মরাগ মণির মত উল্লাসে ঝলমল করত। এটা পার্শী অভিধানের মত। রঙমহলটি চতুষ্পার্শ্বে পরিখা বেষ্টিত একটি সুরক্ষিত দুর্গের মত ছিল। চতুষ্পার্শ্বে সৈন্যগণ পাহারা দিত। বেশ কটি সৌন্দর্যশালী দালান-কোঠা এবং মোগল শাহজাদাদের শীত মৌসুমে ব্যবহৃত কয়েকটি অপরূপ সৌন্দর্যশালী কাশানার নাম এখন অবধি স্থানগুলির সহিত জড়িত রয়েছে। যেমন কামাল কাশানা, বাকের কাশানা (বাহার কাশানা) নওয়াব কাশানা নেত্তা কাশানা, কাশানা এই কাশনা বা কাশানার নাম ইংরাজদের ১৯৩২/৩৩ সালে সেটেলমেন্ট রেকর্ডও রয়েছে। মুন্সীপাড়ার দক্ষিণে এখন অবধি এক উঁচু ভিটা রয়েছে। মাহিগঞ্জ যাওয়ার রাস্তার উত্তর-পূর্ব দিকটিকে এখন অবধি বলা হয়ে থাকে খাসবাগ।

স্থানীয় লোকেরা স্থানটিকে মির্জাকোট নামে বলে আসছেন। এখন সেনানিবাস না থাকলেও লোকেরা মির্জাকোট স্থানটিকে বলে থাকেন। মির্জাকোটের পাশেই রয়েছে সরোবর, সরোবরটি দর্শনায় গিয়ে ঠেকেছে এবং উত্তরের শাখা কুকরুল ও চিকলিতে গিয়ে ঠেকেছে। মীর্জা কোটের সামান্য কিছুদূর উত্তরে রয়েছে ঘি-এর দীঘি। দীঘিটি কিছুটা ভরাট হয়েছে, কিন্তু নামের পরিবর্তন হয় নাই। দীঘিতে বড় ছোট নানা ডেকচি, থালা-বাসন ধৌত করার সময় ঘি পানিতে ভাসত জন্য সম্ভবত ঘি-এর দীঘি নাম হয়েছে।

কাশানা বা কাশনার আভিধানিক অর্থ কি, তা জানার জন্য দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলাম, একটি হল ভারতের হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আর একটি হল ভারতের মুসলিম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় দেওবন্দ মাদ্রাসা। দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাশানার আভিধানিক অর্থ করে পাঠিয়েছেন ফার্সী ভাষায় দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে পাঠানো আভিধানিক অর্থ সংক্ষিপ্ত আকারে ফার্সী ও বাংলা অনুবাদ এখানে হুবহু দিচ্ছি :

"জনাব কা গিরামী নামা পঁচিশ আগষ্ট ১৯৮২ মাউসুল হুয়া। কাশানী ফারশী লকজ হ্যায়, কাশানাহ—দার আছল বা মায়না খানাআস্ত কেহ্ শিশা হায়ে বরায়ে রৌশনিদার তাবাদ মরাককাব্ আপ কাশ বা মায়না শিশাহ্ ওয়া আনাহ কাল মাহে নিছ নিছ বাদআস্ত' কাশানাহ উছয়ার কোভী কাহতে হ্যায়, জিছকে তামাম দিল চাঁছ পুং-মি শিশে লাগে গেয়ে হো। কেহ রৌশনী আয়ে, ঠাণ্ডি হাওয়াই না আয়ি।

"কাশানাহ্ জাঁড়ো মি রাহনিকা উওহ মাকান জিছমী চাঁরো তারাক রৌশন্দা নোঁ মি শিশে লাগে হোঁ তা কেহ্ রৌশনী আয়ে আওর হাওয়া নাহ্ আছাকে। ইছলিয়ে কেহ্ কাশ বা মায়না শিশাহ হ্যায়। শাহ্জাদে সুরত ও তাফরিহ মি যু কিয়াম গাহ বানাতেথে উন পারভি কাশানাহ্ কা ইতলাক হোতা হোগা।"

আমরা এখানে হুবহু বাংলা অনুবাদ দিচ্ছিঃ "আপনার অনুগ্রহ পত্র ২৫ আগস্ট ১৯৮২ ইং তারিখে পাইয়াছি। কাশানাহ ফারশী শব্দ। কাশানাহ—মূল অর্থে ঐ কাঁচের ঘরকে বলা হয় যাহা ঔজ্জ্বল্যকারী। কাশ-ও-আনাহ যোগ হইয়া উহা যৌগিক শব্দ। কাশ অর্থ কাঁচ ও আনাহ সম্বন্ধ পদ। কাশানাহ—অর্থ প্রমোদ গৃহ, কাশানাহ অর্থ—এমন গৃহ যাহার সমুদয় মনোরম ও আকর্ষণীয় বস্তু কাঁচ মড়ানো—উহা হইতেও ঔজ্জ্বল্য—ঝলমল করে কিন্তু বাতাস প্রবেশ করে না। কাশানাহ্ শীতকালীন বাসভবন—যাহার চতুষ্পার্শ্বে ফানুষগুলিতে কাঁচ সাজানো হয়, তাহা হইতেও ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করে না। (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর) শাহজাদাগণ ভ্রমণ ও আমোদ প্রমোদের জন্য যে বাসস্থান প্রস্তুত করিতেন সে ঘরগুলিকে কাশানাহ্ বলা হইয়া থাকে।"

অনুবাদক—

মওলানা শাহ আহম্মদ সাঈদ আফতাবী

ও

মওলানা আবদুর রহীম আফতাবী

Phone : 71951 (10 Lines)
Ext : 2566279
Dated 15-10-82

No. 1962/RQ/82

From
The Librarian
Osmania University Library
Hydrabad—500007 (A.P)

To
Sri Haidar Ali Choudhury
Fulchowki Rest House
Station Road,
P.O. Alamnagar
Dist. Rangpur
Bangladesh

Dear Sir,

In response to your letter dated 25th August 1982, enclosed please find the information required by you. Also enclosed is a xerox of an extract from FIRHANG-E-ANANDRAJ Vol. 5, page 3335 (a Persian Dictionary).

Yours faithfully
Illigible
University Librarian

Encl : As stated.

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'কাশানা' এর অর্থ কি হবে জানতে চাওয়ায় যা অর্থ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে, তার হুবহু বাংলা অর্থ নীচে দেওয়া হল :

হাওলা উদ্ধৃতি : ফারহাঙ্গে ইনিন্দরাজ (ফারসী অভিধান)
কৃত : মুহাম্মদ পাদশাহ (শাদ)

কাশানাহ্ (ফারছী) খানায়ে কুচকওয়া জাহেরান দরআছল বা মায়না—
(প্রাচীন ভাবুক কবিদের একেকজনের একেক রকম সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা)
(অনুবাদক)

কাসানাহ্ চাশমে মাহাবারায়ে কোদামা আস্ত, ওয় কাসানায়ে আয়নাহ ওয় কাশানায়ে ছাগের ওয় কাশানায়ে কামানদর কালামে মোতাখ্যেরীন ওয়া

কেয় শোদাহ। ...... দরকামো বালাগাত কাছে কেহ সাহের আস্ত আবুদর কাশানায়ে আয়নাহ্ বিরূঁনে দরআস্ত।

অর্থঃ ছোট ঘর ও উহার প্রকৃত অর্থ ঐ ঘরের প্রতি প্রযোজ্য যাহার ভিতর আলোকিত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে উজ্জ্বলিত কাঁচ দ্বারা যে ঘরের পরিবেষ্টন করা হয়, ইহা কাস—কাঁচ অর্থে এবং আনাহ্ সম্বন্ধ পদ যুক্ত শব্দ। তদুপরি সাধারণ ঘর অর্থে প্রযোজ্য হইয়াছে এমনকি পাখীর নীড় অর্থে লওয়া যায়।

কাশানাহ শব্দ প্রাচীন ভাবুক কবিগণের পারিভাষিক এক সূত্র, যেমন কাশানায়ে আয়না (কাঁচের ঘর) কাশানায়ে সাগের (মদিরা কুঠির) কাশানায়ে কামানদর (তোপখানা ঘর) কিন্তু ভাষা অলংকার শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়ম হিসাবে উহার অর্থ কাঁচ খচিত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর ও যাহার আলোকসজ্জা আছে। অর্থাৎ প্রমোদ ঘরকেই কাশানাহ বলা হয় এবং সৌন্দর্য্যময় রাজকীয় আড়ম্বরপূর্ণ কাঁচ নির্মিত ঘর।

কাশানাহ—ইহা আলোময় সৌন্দর্য্য উল্লাসে ঝলমল করিয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই যে, ভাবুকের ভাব ও প্রেম যখন নয়নাভিরাম ও মনোহর শিল্পোন্নত কোন কারুকার্য্য দেখে তখন কবির কবিতার লালিত্য ও শিল্পকলার গৌরববর্দ্ধন ও সাধন হয়। আর অমর হয়ে থাকে তদানীন্তন ঐতিহ্য ও কাব্যরস, যাহা 'কাশানাহ' শব্দের মধ্যে অনুভব করা হয়।

শব্দ—কাসনা মূল ফারসী ভাষা

উচ্চারণ—কাশানা (Kashana)

১. ফারহাঙ্গে—আসিকা (নামক অভিধান) (৩য় খণ্ড ৪২১ পৃষ্ঠা) কাশানাহ্ (ফারছী) বিশেষ্য–পুং ইছমে মুজাক্কার। অর্থ ... ... মায়না

১. ক্ষুদ্রাকার ঘর—পর্ণকুটীর-নগণ্য অর্থে ব্যবহৃত।

২. পাখীর বাসা, আশ্রম

২. নূরুল্লোগাত–৪র্থ খণ্ড ১২ পৃঃ

কাসনা-ফারসী—কাস অর্থ কাঁচ } পাখীর নীড়
এবং আসাহ অর্থ সম্বন্ধপদ }

পুং—(১) অগ্রণীপ্রাসাদ বা বিত্তধারী নেতৃবৃন্দের বাড়ী, প্রাসাদ।
(২) নীড়, আশ্রম।

মুহাহাবুল্লোগাত—৯ম খণ্ড ২১২ পৃঃ

কাসানা—পর্ণকুটীর, ক্ষুদ্র বাটী (বাড়ী)

যথা প্রসিদ্ধ ও খ্যাতনামা কবি গালিব' তাঁর কাব্যে গাহিয়াছেন

গিরিয়া কিছি শোয়লী কা খুন না করেগী আয় বরক্,
কিয়া না চামকেগা ছিতারা ছাবে কাসানে কা।

অর্থ: হে 'বরক' (কবির এক ছদ্মনাম) কোন প্রেমস্ফুলিঙ্গের রক্তাশ্রু আর পড়িবে না ? তাহলে কি (প্রেমিকের) কাসানার সরাইখানাতে তারকা (সদৃশ উদ্বিপ্ত হবে না জ্যোতি)

কাশ—কাঁচ এবং আনাহ, সম্বন্ধ পদ যাহা সম্বন্ধ নগণ্য হিসাবে ব্যবহার হয়।

ব্যবহার—শীতকালীন বাসস্থান বা ঐ ভবন যাহার চারিপাশে কাঁচ খচিত আলোকসজ্জা থাকে। (হাম্মামখানা যেমন) যাহাতে আলোকিত হয় কিন্তু বায়ু প্রবেশ করে না।

মোঘল শাহজাদা ও
শাহজাদীদের গোপন
করার অপচেষ্টা :

Registree No 7
Vol.—3
illegible No 16 for 1878

ইয়াদি—শ্রীযুক্তা ঘাউয়ানী বিবি চৌধুরানী সাহেবা জওজে মৃত জামালউদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী সাহেব, জাতী মুসলমান, পেষা জমিদারী আদি নিবাস জগদীশপুর পরগনে সরহাট্টা ষ্টেষন মোলঙ্গ জেলা রঙ্গপুর মকরারি পাট্টা পত্র মিদং সন ১২৮৪ চুরাশী সাল অব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে ডিষ্ট্রিকট সাব-ডিষ্ট্রিকট রঙ্গপুর ষ্টেশন মোলঙ্গর অধীন জেলা রঙ্গপুরের কালেকটরির তৌজির ২৬১ নম্বরি মহাল পরগনে সরহাট্টার মোতাবেক মৌজে ফুলচকি ও জগদীশপুর আমি মোছাম্মাত আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী আমার পত্তনী স্বত্ব—দ. আনা ও আমি নছিরউদ্দীন মহম্মদ চৌধুরী আমার দরপত্তনী সত্ত কওলা খরিদা ৵১০ আনা ও উত্তরাধিকারী-সূত্রে প্রাপ্ত ॥৵ আনা মোট যোল আনাতে পত্তনী ও দরপত্তনী সত্বে আমরা উভয়ে সাথর্কান ও দলীলকার আছি। তন্মধ্যে মৌজে জগদীশপুর নিম্নের চৌহদ্দীর লিখিত মত খাজেরউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরীর[1]

---

[1] সাধারণ লোকেরা মোঘল শাহজাদাকে শাহ্ এবং সুলতান বলতেন যেমন ফিরোজ শাহ্। সম্রাট আকবরের দুই পুত্রের নাম ইতিহাসে সুলতান মুরাদ ও সুলতান দানিয়েল নামে দেখতে পাওয়া যায়। ফুলচৌকী নগরে শাহজাদা খাজেরউদ্দীন

বশতবাটীর সরহঙ্গ ও জমিন সহ মত্তবিত্ত ১০৴ দশ বিঘা ভূমিতে আপন বসতবাশ করিয়া আছেন তাহা আপনার জীবন্দশা পর্য্যন্ত মকররি জামাতে বন্দবস্ত করিয়া লওয়ার বিশয় আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন আপনে, আমি আমিরন্নেছা বিবি আমার শাশুড়ী ও আমি নছিরউদ্দীন মহাম্মদ চৌধুরী আমার (অস্পষ্ট) বিধায় সম্মত হইয়া সালিয়ানা কোম্পানী ১০ দশ টাকা মকররি জমা ধার্য্য করতঃ এই মকররি পাট্টা লিখিয়া দিলাম।

আপনে কবুলিয়ত দাখিল করিলেন, আপনে আজীবন পর্যন্ত উক্ত ১০৴ দশ বিঘা ভূমি বিনাকমি বেশী মকররি জমা শুরং ভোগদখল করিতে থাকিবেন আপনে বর্ত্তমান থাকা পর্যন্ত উক্ত জমা নেওয়ায় কবঈক বেশীহ দিবে না কমিহ পাইবে না, আপনি অভাব হওয়া মাত্রই উক্ত জোত খাস দখল নওা যাইবেক। তাহারা আপনকার ওয়ারিশান ও স্থলভিষিক্ত জনগণ কেহ কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেক না, করিলেও গ্রাহ্য হইবেক না। এতদর্থে আজীবন সার্থ মকররি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি তারিখ ৮ আটই বৈশাখ ১২৮৪ সাল তপশীল চৌহদ্দী জমি ১ দাগে মৌজে জগদীশপুরের ভিটায় ৪৩৩ দাগের যাহার পুর্ব্বে খাজের-উদ্দিন চৌধুরী পুষ্কর্নী ও ফুলচৌকির সীমানা করীমন্নেছা বিবির জোত তক পাকাবাঙ্গা দালান উত্তর রাস্তা ও পাইকড় ১ এ কাপড় এই তৌহদ্দী (অস্পষ্ট)।

৪ বিঘা মাঝে নীজবংশ ২/২ দাগের উত্তর ঐ মৌজার ৪৩৫ দাগ ইহার দক্ষিণ ফুলচকির করিমন্নেছা বিবির বশতবাড়ী পুর্ব্বে নিজ উত্তরে রোপ জমি পশ্চিম গেন্ঠা ভেকুর জোত ৩/৩৷৷ মাঝে নিজ বংশ ১৷৷৪ ৩ দাগে রোপ—এক কিত্তা ইহার উত্তরে জলশতী পশ্চিম রাস্তা দক্ষিণ পুষ্কর্নী পুর্বে নিজ জোত ৷৷১ ৪ দাগে রোপ ৩ কিত্তা ইহার দক্ষিণ জোত পুর্ব্বে করিমন্নেছা বিবির জোত উত্তরে জলবসতী পশ্চিম

মোহম্মদকেও খাজের সুলতান নামে অভিহিত করা হতো। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময়কালে দিল্লীতে মোগলদের গোরস্থানে তিন শাহজাদা--মীর্জা খাজের সুলতান, মীর্জা আবু বকর, মীর্জা মোগল সম্রাটের দুই পুত্র ও একজন নিকটতম আত্মীয় এদেরকে গুলী করে মারা হয়। প্রথমে যে শাহজাদা মীর্জা খাজের সুলতানের নাম উল্লেখিত রয়েছে ইতিহাসে, উক্ত খাজের সুলতানই আমাদের দলীলে বর্ণিত ফুলচৌকী নগরের মৃত খাজেরউদ্দীন মহম্মদ চৌধুরী, সম্রাটের দুই পুত্র--মীর্জা আবু বকর ও মীর্জা মোগল এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ই হলেন খাজেরউদ্দীন মোহাম্মদ।

নিজ ও পুষ্করনীর পাহাড়ী ১॥৪ ৫ দাগে রোপ ৪ কিত্তা ইহার পূর্ব ও উত্তর ও দক্ষিণ নছিরউদ্দিন চৌধুরী পশ্চিম জলশতী ও আগুন গ্রাস বড় মাল্বীর উজান এক কিত্তা পার ২দ ১৬ দাগে তদপ জগদীশপুরের ৪৩৬ দাগে ৪ কিত্তার কাত রোপ ইহার উত্তর রাস্তা পশ্চিম পেণ্টু পাইকাড়ের জোত পূর্ব নিজ। দক্ষিণ খাজেরউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের বাড়ী বন্দ। ১।.
১০/

শ্রী কাদের উল্বা মোং আদালত জেলা রঙ্গপুর সাল ১৮৭৭ইং ১৮ই এপ্রিল সাল ১২৮৪ ৭ই বৈশাখ, খরিদ্বার শ্রী তরিকুল্বা বরকন্দাজ সাং পালীচড়া দাম ॥ আট আনা নং ২৪৬ পট্টী—

শ্রী ছলুক খাঁ-উকিল ওলাদে মৃত ছরওয়ার খাঁ মরহুম, সাকিন রাধাবল্লভ··· ··· ···

শ্রী নছিরউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী পিতার নাম কামালউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী মততকা সাং ফুলচৌকি।

শ্রী আমীরন্নেছা বিবি চৌধুরানী পত্তনীদার জওপে শ্রী নছিরউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী বঃ শ্রী নছিরউদ্দিন মহম্মদ মোক্তার আম শ্রী নছিরউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী ওলাদে মৃত কামালউদ্দিন চৌধুরী জাতী মোসলমান পেষা জমিদারী সাকিনান ফুলচৌকি পং সরহাট্টা—এবং মোলঙ্গ জেলা সাব-ডিষ্ট্রিকট রঙ্গপুর।

মাননীয় ইতিহাসের পাঠক মহোদয়গণ অবগত আছেন যে ৩ জন শাহাজাদা মোগলদের কবরস্থানে লুক্কায়িতভাবে ছিলেন বলে ইতিহাসে উল্লেখিত রয়েছে-মীর্জা খাজের সুলতান, মীর্জা মোগল এবং মীর্জা আবু বকর। মীর্জা খাজের সুলতান ফুলচৌকি নগরে তার পৈতৃক প্রাসাদে বসবাস করতেন। যুদ্ধ সময়কালীন লালকেল্লার নিজ প্রাসাদে ছিলেন। ইনি সকলের কনিষ্ঠ হওয়ায় এনাকে কেহ যুদ্ধে যেতে দেন নাই। কিন্তু বিধির বিধান দিল্লীর মোগলদের কবরস্থানে ইংরাজ ক্যাপ্টেন হড্সন এনাকে ও অপর দুইজন শাহাজাদাকে গুলী করে হত্যা করেন। মীর্জা মোগল ও মীর্জা আবু বকর সম্রাটের পুত্র। মীর্জা খাজের সুলতান সম্রাটের ভগ্নিপতি ও একই বংশের নিকটতম লোক।

দলীলে উল্লেখিত "ঘাউয়ানী বিবি চৌধুরানী সাহেবা" দলীলে যে মৃত খাজেরউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী যিনি ঘাউয়ানী বিবি চৌধুরানীর ও

মু. জামালউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেবের একমাত্র পুত্র। রেজিষ্ট্রী দলিলে যে খাজেরউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী দেখা যাচ্ছে ইনি দিল্লীর মোগলদের কবরস্থানে হডসনের গুলীতে মারা যান, এনার স্ত্রী খোদেজা বিবি ফুলচৌকি নগর প্রাসাদে কিছুদিন পরেই মারা যান। এক মাত্র কন্যা খুশীয়ন নেছা বিবি বিবাহের ২/৩ বৎসরের মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট ২য় আকবর ও সম্রাজ্ঞী লালবিবির কন্যা খোদেজা বিবি হলেন শাহজাদা খাজেরউদ্দিন মোহাম্মদের বেগম।

দেখা যাচ্ছে ঘাউয়ানী চৌধুরানী বিবি সাহেবা এই নামটি সম্পূর্ণ বানানো ও মিথ্যা। এনার আসল নাম হল আছিয়া বিবি। এনার পিতার নাম বাদশাহ শাহ আলম। জামালউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরীর জ্যাষ্ঠা ভ্রাতা কামালউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী। এনারা দুই ভাই সম্রাটের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। জ্যাষ্ঠা কন্যার নাম জতন বিবি, ডাক নাম কোকিলা আর কনিষ্ঠার নাম আছিয়া বিবি। দলীলে দেওয়া আছে পালিচরা নিবাসী তরিকুল্লা বরকন্দাজ রংপুর সদরে ঐ দলীল রেজিষ্টী করতে গিয়াছিল এবং যাকে ঘাউয়ানী বিবি চৌধুরানী বলা হচ্ছে তিনি স্বয়ং এবং নছিরউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী ও আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী এনারা আজীবন গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন।

পদাগঞ্জ বা পদগঞ্জের হাট সংলগ্ন পশ্চিম দিকে জামালউদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী ও আছিয়া বিবি চৌধুরানীর ঝিল ও বালাখানার নাম এখন অবধি লোকেরা বলে থাকেন। কাঠগড়ার পার্শ্বে বালাখানা ও ঝিলের ধ্বংসাবশেষ কিছু কিছু পরিলক্ষিত হয়।

হাণ্টার কর্তৃক ইংরেজ শাসকদের প্রদত্ত পরামর্শ

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের দৃষ্টিতে যারা গুরুতর অপরাধী তাদের গুলী করে অথবা ফাঁসে ঝুলিয়ে মারত। কিন্তু ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সাহেব তার উপরওয়ালাদের পরামর্শ দিচ্ছেন কিভাবে তা দেখুন ঃ

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সাহেব এখানে কি বলছেন তা উদ্ধৃত করা হল ঃ

"'Any attempt to stamp out the conspiracy by whole sale prosecutions would face the zeal of the feutics into a flame, and array on their side the sympathies of all devout Mussalmans. The distempered class must be segragated without the sightest feeling of resentment and indeed with the utmost gemtleness but with absolute strength''...

The Indian Musalmans
W. W. Hunter—1871
Page 126

বাংলা অনুবাদ ঃ

''সার্বিক দমননীতি প্রয়োগের দ্বারা ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদের চেষ্টার পরিণতি দাঁড়াবে ধর্মান্ধদের উৎসাহকে অগ্নিশিখায় পরিণত করে সমস্ত ধর্মভীরু মুসলমানদের সহানুভূতি তাদের দিকে আকৃষ্ট করা। অসন্তোষের সামান্যতম মনোভাব সৃষ্টির আগেই অবাধ্য শ্রেণীকে অবশ্যই আলাদা করে ফেলতে হবে এবং এটা করতে হবে সম্পূর্ণ ভদ্র প্রক্রিয়ায় অথচ সামগ্রিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে।"

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সাহেব তার কথাগুলি আরও পরিষ্কার করে কি বলছেন দেখুন ঃ

"It can shut up the trailors in its Jails, but it can segregate the whole party of sedition in a nobler way - by detaching from it the sympathies of the general Muhammadan community, This, however, it can do only by removing that chronic sense of wrong which has grown up in the hearts of the Musalmans under British Rule.''

বাংলা অনুবাদ ঃ

"ভারতে বৃটিশ সরকার এখন এত শক্তিশালী যে তাতে আর দুর্বলতার কোন অবকাশ নেই। রাজদ্রোহীদের সকলকেই সরকার কারান্তরালে আটকে রাখতে পারেন; কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহী দলটাকে কোণঠাসা করার আরও একটা মহত্তর উপায় আছে; সেটা হল সাধারণ মুসলমান সমাজ থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা। মুসলমানদের মনে অন্যায়বোধের যে পুরানো রোগ বৃটিশ শাসনামলে সৃষ্টি হয়েছে তাকে অপসারণ করেই এটা করা যেতে পারে... পৃঃ ১২৭—187

The Indian Mussalmans
First Bangladesh Edition. Oct. 1975
Translated by M. Anisuzzaman

ঠকানো কমিশন দলীল

মাননীয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে দুইখানা একই বাংলা ও ইংরেজী রেজিষ্ট্রী দলীলের হুবহু উদ্ধৃতি এখানে দিলাম। এর ২ খানি কমিশন নিয়োগ দলীল। আমিরন নেছা বিবি চৌধুরানী সম্পত্তি লিখে দিচ্ছেন, কিন্তু কাকে দিচ্ছেন সম্পত্তি-তার কোন নাম নেই এবং কোথাকার কত সম্পত্তি দিচ্ছেন তারও কোন উল্লেখ দলীলে নেই। অথচ তাঁর নামীয় যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তা সবই গেল। যে সময়কালে দলীল সম্পাদন করা হয়েছে-ঐ সময় এবং তার আগে ও পরে ঐ প্রাসাদের নরনারী সকলেই গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত ইংরাজদেব শয়তানী, নিষ্ঠুরতা ও ধাপ্পাবাজি কতখানি ছিল তা দেখুন। আশুতোষ দেবের বাংলা ইংরাজী অভিধানে বলা হচ্ছে (Commission) কমিশন দালালী দস্তুরী, Brokerage (সাধারণত অন্যায়) কার্য্য সম্পাদন; The act of doing some thing (Use wrong) ভারপ্রাপ্ত করা হইল।

শ্রী আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী জওজে শ্রীযুক্ত-নছিরউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী, বেন্তে ছানাউল্বা চৌধুরী মরহুম, বয়স আন্দাজ-৩৭/৩৮ বৎসর, পেষা জমিদারী আদি সাকিন ফুলচৌকি, ষ্টেষন মলঙ্গ, পরগনে সরহাট্যা জেলা রঙ্গপুর। লেখক শ্রী নেজামউদ্দীন চৌধুরী।

এই হাজীর আম মোক্তার নামা দাইনী শ্রীযুক্তা আমীরন্নেছা-বিবি চৌধুরানীকে আমরা চিনি ও আমাদের সম্মুখে কমিশনে এই মোক্তার-নামা পাঠ করিয়া শুনালে পারস্য লিখিত দস্তখত আপন নামের মোহর স্বহস্তে ছেপ্ত করিয়া দেওা ও তাহার নাম শ্রী মনিরউদ্দিন সরকার লিখিয়া দেওা ও এই আম মোক্তারনামার সমুদয় লিখিত স্বর্ত্য স্বীকার করিলেন। ইতি সন ১৮৭৮ ইংরেজী তারিখ—১ আগষ্ট মোতাবেক ১২৮৫ সাল, বাংলা তারিখ ১৭ই শ্রাবণ—

শ্রী নেজামউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী, পিতার নাম শ্রীযুক্ত নছিরউদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী বএশ আন্দাজ ১৯/২০ বৎসর পেষা জমিদারী সাকীন ফুলচৌকি ষ্টেষন মলঙ্গ পরগনে সরহাট্টা জেলা রঙ্গপুর।

শ্রী জমিরউদ্দিন মহাম্মদ পিতার নাম শ্রীযুক্ত ফাজিলউদ্দিন মহম্মদ মিঞা বএশ আন্দাজ ২২/২৩ বৎসর। পেষা গৃহস্থি ও জোতদারী সাকিন জগদীশপুর ষ্টেষন মোলঙ্গ, পরগনে সরহাট্টা জেলা রঙ্গপুর।

শ্রী আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী
লিখক শ্রী নেজামউদ্দিন মহম্মদ চৌধুরী

SEAL

শ্রী নছিরউদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী

Rangpore S. R. office
The 1st August 1878 } Fahimulla Shaikh Mohuri.

Voluntarily execute
Amirunnesa Bibi
Nasiruddin Mahammad
of Fulchouki, Zaminder
by whom is—

Having visited the residence, Bibi Choudhurani wife of Nasiruddin Mohammad Choudhury of Fulchouki, Station Molong, Perg, Sarhatta zh Rangpore, Zaminder by caste Mahammedan, I have this day examined the said Amiran Nesa Bibi Choudhurani who has been identified to my satisfaction, by Nezamuddin Mohammad Choudhuri son of Nasiruddin Mohammad Choudhuri aforesaid of Fulchouki, station Molong. Perg Sarhatta zh Rangpore Zeminder by Mohammedan and by Zamiruddin Mohammad son of Faziluddin Mohammad of Jagadishpur station Molong Perg. Sarhatta zh. Rangpore Jotedar,

শ্রী আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী
দিঃ— শ্রী নেজামউদ্দিন চৌধুরী

Seal of Registar
রঙ্গপুর

শ্রী আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী
স্বামী—নছিরউদ্দিন চৌধুরী

শ্রী আমিরন্নেছা বিবি চৌধুরানী

by caste Musalman and the said Amiran Nessa Bibi Choudhurani admitted the execution of the written power.

তনখার মিয়াদের কথা

তংকা বা তনখা নাম উৎপন্ন কিভাবে হয়েছে সুধীগণ কেহ যদি জানতে চান ৪৭০ পৃঃ ৭ম ভাগ বিশ্বকোষ, নরেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত পাঠ করলে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

আমরা এখন বৃটিশ ভারতখ্যাত রাজনৈতিক এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অশোক মেহতা লিখিত ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'আঠার 'শ সাতান্নর বিদ্রোহ' নামক গ্রন্থে বিখ্যাত উর্দু কবি গালিবের কবিতার সামান্য অংশ যা বাংলা অনুবাদে রয়েছে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"দিল্লী হো গিয়া সাহারা"

"তালিয়ার খানের দুই ছেলে তংক থেকে এসেছিল দিল্লীতে বেড়াতে বিদ্রোহ ঘটাতে; তারা আর ফিরে যেতে পারেনি। তাদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে আজ।"

—গালিব রচিত উদ-ই-হিন্দ

এই তঙ্ক বা তনখা হল রঙ্গপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত বর্তমানে একটি গণ্ড গ্রাম। মোগল আমলে এমন একদিন ছিল যখন শুধু তঙ্ক বা তনখা বললেই মোগল ভারতে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা বুঝে ফেলতেন তঙ্ক বা তনখা বাংলা সুবা, একটি সমৃদ্ধশালী স্থানে বসবাসকারী 'মিয়া'। ইতিহাস পাঠে জানা যায় সৈয়দ মোহাম্মদ খাঁ ১৬৮২ শকে রঙ্গপুরের ফৌজদার ছিলেন এবং ঐ বংশের অধস্তন এবাদত খাঁ, কোববাদ খাঁ, আলদাদ খাঁ ও জামান খাঁ ইহাদের নাম দলীল-দস্তাবেজে পাওয়া যায়। এনারা সকলেই বংশানুক্রমে রঙ্গপুর, ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন। একটি দলীলে আলদাদ খাঁ ও জামান খাঁর ১১৮৬ বাংলা সালে নাম দেখা যায়। কাকিনার জমিদার বাড়ীর হাতে লেখা ইতিহাসের একটি ইংরাজী পাণ্ডুলিপিতে লেখা ছিল। (লেখক কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য) আলদাদ খাঁ মোগলদের শেষ ফৌজদার। ১৭৬০ সালের সময়কালে আলদাদ খাঁ মোগলদের পক্ষে ফৌজদার ছিলেন। ইঁহারা মোগল সম্রাটদের আত্মীয় ছিলেন। সম্ভবত বাংলা সুবায় আর কোন আত্মীয় ছিল না।

কবি গালিব বর্ণিত তালিয়ার খাঁর পিতা আলদাদ খাঁ, তালিয়ার খাঁর পুত্র ফাজিল খাঁ তৎপুত্র আমীর খাঁ ও তমিজ খাঁ। তমিজ খাঁর এক পুত্র মিয়া রহীম খাঁ। রহীম খাঁর একমাত্র কন্যা জীবিত আছেন। তার নাম খোদেজা বিবি। এর ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমির খাঁর দুই কন্যা—একজনের নাম জোহরা বেগম আর একজনের নাম আমীরন বিবি। কিন্তু উভয় কন্যারই বংশধর অদ্যাবধি রয়েছে। তালিয়ার খাঁর স্ত্রী ও ফাজিল খাঁর মাতার নাম গুলবণ বিবি। ইনিও লালকেল্লার এক শাহজাদী। তালিয়ার খাঁর পুত্র ফাজিল খাঁ মোগল শাহজাদা ওয়ালীদাদ মোহাম্মদের কন্যা শাহজাদী গরীবন বিবিকে বিবাহ করেন। শাহজাদা বাকের জঙ্গ-এর মামা ফৌজদার আলদাদ খাঁ, নানা হলেন কোববাদ খাঁ এই আত্মীয়তা সূত্রে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় তালিয়ার খাঁর দুই পুত্র দিল্লীর লালকেল্লা মোগলদের প্রাসাদে বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে ইংরাজরা দুই ভ্রাতাকে গুলী করে হত্যা করেছিলেন। আমীর খাঁ ও তমিজ খাঁর পিতা ফাজিল খাঁ। ফাজিল খাঁ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব যুদ্ধে যোগদান করেন এবং যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলে ইংরাজ কর্তৃক তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ফাজিল খাঁর ফাঁস

হওয়ার কথা ইংরাজদের ইতিহাসে ও এ দেশীয় ইতিহাসেও লেখা রয়েছে বটে কিন্তু তাঁর নিবাস কোথায় এবং পরিচয় বা কি সে সব কথা ইতিহাসে লেখা হয় নাই।

ইঁহারা খুবই প্রজারঞ্জক দানশীল জমিদার ছিলেন। রঙ্গপুরস্থ বাতাসন পরগনা ও সরহাট্টা পরগনা ইত্যাদির মোট ৫টি পরগনার জমিদার ছিলেন। ইহা ছাড়া বহুবিধ ব্যবসাও ছিল। দিল্লী মোগলদের রাজধানীতে এই বংশের লোক-রাজকার্যের বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সাধক (কামেল) লোকও ছিলেন। ইংরাজদের সহিত সংগ্রামকারী সন্ন্যাসী ফকীর নেতাদের সহিত ইহাদের খুবই আত্মীয়তা-সুলভ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ বিপ্লবের যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় এই বংশের বহু লোককে অমানুষিকভাবে হত্যা করা হয়। কেউ কেউ এদিক সেদিক পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করেন। ফুলচৌকি নগরের মোগল রাজবংশের এক লোক ফুলচৌকি নগর লুন্ঠন ও হত্যার তাণ্ডবলীলা দেখে জীবন বাঁচানোর জন্য পাবনা জেলায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন। এখন তাদের পরিচয় কিছু জানা যায় না। এখন প্রশ্ন হলো আলদাদ খাঁর সহোদর ভ্রাতা-জামান খাঁর অধস্তন-বংশধরেরা আছেন কি না?

১৮৫৭ সালে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর তনখার মিয়াদের সমস্ত জমিদারী, খাস জমি ও ব্যবসাদি সবই বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদটিও ধ্বংস করে দেয়। বাতাসন পরগনা, সরহাট্টা পরগনা ও অন্য আরও ২/১ টি পরগনা মুর্শিদাবাদের বানোয়ারী লাল ইংরাজদের নিকট হতে নাম মাত্র মূল্যে পায়। প্রজাদের বিদ্রোহের ফলে ও অনেক মারপিটের পর-বানোয়ারী লাল কয়েক বৎসর পরেই উক্ত জমিদারীগুলি মুর্শিদাবাদ নিবাসী প্রতাপ সিংহ দুগড়ের পুত্র নছমিপাত সিংহ দুগড়কে জমিদারী পত্তন দেন। এদের সঙ্গেও প্রজাদের বহু বৎসর ধরে মারপিট, বিবাদ-বিসম্বাদ চলে। পরে ইংরাজ ও জমিদারের অবর্ণনীয় অত্যাচারে প্রজারা শান্ত হন।

প্রখ্যাত কবি ও ঐতিহাসিক কবি গালিবের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, যা বিশ্বকোষে রয়েছে তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম ঃ

গালিব বিখ্যাত কবি ও ঐতিহাসিক। ইঁহার আসল নাম মির্জা আসাদ-উল্লা খাঁ। ইঁনি আলী বকস খাঁর পুত্র, ফিরোজপুর ও লোহারির নবাব

আহম্মদ বকস খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র. ইনি পারস্য ভাষায় একখানি 'দিবান' এবং ভারতবর্ষের মোগল সম্রাটগণের ইতিহাস রচনা করেন।"

বিশ্বকোষ
নরেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত

তঙকা বা তনখা, সংস্কৃত টঙ্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন। "বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাজ সরকারের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারী ও সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি প্রদত্ত হয় উহাকেও তংকা বা তনখা কহে।"

বিশ্বকোষ ঃ শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু
সংকলিত ও সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪৭০, সপ্তম ভাগ

জনাব মান্নান খান এডভোকেট সাহেব আমাকে (লেখককে) বলে আসছেন যে ওঁনারা তনখার মিঞাদের অধস্তন বংশধর। কিন্তু উপর বংশের কুষ্টিনামা লেখা নাই এবং থাকতেও পারে না যে ভাবে অত্যাচার হত্যালীলা লুঠতরাজ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের তাণ্ডবলীলা চলেছিল।

আমরা শুধুমাত্র আলদাদ খাঁ সাহেবদের বংশ-তালিকা বা কুষ্টিনামা পেয়েছি যা উদ্ধৃত করা হয়েছে। শাহ নেওয়াজ খান পর্যন্ত ওঁনারা বলতে পারেন এবং আকবর খানের ভগ্নি আছিয়া খাতুন তনখার মিঞাদের বংশধর—এ কথা তিনি ছোটবেলা হতে শুনে এসেছেন অনেকের মুখে। আমিও (লেখক) মনে করছি যে ওনারা তনখার মিঞাদের কোন বংশধর হতে পারেন।

হাজী শাহ নেওয়াজ খান
পুত্র ঃ আঃ রহীম খান
পুত্র ঃ হাজী আকবর খান—ভগ্নি আছিয়া খাতুন
পুত্র মান্নান খান

দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক গোলাম কাদের খাঁর কথা

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের ইতিহাসে এবং এদেশীয় ইংরাজদের পদলেহী লেখকদের লেখায়ও দেখতে পাওয়া যায় সম্রাট শাহ আলম যখন ইংরাজদের পক্ষপুটে থাকেন তখন কিছুই বলা হয় না, আর যখন মারাঠাদের কাছে থাকেন তখন বলা হয় মারাঠাদের অধীন। আর ইংরাজদের কাছে থাকলে আশ্রয়ে বলা হয়। শাহ আলম বাদশাহ এর প্রতি-ইংরাজদের অনুরূপ ন্যায়-বিচার-অথবা দরদ ছিল ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ নাই। অথচ মারাঠাদের

কতখানি দরদ-ও মমতা ছিল সম্রাটের প্রতি তা নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ হতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

“গোলাম কাদের খাঁ,”

“একজন রোহিলা সর্দার, জাবিদ খাঁর পুত্র, এই পাপিষ্ঠ সম্রাট শাহ আলমের আশ্রয়ে থাকিতেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক রোহিলাদিগকে সম্রাটের নেত্রগোলক উৎপাটিত করিতে আদেশ করেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ১০ই আগষ্ট সেই জঘন্য আদেশ প্রতিপালিত হয়।

কিন্তু পথিমধ্যে মারাঠা সৈন্য আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। তাহারা পাপিষ্ঠ-গোলাম কাদেরের নাক, কান, হাত পা খণ্ড খণ্ড করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু পথেই উক্ত বর্ষে ডিসেম্বর মাসে তাহার মৃত্যু হয়।”

বিশ্বকোষ
প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব
শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত

রাজা রামমোহন রায়ের কথা

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ রঙ্গমহল ও মোগলদের ঢেকে ফেলবার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকির ও ছলনা চাতুর্য্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইংরাজদের লেখায় জানা যায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু ও অত্যাচারী হররাম (সেন) এর পৈতৃক বাড়ী নিলফামারী ডিমলা থানার সন্নিকট। মৌজাটির নাম ডিমলা। ১১৭৩-এর মন্বন্তরের সময় ক্ষিপ্ত প্রজারা হররামের পুত্র গৌর মোহনকে হত্যা করে এবং হররামই এই পুরুষের ১ম জমিদার। সেই হতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের সহিত এই বংশের লোকদের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ গাঢ় হয়ে উঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত তা ছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে রঙ্গমহলের একটি অর্দ্ধ ভরাট ক্যানেল কাটিয়ে নিলকমল সেনের পুত্র জানকী বল্লভ সেন, নিবাস কাননগো টোলা, মাহীগঞ্জ (ডিমলার জমিদার বাড়ী) উক্ত ইং সালে জানকী বল্লভ সেনের মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে রঙ্গপুর আদালত কাছারীর রাস্তার পার্শ্বে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। উক্ত স্তম্ভে লেখা রয়েছে “পীড়ার আকরভূমি এই রঙ্গপুর প্রণালী কাটিয়া তাহা করিবারে দূর, মাতা শ্যামা সুন্দরীর স্মরণের তরে

জানকী বল্লভ সুত এই কীর্ত্তি করে।" কিন্তু অন্যান্য জেলার মত পীড়া ব্যতীত অধিক কিছুই হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্কে কিছুটা এখানে বলতে চাই। ইনি চাকুরী অবস্থায় যে স্থানে বাস করতেন সেই স্থানটির নাম এখন অবধি রয়েছে দেওয়ান টোলা, বর্তমান মাহীগঞ্জ টাউনের সোজা ১ মাইল দক্ষিণে। কাননগো টোলার সোজা পূর্বদিকে ৪/৫ শত গজ দূরে দেওয়ান টোলা। ঐ সব এলাকাই পূর্বে রঙ্গপুর শহর ছিল।

ফুলচৌকি নগরের শিক্ষিত প্রাচীন লোকেরা বলতেন যে রাজা রামমোহন রায় খুবই স্বদেশ প্রেমিক এবং স্বাধীনতা পিয়াসী ছিলেন। তাঁর রঙ্গপুরের চাকুরী সময়কালে মোগল শাহজাদাদের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ও আলোচনাদি করতেন তেমনি ফকির-সন্ন্যাসী নেতৃবৃন্দের সহিত ধর্মালোচনা এবং দেশের মুক্তির আলোচনাদিও করতেন সতর্কতার সহিত। সেই জন্য রাজা রামমোহন রায় রঙমহলে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম কর্ম করার জন্য। এই ধর্ম আলোচনার নাম করে তিনি পূর্বোক্ত লোকদের সহিত মেলামেশা এবং দেশের স্বাধীনতা আনয়ন সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতেন। পূর্বের ব্রাহ্ম মন্দিরটি নিম্নোক্ত বর্ণনার জায়গায় ছিল। বর্তমানে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জায়গাটির বর্ণনা আমি জমিদার সুবোধ চন্দ্র রায় এবং আরো অনেকের কাছে যেমন শুনেছি এবং আমিও ভাঙ্গা দেয়াল মন্দির ঘরের নিজেও (লেখক) দেখেছি সেই অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

"পুলিশ হলের উত্তরের বারান্দা পর্যন্ত পুরাতন আদি ব্রাহ্ম সমাজ গৃহের সীমানা এবং দক্ষিণের বারান্দা পর্যন্ত ঐ মন্দির ছিল। বড় রাস্তার উত্তর পার্শ্ব পর্যন্ত ঐ আমলের একটি পুকুর ছিল। পুকুরটি পুলিশ হল স্থাপনের কিছু পূর্বে ভরাট করা হয়েছে।"

মাননীয় স্বর্গীয় কেশব সেন মহাশয় তাঁহার প্রথম কন্যা সুনিতি দেবীর সহিত কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয় ১৮৭৮ খৃঃ ৬ই

মার্চ তারিখে। সেই হিসেবে কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার আত্মীয় কাকিনার জমিদার বংশীয়রাও ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং কাকিনার জমিদারদের দেওয়া রঙ্গপুরের বর্তমান ব্রাহ্ম মন্দিরটি।

প্রবন্ধের নাম-মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭-১৯০৫)

মূর্তিপূজা অস্বীকার

"রাজা রামমোহন প্রথম বয়সে আরব ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। এই ভাষার সাহায্যে মুসলমান ধর্ম্মে প্রবেশ তিনি সহজেই লাভ করেন। মুসলমান ধর্মের প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বালক রামমোহন মূর্তিপূজার উপর বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। মূর্তি পূজার উপর বিদ্বেষভাব লইয়াই তিনি হিন্দু শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এবং ইহাকে বেদবিরোধী ও নিম্নাধিকারীর যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করেন। পরবর্তীকালে খৃষ্টান ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া খৃস্টানদের ভজনালয়ে গিয়া উপাসনা করিতেন—ইহাও আমরা দেখিয়াছি, এবং স্বাজাত্য বোধ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কিরূপে তিনি খৃষ্টান ভজনালয় পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করেন তাহাও দেখিয়াছি। এই ব্রাহ্মসভাকে কোন কোন বিষয়ে বিশেষভাবে হিন্দু আকার দেওয়া হইয়া থাকিলেও প্রকাশ্য সভা করিয়া সকলে মিলিয়া ব্রহ্মোপোসনা করার মূলে খৃষ্টানধর্মের প্রেরণা বহু পরিমাণে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সুতরাং সংস্কার যুগে রামমোহনের মূর্তি পূজার অস্বীকারের মূলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মের প্রেরণা আমাদের দৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। রামমোহনের ব্রাহ্মসভা যে সার্বভৌমিকতার উপর স্থাপিত, তাহা প্রধানত মুসলমান ও খৃষ্টান এই দুই বিশেষ ধর্মের সংঘাতজনিত। রামমোহনের এবংবিধ ব্রাহ্মসভা মূর্তি পূজাকে হিন্দুধর্মের পক্ষ হইতে অস্বীকার করে। এই ব্রহ্মসভা কালে দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয়। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে মূর্তিপূজার অস্বীকারের ইহাই ইতিহাস।"

"রাজা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের প্রায় অর্ধশতাব্দীরও কিঞ্চিতধিক পূর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ 'শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৯০ খৃঃ হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম প্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা করিয়া মূর্তি পূজার প্রতিবাদ করেন। তাহার পর ১৮১৪ খৃঃ হইতে রাজা রামমোহন হিন্দুর মূর্তি পূজাকে নিম্ন অধিকারীর উপযোগী ও বেদবিরোধী, কাজেই অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বাঙ্গালা ও বাঙ্গালার বাহিরে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন।"

লেখক শ্রীযুক্ত গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী
নারায়ণ (মাসিক পত্রিকা)
সম্পাদক, শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশ
তৃতীয় বর্ষ, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা
বৈশাখ ১৩২৪ সাল

যাহা হউক কলিকাতা হতে প্রকাশিত রাজা রাম মোহন সম্পর্কে ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতাস্থ বাড়ীতে পাল্কীতে পর্দা ঢাকা অবস্থায় এক মুসলমান প্রণয়নী মহিলা রাজা রাম মোহন রায়ের কাছে আসতেন। প্রশ্ন হল পাল্কীর পর্দা উন্মোচন করে কেহ কি দেখেছিলেন যে পাল্কীর ভিতরে নারী কিম্বা-পুরুষ রয়েছে?

কলিকাতায় যখন রাজা রামমোহন রায় অবস্থান করতেন তখন কলিকাতার সুতানুটিতে ফুলচৌকির মোগলদের কারবারের কুঠি ছিল, সেই কুঠি হতে কোন পুরুষ-লোক- পাল্কীতে চড়ে পদা ঢাকা অবস্থায় গোপনে রাজার সহিত রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শাদি করতে যেতেও পারেন তো; এবং ফুলচৌকি নগরের প্রাচীন লোকদের মুখে রাজা রামমোহন সম্পর্কে কথাগুলি এখন কিন্তু আমার তাই মনে হয়। এ কথাও আমাদের মনে রাখার দরকার যে রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাওয়ার সমস্ত খরচ কলিকাতার সুতানুটি কুঠি হতে দেওয়া হয়েছিল, এ সব কথাও ফুলচৌকির প্রাচীনরা বলাবলি করতেন।

বিশাল ধনী ও ব্যবসায়ী মোগল শাহজাদা কামালউদ্দিন মোহাম্মদের সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগ্নি হলেন সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের বেগম শাহজাদী লালবিবি।

সেনানায়ক গোলাব সিংহের অধস্তন বংশধরদের সংক্ষিপ্ত কথা

সুদূর অতীত ইতিহাসের বিস্ময়কর আবিষ্কারক এণ্ডরু টমাস বলেন যে, "মানুষ একমাত্র তখনই সভ্য যখন সে অতীতের কথা মনে রাখে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।"

আমাদের আলোচ্য ইতিহাসের বিষয়বস্তুগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে আমরা অতীতের দিকে খুব একটা ভাল করে তাকাই নাই, দেখি নাই।

গোলাব সিংহের শিশু ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে ৩ মাসের শিশুকে তার মা হত্যাতাণ্ডবলীলার সময় কোলে নিয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করে পালিয়ে কোন রকমে নিজের জীবন ও শিশুর জীবন রক্ষা করেন। সেই শিশুর অধস্তন বংশধরগণের এখন রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানাধীন ধাপের হাটের পশ্চিমের নদীটির পশ্চিম পাড়ে বসতবাড়ী রয়েছে বিষ্ণুপুর গ্রামে। ঐ বংশের সব থেকে প্রাচীন সুরেন্দ্র নাথ সাহা— (৯৫ বৎসর) পিতা অমৃত লাল সাহা, পিতামহ মদন মোহন সাহা, ভ্রাতা গোলাব সাহা (সিংহ) পিতা কানোয়ার সিংহ পিতা মহেন্দ্র সিংহকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনারা তো সাহা বংশীয় কেমন ? প্রাচীন ভদলোক বললেন আমরা সাহা পদবীওয়ালা লোক ছিলাম না। তবে কি খেতাব আপনাদের পূর্ব পুরুষদের ছিল ? প্রাচীন ভদ্রলোক ও আরও কয়েকজন ঐ বংশীয় লোকেরা বললেন ইংরাজ আমলে ছোটবেলায় আমাদের বংশীয়রা মাঝ মাঝে কখনও বলতেন আমরা সাহা নই। সাহা যদি নন তবে কি পদবী আপনাদের ? এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে ছিলেন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ বিপ্লবের সময়কালে ধনকুবের মহেন্দ্র সিংহের একপুত্র সিরাজ টাকানীতে অধ্যক্ষ ছিলেন টাকশালের। তিনি যে স্থানে কুঠি নির্মাণ করে বাস করতেন ঐ স্থানটি সিরাজ টাকানী হতে উত্তর পশ্চিমে ২/২½ মাইল হবে। স্থানটির নাম এখন পদাগঞ্জ বলা হয়। ঐ খানেও একটি ছোট টাকশাল বা টাকানী ছিল। সে নামটি এখন অবধি রয়েছে। লোকেরা পদশাহ, পদাসিংহ, পদশাহ, পদশেঠ এখন অবধি বলে থাকেন। শাহর অপভ্রংশ হল শেঠ। উক্ত পদাগঞ্জের সামান্য কিছু পশ্চিমে কাঠগড়া, কাঠগড়ার পার্শ্বে ঝিল, ঝিলের পার্শ্বে শাহজাদা জামালউদ্দীন ও তার

বেগম শাহজাদী আছিয়া বিবির বালাখানা ছিল। এ সব কিছুর বিশেষ কিছুই নাই, তবে স্মৃতিচিহ্নগুলি এখন অবধি দেখতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্র সিংহের পুত্র কানোয়ার সিংহের এক পুত্রের নাম গোলাব সিংহ। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর ইংরাজ কর্তৃক নানারূপ অত্যাচার ও হত্যালীলায় ঐ বংশের সকলেই শেষ হয়ে গেছে।

একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

"রংপুরের জীবনে কয়েকটি কাহিনী" শিরোনাম দিয়ে রংপুরের প্রখ্যাত উকিল ও পণ্ডিত চিন্তাবিদ দেশপ্রেমিক জগদীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত একটি সুচিন্তিত প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রকাশ করে "রংপুর সম্মিলনী", (কলিকাতা) স্মারক সংখ্যা ১৯৮৪ পত্রিকায় যে সব তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন, সেই লেখাটির কিছু কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিয়ে আমাদের যৎকিঞ্চিৎ মতামত তুলে ধরব আশা করি।

……"রংপুর জেলা স্কুলের প্রেসিডেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইমারসন সাহেব স্কুলে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদের কোন কৈফিয়তের সুযোগ না দিয়া প্রতিদিন দেশাত্মবোধক গান করার শাস্তিস্বরূপ প্রত্যেক ছাত্রকে পাঁচ টাকা জরিমানার হুকুম দিলেন।" … ছাত্র প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়া নিজ নিজ ক্লাস পরিত্যাগ করিয়া স্কুল প্রাঙ্গণে সভা করে ও প্রস্তাব গ্রহণ করে এই সরকারী গোলাম খানা চিরতরে বর্জন করিতে হইবে। "গোলাম খানায়" পড়ব না এই সংকল্পে প্রতিবাদ মুখর ছাত্ররা সেই দিন হইতে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিল।' …… 'রংপুরের এই বিদ্যালয় সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হয়। পরবর্তী কালে রংপুরবাসীর দেয় অর্থে জাতীয় বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ রংপুরের ব্রাহ্ম সমাজের পাশে নির্মিত হইলে তথায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য কলিকাতার National Council of Education দ্বারা ঐ জাতীয় বিদ্যালয় affiliated হয়। National Council of Education-এর পরিচালনাধীন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্তন হইলে পরীক্ষার্থী ছাত্ররা ঐ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইত।"

…"জাতীয় আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষা দেওয়াই ছিল ইহার মূলমন্ত্র।"

…"ঐ বিদ্যালয়ের একটি টেকনিক্যাল ও সারভে সেকশনও ছিল।"…

…"এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষার প্রশ্নকর্তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। কলিকাতার National Council of Education কলেজ বিভাগে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। বরোদা কলেজে সাত আট শো টাকা বেতনের অধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র একশত টাকা বেতনে জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন।"

… বিভিন্ন দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, মহাপুরুষদের জীবনী বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ মঠ।"

… "এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রেরণায় রংপুর শহরের জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ও কুড়িগ্রাম শহরে ১৯০৭ সালে রংপুর জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। রংপুরের সভায় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও কুড়িগ্রাম সভায় উমেশচন্দ্র গুপ্ত সভাপতিত্বের কাজ করেন। উভয় সভাতেই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভলান্টিয়ার হিসাবে কাজ করে ও সম্মিলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে।" … "ও ছাত্রদের উপরও নজর (পুলিশের) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে ছাত্রদের অভিভাবকগণ জাতীয় বিদ্যালয় হইতে ক্রমে ক্রমে ছেলেদের ছাড়াইয়া লইয়া যায়। জাতীয় বিদ্যালয় এই ভাবে ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যায়। আরও বিশেষতঃ ১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের রাজপদে অভিষিক্ত হওয়া ও ভারতে আগমনের পর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়—সেই কারণেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তীব্রতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।"

…… অরবিন্দকে পুনরায় জেলে আবদ্ধ করার ষড়যন্ত্র চলে। সেই মর্মে ইংরাজ সরকারের ওয়ারেন্টের হুকুম পূর্বে গোপনে জানা যায়।"………… "রাত্রিকালে শ্রী অরবিন্দকে হাওড়ার গঙ্গার ঘাট হইতে ফরাশী শাশিত চন্দন নগরে মতিলাল রায়ের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেন।"…… শ্রী অরবিন্দ তখন স্থির করেন দক্ষিণ ভারতে ফরাশী শাশিত অঞ্চল পণ্ডিচেরীতে সকলের অজ্ঞাতে আশ্রয় লইবেন।" …

…"সেখানে (পণ্ডিচেরী) শ্রী অরবিন্দ ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যোগসাধনায় রত থাকেন।"…

আমাদের প্রশ্ন হল অরবিন্দ ঘোষ ভয়ে ওয়ারেন্ট এড়াতে চেয়েছিলেন কি? তিনি ইংরাজদের ভয়ে কি কখনও ভীত ছিলেন? এক কথায়

বলা যায় তিনি কখনও কোন সময়ই জেল জুলুম এমনকি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন দিতে কখনও তিনি ভীত ও কুণ্ঠিত ছিলেন না। একথা পরীক্ষিত সত্য যে যারা যত জ্ঞানী তারা তত বড় সংগ্রামী সাহসী পুরুষ। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ ও এদেশীয় কতিপয় লেখক ও তোষামোদকারীদের দ্বারা স্থায়ী সংঘাত-সংঘর্ষের দিকে দেশ চলে যাচ্ছে শেষে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এই মহাসত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন তার গভীর চিন্তাশীলতায়।

দেশপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক অসাম্প্রদায়িক বিশ্বপ্রেমিক এবং নিজের ধর্মপ্রেমিক মহানায়ক শ্রী অরবিন্দ ঘোষ পণ্ডিচেরীতে মহাতাপসী হয়ে রইলেন, পূর্বের স্থায়ী সংঘর্ষের সংঘাতের বিষয়গুলিকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু ইহাতেও কাজ হল না। ঘৃণা-বিদ্বেষ ও কল্পনার অপপ্রচারে দেশ ভাসল। ভাইয়ে ভাইয়ে স্থায়ী সংঘর্ষ, সংঘাত বিবাদ বিসম্বাদ, অবশেষে দেশ খণ্ডিত হল। সুচতুর ইংরাজ খেলোয়ার খেলায় কুপোকাৎ করে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে গোল দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু সমস্যা কি মিঠে গেছে না বেড়েই চলেছে ?

গোলাম আরবী শব্দ, আরবী উর্দু অভিধানে দেখা যায় গোলাম শব্দের অর্থ "শিশু," ভৃত্য," বিবেক বিচার, ন্যায় অন্যায়, নিজের ভালমন্দ সব কিছু প্রভু মনিবের উপর ন্যস্ত, নিজের বলিতে কিছু নাই।

বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত করেছিল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা ১৯০৫ সালে, বাঙ্গালী স্বদেশ প্রেমিকদের নব জাগরণ দেখে ভয় ও আতঙ্কে। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে ইংরাজ মারা এবং এ দেশীয় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীদের গুলী করে হত্যা করা এইসব বহুবিধ কারণে ইংরাজরা আতঙ্কিত হয়ে উঠে এবং যার ফলে বঙ্গ বিভাগ করা হল। বঙ্কিম-দর্শনে না থেকে হয়ত বাঙ্গালীরা পূর্বের বিদ্রোহ বিপ্লবের মত হিন্দু মুসলমান একত্রিত হয়ে স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে সংগ্রামে—এই ভয় ও আশংকা নিয়ে ইংরাজরা বাংলাদেশ ভাগ করেছিলেন। পরে বঙ্গ বিভাগ রহিত করা হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা হতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল। আমাদের কথা হল এই যে আমরা গোলামখানায় পড়ব না, কিন্তু পড়ে দেখা গেল সুড় সুড় করে ছাত্ররা সেই কথিত গোলামখানায় গেল অভিভাবকদের ইচ্ছায় নয় কি ?

ইতিহাসের দুটি অধ্যায়ে রংপুর গবেষক সুনীল রায়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধ হতে সামান্য কিছু তথ্যমূলক কথা আমরা এখানে উদ্ধৃত করে দিতে চাই ঃ

“ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দশ ভূজাধারিণী ! তবে ত্রাণে নয় লুণ্ঠনে।”

“দশভুজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভুজগুলি আবিষ্কার করতে গেলে অনেক তথ্যের অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দশভুজের অন্যভুজগুলি একের পর এক বেরিয়ে আসে পলাশীর পর থেকে।”…

১৭৬৯ সালে মুর্শিদাবাদে নিযুক্ত কোম্পানী রেসিডেন্ট মিঃ বেচার কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে আক্ষেপ করে বলেছেন—‘এদেশে যখন অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল সেই সময়ে এ দেশের সমৃদ্ধশালী অবস্থার কথা স্মরণ আছে। এখন আমি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে এ দেশের কি বিধ্বস্ত অবস্থা।” ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের সরকারী নথিতে দেখা যায়, লর্ড কর্নওয়ালিশ মন্তব্য করেছেন “আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি হিন্দুস্থানের কোম্পানীর অধিকৃত অংশের এক-তৃতীয়াংশ বর্তমানে বন্য পশু অধ্যুষিত বন্য জঙ্গলে পরিণত হয়েছে।” এই কথা উচ্চারিত হয় সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ দমন কার্য্য সমাধা হবার সমসময়ে।”

স্যার জর্জ কর্নেওয়াল লুইস ১৮৫৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী হাউস অব কমন্সে কি সাধে বলেছিলেন, “আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পরিচালিত সরকারের মত প্রতারক এবং বিধ্বংসী সরকার পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের সরকার ছিল না।”

ভারতীয় পণ্যের আসল মূল্য নির্ধারণ করে হিসেব করলে ১৭৬৫ সাল থেকে ১৭৮০ সাল এই পনেরো বছরে কম করেও রাম রহিমেরা ১০৫ কোটি টাকা মূলধন হিসেবে বৃটেনে শিল্প বিপ্লব ঘটাবার কাজে জুগিয়েছে। কোম্পানীর সাহেবদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই হিসেবের উপরে।”

“এই লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম-গণঅভুত্থান ঘটে উত্তরবঙ্গে ১৭৮২/৮৩ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। তার প্রামাণ্য নথি পাওয়া গেছে স্যার উইলিয়াম হান্টারের অ্যানালস্ অব বেঙ্গল-এর জেলাওয়ারী রিপোর্ট থেকে, ১৭৭০ সালের

মন্বন্তরের পর কোম্পানীর কলিকাতা কাউন্সিল ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৭৭১ এ রিপোর্ট করছে বিগত মন্বন্তরের বিধ্বংসী ক্ষতি এবং লোকসংখ্যা অসম্ভব হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বাংলা এবং বিহার প্রদেশের রাজস্বের হার বৃদ্ধি করতে হয়েছে।”

“রাজস্ব ধার্য্যের এই অমানুষিক চাপ। তারপর ১৭৮১ সালে আসল কর সংগ্রহকারীদের বঞ্চিত করে আরও উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের জন্য রংপুর, দিনাজপুর এবং তৎকালীন জেলা ইদ্রাকপুরের রাজস্ব আদায়ের জন্য দেবী সিংহকে যে ইজারা দেওয়া হয়, তার অত্যাচারে প্রথম রংপুরের চাষীরা বিদ্রোহ করে এবং পরবর্তীকালে কোচবিহার ও দিনাজপুরের চাষীদের এই বিদ্রোহে সামিল করিয়ে নেয় তার বিবরণ ইংরাজ কালেক্টর এবং হাণ্টার সাহেব শাষক গোষ্ঠির পক্ষ থেকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন সেটা বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই কি ব্যাপক শক্তিশালী গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছিল দীর্ঘ আট বছর ব্যাপী।”

—রংপুর সম্মিলনী, ১৯৮৬
সম্পাদক বিমল সেনগুপ্ত, কলিকাতা

এদেশীয় উচ্চশিক্ষিত নামধারী কতিপয় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকরা বলতেন ইংরাজ শাসন এদেশে এসে সুখ-সমৃদ্ধিতে দেশ ভরে গিয়েছে। যাকে বলা চলে স্বর্ণযুগ। কিন্তু ওপরের উদ্ধৃতিগুলি কি সে কথা বলে ?

রঙ্গপুরে ইংরাজ গুপ্তচর অফিসারের অবস্থিতির কথা

আমরা এখন নূতন তথ্য জানতে চাই, তৎসহ আমাদের কিছু বক্তব্য বলবার আশা রাখি।

পুরানো রঙ্গপুরের সীমানা যা জানা যায় তা হল জলপাইগুড়ি জেলা সহ হিমালয়ের পাদদেশ, আসামের ধুবড়ী জেলা এবং বগুড়ার কিছু অংশ, বর্তমান দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট থানা সহ রঙ্গপুর বিস্তৃত ছিল। বৃটিশ ভারতে মোট ৪টি মিলিটারী ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এর মধ্যে একটি রঙ্গপুরে ছিল লর্ড কর্নওয়ালীশের সময় হতে ১৯৪৭ সালের বৃটিশ রাজত্বের শেষদিন পর্য্যন্ত। এদেশীয় বাঙ্গালী শিক্ষিত ইংরাজদের গুপ্তচর অফিসে গিজগিজ করত। কর্নওয়ালিসের সময়কাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত রঙ্গপুর সদরে একজন মিলিটারী ইনটেলিজেন্স অফিসার (M. I. O) সব সময় থাকতেন। এ দেশীয় গুপ্তচরদের সহায়তায় খবরাখবর সংগ্রহ

করে সেই অনুযায়ী কাজ করতেন। একবারে শেষের অফিসারটির নাম হল গ্রাগরী সাহেব। সম্ভবত রাজশাহী বিভাগ-এর জুরিডিকসনের মধ্যে ছিল। পূর্বের আমাদের বর্ণিত ইতিহাসের বিষয়গুলি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পুনর্বার মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে, হিন্দু মুসলমানের লাগানো বিবাদ আরও জোরে সোরে চলতে পারে; কখনই যেন হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে তারই কাজকর্মের রিপোর্ট তৈরী করা এবং নূতন সন্ত্রাসবাদী নেতাদের ধর-পাকড় ও নানা অত্যাচার চালাত এম. আই. ও. গ্রাগরী সাহেব। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপরও কড়া নজর রাখা হত।

আমার প্রথম প্রশ্নটির কথা, আমরা জানতে চাই এই রঙ্গপুরের মত পূর্বের বাংলায় সব জেলাতেই কি M. I. O.[১] অফিসার থাকতো কিনা? শেষের অফিসারটির অফিস ছিল বর্তমান এস. পি. সাহেবের অফিসে ঢুকতে ডানদিকের ১ টি কামরার পর, পরের ডান পার্শ্বের কামরাটায় গ্রাগরী সাহেব বসতেন।

এটিই তার অফিস। থাকতো ডি. সি সাহেবের বাঙ্গলোরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি দালানে। দালানটিতে এখন পুলিশ ইন্সপেক্টর থাকেন। ১৯৪৭ সালের সময়কালে যখন ইংরাজ শাসকরা এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে ঠিক ঐ সময় মধ্যে দিল্লী, কলিকাতা পাটনায় ইংরাজরা তাদের গোপন ফাইল পত্র দলীল দস্তাবেজ স্বহস্তে পুড়িয়ে ফেলেন এবং সেখানে এদেশীয়দের যেতে দেওয়া হয় নাই। এ সব কথা আমরা পত্রিকায় পড়েছি। রঙ্গপুরেও পূর্ববর্ণিত অবস্থাই ঘটেছিল। M.I.O গ্রাগরী সাহেব তার অফিসের নিজ কামরায় দলীল দস্তাবেজ ফাইলপত্র স্বহস্তে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে এবং দরজায় বড় তালা দিয়ে বার হয়ে যায়। M.I O গ্রাগরী সাহেব যে মিলিটারী ইনটেলিজেন্স-এর একজন অফিসার। এই দুর্দান্ত অফিসার গ্রাগরী। আমার একটি প্রবন্ধ "রংপুর সম্মিলনী" পত্রিকায় ছাপা হয়। উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় আলোচনার উপরে একটি সুচিন্তিত তথ্যবহুল সম্পাদকীয় লিখেন প্রখ্যাত পণ্ডিত সম্পাদক ডাঃ বিমল সেনগুপ্ত। ঐ আলোচনায় তিনি বলেন সেকাল হতে একাল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রংপুরে একজন মিলিটারী অফিসার থাকতো এবং শেষের M. I. O. অফিসারটি হল গ্রাগরী সাহেব। না বললেও চলে ডাঃ বিমল সেন গুপ্ত মহাশয় রংপুরের একজন প্রখ্যাত উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় সন্তান।

---

[১] M. I. O=মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স অফিসার।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার প্রসঙ্গে

এখন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারকে নিয়ে কিছুটা কথা বলতে চাই ঃ

বগুড়া সহরের সদর থানা এর দক্ষিণ-পশ্চিমে থানা নন্দীগ্রাম এর পড়েই যদুনাথ সরকারের জন্মভূমি, থানা হল সিংড়া, মহকুমা নাটোর. জেলা রাজশাহী সিংড়া থানাধীন করচমাড়িয়া গ্রামে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের জন্ম হয়। আমার একটি পত্রের জবাব দিচ্ছেন যদুনাথ সরকারের প্রাক্তন নায়েব ঃ

জনাব হায়দার আলী চৌধুরী তাং ৫/১০/৮৩ ইং

আচ্ছালামো আলায়কুম !

আপনার লিখিত ১৫/৯/৮৩ ইং তারিখের পত্র পেয়েছি।...জনাব আপনার প্রয়োজনীয় বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল—

যতদূর আমার জানা আছে, তাহাই জানাইলাম—(আমি সরকার এষ্টেটের একজন নায়েব ছিলাম) করচমাড়িয়া গ্রামেই স্যার যদুনাথ সরকার দিগরের সদর কাছারী ছিল—(স্যার যদুনাথ সরকারের জন্মস্থান করচমাড়িয়া গ্রাম—স্যার যদুনাথ সরকারের পিতার নাম রাজকুমার সরকার। মাতার নাম স্নেহময়ী সরকার। স্যার যদুনাথ সরকারের ৭ ভাই। সবাই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। এই জন্য স্নেহময়ীকে (যদুনাথ সরকারের মাতাকে) বৃটিশ গভর্নমেন্ট 'রত্নগর্ভা প্রসবিনী' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।) কোন সনে উহা বলিতে পারি না। (স্যার যদুনাথ সরকার একজন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন) দাতব্য-চিকিৎসালয় (নাই) পোষ্ট অফিস, পাথরের মন্দির বহু পুকুর এখনও আছে। বহু উচ্চশিক্ষিত লোক এই গ্রামে আছে, এই পর্যন্ত জানাইলাম—পত্রের ত্রুটী মার্জনীয় আগতে ভবদীয় কুশল বাঞ্ছনীয়—ইতি।

নিঃ মোঃ জালালউদ্দিন সরদার
গ্রাম + পোঃ করচমাড়িয়া
জেলা রাজশাহী
বাংলাদেশ

ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে স্মরণ করলেও দুঃখে ও লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছা করে। বগুড়া কোতয়ালী থানার পরেই হল নন্দীগ্রাম থানা। নন্দীগ্রাম থানার পার্শ্ববর্তী হল সিংড়া থানা। ঐ থানার করচমাড়িয়া গ্রামে যদুনাথ

সরকারের জন্ম হয়। নাটোর মহকুমা এবং জেলা রাজশাহী। যদুনাথ সরকার মোগলদের ইতিহাস লিখেছেন হয়ত অনেক বৎসর ধরে। রানী ভবানীর এবং তার স্বামী, শ্বশুর বংশীয়দের একজন প্রজা ছিলেন যদুনাথ সরকাররা এবং রানী ভবানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে গড়, দুর্গ করে যে লড়াই করেছিলেন এই সব কথা ও ঘটনাগুলি যদুনাথ সরকারের না জানার কোন কারণ থাকতে পারে না। ইতিহাসের দিকে যাদের ঝোঁক, যদি সেই লোক অশিক্ষিত কৃষকও হয় তবুও তিনি এর ওর মুখে পুরানো কথা শুনে বলতে পারেন। আর ইতিহাসেয় লেখক গবেষক—এতবড় বিরাট ঘটনাগুলি জানতে পারেন নাই কি ? এটা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায় না, পারে না। তা'হলে সুচতুর ইংরাজরা কি যদুনাথ সরকারের মাকে 'রত্নগর্ভা' উপাধি দিয়ে তাকে হাত করে চিরদিনের জন্য যদুনাথ সরকারের মুখ ও কলম বন্ধ করে দিয়েছিলেন ?

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা বলছেন বাজপুরী ডাকাত ভবানী পাঠক এবং স্যার যদুনাথ সরকার ইংরাজদের ভুলটাকে সংশোধন করে বলেছেন ভোজপুরী ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ভবানী পাঠক বাংলায় বসবাসকারী লোক নন, বহিরাগত ডাকাত।

রাজা ভবানী পাঠকের পূর্বপুরুষ পিতামহ, পিতা এবং ভবানী পাঠক এঁনারা রঙ্গপুরের অধিবাসী পূর্ব হতে ছিলেন। তিনি যে একজন বাঙ্গালী ইংরাজ বিরোধী ব্রাহ্মণ সন্তান এবং তার নিবাস রঙ্গপুরে ছিল এবং বংশানুগত জমিদার ছিলেন এসব খবর কি স্যার যদুনাথ সরকার জানতেন না ? সাম্রাজ্যবাদীদের সব কিছুরই সমর্থক ও বাহক ছিলেন যদুনাথ সরকার বলে আমরা মনে করি। স্যার যদুনাথ সরকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপন্যাস দেবী চৌধুরানীর আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন।

ইতিহাসের চিন্তাশীল গবেষক ও বিচারক ভারতখ্যাত মনীষী ডঃ নীহার রঞ্জন রায়-এর লেখা হতে কিছুটা লেখা উদ্ধৃত করা হল ঃ

"কাজেই, আমাদের এই উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবন পশ্চিম য়ুরোপীয় Renaissance-এর সঙ্গে তুলিত হবে এটা কিছু বিচিত্র নয়। গোড়াতেই বলা প্রয়োজন এই তুলনা, এই অনুসঙ্গ অসার্থক অনৈতিহাসিক; পশ্চিম য়ুরোপীয় রেনেশাস-এর সঙ্গে আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনের কোন মিল নেই।"

…… "আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবন কিন্তু শুরুই হল ধর্মকে ও ধর্মাশ্রিত বর্ণ হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করে," …

… "আমরা কতটা ঠিক তাদের মত হতে পারি—অনবরত, সুদীর্ঘকাল এই অভ্যাসের ফলে আমাদের বুদ্ধি ও মনীষার খর্বতা ঘটেছে।"

"বুদ্ধি চিন্তা ও কল্পনা এমন দাসত্ব ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আগে কখনও দেখা গেছে, এমন আমার জানা নেই।" ……

"ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পরিবর্ত্তমান জীবনের যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে বিস্তৃত তা কবলিত হয়ে আছে য়ুরোপীয় বৃটিশ ও ঔপনিবেশিক রাহুর করাল গ্রাসে" … "আজ আমরা ক্রমশঃ বুঝতে পারছি, ইংরেজী ভাষা, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের অর্থই ছিল গ্রেট ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লবজাত দ্রব্যের ভারতীয় বাজারের বিস্তৃতি, সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, তার সমর্থক নূতন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি এবং ভারতীয় হস্ত ও কুটির শিল্পের ক্রম বিনষ্টি।" … "এখনও আমাদের সমাজের গতি প্রকৃতি নির্ণিত হয় সমাজের অন্তর্নিহিত প্রয়োজন বোধের তাড়ায় তত নয়, যত বহির্বিশ্বের নানা প্রেরণা ও তাড়না থেকে।" … "যাদের ধ্যান-ধারণা ভাবনা চেতনার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের কোন যোগ নেই, তাদের সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থ ও জীবন চর্য্যারও নয়।" … …

"উনিশ শতকীয় বাঙ্গালীর পুনরুজ্জীবন
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা : নীহার রঞ্জন রায়,
পুনঃ মুদ্রণ—ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়—রেনেশাঁস
জিজ্ঞাসা, বৈশাখ ১৩৮৭
সংগ্রহ সৃজনী সংবাদ (পত্রিকা)
১৬ জুন ১৯৮০, সম্পাদক চিত্ত সিংহ
৪, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলিকাতা
মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

কিছু ঐতিহাসিক স্থানের কথা

রংপুর জেলা লালমনিরহাট থানাধীন সুবার কোট, সুবার বাড়ী, মজুমদারের কোট প্রভৃতি লেখা রয়েছে। উক্ত থানায় পরবর্তীকালে যা পাওয়া গেছে তা এখানে উল্লেখ করছি :

কাশনার ঝাড় (কাশানা) কালীর পাট (কালীমন্দির), কুটিশ্বর (নবাবের কুঠি), পাংগার জমিদারদের বাড়ী ২/২½ ক্রোশ পশ্চিম দক্ষিণে উক্ত জিনিষগুলির অবশিষ্ট কিছু না থাকলেও নামগুলি এখন অবধি অক্ষয় হয়ে রয়েছে। দেশের চিন্তাশীল জাতী সংগঠনে এবং জাতিকে নূতনভাবে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য যারা আগ্রহী তাদের জন্য কিছু নিবেদন এখানে করতে চাই।

ফরিদপুর জেলার শরিয়তপুর মহকুমাধীন গোসাই হাটের পার্শ্ববর্ত্তী একটি জায়গার নাম বড় কাশনা রয়েছে। এই-কাশনা-নামীয় শব্দটি এখানে আসলো কিভাবে, কেমন করে? আমরা মনে করছি যে উত্তর বঙ্গীয় ইংরাজ বিরোধী সংগ্রামগুলির শাখা-প্রশাখা দক্ষিণ বঙ্গের ফরিদপুরেও এসেছিল কি? কারণ সন্ন্যাসী নেতাদিগকে গোসাই বলা হয়ে থাকে এবং সেই গোসাই হাটের সংলগ্ন স্থানকে কাশনা বলা হচ্ছে এবং কাশনা একটা যা-তা নাম নয়। বিদ্রোহী সংগ্রামকারী দলের নবাব নিশ্চয়ই এই কাশানায় এসে সময় সময় অবস্থান করতেন। আবার বড় কাশনা যখন নাম হয়েছে তাহলে ছোট কাশনাও কোথাও ছিল বা আছে বলে আমরা মনে করি।

এখানেও যে সন্ন্যাসীদের ও অন্যান্য হিন্দু মুসলমানের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম হয়েছিল বলে আমরা ধারণা করছি। হাজী শরিয়তুল্যা প্রভৃতি জননায়কদের যে ভাবেই ইংরাজরা চিত্রিত করুক না কেন, পূর্বের সংগ্রামগুলির নায়ক অথবা উত্তরাধিকারী এনারা এবং এনাদের পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

ইংরাজদের দাসত্ব করা লোকগুলি এবং সম্পত্তি, জমিদারী ঘুষ দেওয়া নেওয়া লোকের সংখ্যা বঙ্গদেশে খুব সামান্যই ছিল বৃহৎ জনসমষ্টির তুলনায়। তবে ইহারা ক্ষমতাশালী ও নব্য ইংরাজী শিক্ষিত ছিল এবং ইংরাজদের সর্বপ্রকারের গোলামী যা বোঝায় আভিধানিক অর্থে তাই ইহারা করেছেন। লোভের সামান্য অর্থ সম্পত্তির তুলনায় দেশের হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ সম্পত্তি ইংলন্ডে পাঠিয়েছেন, যা ভাবলে লজ্জায়, ঘৃণায় ও দুঃখে মাথা হেট হয়ে আসে।

আমরা অর্দ্ধশতাধিক বছরে পরিব্যাপ্ত এই পটভূমিতেই এখন সেই মৌলিক প্রশ্নের জবাব খুঁজছি, যা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমরা

ব্যর্থ হয়েছি। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্বের মূল্যায়ন সম্ভব হবে ঐ সময়-কালগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে সত্যি কথাটি জানতে পারব।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে স্থানে সৈন্যদের গড়, কোট, দুর্গ থাকে তার দেড় দুই তিন মাইল মধ্যে সৈন্যদের নির্দিষ্ট বাজার থাকতো। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস হতে সে কথা উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে। এসব এলাকায়ও গড়, কোট হতে কিছু দূরত্বে সৈন্যদের বাজার করার জন্য ঐ রূপ বাজার ছিল। এখানে ইতিহাসের উদ্ধৃতি দেওয়া হল, "রেজিমেণ্টে নির্দিষ্ট বাজার থাকিত। যাবতীয় দ্রব্য এই বাজার হইতে আনিতে হইত। যাহারা বাজারের দোকানদার নয় তাহারা অধিনায়কের স্বাক্ষরযুক্ত পাশ ভিন্ন রেজিমেণ্টের শিবিরে কোন দ্রব্য লইয়া আসিতে পারিত না।"

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস : শ্রী রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত,
পঞ্চম অধ্যায়, ৩৪৯ পৃষ্ঠা, ৫ম ভাগ

ডাকে নয়, বিশ্বস্ত লোক মারফত গোপন তথ্য পাঠান

আমার বন্ধুপ্রতিম ও ঐতিহাসিক ও ইতিবৃত্তের চিন্তাশীল গবেষক লেখক শ্রী ধর্মন নারায়ণ সরকার ভক্তি শাস্ত্রী লিখিত 'রায় সাহেব পঞ্চানন' গ্রন্থের লেখক, উক্ত গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "পণ্ডিত প্রসন্নকুমার ঠাকুর পঞ্চানন লিখিত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর লিখিত প্রবন্ধ এবং পত্র বহন করে নিয়ে যেতেন (কলিকাতায়) এবং বিভিন্ন সারগর্ভ আলোচনার পর যথাযথ উত্তর সংগ্রহ করে ঠাকুরের কাছে (পঞ্চানন বাবুর কাছে) বয়ে নিয়ে আসতেন।.........কথা প্রসঙ্গে বসু মহাশয় পণ্ডিত প্রসন্ন কুমারকে বলেন যে, "শ্রী পঞ্চানন সরকারের পান্ডিত্যকে তিনি উত্তরবঙ্গের একটি প্রদীপ্ত দীপ বলে মনে করেন এবং তাঁর রাজবংশ ভাষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ আমার ধারণাকে নূতন করে গবেষণার প্রেরণা যোগাচ্ছে।"

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ এবং সাহিত্য পরিষদের ত্রৈমাসিক পত্রিকা যখন গোটা বাংলাদেশে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখে বিভিন্ন লেখকগণ বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ সময়গুলিতে ৩জন মহাজ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তি সাহিত্য পরিষদ ও পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের স্বনামধন্য সম্পাদক সুরেন্দ্র মোহন রায়

চৌধুরী, রায় সাহেব পঞ্চানন বর্ম্মন এবং সকলের মাথার মধ্যমণিরূপে বিরাজ করছিলেন কবি সম্রাট মহাপন্ডিত মনীষী ও গবেষক যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের ২/৩ বৎসর পর রংপুর সাহিত্য পরিষদ নির্জীব হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। আমি (লেখক) যে সময়ের কথা বলছি, ঐ সময়টিতে সুরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন না। একদিন সুরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের—রংপুর শহরস্থ বাসায় গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বললাম সাহিত্য পরিষদ এখন বন্ধ তালা ঝুলানো দেখেছি। আপনাদের কাছে নাকি চাবি আছে ? খুলে দিলে সাহিত্য পরিষদের বইপত্র ও পত্রিকাদি মাঝে মাঝে এসে পড়ে দেখতাম। চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় এক বৃদ্ধ লোককে ডেকে তার হাতে চাবি দিয়ে বললেন এনাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন যখন খুশী সাহিত্য পরিষদে যাবেন। আমি এখন সেই চাবিওয়ালা ভদ্রলোকের সামান্য কিছুটা পরিচয় দিতে চাই। ভদ্রলোকের নাম আজীজ মিয়া। সুরেন বাবুর ছোট বেলার বাল্য বন্ধু, একই সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন। বড় হলে সুরেন বাবুর চাকুরী করেন জীবিতকাল পর্য্যন্ত এবং সব সময় সুরেন বাবুর সঙ্গেই থাকতেন।

ভদ্রলোক খুবই ঠান্ডা শীতল এবং অমায়িক ব্যবহারের লোক ছিলেন। আমি একদিন কথাচ্ছলে বললাম সাহিত্য পরিষদের ভিতরে যে আপনাদের অনেক কিছু তোলা ফটো আছে, কিন্তু ফুলচৌকীর এই নয়নভোলা বাড়ীর কোন ফটো, নকশা ফোয়ারা দেখছি না এবং তাদের সম্পর্কে রংপুর সাহিত্য পরিষদের পত্র-পত্রিকাদিতে কোন লেখায়ও দেখি না কেন ? ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন সদ্যপুষ্করিণীর বীরেশ্বর ব্যানার্জী এবং জামাল চৌধুরী তাদের ক্যামেরা দিয়ে ফুলচৌকী প্রাসাদ, ঝর্ণা ফোয়ারা ইত্যাদির ছবি তুলে নিয়ে এসেছিলেন সাহিত্য পরিষদে। ওনারা ঐ সময় সাহিত্য পরিষদের ছাত্র সভ্য ছিলেন। একদিন রাত্রে পরিষদের কার্য্যকরী কমিটি সভায় আলোচনা করে সকলে একমত হলেন যে, মোগল রাজবংশীয়দের কথা এবং তাদের প্রাসাদাদির কথা পত্রিকায় ছাপালে সরকার পত্রিকা তো বন্ধ করে দেবেনই, উপরন্তু সাহিত্য পরিষদও বন্ধ করে দেবেন। সেইজন্য ফুলচৌকীর প্রাসাদাদির ছবি ও তাদের সম্বন্ধে পত্রিকায় কোন কিছু লেখা হয় নাই।

এখন আমরা পূর্বের কথায় ফিরে যেতে চাই। পন্ডিত প্রসন্ন ঠাকুরের সঙ্গে আজীজ মিয়াও পত্র বহন করে নিয়ে যেতেন। এ সম্পর্কে আমি আজীজ মিঞার নিকট যা শুনেছি, তা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে বলছি ঃ

স্বর্গীয় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় [১] অধিক সময় ইংরাজদের গোপন করা জিনিসগুলি ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়ে অত্যন্ত গোপনভাবে (পোষ্টাফিসের ডাকযোগে না পাঠিয়ে) প্রসন্নবাবু ও আজীজ মিঞাকে সাবধান করে দিয়ে বলতেন—একমাত্র নগেনবাবু ছাড়া আর কাহারও হাতে পত্র ও প্রবন্ধ কখনও দিবে না এবং এনারা ২ জন প্রায়ই কলিকাতায় পত্র ও প্রবন্ধ নরেনবাবুর নিকট নিয়ে যেতেন। নগেনবাবু আবার বহু কায়দা কানুনের ভিতর দিয়ে বিশ্বকোষের বিভিন্ন জায়গায় খুব সংক্ষিপ্তাকারে বিষয়গুলি লিখে রাখতেন। আজীজ মিঞা ৩ খানি ইংরাজদের বাজেয়াপ্ত করা গ্রন্হের নাম করেন। কলিকাতা নিবাসী "হরিশচন্দ্রের গুপ্ত কথা ইতিহাস কাকিনার জমিদার 'শম্ভুবংশ চরিত' ইতিহাস ইংরাজ বিরোধী সন্ন্যাসী নেতা হনুমানগিরির পালিত পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহগঞ্জ (সাহেবগঞ্জ) বদরগঞ্জ যাত্রাধীন নিবাসী ২য় হনুমানগিরির ইতিহাস গ্রন্হ 'অজ্ঞাতর ইতিহাস' এ সব ইংরাজ বাজেয়াপ্ত ইতিহাস। যাদবেশ্বর বাবু, সুরেন বাবু ও নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়দের নিকট ছিল এবং আরও অনেক লোকের নিকট ছিল যা আমি দেখেছি ও পড়েছি। আমাদের কথা হল রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের আজীবন সম্পাদক কুন্ডির অন্যতম জমিদার ও ইতিহাসের গবেষক প্রত্নতত্ত্ববিদ সুরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী মহাশয় ইনি রংপুরের ইতিহাস লিখেও ছাপাতে পারেন নাই। শুধু ইংরাজদের ভয়ে নয়, নিকটতম জ্ঞাতিদের ভয়ে।

কোন কোন ইংরাজভক্ত বাঙ্গালী লেখক উপন্যাসের ছদ্মাবরণে হিন্দু মুসলমানের একই সংগে আযাদী সংগ্রামের মর্ম ও কথাগুলিকেও বিকৃত ভাবে সাম্প্রদায়িক প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি বিশ্বস্ততার অভাবে সে কাহিনী হিন্দু মুসলিম জাতীয় জাগরণের উদ্বোধক না হয়ে বিদ্বেষই বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[১] কবি সম্রাট মহামহোপাধ্যায় মনীষী যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য তর্করত্নের জন্ম ১৮৫০ খৃস্টাব্দ, মৃত্যু ১৯২৪ খৃস্টাব্দ, পিতা আনন্দেশ্বর ভট্টাচার্য্য, গ্রাম ইটাকুমারী, থানা কাউনিয়া, জেলা রঙ্গপুর। হাল সাকিন নবাবগঞ্জের ব্রাহ্ম মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত। দাগ নং ১৭৩৫, ৩নং সীট মৌজা রাধাবল্লভ। সেটেলমেণ্ট ১৯৩২—৩৩ খৃঃ।

পাশ্চাত্যের কোন এক লেখক বলেছেন, "তুমি যদি স্থায়ী বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি করে থাকো তা হলে প্রতিঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকো।"

পি· সি· সেন ও কেশব বসুর কবিতা

ইহা ঐতিহাসিকভাবে অতি সত্য যে, কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ডিগ্রীওয়ালা ব্যক্তি ইংরাজ শাসনকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে যত বড় মিথ্যাই হোক না কেন তা বলতে, লিখতে কোন দ্বিধা সংকোচই করেন নাই। যেমন বগুড়া শহরে জনৈক পি. সি. সেন প্লীডার নামক এক ব্যক্তি মজনু ফকিরের কবিতা প্রকাশ করেন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বাংলা ১৩১৭ সালে (১৯১০ খৃঃ) অবশ্য বিশ্বকোষ কবিতাটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন জাল ও মিথ্যা বলে।

আর একটা কবিতা ছাপান রংপুরের কৈলাশরঞ্জন হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রী কেশবলাল বসু ১৩৪৬ সালে ইং ১৯৩৯ সন। বামনডাঙ্গার জমিদার বাড়ীর এক বধু ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারিণী দেবী চৌধুরানী। ইতিহাস অনভিজ্ঞ লোকেরা কবিতাটির কথামত মনে করলেন যে দেবী চৌধুরানী বামনডাঙ্গার জমিদার বাড়ীর কোন বধু টধু হবে। ঐ কবিতাটি মিথ্যা ও ভূয়া উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিল—এ সব প্রমাণ আমরা যথাযথভাবে দিয়েছি।

শামসুল হুদার নেয়ামুল কোরআন প্রসঙ্গে

আমরা এখন এক আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রীধারী দেশদ্রোহী কাল্পনিক ও উদ্দেশ্যমূলক লেখকের লেখা গ্রন্থটি ও তার নাম ঠিকানাসহ উদ্ধৃত করলাম ঃ

গ্রন্থটির নাম হল 'নেয়ামুল কোরআন' লেখকের নাম শামসুল হুদা বি. এ.; বি. এল. অভিনব অষ্টাদশ সংস্করণ, ২৫ শে জুলাই ১৯৭৫ সন। বাংলা ১৩৪৭ সালে ১ম মুদ্রিত লেখা রয়েছে গ্রন্থটির মধ্যে। এতেই বোঝা যাচ্ছে লেখক ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় দেশের মুসলিম লোকদের বিভ্রান্ত করা ও ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন করার জন্যই নেয়ামুল কোরআন এই চাতুর্যপূর্ণ পবিত্র নামটিকে ব্যবহার করেছেন। দ্বাদশ অধ্যায় এ ৩০৮ পৃষ্ঠা হতে ৩১১ পৃষ্ঠায় লেখক যা লিখেছেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতে ও তাহার ইচ্ছার বাহিরে কিছু হওয়া অসম্ভব।"

হজরত খেজের আলায়হেচ্ছালাম ও পলাশীর যুদ্ধ

"১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুন তারিখে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ যখন নৌবহর লইয়া ভাগিরথীর উপর দিয়া পলাশী ময়দানে বাঙ্গালার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌল্যার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাইতেছিলেন, পথে পক্ষতা নামক স্থানে বিখ্যাত কামেল অলী হজরত শাহ জোবায়েরের (রাঃ) নিকট ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দোয়া প্রার্থী হয়, শাহ সাহেব হাত উঠাইয়া তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকেন। মোসলমানরা ইহা দেখিয়া হায় হায় করিতে থাকেন এবং ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাহ সাহেব উত্তর দেন যে, আমি দোয়া না করিয়া কি করিব? দেখিলাম হযরত খেজের আলায়হেচ্ছালাম ক্লাইভের নৌবহরের আগে আগে বিজয়পতাকা ধারণ করিয়া যাইতেছেন।"

শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণ উপরোক্ত নামীয় গ্রন্থটির অষ্টাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হওয়ায় কত যে লক্ষ লক্ষ সরলপ্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন। উপরন্তু মুসলমান ধর্ম বিশ্বাসীদের এবং উপমহাদেশের সব ধর্ম বিশ্বাসীদের পীর সাহেব খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরির স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে।

গ্রন্থকারের উক্ত নেয়ামুল কোরআন পুস্তকটি ৩৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। লেখক শামসুল হুদা বি. এ; বি. এল. ম্যাজিস্ট্রেট বলে পুস্তকের উপরিভাগে লেখা রয়েছে। রহমানিয়া লাইব্রেরী, ৩১ নং নবরায় লেন, ঢাকা—১ এই ঠিকানা রয়েছে।

সত্য দিয়েই দুশমনের প্রতিরোধ করতে হয়

মহামতি লেনিনের বহুল ব্যবহৃত একটি বিখ্যাত উক্তি "বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী সংগ্রাম হয় না।"

দুঃখ ও বেদনার সাথে আমরা দেখেছি যে, নিদেনপক্ষেও ইংরাজ আমলে ইংরাজের বিরুদ্ধে ১ম শতাব্দীর দিকেও আমাদের দেশীয় কোন রাজনৈতিক দল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। এনারা শুধু ভাবের উপরেই বক্তৃতা করে নিজেদের কর্তব্য শেষ করেছেন। অথচ মহামতি লেনিন কি বলেছেন তা একবার লক্ষ্য করা উচিত।

কথা প্রসঙ্গে

ইংরাজ আমলে ১৯২৩-২৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর (ক্লাস টু) ছেলেদের ভূগোলে লেখা ছিল এই রংপুরে রাজা ভগদত্তের রঙ্গালয় ছিল। এইজন্য রঙ্গপুর হইয়াছে।

আর একজন লেখক নাম শ্রী কিশমতুল্যা মোক্তার ক্লাস টু এর ভূগোলে লিখেছেন ১৯৩০-৩২ সালে এই শহরে নওয়াব বদর জঙ্গের রঙমহল ছিল সেইজন্য রঙ্গপুর নাম হইয়াছে। মাহিগঞ্জের সোজা ৪/৫ মাইল পূর্ব-দিকে একটি বিরাট আকারের দীঘি আছে এখন অবধি। স্থানীয় লোকেরা বলেন বদরদীঘি—সম্ভবত বাকের অপভ্রংশ হয়ে বদর হয়েছে। ভূগোল লিখক কিশমতুল্যা মোক্তার এরূপ কিছুটা নামের ভুল করেছেন।

"ঢাকা বিভাগের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক মিঃ সুব্রত শংকর ও মিঃ আলী রিয়াজ এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মিঃ আনিসুর রহমানের তথ্যে তাঁরা ভিন্নমত ব্যক্ত করেন। উপরোক্ত দুইজন অধ্যাপক বলেন যে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র' প্রকাশ ১৩৪৬ সাল।"

''রংপুর বার্ত্তাবহ'' এতদঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র। রংপুর বার্ত্তাবহ ১৮৪৭ সালে বৃটিশ শাসন অবসানের ১০০ শত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় জমিদার শ্রী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এটি সম্পাদনা করেন শ্রী গুরুচরণ রায়। স্বাধীন ভূমিকার জন্য ১৮৫৭ সালে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং এক বিশেষ ডিক্রী বলে এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করেন।"

৩০শে ভাদ্র, ১৩৯১ সাল
দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা,
ঢাকা

আমরা এখানে একটি কথা নিবেদন করতে চাই আমাদের শ্রদ্ধেয় মাননীয় পাঠক-পাঠিকাগণের গোচরে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও ধুবড়ী—এক কথায় পূর্বের উত্তরবঙ্গ সম্পর্কে কথাটি হল এই—বৃটিশ আমলের শেষের দিকে এই যে হিন্দু মুসলমান ঘৃণা-বিদ্বেষ, মারামারি কাটাকাটি হয়েছে বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরেও কিন্তু বাস্তবভাবে দেখা গেছে উত্তরবঙ্গে হিন্দু মুসলমানে মারামারি কাটাকাটি, হত্যা, লুণ্ঠন

হয় নাই।---বিশেষ করে যে সব জায়গায় ১৭৬০ খৃস্টাব্দ হতে ১৮৫৭/৫৮ সাল পর্যন্ত সময়গুলিতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের মুকাবিলা করেছেন এবং একই সঙ্গে নিজেদের রক্ত ঢেলেছেন। এই রক্ত ঢালার মধ্য দিয়ে বিদেশী শক্তিকে বাধা দেওয়ার মধ্য দিয়ে যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠেছিল, সেই ঐক্য, সংহতি, ভালবাসা, ভ্রাতৃবোধ, আত্মীয়তাবোধ যেমন অন্তরের মধ্যে ছিল, বাইরেও তা ছিল; রক্ত-মাংস হৃদয়ে আজও তা অম্লান হয়ে আছে চিন্তায়, কার্যে ও বাস্তবে। এখানেই প্রকৃত Nationality বা জাতীয়তাবোধ পূর্বে যেমন ছিল আজও তা রয়েছে অমলিনভাবে।

রঙ্গপুর জেলায় কখন রেললাইন চালু হয়েছে ঃ

মাহিগঞ্জ, ধাপ-ও নবাবগঞ্জ নামক উপকণ্ঠ লইয়া রংপুর-সদর মিউনিসিপ্যালিটির অধিকার। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে নর্দারন বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে ও তাহার শাখা রংপুর জেলার মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।”

রংপুর দেখুন
বিশ্বকোষ
শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত

মীর্জা আলী খান প্রসঙ্গ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামকারী অকুতোভয় মহানায়ক সেনানী মীর্জা আলী খান সম্পর্কে এখানে কিছুটা কথা নিবেদন করতে চাই ঃ

১৯৪৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় পার্লামেন্টের এক সদস্য প্রশ্ন করেন ইপির ফকিরের প্রকৃত নাম কি ? সম্ভবত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রশ্নের জবাব দেন, মির্জা আলী খান। ঐ সময় আমি (লেখক) একজন কিশোর মাত্র। সংবাদপত্রে মীর্জা আলী খান নামটি আমি পড়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করেও ইপির ফকিরের প্রকৃত নাম কি পাই নাই। আমার কিন্তু মীর্জা আলী খান নামটি স্মরণ ছিল।

প্রমাণ না পাওয়ায় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরণাপন্ন হলাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রের কোন জবাব পাঠান নাই। বক্রী তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় পত্রের যে জবাব দিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। কিন্তু তার আগে কিছুটা নিবেদন আমার রয়েছে।

ইপির ফকীরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিষয়গুলি ছিল ১৯৪৭ সালের পর পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের সময়কালের মধ্যে। অথচ ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য মহোদয় পর্যন্ত তার প্রকৃত নাম পরিচয় জানেন নাই। এতেই বোঝা যাচ্ছে আমরা কি ভাবে দেশের সংগ্রামকারীদের খবরাখবর ইত্যাদি রেখেছিলাম। যাঁরা এখনকার সহ মতবাদীদের খবর রাখেন না তারা কিভাবে ১৭৬০ খৃঃ হতে ১৮৬০ সালের কথাদি কিভাবে জানতে আগ্রহী হবেন এবং রাখবেন ?

Phones :
City : 5612
Local : 278
Res. : 5618

Maulana Azad Library
Aligarh Muslim University
Aligarh India

20. 3. 1982

No, 542

Mr. Haider Ali Chowdhury,
Fulchowki Rest House.
Station Road.
Po : Alamnagore,
Distt. Rangpur,
Bangladesh.

Dear sir,

Please refer to your letter dated 5. 1. 1982 asking for particulars about the Fakir of IPI. whatever bibliographical information could be collected from different sources about Fakir of IPI is contained in the enclosed note. The sources from which the information has been collected are also mentioned at the end of the note.

I hope this will serve your purpose.

Yours faithfully
(1A Qureshi)
Deputy Librarian

Encl : as above.

FAKIR OF IPI

Haji Mirza Ali Khan better known as the Fakir of IPI belonged to WAZIRS tribe of North-West Frontiers. He was a wiry little mom from the Tori Khal Waziris, He was born about 1890. His tribe was occupant of the Hills from west of Thau in the Miromzai valley right up to the Gamal Pass. The original home of the tribe is supposed to be KAMIGORAM, which is the Southern base of the Pir Ghall Mountain. The tribe had its strong hold on the hills of PIRGHALL, SHUTDAR, and Bundal ghall and used to face their enemies in the events of threat to their liberty.

In 1936 Haji Mirza Ali Khan (Fakir of IPI) become IMAM of a small Mosque at IPI, a hamlet close to the road between BAHNU and the lower TOCHI valley.

His fellow Khan Abdul Ghaffar Khan was engaged in different campaigns against Britishers at that time but Fakir of IPI, up to that time lived quiet religious life. Having all good qualities, the Fakir was a formatical hater of all infidels willing at any time to stir-up religious parrions of his own ends.

In the abduction case of Islam Bibi, the wife of a Hindu merchant, the FAKIR sided Wazirs as she was Married by a Waziri according to Muslim Laws. British military came into action against him in 1937. After hearing fighting the Fakir's head quarters at Arsalkot were attacked but British forces could not trace him.

The Fakir of IPI remained in business for many years afterwards, when Pakistan took over the Frontier he regained still at Large and as great a menace as ever. A Pakistan official in the fifties described him a, 'a vicious old man Toisted with hate and selfishness." He died in 1960.

BIBLIOGRAPHY

1. Arthur Swinson : North-West Frontier, Hutchrison, London, 1967. Pages. 327–32
2. Mohammad Yunus : Frontier Speaks, Minova Book Shop Lahore, 1925, Pages 86–90
3. Major General J. G. Elliott : The Frontier 1839—1947. (The Story of the North-West Frontier of India) Cassell London, 1968 Pages 271, 273—6, 278–81, 288–9.

Main Library Phone : 8310
University of Peshawar Dated-17. 2. 82
N. W. F. P. (Pakistan)

Mr. Haidar Ali Choudhury
Fulchowki Rest House
Station Road
P.O Alamnagar
Dist. Rangpur
Bangladesh

Dear Sir,

With reference to your letter dated 6th February, 1982, the information required is furnished below.

... ··· I hope this ··· ... ··· undersigned.

Yours sincerely
Son of
A. W. Khan
Librarian
Chairman

Centre for the Study of the
Civilizations of Central Asia
Quid-i-Azam University
Islamabad–Pakistan

Re/No. CAS/PF-4/82-519 . Date 31. 2. 82

My Dear Choudhury Sahib,

Please find enclosed here with information about Fakir Ippi, which has been received in this office on 31. 2. 82. We are at your service in case you need any information in future.

With best regards.

Yours sincerely
(Inamullah Khan)
Assistant Director.

Mr. Haidar Ali Choudhury
Fulchouki Rest House
Station Road,
P. O. Alamnagare
Dist. Rangpur
Bangladesh.

Government of N. W. F. P,
Home & Tribal Affairs Department,
(Research Cell)
No. TRC (HD)-3/17–78.
Dated Peshawar, the 24th March, 1982

To,
The Director of Archives,
Government of N. W. F. P.
Peshawar

Subject : Faqir of IPI.

Please refer to your Memo No 263/10/6/AD, dated the 17th March 1982 on the subjected noted above.

The requisite information is given as under :

1. Mirza Ali Khan alias Fakir of Ippi.
2. Sheikh Arsala Khan.
3. 1901 , Village Ippi, North Waziristan Agency.
4. Mirza Ali Khan is known as the Fakir of IPI. IPI is a village where he was born and had his basic education. Since Mirza Ali Khan lived most of his life in that village Preaching

Religious and gospels of truth. He was sentimentally attached to that village. Hence Fakir of IPI.

Faqir of IPI received his early education in Arabic. Persian, Pushto and Urdu from his father, Arsala Khan and Maulvi Manay Jau Daur, Hassu Khel. Maulvi Alam Khan IPI Daur also taught him.

After receive initial Lessons in religious education, Mirza Ali Khan was sent io Bornu by his father for getting formal education from Maulvi Gulh Khoidar of Norar village. The young Mirza Ali Khan sat at the feet of his mantor Maulvi Ghul Khoidar for a couple of years, Faqir of IPI mind was steeped in books of psychology and Tib, which he greatly fancied.

Mirza Ali Khan married the daughter of one Qazi Sherazad, Bannuo unlike the tribes men who relish polygamy this turned out to be his first and last marriage. His marriage did not bear him any child.

Faqir of IPI'S father, Arsala Khan was a die hard anti. British and he always underscored the need for Jihad against the Britishers. Faqir of IPI was also on the look out for an opportunity to show his anti-British feelings. Islam Bib case provided him with none.

Faqir of IPI selected Gurweikht in Madda Khel Wazir area as permanent headquarter because the approach to it was extremly rough on it provided excelent cover which could not be touched by the British shel.

The Britishers had a smooth Sailing in north Waziristan right from the fag end of 19th century. when they first sat their foot in this area till 1935. When the Faqir of IPI started his campaign against them on the moreever after.

He was used by Axis powers durking the world war II and since the establishment of Pakistan by Afghanistan Government to create disturbances in Waziristan and on the border with the adjoiing districts. In 1958 efforts were made by the Pakistan Government to come to some sort of understanding with the Fakir of IPI. Through these efforts the Faqir of IPI showed his circulation inclunation to come to terms with Pakistan Government, when Ayub Khan's martial Law abruptly put an end to these efforts.

Thereafter nobody picked up the thread till the Faqir breathed his last in 1962.

S/O
(Ghulam Jabir)
Research officer—11.

দেশবরেণ্য নীহাররঞ্জন রায়ের ঐতিহাসিক সুচিন্তিত মতামত

আমরা বঙ্গ ভারত বিখ্যাত পন্ডিত মনীষী ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সুচিন্তিত মতামত আরও কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

……বঙ্গভূমে যেমন করেই হোক, ফরাসী renaissance 'রেনেশাঁস' কথাটা খুব চালু হয়ে গেছে, ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। এবং যেহেতু তাঁরা সকলই য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়ে 'মানুষ" তাঁদের প্রায় সকলেরই সচেতন বা অবচেতন মানসে কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নয়, বস্তুত ইতিহাসগত অর্থ দৃঢ়ভাবে যেন মুদ্রিত আছে। সে অর্থটি আশ্রয় করে আছে য়ুরোপের, বিশেষ করে পশ্চিম য়ুরোপের 'রেনেশাস' ……।

……বঙ্গভূমির উনিশ শতকী নবজাগরণ যে কেন, কী উপায়ে পশ্চিম য়ুরোপীয় Renaissance র সঙ্গে তুলিত হলো কিংবা কবে যে কথাটা বাঙ্গালী ও পরে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চালু হয়ে গেল, তা বলা কঠিন না হলেও তার সার্থকতা কিছু আছে বলে আমি মনে করিনে। একটা সময় গেছে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের জীবনে, অবশ্যই পাশ্চাত্য

পণ্ডিতদের দৃষ্টান্তে. যখন আমরা ভারতেতিহাসের বিভিন্ন পর্বগুলির তুলনা করতাম পাশ্চাত্য ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব ও অধ্যায়ের সঙ্গে৷ Periclean Age, Classical Age, Eligabethian Age, Age of Decadence.

এ সব যদি ভারতেতিহাসে না থাকলো তো সে ইতিহাস হলো কোথায়! আর কালিদাস যদি সেকসপীয়র, মাইকেল যদি বায়রন, বঙ্কিমচন্দ্র যদি কীটস এবং রবীন্দ্র নাথ যদি নিদেনপক্ষে শেলীও না হন, তা হলে আর বাংলা সাহিত্য সাহিত্য পদবাচ্য হলো কোথায়? কাজেই আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবন পশ্চিম যুরোপীয় Renaissance-র সঙ্গে তুলিত হবে এটা কিছু বিচিত্র নয়। গোড়াতেই বলা প্রয়োজন এই তুলনা এই অনুসঙ্গ অসার্থক, অনৈতিহাসিক, পশ্চিম য়ুরোপীয় Renaissance-এর সঙ্গে আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবনের কোন মিল নেই শুধু নবজন্মের' সামান্যার্থ ছাড়া।

···প্রথমতঃ যুরোপীয় রেনেশাঁস মধ্যযুগীয় যুরোপের ধর্মীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কার্য্য করণ শৃঙ্খলাগত পরিণতি সে বিবর্তন ও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা য়ুরোপীয় সমাজের ভেতর থেকে উদ্ভূত। উনিশ শতকী বঙ্গভূমে ও ভারতবর্ষে যা ঘটেছিল তাকে বাঙ্গালী ও ভারতীয় সমাজ বিবর্তনের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাগত বলা যায় না; সমাজের ভেতর থেকে তা উদ্ভূত হয়নি। ··· ···

আমাদের উনিশ শতকী পুনরুজ্জীবন কিন্তু শুরুই হলো ধর্মকে ও ধর্মাশ্রিত বর্ণ হিন্দু সমাজকে কেন্দ্র করে এবং এমন একটি ভাষা ও একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যে দুটি পরদেশী শাসক গোষ্ঠীর নিজেদের বাসভূমে জাত, পালিত ও বর্দ্ধিত, সে দেশ থেকে আনীত ও প্রবর্ত্তিত। ··· ··· এ তথ্য পরিষ্কার যে আমাদের উনিশ শতকী জীবনান্দোলনের সূচনা অতি স্বল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় একটি গোষ্ঠির হাতে এবং তাদেরও চিন্তা ও কর্ম প্রেরণাটা এসেছিল পাশ্চাত্য পৃথিবী থেকে, প্রধানত ইংরেজ ও ইংরেজি মারফৎ।···

···আজ ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে—শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে ইংরেজী ভাষার এই আধিপত্য, ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার নির্বাক সর্বভারতীয় বিস্তার (যার সূচনা বঙ্গভূমের পুনরুজ্জীবনে), বঙ্গভূমি ও ভারতবর্ষের পক্ষে শুভকর হয়নি, কল্যাণকর হয়নি। ··· ··· গত দেড়শ' দুশ বছর ধরে

আমাদের যত কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তা-কল্পনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান আমরা আহরণ করেছি, তা প্রায় সমস্তই বিদেশী পণ্ডিতদের বই থেকে। আমরা নিজেরাও যখন লিখেছি নিজেদেরই সম্বন্ধে, তখনও সেই সব পণ্ডিত মনীষীদের লেখা ও কথা, চিন্তা ও কল্পনারই পুনরুক্তি করেছি, এখনও করছি। আমাদের লক্ষ্যই যেন ছিল (আজও তাই) আমরা কতটা ঠিক তাঁদের মত হতে পারি। (অনবরত, সুদীর্ঘকাল এই অভ্যাসের ফলে আমাদের বুদ্ধি ও মনীষার খর্বতা ঘটেছে) বিদেশী খুঁটিতে ভর না করে আজও আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারিনে, বিদেশী 'মডেল' সামনে না থাকলে আজও আমাদের পথ চলতে কষ্ট হয়। বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনার এমন দাসত্ব ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আগে কখনও দেখা গেছে, এমন আমার জানা নেই।……

'জিজ্ঞাসা'/বৈশাখ ১৩৮৭
সংগ্রহ সুজনী সংবাদ
১৬ জুন ১৯৮০, সম্পাদক চিত্ত সিংহ
৪ ভূপেন বোস এভিন্যু, কলিকাতা ৭০০০০৪

কথা প্রসঙ্গে

দিল্লীর শেষ মোঘল বাদশাহ ২য় বাহাদুর শাহ্‌র মাতার নাম যে লালবাঈ, একথা বিভিন্ন ইতিহাসে দেখা না গেলেও ভারতের মহামনীষী জাতীয়তাবাদী প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব তাঁর সম্পাদিত বিখ্যাত বিশ্বকোষের ৩৫ পৃষ্ঠা ত্রয়োদশ খণ্ডে লিখিয়াছেন ঃ

"বাহাদুর শাহ্‌ ২য়,—দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট। ইহার পূর্ণ নাম ঃ আবুল মুজাফফর সিরাজউদ্দীন মুহম্মদ বাহাদুর শাহ্‌। ২য় আকবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৩৭ খৃঃ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম লালবাঈ। ১৭৭৫ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়।

তিনি পারস্য ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উর্দু কবিতা লেখার জন্য তিনি বিদ্বৎ সমাজ হইতে 'জাফর' উপাধি লাভ করেন। তাহার রচিত দিবান অনেক পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহী বিদ্রোহে তিনি জড়িত ছিলেন।

বিশ্বকোষ ঃ নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত
পৃষ্ঠা ৩৫, ত্রয়োদশ খণ্ড

সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ লেখকগণ বলছেন দস্যু সর্দার ভবানী পাঠক 'বাজপুরী' দস্যু এবং এদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলার জনৈক বাঘা ঐতিহাসিক ইংরাজদের কিছু ভুলকে সংশোধন করে দিয়ে লিখেছেন, 'ভোজপুরী'। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের সুরে সুর মিলিয়ে যে দেশের ঐতিহাসিকরা চলেন বা কথা বলেন, সেই দেশের যে সর্বগ্রাসী সর্বনাশ হবে এতে কি কোন সন্দেহ সংশয় আছে ? নগেন্দ্রবাবুর বিশ্বকোষ বলছেন, ভবানী পাঠক বরেন্দ্রভূমি নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। বরেন্দ্রভূমি বলতে কি উত্তর বঙ্গকে বুঝায় না ? বাজপুর ভোজপুর বলতে তো বোঝায় বিহার প্রদেশের বা বিহারের একটি এলাকা। এদিকেও আমরা দেশের চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কলিকাতায় প্রকাশিত প্রবন্ধ

রংপুর সম্মিলনী
আযাদী আন্দোলনের পাদপীঠ, রংপুর,
হায়দার আলী

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন দেবী চৌধুরানীর স্বামীর নাম ব্রজেশ্বর, শ্বশুরের নাম হরবল্লভ স্বর্গীয় কেশবলাল বসু ও বামনডাঙ্গার দ্বাদশ পুরুষের বংশ পরিচয় (সুভেনির-৮৪) এই বলেছেন, হায়দার আলী কিন্তু লিখছেন পিতা ব্রজকিশোর। স্বামী নরেন্দ্র নারায়ণ। কোন প্রমাণ তিনি দেন নি। ডাকনাম বঙ্কিম বলেছেন প্রফুল্ল। হায়দার আলী ও ইটাকুমারীর কবি রতিকান্ত দাস বলেছেন, জয়দুর্গা গ্রামের লোকেরা এই রণরঙ্গিনীকে ডাকতো চণ্ডী বলে। বঙ্কিম রচনায় স্বামীর নাম ও শ্বশুরের নামের মত হওয়ায় হায়দার আলীর কিছু উষ্মা আছে বা তিনি পত্রান্তরে বলেছেন। কিন্তু স্বামীর নাম যে নরেন্দ্র নারায়ণ ছিল তা প্রতিষ্ঠা করতে হলে তো প্রমাণ চাই, দলীল-দস্তাবেজে কোথাও তো থাকবে। শ্বশুর জামাইয়ের নামে coincidence থাকতে পারে। ব্রজেশ্বরের দরবারী নাম নরেন্দ্র নারায়ণও হতে পারে।

বঙ্কিম দেবী চৌধুরানীর পিতার নাম না জেনে সাহিত্যের কারণে নূতন নামের সৃষ্টি করতে পারেন সেটা স্বভাবতই ইতিহাস মনে করার কারণ নেই। এই কথা সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ, সুভেনিরের প্রবন্ধে হায়দার আলী কিন্তু

যতটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার পরিচয়, বাসস্থান ও কর্মক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন তা দীর্ঘকালের অন্বেষণের ফল। তা ভুঁড়িতে তুড়ি মেরে উঠিয়ে দেওয়া কঠিন। বিশেষত তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহের স্থানগুলি তার জীবিতকালে দেখে যাবার জন্যে বারবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাই পণ্ডিতদের কাছে ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে আবেদন এ দিকটা তারা একটু খুঁজে-পেতে দেখুন। এমনও তো হতে পারে কেউ শেষ কথা বলে যান নি। তাছাড়া বৃটিশের বিরুদ্ধে কিংবদন্তীর নায়িকার যে সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের বেশী আগ্রহ, সেটা "আলী সাহেব খুবই সুন্দরভাবে উপহার দিয়েছেন। এ জন্য তিনি অশেষ ধন্যবাদার্হ।"

দেবী চৌধুরানীর বিদ্রোহ সম্পর্কিত (জাগের গান) ও তার উপর বিশ্বকোষ রচয়িতা যাদবেশ্বর তর্করত্নের আলোচনা সুভেনির্রে ছাপা হবে। দিল্লীর বাদশা বংশের, কিন্তু জন-নির্বাচিত নবাব নূরুদ্দীনের (যার সম্বন্ধে ঢাকার নাগরিক নাট্যসংস্থা কলকাতায় একটা সুন্দর নাটক করে গেছেন গত বছর রংপুরের নিজস্ব ভাষায়)। সন্ন্যাসী ফকীর বিদ্রোহের ভূমিকা, সিপাহী বিদ্রোহে রংপুর স্থানীয় প্রমাণাদি সহ এবং নবাব বংশীয় শাহবানু বেগমের জবানবন্দী পর পর সংখ্যায় ছাপা হবে। এ ছাড়া কেশবলাল বসু বলেছেন বামনডাঙ্গার বউ। রতিরাম দাশ তাঁর গানে এক জায়গায় বলেছেন পীরগাছার। এদিকে আবার পীরগাছা মন্থনা পরগনার একটা গ্রাম।

স্বর্গীয় কেশবলাল বসুর লেখা অনুযায়ী চাকমা ফতেপুর থেকে ঘড়িয়ালডাঙ্গার অংশ বাদ দিলে বাকী অংশের সাড়ে চার আনার নাম বামনডাঙ্গা। দুই আনার নাম পীরগাছা। সুতরাং পীরগাছা, বামনডাঙ্গা, মন্থনা এক নয়। এর ব্যাখ্যা দরকার। প্রাচীন লোকেরা বলতে পারেন। প্রসঙ্গত একটি অন্য কথা বলছি। কেশবলাল বসুর লেখায় আছে কুচবিহার আক্রমণ করেন জবরদস্ত মা; তিনিই আবার সন্তুষ্ট হয়ে কুচবিহারের নায়েব রামেশ্বরকে (ব্রজেশ্বরের ঊর্দ্ধতন দশম পুরুষ) উপহার দেন চাকমা ফতেপুর! কেন দিলেন এর উত্তর যতদিন না পাচ্ছি—গোলাপ বাগানে ধুতরোর কাঁটা খোঁচা খাওয়ার মত মচ মচ করছে। ঘড়িয়ালডাঙ্গার বংশধরেরা বলেছেন ওটা সঠিক ইতিহাস নয়। এই

বংশের সম্মিলনীর অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সুনীল রায়, রংপুরের ইতিহাসের যে অংশ, মায় মহাভারত পুরাণের যুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে লিখেছেন আগামী সুভেনির্রে।

ডাঃ বিমল সেন গুপ্ত, পত্রিকা সম্পাদক

দেবী চৌধুরানীর পিতৃদত্ত নাম ছিল 'জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানী' পিতার নাম ব্রজকিশোর চৌধুরী, মাতার নাম কাশীশ্বরী দেবী চৌধুরানী। গ্রামের নাম শিবুকুন্ঠিরাম, প্রকাশ্য ভুতছাড়া বামনপাড়া, থানা কাউনিয়া, জিলা রংপুর। দেবী চৌধুরানীর স্বামীর নাম হল নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, গ্রাম পীরগাছা, থানা পীরগাছা, জিলা রংপুর। আর আনন্দমঠ বঙ্কিমের কল্পনায় নহে। আনন্দমঠের প্রতিষ্ঠাতার নাম হল জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী। ইনি ইংরাজ বিরোধী নবাব নুরুদ্দীনের (মির্জা বাকের জঙ্গ) উজীর (মন্ত্রী) ছিলেন। এর গ্রামের নাম হল ইটাকুমারী, থানা কাউনিয়া, জেলা রংপুর। কাউনিয়া রেলস্টেশন হতে দেড় মাইল দক্ষিণে আনন্দমঠ অবস্থিত ছিল। এখনও এর অনেক কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট রয়েছে। স্থানটিকে এখন অবধি বলা হয়ে থাকে তপস্বী ডাঙ্গার আনন্দমঠ, তপস্বী ডাঙ্গার দীঘি, তপস্বী ডাঙ্গার মাঠ; তপস্বী মানেই হল সন্ন্যাসী, ফকীর সম্প্রদায়কে বলা হচ্ছে এখানে। এরাই ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন অন্য সকলের সঙ্গে মিলে।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই সব অমূল্য জাতীয় জিনিসগুলি আমরা উপেক্ষা করলেও সুচতুর কুটনীতি বিশারদ ইংরাজরা দুর্ভেদ্য অরণ্য করে লোকদৃষ্টির বাইরে ঢেকে রেখেছিল, দুর্গম জঙ্গলে, দিনের বেলায়ও সুর্যের আলো প্রবেশ করতে পারত না।

ফকীর, সন্ন্যাসী, হিন্দু, মুসলমান জমিদার, প্রজা, নারীপুরুষ সবাই মিলে ইংরাজ শক্তিকে প্রতিহত করে রেখেছিলেন ১৭৬০ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭৮৩ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ তক। অথচ দুঃখের বিষয় কি রাজনৈতিক, কি ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের কেউই এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নি।

শহীদ প্রফুল্লচাকীর জন্মস্থানের (মামাবাড়ী, সম্পাদক) নামটি হল শিবুকুন্ঠিরাম, প্রকাশ্য ভুতছাড়া বামনপাড়া। ইংরাজদের ভুত বলা হত এবং তাদের এ স্থান হতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ভুতছাড়া নামকরণ

হয়েছে। বৃটিশ বিরোধী বীরাঙ্গনা জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর পিত্রালয় শিবু কুন্ঠিরাম গ্রামে। ইংরাজ বিরোধী নেতা ভবানী পাঠকের কথা কিছুটা বলব। রংপুর জেলার উলিপুর থানাধীন কমলওঝা গ্রাম, প্রকাশ্য পাঠকপাড়া। পাঠকরা পূর্ব হতে ফুলখাঁ চাকলার বিশাল জমিদারীর মালিক ছিলেন। পাঠকপাড়ার নিকটবর্তী রাজার হাট। এই রাজা উপাধি হল ভবানী পাঠকদের। এখানে বিরাট প্রাসাদ, মন্দির, দীঘি ও সৈন্য শিবিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। রাজা ভবানী পাঠকের অধস্তন বংশধরগণ এখানে আছেন।

প্রফুল্লমুখীর বাপের বাড়ী হতে শ্বশুরবাড়ী ছয় ক্রোশ। আবার ভূতছাড়া গ্রামকে বঙ্কিম 'ভূতনাথ' বলেছেন, পদাগঞ্জকে বলেছেন 'পদচিহ্ন'। কবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্নের সংগৃহীত কবি রতিরাম দাশের কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে জিনিসগুলিকে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব আমি সংক্ষেপে।

জমিদার শিবচন্দ্র রায় চৌধুরী ঐ সময়কার ইংরাজ বিরোধী নবাবের উজির (মন্ত্রী) ছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে আনন্দমঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অন্হনা হল একটি পরগনা, পীরগাছা হল একটি গ্রামের নাম।

বৈদ্য বংশ জন্ম শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবী সিংহের অত্যাচার আর নাহি শয়।।
রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার।
সব্বাকে লিখিল পত্র সৌধে আসিবার।।
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সক্কল প্রজাকে ডাকে রোকা দিয়া তার।।

এইভাবে জমিদার, প্রজা, ফকীর সন্ন্যাসী সবাই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করেন। মোগল আমলে যেমন ফৌজদার ছিলেন জেলার সৈন্যবাহিনীর কর্তা বা প্রধান ঐ সময়ে রংপুরের কালেক্টর গুডল্যাড ছিলেন সৈন্যবাহিনীর প্রধান। কিন্তু কথা হল এই দেবী সিং কালেক্টরের কাছে আশ্রয় না নিয়ে মুর্শিদাবাদ বা ঢাকায় পালিয়ে যাবার কারণটা কি ছিল ? শুধু দেবী সিং যে পালিয়ে গেল তাই নয়, তার সাথে সাথে 'বার ঢিং' মানে দেবী সিং-এর সাথে আরো যারা কর্মচারী ছিল, তারা সবাই পালিয়ে গেল। এতে বোঝা যাচ্ছে গুডল্যাড কালেক্টর ও তার সৈন্যবাহিনীর লোকেরা সবাই পরাস্ত হয়েই পালিয়ে গেছে।

কুণ্ডির জমিদার বংশের ইতিহাসে আমরা দেখেছি, ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের সময় রংপুরের কালেক্টর তার কুঠি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকেন সদ্য পুষ্করিণীর জমিদার বাড়ীর দুই মহলায়। ভাগ্যিস ইতিহাসে ঐ কথাটি লেখা ছিল জন্য আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের গৌরব এবং আমাদের পথ প্রদর্শক পণ্ডিত রাজকবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আয়ারল্যাণ্ড নিবাসী পার্লামেণ্টিয়ান এডমণ্ড বার্কের বিখ্যাত বক্তৃতা স্মরণ করে দিয়ে বলেছেন যে বৃটিশ পার্লামেণ্টে দেবী সিং-এর অত্যাচার কাহিনী শুনে লণ্ডন নগরীর দুইশত লেডী অচৈতন্য হয়েছিলেন।

আরও একটা মহা মূল্যবান কথা চালু করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা মহাফাঁপড়ে পড়েছিলেন। কথাটা হল এই—ইংরাজরা তাদের মিথ্যা ও জাল ইতিহাস দিয়ে এতদিন ধরে বলেছেন এগুলো স্থানীয় ডাকাতি লুঠতরাজ মাত্র।

জাগের গানের মারফত জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীকে দেখা যাচ্ছে প্রজা বিদ্রোহী নেতৃরূপে এবং কথিত নবাবকেও দেখা যাচ্ছে প্রজা বিদ্রোহের সঙ্গে—তাহলে লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে যে মুসলমান নবাব হিন্দু ভূস্বামী সব স্বাধীনতা যুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান ঐক্য সর্বনাশ। এই বিপদের ভয়ে ইংরেজরা ১৩১৭ সালে (১৯১০ খৃঃ) মজনু, শাহ্‌কে মজনু (পাগল) ফকীর করে একটি জাল কবিতা লিখিয়ে নেন। [বগুড়ার উকিল পি. সি সেনকে দিয়ে এবং তা রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং আর একটি বই প্রকাশ করেন ১৯৩০ সালে ‘সন্ন্যাসী এণ্ড ফকীর রেইডার্স ইন বেঙ্গল’ নামে]

দেবী চৌধুরানীর শহীদ হওয়ার বিবরণ

এই সব বিস্তৃত এলাকার লোকজন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর যে নাম দিয়েছিলেন, সেই নামের মত গুণ ও কাজ ছিল দেবী চৌধুরানীর। তাকে চণ্ডী মা বলে লোকেরা বলতেন ও ডাকতেন। দেবী চৌধুরানীর ইংরাজদের সহিত লড়াই করে নিহত হওয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেটুকু লোকের মুখে শুনেছি তা এখানে বলবার প্রয়াস পাব।

১৭৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে নবাব সুবেদার নুরউদ্দীন মীর্জা বাকের জঙ্গ শহীদ হন। উক্ত সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিন ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে ঘোরতর লড়াইয়ে

দেবী নিজে লড়াই করে নিহত হন। সঙ্গে নিহত হন রাজা শিবচন্দ্র রায় এবং দেবী চৌধুরানীর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেষ্ট কিশোর চৌধুরী।

হেস্টিংস স্বয়ং অগণিত সৈন্য নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করেন। দেবী চৌধুরানীর বাহিনীও বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করে একে একে নিহত হন, কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। স্থানীয় অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানরা মিলে ঐ দিনটি স্মরণ করবার জন্য বৈশাখ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে একটা মেলার ব্যবস্থা করে আসছেন আজ অবধি।

লড়াইয়ের এই স্থানটি হল রংপুর জেলার পীরগাছা থানার পীরগাছা মৌজায় অবস্থিত। আমাদের স্থানীয় আঞ্চলিক ভাষায় না পারাটাকে 'না পাইম' বা 'না পাই' বলা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় না পাই মুই, না পাই আমরা অর্থাৎ আমি বা আমরা পারি না। পীরগাছা মৌজার ঐ স্থানটির নাম হল 'না পাই চণ্ডী' অর্থাৎ সেখানে চণ্ডী পারলেন না, হেরে গেলেন। ঐ স্থানটিতে দেবী চৌধুরানীর সৈন্যগণ থাকত। বিরাট মাঠ, মাঠের মধ্যস্থানে মুসলমান সৈন্যদের নামায পড়ার জন্য তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি পাকা মসজিদ এখনও অক্ষত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ২২ হাত, প্রস্থ ১১ হাত। মসজিদটির সামনে সৈনিকদের গোসল করা ও নামায পড়ার জন্য একটি দীঘি খনন করা হয়েছিল। দীঘিটির পানি এখনও স্বচ্ছ রয়েছে। দীঘিটির দৈর্ঘ্য ৩৩১ হাত ও প্রস্থ ২৬০ হাত। দীঘির সিকি মাইল উত্তরে নবাব বাকের জঙ্গের পবিত্র কুঠি—কুঠিটি পাকা দালান। নির্মিত দালান বিশেষ নেই। তবে ধ্বংসাবশেষগুলি এখনও রয়েছে। পাশের সরোবর নবাবের নৌকা বিহারের জন্য এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। ঐ স্থান হতে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর স্বামীর বাড়ী ১ মাইল পূর্ব দিকে। ঐ সময়ে একটি দুই মহলা পাকা বাড়ী ছিল। বাড়ীটি সম্পূর্ণ রূপে ভূমিসাৎ করা হয়েছে। সেখানে একটি মন্দির এখনও অক্ষত রয়েছে। সৈন্য থাকা স্থানের মসজিদের ৫০ গজ উত্তর দিকে একটি মন্দির ছিল। মন্দিরটি এখন নাই। নবাবের পবিত্র কুঠির নাম এখনও লোকেরা বলে থাকেন পবিত্র ঝাড়। দেবী চৌধুরানী যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় যেমন নাম হয়েছে 'না পাই চণ্ডী' তেমনি ওয়ারেন হেস্টিংস যেখানে এসে অবস্থান করেছিলেন, ঐ স্থানটির নামকরণ হয়েছে নগর জিৎপুর অর্থাৎ হেস্টিংস যুদ্ধে জয় লাভ করায় নগর জিৎপুর নামকরণ হয়েছে।

যখন আমি (লেখক) পবিত্র কুঠি বা ঝাড়ে গেলাম তখন ঐ কুঠির একবারে উপরে একটা বাড়ী রয়েছে। বাড়ীর মালিক আমাকে একটা চেয়ার বসতে দিলেন। আমি চেয়ারে বসে লোকটির কথা শুনছিলাম। লোকটি বিস্তৃত মাঠের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললেন মাটিতে সমস্ত স্থান জুড়ে কবর শুধু কবর।

নববর্ষ সংখ্যা,
রংপুর সম্মিলনী
২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা,
সম্পাদক ডাঃ বিমল সেন গুপ্ত
অফিস ৩৩/৮ এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
শান্তি পল্লী, কলকাতা—৩২, ফোন ৭২ ৪৪ ৫২

রংপুর সম্মিলনী
৩৩/৮ এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড--
শান্তি পল্লী, কলিকাতা ৩২, ১৯৮৫
আযাদী আন্দোলনের পাদপীঠ, রংপুর
১৭৮৩-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে বিশ্বকোষ ও রতিরাম দাসের
জাগের গান, হায়দার আলী, রংপুর

[নববর্ষ সংখ্যা, 'রংপুর সম্মিলনী' পত্রিকায় হায়দার আলীর ধারাবাহিক রচনা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলাম—দেবী চৌধুরানী আসল নাম, পরিচয় ও তিনি পীরগাছা, না মন্হনা, না বামনডাঙ্গার বৌ ছিলেন ? এর উত্তরে রংপুর থেকে হায়দার আলী Bengal District Records. Vol—1, 1770—1779 edited by Archdeacon of Calcutta. থেকে 1083—119 no Record (24/7/79) উদ্ধৃত দেখাচ্ছেন তিনি মন্হনা ও বামনডাঙ্গা উভয় পরগনার জমিদার very name of which carry torror through out the mafussil. পরে দেখিযেছেন, কিভাবে জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানীর আশ্রিতা পবিত্রা রানী Jay Durga having absented herself for the space of a year and no one on her part to take charge of the pergunnah বামনডাঙ্গার জমিদারী পান ও তার পোষ্য পুত্র বংশই বামনডাঙ্গার জমিদার বলে পরিচিত হন। হায়দার আলীর মতে এই পবিত্রা রানীই বঙ্কিম বর্ণিত বামনী, নিশি ঠাকুরানী। সুতরাং স্বর্গীয় কেশবলাল বসুর গত বছরের উদ্ধৃত লেখা অনুযায়ী বামনডাঙ্গার অর্থাৎ রামেশ্বর মুস্তফীর বংশ দেবী চৌধুরানীর নয়। লেখাটি বিস্তৃত ও তথ্যপূর্ণ

হলেও খানিকটা এলোমেলোভাবে ছড়ানো। সুতরাং ছাপবার আগে একটু সম্পাদনা দরকার হবে।

আর একটি কথা, ৭৬-এর মন্বন্তর সম্পর্কে হান্টারের রিপোর্টে উদ্ধৃত রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট গেজিয়া-এর বক্তব্য ছিল রংপুর জেলা ৭৬-এর মন্বন্তরে ততটা প্রভাবিত হয়নি, কেশব বাবুর লেখাতেও তারই প্রতিধ্বনি আছে। তাহলে দাঁড়ায়, এই গণঅভ্যুত্থানের পেছনে কি দুর্ভিক্ষ ছাড়াও কারণ ছিল ? হ্যাঁ ছিল। অর্থনৈতিক কারণটা তো আমরা জানিই—স্থানীয় নারায়ণী টাকার সাথে রেভিনিউ এ দেয় আর্কট মুদ্রার মানগত পার্থক্যের জন্য রায়তদের বিরাট ক্ষতি হচ্ছিল। নরহরি কবিরাজ এ ব্যাপারটা একটু ছুঁয়ে গেছেন, তাছাড়া নবাব বংশীয়দের (মজনু শাহের) ক্ষেত্রে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের রাজনৈতিক চেষ্টাও ছিল। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের একটু নেড়ে চেড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। দুঃখের বিষয় আমাদের ঐতিহাসিকরা সারা ভারতের উত্থান-পতন এমন কি বিদেশের ইতিহাস নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন, বাংলার এক অভ্যুত্থান নিয়ে ভালভাবে তত্ত্বতল্লাশ করেন নি। এখন করতেও তো বাধা নাই। হায়দার আলীর বক্তব্যগুলিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে উড়িয়ে দিতে পারছি না যদিও তার সমস্ত বক্তব্যের সাথে আমি একমত নই। হায়দারের বক্তব্য সম্পর্কে অনেকেই বিরোধিতা করেছেন, তাদের প্রতি বক্তব্য ঐ কাজটাই শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে, মুখে মুখে না করে লিখিত আকারে করুন। আমরা তাও ছাপবো। তাতে একটা কাজ হবে। তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক আলোচনা সত্য উদঘাটিত করতে সাহায্য করবে।

বিমল সেন গুপ্ত—পত্রিকা সম্পাদক

ইতিহাস হল সতর্ককারী, ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত পথ দেখায়। আধুনিক জাতি ও জাতীয় রাষ্ট্র গড়তে গেলে যে জাতির জাতীয় ইতিহাস যত বেশী স্বচ্ছ পরিষ্কার, সেই সব জাতি তত বেশী শক্তিমান।

সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিশ্বকোষ-এর লেখক কবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় স্বদেশভক্ত রাজা ভবানী পাঠকের দীপান্তর হওয়া অথবা রেনানের যুদ্ধে নিহত হওয়ার কথা বিশ্বকোষ আমলেই দেন নাই। কারণ মহাবীর পাঠক ঐ সময়গুলিতেও জীবিত ছিলেন। বিশ্বকোষের সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তথ্য গোপন করায়

ইংরাজদের উদ্দেশ্যটা কি ছিল বিলক্ষণ জানতেন। কিন্তু বিশ্বকোষ বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয়ে তা খোলাখুলি উল্লেখ করেন নি। তবে ইংরাজদের মিথ্যাপূর্ণ জাল লেখাগুলির উদ্ধৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বকোষের বিভিন্ন খণ্ডে তার সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করেছেন। যদি কেউ বিশ্বকোষের আগাগোড়া ইতিহাসগুলি অনুসন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে পড়তেন এবং বিদ্রোহী এলাকাগুলি ঘুরে ফিরে দেখতেন, তাহলে ইতিহাস অন্য রকম হত। ভবানী পাঠক সম্পর্কে বিশ্বকোষে লিখেছেন, "শোনা যায় ইংরাজের বিচারে তিনি (ভবানী পাঠক) দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে পাঠক নিহত হন।" বিদ্রোহী নবাব নুরউদ্দীন সম্পর্কে ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখেছেন সেল্ফ স্টাইল্ড নবাব মানে স্বঘোষিত নবাব।

রংপুরের অধিবাসী কবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় জাগের গানের যুগান্তকারী প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে লিখেছেন, "তিনি (কালেকটর গুডল্যাড) শুনিলেন নুরুলউদ্দীনকে প্রজারা নবাব পদে বরণ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে ...লেফটেনেন্ট সাহেব শুনিলেন, নুরুলউদ্দীন মোগলহাটে আছেন।

তিনি সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। নুরুলউদ্দীন পঞ্চাশজন মাত্র লোক মোগলহাটে লইয়াছিলেন। তাহার দলবল সকলেই পাটগ্রামে ছিলেন। ম্যাকডোনাল্ড অতর্কিতভাবে মোগলহাটে নুরুলউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইল, নুরুলউদ্দীন আহত হইয়া অল্পদিনেই ইহলোক ত্যাগ করিলেন এবং নুরুলউদ্দীনের দেওয়ান (রাজস্ব মন্ত্রী) দয়াশীল (রাজা) হত হইল।

কবি সম্রাটের প্রতিটি কথাই যথার্থ সত্য। প্রজারা নবাবকে নির্বাচন করেছিলেন এ কথাই সত্য। রংপুরের লোকেরা বংশ পরম্পরায় এই কথাই বলে আসছেন। 'কোচবিহারের ইতিহাস' এ ২১৯ পৃষ্ঠায় আছে, "রংপুরের প্রজাবৃন্দ অবশেষে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রকাশ্যভাবে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং নুরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি তাহাদের নবাব ও দয়াশীল নামক এক ব্যক্তি সেই নবাবের দেওয়ান নির্বাচিত হন।" কোন এক ইংরাজ ঐতিহাসিক বলছেন, নবাবকে বন্দী করা হয়েছিল; কোচবিহারের ইতিহাসে ও বিশ্বকোষে বন্দী হওয়ার কথা নেই। নবাব গুরুতর আহত

হওয়ার পর নবাবের দেহরক্ষীরা নবাবকে নিয়ে বিদ্রোহীদের নির্মীয়মান রাজধানী ফুলচৌকী নগরে নিয়ে যান এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে নবাব ইহলীলা ত্যাগ করেন। ফুলচৌকী নগরের মসজিদের সামনে তাকে কবরস্থ করা হয়।

"১৭৭৩ খৃস্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাত প্রায় ৫০ সহস্র লোক ইংরাজের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। ··· ইহা হতে বোঝা যায় বিদ্রোহের বিধ্বংসী ক্ষমতা কত ব্যাপক ও বিরাট ছিল। ··· ··· 'শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শে দেবী ও মজনুর করাল কৃপাণের সহযোগিতা পাইয়াছিল ··· । পাঠকের এক বন্ধুর নাম মজনু শাহ্।" —বিশ্বকোষ

আর একটি কথা বলতে চাই এই যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা বলছেন মজনু শাহ্। এটা অনেকটা দেবী চৌধুরানীর নামের মত অর্থাৎ আসল নাম না দিয়ে কেবল পদবী দেওয়া হচ্ছে। এই যে মজনু এটা ইংরাজদের দেওয়া নাম। কারণ মজনু অর্থ হল পাগল, উন্মাদ। এটা কোন মুসলমানের নামই হতে পারে না। কারণ শিশু জন্মিবার ৭ দিন, ১৪ দিন, ২১ দিন, ৪০ দিনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী সাহেবানরা নবজাত শিশুর নামকরণ করেন। সুতরাং কোন বেয়াকুব, বে-আক্কেল মৌলবী সাহেবানই নবজাত শিশুর মজনু বা পাগল নাম রাখতে পারেন না।

'সিয়ারুল মোতাখখারিনের' সাম্রাজ্যবাদীদের ইংরাজী অনুবাদে বলা হচ্ছে সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মির্জা বাবর। ইংরাজরা 'বাকের'কে অনুবাদে বাবরে রূপান্তরিত করেছেন বিশেষ কারণে। সে কথা আপনারা ধীরে ধীরে জানতে ও বুঝতে পারবেন। ফুলচৌকী মসজিদের সামনে শিলালিপিতে লেখা রয়েছে 'বাকের মহাম্মদ' 'কামাল মোহাম্মদ'। এই কামাল হল বর্তমান রংপুরের 'কামাল কাছনা' পাড়ার কামাল। আসলে মোগলদের কথা প্রকাশ হলে প্রজাসাধারণ স্বেচ্ছায় মোগলদের পক্ষ নিত জন্য গোপনীয়তার এই প্রয়াস। প্রজাবিদ্রোহের নেতা নবাব নুরুলউদ্দীন ও মজনু শাহ একই ব্যক্তি। এর আসল নাম মীর্জা বাকের জঙ্গ। রংপুরের হাজার হাজার মানুষ বংশ পরম্পরায় শুনে আসছেন। তারই পক্ষ নিয়ে হিন্দু, মুসলমান, প্রজাসাধারণ, জমিদার ফকীর সন্ন্যাসী, সামরিক-অসামরিক নারী পুরুষ, এমন কি মারাঠা, রাজপুত একত্রে দারুণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ইংরাজদের কায়দা ও চালাকীতে একই ব্যক্তিকে দুই নামে অভিহিত করা হচ্ছে।

ইংরাজ আমলের ইতিহাস না লেখার ফলেই ইংরাজদের কথাগুলিকে বলা হয় যথার্থ ইতিহাস। উক্ত মীর্জা বাকেরকে ইংরাজরা কখনও বলছেন মজনু শাহ আবার কখনও বলছেন নবাব নুরুলউদ্দীন, পরে বলেছেন মজনু ফকীর।

পত্রিকা পরিচালক মণ্ডলী

ডাঃ বিমল সেনগুপ্ত (সম্পাদক) নৃপেন ঘোষ, মহী বাগচী, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়, মানসী ভট্টাচার্য, রবি পণ্ডিত, রথীন্দ্র সরকার, অফিস ঃ c/o সেনগুপ্ত, ৩৩/৮ এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, শান্তি পল্লী, কলিকাতা ৩২, ফোন ৭২৪৪৫২।

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৮৪
(আযাদী আন্দোলনের পাদপীঠ—হায়দার আলী, রংপুর

[লেখক রংপুরের '৭৬ এর (ইং ১৭৭০) মন্বন্তরের সমকালীন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকীর বিদ্রোহ সম্পর্কে ও ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান ও অজ্ঞাত, বরং বলা উচিত, ঐতিহাসিকদের দ্বারা অবহেলিত তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ লিখেছেন।

এতে আছে দেবী সিংহের অত্যাচারের বর্ণনা এবং দেবী চৌধুরানী, নুরউদ্দীন, ভবানী পাঠক পরিচালিত ইংরাজ বিরোধী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ইটাকুমারীর রতিরাম দাশ রচিত 'জাগের গান'—যার সম্বন্ধে 'রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার' ১৩১৫ সালের (১৯০৮ খৃঃ) ৪র্থ সংখ্যায় রংপুরের গৌরবপণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন এক অনন্য সাধারণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

এ ছাড়া প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ গ্রন্থে বিদ্রোহ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ টীকা আছে। আছে নুরুন্দীনের পরিচয়। পাঠকরা জানেন গত এপ্রিল মাসে ঢাকার নাগরিক নাট্য সংস্থা কলকাতার হিন্দী হাইস্কুলে, সৈয়দ শামসুল হক রচিত ও আলী জাকের পরিচালিত "নুরলদীনের সারা জীবন" রংপুরের বাহে ভাষায় অভিনয়ে কলকাতাবাসীদের মুগ্ধ করে গেছেন। এই নুরুলদীনই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক নুরুন্দীন। (আমরা রংপুর সম্মিলনীর পক্ষ থেকে নাট্যসংস্থাকে অভিনন্দন জানিয়েছি ও ৮৪ র সম্মেলন স্মারক সংখ্যা উপহার দিয়েছি।—)

লেখক দেখিয়েছেন দিল্লীর বাদশাহর নিকট আত্মীয়তা কিভাবে এই বিদ্রোহগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে হলে বাদশাহী বংশতালিকার পরিচয় আপনাদের বুঝতে সাহায্য করবে। এই বাকেরউদ্দীন বা নুরুদ্দীনই নাটকের নুরলদীন। বাকের শব্দ পরিবর্তিত হয়ে বাহার কাচনা ও কামালউদ্দীনের নামেই রংপুরের কামাল কাচনা। বৃটিশ সরকার তাদের স্বার্থের কারণেই বিদ্রোহীদের সাধারণ ডাকাইত বা লুটেরা প্রমাণ করার জন্য Fact suppress করেছেন ও দলীল-দস্তাবেজ যথাসম্ভব লোপাট করেছেন। নুরলদীন অবশ্যই গণনেতা। দয়াশীল তার দেওয়ান এবং তিনি বাদশাহ বংশোদ্ভূত ও বটে। সিপাহী বিদ্রোহে কামালউদ্দীনের ভূমিকাও আপনারা লক্ষ্য করবেন।

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা যে বাদশাহ বংশোদ্ভূতরা ইংরেজদের হাত থেকে আবার তাদের হৃত প্রতিপত্তি ও গৌরব উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন। এই সম্বন্ধে হায়দার আলীর আলোকপাত খুবই চিত্তাকর্ষক। এছাড়া আরও একটি বিশেষ দিকের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৭৫৭-তে পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৭০-এর সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ (বঙ্কিমের লেখায় যার আংশিক চিত্র, কিছু বৃটিশ প্রশস্তি, কিছু না থাকলেই ভাল হত এখন যে চিত্র আছে। অবশ্য মনে রাখতে হবে বঙ্কিমকে রাজরোষ এড়াতে আনন্দমঠকে পাঁচবার নতুন করে লিখতে হয়েছে। না হলে এ অমূল্য বই আমরা পেতামই না। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, ডাঃ শরীফ, সাহিত্যিক রেজাউল করিমের রচনা অনিসন্ধিৎসু পাঠকরা দেখতে পারেন।

তাছাড়া ভেলোরের ছাউনীতে বিদ্রোহ, ব্যারাকপুরের ছাউনীতে বিদ্রোহ (১৮২৪), বেরিলীর বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ছোট নাগপুরের বিচ্ছিন্ন আদিবাসীদের অভ্যুত্থান, বারাসতে তিতুমীরের বিদ্রোহ, মোফলা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫ সালের বাংলা বিহারের সাঁওতাল বিদ্রোহ। এগুলি প্রমাণ করে প্রতি মুহূর্তে বৃটিশ বিরোধী বিক্ষোভ কিভাবে গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিতে চেষ্টা করছিল। তৎসত্ত্বেও ১৮৫৭র বিদ্রোহ নিছক সিপাহীদের বিদ্রোহ পর্যায়েই ছিল না।

পরে ব্যাপক আকার ধারণ করে সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান।

স্যার সৈয়দ আহমদ, চার্লস রেকজনকে জনৈক বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (আলোচ্য প্রবন্ধে যার উল্লেখ আছে) মতে এটা মূলত অসন্তুষ্ট সিপাহীদের বিদ্রোহ কেবল একটু ব্যাপক ভাবে ছাড়া আর কিছু নয়।

অন্যদিকে জে. বিনর্টন, ডাঃ আলেকজান্ডার ডাফ ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের মতে সিপাহীদের বিদ্রোহ আন্দোলনের শুরু হলেও পরে ব্যাপকতর জাতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করে ও স্থানে স্থানে সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ১৯৫৭ সালে বিদ্রোহের শত বার্ষিকী উপলক্ষে ডাঃ ধীরেন সেন ডাঃ রমেশ মজুমদারের রচনায় এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। হায়দার আলীর রচনা দীর্ঘকাল অনুসন্ধানের ও পরিশ্রমের ফল এবং মূল্যবান সংযোজন। ইংরাজরা চর্বি মাখা কার্তুজের কথা যতই ফলাও করে বলার চেষ্টা করুন ওটা উপলক্ষ মাত্র। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ দীর্ঘকালের অসন্তোষ।

আসলে মনে হয়, প্রতিটি দেশের সকল স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লব্ধ যৌক্তিক ধারণা সামরিক শক্তিতে বলীয়ান বৃটিশকে সামরিক শক্তি ছাড়া বিতাড়ন সম্ভব নয়। সুতরাং ছাড়াছাড়া বিচ্ছিন্ন (sporadic) গণ-অভ্যুত্থান, নবাব যাতে প্রধানত নেতৃত্ব দিয়েছিল রাজা বা ভূস্বামীরা, সেগুলিকে ঐতিহাসিক বা জাতীয় গণ-অভ্যুত্থানের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেছেন। কিন্তু স্থানীয় গণ অভ্যুত্থান ও না হলে বৃটিশ সৈন্যরাই বা কেন রংপুরে অগণিত লোককে গুলী করে, গাছে গাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ব্যাপক হত্যালীলা করে যাবে ? না হলে বৃটিশ ভারতে ৪টি Military Intelligence এর একটি Centre রংপুরের সেকাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল এমনি এমনি ? রংপুরের কালেক্টর উড্‌ল্যাডকে কেন কুণ্ডির রাজবাড়ীতে লুকিয়ে থাকতে হবে ? কলকাতা শান্ত ছিল বলেই সার বাংলা শান্ত ছিল তা ঠিক নয়। বিশেষত সেকালে উত্তর বঙ্গের সাথেই বেশী যোগাযোগ ছিল বিদ্রোহী বিহারের পূর্নিয়া, কাঠিহার রাজমহল হয়ে। হায়দার আলী দেখিয়েছেন কি ভাবে এই সব অভ্যুত্থানে হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গেছেন তার লেখায় উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্রোহীদের ছাউনীর বর্ণনা ও স্থানগুলির পরিচয় আছে।

লেখক দুঃখ করে বলেছেন, এই ইতিহাস জানবার চেষ্টা জাতীয়তাবাদী ধর্মীয় বা মার্কসবাদী পার্টিগুলিও করেন নি—তাহলে দেশ ভাগ হত না।

কথাটা ঠিকই, কারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইংরাজদেরই Planned Creation এবং স্বৈরতন্ত্র এখনো দুই দেশেই সে চেষ্টা চালাচ্ছে সুনিপুণভাবে। তাদের সাহায্য করছে দেশবাসীর অজ্ঞতা।

হায়দার আলীর আর একটা মূল্যবান সংযোজন নবাব কামালউদ্দীনের নাত বৌ শাহা খানু বেগমের (বয়স ৯৬ বছর জীবিত। রংপুর ফুলচৌকিতে আছেন এবং যিনি বৃটিশের বহু অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছেন।) জবানবন্দী ! ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সম্পাদকের কলমে এতটা introduction লেখার একটি কারণ প্রবন্ধে সংখ্যায় সংখ্যায় যা ছাপা হবে তার সম্বন্ধে আগেই সামগ্রিক ধারণা দেওয়া, যাতে পাঠক সব মিলিয়ে নিতে পারেন। না হলে ৩ মাস আগ্রহ বজায় রাখা কঠিন।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে আমরা ঐতিহাসিক নই, এই পত্রিকাও ইতিহাসের Research Paper নয় কিন্তু যেহেতু সম্মিলনী সাহিত্য ঐতিহাসিক সততার প্রতি নিয়মনিষ্ঠ থাকতে চায়, সুতরাং এগুলি ছাপবে। কোন দ্বিমত থাকলে তাও ছাপবে। যোগ্যতর ব্যক্তিরা সত্যাসত্য যাচাইয়ের নিরিখেই বিক্ষিপ্ত তথ্য থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন। এ ব্যাপারে সকলকে আমাদের আহ্বান।

ডাঃ বিমল সেনগুপ্ত (পত্রিকা সম্পাদক)

আপনারা কলিকাতায় 'রংপুর সম্মিলনী' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। লোকমুখে শুনে আপনাদেরকে অভিবাদন ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। ১৯৪৬ সালে আমরাও কলিকাতায় একটি রংপুর সমিতি করেছিলাম; ধর্মতলার এক হোটেলে। সপ্তাহে দুদিন করে বসা হত। সমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন তুলসী লাহিড়ী, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, খয়রাত হোসেন, ধীরেন চক্রবর্ত্তী এবং আরও দশ বারজন মিলে আমরা ছিলাম। সমিতিতে কথাবার্তা ও বক্তৃতা হত রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায়। ঐ সময় এর প্রয়োজনীয়তা ছিল যথেষ্ট, এখন তা আছে কিনা জানি না। স্বর্গীয় শ্যামাদাস চৌধুরীর পুত্র মুকুল রায় চৌধুরীর নিকট শুনলাম রংপুরের অনেক জ্ঞানী-গুণী, পণ্ডিত ব্যক্তি নিয়ে সমিতি গঠিত হয়েছে। ইহা খুবই আনন্দের কথা। রংপুরের নিকট অতীতের কি সব বিষয়বস্তু নিয়ে একটি ছাপানো বুলেটিন নাকি আপনারা বার করেছেন, তার মধ্যে কি লেখা আছে জানি না। আপনারা এখন যে কারণে বা যে জন্যই প্রবাসী

তাই জন্মভূমি, পিতৃভূমি মাতৃভূমি রংপুরকে, এর মাটি ও মানষগুলি, গাছ-গাছড়াগুলিকে আগের চেয়ে হয়ত অনেক অনেক বেশী ভাল লাগে। এর কারণও আছে যথেষ্ট। পাবনা জেলার এক প্রখ্যাত লেখক পরিমল গোস্বামী মাসিক বসুমতীতে -(১৩৬৪ সাল চৈত্র সংখ্যা) তাঁর স্মৃতিচারণ লিখতে গিয়ে জন্মভূমি পাবনায় সাহিত্য সম্মিলনে যান পাকিস্তান আমলে। কিন্তু সেখান থেকে ফেরার সময়ের যে বেদনা, যে আকুতি, যে মর্মান্তিক দুঃখপূর্ণ কথাগুলি বলেছেন, তা আজও আমার মনে দুঃখ ও বেদনার সঞ্চার করে। ১৯৭১ সালে গোলমালের সময় কলকাতায় বন্ধুদের আশ্রয়ে ছিলাম বেশ কিছুদিন। রংপুরের স্বনামধন্য গরীব দুঃখীদের অন্নদাতা স্বর্গীয় বাবু অবনী পণ্ডিতের সুযোগ্য পুত্র অসীম নারায়ণ পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী; বিপিন চন্দ্র পাল রোডে, রংপুরের কোন এক নামী লোককে আশ্রয় দিবার অনুরোধ করতে আমি গিয়েছিলাম।

রংপুর সম্মিলনী
৩৩/৮ এ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
শান্তি পল্লী, কলিকাতা ৩২, ১৯৮৫
আযাদী আন্দোলনের পাদপীঠ
(১ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর) হায়দার আলী রংপুর

অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গেই অসীম বাবু বলে উঠলেন দাদা রংপুরের কথা যতক্ষণ ঘুমাই না ততক্ষণ মনে থাকে; আর রংপুরের মানুষকে থাকবার জায়গা দিব না ? মানুষ তো দূরের কথা রংপুরের কুকুর আসলেও থাকতে দিব। এক সময় গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ি। শহরে গিয়ে উঠলাম মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ও অভিজাত ব্যক্তির বাড়ীতে। বিকাল বেলায় রিকশায় শহর দেখতে বার হলাম। রাস্তায় বড় করে আমার নাম করে দাদা দাদা করে কে যেন ডাকল; পিছন ফিরে দেখি, আমাদের পাশের গ্রামের এক লোক। কাছে এসে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্য কি আকুলভাবে কাকুতি মিনতি করা আরম্ভ করলো। আমি যার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তিনিও আমার সঙ্গে ছিলেন রিকশায়, তিনিও দৃশ্যগুলি পূর্ণরূপে দেখেছিলেন হয়তো। অনুভবও করেছিলেন তাঁর বেদনাটা কোথায়। শহর দেখা আর হল না। আমার পোটলাপুটলি নিয়ে সেই লোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি—সে

কি সবাই মিলে কান্নাকাটি। দুইজনে এক বিছানায় শুয়ে রাত ৩টা পর্যন্ত তার নানারূপ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হল। কে কেমন আছে, অমুকের কি হল, তমুকের কি হল, অমুক গাছগুলি আছে কিনা? বিল-পুকুর সে সব এখনি কাদের? আগের মত গাছ আছে কিনা? এরূপ নানা প্রশ্ন দুঃখ-বেদনা মিশানো। যখন সকাল বেলা সকালের নাশতা সেরে কুচবিহার যাওয়ার জন্য রিকশা বাস স্ট্যান্ডে যাচ্ছি, ফিরে দেখি বন্ধুটি রাস্তার পাশে বসে আমার রিকশাটির দিকে দেখছেন তাকিয়ে একদৃষ্টে, এক মনে।

এই যে দেশবিভাগ, এটা কে করলো, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ না সাম্রাজ্যবাদ ইংরাজ? হেস্টিংসের সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরাজরা রাষ্ট্রনীতির নামে যে কূটনীতি চালিয়েছিল, তার ফলস্বরূপ এই দেশ বিভাগ। আমরা আধুনিক রাষ্ট্র করতে গিয়ে ইতিহাসটা কখনও যাচাই করি নি; আসলে পাঠান মোগল এমনকি ইংরাজ আমলের ইতিহাস পর্যন্ত লেখা হয় নি। তারই জন্য এই হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি—শেষে দেশবিভাগ। এখন অবধি সে অশান্তি নিবারিত হয় নাই। ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে আধুনিক রাষ্ট্র গড়তে গেলে ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত তা অসম্ভব। আমরা এমন ফাঁকা অথর্ব নেতৃত্বের মধ্যে ছিলাম, যা ভাবলে অবাক ও বিস্মিত হতে হয়। আমরা রংপুরের ভ্রাতৃবর্গকে আত্মীয়গণকে নিবেদন করে বলছি ১৭৬০ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৭৮৩ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রংপুরের এই সব বিরাট এলাকা জুড়ে মুক্তাঞ্চল ছিল। যার মধ্যে ইংরাজদের রাজত্বই ছিল না, তা কি আমরা কখনও খোঁজ করে দেখেছি? অথচ অনেকে জানতো যে রংপুরের ইংরাজ বিরোধী ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। এ সব নাম সুচতুর ইংরেজদের দেওয়া।

সত্য কথা হল এই হিন্দু, মুসলমান, ফকীর, সন্ন্যাসী, জমিদার, প্রজা, ধনী-নির্ধন নারী-পুরুষ সবাই মিলে এক নেতার নেতৃত্বে এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে গণ-বিপ্লব ঘটানো হয়েছিল। এদের সঙ্গে আরও ছিলেন মারাঠা,

রাজপুত ও বিভিন্ন স্বাধীনতা-পিয়াসী বীরঙ্গনাগণ। এ সব আমার গালগল্প নহে। ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বে সমৃদ্ধ কথা। এই পুণ্যভূমি পরিদর্শনের জন্য একবার আসার জন্য আমি আপনাদের সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সব বিদ্রোহীদের বংশধরেরা ১৮৫৭ সালের যে মহাবিদ্রোহ বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এক কথায় ভারতের জাতীয়তাবাদী সূর্যকে ও অমলিন তারকারাজিকে সুচতুর সুকৌশলী বিশ্ব বেনিয়া সুনিপুণ ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গোপন করে রেখেছিল জন্যই আজ এই দুর্দশা, বেদনা এবং লাঞ্ছনার একশেষ হচ্ছে।

আমাদের এই ফাঁপা ইংরাজী বিদ্যাটা আমরা জেনে খুব যে একটা জাতীয় বড় কিছু করতে পেরেছি তা নয়, তবে পশুদের মত শরীরটা পুষতে পেরেছি। বড় আফসোস ও লজ্জার বিষয়! এই রংপুরের আমার ভ্রাতা-ভগ্নিগণ আমাদের। রংপুরের গৌরব-পণ্ডিত রাজকবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের, তার বৃদ্ধ বয়সে কঠিন কঠোর সংকল্প নিয়ে জেল, ফাঁসি যা হয় হবে; এই কঠোর কঠিন মন নিয়ে বাংলা ১৩১৫ সালে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪ পৃষ্ঠা 'রঙ্গপুরের জাগের গান' নাম দিয়ে এক অনন্য সাধারণ প্রবন্ধ লিখেন, যার সূত্র ধরে বলব না। বলব বিষয়গুলি ধরে, যদি অনুসন্ধান করা হত তাহলে দেশের এই দুর্দশা বা দেশবিভাগ হত না। আজ ১৩১৫ সাল থেকে ১৩৯০ সাল এই সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসরের মধ্যেও কোন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক, দক্ষিণপন্থী অথবা বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, কোন লেখক, সাহিত্যিক ঐতিহাসিক কেউ কি কখনও ঐ যুগস্রষ্টা যুগান্তকারী প্রবন্ধটির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন? অথচ সুচতুর ইংরাজরা যাদবেশ্বর বাবুর দিকে তাকিয়ে না দেখে বা কোন শাস্তি না দিয়ে কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে পূর্ণরূপে সফলকাম হল।

দিল্লীর বাদশার বংশ-তালিকার সাহায্যে পাঠক দিল্লীর বাদশার সাথে রংপুরের নবাবদের সম্পর্ক সহজে বুঝতে পারবেন। নূরউদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গ সন্ন্যাসী ফকীর বিদ্রোহের অন্যতম নেতা।

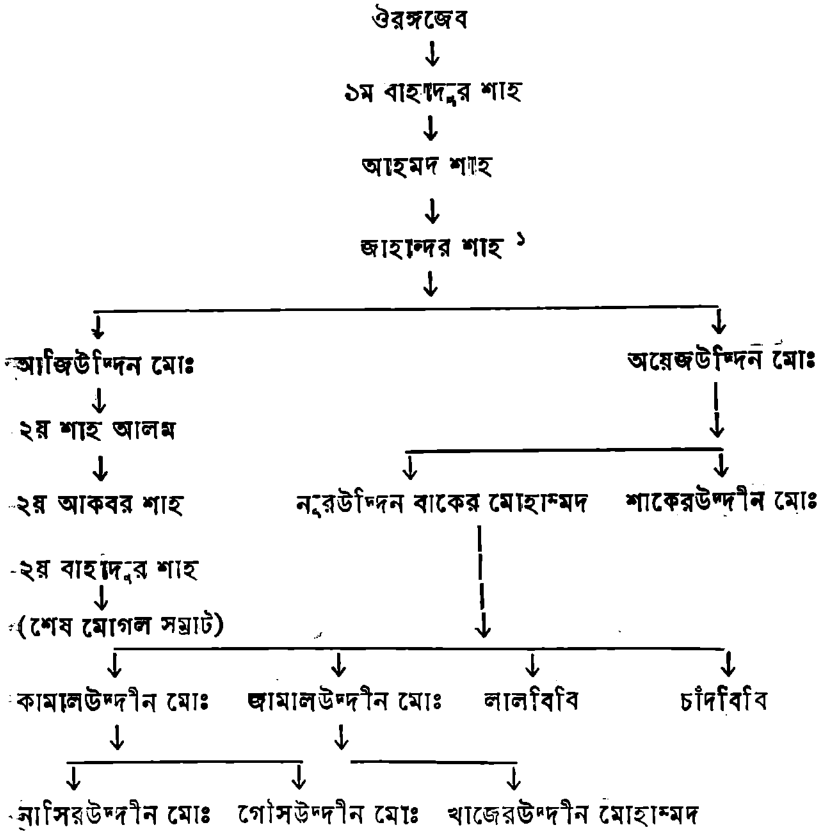
ঔরঙ্গজেব
১ম বাহাদুর শাহ
আহমদ শাহ
জাহান্দর শাহ ১
আজিজউদ্দিন মোঃ
অয়েজউদ্দিন মোঃ
২য় শাহ আলম
২য় আকবর শাহ
২য় বাহাদুর শাহ
(শেষ মোগল সম্রাট)
নূরউদ্দিন বাকের মোহাম্মদ
শাকেরউদ্দীন মোঃ
কামালউদ্দীন মোঃ
জামালউদ্দীন মোঃ
লালবিবি
চাঁদবিবি
নাসিরউদ্দীন মোঃ
গোসউদ্দীন মোঃ
খাজেরউদ্দীন মোহাম্মদ

শাহ বানু বেগমের জবানবন্দী

সিপাহী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন
রংপুরের এমন একটি পরিবারের স্মৃতিকথা
অনুলেখন : হায়দার আলী (রংপুর)

[হায়দার আলীর ভূমিকা—দীর্ঘ তিরিশ বছরেরও অধিক দিন ধরে অনুসন্ধানে জেনেছি যে আমার পূর্বে অনুসন্ধানের জন্য রংপুরের বিদ্রোহীদের এলাকাগুলিতে আর কেউ পদার্পণ করেন নি। আমাদের অনেকে

---

১. সম্রাট জাহান্দর শাহের পূর্ব নাম রোজিউদ্দীন মোহাম্মদ।

না জানলে এবং না বুঝলেও সুচতুর দূরদর্শী রাজারা জানত যে গণ-বিদ্রোহের কাছে রাজশক্তি অতীব দুর্বল ও তুচ্ছ। কারণ ইউরোপের গণ-বিদ্রোহের কথা বা খোঁজ ও ফলাফল তারা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা বিষয়গুলিকে যে কোন ভাবেই হোক কবরচাপা দিয়ে রেখেছিলেন তাদের শেষ দিনটি পর্যন্ত। এখন খোদ রংপুর শহরের কথায় আসা যাক। যে শহরে আপনারা বাস করছেন সে শহর বেশী দিনের পুরানো নয়। ১৮৫৭ সালের ১০/১২ বছর পরে এই শহরের জন্ম হয়েছে। পূর্বের রংপুর শহর ছিল মাহিগঞ্জের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ জুড়ে। পূর্বের রংপুর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং দালান-কোঠা সব ভূমিসাৎ ও লোকগুলিকে মেরে তাড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ঐ সময়গুলিতে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় বর্ণিত স্বর্ণযুগ ছিল। এসব কথা অবশ্যই আপনারা স্বীকার করবেন, যার ফলে আপনাদের পক্ষে অর্থাৎ বহিরাগতদের এসব বিষয় জানা সম্ভব হয় নি।

ইংরাজদের লেখা বিদ্রোহের বিষয়গুলি তারা নিজেদের মনোমত করে লিখলেও এসব অনুসন্ধান করে সঠিক তথ্য জানা ও প্রকাশ করবার আগ্রহ খুব একটা কারো ছিল না। শ্রদ্ধেয় শংকর বাবুরা তিন পুরুষ হয় বদরগঞ্জ কুতুবপুরে আসেন। ১৮৫৭ সালে তনখার মিঞাদের বিশাল জমিদারী ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে অনেককে সেই সব জমিদারী দিয়ে দেন। তন্মধ্যে বাতাসন পরগনা ও সরহাট্টা পরগনার কিছু অংশ মুর্শিদাবাদে কোনে এক মাড়োয়ারী পত্তন নেন। কিন্তু প্রজারা নতুন জমিদারকে স্বীকার না করে উপরন্তু মেরে পিটে তাড়িয়ে দেওয়ায় ১০০ শত রাজপুত ঘর পশ্চিমা লাঠিয়াল নিয়ে আসা হয় এবং তাদের সঙ্গে ২/১ ঘর ব্রাহ্মণও নিয়ে আসা হয়। শংকর বাবুরা তাদেরই পৌত্র। শংকর বাবুর কাকা শ্রদ্ধেয় ঠাকুর প্রসাদ রায় মহাশয় প্রজাদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশা দেখে রংপুর জেলার মধ্যে সম্ভবত সর্ব প্রথম প্রজা সমিতি গঠন ও আন্দোলন শুরু করেন। এতে ঠাকুর বাবু মাড়োয়ারী জমিদার দ্বারা লাঞ্ছিত হন। সেই হতে উক্ত পরিবারটি সম্পূর্ণভাবে জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। ইহারা সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। গরীব আমীর মনপ্রাণ দিয়ে সকলের সঙ্গেই মেলামেশা ও যাওয়া-আসা করতেন।

পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বহুপুরুষ ধরে রংপুরের ইটাকুমারীতে বাস করে আসছেন। ইংরাজদের রক্তচক্ষু এড়িয়ে সেই

সময়কার প্রচলিত আইন মেনে নিয়ে তিনি যে দেবী চৌধুরানীর আসল নাম, নিবাস পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন ১৩১৫ সালে এটা কত বড় দেশপ্রেম ও বুকের পাটা যে, এই দুঃসাহস তিনি করেছিলেন।

তিনি শুধু ছেলে পড়ান নাই, একজন উচুঁদরের প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ছিলেন। জয়দুর্গাদেবী চৌধুরানী যে বের হয়ে পড়লেই আর সবগুলি বের হয়ে পড়ত; যার ফলে ১৯৪৭ সালের ঘটনার পুনরাবির্ভাব কিছুতেই হত না। দেশের মন-মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে বদলে যেত। আরও একজন ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম করা যায়। তিনি হলেন সাহিত্য পরিষদের আজীবন সম্পাদক সুরেন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী। কুন্ডির অন্যতম জমিদার। ইঁনি ইতিহাস লিখেও ছাপাতে পারেন নি। শুধু ইংরাজদের ভয়ে নয়; নিকটতম জ্ঞাতিদের ভয়ে। পূর্বের ইংরাজ-বিরোধীদের লেখা তিনখানি ইতিহাসের নাম আমি অবগত হয়েছি। তিনখানা ইতিহাসই ইংরাজ সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত ছিল। ১। অজ্ঞাতর ইতিহাস, ২। শম্ভুবংশ চরিত, ৩। হরিশচন্দ্রের গুপ্তকথা। প্রথমখানির নাম বলেছেন সিরাজ ফকির, সাং শাকীলাদহ, থানা মিঠাপুকুর, জেলা রংপুর। দ্বিতীয় ও তৃতীয়খানির নাম বলেছেন রংহিনী মিশ্র ও শরৎচন্দ্র মিশ্র, সাং সুবায় বাড়ী, সুবার কোট। থানা লালমনির হাট, রংপুর জেলা]

জবানবন্দী

[জেলা রংপুর, থানা মিঠাপুকুর, অন্তর্গত ফুলচৌকী নগর বা নগরের অধিবাসিনী মোগল রাজবংশীয়া গৃহবধূ শাহ বানু বেগমের জবানবন্দী।

শাহবানু বেগম (৯৬ বছর), পিতা সুজাউদ্দীন চৌধুরী, মাতা খয়তন্নেছা, গ্রাম পালিচড়া, থানা কোতয়ালী, জেলা রংপুর। (জবানবন্দীর তারিখ হায়দার আলী দেন নি—সম্পাদক)

মাননীয়া শাহবানু বেগম, স্বামী নজমউদ্দিন মোহাম্মদ। শ্বশুর নেহালউদ্দীন মোহাম্মদ। উক্ত বেগম সাহেবা তাঁর জবানবন্দীতে তিনি যা বলেছেন, আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

'আমার বিবাহের পূর্বে ছোটবেলায় আমি পূর্বের আত্মীয় হিসেবে, নগরের মূল প্রাসাদে ১১ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে দুইবার এসেছিলাম। শাহ্‌জাদা খাজেরউদ্দীন মোহাম্মদের কন্যা খুশীরন্নেছা বিবির

বিবাহ হয়েছিল আমাদের ওখানে পালিচড়ায়।। তাঁর সঙ্গে এসেছিলাম দুইবার। তখন মুল প্রাসাদটি ঠিকই ছিল। আমার দাদা শ্বশুর শাহ্‌জাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ঐ সময় মারা গিয়াছেন। তাই তখন হতে ভোরের বেলায় নহবতখানায় আর নহবত বাজত না। আমার দাদা শ্বশুরের মৃত্যুর পর অনুমান সাত বৎসর আমার দাদী শাশুড়ী আমীরন্নেসা বিবি (ইংরাজ বর্ণিত বিলাসিনী, ইংরাজ বিদ্বেষিণী বারবনিতা আজীজন) বেঁচে ছিলেন। আমার দাদী শাশুড়ী আমাকে খুবই আদর করতেন এবং সব সময় কাছেই রাখতেন। বাড়ীতে আমি ছাড়া আর কোন বউ ছিল না। আমার পিত্রালয়ে আমি বাংলা ও ফার্সী ভাষায় লেখাপড়া শিক্ষা করি।

সিপাহী বিদ্রোহের কথা এবং আরও অনেক কথাবার্তা সময় সময় কখনও শুয়ে, কখনও বসে বলতেন। আমি মুখ বুজে শুধু শুনতাম। বাড়ীর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দাস-দাসী, অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী এবং আগন্তুক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখেও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, ধন-ঐশ্বর্যের কথা এবং সিপাহী বিদ্রোহের পর সব কিছু বাজেয়াপ্তির কথা, নানারূপ নির্যাতন, হত্যালীলার কথা অনেকের মুখে শুনতাম। সে সব অনেক বিষাদপূর্ণ কথা কাহিনী যা বলতেও মন চায় না, ভাল লাগে না। আমার ছোট দাদা শ্বশুর গৌউসউদ্দিন মুহাম্মদকে এবং দাদা শ্বশুরের কাকা ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মদকে যুদ্ধের পর প্রাসাদ হতে ধরে নিয়ে হাতীর পায়ের সাথে বেঁধে চাবুক মারতে মারতে এবং আরো নানারূপ নির্যাতন করতে করতে রংপুরের পাশে মেরে ফেলে দেয়। একজনের কবর রয়েছে 'রঙমহলের' লিচু বাগানে। আর একজনের কবর কারমাইকেল কলেজের উত্তর পার্শ্বে 'বালাটাড়ী' নামক গ্রামে। আমার দাদী শাশুড়ীর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা গোছের চেহারা, না লম্বা না খাটো। মাথার চুলগুলো ছিল ধবধবে সাদা। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর চালচলনে বলনে ছিল আমীরানা ঠাঁটবাট। সব সময় হীরা-জহরতের গহনা গলায় হাতে পরে থাকতেন। ধবধবে সাদা মসলিনের শাড়ী পরে থাকতেন। বাইরে কোথাও যাবার আদেশ ছিল না। এমনকি পিত্রালয়েও তিনি যাইতে পারেন নি কখনও। ইংরাজ সরকারের বিধি-নিষেধ ছিল তাই।

'আমার শ্বশুর বংশের কিছুটা পূর্বের কথা এখানে বলতে চাই। বাদশাহ জাহান্দর শাহ্‌র দুই পুত্র ছিল (১) আয়েজউদ্দীন মুহাম্মদ (২)

আজীজউদ্দীন মুহাম্মদ। ইনি দ্বিতীয় আলমগীর নাম ধারণ করিয়া বাদশাহ হন। আজীজউদ্দীনের পুত্র বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলম। আয়েজউদ্দীনের দুই পুত্র—বাকেরউদ্দীন মুহাম্মদ ও শাকেরউদ্দীন মুহাম্মদ।

দ্বিতীয় শাহ্ আলম বাদশাহ হবার পর মসিমপুরের যুদ্ধ (Battle of Mosimpur) হয়। ঐ সময় মীর্জা নুরউদ্দীন বাকের মুহাম্মদ জঙ্গ সুবা বাংলার নবাব হন। উক্ত মীর্জা বাকের সম্রাট ২য় আলমগীরের যেমন ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তৎসঙ্গে জামাতাও ছিলেন।

মীর্জা বাকেরের ২ পুত্র, ২ কন্যা। পুত্ররা হল কামালউদ্দীন মুহাম্মদ ও জামালউদ্দিন মুহাম্মদ। কন্যাদের নাম হল শাহজাদী লালবিবি ও শাহজাদী চাঁদবিবি। পুত্র কন্যাদের মধ্যে লালবিবি জ্যেষ্ঠা ছিলেন।

বাদশাহ ২য় শাহ্ আলমের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল নছর মুঈনউদ্দীন মুহাম্মদ আকবর দ্বিতীয়ের সহিত বিবাহ হয় বাকেরউদ্দীন মুহাম্মদের জ্যেষ্ঠা কন্যা বেগম লালবিবির সহিত। বাদশাহ আবুল মোজাফফর সিরাজউদ্দীন মুহাম্মদ বাহাদুর শাহ্ ২য় হয়। উক্ত শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহের আপন মাতা ছিলেন উপরোক্ত বেগম লালবিবি।

অনুমানি ১৮৪০-৪১ সালের মধ্যে দিল্লীর লালকেল্লা হতে নগরে ভ্রাতাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন গোপনে। কারণ লালবিবি পূর্ব হতে ইংরাজদের কখনও মানিয়া নেন নাই ভ্রাতাতের মত। নগর হতে গোপনে লালবিবি পুরানা রংপুরে আসেন সন্ন্যাসী নেতা মরিচা নন্দ গিরি ও ফকীর নেতা আকবর শাহ্ মদিনীর সহিত দেখা ও গোপন আলাপ আলোচনা করতেন। ইঁহারা ঘোরতর ইংরাজ বিরোধী ছিলেন। সে সব কখনও ইংরাজরাও বিলক্ষণ জানতেন ও খোঁজ খবর রাখতেন।

লালবিবি যখন নগর হতে মীরগঞ্জ নামক স্থানে আসেন, তখন ইংরাজের গুপ্তচর টাটি ও খয়েরউদ্দীন ও জনৈক লাহিড়ী উহারা ইংরাজ কালেকটরকে সংবাদ দেন। ইংরাজরা মীরগঞ্জ নামক স্থানে লালবিবিকে গুলী করে মারেন ও উক্ত দুই সন্ন্যাসী ও ফকীর নেতাকেও গুলী করে মারেন একই সময়ে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর নগরের ও অন্যান্য স্থানে বিশিষ্ট লোকজন এবং লালবিবির পুত্র ২য় বাহাদুর শাহ ইংরাজদের ভারত ছাড়া করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান।

এই ঘটনা নিয়ে পরবর্তী সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ নামক যুদ্ধ সংঘটিত

হয়। এর পরে হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। যুদ্ধের পরে পরেই শাহযাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ ও তার স্ত্রী বেগম আমীরন নেছা হেরে যাবার পর আত্মগোপন করে থাকেন। পরে মাওলানা কেরামত আলী ও সম্ভবত ডব্লিউ, ডব্লিউ হান্টার সাহেবের চেষ্টায় ইহারা প্রাণে বেঁচে যান এবং নগরের প্রাসাদে থাকবার অনুমতি পান। নগরের প্রাসাদাদি ১ম বার ইংরাজরা নিজেরাই লুণ্ঠন করেন। ২য় বার ইংরাজদের প্ররোচনায় মাহিগঞ্জের বঙ্ক সাহার নায়কত্বায় প্রাসাদাদি লুণ্ঠিত হয়। মোগল বংশীয়দের মধ্যে ইহারাই ছিলেন ধনে বিশাল ধনী। প্রাসাদ এবং বিভিন্ন কুঠিগুলিতে আমীরানার ঠাঁট-বাট বজায় রাখার জন্য অবিশ্বাস্য রকম বহুমূল্যাদির জিনিস-পত্র, হীরা পান্না জহরতাদির নির্মিত নানারূপ গহনা ও জিনিসপত্র, স্বর্ণরৌপ্য, মণিমুক্তায় জড়িত, স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত আটটি সিংহাসন, স্বর্ণরৌপ্য ও মণি মাণিক্য খচিত খাট-পালঙ্ক, আসা-সোটা স্বর্ণরৌপ্য নির্মিত নানারূপ বস্ত্রের সামগ্রী, তাঁবু, সামিয়ানা, স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত পালকি, বড় বড় পাখা স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত ছাতা, স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত থালা-বাসন ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী দুর্বৃত্তরা নিয়ে যায়। হাতীর গায়ের পা পর্যন্ত ঝুলানো চাদর এসবগুলিও লুণ্ঠনকারীরা নিয়ে যায়। বাতাসন ও সরহাট্টা পরগনার জমিদার, মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জস্থ মাড়োয়ারী জমিদারগণ বলেছেন যে. হাতীর গায়ের একেকটা চাঁদর পুড়িয়ে (২৫০) আড়াইশত হতে (৩০০) তিনশত ভরি স্বর্ণ তারা পেয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কত মহামূল্যবান সম্পদ লুট হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক রাজা ধুন্ধুপন্থ নানাজী এবং তার মন্ত্রী আজীমুল্লাহ খান ও নগরে শেষের দিকে এসে আত্মগোপন করেছিলেন এবং এখানেই তারা ইহলীলা ত্যাগ করেছেন। রাজা ধুন্ধুপন্থ নানাজী নগরের প্রাসাদে শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদের একই ঘরের পাশের কামরায় থাকতেন। ইংরাজ বিরোধী প্রধান সন্ন্যাসী নায়ক প্রথম হনুমানগিরির পালিত পুত্র ২য় হনুমানগিরি এবং অন্য আরও দুচারজন মিলে বর্তমান হাশিয়ার চড়কতলায় যমুনা নদীর তীরে; প্রাসাদের জানালার চন্দন কাঠের খড়ি (খড়ি—জ্বালানি কাঠ অর্থে ঃ সম্পাদক) দিয়ে ঘৃত সহযোগে চিতা করে উক্ত ইংরাজ বিরোধী নানাজীকে দাহ করেন।

সমস্ত ব্যবস্থা এবং মুখাগ্নি করেন সন্ন্যাসী নেতা ২য় হনুমানগিরি

নিজে। কারণ তিনিও ব্রাহ্মণপুত্র ছিলেন। মন্ত্রী আজীমুল্যা আরো প্রায় ৩ বছরের মত বেঁচেছিলেন। তাঁকে সকলেই মুন্‌সীজি বলে ডাকত। শাহজাদা এবং বেগম আমীরন নেছা ছাড়া এদের আসল পরিচয় প্রাসাদের আর কেউ জানত না। রাজা ধুন্ধুপন্থ বয়সে শাহজাদারও বড় ছিলেন। সেই হিসাবে নানাজী বেগম আমীরন নেছাকে পূর্ব হতে ভাসুর হিসাবে বউ-মা বলে ডাকতেন। পূর্ব হতে তাদের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। এসব কথা বেগম শাহবানু সাহেবা শুনেছেন খোদ বেগম আমীরন নেছার নিকট। মন্ত্রী আজীমুল্যা খান তিন বছরের মত বেঁচে থেকে মারা গেলে শাহজাদাদের পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

দিল্লী, আগ্রা, কানপুর, পাটনা, কলিকাতার সুতানুটি বহু ব্যবসার স্থানে তাদের ব্যবসায়ের কুঠি ছিল। ঘোরতর যুদ্ধের সময় বেগম আমীরন নেছা কানপুরে অধিক সময় ছিলেন এবং এদেশীয় সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। ইংরাজ সরকার সবই জানতেন, কিন্তু মোগল নামের মধ্যে যে যাদুস্পর্শ আছে বিশেষ করে নগরের এই মোগলদের উপরে, সর্বসাধারণ সর্বশ্রেণীর প্রজাদের। তাই সুচতুর ইংরাজরা নগরের এই মোগলদের নাম বিকৃত করে গোপন করবার চেষ্টা করেছেন। তা না হলে এদের বিপুল ধনরাশি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল কেমন করে? অবশ্য ইংরাজরা তাদের কায়দা কৌশলে সফলকাম হয়েছেন বলতেই হবে। শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদের বাহিনী বা তিনি নিজে কোন অসামরিক ইংরাজ নর-নারীকে হত্যা করেন নি এবং এই অসাধারণ সংগঠক শাহজাদাকে হস্তগত করবার মানসেই সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁকে প্রাণে মারেন নি। কিন্তু হান্টার সাহেব বহু চেষ্টা করলেও ইংরাজদের পক্ষে একটি কথা বলতেও তিনি সম্মত হন নি। অগণিত শহীদের সঙ্গে তিনি ও বেগম আমীরণ নেছা বিশ্বাসঘাতকতা করতে কখনই রাযী হন নি, যার ফলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতা ও মাতাকে অনেক বুঝিয়েছেন, সমঝিয়েছেন এই বলে যে হান্টার সাহেবকে যদি আমরা ফিরিয়ে দেই, তবে আমাদের ভিক্ষার পাত্র ছাড়া আর কিছু থাকবে না। কিন্তু পিতা শাহজাদা নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ ও মাতা বেগম আমীরন নেছা জ্যেষ্ঠ পুত্র নেহালউদ্দীন মোহাম্মদের কথা ও অনুরোধ এবং হান্টার সাহেবের কথা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

হান্টার সাহেবের সঙ্গে কয়েকজন ইংরাজ চিত্রকর শিল্পীও এসেছিলেন নগরে। তাঁরা প্রাসাদ প্রভৃতি মনোমুগ্ধকর স্থান ঘুরে ঘুরে দেখে

নকশা করে নিয়ে গেছেন। সিপাহী যুদ্ধের পূর্বে আরো একবার চিত্রকর শিল্পীরা এসে প্রাসাদাদির নকশা করে নিয়ে যান। এসব নকশা তাঁরা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গেছেন কিংবা ভারতের কোন জায়গায় রেখেছেন, তা জানবার কোন উপায় নেই। আমার দাদা শ্বশুর নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ মারা যাবার পর আমার দাদী শাশুড়ীকে ইংরাজরা প্রাসাদ হতে বের করে দেন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রাসাদের পশ্চিম পার্শ্বে আটচালা খড়ের ঘর করে থেকে সেখানেই ইহলীলা ত্যাগ করেন। হাণ্টার সাহেব ফিরে যাবার পর আমার দাদা শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নেহালউদ্দীন মোহাম্মদ চিন্তা ও গভীর মনোবেদনায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হার্টফেল করেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে নজমউদ্দীন মোহাম্মদকে রেখে যান। প্রাসাদ দুইটি নিলামে মাহিগঞ্জের বঙ্ক সাহা নিয়েছিলেন। স্থানীয় ও বিভিন্ন হিন্দু মুসলমান প্রজারা বঙ্ক সাহাকে এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে, যে প্রাসাদে এসে থাকবে তাকেই হত্যা করা হবে।

প্রাণে মারা পড়বার ভয়ে বঙ্ক সাহা বা তাহার কোন লোকজন কখনও প্রাসাদে একদিনের জন্যও থাকবার সাহস পান নি, থাকেন নি। শেষে নানা কারণে এই স্বর্গতুল্য প্রাসাদ, কুঠি ও নানারূপ বাগ-বাগিচা নানা ধরনের প্রতিকূলতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এখন শুধু নামগুলি রয়েছে মাত্র, আর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন। নগরটি নিজস্ব সৈন্য দিয়ে পাহারা দেওয়া হত। প্রাসাদ দুটিকে সরকারী বাড়ী বলা হত। এখনও আমাদের আস্তানাগুলিকে লোকেরা সরকারী বাড়ী বলে থাকে। নবাব মীর্জা বাকের জঙ্গ-এর বিশিষ্ট সহকারিগণের বংশধরগণ এবং শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদের বিশিষ্ট কর্মচারী ও তাদের বংশধরগণ নগরের কুঠিগুলিতে মর্যাদানুযায়ী থাকতেন বা থাকবার কুঠি পেতেন। যেমন ঃ সন্ন্যাসীর কুঠি (মহারাজ হনুমানগিরি) বৈরাগী কুঠি, বামনের কুঠি, জয়দুর্গার কুঠি (ব্রাহ্মণ রাজা ভবানী পাঠকের কুঠি), ফকীর বকসীর কুঠি (মুসা শাহ ফকীর), শীলরাজার কুঠি (রাজা দয়াশীল), তালিয়ার খাঁর কুঠি, শাহজাদাদের কুঠি ইত্যাদি। সকলের ব্যয়ভার বহন করতেন শাহজাদা কামালউদ্দীন মোহাম্মদ নিজে। একটা বৃহৎ পরিবার হয়ে সবাই বাস করতেন নগরে। নগরে নয় মাস বসবাস করা হত এবং রঙমহলে তিনমাস বাস করতেন এঁনারা সকলে।

পরবর্তীকালে আমার দাদী শাশুড়ী বেগম আমিরন নেছা নানাভাবে এদিক-সেদিক পড়ে থাকা ছড়ানো-ছিটানো সোনা-রুপা সংগ্রহ করে সেসব বিক্রয় করে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকার মত হস্তবুদ আদায়ের জমিদারী ও পত্তনি ক্রয় করেন এবং ৪/৫ হাজার বিঘার মত খাস যমীন ক্রয় করে রেখে মারা যান। এসব সম্পত্তি নানারূপ দুঃখজনক প্রতিকূলতায় একরূপ শেষ হয়ে যায়।

মূল প্রাসাদ দুইটির একটি ২ মহলা ও একটি ৩ মহলা বিশিষ্ট ছিল। কুঠিগুলি ১ মহলা ও ২ মহলা বিশিষ্ট ছিল। নগরে চার পাঁচটি মসজিদ ও দরগাহ এবং চারটি মন্দির ও একটি মঠ, নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপাসনাদি করার জন্য ছিল।

রংপুর সদরের কয়েকটি কুঠি হতে খাবারের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী নগরে দৈনিক আসত। উহা নগরের বাসিন্দাদের মধ্যে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী বিলি হত।

মাছ, মাংস, দুধ, দই, কলা, ঘি, ননী, চাউল, তরকারী ইত্যাদি। রংপুর ও দিনাজপুর জেলায় এদের ব্যবসায়ের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর জন্য (২২) বাইশটি কুঠি ছিল। যেমন চান্দামারীর কুঠি। এখানে হাজার হাজার গরু-ছাগল পোষা হত। যে স্থানে এরা ছিল, ঐ স্থানটিকে শংকরপুরের ডাঙ্গা বলা হত। চান্দামারী কুঠির মূল কেন্দ্র ছিল। ঐ স্থানে কতিপয় নিজেদের সৈন্য রাখা হত। এর জন্য চাঁদমারী নামেও কুঠি হয়েছে। হাতিয়ার কুঠি, বলদী পুকুরের কুঠি, মিঠাপুকুরের কুঠি, গুটিবাড়ীর কুঠি ইত্যাদি কুঠি হতে নিত্যদিন ভারে ভারে জিনিসপত্র বহন করে নিয়ে আসত। বিবাহ, শাদী ফাতিহা ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি ব্যাপারে নগরের বাইরের কোন লোকের প্রয়োজন হলে গরু, খাসি, পাঠা, মাছ, দুধ, দই ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী যে লোকের প্রয়োজন আছে, যতখানি তা তিনি নিতে পারতেন। এতে ভারীরা বাধা না দিয়ে শুধু নগরে এসে হিসাবরক্ষকের কাছে গ্রহীতার নাম ঠিকানা এবং কি কারণে কে কি জিনিসপত্র নিল তা নগরের হিসাবরক্ষকের নিকট দিতে হত মাত্র। এভাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম বা বিলি বন্টন

হত। জলের হাজার হাজার ঝরনা ফোয়ারা ফুল ও ফলের নানা জাতীয় ছোট বড় বাগ-বাগিচার ধ্বংসকারী জিনিসগুলি আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সিপাহী বিদ্রোহে রংপুরের এই নবাব বংশীয়দের ভূমিকা সম্পর্কে হায়দার আলীর চিত্তাকার্ষক রচনা ক্রমে ক্রমে আমরা প্রকাশ করবো। আমরা আগেও বলেছি (সম্মিলনী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক অসঙ্গতি পেলে বা লেখার সমর্থনে কেউ কিছু লিখে পাঠালে তা ছাপা হবে।

বি. সে. গু. সম্পাদক

তৈমুর, বাবর—ইহারা চেঙ্গিজ বংশীয় মোগল—তাহার প্রমাণ

শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাগণ অবগত আছেন যে, দিল্লীর মোগল রাজবংশীয়দের তুর্কী স্থানীয় শক্ জাতি বলে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীগণ তাদের পক্ষপাতি ইতিহাসগুলিতে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে এসেছেন এবং তারা সারা বিশ্বে না হলেও বৃটিশ ভারতে দীর্ঘ বছরগুলি ধরে সফলকাম হয়ে এসেছেন, যে বাবর, তৈমুর—এরা তুর্কী বংশীয় শক্‌তই বা শক্ জাতি। চগ্‌তাই জাতি তুর্কী জাতির একটি শ্রেণী। রাজস্থানের লেখক লেঃ কর্নেল টড্ সাহেব বালকের মতো কথাবার্তা দিয়ে সম্রাট বাবর যে ভারতে রাজত্ব স্থাপনের সময়কালে যেহেতু তুর্কী ভাষায় লেখাপড়া করেছেন ও কথাবার্তা বলেছেন, ভারতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকালে দিল্লী দরবারে তুর্কী ভাষাই কিছুদিন প্রচলিত ছিল, ইত্যাদি কথা বলে তুর্কী বংশীয় বলেছেন। আমাদের কথা হল সেখানে যারা জন্মিবে সেই ভাষায় কথাবার্তা বলেছিলেন বা রাজত্বের কার্য করেছিলেন বলে যে ওই লোক তুর্কীস্থানের চগতাই বংশীয় হবেন এর কি কোন যুক্তিযুক্ততা আছে? যেমন অনেক আরব বংশীয় ও আর্য বংশীয় ভারত বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা কি রক্তের দিকদিয়ে অনার্য্য বলতে হবে? রক্তের দিক দিয়ে তৈমুর, বাবর—ইহারা চেঙ্গিজ খাঁর অধঃস্তন বংশীয় মোগল—এই হল আমাদের কথা।

তুর্কীস্থানে আরবরা এবং চেঙ্গিজ খাঁ এবং শেষে আমীর তৈমুর তুর্কীস্থান দখল করেন। আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্য প্রামাণ্য ইতিহাস হতে কিছু তথ্য দিয়ে আমাদের কথা বলব ঃ

“সমরকন্দ·········তুর্কীস্থানের অন্তর্গত একটি নগর। এই স্থানেই মোগল সম্রাট তৈমুরলঙ্গ স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।... ... ...

৭০২ খৃস্টাব্দে ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবজাতি এই স্থান অধিকার করেন। ১২২৯ খৃস্টাব্দে চেঙ্গিজ খাঁর এবং ১৩৫৯ খৃস্টাব্দে তৈমুরের করায়ত্ত হয়।”

—বিশ্বকোষ, ১৩১ পৃষ্ঠা, একবিংশ ভাগ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

ইহা না বললেও বোঝা যায় যে, চেঙ্গিজ খাঁ এবং তৈমুর ও তাদের অধঃস্তন পুরুষগণ যে তুর্কীস্থানে পূর্ব হতে ছিলেন এবং তুর্কীস্থানে থাকলে তুর্কী ভাষায় কথাবার্তা বললে যে চেঙ্গিজ খাঁ বংশীয় মোগল হওয়ার অধিকার হারিয়ে ফেললেন? আসলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ Divide and Rule policy নিয়েছেন বহুবিধ কারণে। তার একটি প্রধান হলো এই যে, ভারতীয় জনগণ যেন এই অসীম শক্তিশালী যুদ্ধকৌশল জাতি মোগলদের চেঙ্গিজ খাঁ বংশীয় মোগল মনে না করেন অর্থাৎ চেঙ্গিজ বংশীয় মোগল হতে বিচ্ছিন্ন করার ইংরাজদের একটি অপকৌশল।

১. বাঙ্গালীদেরকে ভীরু অযোগ্য বলে ডুবিয়ে দিতে না পারলে ভারত সাম্রাজ্য কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

২. চেঙ্গিজ-এর বংশ হতে তৈমুরকে বিচ্ছিন্ন করা না হলে গোটা প্রাচ্য হতে ইউরোপীয়দের হঠতে হবে।

তাই ১ নং ও ২নং চিন্তাধারার উপর পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ তাদের কূটনীতির কাজ পুরোদমে করেছেন, যদিও বিষয় দুইটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। এই জঘন্য মিথ্যা কূট কৌশলের উপর সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ তাদের নীতি নির্ধারণ করে তাদের সাম্রাজ্যে ও বিশ্বে জোর প্রচারাভিযান চালান। সেই জালে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম আফিমের নেশায় নেশাখোরের মত করে।

“MOGUL or Moghal. the Arabic and Persian form of the word Mongol, It is inacurately used to describe the dynasty of Emperors of India founded by Baber (Babur) in 1526 A. D. On the male side Baber reckoned his descent from Timur (G. V.) who was a Barlas Turk; through his mother he was a descend from the Jayatai the second son of the Mongol ruler Jenghiz Khan. It is therefore more correct to refer to Mogul Emperor in India as a Taimurid or Turki Emperore, (See India History)—C. C.D)—” Page 646, Volume—15,

Encyclopaedia Britannica 1955 A. D. Founded—A. D. 1768

অনুবাদ : মোগল অথবা মোগাল আরবী অথবা পার্শী শব্দ। মঙ্গোল শব্দের একটি রূপ। ইহা ভ্রমাত্মকভাবে (inacurately) বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাজবংশের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়। বাবর তাঁর পিতার দিক দিয়ে তৈমুরের বংশোদ্ভূত। যিনি (তৈমুর) একজন বারলাস তুর্কী। তাঁর মাতার দিক দিয়ে তিনি মঙ্গোল শাসক চেঙ্গিজ খানের দ্বিতীয় পুত্র চঘ্‌তাই-এর বংশোদ্ভূত। সুতরাং সঠিকভাবে ভারতের মোগল রাজবংশকে বলা যায় তৈমুরীয় অথবা তুর্কী রাজবংশ।”

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার লেখকরা বলছেন যে দিল্লীর বাবর বংশীয় শাসকরা নিজেকে মোগল বংশীয় বলতেন এবং সেই হিসেবে তখনকার ঐতিহাসিকগণ ওনাদের মন খুশী করার জন্য ইতিহাসে মোগল বংশ বলে প্রশস্তি গেয়েছেন, কিন্তু ইহা আমরা সচেতনভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে. সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরাই তাদের নিজেদের ভবিষ্যত রক্ষা ও নিরাপদ রাখার জন্যই এই জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইহা আমাদের কথা নহে। ইতিহাসই প্রবলভাবে এর স্বাক্ষর দিচ্ছে যে, তৈমুর, বাবর এনারা চেঙ্গিজ বংশীয় অধঃস্তন মোগল।

প্রাচ্যের বহু ভাষায় ভাষাবিদ মহাপণ্ডিত মনীষী নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর সম্পাদিত বিশ্বকোষে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের পক্ষপাতী ইতিহাসগুলির কথা যেমন বিশ্বকোষে দিয়েছেন, তেমনি তিনি আরবী, ফার্সী, প্রভৃতি ভাষার ইতিহাস হতে তাঁর বিশাল বিশ্বকোষের বিভিন্ন জায়গায় প্রাচ্যের সত্য ইতিহাসগুলির কথা বলে চেঙ্গিজ খাঁর অধঃস্তন বংশধর তৈমুর, বাবর ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতা ও চাতুর্যের সাথে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ সরকার বিশ্বকোষের ভল্যুমগুলি বাজেয়াপ্ত না করেন। এই সতর্কতা নিয়ে এদের বংশতালিকাও বিশ্বকোষে দিয়েছেন বাবর পর্যন্ত।

চেঙ্গিজ খাঁর পিতা য়ামন্যুক হতে আমীর তৈমুর কত পুরুষ তা বিশ্বকোষে যেমন দেওয়া আছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

“রাজা য়াসন্যুক”—আমীর তৈমুরের ৫ম পূর্ব্ব পুরুষ। এর রাজধানীর নাম “দিলুময়ুলদু” রাজা য়াসন্যুক এর পাঠানো মহিষীর নাম “উলনফুজান।”

এখন আমরা ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে ঢাকা হতে প্রকাশিত বিশ্বকোষ প্রধান সম্পাদক খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় বাংলা বিশ্বকোষ যা প্রকাশিত হয়েছে, এটি সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত ইতিহাসের নকল মাত্র। তাঁরা যা লিখেছেন, তা হলো ঃ

"তাইমুর বা আমীর তৈমুর ……… তিনি নিজেকে চেঙ্গিজ খানের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন, তাহার পিতা আমীর তুরগে (Turghay) বরলাম তুর্কীদের তুর্কনি শাখার প্রধান ছিলেন।

পৃষ্ঠা ৬৯৮, বাংলা বিশ্বকোষ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, হতে যে এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কি বলেছেন এখন তাই দেখুন।

Baber, Babur or Babar (babar) (1483-1530)

Conqueror of India and founder of the Mogul dynasty, was born in 1483. He was a descendent of the great Mongol Emperor Genghis Khan through his second son Joyatai and from the equally renowned Turkish Chieften Timur or Tamerlance

His surname Baber, meaning "Tiger" was derived from the Mongol…… Brno Les ker.

Page-421, Colliers Encyclopedia, Volume 3

Latest Edition—1965 first—1952

William D. Halsey Editorial director.

Lavis Shores. Ph. D.—Editor in Chief.

Robert. H. Blackburn—M. S. B. L. S.—Consultant for Canadu. Sir Frank Fransis. K. C. B. M. A. D. LiH. F. S. A.—Consultant for Great Britain.

Copyright (c) U. S. A. (United States) 1952-1965.
by P. F. Colliers and Son Corporation.

Copyright (e) Great Britain 1952-1965.
by P. F Colliers and Son Corporation
All right reserved under the inter American Copyright Union and under the Pan American Copyright Convention

অনুবাদ

"বাবের, বাবুর অথবা বাবার (১৪৮৩-১৫৩০) ভারত বিজয়ী এবং মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ১৪৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন; বাবর মহান মঙ্গোল সম্রাট চেঙ্গিস খানের ২য় পুত্র চঘতাই-এর বংশধর এবং সমান খ্যাতিসম্পন্ন তুর্কী শাসক তৈমুর বা তামারলাণ্ড-এর বংশধর।......

তাঁহার বংশনাম (পদবী) বাবের 'মঙ্গোল' শব্দ হইতে আগত যাহার অর্থ —ব্যাঘ্র"......

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

BABUR : Brige K. Gupta

A Chagtai Turk, Babur (Pronounced babar) was born at Farghana (Turkestan) on Feb. 14. 1483. He climed descent from two great Central Asian conquerors. Fifth generation from Tamerlance and fifteenth generation from Genghis Khan. Baburs efforts to built an empire in Central Asia and Northern India were largely based on his desire to recover terretoring once controlled by the two ancestors.

Volume-1, Page-325. The Macgraw Hill, Encyclopaedia of World Biography.

Printed in America (U. S. A.)

অনুবাদ

বাবুর ঃ ব্রিজ কে. গুপ্ত

"একজন চগতাই তুর্কী। বাবুর ফারহানা (তুর্কীস্থান) নামক স্থানে ১৪৮৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দুই বিখ্যাত মধ্য এশিয়া জয়ী বীরের বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবী করিতেন। তামারলাণ্ড-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ এবং চেঙ্গিজ খানের পঞ্চদশ অধঃস্তন পুরুষ। বাবুর মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য কঠোর ভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহার বৃত্তের ভিত্তি ছিল একদা তাঁহার দুই বিখ্যাত পূর্বপুরুষের শাসনভুক্ত এলাকা পুনরুদ্ধারে তাহার ইচ্ছা।"

TIMUR (Timur-i-Leng......the lame Timur)

His father Turagai was head of the tribe Barlas Great grandson of Karachar Nevian (Minister of Jagtui son of Tenghiz Khan and Commanderin-chief of his forces).

Encyclopaedia, Britannica, page ঃ 232. Volume 22, 1768—1937

তৈমুর (তৈমুর-ই-ল্যাঙ্গ······খোড়া তৈমুর)

তাঁহার পিতা তুরাঘাই বারলাস জাতির প্রধান ছিলেন কারাচার নেভিয়ানের মহান পৌত্র (চেঙ্গিজ খানের পুত্র চঘতাই-এর মন্ত্রী এবং সৈন্যবাহিনীর প্রধান ···)।

সত্যকে চাপা দিয়ে কেমনভাবে বলা হচ্ছে তৈমুরের পিতা তুরাঘাই কারাচার নেভিয়ানের বংশীয় হলেন তৈমুর খাঁ। তৈমুরের পিতার নামটা ঠিকই রাখা হয়েছে। বারলাস জাতির প্রধান ছিলেন তৈমুরের পিতা তুরাঘাই। জাতির প্রধান হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যেহেতু শাসক ছিলেন মোগলরা, যেমন ভারতের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন জওয়াহেরলাল নেহরু। কিন্তু তাতে কি জওয়াহেরলালজী যে আর্য্য ঠাকুর বংশীয় নাকি ব্রাহ্মণ বংশীয় তা কি লোপ পেয়ে যাবে? তাতে কি আর রক্তের দিক দিয়ে আর্যত্ব ঘুচে যাবে? এইসব জারিজুরি চুরমার করে দিয়ে নগেন্দ্রনাথ বাবুর বিশ্বকোষ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে চেঙ্গিজের অধঃস্তন পুরুষ—তৈমুর, বাবর প্রভৃতিগণ।

সোভিয়েত রাশিয়ার এনসাইক্লোপিডিয়া বলছেন যে তৈমুর তুর্কীতে বসবাসকারী মোগল। তাদের নিজস্ব কথায় দেখুন ঃ

TAMERLANE (··· ···)

Born 1336 in the village of Hodja-Il-Gar, died Feb. 18, 1405. in Otrar, Middle Asian state figure and military leader; emir Son of Taragai of the Barlas tribe, Turkic Mongol.

He took the title of Emir and began to rule Mavera-un-nahn (Transoxiana) on behalf of the descendants of Genghis Khan."

Great Soviet Encyclopedia, Volume, No. 25.
Page, 350. (Colliers Macmillan Publishers, London)

অনুবাদ : তৈমুর হোজা-আলগর গ্রামে ১৩৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং উত্রারে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪০৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মধ্য এশিয়ান রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব ও সেনানায়ক আমীর তুর্কীয় মোঙ্গল বারলাস সম্প্রদায়ের তুরাঘাইয়ের পুত্র, তিনি আমীর উপাধি ধারণ করিয়া চেঙ্গিজ খানের অধঃস্তন বংশধরদের পক্ষ হইতে মাভেরা-উন-নহর এর (ট্রান্সোক্সিয়ানার) শাসনভার গ্রহণ করেন।

তুর্কীস্থানে চেঙ্গিজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুষী খান এবং দ্বিতীয় পুত্র চগতাই-এর বংশধরগণ তৈমুরের শৈশবকালের সময়গুলিতে একেকজন এক একটা শহরে রাজত্ব করছিলেন ক্ষুদ্র শাসক হিসেবে। চেঙ্গিজ বংশীয় ব্যতীত তুর্কীস্থানে ঐ সময়গুলিতে আর কোন মোঙ্গলরা কি তুর্কীস্থান শাসন করেছিলেন ?

মিথ্যা কথা অত জোরের সঙ্গে বললেই কি মিথ্যা সত্য হয়ে যায় ? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বাবর তৈমুর সম্পর্কে কিন্তু সেই পথই ধরেছেন দেখছি। আমীর তৈমুর জগৎবিখ্যাত মোগল বীর ১৩৩৬ খৃস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল প্রাচীন সোগদিয়ানাস্থ কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পারস্য বিজেতা চঙ্গেজ খাঁর বংশে এই মহাবীরের জন্ম। তৈমুরের পিতার নাম আমীর তুরাঘাই, মাতার নাম তকীনা খাতুন। চঙ্গেজ খাঁর জ্ঞাতি করাচার নেভিয়ান হইতে তৈমুর ছয় পুরুষ নিম্নে। তৈমুরের জন্মকালে চঘতৈ রাজবংশ বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কতকগুলি মোগল বংশীয় প্রধান ব্যক্তি এক-একটি নগরের রাজা হইয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে তৈমুরের খুড়া হাজী বরলস্ কুশনগরে রাজত্ব করিতেন। এইখানে তৈমুর জীবনের প্রথম চব্বিশ বৎসর শান্তভাবে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি শিকার করিতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন। ১৩৬০ খৃস্টাব্দে কালম্ কেরা তুর্কীস্থান দখল করিতে থাকে এবং তথাকার স্বাধীন রাজাদিগকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়। তৈমুরের খুড়া বিজেতার ভয়ে পালাইয়া যান ; কিন্তু বীরবর তৈমুর পশ্চাদপদ হইলেন না। এতদিন যে বীর্য লুকানো ছিল, সময় পাইয়া জাগিয়া উঠিল। জন্মভূমিকে অপরের করে অর্পণ করিতে তাহার প্রাণে সহিল না। কতকগুলি মাত্র সৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রবল বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেম। আক্রমণকারী কালমক রাজ তৈমুরের সাহস, বল এবং বীরোচিত সম্বোধনে চমৎকৃত হইলেন; তাহাকে কুশনগরের শাসনভার দিলেন ১৩৬৫ খৃস্টাব্দে।

বলখের অধিপতি আমীর হোসেন বিপক্ষের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করেন। তাহাতে তৈমুরও যোগ দেন। উভয় বীরের যত্নে তুর্কীস্থান কালমক্‌দের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। উভয় মিলিয়া তুর্কীস্থানের রাজা হইলেন। তৈমুর হোসেনের ভগ্নিকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন যাইতে না যাইতে উভয় বীরের মনোবিবাদ ঘটিল, তখন তৈমুর আমীর হোসেনকে পরাজিত ও বিনষ্ট করিয়া সমগ্র তুর্কীস্থানের একটা অধীশ্বর হইলেন।

—১০ই এপ্রিল, ১৩৭০ খৃস্টাব্দ বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড,
নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত

ইংলণ্ড হইতে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে আমীর তৈমুরকে বারলাস জাতির বংশোদ্ভূত তুর্কী বলা হয়েছে, যার অর্থ ইংরাজরা মোগল নয়, বলেছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষে উল্লেখিত রয়েছে ঃ

"বুজঙ্গর খাঁ হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ তোমনাই খাঁ। তাহার দুই পত্নী ... ... দ্বিতীয়ার গর্ভে কবাল ও কাজুলী নামে দুই যমজ পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর পর কবাল খাঁ রাজপদে এবং কাজুলী খাঁ প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ... ...

... ... কবাল খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কুবীলা খাঁ রাজ্যাধিকার পান ... ... কুবিলা খাঁর লোকান্তর গমনের পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্তান বাহাদুর (ইনি পূর্বপুরুষদের খাঁ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুর উপাধি ধারণ করেন) রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

বর্তানের রাজত্বকালে কাজুলী খাঁর মৃত্যু ঘটায় তৎপুত্র ইন্দর্ম মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হন। ইন্দর্ম চিরলাস উপাধি গ্রহণ করিয়া মোঙ্গল জাতির একটা নূতন শাখার প্রবর্তন করেন। উহা তাহারই নামানুসারে বারলাস নামে খ্যাত হয়।

বর্তানের পর তৎপুত্র য়াসুাক রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। ইহার কিছুকাল পরে ইন্দর্ম-চি-বরলাস প্রাণত্যাগ করলে তৎপুত্র সুঘুজ-চি বা সুঘুজিজান মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হইলেন। ইনি আমীর তৈমুরের ৫ম পূর্বপুরুষ।

মোগল বংশের নৈরুনশাখা য়াসদ্যক বাহাদুরের পুত্র তমুরচিকে (চেঙ্গিজ খাঁ) আপনাদের অধিনেতৃরূপে গ্রহণ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই বহুদর্শী অমাত্য সুঘুজিজান স্বর্গপুরে গমন করেন। তাহার কিশোর পুত্র নুন-আন (কারাচার) মন্ত্রীপদে নিয়োজিত হইলেন।

পৃষ্ঠা ৪৪০, পঞ্চদশ ভাগ, বিশ্বকোষ; শব্দ-মোগল

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষ জগত বিখ্যাত আরবী, ফার্সী প্রভৃতি বিশ্বস্ত গ্রহণীয় ইতিহাস ঘেঁটে যেসব সত্য তথ্য দিয়েছেন, এতে দেখা যাচ্ছে যে করাচার নবীআন প্রকৃত মোগল রাজবংশীয়। এরা তুর্কীস্থানে জন্মেছেন বলে তুর্কী নন। আসলে চেঙ্গিজ বংশীয় মোগল অথচ বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ তাদের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ‘‘On the male side Baber reckoned his descent from Timur, who was Barlas Turk.’

অনুবাদ ঃ বাবর তাহার পিতার দিক দিয়া তৈমুরের বংশোদ্ভূত, যিনি একজন বারলাস তুর্কী।

এবং বাবর সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া কি বলছেন দেখুন, ‘‘It is therefore more correct to refer to Mogul Empire in India as a Timurid or a Turki emperors.

অনুবাদ ঃ সুতরাং সঠিকভাবে ভারতের মোগল রাজবংশকে বলা যায় তৈমুরীয় অথবা তুর্কী রাজবংশ।

পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজগণ ব্যাঘ্র শাবককে মেষ বানাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ চেঙ্গিজ খাঁ বংশীয়দের তুর্কী বংশীয় বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সঠিক ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে তৈমুর, বাবর চেঙ্গিজ খাঁ, বারলাস—এরা রক্ত বংশের দিক দিয়া একই বংশীয় লোক।

চেঙ্গিজ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তুষী খাঁর পুত্র বতু খাঁ এবং চেঙ্গিজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র চগতাই খাঁর বংশধরগণ তুর্কীস্থানে বসবাস করতেন। সেখানে রাজত্ব করেছেন কখনো সবল হয়ে, কখনো দুর্বল হয়ে। এসব কথা কি অস্বীকার করা যাবে? আমরা আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, কোন অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই প্রাচ্য দেশগুলিকে লুণ্ঠনকারী দেশ ও জাতীয় চরিত্র হরণকারী সামাজ্যবাদী ইংরাজগণ যা কিছু লিখেছেন বলেছেন তাই আমরা মেনে নিয়েছি। জ্ঞানী-গুণী বিদ্বানদের নিকটে আমাদের প্রশ্ন—এসব দেশে

ইংরাজরা কি প্রেরিত পুরুষ হিসেবে এসেছিলেন ঈশ্বরের বাণী নিয়ে যে তাঁরা যা বলেছেন তাই আমাদের মেনে নিতে হবে সত্য বাণী বলে? আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধান বিমুখতা দেখে আসছি। এর ফলেই আমাদের অবর্ণনীয় ক্ষয়-ক্ষতি ও দুর্দশাগ্রস্ততা।

এখন আমরা মহামনীষী নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত বিশ্বকোষ হতে মোগলদের সম্বন্ধে কিছু প্রামাণ্য ইতিহাস উদ্ধৃত করব।

"বর্তানের পর তৎপুত্র য়াস্যুক রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি আমীর তৈমুরের ৫ম পূর্বপুরুষ। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাহার উলকশহ্য জাতীয় প্রধানা মহিষী 'উলন কুজান' এক পুত্র (চেঙ্গেজ খাঁ) প্রসব করলেন। বিশ্বকোষ, ৪৩৪ পৃষ্ঠা, পঞ্চদশ ভাগ

"চেঙ্গিজ প্রপৌত্র, তুষীর পৌত্র, বতুর পুত্র উজবেক খাঁ প্রথম মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মোগল রাজবংশীয়দের মধ্যে।

"চেঙ্গিজ প্রপৌত্র চাগতাই-এর পৌত্র তুরাঘাইয়ের পুত্র তৈমুর খাঁ দ্বিতীয় শাখায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন।'

'চেঙ্গিজের প্রপৌত্র চগতাই-এর পৌত্র তুরাঘাইয়ের পুত্র তৈমুর খাঁ সমগ্র মোগলদের নেতৃপদে বরণীয় হওয়ার পর মুসলমান ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।'

'অতঃপর চগতাই বংশীয় তোঘলক তৈমুর খাঁ অধিনেতৃ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইসলাম মতে পক্ষপতিত হন। তিনি কোরআনোক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া স্বয়ং তন্মতে দীক্ষা লাভ করেন। ভারতের মোগল রাজবংশ এই চগতাই বংশ সম্ভূত বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।'

বিশ্বকোষ, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, পঞ্চদশ ভাগ

'এরূপ সংকটের সময় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মোগল গৌরব রবি তৈমুর লঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া এশিয়ার ভাগ্যাকাশে সমুদিত হন। তাহার অভ্যুদয়ে মোগল জাতি নবতেজে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।'

বিশ্বকোষ

এখন ঢাকা হতে প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ হতে মোগলদের শৌর্য-বীর্য সম্পর্কীয় কিছু তথ্য উদ্ধৃত করছি ঃ

'বটু খান (বতু খাঁ) (Batu Khan)। মৃত্যু ১২০৫ খৃস্টাব্দ, গোলডেন হোর্ড নামক মঙ্গোল বাহিনীর অধিনায়ক। চেঙ্গিজ খানের পৌত্র, ১২৩৫ খৃস্টাব্দে তাহাকে মঙ্গোল বাহিনীর প্রধান করিয়া ইউরোপ বিজয়াভিযানে প্রেরণ করা হয়। তাহার সেনাপতি ছিলেন সুবাতাই (সাবুতাই)। বটু খান ভলগা নদী অতিক্রম করেন, অধিকাংশ সৈন্যবাহিনী রাশিয়ায় এবং কিয়দংশ বুলগেরিয়ায় প্রেরণ করেন। ১২৪০ খৃঃ-এর মধ্যে মস্কো এবং কিএফ তাহার করতলগত হয়। পরবর্তী দুই বৎসরে তিনি হাংগেরী ও পোল্যান্ড জয় এবং জার্মানী আক্রমণ করেন। অনুমান করা হয় যে, মহাখান (Grand Khan)-এর নির্বাচন উপলক্ষে ১২৪২ খৃস্টাব্দে তাহাকে কারাকোরাম প্রত্যাবর্তনের আহবান না আসিলে সমগ্র ইউরোপই হয়ত মঙ্গোল শাসনাধীন হইত। তাহার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র কিপচাক খান রাজ্য (Kipchak Khanate) নামে পরিচিত।

পৃষ্ঠা ৩৯৮, বাংলা বিশ্বকোষ, সম্পাদক খান বাহাদুর আবদুল হাকিম

এখন সুধী ও বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য বিশ্বকোষে উল্লেখিত মোগলদের সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি প্রামাণ্য ও সত্য ইতিহাস ও ঐতিহাসিকের নাম উদ্ধৃত করিতেছি।

১. নাসিরুদ্দীন আবদালা বিন ওমর আলবৈজভী একজন মুসলমান ঐতিহাসিক। এশিয়ার সমাট বিশেষত মোগলগণের বিবরণই ইনি বিশেষ লিখিয়াছেন, সম্ভবত তারিজ নগরে ১২৮৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

২. নাসিরুদ্দীন আবদালা-বিন-ওমর-আলবৈজভী—ঐতিহাসিক যিনি মোগল বংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন এক গবেষণাপূর্ণ পার্সী গ্রন্থ।

৬৭০ পৃষ্ঠা, নবম ভাগ, বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

"হাফিজ আবরু—একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক। উপাধি নুরুদ্দিন-বিন-লুৎফুল্লা। হিরাট নগরে ইহার জন্ম। কার্যবশে হামদান নগরে তিনি বাল্য জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন এবং সেই স্থানে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন শুভ গ্রহ বশে তিনি মোগল সম্রাট আমীর তৈমুরের অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়েন। উক্ত সম্রাট তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাহার উপকারার্থে যে কোনরূপ কার্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি সম্রাট তৈমুরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শাহরুখ মীর্জার দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শাহরুখ-তনয়

যুবরাজ মীর্জা বৈষঈম তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। তিনি তাহার প্রীতি দয়া প্রকাশে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। উক্ত রাজকুমারের ব্যবহারে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তিনি স্বরচিত ইতিহাস 'জুবদাৎ-উৎ-তবারিখ বৈষঈম' নামে যুবরাজকে উৎসর্গ করেন। ঐ গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ, উহাতে ১৪২৫ খৃঃ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস, বিভিন্ন দেশবাসী ও তাহাদের ধর্ম্ম ও শিক্ষা প্রণালী প্রভৃতির বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, এতভিন্ন তাঁহার রচিত "তারিখ হাফিজ আবরু," নামে আর একখানি ইতিহাস গ্রন্থ পাওয়া যায়। ১৪৩০ খৃঃ (৮৩৪ হিঃ) সমকালে জনজান নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্বকোষ, পৃঃ ৫৫৯, দ্বাবিংশ ভাগ
নগেন্দ্রনাথ বসু সংকলিত ও প্রকাশিত

'আকবরনামা' শেখ আবুল ফজলের রচিত। আকবরনামা তিন খণ্ডে সাঙ্গ। প্রথম খণ্ডে তৈমুরের বংশ বিবরণ।

বিশ্বকোষ, ১৩ পৃষ্ঠা, প্রথম খণ্ড, শ্রী রঙ্গলাল
মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত

ইহা ছাড়া কলিকাতা হতে প্রকাশিত 'নূতন বাংলা অভিধান', 'বিচিত্র ভারত' ইত্যাদি গ্রন্থে লিখেছেন চেঙ্গিজের অধঃস্তন বংশধর তৈমুর, বাবর প্রভৃতিগণ। এসব কথা কি খেয়ালীপনা ধারণা মাত্র? সর্বোপরি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত এনসাইক্লোপিডয়ায়ও দেখা যাচ্ছে যে, চেঙ্গিজ খাঁর অধস্তন পুরুষ তৈমুর বাবর প্রভৃতিগণ, সুতরাং পাঠকদের কাছে প্রশ্ন— আমরা এইসব মহাজ্ঞানী গুণী বিদ্বান ব্যক্তিদের কথাই ধরব, না যারা ২০০ বছর ধরে আমাদের শোষণ, উৎপীড়ন, নির্যাতন করেছে এবং আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী, সেই সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজদের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত মিথ্যা কথাগুলি ধরব ?

ব্রিটিশ ভারতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাস না লেখার দরুন।

ইফাবা—৮৬-৮৭—প্র/৩৩৩৫—২২৫০—১৫. ৩. ১৩৯৪/৩০. ৬. ১৯৮৭

পলাশী
যুদ্ধোত্তর
আযাদী
সংগ্রামের
পাদপীঠ

হায়দার আলী চৌধুরী